সূচী-পত্র

মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনা :



বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

'চিত্র ও কাব্য'

[১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রথম প্রকাশিত]

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কাকা মহাশয়

শ্রীচরণেষু

বিজ্ঞাপন

গত তিন বৎসরের 'সাধনা'য় চিত্র ও কাব্য সম্বন্ধে আমার যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই কতকগুলি সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া এই গ্রন্থে একত্র সন্নিবিষ্ট হইল।

গ্রন্থকার

কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা

অলঙ্কারের নির্দ্দেশানুসারে মহাকাব্য বলিয়া গণ্য হইলেও রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন মহাকাব্যের সহিত কালিদাসের রঘুবংশের একটা বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে কোনও মূল ঘটনা বা প্রধান চরিত্রের প্রভাব লক্ষিত হয় না—কেবলি ধারাবাহিক কতকগুলি খণ্ড খণ্ড সম্পূর্ণ চিত্র একমাত্র কুলগৌরবসূত্রে সংযুক্ত। দিলীপ হইতে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত ভালমন্দ অনেকগুলি রাজা—কেহ পুত্রাকাঙ্ক্ষায় তপোবনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, কেহ দিগ্বিজয়ী ধনুর্দ্ধর, কেহ প্রিয়বিরহে বিলাপ করিয়া আকুল, কেহ পিতৃসত্য-পালনার্থে বনে বনে ফিরেন, কেহ বা প্রমদাজনবেষ্টিত হইয়া অহর্নিশি সুরাপানে কালক্ষয় করেন—প্রত্যেকের জীবনের মূল ঘটনা স্বতন্ত্র এবং কালভেদে একের জীবনের সহিত অপরের জীবনের ঘটনার বড় সম্পর্ক নাই। যোগ এই পর্য্যন্ত যে, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, এবং এইরূপে অগ্নিবর্ণ পর্য্যন্ত একটি ধারাবাহিক বংশাবলী।

রামায়ণ মহাভারত এরূপ কুলজী নহে। কুলের কথা তাহাতে অনেক আছে বটে, কিন্তু তাহা প্রসঙ্গক্রমে আসিয়াছে মাত্র। সমগ্র কাব্যখানি সেই সূত্রে গ্রথিত বলা যায় না। কবির হৃদয়ে মনুষ্যত্বের যে চরম আদর্শ জাগিয়া ছিল, সেই আদর্শকে মূর্ত্তি দিয়া তিনি রামকে গড়িয়াছেন। এবং রামায়ণের অন্যান্য চরিত্রগুলিও রামেরই আনুষঙ্গিক।

মহাভারতে ঘটনারও যেমন অন্ত নাই, লোকেরও অন্ত নাই—ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শত ধার্ত্তরাষ্ট্র, সঞ্জয়, বিদুর, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণ—বিস্তর বড়লোক এবং প্রত্যেকেরই নিজত্ব বিশেষ পরিস্ফুট। কিন্তু এই বিবিধ ছোট বড় ঘটনা এবং বিচিত্র প্রধান অপ্রধান চরিত্রসমাবেশ কুরুক্ষেত্র-ব্যাপারেরই সূচনা। প্রতি ঘটনা এই মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বায়োজন এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রলয়ের রঙ্গভূমিতে অভিনেতা।

রঘুবংশের বিষয় পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বিবস্বৎকুলের বর্ণনা। কোন মূল ঘটনাও নাই, বিশেষ নায়কও নাই, এবং রাজচরিত্রের একটা আদর্শস্থাপন কিম্বা অনুরূপ কোন উদ্দেশ্যও দেখা যায় না। তবে এত বিষয় থাকিতে এক প্রাচীন বংশাবলী বর্ণনায় কবির এত উৎসাহ কেন?

ইহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনায় কালিদাসের একটু যেন বিশেষ আনন্দ ছিল। শম্বুক যেমন অতি সহজেই আপনার চারি দিকে বিচিত্র চিত্রিত আবরণ নির্ম্মাণ করে, কালিদাসের প্রতিভা তেমনি দেখিতে দেখিতে আপনাকে চিত্রময়

শ্লোকে আবৃত করিয়া তোলে। ভবভূতি যেমন মানবপ্রকৃতিকে করুণারসে বিগলিত করিয়া লেখনীমুখে নিঃসৃত করিতে ভালবাসিতেন, কালিদাস তেমনি মানবপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতিকে চিত্র-আকারে পরিস্ফুট করিতে ভালবাসিতেন। রঘুবংশের ন্যায় প্রায়-অসংলগ্ন সর্গপরম্পরায় এই ছবি আঁকিবার অনেকটা অবসর পাওয়া যায়। একটা চিত্রশালা দেখিয়া আসিলে যেমন মনের ভাব হয়, সমস্ত রঘুবংশ পাঠ করিলেও সেইরূপ হয়। অনেকগুলি ফ্রেমে বাঁধানো ভাল ভাল ছবি।—দিলীপদম্পতির তপোবনে গমন। রঘুর নানা দেশে দিগ্বিজয়। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর। দশরথের মৃগয়াগমন। রামসীতার রথযাত্রা। পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী। অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ। এইগুলি ছবি—বাকি সমস্তই ফ্রেম।

রঘুবংশে চরিত্র যাহা বাণত হইয়াছে, তাহা কেবল বর্ণনা মাত্র, চরিত্র রচিত হয় নাই। দিলীপের গুণগ্রাম কালিদাস নীতিগ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়া লিখিয়াছেন মাত্র—অন্য নৃপতিদিগকেও সর্ব্বাঙ্গীণভাবে জাগ্রত করিয়া তুলিবার তেমন চেষ্টা হয় নাই। কেবল ছবিগুলির প্রতিই কালিদাসের টান।

এবং কালিদাস ক্রমাগতই চিত্রের পর চিত্র সাজাইয়াছেন। অনেক স্থলে একই পথবর্ণনার এক-একটি শ্লোকে এক-একটি চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ পথ কখনও গ্রামের প্রান্ত দিয়া, কখনও বনের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে—স্নিগ্ধ-গম্ভীরনির্ঘোষ এক স্যন্দনে বসিয়া রাজা ও রাণী এই পথে গুরুগৃহে চলিয়াছেন। পথের দুই ধারে কোথাও স্যন্দনবদ্ধদৃষ্টি হরিণমিথুন, কোথাও রথনেমিস্বনোন্মুখ ময়ূরদল, গ্রামপ্রান্তে মধ্যে মধ্যে ঘৃতভাণ্ডহস্তে ঘোষবৃদ্ধেরা রথের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হয়—রাজা তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহেন, তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন, রাজদর্শনে প্রীত হইয়া তাহারা গৃহে ফিরে।

এইরূপে সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সায়ংকালে রাজা দিলীপ সস্ত্রীক বশিষ্ঠাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নিরাবিল তপোবন—কালিদাসের কল্পনার প্রিয় বিহারভূমি। উজ্জয়িনীর নাগরিকতা হইতে তিনি যেন এইখানে আপন মানসী আশ্রমে আসিয়া বিশ্রাম-লাভ করেন। কিন্তু এ তপোবনে তপস্যার কঠোরতা বড় নাই—কেবলি একটি পবিত্র হোমধূমাচ্ছন্ন নির্জ্জন গৃহাশ্রম। এখানে ঋষিপত্নীরা ব্রত আচরণ করেন, বিকালবেলায় উটজদ্বারে দাঁড়াইয়া অপত্যবৎ হরিণযূথকে নীবার রোমন্থ করিতে দেখেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটহস্তে আলবালে জলসেক করিয়া থাকেন এবং সেকান্তে আলবালাম্বুপায়ী বিহঙ্গগণের বিশ্বাসের নিমিত্ত দূরে সরিয়া দাঁড়ান। এখানে কেবলি স্নেহ দয়া মায়া, রমণীর শুভ্র কোমলতা—দ্বেষ নাই, হিংসা নাই, সিংহাসন এবং চক্রান্ত নাই—শুধু শান্তি এবং

সন্তোষ। কালিদাস ইহাই উপভোগ করেন—সরল হৃদয় এবং পবিত্র প্রীতিভাব, বিকশিত সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য এবং সুডোল নিটোল গঠন, নিরলঙ্কারর মণীয়তা এবং বল্কলবদ্ধ বিমল যৌবন।

রাজদম্পতি এই তপোবনে পর্ণশালায় থাকিয়া ধেনুর সেবা করেন। প্রত্যহ প্রভাতে নন্দিনীকে লইয়া বনে বাহির হন এবং সায়ংকালে ঝিল্লীমুখরিত বনপথ দিয়া কুটীরে ফিরিয়া আসেন। একদিন সহসা দেখিলেন, নন্দিনী নিকটে নাই—অদূরে শৈলগহ্বরের সম্মুখে এক সিংহ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে—নন্দিনী কাতরদৃষ্টিতে দিলীপের দিকে চাহিয়া। রাজা ধনুতে শরযোজনা করিলেন—নন্দিনীর মায়াপ্রভাবে তাঁহার হস্ত অসাড়—ধনুর্ব্বাণহস্তে যেমনটি তেমনি চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। কালিদাসও চিত্রিতবৎ বর্ণনা করিয়াছেন। এবং কেবল একটি সুন্দর চিত্রহিসাবেই ইহার সৌন্দর্য্য।

অবশেষে নন্দিনী প্রীত হইয়া রাজাকে অভিলষিত বর প্রদান করিল। গুরু ও গুরুপত্নীর পাদবন্দনাদি করিয়া সস্ত্রীক দিলীপ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিলেন। অল্পদিনমধ্যেই সুদক্ষিণার দোহদলক্ষণ দেখা দিল।

সুদক্ষিণা যখন অন্তঃসত্ত্বা, কালিদাস দিলীপের অন্তঃপুরে গিয়া এক এক বার মহিষীকে দেখিয়া আসিয়াছেন। এবং গর্ভিণীর পাণ্ডু মুখশ্রী, মন্থরগতি, অলসভাব—পরিপূর্ণা দোহদশ্রী—এক আধটি মৃদু উপমায় চিত্রিত করিয়াছেন; কোথাও উষাকালীন ক্ষীণপাণ্ডু শশীর সাদৃশ্যে; কোথাও বা পুরাতন পত্রাপগমে সন্নদ্ধমনোজ্ঞপল্লবা লতিকার সহিত তুলনায়।

শুধু ইহাই নহে, দু' একটি নিভৃত সুন্দর দাম্পত্য চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছে। সন্তানসম্ভাবনায় মহিষীর আদর বাড়িয়াছে—রাজা যখন তখন অন্তঃপুরে আসিয়া প্রিয়াকে জিজ্ঞাসা করেন, কি খাইতে ইচ্ছা করে, কি পরিতে সাধ যায়, ইত্যাদি। এবং ঘন ঘন সুদক্ষিণার মৃৎসুরভি আনন আঘ্রাণ করিয়া দিলীপের আর কিছুতেই পরিতৃপ্তি জন্মে না।

এই দোহদচিত্র রঘুবংশে আরও দু' এক স্থলে দেখা যায়। রামচন্দ্রও একদিন আলেখ্যগৃহে বসিয়া অঙ্কনিষণ্ণা সীতাকে এমনি করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাঁহার কি সাধ যায়; এবং তদুত্তরে সীতা—বোধ করি, চতুর্দ্দিকের বনবাসবৃত্তান্তালেখ্যদর্শনে—আর একবার সেই ঋষিকন্যাপরিবৃত তপোবনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দিলীপ রাজ্যভার হইতে অবসর গ্রহণ করিলে রঘু সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশদেশান্তরে দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন। তখন শরৎকাল। উজ্জ্বল দিন। দূরবিস্তৃত শস্যক্ষেত্রে ইক্ষুচ্ছায়ায় বসিয়া কৃষকাঙ্গনারা গ্রাম্য কবিরচিত রঘুকর্ত্তৃক ইন্দ্রবিজয়গাথা গাহিতেছে। রাজধানী-সুরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শুভ দিনে শুভ ক্ষণে রঘু সেনাদল সহ যাত্রা করিলেন। পৌরাঙ্গনারা চতুর্দ্দিক্ হইতে লাজরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল।

চতুরঙ্গ সেনা যেখান দিয়া যায়, ধূলায় আকাশ ছাইয়া ফেলে। মাতঙ্গকুল শুণ্ডের দ্বারা বড় বড় বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া পথ পরিষ্কার করিতে থাকে—বন উজাড় হইয়া যায়। জয়োল্লাসমত্ত রঘুসেনা কোথাও পার্ব্বত্যপ্রদেশে পানভূমি রচনা করিয়া তাম্বূলপত্রপুটে নারিকেলসুরাপানে কালহরণ করে। কোথাও নৌসেতু বাঁধিয়া, কোথাও বা হস্তিপৃষ্ঠে রঘু সসৈন্যে নদী পার হয়েন। এবং মদমত্ত সেনাগজগণের অবগাহনে সরিৎসকল মদগন্ধে আকুল হইয়া উঠে।

তাহার পর স্বয়ম্বরসভা। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভায় ভারতের যত সম্ভ্রান্ত নরপতিগণ উপস্থিত হইয়াছেন, কালিদাস প্রত্যেকের এক একখানি চিত্র আঁকিয়াছেন। এই রাজগণ-বর্ণনার মধ্যে দু' একটি মৃদুস্পর্শ টান দিয়া রূপসীর রূপের আভাসে তিনি চিত্রগুলিকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রতিহারিণী সুনন্দা মগধ-ঈশ্বরের বর্ণনা করিতেছে—মগধরাজ বহু যজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে নিজগৃহে রাখিয়াছেন এবং সেই অবধি বিরহিণী শচীর কেশবিন্যাস বন্ধ। দেবাঙ্গনাবাঞ্ছিত অঙ্গদেশাধিপতির বর্ণনা—অঙ্গরাজ যখন শত্রুদিগকে বধ করিলেন, তাহাদের রমণীরা মুক্তাহার ত্যাগ করিয়া কাঁদিতে বসিল এবং মুক্তাফলস্থূল অশ্রুবিন্দু তাহাদের স্তনদেশে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। দুর্ব্বিষহতেজ মথুরাধিপ সুষেণ স্নিগ্ধকান্তি এবং নয়নাভিরাম—জলক্রীড়াকালে তাঁহার অন্তঃপুরিকাগণের স্তনচন্দন-প্রক্ষালনে কালিন্দীর নীল জল যেন শুভ্র গঙ্গোর্ম্মিসংযুক্ত হইয়া শোভা পায়। ইন্দুমতী একে একে নমস্কারপূর্ব্বক সকলকেই সসম্ভ্রমে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রমে অজের নাম; সুনন্দা বলিতে লাগিল—ইহাঁরই পিতামহ দিলীপ, যাঁহার শাসনে পথিমধ্যে নিদ্রিতা নর্ত্তকীর অঙ্গবসন উড়াইতে বায়ুও সাহস করিত না, পিতা রঘু বিশ্বজিৎ যজ্ঞে মৃণ্ময় পাত্র মাত্র রাখিয়া সমস্ত ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়াছেন, এবং কুলে শীলে রূপে গুণে ও নবীন যৌবনে ইনি তোমার তুল্য বর, ইহাঁকে বরণ কর, রতনে কাঞ্চনে মিলন হউক্। অজের গলদেশে বরমাল্য শোভা পাইল।

কেবলি রূপের তরঙ্গ। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূল প্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য—রূপযৌবনসমাচ্ছন্ন এবং রমণীয়।

রাজা দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছেন, তখন কোথায় অশ্বের হ্রেষারবে, হস্তীর বৃংহিতধ্বনিতে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত হইবে, না—কালিদাস, স্ত্রী এবং বসন্ত এবং ললিত আদিরসে মৃগয়াকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছেন। বসন্তকাল, গাছে গাছে নূতন পাতা, ডালে ডালে কোকিলকূজন, ফুলে ফুলে ভ্রমরগুঞ্জন, মৃদু মলয়ানিল, এবং মদনশরজর্জ্জর বিলাসবিভ্রম, পতির সহিত অঙ্গনাগণের বকুলমদ্যপান, ঢলাঢলি গলাগলি। রূপসী নহিলে

মৃগয়া হয় না—অধরসুধার উত্তেজনা, নূপুরনিক্বণের উদ্দীপনা এবং মদনশরের পরিচালনা ইহার প্রধান অঙ্গ।

রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনা হইতে কালিদাসের মৃগয়াচিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। রামায়ণে এসকল ললিত বর্ণনা কোথাও নাই। দশরথ যখন মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন, তখন তিনি যুবরাজ এবং অবিবাহিত। অযোধ্যাকাণ্ডে কৌশল্যার নিকট দশরথ এই মৃগয়াবৃত্তান্ত বলিতেছেন—

"দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য ভূমির রস আকর্ষণপূর্ব্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতপ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে, তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দুর হইয়া গেল; স্নিগ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল। ভেক চাতক ও ময়ূরগণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখাসকল বৃষ্টির পতনবেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল। বিহঙ্গেরা বর্ষাজলে স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় গিয়া আশ্রয় লইল। মত্ত ময়ূরশোভিত পর্ব্বত নিরন্তর-নিপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে জলরাশির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইল। জলস্রোত স্বভাবতঃ নির্ম্মল হইলেও গৈরিকাদি ধাতুসংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায় রক্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভস্মমিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবি! এই সুখময় কালে মৃগয়াবিহারে আমার ইচ্ছা হইল। তখন আমি রাত্রিযোগে নিপানে জলপানার্থে আগত মহিষ হস্তী বা যে কোন জন্তু হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শর শরাসন গ্রহণ ও রথারোহণপূর্ব্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক্ আবৃত হইলে, ঐ অদৃশ্য সরযূর জলমধ্যে করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার হস্তী বোধ হইল। তখন আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর তূণীর হইতে গ্রহণপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম।"*

রামায়ণের এই মৃগয়াবর্ণনার পার্শ্বে কালিদাসের মৃগয়া সৌখীন বিলাস মাত্র। কালিদাস মৃগয়াবলম্বনে কেবল কতকগুলি সুন্দর চিত্র ফুটাইতে চাহেন বৈ ত নয়। রামায়ণের এই বর্ষাবর্ণনায় বাল্মীকি সেই অন্ধকার কালরাত্রির ভয়ঙ্করী ঘটনার পূর্ব্বসূচনা করিয়াছেন। বাল্মীকির চিত্রে একটি গম্ভীর ভীষণতা ব্যক্ত হয়। কালিদাসের চিত্র উজ্জ্বল এবং মধুর।

ভবভূতি হইলে মুনিপুত্রবধ লইয়া এইখানে অনেক করুণরস উদ্রেক করিতেন। বাল্মীকির পদানুসরণ করিয়া তিনি ঘন বর্ষার একটি গম্ভীর দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিতেন এবং

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে ধনুর্ব্বাণহস্ত দশরথের চিত্র ফুটাইয়া তুলিতেন। এবং বাণবিদ্ধ ঋষিবালকের করুণ বিলাপে শ্রোতৃবর্গের হৃদয় আর্দ্র হইয়া আসিত।

কালিদাস করুণরসে এমন পটু নহেন। দশরথের মৃগয়ায় মুনিপুত্রবধ ব্যাপারকে তিনি বড় প্রাধান্যই দেন নাই। যেখানে বা তাঁহার করুণরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে, সেখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য চিত্রবিন্যস্ত। শোকের মধ্যেও তিনি রূপ এবং যৌবন, বিলাস এবং বিভ্রম চিত্রিত করেন, এবং এই রূপযৌবনবিভ্রমবিলাসের স্মৃতিতে তাঁহার দীর্ঘ বিলাপ রচিত হয়। প্রেয়সীর মৃতদেহ কোলে করিয়া অজ যেখানে বিলাপ করিতেছেন—ইন্দুমতীর চারু বিলাসগমন; নূপুরনিক্কণসহিত অশোক তরুতে মৃদু পাদতাড়ন; কোথাও অসমাপ্ত মালাগাঁথার কাহিনী; ললিত কলাবিদ্যায় তাঁহার নিপুণতার কথা; কোথাও বা রূপসীর রূপের অতি মৃদু আভাস; কোথাও একটি সুন্দর উপমা—এমন করিয়া বলা যে, শুনিলেই মনে একটি চিত্র ফুটিয়া উঠে; শ্লোকের পর শ্লোক কেবলি চিত্রবিন্যাস।

সমস্ত রঘুবংশটিই এইরূপ চিত্রপরম্পরা। হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্রসৌন্দর্য্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক অভিব্যক্ত। এবং ঘটনা যৎসামান্য অবলম্বনে বর্ণনা বিচিত্র। রাম যখন সীতাকে লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন, ঘটনা কিছুই নাই—কেবল আকাশপথে একখানি রথ চলিয়াছে এবং সেই রথে বসিয়া অযোধ্যার রাজদম্পতি। কিন্তু পথ দীর্ঘ এবং সমুদ্র নদনদী পাহাড় পর্ব্বতে দৃশ্য বিচিত্র। সুতরাং চিত্ররচনার এই অবসর। প্রথমেই সমুদ্রবর্ণনা—কতকগুলি চিত্র—কোথাও সেতুবন্ধে ফেনিল অম্বুরাশি আছাড়িয়া পড়িতেছে, কোথাও আকাশে সাগরে মিশাইয়া গিয়া এক অনন্ত বিস্তার, কোথাও তমালতালীবনরাজিনীলা দূর বেলাভূমি, কোথাও বা গুটিকতক পৌরাণিক স্মৃতি—বিস্মৃত সগরকাহিনী, পুরাতন মন্থনকথা,—এবং ইহারই মধ্যে যেখানে অবসর ঘটিয়াছে, সুবিধামত একটু আধটু অধরপানের প্রসঙ্গ। ক্রমে বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া রথ জনস্থানের উপর দিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে দেখাইতেছেন;—এই সেই স্থান, তোমাকে অন্বেষণ করিতে করিতে যেখানে আসিয়া তোমার চরণারবিন্দবিশ্লেষদুঃখে বদ্ধমৌন একটি নূপুর কুড়াইয়া পাই; এই পর্ব্বতশৃঙ্গে একদিন—মনে পড়ে কি?—গুরু গুরু মেঘগর্জ্জনে পতির গাঢ় আলিঙ্গনমধ্যে মুদ্রিতনয়নে আপনাকে লুকাইয়াছিলে; আর ঐ অম্বরলেখি গিরিশৃঙ্গে একদিন বর্ষা ঘনাইয়া আসিয়াছিল, কেকাধ্বনিতে কদম্বসৌরভে চারি দিক্ সমাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তোমার বিরহে সে দিন আমার জীবন অসহ্য বোধ হইয়াছিল; এই পম্পাসরোবরে—অহো!—তুমি তখন নিকটে ছিলে না, আমি নির্নিমেষনেত্রে শুধু ঐ চক্রবাকমিথুনের নীরব প্রেমালাপ দেখিতাম; সাশ্রুনয়নে এই স্থানে একদিন স্তবকাভিনম্র অশোকলতাকে দেখিয়া পীনপয়োধরা জনকতনয়া ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হই—

ভাগ্যে লক্ষ্মণ ছিল, সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিল; দূরে ঐ পঞ্চাপ্সরবিহারবারি—সমাধিভীত ইন্দ্র একজন তপস্বীকে এইখানে অপ্সরাগণের যৌবনকূটবন্ধে আবদ্ধ করেন; আর এই সেই সুতীক্ষ্ণাশ্রম—সুতীক্ষ্ণের নিকট সুরাঙ্গনাদিগের বিভ্রমচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল, সহাসপ্রেক্ষিতদৃষ্টি এবং ব্যাজার্দ্ধসংদর্শিতমেখলা উভয়ই সফল হয় নাই; ঐ সরযু দেখা যায়—তরঙ্গহস্তদ্বারা আমাকে আলিঙ্গন জানাইতেছে। রথ আসিয়া থামিল। রামচন্দ্র রথ হইতে অবতরণ করিলেন।

এত দিনে অযোধ্যার শ্রী ফিরিল। প্রাসাদসকল হইতে কালাগুরুধূম নির্গত হইতেছে—যেন রামচন্দ্র প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বহস্তে পুরীর বেণী মোচন করিয়া দিয়াছেন। রাম একদিন প্রাসাদশিখরে উঠিয়া অযোধ্যাপুরীর দিকে চাহিয়া দেখিলেন—বিলাসী বিলাসিনীরা প্রমোদ-উদ্যানে বিহার করিতেছে এবং সরযু পণ্যবাহিনী তরণী-পরিপূর্ণা।

অগ্নিবর্ণের রাজত্বকালে এই বিলাস পূর্ণমাত্রায় উন্মুক্ত। রাজা বিলাসিনীপরিবৃত হইয়া অষ্টপ্রহর অন্তঃপুরেই থাকেন; প্রজারা তাঁহার দর্শন পায় না; রাজকার্য্য মন্ত্রিবর্গ সুসম্পন্ন করেন। অন্তঃপুরে নিত্য মন্মথোৎসব। রাজা কামিনীগণের সহিত জলবিহার করেন—জলে বিলাসিনীদিগের নয়নাঞ্জন ও অধরের কৃত্রিম রাগ ধুইয়া যায় এবং স্বাভাবিক মুখরাগ অগ্নিবর্ণকে অধিকতর প্রলোভিত করে। বিলাসিনীদিগের সহিত মনোরম পানভূমিতে বসিয়া তিনি বকুলের সুরা পান করিতে থাকেন এবং প্রমদাগণপ্রদত্ত মুখাসবপানে একান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন। রাজার এক অঙ্কে বীণা, অপর অঙ্কে অঙ্গনা, এবং সম্মুখে অবিশ্রাম নর্ত্তকীর লাস্যলীলা। প্রমদা হইতে প্রমদান্তরে, বিলাস হইতে বিলাসান্তরে অগ্নিবর্ণ নিত্য রমণ করেন। বিপুল অন্তঃপুরেও কুলাইয়া উঠে না। লতাকুঞ্জে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া পরিজনাঙ্গনাগণের সহিত প্রমোদালাপে কালক্ষেপ করিতে যান। বাদ্‌শাহী বিলাসিতাও এখানে হার মানে। এবং এই উৎকট উন্মাদনা রাজযক্ষ্মাকারে ব্যক্ত হইয়া অল্পদিনমধ্যেই অগ্নিবর্ণকে ঐহিক প্রমোদের বন্ধন হইতে ছিন্ন করিয়া লয়।

এইখানেই রঘুবংশের উপসংহার—এই বাদ্‌শাহী বিলাসের এক-সর্গ চিত্রপরম্পরায়। সুতরাং রঘুবংশ সম্বন্ধে আমাদের আর জানিবার বড় কিছু রহিল না। এবং এই উনবিংশ সর্গের মহাকাব্য হইতেই বোধ করি কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাইলাম।

কিন্তু ইহাই চরম নহে। কালিদাসের অন্য কাব্য আলোচনা করিলেও তাঁহার এই বিশেষত্ব দৃষ্টিগোচর হয়। মেঘদূতের মত অমন সামান্য অবলম্বনের উপর নির্ভর করিয়া কেবল কাল্পনিক কথা লইয়া এমন একখানা সমগ্র কাব্য কালিদাসের পূর্ব্বে সংস্কৃত সাহিত্যে

দেখা যায় না। কিন্তু কালিদাসের চিত্রপ্রিয় কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকিবার জন্য আপন মনের মত বিষয়টি বাছিয়া লইয়াছে। যক্ষের বিরহবর্ণনা উপলক্ষ্য মাত্র।

মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল এই চিত্রপরম্পরায়। কুবেরানুচরের দীর্ঘ পথ, বর্ষা বিরহ এবং অভিসারের মায়ারচনা। প্রতি বিরহিণীর দুঃখবর্ণনায় যক্ষ আপন প্রেয়সীর বিরহবিধুর মূর্ত্তি আঁকিয়া বাঁচে, প্রবাসীর কথায় মেঘের নিকট আপন হৃদয় খুলিয়া দেখায়। অলকার প্রমোদবিলাস বর্ণনা করে—প্রতিযোগিতায় তাহার বিরহ যেন সমধিক ফুটিয়া উঠে। কিন্তু কেবলি চিত্র—ছবির পর ছবি।

এইরূপ চিত্র আঁকিতেই কালিদাস কিছু ভালবাসেন। বজ্র-বিদ্যুতের মধ্যে সূচিভেদ্য অন্ধকারে লঘুগতি অভিসারিকা; মুক্ত বাতায়নে বসিয়া একবেণী বিরহিণী—উৎসঙ্গে বীণা পড়িয়া রহিয়াছে, মুখের গান মুখেই রহিয়া গিয়াছে, এবং চারি দিক্ হইতে শুধু মেঘমন্দ্রস্বরে শ্রাবণ ঘনাইয়া আসিতেছে; প্রবাসী রামগিরিশিখরে দাঁড়াইয়া মেঘের পানে চাহিয়া—মেঘ যদি দৌত্য-কার্য্য করে!

কুমারসম্ভবও কতকগুলি ছবি। প্রথমে হিমালয়ে বালিকা গৌরী। দ্বিতীয়তঃ শিবের তপোবনে যুবতী গৌরী। তৃতীয়তঃ গৌরীর তপোবনে বৃদ্ধ শিব। চতুর্থতঃ শিবের বিবাহ।

রতিবিলাপেও করুণরসে কালিদাসের হৃদয়াবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই—তাহা নৈপুণ্যপরিপূর্ণ, কেবল মাঝে মাঝে এক একটি চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথমেই কালিদাস রতিকে এক কথায় আঁকিয়া তুলিলেন—রতি বসুধালিঙ্গনধূসরস্তনী। রতির আর বাঁচিবার সাধ নাই—স্বামীর অনুগমন ভিন্ন তাহার জ্বালা জুড়াইবে না। সেই রতি বিলাপ করিতেছেন,

রজনীতিমিরাবগুণ্ঠিতে
পুরমার্গে ঘনশব্দবিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয় কামিনাং প্রিয়াঃ
ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ॥
নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্
বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ
প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥ ইত্যাদি।

পরে পরে কতকগুলি ছবি—ঘন-অন্ধকার রাজপথে ঘনগর্জ্জনভীতা একাকিনী অভিসারিকা, বারুণীমদ্যপানে অরুণনয়না স্খলিতবচনা প্রমদাজন, তাহার পর জ্যোৎস্না কোকিল মলয়

লইয়া বসন্ত; কিন্তু মদনাভাবে এই সকলই নিষ্ফল—অতএব, হে মদন, তুমি ফিরিয়া আসিয়া ইহাদের গতি কর।

এ পর্য্যন্ত কালিদাসের প্রতিভার যে বিশেষত্ব দেখা গেল, শকুন্তলায় ইহার পূর্ণ বিকাশ। বহিঃপ্রকৃতিতে চিত্রকরের মানসী প্রতিমা এইখানে যেন সম্পূর্ণরূপে আপনাকে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছে। সেই জন্য চিত্রগুলি এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ।

প্রথমেই রথযাত্রা। রাজা দুষ্মন্ত রথারোহণে দ্রুতগামী কৃষ্ণসারের অনুসরণ করিয়াছেন, মৃগ প্রাণভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছে এবং মনোহর গ্রীবাভঙ্গসহকারে মুহুর্মুহু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিতেছে। রথের গতিবেগ এত দ্রুত যে,

যদালোকে সূক্ষ্মং ব্রজতি সহসা তদ্বিপুলতাং
যদন্তর্বিচ্ছিন্নং ভবতি কৃতসন্ধানমিব তৎ।
প্রকৃত্যা যদ্‌বক্রং তদপি সমরেখং নয়নয়ো-
র্ন মে পার্শ্বে কিঞ্চিৎ ক্ষণমপি ন দূরে রথজবাৎ॥

ইহা নাট্যকলার বিরোধী। কারণ, অতিদ্রুত রথযাত্রা এবং তদবস্থায় রাজা ও সারথির কথোপকথন দৃশ্যকাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে। কিন্তু কেমন ছবি!

তাহার পর তপোবনবর্ণনা। ক্রমে, আলবালে ঋষিকন্যাদের জলসেচন এবং রাজাকর্ত্তৃক গোপনে তাহাদের কথাবার্ত্তা শ্রবণ; শকুন্তলার নিবিষ্টচিত্তে রাজার ধ্যান ও দুর্ব্বাসার অভিশাপ; শকুন্তলার বিদায়; রাজসভার দৃশ্য; অঙ্গুরীয়কপ্রাপ্ত রাজার উৎকণ্ঠা ও দূরে মহিষীর গান; সিংহশিশুর সহিত বালকের খেলা ও শিশুচিত্র।

এইগুলি একখানি ছবি নহে—ইহারই এক একখানি অনেকগুলি ছবির সমষ্টি। শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত যেন তুলি দিয়া আঁকা যায়। চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা ভঙ্গীতে আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যে এবং বিবিধ ভাব ও ভঙ্গীতে যত রকমে সম্ভব শকুন্তলার সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। কোথাও বা কুরবকশাখায় বল্কল বদ্ধ হইয়া যায়, কোথাও বা প্রিয়সখী বল্কলের দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, কোথাও অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুন্দরীর নব কিসলয়বৎ রূপলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে; সৌন্দর্য্যের কবি সৌন্দর্য্য ফুটাইতে ব্যাকুল—একটি বাহুভঙ্গী, একটি হৃদ্‌স্পন্দন, পাণ্ডু মুখকমলে অতি ক্ষীণ মৃদু অরুণিমাসঞ্চার এবং স্নিগ্ধ দৃষ্টির নিবিড় চাঞ্চল্যটুকু পর্য্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না। যেখানে অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করিয়াছেন—যেমন "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া শকুন্তলাকে লইয়া যাওয়া—সেখানেও কেবল একটি সুন্দর চিত্র ব্যক্ত হইয়াছে।

শকুন্তলা যদিও নাটক এবং উহার মধ্যে প্রকৃতিতত্ত্ব সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ তত্ত্ব থাকিতে পারে, তথাপি শকুন্তলা আমাদের মনে প্রধানতঃ কতকগুলি চিত্রশ্রেণী টাঙ্গাইয়া দিয়া যায়। আমরা যে শকুন্তলার ঘটনাপ্রবাহে ভাসিয়া যাই তাহা নহে, বরঞ্চ উহার স্থির মুহূর্ত্তগুলিই আমাদিগকে আকর্ষণ করিয়া রাখে—নাটকটি অগ্রসর হইতে হইতে যে যে স্থানে ছবি-আকারে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সেই স্থানই আমাদের চোখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠে।

যেমন, বিদায়দৃশ্য। শকুন্তলা অগ্রসর হইতে যান, পশ্চাৎ হইতে কে যেন টানিয়া রাখে; ফিরিয়া দেখেন, তাঁহারই স্নেহপালিত মৃগশিশু অঞ্চল ধরিয়া টানিতেছে। প্রত্যেক তরু এবং লতা শকুন্তলার সুখদুঃখের সঙ্গী—বার বার তাহাদের কাছে দাঁড়াইয়া, তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়া, আলিঙ্গন করিয়া শকুন্তলা তপোবনের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

রাজসভামধ্যে দুষ্মন্ত যখন প্রত্যাখ্যান করিলেন, তখনও ঘটনা অধিক নয় এবং শকুন্তলা কথাও বড় বলেন নাই, কেবল সেই সভামধ্যে দুষ্মন্তকে 'পৌরব' সম্ভাষণ করিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখনই দুষ্মন্ত, রাজসভা, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত এবং এই দুই তপস্বীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মানা তেজস্বিনী তপোবনবালিকার একখানি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিল।

কেবলমাত্র "অয়মহং ভোঃ" এইটুকুতে শকুন্তলার বিরহ চিত্রিত হইয়াছে। দুর্ব্বাসা এই বলিয়া আশ্রমের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন—কিন্তু তবু শকুন্তলা মাথা তুলিলেন না, তাঁহার মুখে কথা নাই।

এইরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালিদাসের স্ফূর্ত্তি ধরে না। সুখে দুঃখে বেদনা বিলাসে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যেন কিছু সস্নেহ সহৃদয়তা দেখা যায় এবং স্ত্রীসঙ্গে তিনি একটু বিশেষ আনন্দ লাভ করেন।

নারী এবং প্রকৃতিসৌন্দর্য্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোন কবিতে দেখা যায় না। যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষিবালিকার সমাবেশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সেই দুই অনুরাগের একত্র মিলন হইয়াছে। নগরবাসী রাজা, তপোবনের পালিত মৃগসেবিত তরুকুঞ্জের মধ্যে একটি ঋষিকুমারীর—একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যে একটি নাট্যব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যেন কবির নিজের কামনাস্বপ্ন। আত্মপ্রকৃতির সমগ্র অনুরাগ সেচন করিতে পারেন, কালিদাস এমন একটি বিষয় সৃজন করিয়া লইয়াছেন, এই জন্য সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা এমন একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু কেবল চিত্ররচনা নহে, খণ্ড খণ্ড চিত্ররচনাতেই কালিদাসের প্রতিভার বিশেষ পটুত্ব। পাঠকেরা তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। পথের বর্ণনা করিতে কালিদাস বড়

ভালবাসেন। তাহার কারণ, পথের দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড চিত্র পরে পরে চক্ষের সমক্ষে উপনীত হয়; একটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পরেই আর একটার প্রতি চক্ষু পড়ে। একটা সমগ্র সম্পূর্ণ বৃহৎ চিত্র রচনা করিতে হয় না। সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষ্বাকুবংশের একটি দীর্ঘ প্রাচীন রাজপথ। কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলীপের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এই ভাবের: দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভাতেও কবির প্রতিভা দুই পার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। রামের রথযাত্রাতেও কবিপ্রতিভার সেই গতি-লীলা প্রকাশ পায়। অগ্নিবর্ণের বিলাসসম্ভোগও সেইরূপ; প্রমোদ হইতে প্রমোদান্তরে অপরিতৃপ্ত চপল হৃদয়ের ভ্রমণচাঞ্চল্য। মেঘদূত কাব্য মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুই পার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ঠিক পথবর্ণনা নহে বটে—কিন্তু ইহাও চলিতে চলিতে বর্ণনা। বিক্রমোর্ব্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে অরণ্যে বিলাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনও পাখী, কখনও মেঘ, কখনও লতা, কখনও পর্ব্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস।

এইরূপ খণ্ড খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কবির বিশেষ দৃষ্টি থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না। সমুদ্র পর্ব্বতের ন্যায় প্রকৃতির বিরাট্ দৃশ্যে কবি যদি এক মুহূর্ত্তে দৃশ্যের সমস্ত বৃহত্ত্ব চক্ষের সমক্ষে খাড়া করিয়া না তুলিতে পারেন, তবে যে চিত্রই ব্যর্থ হয়। কারণ, বিরাট্ত্বই তাহার প্রধান ভাব; তাহার খণ্ড খণ্ড আংশিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে প্রাধান্য দিলে তাহার প্রকৃত ভাবটাকেই খর্ব্ব করা হয়। পর্ব্বতে যে চমরী লাফাইতেছে বা ওষধি জ্বলিতেছে বা গজমুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে, তাহা চিত্রিতব্য বিষয় নহে—কারণ, বৃহৎ হিমালয়ের মধ্যে তাহারা কে কোথায় বিলীন হইয়া থাকে, তাহা চিত্রকরের দৃষ্টিগোচর হওয়াই উচিত নহে। কিন্তু কালিদাস নিপুণ চিত্রকর হইয়াও তাঁহার অতিনৈপুণ্যবশতই হিমালয় ও সমুদ্র বর্ণনায় অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। তিনি প্রত্যেক অংশের স্বতন্ত্র বর্ণনার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন না। ভবভূতি যেখানে একটিমাত্র মেঘমন্দ্র সমাসে বিন্ধ্যপর্ব্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেন না। ['সাধনা,' ভাদ্র-আশ্বিন ১২৯৯]

উত্তরচরিত

উত্তররামচরিত কালিদাসের কাব্যের মত কেবলি মধুর ও সুন্দর চিত্রপরম্পরার সমাবেশ নহে; সেখানে মেঘমন্দ্র সমাসে যেমন প্রকৃতির নিবিড় নিশ্চল গাম্ভীর্য্য মুদ্রিত হইয়া উঠে, তীব্র করুণ আবেগে সেইরূপ মানবহৃদয়ের সমস্ত গভীর সুখ দুঃখ, বেদনা আনন্দ প্রগাঢ় হইয়া আসে; এবং এই নির্ঝরঝাঙ্কৃত উত্তাল তরঙ্গকল্লোলিত প্রচণ্ড প্রকৃতি মানবের মেঘমেদুর অন্তরে ঘনীভূত হইয়া চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। কালিদাসের চিত্রশালা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ভবভূতির কাব্যজগৎ যেন এক সম্পূর্ণ নূতন দেশ—এখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য সুবিন্যস্ত এবং মানবহৃদয় বহিঃপ্রকৃতির সহিত নানা অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হইয়া আপনাকে নানা ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু কালিদাসের চিত্রশালায় মন যেরূপ ভ্রমরবৎ চিত্র হইতে চিত্রান্তরে, সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যান্তরে, উপমা হইতে উপমান্তরে নীত হয় এবং নানা ফুল হইতে কেবল মধুর সৌন্দর্য্যটুকু সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে, ভবভূতির দৃশ্যকাব্যে মনে সেরূপ হিল্লোল সঞ্চারিত হয় না—চক্ষের সম্মুখে ঘননিবিড় অরণ্যানীর নীরন্ধ্রনিচুলনীলিম একটি গম্ভীর দৃশ্যপট উদ্‌ঘাটিত হয় এবং দূর দিগন্তপটে মুদ্রিত মেঘমালাবৎ নীল শৈলশ্রেণী, গদ্‌গদভাষিণী নদী গোদাবরী, নিরন্তরধ্বনিত নিবিড় নির্জ্জনতা, সমস্ত মিলিয়া সেই নিবিড়তা আরও নিবিড়তর করিয়া তুলে; একটি সমগ্র সংহত দৃশ্যগাম্ভীর্য্যে মন অভিভূত হইয়া পড়ে। কালিদাস যেখানে ফুলটি, মালাটি, মদরাগ ও চুম্বনবিলাস এবং তদানুষঙ্গিক সুন্দর জ্যোৎস্না, মধুর মলয় ও উদ্ভিন্নযৌবনা প্রকৃতি দিয়া খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়া দেন, ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে যেন মন্থন করিয়া তুলেন; সেই জন্য প্রিয়জন তাঁহার নিকট এমন কি-জানি-কি এবং প্রিয়স্পর্শে তিনি একেবারে আকুল হইয়া উঠেন—নিশ্চয় করিতে পারেন না—সুখ না দুঃখ, প্রবোধ না নিদ্রা, শরীরে বিষসঞ্চার হইয়াছে অথবা মদিরা পান করিয়াছেন, চৈতন্য লুপ্ত কি উন্মীলিত।

সর্ব্বাঙ্গ দিয়া এবং সকল হৃদয় দিয়া ভবভূতি প্রিয়জনকে অন্তরের অন্তরদেশে যতই চাপিয়া ধরেন, সে কি-জানি-কিকে সম্যক্ অনুভব করিয়া উঠা যায় না; অঙ্গ অবশ হইয়া আসে, চিত্ত বিহ্বল হইয়া পড়ে, ভবভূতি আত্মহারা হইয়া যান, কিন্তু প্রিয়জন ততই কি-জানি-কি। উত্তরচরিত নাটকের সপ্ত অঙ্কের মধ্য দিয়া বরাবর এই একটি করুণ বেদনা সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে। নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন কোন্ প্রিয়াকুল করুণ

হৃদয় আপন গোপন মর্ম্মস্থলে প্রিয়জনকে বিদ্ধ করিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া আপনাকে তাহাতে ক্ষীণ করিতেছে এবং সেই নিবিড় মর্ম্মনিপীড়িত বেদনা কোথাও দেহ অবলম্বনে, কোথাও হৃদয় অবলম্বনে, কোথাও চিত্র অবলম্বনে, কোথাও বা ছায়া অবলম্বনে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

উত্তরচরিতে তবে সুখ কি নাই? কেবলি একটি ধারাবাহিক করুণ ব্যাকুলতা? কেবলি হা হতোস্মি, হা রাম, হা সীতে, কিম্বা কোথা প্রিয়ে, প্রাণনাথ, এবং অন্তর্বাষ্পাবস্থা ও সাশ্রু নয়ন? লক্ষ্মণ যখন পিতৃবিচ্ছেদে দুর্ম্মনায়মানা সীতাদেবীকে তাঁহাদের পূর্ব্ববৃত্তান্তের চিত্রগুলি দেখাইতেছেন, তখন কি সকলের মনে সুখসঞ্চার হয় নাই? নিদ্রালসে শিথিলাঙ্গী আলিঙ্গনবদ্ধা সীতার স্পর্শে রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গে যে পুলক সঞ্চার হইয়াছিল, সে কি সুখ নহে? দীর্ঘ বিরহনিশাবসানে সীতার সহিত রামের যখন মিলন সম্পাদিত হইল, তখন কি সুখের সীমা ছিল?—কিন্তু ভবভূতির কাব্যে সুখও যেন অত্যন্ত প্রগাঢ় হইয়া অনেকটা দুঃখেরই মত হইয়া আসে। হয়, তাহার সহিত কতকগুলি দুঃখকাহিনী বিজড়িত, নয়, তাহার মধ্যে একটা অনির্দ্দেশ্য বিবশ ব্যাকুলতা—সুখ কি দুঃখ নির্ণয় করিয়া উঠা কঠিন; যদি বা মিলন হয়, মিলনের মাঝখানে যেন শতবর্ষের বিরহ জাগিয়া থাকে এবং মিলনান্ত উপসংহারেও পুরাতন বিরহ পরিতৃপ্ত হয় না। কালিদাসের কাব্যে যেমন দুঃখও বিলাস-অলসিত মোহন মধুরবেশে কতকগুলি সুন্দর চিত্রবদ্ধ হইয়া মোহ উদ্রেক করিয়া দেয়, ভবভূতির কাব্যে সুখ সেইরূপ মর্ম্মস্থলে বেদনাবিদ্ধ হইয়া অত্যন্ত করুণ ও নিবিড় হইয়া উঠে।

নাট্যারম্ভের অল্পক্ষণমধ্যেই সীতার বিনোদনজন্য চিত্রিত কতকগুলি আলেখ্য লইয়া লক্ষ্মণ যখন প্রবেশ করিলেন, রামচন্দ্র ও সীতাদেবী অষ্টাবক্রকে সবে মাত্র বিদায় দিয়া নিভৃতে বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণের আগমনে প্রথম সেই নীরবতা ভঙ্গ হইল। রামচন্দ্র আলেখ্যের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, ইহাতে কি অবধি চিত্রিত হইয়াছে? লক্ষ্মণ বলিলেন, আর্য্যা বধূঠাকুরাণীর অগ্নিশুদ্ধি পর্য্যন্ত। প্রিয়াগতপ্রাণ রামচন্দ্রের নেত্রপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল, তিনি দুঃখ করিতে লাগিলেন যে, হায়, জন্মপরিশুদ্ধাকেও আবার অগ্নিতে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইল! সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, প্রিয়ে, তোমার প্রতি যে রুক্ষ আচরণ করিয়াছি, তাহা সর্ব্বথা তোমার অযোগ্য, অপরাধ মার্জ্জনা কর। সীতা তাড়াতাড়ি কথাটা চাপা দিবার জন্য আলেখ্যের প্রতি রামের মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন।

সে বহুদিনের কথা; প্রথম যখন আর্য্যপুত্র, ঋষি বিশ্বামিত্র সমভিব্যাহারে মিথিলায় শুভাগমন করেন—উদ্ভিদ্যমান নবনীলোৎপলশ্যাম স্নিগ্ধ মসৃণ চারুদেহ, সৌম্য সুন্দর মুখশ্রী, কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভঙ্গ করিতেছেন—পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাত জনক, বিস্মিত দৃষ্টি

বালকের মুখমণ্ডলে নিবদ্ধ করিয়া নিশ্চল। সেই শুভ বিবাহ-রজনী—মঙ্গলাচার, হুলুধ্বনি, রাজন্যবর্গ ও ঋষিগণপরিবৃত সভামণ্ডপ—চারি ভ্রাতার চারি বধূ—তাত দশরথ বধূসমাগমে পরিপূর্ণহৃদয়। জানকীকে দেখিয়া মাতৃগণের কি আনন্দই হইয়াছিল। বালিকার অনতিনিবিড় সূক্ষ্ম দন্তপংক্তি, উভয় গণ্ডদেশে চারু অলকাবলী আসিয়া পড়িয়াছে, চন্দ্রকরনির্ম্মল মনোহর মুখশ্রী, বিভ্রমবিলাসহীন সরল অঙ্গযষ্টি। তখন জীবন অতি লঘু—তাত জীবিত—ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, দিনগুলি নিশ্চিন্তমনে কাটিয়া যাইত। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

লক্ষ্মণ একটির পর একটি চিত্র উল্টাইয়া যাইতেছেন, এবং পুরাতন বিস্মৃতপ্রায় দিনগুলি সকলের চক্ষের সমক্ষে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতেছে। সীতা রামকে বলিতেছেন, কখনও বা রাম সীতাকে বলিতেছেন, সেই দিন স্মরণ হয় কি?—এই সেই কালিন্দীতটস্থ শ্যামবট—হে প্রিয়ে, এখানে একদিন পথশ্রমে ক্লান্তদেহ তুমি আমার বক্ষের মধ্যে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া সুখে নিদ্রা গিয়াছিলে। ঐ যে সেই বিন্ধ্যাটবীর প্রবেশদ্বার—আর্য্যপুত্র হস্তস্থিত তালবৃন্তের দ্বারা এইখানে একদিন আমার আতপ নিবারণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণ দেখাইয়া দিলেন, দূরে ঐ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষসমূহে নিরন্তরস্নিগ্ধনীল-পরিসর গোদাবরীমুখরিত অরণ্যপ্রদেশ দেখা যায়, বনভূমির মধ্য হইতে মেঘমেদুরিতনীলিমা প্রস্রবণগিরি উঠিয়াছে। রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই পর্ব্বতের পর্য্যন্তভাগে গোদাবরীশিশিরকণাসম্পৃক্ত বায়ুসেবনে আমাদের বিজন স্বচ্ছন্দসঞ্চরণ মনে পড়ে কি? কপোলে কপোল সংসক্ত এবং পরস্পরকে প্রগাঢ় বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া সুখপর্ণশয্যায় অবিরত মৃদু গল্পগুঞ্জনে অজ্ঞাতসারে নিশাতিবাহন মনে পড়ে কি? লক্ষ্মণ আর একটি চিত্র উদ্‌ঘাটন করিলেন—রামচন্দ্রের সেই প্রথম বিরহ। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাঁহার চোখ ফুলিয়াছে এবং অধর ও নাসাপুট রুদ্ধ আবেগে ঈষৎ স্ফুরিত। রামচন্দ্র বলিলেন, বৎস, বৈরপ্রতিমোচনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তৎকালে কোনরূপে এ দারুণ বিরহও সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দুঃখাগ্নি পুনঃপ্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া হৃন্মর্ম্মব্রণের ন্যায় অন্তরে অত্যন্ত দুঃসহ বেদনা দিতেছে। এইরূপ বহুতর চিত্রের মধ্য দিয়া গিয়া সেই প্রসন্নগম্ভীর বনরাজি এবং চিরাকাঙ্ক্ষিত পবিত্রসৌম্যশিশিরাবগাহা ভাগীরথী—যাহা দেখিয়া সীতার মন তপোবনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল এবং রামচন্দ্র অচিরেই তাঁহার দোহদাভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

সকল চিত্রগুলি আমরা অবশ্য এখানে উল্লেখ করিলাম না। উর্ম্মিলার চিত্র লইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সীতার মৃদু পরিহাস "বচ্ছ ইঅং বি অবরা কা," শূর্পণখাকে দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীজনোচিত ভীতিভাব, মন্থরার চিত্র হইতে অবিচলিত অবলীলাক্রমে রামের চিত্রান্তরে গমন, এই সকলের মধ্যে কাব্যকলা যথেষ্ট আছে। এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার

বনবাস প্রথম পরিচ্ছেদের কল্যাণে বঙ্গীয় পাঠকসমাজে তাহা অপ্রকাশও নাই। আমরা যে চিত্রগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি, সেইগুলি হইতে কালিদাসের বর্ণনার সহিত ভবভূতির বর্ণনা তুলনা করিয়া দেখিবার কতকটা সহায়তা হইতে পারে বোধ হয়।

কালিদাসও এই পথ দিয়া দু' এক বার যাত্রা করিয়াছেন। এবং ভবভূতি যে তরুসমাচ্ছন্ন গোদাবরীপ্রদেশ, হংসকারণ্ডবাদিবিচরিত কমলশোভিত রমণীয় পম্পাসরোবর ও ককুভসুরভিত নীল স্নিগ্ধ নূতন তোয়বাহবেষ্টিত মাল্যবান্ শৃঙ্গের বর্ণনা করিয়াছেন, কালিদাসের লেখনী তাহার একটিকেও পরিত্যাগ করে নাই এবং এই সকল প্রাকৃতিক দৃশ্য তাঁহারও মনে পত্নীগতপ্রাণ রামচন্দ্রের বিরহ উদ্রেক করিয়া দিয়াছে।) রামচন্দ্র সীতাকে বলিতেছেন, এইখানে বেতসকুঞ্জে গোদাবরীতরঙ্গশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার উৎসঙ্গে মস্তক রাখিয়া কত নিশি যাপন করিয়াছি; এই মাল্যবান্ গিরি—নূতন মেঘবারির সহিত এইখানে আমারও বিরহজনিত নেত্রজল পতিত হইয়াছিল; নবোদকসিক্ত পল্বলগন্ধ, অর্দ্ধোদগতকেশর কদম্বপুষ্প, শিখিকুলের কেকাধ্বনি তোমার বিরহে অসহ্য বোধ হইয়াছিল; মেঘগর্জ্জনে ভীত হইয়া তুমি যে গাঢ়ভাবে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে, তাহারই স্মৃতি লইয়া গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত ঘনগর্জ্জন অতি কষ্টে সহ্য করিতাম; ঐ পম্পাসর—অয়ি প্রিয়ে, ঐখানে চক্রবাকমিথুন ক্ষণমাত্র বিযুক্ত না হইয়া পরস্পরের মুখে পদ্মের কেশর প্রদান করিত, তাহা দেখিয়া বহু কষ্টে আমি তোমার বিরহ যাপন করিতাম; পম্পাতটে ঐ স্তনাভিরামস্তবকাভিনম্রা তন্বী অশোকলতাকে দেখিয়া তোমা ভ্রমে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলাম। ইহার পর যেখানে ঋষ্যাশ্রম আসিয়াছে, সুরাঙ্গনাগণের ব্যর্থ বিভ্রমচেষ্টা দিয়া তপঃপ্রভাব প্রদর্শনচ্ছলে কালিদাস রূপসীর উন্মুক্ত যৌবন বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং গিরিপাদপ্রবাহিত নগনদীদর্শনে মুক্তাহারবিন্যস্ত পীন পয়োধর চিত্রিত করিয়াছেন। ভবভূতির বর্ণনায় মাল্যবান্ চিত্র দেখিয়া রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কেবল বলিয়াছেন, বৎস, থাক্ থাক্, আর পারি না, আমার জানকীবিপ্রয়োগ পুনঃপ্রত্যাবৃত্ত হইতেছে; পম্পাসরোবরে অশ্রুজলের আভাস আছে মাত্র; এবং ঋষ্যাশ্রম ও প্রকৃতিদর্শনে কেবল সরল গম্ভীর ভাষায় তাহার বিরলোপমা বর্ণনা।

কিন্তু ভবভূতির পরিচয় এ পর্য্যন্ত আমরা অল্পই পাইয়াছি। চিত্রদর্শনে এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের একাংশমাত্র প্রকাশ পাইয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইয়া গেলে সীতাদেবী বাহুপাশে রামচন্দ্রের কণ্ঠদেশ বেষ্টন করিয়া বাতায়নসন্নিহিত নিভৃত প্রদেশে শয়ন করিলেন। সেই স্পর্শটুকুমাত্রে ভবভূতির সমস্ত বেদনা যেন সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। একখানি নবনীসুকুমার কোমল করস্পর্শ—শুধু একটা আত্মবিস্মৃত অনির্দ্দেশ্য আবেগের মত। রামচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন,

প্রিয়ে কিমেতৎ

বিনিশ্চেতুং শক্যো ন সুখমিতি বা দুঃখমিতি বা
প্রবোধো নিদ্রা বা কিমু বিষবিসর্পঃ কিমু মদঃ।
তব স্পর্শে স্পর্শে মম হি পরিমূঢ়েন্দ্রিয়গণো
বিকারশ্চৈতন্যং ভ্রময়তি সমুন্মীলয়তি চ॥

বহুবর্ষ পরে নাইটিঙ্গেলের কণ্ঠস্বরে একজন বিদেশী কবির হৃদয়ে অনেকটা এইরূপ ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল।

"My heart aches, and a drowsy numbness pains
My sense, as though of hemlock I had drunk,
Or emptied some dull opiate to the drains
One minute past, and Lethe-wards had sunk."

শুধু কি তাই? গান শুনিতে শুনিতে কীট্‌সেরও রামচন্দ্রের দশা ঘটিয়াছে —"প্রবোধো নিদ্রা বা"—"Do I wake or sleep?"

রামচন্দ্রের বাহূপরি মস্তক রাখিয়া সীতা নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বিবাহসময় হইতে গৃহে বনে, শৈশবে যৌবনে চিরদিনই এই বাহু তাঁহার উপাধান হইয়া আসিয়াছে। নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিয়া সীতা বলিয়া উঠিলেন, "আর্য্যপুত্র, আছ ত?" রামচন্দ্র স্নেহভরে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে করস্পর্শ করিলেন। সীতা তাঁহার গৃহের লক্ষ্মী, নয়নের অমৃতশলাকা, সীতার স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে বহুল চন্দনরস লেপন, কণ্ঠদেশে এই বাহু শিশিরমসৃণ মুক্তাহার; অসহ্য বিরহ ভিন্ন সীতার কিই না প্রিয়? "হা আর্য্যপুত্র, সৌম্য, কোথা তুমি?" চিত্র-দর্শনজনিত বিরহভাবনা স্বপ্নাবস্থায়ও প্রিয়ার চিত্তোদ্বেগ ঘটাইতেছে।

অদ্বৈতং সুখদুঃখয়োরনুগুণং সর্ব্বাস্ববস্থাসু য-
দ্বিশ্রামো হৃদয়স্য যত্র জরসা যস্মিন্নহার্য্যো রসঃ।
কালেনাবরণাত্যয়াৎ পরিণতে যৎ স্নেহসারে স্থিতম্
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপ্যেকং হি তৎ প্রাপ্যতে॥

সুখে দুঃখে একরূপ, সর্ব্বাবস্থাতেই অনুকূল, হৃদয় যাহাতে বিশ্রাম লাভ করে, বয়সে যাহার রসক্ষয় হয় না, কালক্রমে লজ্জা ভয় সঙ্কোচ অপগত হইয়া যাহা পরিণত স্নেহসারে অবস্থিতি করে, সুমানুষের সেই অদ্বিতীয় নিরুপধি প্রেম কত পুণ্যেই পাওয়া যায়!

এমন সময়ে দুর্ম্মুখ আসিয়া সেই দারুণ লোকাপবাদসংবাদ নিবেদন করিল। কোথায় এত প্রেম? কোথায় সেই চিরন্তন পত্নীগতপ্রাণতা? প্রবল কুলগৌরব আসিয়া বলিল, সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। হৃদয় বলিল, সীতা যে নিরপরাধিনী। আর, হে রাম, সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া তোমার জীবনধারণে প্রয়োজন কি? তোমার জগৎ ত সীতাবিহনে

জীর্ণারণ্য। ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্ক মোচনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যে অখণ্ড প্রেম সমস্ত প্রজাপুঞ্জের প্রীতি হইতেও গুরুতর ও উচ্চতর, যে অদ্বিতীয় প্রীতি, শুধু ইক্ষ্বাকুবংশ কেন, সমস্ত মানবকুলের জীবন, তাহাকে অকারণে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া কলঙ্কক্ষালন কিরূপ? তবে আশৈশব এত করিয়া সীতাকে পোষণ করিলে কেন? সৌনিকবৃত্তিই যদি অবলম্বন করিবে, ক্ষুদ্রা পক্ষিণীকে বক্ষনীড়ে টানিয়া রাখিবার কি প্রয়োজন ছিল? কুলগৌরব বলিল, ও কথা নয়; তুমি রাজা, তুমি দশরথের পুত্র, রঘুর প্রপৌত্র, সূর্য্য তোমার আদিপুরুষ স্মরণ রাখিয়ো; তুমি শুধু সীতার স্বামী নহ, সসাগরা ধরিত্রী তোমাকে পতিরূপে বরণ করিয়াছে, তাহাকে ভুলিয়ো না; পত্নী ত্যাগ কর—নহিলে, আজ তুমি রাজা হইয়া যে দৃষ্টান্ত দেখাইবে, তাহার ফলে লক্ষ লক্ষ গৃহে বিষবৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিবে; তুমি রাজা, তুমি শুদ্ধ মাত্র প্রেয়সীর প্রেয়ান্ নহ, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া চিরন্তন বিধি রক্ষা কর। রামচন্দ্র কুলগৌরবের নিকট শির নত করিলেন। হৃদয় বলিতে লাগিল—কি করিলে! হায় রামচন্দ্র, কি করিলে!

দ্বিতীয় অঙ্কে ঘটনা বড় নাই। একটি সুন্দর বিষ্কম্ভক—সেই বিষ্কম্ভকে ঋষিপত্নী আত্রেয়ী ও বনদেবতা বাসন্তীর কথোপকথনচ্ছলে দ্বাদশ বৎসরের ঘটনাবলী সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে; যথা, সীতার যমক সন্তান প্রসবানন্তর রসাতলপ্রবেশ, সন্তানদ্বয়ের বাল্মীকি আশ্রমে অবস্থান, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের উদ্যোগ, লক্ষ্মণাত্মজ চন্দ্রকেতুর প্রতি অশ্বরক্ষণভার, নীচজাতীয় শম্বূকের তপশ্চর্য্যা নিবন্ধন রাজ্যে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ও শম্বূকের শিরশ্ছেদনমানসে রামের পঞ্চবটী আগমন বৃত্তান্ত। বিষ্কম্ভক এই; এবং অঙ্কটি রামখড়্গাঘাতে শাপবিমুক্ত দিব্যপুরুষ শম্বূকের সহিত রামের কথোপকথনে পঞ্চবটী বর্ণনাদি।

সম্মুখে দণ্ডকারণ্য। কোথাও স্নিগ্ধশ্যাম, কোথাও ভীষণ রুক্ষ দৃশ্য; স্থানে স্থানে নিরন্তর নির্ঝর-ঝরঝর-মুখরিত; কোথাও তীর্থাশ্রম, কোথাও পর্ব্বত, কোথাও নদী, কোথাও ঘন বন। ঐ যে জনস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত দীর্ঘ দক্ষিণারণ্য চলিয়াছে। এই অরণ্যভূমি চিরদিন সর্ব্বলোকলোমহর্ষণ—এখানকার গিরিগহ্বরসকল উন্মত্ত প্রচণ্ড শ্বাপদসঙ্কুল। কোথাও একেবারে নিষ্কূজস্তিমিত, কোথাও নিরন্তর গর্জ্জনধ্বনিত, কোথাও বা স্বেচ্ছাসুপ্ত গভীরগর্জ্জনকারী ভুজঙ্গগণের নিশ্বাসে জ্বালিত-অগ্নি; কোথাও গর্ত্তমধ্যে অল্প জল দেখা যাইতেছে, এবং তৃষিত কৃকলাসেরা অজগরের স্বেদবিন্দু পান করিতেছে।—রামের সেই সকল পুরাতন কথা মনে পড়িতেছে, সীতা তাঁহার সহিত এই বনে বনে থাকিতে কত ভালবাসিতেন এবং সীতাসান্নিধ্যে তাঁহার সকল দুঃখ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত!

তত্তস্য কিমপি দ্রব্যং যো হি যস্য প্রিয়ো জনঃ।

এই মধ্যমারণ্য সকল কেমন প্রশান্ত গম্ভীর! মদকল ময়ূরের কণ্ঠসদৃশ কোমলচ্ছবি পর্ব্বতে অবকীর্ণ, ঘনসন্নিবিষ্ট নীলপ্রধান তরুণ তরুসমূহে শোভিত এবং অনাকুল বিবিধ মৃগযূথে পরিপূর্ণ। স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণীসকল বহুস্রোতে বহিতেছে; মদমত্ত বিহঙ্গগণের অধিষ্ঠানে বৃন্তচ্যুত বেতসকুসুম পতিত হইয়া সেই জলকে স্নিগ্ধ ও সুরভিত করিতেছে; এবং পরিপক্ক ফলময় শ্যামজম্বুবনান্তে স্রোত স্খলিত হইয়া মুখরিত হইতেছে। গুহাবাসী ভল্লূকগণের থুৎকারনিঃসরণসহিত শব্দ চতুর্দ্দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া অত্যন্ত গম্ভীর বোধ হইতেছে, এবং গজভগ্ন শল্লকীবৃক্ষের বিক্ষিপ্ত গ্রন্থিসকল হইতে শিশিরকটুকষায় গন্ধ বাহির হইতেছে।—এই পঞ্চবটী বনে সীতার সহিত বিশ্রম্ভালাপে কত দিন কাটিয়াছে। সেই সকল কথা মনে হইয়া রামের রুদ্ধ শোকপ্রবাহ উথলিয়া উঠিতেছে—শরীরপ্রবিষ্ট তীব্র বিষরস যেমন বহুদিন পরে সহসা আপন বেগ প্রকাশ করে।

চিরাদ্বেগারম্ভী প্রসৃত ইব তীব্রো বিষরসঃ
কুতশ্চিৎ সংবেগাচ্চলিত ইব শল্যস্য শকলঃ।
ব্রণো রূঢ়গ্রন্থিঃ স্ফুটিত ইব হৃন্মর্ম্মণি পুন-
র্ঘনীভূতঃ শোকো বিকলয়তি মাং নূতন ইব॥

অগস্ত্যাশ্রমে আমন্ত্রিত হইয়া রামকে এই পঞ্চবটী অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। পথে

গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকৌশিকঘটাঘুৎকারবৎকীচক-
স্তম্বাড়ম্বরমূকমৌকুলিকুলঃ ক্রৌঞ্চাবতোঽয়ং গিরিঃ।
এতস্মিন্ প্রচলাকিনাং প্রচলতামুদ্বেজিতাঃ কূজিতৈ-
রুদ্বেল্লন্তি পুরাণরোহিণতরুস্কন্ধেষু কুম্ভীনসাঃ॥

এই ক্রৌঞ্চাবত গিরি। এখানে অব্যক্তনাদী কুঞ্জকুটীরবাসী পেচককুলের ঘুৎকারবৎ বায়ুপ্রবিষ্ট বংশগুচ্ছের শব্দে ভীত হইয়া কাকেরা নিঃশব্দ, এবং চঞ্চল ময়ূরগণের কেকারবে ভীত হইয়া সর্পেরা প্রাচীন বটের স্কন্ধদেশে লুক্কায়িত।

অদূরে

এতে তে কুহরেষু গদ্গদনদদ্গোদাবরীবারয়ো
মেঘালঙ্কৃতমৌলিনীলশিখরাঃ ক্ষৌণীভৃতো দক্ষিণাঃ।
অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুলচলৎকল্লোলকোলাহলৈ-
রুত্তালাস্ত ইমে গভীরপয়সঃ পুণ্যাঃ সরিৎসঙ্গমাঃ॥

এই সকল দক্ষিণ পর্ব্বত! পর্ব্বতের কুহরে গোদাবরীর বারিরাশি গদ্গদনিনাদ করিতেছে; নীল শিখরদেশ মেঘালঙ্কৃত; এবং অন্যোন্যপ্রতিঘাতসঙ্কুল চঞ্চল তরঙ্গকোলাহলে দুর্দ্ধর্ষ গভীরবারি নদীগণের পুণ্য সঙ্গম দেখা যায়।

এই পঞ্চবটীপ্রবেশ নামক অঙ্কের পরেই সেই ছায়াঙ্ক। মনোহর ক্ষুদ্র বিষ্কম্ভকে কলকলভাষিণী তমসা ও মুরলা আসিয়া মিলিয়াছে—এবং বিরহক্ষীণ "অন্তর্গূঢ়ঘনব্যথঃ" রামচন্দ্রের—চতুর্দ্দিকে বধূসহবাসবিস্রম্ভের স্মৃতিদংশনে—ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কা করিয়া গোদাবরীর নিকটে শীতল জলকণাসম্পৃক্ত বায়ুহিল্লোল প্রার্থনা করিতেছে। ভগবতী ভাগীরথীর অনুগ্রহে সীতা ছায়ারূপিণী—স্পর্শ আছে, কিন্তু দর্শনের অতীত; ঠিক ছায়ার মত নয়, যেন বাতাসের মত—স্পর্শে তেমনি সঞ্জীবনী এবং বাতাসেরই মত নয়নের অতীত। কিন্তু বাতাসের মত কেবলি একটা উন্মত্ত হাহাকার নহে—যখন নর্ম্মদাহ্রদ হইতে উঠিয়া আসেন, পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোলসুন্দর বিলোলকবরী মুখখানি—দেখিয়া মনে হয়, যেন করুণার মূর্ত্তি অথবা শরীরিণী বিরহব্যথা সমুপস্থিত।

উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কটিই এই করুণাবিগলিত বেদনা দিয়া রচিত। এক দিকে পূর্ব্বস্মৃতি সীতাকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে—কবে কোন্ করিশাবককে তিনি শল্লকীপত্র খাওয়াইয়া পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিয়াছিলেন, তাহার বিপদ্ হইয়াছে শুনিয়া তাড়াতাড়ি আর্য্যপুত্রকে আহ্বান করিয়া বসেন এবং পরক্ষণেই দ্বাদশ বৎসরের ব্যবধান স্মরণ করিয়া একেবারে যেন ধূলিসাৎ হইয়া যান; অন্য দিকে রামও সেই পঞ্চবটীর তরু লতা, মৃগ মৃগী, ময়ূর ময়ূরী, সর্ব্বত্র সীতার স্নেহ অনুভব করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠেন এবং সীতা সীতা করিতে করিতে মোহপ্রাপ্ত হয়েন।

তখন সীতার স্পর্শ ভিন্ন কিছুই আর তাঁহার চেতনা সম্পাদন করিতে পারে না। সেই ছায়ারূপিণীর সঞ্জীবনস্পর্শে তাঁহার মূর্চ্ছা অপনোদিত হইয়া আনন্দে একটা অবশ অলস বিহ্বলতা জন্মে। সেই ছায়াহস্তকে তিনি চাপিয়া ধরেন—করে করস্পর্শে উভয়েরই অঙ্গে অঙ্গে যেন পুলক সঞ্চারিত হইয়া উঠে—কিন্তু ধরিয়া রাখা যায় না, অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, হাত ছাড়িয়া যায়। যেন সফল হইতে আসিয়া আশা সহসা বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে।

চেতনা সম্পাদিত হইলেও জীবন অত্যন্ত দুর্ব্বহ। একে সেই পঞ্চবটী বন—এইখানে বসিয়া সীতা মৃগদম্পতিকে তৃণভক্ষণ করাইতেন, ঐ তাঁহার স্বহস্তরোপিত কদম্বতরু, সম্মুখে সেই উল্লাসচঞ্চলা ময়ূরবধূ—চতুর্দ্দিক্ সীতাময়; তাহার উপর বাসন্তীর সেই মর্ম্মবেধী বজ্রকঠিন বিদ্রূপাচরণ। মহারাজ, অঙ্গের অমৃত, নয়নের কৌমুদী, দ্বিতীয় হৃদয় বলিয়া যাহাকে ভুলাইতে, লোকাপবাদ মিথ্যা জানিয়াও তাহাকে বিসর্জ্জন দিলে কোন্ হৃদয়ে? প্রেয়সী তবে শুধু কথার কথা, যশই তোমাদের একমাত্র প্রিয়! রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। কিন্তু তাহাই বা হয় কৈ?

দলতি হৃদয়ং গাঢ়োদ্বেগং দ্বিধা তু ন ভিদ্যতে
বহতি বিকলঃ কায়ো মোহং ন মুঞ্চতি চেতনাম্।
জ্বলয়তি তনূমন্তর্দাহঃ করোতি ন ভস্মসাৎ
প্রহরতি বিধির্মর্ম্মচ্ছেদী ন কৃন্ততি জীবিতম্॥

এ শুধু অনন্ত দহন, ভস্মসাৎ করে না, জ্বালা দেয় মাত্র; শুধু মর্ম্মচ্ছেদ করিতে থাকে, জীবন শেষ করিয়া দেয় না।

হা জানকি! হা চণ্ডি! চতুর্দ্দিকেই তোমাকে দেখিতেছি—তবু তুমি নির্দ্দয় হইয়া আছ কেন? হৃদয় স্ফুটিত হইতেছে, দেহবন্ধ শিথিল হইয়া আসিতেছে, জগৎ শূন্য, অন্তরে নিরন্তর জ্বালা, মোহ আমাকে আচ্ছন্ন করিতেছে, আমি অতি মন্দভাগ্য! বলিতে বলিতে রাম মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সীতা তাঁহার ললাট স্পর্শ করিতে চেতনা সঞ্চার হইল। সেই স্পর্শ অন্তরে বাহিরে অমৃতের প্রলেপ; চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আনন্দও যেন মোহ উৎপাদন করে।

ভবভূতির হৃদয় এই অশরীরী স্পর্শটুকু—এই আনন্দেও বেদনা, চৈতন্যেও মোহ, এই আবেগ, আকুলতা, মায়া, রহস্য। বাসন্তী, তমসা, সীতা, রাম, পঞ্চবটী, সমস্ত মিলিয়া যে একটি নিবিড় মায়ারহস্য রচনা করিয়াছে, তাহা শুধু এই বেদনাবিদ্ধ কবিহৃদয়ের বহিরুচ্ছ্বাস। সৃষ্টি যেমন মায়াও বটে, সত্যও বটে, ইহাও সেইরূপ। এই ছায়াঙ্ক সম্বন্ধে বোধ করি বলা খাটে "স্বপ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু।"

এই স্বপ্ন, মায়া, মতিভ্রম উত্তরচরিতের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাল্মীকি-আশ্রমে কৌশল্যা-জনকাদি সমাগমেই কি, লব-চন্দ্রকেতুর সুবর্ণিত সৌজন্যপরিপূর্ণ যুদ্ধদৃশ্যেই কি, এবং সপ্তম অঙ্কের নাট্যাভিনয়েই বা কি, সর্ব্বত্রই যেন একটা কি ধরি-ধরি-ধরা-যায়-না, যেন কাহাকে জানি না অথচ জানি, যেন অভিনয়, কি সত্য, ভ্রম, কি বাস্তব, ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন। সেই জন্য সুখের মধ্যেও বেদনা, জ্ঞানেও সংশয়। এবং যখন সেই রসাতলোদ্ধৃত সিংহাসনে গঙ্গা ও ধরিত্রীর মধ্যস্থলে দেবী সীতা আবির্ভূতা হইলেন, তখন সকলে নিশ্চল স্তিমিত—সত্য, না মায়া! সেই কুশলবের মুখে "হা তাত হা অম্ব হা মাতামহ," সেই রামের স্নেহার্দ্র সহর্ষ আলিঙ্গন, সেই অরুন্ধতী, সীতা, গঙ্গা, পৃথিবী, বাল্মীকি, কুশ-লব, প্রজাপুঞ্জ, স্নেহ প্রেম, ভক্তি বিস্ময়, সুখ দুঃখ, মোহ চৈতন্যের অনির্ব্বচনীয় মহাসঙ্গম—সত্য, কি মায়া!

['সাধনা,' আষাঢ় ১৩০০]

মৃচ্ছকটিক

মৃচ্ছকটিক প্রাচীন উজ্জয়িনীর একখানি উজ্জ্বল সমাজচিত্র। ইহাতে তপোবন নাই, ঋষ্যাশ্রম নাই, মানবহৃদয়ের চতুষ্পার্শ্বে বহিঃপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসে নাই ; কেবল উজ্জয়িনীর রাজশ্যালক, সার্থবাহ, গণিকাকন্যা, ধর্ম্মাধিকরণ, বিলাসভবন ও বৌদ্ধ বিহার দিয়া তদানীন্তন সমাজের কতকগুলি সুন্দর চিত্র রচিত হইয়াছে এবং একটি প্রণয়কাহিনীসূত্রে এই সমস্ত চিত্রগুলি পরে পরে যথাশোভনরূপে গ্রথিত হইয়া মধ্যযুগের সংস্কৃত সভ্যতার একটি অখণ্ড আদর্শ গঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

উজ্জয়িনী তখন ভারতবর্ষের মধ্যে মহাসমৃদ্ধিশালী নগরী। প্রশস্ত রাজপথের দুই পার্শ্বে সুসজ্জিত পণ্যবীথিকা, শ্রেণীবদ্ধ সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী ও নিত্য উৎসবময় বিলাসভবন ; নগরপ্রান্তে অহরহ সঙ্গীতধ্বনিত প্রমোদকাননশ্রেণী, পাদমূল ধৌত করিয়া চঞ্চলা শিপ্রা কলস্বরে বহিয়া গিয়াছে। অদূরে বৌদ্ধ বিহার—পরিব্রাজকেরা সেখানে বসিয়া বৌদ্ধ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন ; এবং নগরীমধ্যে মহাকালমন্দিরে মহাসমারোহে প্রতি দিন ব্রাহ্মণদিগের শিবপূজা সম্পন্ন হয়।

এই চির-উৎসবময়ী উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠিচত্বরে দ্বিজসার্থবাহ চারুদত্তের বাস ; এবং গণিকাকন্যা বসন্তসেনা এই নষ্টবিত্ত সম্ভ্রান্ত পৌরজনের গুণমুগ্ধা প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী। কিন্তু যাহার রূপ ও যৌবন দুই আছে, মকরকেতন তাহার প্রণয়পথ কখনও নিষ্কণ্টক করেন না। বসন্তসেনার রূপযৌবন নষ্টচরিত্র রাজশ্যালকের শরীর মন নিরন্তর মদনানলে দগ্ধ করে। কিন্তু বসন্তসেনা গণিকাকন্যা হইলেও গণিকার মত তাঁহার স্বভাব নহে—সুতরাং শকারের ঐশ্বর্য্যপ্রভাব তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তিনি চারুদত্তের গুণাবলী শুনিয়া অবধি মনে মনে তৎপ্রতি অনুরাগবতী হইয়াছেন ; এবং যে দিন কাম-দেবায়তনোদ্যানে চারুদত্তের দর্শন লাভ করিলেন, সে দিন হইতে সেই সৌম্যমূর্ত্তি ভিন্ন তাঁহার অন্তরে আর কিছুই স্থান পায় নাই।

কিন্তু নীচবংশ শকারের ইহা সহ্য হইবে কেন? সে ভগিনীপতির অনুগ্রহপরিপুষ্ট হইয়া কেবলমাত্র অষ্টাদশ ব্যসন আয়ত্ত করিয়াছে ; এবং উজ্জয়িনীতে নিশাচর দুর্জ্জনদিগের অগ্রণী বলিয়াই তাহার খ্যাতি। সন্ধ্যার পর তাহার ভয়ে যুবতীজনের একাকিনী পথে বাহির হইবার যো ছিল না। বসন্তসেনাকে একবার সুবিধামত পাইলে শকার কি সহজে ছাড়ে?

দৈবক্রমে কামদেবায়তন উদ্যান হইতে বসন্তোৎসব দেখিয়া ফিরিতে বসন্তসেনার সে দিন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল। তখন শকার সদলবলে পথে বাহির হইয়াছে এবং পথ প্রায় জনশূন্য। সেই নির্জ্জন পথে একাকিনী পাইয়া শকার, বিট ও চেটের সহিত, বসন্তসেনার অনুগমন করিল। এবং নানাবিধ সম্বোধনে বসন্তসেনাকে দ্রুতগতি হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে লাগিল। বিট সাধুভাষায় বসন্তসেনার নৃত্যপ্রয়োগবিশদ চরণযুগলের প্রশংসা করিয়া ও ব্যাধানুসারচকিতা হরিণীর সহিত উপমা খাটাইয়া কথাগুলি একটু সাজাইয়া গুছাইয়া বলে। এবং শকার অত্যন্ত কুৎসিত গ্রাম্য ভাষায় আপন দারুণ অন্তর্জ্বালা ব্যক্ত করিতে থাকে; এবং কখনও "রামভয়ে পলায়মানা দ্রৌপদীর" সহিত, কখনও বা "রাবণের কুন্তীর" সহিত তুলনা করিয়া বসন্তসেনাকে স্বীয় শয্যাসঙ্গিনী করিবার আশ্বাস দেয়। কিন্তু বসন্তসেনার গতিবেগ যখন কিছুতেই মন্দীভূত হইল না, তখন আশ্বাসবচনের পরিবর্ত্তে অজস্র কটুকাটব্য বর্ষিত হইতে লাগিল এবং শকার এক বার তাঁহার কেশগুচ্ছ ধারণ করিলে ভীমসেন, জমদগ্নিপুত্র, কুন্তীসুত প্রভৃতির বলবীর্য্যও যে ব্যর্থ হইবে, বার বার করিয়া এ কথা বসন্তসেনার কর্ণগোচর করা হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে সেই সূচিভেদ্য অন্ধকারে বসন্তসেনা অনেকটা পথ অতিক্রম করিয়া একেবারে চারুদত্তের পক্ষদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন চারুদত্তের জপসমাপ্তি হইয়াছে এবং বয়স্য মৈত্রেয় পরিচারিকা রদনিকা সমভিব্যাহারে মাতৃকাগণের পূজার্থে পক্ষদ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিতেছেন। দ্বার উন্মুক্ত হইতেই বসন্তসেনা তাড়াতাড়ি রদনিকার হস্তস্থিত দীপ নিবাইয়া দিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। বাতাসে দীপ নিবিয়া গেল ভাবিয়া মৈত্রেয় পুনরায় দীপ জ্বালিয়া আনিতে গেলেন। ইতিমধ্যে শকার আসিয়া বসন্তসেনাভ্রমে রদনিকার কেশগুচ্ছ ধারণ করিল। মৈত্রেয় প্রদীপ লইয়া আসিতেই শকার রদনিকাকে ছাড়িয়া দিল। বিট মার্জ্জনা ভিক্ষাপূর্ব্বক এ ঘটনা যাহাতে চারুদত্তের কর্ণগোচর না হয়, সে জন্য মৈত্রেয়কে বিস্তর অনুনয় সহকারে অনুরোধ করিল। কিন্তু শকারের আস্ফালন থামিল না। সে শাসাইয়া গেল যে, বসন্তসেনা আমাদের অনুনয় বিনয় অগ্রাহ্য করিয়া এই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অতএব সেই গণিকাকন্যাকে প্রত্যর্পণ না করিলে কপাটতলপ্রবিষ্ট কপিত্থবৎ মড়মড়শব্দে চারুদত্তের মস্তক চূর্ণীকৃত হইবে জানিয়ো।

বাহিরে যখন এই কাণ্ড চলিয়াছে, গৃহাভ্যন্তরে তখন চারুদত্ত বসন্তসেনাকে রদনিকা ভাবিয়া পুত্র রোহসেনকে গৃহাভ্যন্তরে আনিতে আদেশ করিলেন এবং বসন্তসেনার প্রতি স্বীয় জাতীকুসুমবাসিত উত্তরীয়খণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তদ্দ্বারা রোহসেনের গাত্রাচ্ছাদন করিয়া দিতে বলিলেন। বসন্তসেনা নীরব নিশ্চল। আদেশ পালিত হইল না দেখিয়া চারুদত্ত

ক্ষুণ্নহৃদয়ে বলিলেন, হায় রদনিকে, আজ প্রতিবচন পর্য্যন্ত নাই—পুরুষের অবস্থাবিপর্য্যয়ে মিত্রও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়, চিরানুরক্তও বিরক্ত হয়।

কথা শেষ হইতে না হইতে রদনিকাকে লইয়া মৈত্রেয় প্রবেশ করিলেন। চারুদত্ত দেখিলেন যে, যাহার অঙ্গে উত্তরীয় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, সে রদনিকা নহে ; কিন্তু যেই হোক্, ইহার অঙ্গে উত্তরীয় বড় শোভা পাইয়াছে।

ছাদিতা শরদভ্রেণ চন্দ্রলেখেব দৃশ্যতে।

মৈত্রেয় বসন্তসেনার পরিচয় দিয়া দিলেন। এবং কামদেবায়তনের কাহিনী ও রাজশ্যালকের দুর্ব্ব্যবহারের কথাও প্রকাশ করিয়া বলিতে ত্রুটি করিলেন না। চারুদত্ত কেবল বলিলেন "অজ্ঞোঽসৌ" এবং উত্তরীয়নিক্ষেপের জন্য বসন্তসেনার নিকট অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বসন্তসেনাও চারুদত্তের ন্যায় সম্ভ্রান্ত জনের গৃহে তাঁহার প্রবেশ অত্যন্ত অনুচিত কার্য্য হইয়াছে বলিয়া ক্ষমা চাহিলেন। ইহাই প্রথম সূচনা। তাহার পর রাজপথে বিপদাশঙ্কায় বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলি চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখিলেন। এবং পরিশেষে চারুদত্তই তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া আসিলেন।

এইখানে মৃচ্ছকটিকের প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল। এবং এই যে চারুদত্তের সহিত বসন্তসেনার সংস্পর্শ সূচিত হইল, দশ অঙ্কের মধ্য দিয়া বিবিধ বিপ্লবচক্রে ও বিচিত্র চিত্রে ইহাই ক্রমে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজা-কবি শূদ্রক গণিকা-কন্যার এই প্রণয়বন্ধনে উজ্জয়িনীর সাময়িক সমাজনাট্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এবং অঙ্কে অঙ্কে এই প্রণয়-ঘটনার চতুর্দ্দিকে বিলাসী উজ্জয়িনীর সমগ্র বিলাস অনুলিপ্ত হইয়াছে।

গণিকা তখন নগরের শোভা বলিয়া গণ্য হইত এবং দ্যূতভবন তাহার ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক ছিল। এবং এই দুই বিলাসের অনুগ্রহে উজ্জয়িনীতে চৌরেরও অসদ্ভাব ছিল না। রজনীতে রাজপথে নগরের রক্ষকেরা যেমন ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইত, গৃহস্থের প্রাচীরের ছিদ্রপথে সেইরূপ বহুসংখ্যক সুদক্ষ চৌরেরও গতিবিধি ছিল। এবং বসন্তসেনার অলঙ্কারন্যাসের পর দরিদ্র চারুদত্তের ভবনেও চুরি হইল। চোর বসন্তসেনার অলঙ্কারগুলির একখানিও রাখিয়া গেল না, কেবল প্রাচীরগাত্রে বহুযত্নরচিত একটি দর্শনীয় ছিদ্রপথ রাখিয়া গেল যে, প্রভাতে উঠিয়া চারুদত্ত ও প্রতিবেশীবর্গ চোরকে কেবলমাত্র গালি না দিয়া তাহার শিল্পনৈপুণ্যেরও প্রশংসা করিবার অবসর পান।

এই ঘটনায় চারুদত্তকে অত্যন্ত কাতর দেখিয়া মৈত্রেয় পরামর্শ দিলেন, সখে, যখন সাক্ষী কেহ নাই, তখন এই অলঙ্কারন্যাসের কথা অস্বীকার করিলেই চলিবে—তুমি অতিমাত্র ভাবিত হইয়ো না। কিন্তু চারুদত্ত মিথ্যা বলিবার পাত্র নহেন। তিনি ভিক্ষা করিয়াও বসন্তসেনার গচ্ছিত ধন পরিশোধ করিবেন, তথাপি চরিত্রভ্রংশকারণ মিথ্যার শরণাপন্ন

হইবেন না।—পত্নী ধূতা এই সংবাদ শ্রবণে অচিরে মৈত্রেয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এবং চারুদত্ত পাছে স্ত্রীর ধন লইতে কুণ্ঠিত হয়েন, রত্নষষ্ঠী ব্রত উদ্‌যাপনচ্ছলে ব্রাহ্মণ মৈত্রেয়কে রত্নমালা দান করিয়া স্বামীর সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন।

চারুদত্তের আদেশে মৈত্রেয়ই বসন্তসেনা সমীপে সেই রত্নমালা লইয়া গেলেন। বসন্তসেনার প্রকাণ্ড আটমহল পুরী। পথের সম্মুখেই গগন স্পর্শ করিয়া দন্তিদন্তনির্ম্মিত তোরণ উঠিয়াছে এবং বিচিত্র পতাকাবলী নিয়ত বায়ুবশে সঞ্চালিত হইয়া তোরণস্তম্ভসমূহের শোভা সম্পাদন্র করিতেছে। নিম্নে সুনির্ম্মিত প্রস্তরবেদিকার উপরে চূতপল্লবরম্য স্ফাটিক মঙ্গলকলসসমূহ সুসজ্জিত; এবং দুর্ভেদ্য কনক-কপাট দারিদ্র্যকে সেই বিলাসপুরী হইতে নিয়ত দূরে রক্ষা করে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া বিবিধরত্নপ্রতিবদ্ধ কাঞ্চনসোপানশোভিত শুভ্র প্রাসাদশ্রেণী দর্শকের নয়ন ঝলসিয়া দেয়। দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে গো-মহিষ-অশ্বশালা। শত শত পরিচারক দিবারাত্রি এই সকল হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ জীবগণের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত। তৃতীয় প্রকোষ্ঠে কুলপুত্রগণের উপবেশন নিমিত্ত বহুবিধ আসন; কোথাও মণিময় গুটিকাযুক্ত পাশকপীঠ, কোথাও বা পাশকপীঠোপরি অর্দ্ধপঠিত পুস্তক অনাবৃত পড়িয়া রহিয়াছে; এবং মদনসন্ধিবিগ্রহচতুর গণিকা ও বৃদ্ধ বিটগণ বিবিধবর্ণবিলিপ্ত চিত্রফলকহস্তে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। চতুর্থ প্রকোষ্ঠে নিত্য যুবতিকরতাড়িত গম্ভীর মৃদঙ্গধ্বনি, মধুকরবিরুতমধুর বংশীরব ও কামিনীগণের নূপুরশিঞ্জন সহ তালে তালে নৃত্য। কোথাও নাট্যপাঠ হইতেছে, কোথাও গণিকাদারিকাগণ বিবিধ দেহভঙ্গী ব্যক্ত করিতেছে। এবং গবাক্ষে সলিলগর্গরীসকল বাতগ্রহণে শীতল হইতেছে। পঞ্চম প্রকোষ্ঠে হিঙ্গুগন্ধসুরভিত রন্ধনশালা—যেখানে আসিয়া বিবিধ মাংস ও পায়সাদির লোভে মৈত্রেয়ের রসনা সিক্ত হইয়া উঠিল এবং নিমন্ত্রণলাভের বৃথা আশায় মন চঞ্চল হইতে লাগিল। ষষ্ঠ প্রকোষ্ঠের তোরণ স্বুবর্ণনির্ম্মিত এবং গৃহতল নীলমণিপরিশোভিত। উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ বৈদূর্য্য মৌক্তিক প্রবালক পুষ্পরাগ ইন্দ্রনীল পদ্মরাগ মরকত প্রভৃতি রত্নরাশি লইয়া পরীক্ষা ও অলঙ্কারনির্ম্মাণ করিতেছে। কোথাও মদিরাপান চলিয়াছে, দাসীগণ কর্পূরসুবাসিত তাম্বূল বিতরণ করিতেছে এবং হাস্যপরিহাসের বিরাম নাই। সপ্তম প্রকোষ্ঠে পক্ষিশালা। অন্যোন্যচুম্বনরত কপোতমিথুন, সুভাষিণী মদনসারিকা, পরপুষ্টা কোকিলা প্রভৃতি নানা-জাতীয় বিহঙ্গকুল এই বিহঙ্গবাটিকায় সুখে নিষণ্ণ। অষ্টম প্রকোষ্ঠে বসন্তসেনার আত্মীয় স্বজনেরা বাস করে। বসন্তসেনার মাতাকে দেখিয়া মৈত্রেয় চেটীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তৈলচিক্কণ পদযুগল উপানৎমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়া উচ্চাসনোপবিষ্টা পুষ্পপ্রাবারকপ্রাবৃতা ঐ রমণীটি কে? চেটী উত্তর করিল, ইনিই আমাদের আর্য্যার জননী। মৈত্রেয় আর্য্যার মাতার দৈহিক পরিধি দেখিয়া উপহাসরসিকতার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারিলেন না।

চেটীকে বলিলেন, ইহাঁর যেরূপ আয়তন দেখিতেছি, বোধ করি বৃহৎ শিবলিঙ্গের ন্যায় ইহাঁকে অগ্রে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে চতুষ্পার্শ্বে এই প্রাচীর ও দ্বারসকল নির্ম্মিত হইয়াছে। চেটী বলিলেন, ঠাকুর, উপহাস করিবেন না, ইনি চাতুর্থিকে অত্যন্ত কাতর আছেন। মৈত্রেয় প্রার্থনা করিলেন, ভগবান্ চাতুর্থিক, তুমি এই দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তানের প্রতি একবার কৃপা কর।

এইরূপে মুগ্ধ মৈত্রেয়ের মুখ দিয়া মৃচ্ছকটিককার বসন্তসেনার পুরী বর্ণনা করিয়াছেন। এবং প্রকোষ্ঠ হইতে প্রকোষ্ঠান্তরে যাইতে বিলাসের এক একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। সংস্কৃত নাটককারেরা এইরূপ আনুপূর্ব্বিক চিত্রন্যস্ত বর্ণনা করিতে যেন কিছু ভালবাসেন। কালিদাসের শকুন্তলাও প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলি চিত্রাঙ্কিত—এমন কি, ছোটখাট উপমাগুলিও এক একটি সুন্দর চিত্রে উদ্ভাসিত। মৃচ্ছকটিকও নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে এইরূপ একটি চিত্রপরম্পরা বলিয়াই প্রতিভাত হয়। তবে কালিদাসের নাটকের মত ইহাতে কেবলি সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের সমাবেশ নহে। বাস্তব জগতের দুই চারিটা নাতিসুন্দর স্থূল দৃশ্যও ইহাতে আছে। কালিদাস বসন্তসেনার আলয়ে প্রবেশ করিলে তদীয়া স্থূলাঙ্গী জননীটিকে মৈত্রেয়ের সমক্ষে কিছুতেই বাহির করিতেন না। একেবারে নৃত্যগীত মদিরা উৎসব ও রূপসীগণের অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু যৌবনের মধ্য দিয়া মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার বৃক্ষবাটিকায় লইয়া যাইতেন—যেখানে যুবতীগণের সনূপুর পাদতাড়নে অশোকতরু মুকুলিত হইয়া উঠে এবং সেই অশোখশাখা হইতে বিলম্বিত দোলায় বসিয়া মৃদু সান্ধ্য পবনে দূর মৃদঙ্গধ্বনির তালে তালে বসন্তসেনা যৌবনের আন্দোলনসুখ অনুভব করেন।

অষ্টম প্রকোষ্ঠের পর এই বৃক্ষবাটিকা। চেটী মৈত্রেয়কে বরাবর সেইখানে লইয়া গেল। বসন্তসেনা সেইখানেই ছিলেন। পরস্পরের কুশলজিজ্ঞাসাদি সমাপনান্তে মৈত্রেয় বলিলেন যে, চারুদত্ত দ্যূতক্রীড়ায় আপনার গচ্ছিত অলঙ্কারগুলি হারাইয়া তৎপরিবর্ত্তে এই রত্নমালা প্রেরণ করিয়াছেন। বসন্তসেনা অলঙ্কারগুলির সন্ধান পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তাঁহারই পরিচারিকা মদনিকার প্রণয়ী শর্ব্বিলক নামক এক ব্রাহ্মণসন্তান প্রণয়িনীকে নিষ্ক্রয়দানে দাসীত্ব হইতে মুক্ত করিতে এই কার্য্য করিয়াছে। এবং এই ঘটনা প্রকাশ হইবার পর মদনিকাকে তিনি শর্ব্বিলকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু মৈত্রেয়কে সে কথা বলিয়া, রত্নমালা গ্রহণপূর্ব্বক, প্রদোষে চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন বলিয়া বিদায় করিলেন।

মৈত্রেয় গিয়া চারুদত্তকে সমস্ত বলিলেন। এবং ঝড়বৃষ্টিবিদ্যুতের মধ্য দিয়া যথাসময়ে ছাতা মাথায় দিয়া বসন্তসেনা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সংস্কৃত কবির নিকট

বর্ষাবর্ণনা কখনও ফাঁক যায় না—বিশেষতঃ যখন এমন একটি প্রণয়কাহিনীর সুবিধা আছে। মৃচ্ছকটিককার নানা ছন্দে এই মেঘ ঝঞ্ঝা অশনি বর্ণনা করিয়াছেন এবং গুরুগুরু বর্ষাবর্ণনায় এক দিকে সোৎকণ্ঠ চারুদত্ত ও অন্য দিকে অভিসারিকা বসন্তসেনার মনে প্রকৃতিকে প্রেমার্দ্র করিয়া তুলিয়াছেন। এবং বিদ্যুৎ যখন অম্বরকে ঘন ঘন আলিঙ্গন করিতে লাগিল, কবি আর থাকিতে পারিলেন না—চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে পরস্পরের গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া অঙ্ক শেষ করিলেন।

বর্ষশতমস্তু দুর্দিনমবিরতধারং শতহ্রদা স্ফুরতু।
অস্মদ্বিধদুর্লভয়া যদহং প্রিয়য়া পরিষ্বক্তঃ॥

কিন্তু রাত্রি প্রভাত হইল। চারুদত্ত ভৃত্য বর্দ্ধমানককে শকট ঠিক করিয়া বসন্তসেনাকে পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে লইয়া যাইতে বলিয়া গিয়াছেন। বসন্তসেনা গাত্রোত্থান করিয়া ধূতা দেবীর সংবাদ লইলেন :—

বস। অবি সন্তপ্পদি চারুদত্তস্স পরিঅণো?
চেটী। সন্তপ্পিস্সদি।
বস। কদা?
চেটী। জদা অজ্জআ গমিস্সদি।
বস। তদো মএ পঢ়মং সন্তপ্পিদব্বম্।*

তদনন্তর তিনি আর্য্যা ধূতার নিকট এই বলিয়া সেই রত্নাবলী পাঠাইয়া দিলেন যে, আমি চারুদত্তের গুণনির্জিতা দাসী, আপনারও দাসী, অতএব এই রত্নাবলী যোগ্য কণ্ঠে ন্যস্ত হউক্।

ধূতা বলিয়া পাঠাইলেন—তাহাও কি হয়? আর্য্যপুত্র প্রসন্ন মনে যাহা আপনাকে দান করিয়াছেন, তাহা আমি লইব কেন? আর্য্যপুত্রই আমার একমাত্র আভরণ।

এমন সময় রদনিকা রোহসেনকে লইয়া প্রবেশ করিল। রোহসেন মৃৎশকটিকার পরিবর্ত্তে সুবর্ণশকটিকা লইয়া খেলা করিতে চায়। দাসী তাহাকে বুঝাইতেছে যে, তোমার পিতার আবার ধন হউক্, সকলি হইবে। বসন্তসেনা চারুদত্তের পুত্রকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক

---

* বস। চারুদত্তের পরিজন কি সন্তপ্ত হইতেছেন?
চেটী। সন্তপ্ত হইবেন।
বস। কখন?
চেটী। যখন আর্য্যা চলিয়া যাইবেন।
বস। তবে আমাকেই প্রথম সন্তপ্ত হইতে হইবে।

ক্রোড়ে হইলেন। এবং বালক সুবর্ণশকটিকার জন্য কাঁদিতেছে শুনিয়া স্বীয় অলঙ্কারগুলি খুলিয়া দিলেন—ইহার দ্বারা তুমি সুবর্ণশকটিকা প্রস্তুত করাইয়া লইয়ো।

শূদ্রক বসন্তসেনাকে বরাবরই নারীহৃদয়ের এই স্বাভাবিক সৌকুমার্য্যে বিভূষিত করিয়াছেন। এ স্নেহ গণিকাসুলভ নহে—নারীহৃদয়ের অতি গভীর তল হইতে ইহা উৎসারিত। রোহসেনকে দেখিয়াই চারুদত্তগতপ্রাণার হৃদয়ে মাতৃস্তনে ক্ষীরসঞ্চারের ন্যায় এই অনির্ব্বচনীয় বাৎসল্য সঞ্চারিত হইয়াছে। প্রিয়জনের পরিজনবর্গকেও প্রেম এমনি আপনার করিয়া তোলে।

কিন্তু শকট সুসজ্জিত। আর বিলম্ব করা চলে না। বর্দ্ধমানক চেটীকে দিয়া সংবাদ পাঠাইল যে, বসন্তসেনার জন্য পক্ষদ্বারে কর্ণীরথ অপেক্ষা করিতেছে। বসন্তসেনা আর একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন—তখনও তাঁহার প্রসাধনক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। বর্দ্ধমানক যানের আচ্ছাদন ফেলিয়া আসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি তাহা ঠিক করিয়া আনিতে গেল। ইতিমধ্যে বসন্তসেনা আসিয়া শকটে উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে সে শকট চারুদত্তের নহে, তাহা রাজশ্যালক সংস্থানকের।

চারুদত্তের শকটও শূন্য গেল না। তাহাতে আর্য্যক নামে এক রাজবিদ্রোহী গোপপুত্র উঠিয়া বসিয়াছেন। সে সময়ে রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য উজ্জয়িনীতে এক চক্রান্ত চলিয়াছিল। লোকমুখে একটা ভবিষ্যদ্বাণী রটনা হইয়াছিল যে, উজ্জয়িনীরাজ পালককে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তৎপদে আর্য্যক নামে এক গোপপুত্র অভিষিক্ত হইবেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী রটনার ফলে অসন্তুষ্ট প্রজাবর্গের অনেকেই গোপনে আর্য্যকের দলভুক্ত হইয়াছিল। শকট যখন পুষ্পকরণ্ডকে আসিয়া পঁহুছিল, চারুদত্ত বসন্তসেনাকে নামাইয়া লইতে আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিস্মিত হইলেন।

করিকরসমবাহুঃ সিংহপীনোন্নতাংসঃ
পৃথুতরসমবক্ষাস্তাম্রলোলায়তাক্ষঃ।
কথমিদমসমানং প্রাপ্ত এবংবিধো যো
বহতি নিগড়মেকং পাদলগ্নং মহাত্মা॥*

জিজ্ঞাসা করিলেন, "ততঃ কো ভবান্?"—আর্য্যক স্বীয় পরিচয় দিলেন। চারুদত্ত বলিলেন,

বিধিনৈবোপনীতস্ত্বং চক্ষুর্বিষয়মাগতঃ।
অপি প্রাণানহং জহ্যাং নতু ত্বাং শরণাগতম্॥†

---

* করিকরসমবাহু, সিংহপীনোন্নতাংস, বিশালবক্ষ, তাম্রলোলায়তচক্ষু, এই সকল মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্ত হইয়াও ইনি পাদলগ্ন নিগড় বহন করিতেছেন কেন?

† আপনি দৈবকর্ত্তৃকই এখানে উপনীত হইয়া আমার চক্ষুগোচর হইলেন। প্রাণও যদি ত্যাগ করিতে হয়, শরণাগত আপনাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।

এবং তাঁহার নিগড় অপনীত করাইয়া দিয়া তাঁহাকে সেই শকটেই রাজপুরুষদিগের দৃষ্টির বাহিরে নিরাপদ্ স্থানে পৌঁছাইয়া দিলেন।

এদিকে বসন্তসেনা পড়িলেন শকারের হাতে। সে প্রথমে প্রবহণমধ্যে উঁকি মারিয়াই স্থির করিল, গাড়ীতে চড়িয়া নিশ্চয় কোন রাক্ষসী আসিয়াছে। বিট গিয়া দেখিল, বসন্তসেনা। বসন্তসেনা বিটের শরণাপন্ন হইলেন। বিট তাঁহার কথা প্রকাশ করিল না। বরঞ্চ যাহাতে শকার প্রবহণ ছাড়িয়া পলায়ন করে, তৎপক্ষে চেষ্টা করিল। কিন্তু রাজশ্যালক গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে যাইতে রাজি হয় না। তখন অগত্যা বসন্তসেনার কথা প্রকাশ হইল। শকার একেবারে তাঁহার চরণে পড়িয়া আরম্ভ করিল,

এশে পড়েমি চলণেশু বিশালণেত্তে
হত্থঞ্জলিং দশণহে তব শুদ্ধদন্তি।
জং তং মএ অবকিদং মদণাতুলেণ
তং খম্মিদাশি বলগত্তি তব ক্ষি দাশে॥*

কিন্তু বসন্তসেনা আহতা ফণিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন। তখন শকার ক্রুদ্ধ হইয়া বিটকে বলিল, এই স্ত্রীলোকটাকে মারিয়া ফেল। বিট সম্মত হইল না। বলিল যে, নগরের শোভা কুলকামিনীসদৃশী প্রণয়বতী এই তরুণী নিরপরাধাকে হত্যা করিয়া পরলোক-নদী উত্তীর্ণ হইব কিরূপে?

শকার উত্তর করিল, আমি ভেলার ব্যবস্থা করিব। এখানে হত্যা করিলে কে দেখিবে?

বিট বলিল, দেখিবে অনেকে,

পশ্যন্তি মাং দশ দিশো বনদেবতাশ্চ
চন্দ্রশ্চ দীপ্তকিরণশ্চ দিবাকরোঽয়ম্।
ধর্ম্মানিলৌ চ গগনঞ্চ তথান্তরাত্মা
ভূমিস্তথা সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা॥†

শকার বলিল, তবে বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করিয়া হত্যা কর—কেহ দেখিতে পাইবে না।

বিট আর থাকিতে পারিল না—"মূর্খ অপধ্বস্তোঽসি" বলিয়া গালি দিয়া বসিল।

---

* হে বিশালনেত্রে, তোমার চরণে পতিত হইতেছি, হে দশনখে, শুদ্ধদন্তি, তোমার নিকট হস্তাঞ্জলি করিতেছি। মদনাতুর আমা কর্ত্তৃক তুমি যে অপকৃত হইয়াছিলে, তাহা ক্ষমা করিয়াছ—হে বরগাত্রি, আমি তোমার দাস।

† আমাকে দেখিতেছেন, দশ দিক্, বনদেবতাসকল, চন্দ্র, দিবাকর, ধর্ম্ম, অনিল, গগন, অন্তরাত্মা এবং সুকৃতদুষ্কৃতসাক্ষিভূতা ভূমি।

তখন শকার চেটকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পাদনার্থে আদেশ করিল। সেও প্রভুবাক্য পালন করিতে অসম্মত হইল।

শকার বলিল, তবে আমি স্বহস্তেই ইহাকে বিনাশ করি।

বিট তাহাতে বাধা দিল। বলিল, খবরদার, আমাদের সম্মুখে স্ত্রীহত্যা করিয়া তুমি কখনও নিষ্কৃতি পাইবে না।

বিপদ্ দেখিয়া শকার পুনরায় মদনশরাহতের ন্যায় বসন্তসেনাকে "বাসু বাসু" সম্বোধন করিতে লাগিল। বিট ও চেট এই ভাব দেখিয়া প্রস্থান করিল। এবং তখন শকার নির্ভয়ে বসন্তসেনার গলা টিপিয়া ধরিল। চারুদত্তের নাম গ্রহণ করিতে করিতে তিনি মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। মৃতা ভাবিয়া শকার তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। এবং ধর্ম্মাধিকরণে গিয়া চারুদত্তের নামে এই হত্যাভিযোগ উপস্থিত করিল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে শ্রেষ্ঠিকায়স্থ সহ অধিকরণিক বিচার করিতে বসিলেন। অনেক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি গৃহীত হইল। বসন্তসেনার মাতা আসিয়াও রাজশ্যালকের কথার অনুকূলে সাক্ষ্য দিল। বিস্তর বিচারবিতর্কের পর অধিকরণিক চারুদত্তকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিলেন। এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ বাহির হইল।

এদিকে বসন্তসেনাকে মৃতপ্রায় অবস্থায় পতিত দেখিয়া একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু নিকটস্থ বিহারে লইয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।—বৌদ্ধধর্ম্ম উজ্জয়িনীতে তখনও প্রবল ছিল বলিয়া বোধ হয়। এবং তদানীন্তন নাটকাদিতে শিবের নামে নান্দী থাকিলেও বৌদ্ধদিগের প্রতি বিশেষ একটু সহানুভূতি দৃষ্ট হয়।—আমাদের ভিক্ষু বসন্তসেনাকে দেখিয়াই চিনিয়াছেন—ইনিও বুদ্ধেরই একজন শরণাগতা। ভিক্ষুটিও বসন্তসেনার পরিচিত—নাম সংবাহক। বসন্তসেনা এক সময়ে ইহাঁকে স্বীয় বলয় বিক্রয় করিয়া দ্যূতাধ্যক্ষের ঋণ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এখন এই ভিক্ষুর সেবা-শুশ্রূষায় তিনি মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধৃত হইলেন।

এইরূপে কখনও পারিবারিক শান্তির চিত্র, কখনও গণিকালয়, কখনও দ্যূতশালা, কখনও সন্ধিচ্ছেদ, কখনও ধর্ম্মাধিকরণ, কখনও বৌদ্ধ বিহার, কখনও শ্রমণক, কখনও বা রাজশ্যালক, নানা চিত্রের মধ্য দিয়া মৃচ্ছকটিকের আখ্যায়িকা অগ্রসর হইয়াছে। সকল চিত্রগুলি চিত্ররূপে পরিস্ফুট করিয়া দেখান আমাদের এ স্বল্প স্থানে অসম্ভব। তৃতীয় অঙ্কে সামান্য চৌর্য্যঘটনা লইয়াই মৃচ্ছকটিককার কতগুলি চিত্র দিয়াছেন! দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক ও মাথুরের দ্যূতদৃশ্যে দ্যূতশালার কত চিত্র আছে! এমন প্রতি অঙ্কে উজ্জয়িনীসমাজের ছোট বড় চিত্র কি যে না বর্ণিত হইয়াছে, বলা কঠিন। এবং এই সমস্ত ঘটনা ও চরিত্রচিত্রাবলী দশম অঙ্কে বধ্যভূমিতে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। সেখানে চণ্ডালেরা

চারুদত্তকে শূলে দিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সহসা কোথা হইতে জীবিতা বসন্তসেনা আসিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড রহিত করিলেন। দুন্দুভিরবে চতুর্দ্দিকে পুরাতন রাজার সিংহাসনচ্যুতি ঘোষিত হইল। আর্য্যক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। শকার চারুদত্তের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। চারুদত্তের অনুরোধে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। রাজাদেশে বসন্তসেনা চারুদত্তের ধর্ম্মপত্নীরূপে গৃহীত হইলেন। ধূতা দেবী তাঁহাকে সাদরে ডাকিয়া লইলেন। সংবাহক সর্ব্ববিহারের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। এবং সর্ব্বত্র শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।—এই বধ্যভূমিতে সমস্ত উজ্জয়িনীসমাগমে মৃচ্ছকটিকের উপযুক্ত উপসংহার।
['সাধনা,' মাঘ ১৩০০]

জয়দেব

সকল জিনিষেরই এমন এক একটি কেন্দ্রস্থল আছে, যেখান হইতে না দেখিলে তাহাকে কিছুতেই সম্পূর্ণরূপে ও সমগ্রভাবে দেখা হয় না। এবং তাহার ভিন্ন ভিন্ন একদেশ মাত্র দেখিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির মনে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা জন্মিয়া থাকে।

ন্যায়শাস্ত্রের একটি উদাহরণে এই তত্ত্বটি অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। কতকগুলি অন্ধ স্পর্শদ্বারা এক বার হস্তীর আকার নির্ণয় করিয়াছিল। যে অন্ধ হস্তীর পাদস্পর্শ করিল, সে হস্তীকে স্তম্ভাকার বলিয়া বর্ণনা করিল। যে শুণ্ড স্পর্শ করিল, সে বলিল, না, এ ত স্তম্ভ নয়, এ যে সর্পাকার দেখিতেছি। যে ব্যক্তি দৈবক্রমে হস্তীর কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল, সে উভয়কেই মিথ্যাবাদী ঠাহরাইয়া হস্তীকে কুলার মত বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল। এইরূপে হস্তীর আকার লইয়া অন্ধে অন্ধে যখন তুমুল কলহ বাধিয়াছে, এক চক্ষুষ্মান্ ব্রাহ্মণ আসিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, বাপুসকল, তোমরা কেহই মিথ্যা বল নাই, কিন্তু হস্তীর এক এক অঙ্গমাত্র স্পর্শ করিয়া তাহাকে তদনুরূপ বর্ণনা করিয়াছ। তোমাদের সকলের বর্ণনা মিলাইয়া লইলে একটি সমগ্র হস্তীর বর্ণনা করা হয়।

হস্তী সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ যে কথা বলিয়াছিলেন, প্রেম সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। প্রেমের স্বরূপ সমগ্রভাবে না দেখিয়া অনেকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখেন। সেই জন্য কেহ বা বলেন, শারীরিক সম্ভোগেই প্রেমের পর্য্যবসান। কেহ বলেন, ইহা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার এবং যোগিজনসুলভ ধ্যানমাত্রাবলম্বী। কেহ বলেন, ইহা ইন্দ্রিয়জ প্রবৃত্তিমাত্র। কেহ বলেন, ইহা এক অতীন্দ্রিয় মনোজ ভাব। কিন্তু যে কেন্দ্রভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে এই শরীর, মন, সম্ভোগ এবং প্রীতি, আলিঙ্গন এবং ধ্যান একটি সমগ্র সত্তার অবিচ্ছেদ্য

অঙ্গরূপে প্রতিভাত হয়, সে কেন্দ্রভূমিতে এই সকল ভিন্নমতাবলম্বী বিরোধিবর্গের কেহই উপনীত হয়েন নাই।

সেখান হইতে যেরূপ প্রতিভাত হয়, একজন ইংরাজ কবি—শ্রীমতী এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং—"Inclusions" নামক একটি ক্ষুদ্র কবিতায় তাহা অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত করিয়াছেন।

"Oh, wilt thou have my hand, Dear,
to lie along in thine ?
As a little stone in a running stream,
it seems to lie and pine.
Now drop the poor pale hand, Dear,
unfit to plight with thine.

Oh, wilt thou have my cheek, Dear,
drawn closer to thine own ?
My cheek is white, my cheek is worn,
by many a tear run down.
Now leave a little space, Dear,
lest it should wet thine own.

Oh, must thou have my soul, Dear,
commingled with thy soul ?
Red grows the cheek, and warm the hand ;
the part is in the whole ;
Nor hands nor cheeks keep separate,
when soul is joined to soul."*

---

* হে প্রিয়তম, আমার এই হাতখানি কি তোমার ঐ হাতের উপরে ফেলিয়া রাখিতে চাও ? এই দেখ, স্রোতের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র উপলখণ্ডের মত আমার এই করতল মুহ্যমানভাবে পড়িয়া আছে, এই ক্ষীণ পাণ্ডুবর্ণ হস্ত তুমি পরিত্যাগ কর প্রিয়তম, এ তোমার সহিত সম্মিলিত হইবার যোগ্য নহে।

হে প্রিয়তম, আমার এই কপোল কি তোমার কপোলের নিকটে আকর্ষণ করিতে চাও ? দেখ, আমার বিবর্ণ কপোল অশ্রুজলধারায় ক্ষীয়মান—মধ্যে ব্যবধান রাখিয়া দাও প্রিয়তম, নহিলে অশ্রুজলে তোমার কপোলও সিক্ত করিয়া দিবে।

হে প্রিয়তম, আমার এই হৃদয় কি তোমার হৃদয়ের সহিত এক করিতে চাও ? আমার বিবর্ণ কপোল রক্তিম হইয়া উঠিল, আমার অসাড় হস্তে জীবনের উত্তাপ সঞ্চারিত হইল। সমগ্রের মধ্যেই অংশ আছে;

যখন হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়, তখন শরীর দূরে পড়িয়া রহে না ; তখন স্বতই বাহু বাহুর নিকটে আকৃষ্ট হয়, কপোল কপোলে আসিয়া সংলগ্ন হইতে চাহে। দেহ মন আত্মা একত্র হইয়া জমাট্‌ বাঁধিয়া গিয়াছে। ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতে গেলে প্রেমকে সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। প্রেমের মধ্যে এই সকলই অত্যন্ত অবিচ্ছেদ্য ভাবে একীকৃত হইয়াছে।

এখন, যে কবি তাঁহার কাব্যে প্রেমকে তাহার এই স্বাভাবিক অখণ্ড মহিমায় যেরূপ ফুটাইয়া তুলিতে পারেন, সেই অনুসারে তাঁহার কাব্যের গৌরব। যিনি প্রেমকে কেবলমাত্র শারীরিক শৃঙ্গারসম্ভোগে অভিব্যক্ত করেন, তাহার সহিত অন্তরের কোনপ্রকার সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহার মহত্ত্ব নাই—তিনি এমন একটি সীমাবদ্ধ ব্যাপারের মধ্যে তাঁহার কাব্যকে স্থাপন করেন, যেখানে অক্লান্ত আনন্দ সম্ভোগের স্থান নাই, যেখানে মানবহৃদয়ের তৃপ্তি অতি শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়। যে কবি শরীরের উপরে প্রেমের প্রতিষ্ঠা না করিয়া তাহাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহারই কাব্যে সম্ভোগের প্রসর অনন্ত বিস্তৃত। কান টানিলে যেরূপ মাথা আসিয়া পড়ে, অন্তরের প্রেম সেইরূপ মনের সহিত সমস্ত শরীরকেও টানিয়া আনে, এবং সেই সঙ্গে শরীর মনের অতীত এক অপরিসীম আনন্দলোকের অপরূপ সৌন্দর্য্যজ্যোতি দীপ্যমান হইয়া উঠে। কিন্তু যাঁহারা শরীরকে হেয়জ্ঞানপূর্ব্বক পূর্ব্ব হইতেই মনকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া প্রেমকে ধ্যানমাত্রে অভিব্যক্ত করিতে চাহেন, তাঁহাদের সে প্রেম আকারবিহীন নিষ্ফল। কারণ, প্রেমের ধর্ম্মই এই যে, সে প্রিয়জনকে দর্শন করিতে চাহে, স্পর্শ করিতে চাহে, তাহার কাছাকাছি থাকিতে পারিলে সুখানুভব করে। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিতে গেলে, শরীরমাত্রগত সম্ভোগ ও দর্শনস্পর্শনাকাঙ্ক্ষাহীন অতিসূক্ষ্ম ধ্যানমাত্রগত সম্ভোগ—মৃতদেহ ও প্রেতাত্মা—উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত করিতে অক্ষম। জীবন্ত মানবই—আত্মাধিষ্ঠিত দেহই—মানবের শরীর মন আত্মাকে সমগ্রভাবে আকর্ষণ করিয়া মনুষ্যত্বকে সফল করিতে পারে।

এই সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণ প্রেমের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তানুসারেই আমরা প্রেমসাহিত্যে গীতগোবিন্দের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব। এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, গীতগোবিন্দে অঙ্গে অঙ্গে যে মদনতরঙ্গ উঠিয়াছে, তাহার পরিতৃপ্তি কোথায়।

অঙ্গের সম্বন্ধ আছে বলিয়া পাঠকেরা বিচলিত হইবেন না। মনের সহিত এই দেহও দেবতারই দান। এবং প্রেমের পুণ্য হোমাগ্নিতে মন ও বাক্যের সহিত শরীরও চিরদিন

করতলের সহিত করতল, এবং কপোলের সহিত কপোল বিচ্ছিন্ন থাকিতে পারে না, যখন হৃদয়ের সহিত হৃদয় সংযুক্ত হয়।

আহুতি প্রদত্ত হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইন্ধনে যেমন হোমাগ্নি সংরক্ষিত হইলেও সেই অগ্নিশিখা দেবতার উদ্দেশে উত্থিত হয় বলিয়াই তাহার গৌরব, প্রেমাগ্নিও সেইরূপ অঙ্গে অঙ্গে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়া যে অন্তরতম গভীরতম পুণ্য আকাঙ্ক্ষার দিকে নির্দ্দেশ করে, তাহাতেই তাহার এত মাহাত্ম্য।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে বিদ্যাপতির কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিদ্যাপতির কবিতা নব্য রুচি অনুসারে সর্ব্বত্র যে খুব শ্লীল, তাহা বলা যায় না। এবং তাঁহার কাব্যে শরীরের প্রতি শরীরের আকর্ষণ যথেষ্ট সূচিত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সাহিত্যক্ষেত্রে বিদ্যাপতির কবিতার স্থান বহু উচ্চে। কারণ এই যে, তাঁহার কবিতায় শরীর শরীরের সহিত মিলিত হইয়া সেই প্রেমকেই চরিতার্থ করিবার প্রয়াস পাইয়াছে, যে প্রেম যতই প্রগাঢ় হয়, ততই অপরিতৃপ্ত এবং ততই তাহার সম্ভোগানন্দ।

সখি রে, কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুনমু
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধু-যামিনী রভসে গোয়ায়নু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল॥
যত যত রসিক জন রস অনুমগন,
অনুভব কাহ না পেখ।
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল এক॥

এখানে কেবলমাত্র প্রেমের শীতল ইন্ধন সংগৃহীত হয় নাই, কিন্তু সেই দীপ্ত অগ্নিশিখা বহু উর্দ্ধে উঠিয়া চতুর্দ্দিকে আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। শুদ্ধ শরীরমাত্র সম্ভোগ হইলে অনুরাগ তিলে তিলে এমন নূতন হইয়া উঠিত না, প্রতি মুহূর্ত্তে ম্লান ও জীর্ণ হইয়া পড়িত। রূপ দেখিতে দেখিতে নয়ন তৃপ্ত হইয়া আসিত, কথা শুনিতে শুনিতে শ্রবণ অসাড় হইয়া পড়িত, হৃদয় হৃদয়ের উপরে ভার বোধ হইত, এবং কেলি ক্লান্তিতে পরিণত হইতে বিলম্ব হইত না। শ্রান্তি শরীরের ধর্ম্ম। কিন্তু অন্তরের প্রেম এ ক্ষণিক সম্ভোগমাত্র নহে।

অন্তরও রূপ দেখে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে না। লক্ষ লক্ষ যুগ ধরিয়া প্রিয়জনকে হৃদয়ে রাখিয়াও তাহার পরিতৃপ্তি নাই। সে প্রগাঢ় প্রেম কেলিকলামাত্রে চরিতার্থ হয় না; সে যতই পায়, ততই চায় এবং প্রিয়জনকে প্রাণপণে যতই বক্ষে চাপিয়া ধরে, কিছুতেই মনের মত করিয়া পায় না।

জয়দেবে এই চির-অতৃপ্ত প্রগাঢ়তা কোথাও চোখে পড়ে না। গীতগোবিন্দ পাঠান্তে মনে হয়, ন্যায়শাস্ত্রবর্ণিত অন্ধের ন্যায় প্রেমের বিপুল বহুল বহিরঙ্গেই জয়দেব হাত বুলাইয়া গিয়াছেন; তিনি খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্তভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন, অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলিস্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, সে ধূলি পুষ্পরেণুর ন্যায় সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য্যরাজ্যের পথে বাধাস্বরূপ।

এই সহজপরিতৃপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্ভোগবিলাস কতকগুলি চিরপ্রচলিত শরীরসম্বন্ধীয় উপমাসন্নদ্ধ হইয়া এক মেরুদণ্ডবিহীন ললিত গলিত ছন্দের উপর ভর করিয়া নিতান্ত পিচ্ছিল কোমল পদাবলীর উপর দিয়া স্খলিত ও লুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

ছন্দও যেমন পিচ্ছিল, জয়দেবের সুন্দরীগণের যৌবনসন্নদ্ধ অঙ্গসমূহ তদপেক্ষা অধিক পিচ্ছিল, এবং এই সুদীর্ঘ শৃঙ্গারকলুষ বর্ণনায় পাঠকের মনে সে সৌন্দর্য্যও সামান্যমাত্রও বসে না। শ্লোকের পর শ্লোক ধারাবাহিক সমভাবাপন্ন শৃঙ্গার-প্রতিধ্বনি মাত্র। সর্গের পর সর্গ—হয়, সখীমুখে, নয়, রাধামুখে, নয়, কৃষ্ণমুখে—সেই একই কথা। কখনও সখী অন্তরাল হইতে রাধিকাকে দেখাইয়া দেয় যে, সহস্র গোপবালাগণের নিবিড় আলিঙ্গনভরে কৃষ্ণের বক্ষস্থল কিরূপ নিপীড়িত হইতেছে; কখনও বা রাধা সখীর নিকট আত্মমনোরথ ব্যক্ত করিতে করিতে অনঙ্গবিলাসের প্রত্যেক অঙ্গ বর্ণনা করিয়া যান। পরের সর্গে শ্রীকৃষ্ণ রাধার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী অবলম্বনে অনঙ্গকে অঙ্গবদ্ধ করিয়া তুলেন। আবার সখী আসে, সখী যায়—এবং প্রত্যেকেই বার বার সেই একই চুম্বন, কটাক্ষ, পঞ্চশর ও তদ্‌দানুষঙ্গিক যাবতীয় পীবর বিলাস বর্ণনা করে। এবং এইরূপে প্রভাতকালে খণ্ডিতা রাধিকার হৃদয়ে মানের আবির্ভাব ও সখীজনমুখে পল্লবশয্যাগত কন্দর্পবিলাসের সুখশ্রবণে সন্ধ্যাকালে রাধার সম্পূর্ণ ভাবান্তরের মধ্য দিয়া অনঙ্গবিলাস বর্ণনার পর বর্ণনায় অগ্রসর হইতে থাকে। এবং এই শ্লোকশ্রেণীর মধ্য দিয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইতে না হইতে পাঠকের মনে শ্রান্তি ও তদানুষঙ্গিক বিরক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই বিরক্তি উদ্রেকের একটা প্রধান কারণ এই যে, জয়দেবের কবিতা ক্রমাগত কর্ণে ইন্দ্রিয়তৃপ্তিজনক শব্দ বর্ষণ করিয়া যায়, কিন্তু কল্পনাপটে কোন চিত্র অঙ্কিত করে না। ইন্দ্রিয়ের উপভোগশক্তি সীমাবদ্ধ, সে অতি অল্পেই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়ে।

বিশেষতঃ জয়দেবের দীর্ঘ ছন্দের মধ্যে কাঠিন্যলেশ না থাকাতে বৈচিত্র্য অভাবে চিত্তকে শীঘ্রই অসাড় করিয়া ফেলে। চিত্রের দ্বারাও মন আকৃষ্ট হয় না, শব্দবৈচিত্র্যেও কর্ণ জাগ্রত হয় না, অনুপ্রাসসঙ্কুল অবিরলতরল বাক্যবিন্যাসে মানসরসনার রসবোধ ক্রমশ যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া আসে।

গীতগোবিন্দের গীত-অংশে চিত্র নাই, কেবল ধ্বনি আছে। ধ্বনির দ্বারা চিত্র এবং ভাবের উদয় করা বিশুদ্ধ সঙ্গীতের কার্য্য। কবিতার ছন্দোবন্ধের মধ্যে যেটুকু ধ্বনি থাকিতে পারে, সঙ্গীতের তুলনায় তাহা অসম্পূর্ণ—এই কারণে কবিতায় ছন্দের ঝঙ্কার ব্যতীতও ভাবপ্রকাশের অন্য উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।

কিন্তু গীতগোবিন্দের গানগুলিতে ঝঙ্কার বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। বর্ণনাগুলি নিতান্ত সাধারণভাবে। একজন অন্ধও সেরূপ বর্ণনা কেবল জনশ্রুতি অবলম্বনে লিখিতে পারেন। তাহাতে কবির সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ এবং স্বাভাবিক প্রতিবিম্বগ্রাহিতা নাই। বসন্তবর্ণনায় "ললিতলবঙ্গলতাপরিশীলনকোমলমলয়সমীরে" কেবল লকার-লসিত ধ্বনির লহরীলীলা মাত্র, তাহা কোন নির্দ্দিষ্ট চিত্র নহে।

কবিতায় চিত্র কাহাকে বলে, তাহা জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দের সূচনাশ্লোকের প্রথম দুই ছত্রে প্রকাশ করিয়াছেন ঃ—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ————————————।

নিম্নে বনভূমি তমালদ্রুমে শ্যাম, এবং ঊর্দ্ধে আকাশ মেঘে মেদুর, এবং সময় রাত্রি। অন্ধকারের উপর অন্ধকার—তাহার উপর সুগম্ভীর শব্দের এবং মেঘমন্দ্র ছন্দের ঘনঘটা। একমাত্র "নক্তং" শব্দ, তাহার ক্রিয়া নাই, বিশেষণ নাই, আনুষঙ্গিক পদ নাই, কেবল একটি কথামাত্রে একটি অখণ্ড তামসী রাত্রি দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক, গীতগোবিন্দ প্রকৃতই গীত। তাহা সুরসংযোগে গেয়। একদিন তাহা রাজসভায় গীত হইয়াছিল। সে রাগিণী অদ্য আমাদের নিকট মৌন—সুতরাং আমাদের নিকট গীতগোবিন্দ অসম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, গীতে যেরূপ বাক্যবিন্যাস হওয়া উচিত, গীতগোবিন্দ তাহার আদর্শস্থল। সঙ্গীতে আমাদের মনে যেরূপ ভাবের উদ্রেক করে, তাহা চিত্রের ন্যায় সুনির্দ্দিষ্ট নহে। তাহা একপ্রকার অব্যক্ত অথচ সুতীব্র ; অগ্নিশিখার ন্যায় তাহার উত্তাপ এবং আলোক এবং স্পন্দন আছে, কিন্তু তাহার আকার, আয়তনের কাঠিন্য এবং নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা নাই—তাহাকে প্রবলভাবে অনুভব করিতে পারি অথচ মুষ্টির মধ্যে গ্রহণ করিতে পারি না।

এই জন্য গানের কথা অত্যন্ত সরল এবং সাধারণ ভাবের হওয়া উচিত। নতুবা কথা সুরের অনুগামী না হইয়া স্বপ্রধান হইয়া উঠে। কথা যদি ভাবকে কোন বিশেষরূপে সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়, তবে সঙ্গীত সেই বন্ধনে পীড়িত হইতে থাকে।

গীতগোবিন্দের ভাষা সর্ব্বাংশেই সঙ্গীতের সহায়তা করিয়াছে, কোথাও প্রতিকূলতা করে নাই। অনুপ্রাসে এবং কথার লালিত্যে সঙ্গীতের ঝঙ্কার বর্দ্ধিত করিয়া তোলে এবং ভাবের বিরলতা ও সরলতায় রাগরাগিণী অব্যাহতভাবে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে।

সঙ্গীতে চিত্রবৈচিত্র্য এবং কল্পনাকৌশলের স্থান নাই, কেবল সাধারণভাবে একটি স্থায়ী রস অবলম্বন করা আবশ্যক। জয়দেব শৃঙ্গাররস আশ্রয় করিয়াছেন—এবং এই রসকেই স্বরোচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত করিয়া তুলিয়াছেন।

এই শৃঙ্গারসম্ভোগই গীতগোবিন্দের দেহ অথবা প্রাণ, যাহা বল। এবং সমালোচকেরা ইহাতেই জয়দেবের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ, ইহা জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনির্ব্বচনীয় আধ্যাত্মিক মিলনেরই শরীরী রূপক। এবং জয়দেব নিজেই বলিয়াছেন যে, যদি হরিস্মরণে মন সরস হয়, তবে জয়দেব-সরস্বতী শ্রবণ কর।

সুতরাং শারীরিক সম্ভোগেরই বর্ণনা বলিয়া গীতগোবিন্দকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্য বলা যায় না। কবি যদি সেই ঈশ্বরের ভাবে তন্ময় হইয়া সাধারণ সম্ভোগের ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাতে এমনই কি দোষ হইয়াছে? হাফেজ ত বার বার মদিরাপানের কথা বলিয়াছেন এবং মর্ত্ত্য বিরহের ভাষাতেই প্রিয়জনের জন্য বিলাপ করিয়াছেন। তাঁহাকে ত কেহ সে জন্য অপরাধী করে না।

বাস্তবিক, ভাবুকের অন্তরে এমন একটি স্থান আছে, যেখানে আসিয়া মনুষ্যত্বের সহিত দেবত্বের মিলন সংঘটিত হয়। এবং সেই সঙ্গমক্ষেত্রের ভাষা মানবকবির রচনায় কতকটা এই মর্ত্ত্য প্রেম ও সম্ভোগের ভাষারই অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক স্পর্শ করে না—কেবল হৃদয়ের একটি নিবিড় প্রগাঢ়তা ব্যক্ত হয়, যে তন্ময়ী প্রগাঢ়তা এই মর্ত্ত্যধামে দম্পতির শরীর মনের ব্যবধান ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয় হৃদয়ের ও সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে।

কেবলি যে, দাম্পত্য প্রেমেই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্বন্ধ ব্যক্ত হয়, এমনও নহে। সকল প্রেমই যাঁহা হইতে নিঃসৃত, সেই প্রেমস্বরূপকে প্রেমের যে কোন ভাবে উপলব্ধি কর, তিনি তাহাতেই প্রকাশমান। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে মাতৃভাবে দেখিয়া তাঁহার সহিত পুত্রের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীতে এই মাতাপুত্রভাব মর্ত্ত্য মাতাপুত্রেরই ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্ম ঈশ্বরকে নানা ভাবে দেখিয়াছে। এবং বৈষ্ণব সঙ্গীতে মানবভাবই প্রগাঢ় হইয়া সেই সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছে। এই যে রাধাকৃষ্ণের রূপক,

ইহা ত সেই বৈষ্ণব ধর্ম্মেরই অঙ্গ। বৈষ্ণব জয়দেব গোস্বামী যদি ইহা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তাহাতে ঈশ্বরতন্ময়তার পরিবর্ত্তে শরীরতন্ময়তাই প্রকাশ পাইবে কেন?

কারণ এই যে, জয়দেব ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া গীতগোবিন্দ রচনা করেন নাই। হরিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় ত তাঁহার লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বিলাসকলায় কুতূহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না। আধ্যাত্মিক সমালোচকেরা স্বপক্ষে যে শ্লোকের কিয়দংশমাত্র উদ্ধৃত করিয়া থাকেন, সেই শ্লোকটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলেই পাঠকেরা ইহার প্রমাণ পাইবেন।

যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাসকলাসু কুতূহলং।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং শৃণু তদা জয়দেবসরস্বতীং ॥

সুতরাং জয়দেব যে, হরিস্মরণ এবং বিলাসকলা, উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্ব্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরিস্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। এবং গীতগোবিন্দের কবিও এই মানবস্বভাবসুলভ দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিতে পারেন নাই বলিয়া আশঙ্কা হয়।

তিনি রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে সেই যে কুঞ্জপ্রবেশ করিয়াছেন, তদবধি এই বিলাসকলাই রচনা করিতেছেন। এবং তাঁহার কাব্যে আদিরসের সমস্ত বাহ্য উপকরণই সংগৃহীত হইয়াছে, কেবল কবির যে আত্মবিস্মৃতিটুকু থাকিলে এই সমস্ত বিলাসকলাও সরল ভাবে নিষ্কলঙ্ক হইয়া উঠিত, তাহাই নাই।

এই অতি সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে। শৃঙ্গাররসও নহে, সম্ভোগবর্ণনাও নহে, মদনতরঙ্গও নহে, মানবদেহও নহে।—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে নব্য রুচির বিরুদ্ধ ভাষায় এমন অনেক কথা স্পষ্ট করিয়াই উল্লেখ আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋগ্বেদের পুরুরবা ও উর্ব্বশী উপাখ্যানের উল্লেখ করা যাইতে পারে।* ঋগ্বেদের এই নগ্ন বর্ণনায় অশ্লীলতা, রুচি অরুচি, শরীর মন, এ সমস্ত অতি সূক্ষ্ম ভেদাভেদ লুপ্ত হইয়া গিয়া হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসে এমন একটি দীপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে, যাহাতে সমস্ত পাপ, সমস্ত অবিশুদ্ধি নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া যায়।

জয়দেবে এই সহজ স্বাভাবিকতাটুকু নাই। সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ঠারই সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য।

* ৮ অষ্টক, ৫ অধ্যায়, ১০ মণ্ডল, ৯৫ সূক্ত।

নহিলে, মানবের শরীরও হেয় নহে, উলঙ্গতাও অপবিত্র নহে। উলঙ্গ যোগীকে দেখিয়া কেহ ত সঙ্কোচ অনুভব করে না। বরঞ্চ সেই নগ্ন দেহই পুণ্যদর্শন বলিয়া গণ্য হয়। উলঙ্গ শিশু কাহারও চক্ষে অপবিত্র নহে। এবং বন্য মানবের উলঙ্গতাও অশোভন বলিয়া গণ্য হয় না। কারণ আর কিছুই নহে, ইহার মধ্যে কোনরূপ ঠার নাই, ইঙ্গিত ইসারা নাই, নাগরিকতা নাই।

গ্রীসীয় নগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিয়া কেহ ত অশ্লীল বলে না। প্রকৃতির অন্তর হইতে সেই নগ্ন গঠন যেন স্বভাবতই অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার আবরণ নিষ্প্রয়োজন। আবরণের কথা সেখানে মনেই আসে না।

কিন্তু এই গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির পার্শ্বে ফরাসী চিত্রশালার একখানি নগ্নদেহ চিত্র স্থাপিত কর, সে অকুণ্ঠিত সম্ভ্রম নাই, সে দীপ্ত গৌরব নাই। ফরাসী চিত্রকর ঐ নারী-মূর্ত্তির সর্ব্বাঙ্গ হইতে বসন স্খলিত করিয়া দিয়া পায়ে হয় ত জুতা রাখিয়াছেন, কিম্বা এমন করিয়া এমন কিছু রাখিয়াছেন, যাহাতে এই বর্ত্তমান শতাব্দীর বসনভূষণের একটি ভাব মনে করাইয়া দেয় এবং এই বিবসনতার মধ্যে একটা সচেতন উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করে।

বৈদিক পুরুরবা ও উর্ব্বশী চিত্রের পার্শ্বে জয়দেবের সম্ভোগচিত্রাবলী এইরূপ। এবং হরিস্মরণ ত দূরের কথা, মনুষ্যত্বেরও বিকাশ এখানে অত্যন্ত সঙ্কুচিত। এই গীতগোবিন্দে গীত থাকিতে পারে, কিন্তু গোবিন্দ আছেন কি না, আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে। ['সাধনা,' ফাল্গুন, ১৩০০]

পশুপ্রীতি

প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের সহিত সমস্ত জীবজগতের প্রতি একটি প্রগাঢ় সহানুভূতি দেখা যায়। গোযূথ, চক্রবাকমিথুন, কলহংস এবং মৃগশাবক সংস্কৃত সাহিত্যরাজ্যের একটি সুবৃহৎ সামাজিকতার মধ্যে কেমন সুন্দর স্থান অধিকার করিয়া আছে —মানুষের সুখদুঃখ এবং দৈনন্দিন ঘটনার মধ্যে তাহারা কেমন সহজে অবাধে বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তাহারা আমাদের যেন পর নহে, ঘরের লোকের মত।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে পশুজাতির প্রতি মমতা ব্যক্ত হয় নাই, এ কথা বলিলে নিতান্তই অত্যুক্তি হইয়া পড়ে। মূষিককে সম্বোধন করিয়া কবি বার্ণ্সের যে করুণার্দ্র বাৎসল্যপূর্ণ কবিতাটি আছে, তাহার তুলনা অন্য দেশের কোন কবিতায় পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সংস্কৃতসাহিত্যে ত দেখা যায় না।

কিন্তু আমার বিবেচনায় না থাকিবার একটি কারণ আছে। কবি বার্ণ্‌সের যে কবিজন-সুলভ মমত্ব, তাহা যেন চতুর্দ্দিকের নির্দ্দয়তার নিপীড়নে কিছু সচেতন বেগে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি জানেন, এই অসহায় জীবকে কেহ দয়ার চক্ষে দেখে না, তিনি জানেন, অকারণে খেলাচ্ছলে পশুহত্যা মানুষের আমোদের একটা অঙ্গ হইয়া গেছে, সেই জন্য চতুর্দ্দিক্ হইতে বাধা এবং ব্যথা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার দয়া এমন প্রবলভাবে স্নেহসঙ্গীতে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃতসাহিত্যে কবিহৃদয়ের দয়া চতুর্দ্দিকের সমাজ কর্ত্তৃক সেই বেদনা প্রাপ্ত হয় নাই, এই জন্য তাহা উচ্ছ্বসিত গীতে পরিণত হইতে পারে নাই, তাহা কেবল একটি আত্মবিস্মৃত অচেতন স্নেহে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে। প্রকৃতি, পশু এবং মানব একটি সহজ প্রেমে যেন এক গার্হস্থ্যের অঙ্গ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

প্রাচীন ভারতবর্ষে যে মৃগয়া ছিল না তাহা নহে, কিন্তু ক্রীড়ার্থে পশুহনন কেবল রাজাদের মধ্যে বদ্ধ ছিল—সাধারণ হিন্দুপ্রকৃতির সহিত উক্ত কার্য্যের যেন একটা অসামঞ্জস্য ছিল। সেই জন্য মৃগয়ায়—অন্য দেশের কবি যেখানে অশ্বের হ্রেষারবে ও কুক্কুরগণের উল্লাসকোলাহলে উৎসাহিত হইয়া শোণিতাক্তকলেবর পলায়মান পশুর পশ্চাতে জয়োল্লাসে ধাবমান হয়েন—সংস্কৃত কবির করুণ হৃদয় সেই প্রাণভয়ে পলায়মান আর্ত্তের দুঃখে বিগলিত হইয়া আসে এবং তাঁহার শিকারদৃশ্য উল্লাসের পরিবর্ত্তে করুণাই উদ্রেক করে।

কাদম্বরীর প্রারম্ভেই ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত আছে। শুকমুখে বাণভট্ট যেখানে ব্যাধগণের অত্যাচার উপদ্রবের বর্ণনা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার এই সহৃদয়তা, পশু-জগতের প্রতি—অহিংসা মাত্র নহে—আন্তরিক নিবিড় অনুরাগ, বর্ণনার পর বর্ণনায় প্রতি ছোটখাট ঘটনার উল্লেখে কেমন প্রগাঢ় হইয়া ফুটিয়াছে।

সেই যমদূতসদৃশ বিকটমূর্ত্তি জবালোহিতচক্ষু নিষ্ঠুর শবরসেনা, নরকের দ্বারপালসদৃশ ভীষণ সেনাপতি, প্রাণভয়ে পলায়মান সিংহ, মাতঙ্গ, কুরঙ্গগণের গর্জ্জন ও চীৎকারে আলোড়িত বনরাজি, জরচ্ছবরের নৃশংস পক্ষিবধব্যাপার ও নিরীহ পক্ষিকুলের অন্তরে দারুণ ভীতিসঞ্চার, প্রতি বর্ণনায় বাণভট্টের অন্তর হইতে বাণবিদ্ধ হরিণের ন্যায়, পাশবদ্ধ পক্ষিশাবকের ন্যায় একটি করুণ আর্ত্তনাদ বাহির হইয়াছে, যে করুণ স্বরে ব্যাধগণের সমস্ত উল্লাসকোলাহল ডুবিয়া গিয়াছে।

কাদম্বরীর গ্রন্থকার যে অধিক হা হুতাশ করিয়াছেন তাহা নহে, এবং মৃগয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া অহিংসার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দীর্ঘ নীতি-উপদেশও প্রদান করেন নাই, কিন্তু অত্যন্ত সহজভাবে সমস্ত বর্ণনায় একটি গভীর সহানুভূতি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। বৃদ্ধ শবরের পক্ষিবধ-বর্ণনার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলে বোধ করি ক্ষতি নাই।

কিমিব হি দুষ্করমকরুণানাং যতঃ স তমনেকতালতুঙ্গমভ্রঙ্কষশাখাশিখরমপি সোপানৈরিবা-যত্নেনৈব পাদপমধিরুহ্য তানমুপজাতোৎপতনশক্তীন্, কাংশ্চিদল্পদিবসজাতান্ গর্ভচ্ছবিপাটলান্ শাল্মলিকুসুমশঙ্কামুপজনয়তঃ, কাংশ্চিদুদ্ভিদ্যমানপক্ষতয়া নলিনসংবর্ত্তিকানুকারিণঃ কাংশ্চিদর্কোপল-সদৃশান্, কাংশ্চিল্লোহিতায়মানচঞ্চুকোটীন্ ঈষদ্বিঘটিতদলপুটপাটলমুখানাং কমলমুকুলানাং শ্রিয়মুদ্বহতঃ, কাংশ্চিদনবরতশিরঃকম্পব্যাজেন নিবারয়ত ইব, প্রতীকারাসমর্থান্, একৈকশঃ ফলানীব তস্য বনস্পতেঃ শাখাসন্ধিভ্যঃ কোটরান্তরেভ্যশ্চ শুকশাবকানগ্রহীৎ, অপগতাসূংশ্চ কৃত্বা ক্ষিতাবপাতয়ৎ।

এই পক্ষিশাবকগুলির বর্ণনাই কি সকরুণ! কেহ এখনও উড়িতে শিখে নাই, কেহ অতি অল্পদিন হইল জন্মিয়াছে, সেই জন্য গর্ভচ্ছবিপাটলবর্ণ—যেন শাল্মলীকুসুমগুলির মত, কাহারও অল্প অল্প নূতন ডানা যেন পদ্মের নবদলের মত উঠিয়াছে, কাহারও লোহিতায়মান ক্ষুদ্র চঞ্চু যেন পদ্মকলির একটুখানি খোলা মুখটুকুর মত, কেহ বা অবিরত শিরঃকম্প দ্বারা এই নিষ্ঠুরকে যেন তাহার অকরুণ কার্য্যে নিবারণ করিতে চাহিতেছে। এই সমস্ত প্রতীকারে অসমর্থ বিহগশিশুগুলিকে যেন এক একটি ফলের মত বনস্পতির শাখাসন্ধি হইতে, কোটরাভ্যন্তর হইতে বাহির করিয়া নিষ্ঠুর শবর যখন গ্রীবা মোটনপূর্ব্বক ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিল, কবির হৃদয়ে তখন কি শেলই বিঁধিতেছিল!

সেই জীর্ণ শাল্মলী-তরুকোটরে বহু যুগ ধরিয়া বহু পক্ষিবংশ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিয়া আসিতেছে। প্রভাত হইলে তাহারা দিকে দিকে আহারান্বেষণে বহির্গত হয় এবং আহারানন্তর প্রত্যাগত হইয়া কুলায়াবস্থিত শাবকদিগকে চঞ্চুপুটের দ্বারা শালিধান্যমঞ্জরী খাওয়াইয়া দেয় এবং শাবককে ক্রোড়ান্তে নিহিত করিয়া সেইখানেই দীর্ঘ নিশা যাপন করে।

একটি জীর্ণ কোটরে একটি বৃদ্ধ শুকদম্পতি বাস করিত। বৃদ্ধবয়সে তাহাদের একটি সন্তান হয়। প্রবল প্রসববেদনায় অভিভূত হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহার জননী প্রাণত্যাগ করিল। বৃদ্ধ পত্নীবিয়োগে অতিমাত্র কাতর হইলেও সুতস্নেহবশতঃ শাবকের লালনপালন ও তৎসম্বর্দ্ধনে যত্নবান্ হইয়া একাকী কায়ক্লেশে দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিতে লাগিল। বয়সের আধিক্যহেতু ও বহুদিনের অনভ্যাসবশতঃ তাহার আর উড়িবার শক্তি ছিল না। নব শেফালিকাকুসুমবৃন্তের ন্যায় পিঞ্জরবর্ণ চঞ্চুপুট দ্বারা পরনীড়নিপতিত শালিবল্লরী হইতে তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিয়া ও তরুমূলনিপতিত শুককুলাবদলিত ফলশকল সংগ্রহ করিয়া শাবককে আহার করাইত এবং শাবকের ভুক্তাবশিষ্ট নিজে আহার করিত।

সে দিন প্রভাতে মৃগয়াকোলাহলে জাগিয়া উঠিয়া শবরকে তরু অভিমুখে আসিতে দেখিয়া বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর ভয়ে দ্বিগুণতর কম্পিত হইতে লাগিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, এবং অশ্রুপরিপ্লুত ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সন্তানস্নেহপরবশ বৃদ্ধ, শাবককে পক্ষপুটে আচ্ছাদিত করিয়া প্রাণপণে বক্ষতলে চাপিয়া রহিল। শবর যখন

তাহার কুলায়সমীপে আসিয়া কোটরের মধ্যে স্বীয় বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধী অনবরত কোদণ্ডগুণাকর্ষণহেতু ব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠ যমদণ্ডসদৃশ বাম বাহু প্রবেশ করাইয়া দিল, বৃদ্ধ চঞ্চুদ্বারা তাহাকে যথাশক্তি আঘাত করিল, কিন্তু সে বাহুপাশ ছাড়াইতে পারিল না। শবর তাহাকে বাহির করিয়া বধ করিল এবং বক্ষতলে শিশু সহ বৃদ্ধ শুক ভূমিতলে নিক্ষিপ্ত হইল।

এই শিশু শুক কালক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজসন্নিধানে আপন পিতার অবস্থা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছে ঃ—

> তাতস্তু তং মহান্তমকাণ্ড এব প্রাণহরমপ্রতীকারমুপপ্লবমুপনতমবলোক্য দ্বিগুণতরোপজাত-বেপথুঃ, মরণভয়াদুদ্‌ভ্রান্ততরলতারকাং বিষাদশূন্যামশ্রুজলপ্লুতাং দৃশ.মিতস্ততো দিক্ষু বিক্ষিপন্, উচ্ছুষ্কতালুরাত্মপ্রতীকারাক্ষমঃ, ত্রাসস্রস্তসন্ধিশিথিলেন পক্ষপুটেনাচ্ছাদ্য মাং তৎকালোচিতপ্রতীকারং মন্যমানঃ, স্নেহপরবশো মদ্রক্ষাকুলঃ কিংকর্ত্তব্যতাবিমূঢ়ঃ ক্রোড়ভাগেন মামবষ্টভ্য তস্থৌ। অসাবপি পাপঃ ক্রমেণ শাখান্তরৈঃ সঞ্চরমাণঃ কোটরদ্বারমাগত্য, জীর্ণাসিতভুজঙ্গভোগভীষণং প্রসার্য্য বিবিধবনবরাহবসাবিস্রগন্ধিকরতলমনবরতকোদণ্ডগুণাকর্ষণব্রণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠমন্তকদণ্ডানুকারিণং বামবাহুমতিনৃশংসো মুহুর্মুহুর্দত্তচঞ্চুপ্রহারমুৎকূজন্তং তমাকৃষ্য তাতমপগতাসুমকরোৎ।

এই দৃশ্যে কবির সহানুভূতি কোন্‌খানে, তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না। বৃদ্ধ শুক তাহার পত্নীবিয়োগের পর যে কত কষ্ট এবং কত স্বার্থত্যাগ স্বীকারপূর্ব্বক আপন শাবকটিকে প্রাণপণে পালন করিয়া আসিয়াছে এবং সেই অনেক দুঃখের পালিত সন্তানটিকে রক্ষা করিবার জন্য যে কি যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মরিল—এই বর্ণনাতেই কবিহৃদয় সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে। পক্ষিকুলের অন্তরের মধ্যে তিনি কেমন প্রবেশ করিয়াছেন! কেমন সহৃদয়তার সহিত সুন্দররূপে তিনি দেখাইয়াছেন যে, আমাদের সন্তান আমাদের নিকট যেমন প্রাণাধিক প্রিয়, পাখীর সন্তানও পাখীর কাছে ঠিক সেইরূপ! ভিন্নজাতীয় জীবের প্রতি করুণা সঞ্চার করিবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা কল্পনা অভাবে অন্য জীবের সুখদুঃখ অনুভব কবিতে পারি না, কবি যখন দেখাইয়া দেন, আমাদের জননীর বাৎসল্য, পিতার স্নেহ, জীবনের মমতা, ঐ ভাষাহীন পাখীর নীড়ের মধ্যেও আছে, তখন সেই "Touch of nature makes the whol world kin." তখন আমারের হৃদয় সমস্ত অনাথ জীবজন্তুর প্রতি আত্মীয়ভাবে ধাবিত হয়।

কেবলমাত্র কাদম্বরীতে নহে, জীবজগতের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি সংস্কৃত কাব্যে প্রায়ই দেখা যায়। রঘুবংশের নবম সর্গে মৃগয়ার মধ্যস্থলে রাজা দশরথের লক্ষ্য হইতে রক্ষা করিবার জন্য সহচরী হরিণী প্রিয়তম হরিণকে আড়াল করিয়া দাঁড়ায়, এবং তদ্দর্শনে কঠিন রাজহৃদয়েও দাম্পত্যের নিবিড় অনুরাগ ঘনাইয়া আসে; শিখিকুলের বর্হবৈচিত্র্যে মুগ্ধ

হইয়া উদ্যত বাণ তূণীরে ফিরিয়া আসে, এবং এই মৃগয়ামত্ততার মধ্যেও মানবহৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সকরুণ স্নেহ ক্ষরিত হইতে থাকে।

শকুন্তলার প্রথম দৃশ্যেও দুষ্মন্তের মৃগানুসরণে কালিদাসের এই গভীর সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে। নহিলে, উদ্যতবাণ দুষ্মন্তের মুখ দিয়া তিনি সেই গ্রীবাভঙ্গাভিরাম সৌন্দর্য্য বর্ণনা করাইবেন কেন? এরূপ সহৃদয়তার সহিত যে প্রাণভয়ে ধাবমান পশুর সৌন্দর্য্য অনুভব করে, চতুরা মৃগয়া তাহাকে কঠিন করিয়া তুলিতে পারে নাই।—ঋষি রাজাকে শরসন্ধানে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যে শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা যেন পশুবৎসল ভারতবর্ষের ব্যথিত হৃদয়ের ভাষা। আহা, এই হরিণকের অতিলোল জীবনটি কতটুকুই বা, আর কোথায় তোমার বজ্রসার শর—পুষ্পরাশির মধ্যে কি আগুন ধরাইতে আছে! কবি বড় করুণার সহিত এই কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে মৃগয়া আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা নিবারণের উদ্যত বাহু আছে—মনের সহিত সেই নিষ্ঠুর প্রমোদে কবি যোগ দিতে পারেন নাই।

কালিদাস পশুজগতের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তপোবনে কামধেনু নন্দিনীর সেবার কথা পাঠ কর। সেই অনিন্দ্যতনু ধেনুর নবকিসলয়দৃশ চিক্কণ পাটল বর্ণ ও ললাট-তটে প্রদোষসময়ের নবোদিত শশিকলাসদৃশ ঈষৎ বক্র শ্বেত রেখা বর্ণনা করিয়া কবি কত আনন্দ লাভ করিয়াছেন! রাজা যখন রথারোহণে গুরুগৃহে অথবা মৃগয়ায় বাহির হন, কালিদাস সমস্ত পথ তাঁহার অশ্বের নিভৃতোর্দ্ধকর্ণ নিষ্কম্পচামরশিখা গতিবেগসৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলেন; এবং কি বশিষ্ঠাশ্রমে, কি মালিনীনদীতীরে, রথ হইতে অবতরণকালে রাজমুখে অশ্বদিগকে বিশ্রাম করাইবার আদেশ দিতে কখনও ভুলেন না।

এই সহানুভূতি শকুন্তলার বিদায়দৃশ্যে—যেখানে হরিণশিশু বার বার অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে ধরিয়া রাখিতে চাহে এবং হরিণশিশুর স্নেহে শকুন্তলার নয়ন ছলছল করিয়া আসে—সেইখানেই সম্যক্ মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। নিপুণ চিত্রকর কালিদাস এইরূপে চতুর্দ্দিকের সুন্দর প্রকৃতির মধ্যস্থলে মানবের সহিত মৃগহৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বাঁধিয়া দিয়া যে একখানি সুন্দর চিত্র উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন, তাহার মর্ম্মস্থলে কবিহৃদয়ের অনেকখানি বেদনা, পশুজগতের প্রতি অনেকখানি সহানুভূতি যেন আপনা হইতে নিঃশব্দে সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে।

ভবভূতির নাটকেও এ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্কে সীতার পালিত করিশিশু ও ময়ূরবর্ণনায় এই অনুরাগ অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে। এবং সেই সঙ্গে প্রকৃতি, পশু এবং মানবের সম্মিলনে সংস্কৃত কবির হৃদয় কিরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহাও প্রকাশ পাইয়াছে।—শকুন্তলার চতুর্থ অঙ্কের সহিত উত্তরচরিতের তৃতীয় অঙ্ক,

বিদায় এবং পুনর্মিলন, দুই সম্পূর্ণ বিভিন্নবিষয়ক হইলেও, দৃশ্যাংশে নিতান্ত বিসদৃশ নহে। এবং ভাবের ঐক্যে উভয় নাটকের পাত্রপাত্রীগণও যেন এইখানে কতকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া আসে।

সংস্কৃত কাব্যের সর্ব্বত্রই জীবজগতের প্রতি এই উদার সহানুভূতি দেখা যায়—এবং ইহাতে ভারতবর্ষেরই অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়। বাস্তবিক জগতে কোথাও সিংহে হস্তীতে, ব্যাঘ্রে মৃগে সদ্ভাব দেখা যায় না, সেই জন্যই ভারতবর্ষীয় কবি আপনার হৃদয়ের অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা অনুসরণ করিয়া কাল্পনিক তপোবনের মধ্যে সর্ব্বজীবের হিংসাহীন মিলনভূমির আদর্শ রচনা করিয়াছেন। শকুন্তলার তপোবনে কেবল যে তরুলতার সহিত মনুষ্যের প্রীতিবন্ধন, কেবল যে মৃগশিশুর প্রতি ঋষিকন্যাদের মাতৃস্নেহ, তাহা নহে; নরবালকের সহিত সিংহশাবকের সাহচর্য্যে কবি সমস্ত প্রাকৃতিক হিংসার সম্পর্ক ভুলিবার এবং ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই আদর্শের অনুগত ধর্ম্ম যদি পৃথিবীর কোনও দেশে কোনও কালে পালিত হইয়া থাকে ত সে ভারতবর্ষে। আজি যে অধঃপতিত ভারত গো-রক্ষার জন্য নির্ম্মম বিদেশীর কঠোর উৎপীড়ন সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ নহে, সে কেবল এই পশুজাতির প্রতি স্নেহবশতঃ। দুগ্ধবতী গাভী এবং হলবাহক বৃষ চিরকাল আমাদের গৃহপার্শ্বে পরিবারের সহিত স্থান পাইয়াছে। তাহারা আমাদিগকে স্তন্যদানে পালন করিয়াছে, অন্ন আহরণে সাহায্য করিয়াছে, তাহারা আমাদের নিত্য গৃহকর্ম্মের সহচর ও সহকারী। বিদেশীরা বলে, তাহা হউক্ না কেন, তবু ত গোরু জন্তু বটে, তাহার সহিত ভক্তিবন্ধন ধর্ম্মবন্ধন কিসের? ভারতবর্ষ বলে, হউক্ না পশু, তবু ত সে আমার মাতার মত হিতকারিণী, সখার মত সুখদুঃখভাগী। পশু বলিয়াই যে, তাহার সহিত ব্যবহারে মানবহৃদয়কে সঙ্কুচিত করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অন্য জাতি যে ভাবটিকে বাড়াবাড়ি মনে করিয়া হাস্য করে, আমাদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। পশুপক্ষী, এমন কি, জড়-প্রকৃতির সহিতও ভারতবর্ষ আপনার হৃদয়ের সংযোগ অনুভব করে এবং তাহাদের প্রতি হৃদয়ের কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে।

পৃথিবীতে এমন অন্য কোন জাতি আছে কি না জানি না, যে জাতি এককালে মাংসাশী ছিল অথচ ক্রমে মাংসাহার ত্যাগ করিয়া নিরামিষভোজী হইয়া উঠিয়াছে। কেবল ভারতবর্ষেই দেখা যায়, মাংসাশী আর্য্যগণ মাংসভোজন ত্যাগ করিয়া তাহাকে অধর্ম্ম বলিয়া নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে এমন ধর্ম্মনীতি আছে কি না জানি না, যাহাতে প্রীতির সম্পর্ক মনুষ্যকে ছাড়াইয়া পশুরাজ্যে বিস্তার করিবার অনুশাসন আছে। মনুষ্যপ্রেমে প্রাণসমর্পণ অন্য দেশের কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে উচ্চতম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু ক্ষুধিত শ্যেনপক্ষীর জন্য নিজ দেহ হইতে মাংস কাটিয়া দেওয়ার কথা বোধ হয় গল্পচ্ছলেও কোথাও

উচ্চারিত হয় না। আমাদের বৌদ্ধগ্রন্থে এরূপ গল্প কর্ত্তব্যের আদর্শ বলিয়া শত শত বার আখ্যাত হইয়াছে। এ আদর্শ অসঙ্গত এবং অসম্ভব বলিয়া মনে করিলেও ইহা হইতে ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি বুঝা যাইতে পারিবে। যেমন হিন্দুধর্ম্ম, তেমনই বৌদ্ধধর্ম্ম এবং জৈনধর্ম্মও যে ভারতবর্ষীয় হৃদয় হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, সে কথা আমরা যেন বিস্মৃত না হই।

পশুস্নেহ ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির যে এক প্রধান লক্ষণ, তাহা একটি কাহিনীতে সুন্দর ব্যক্ত হইয়াছে। ব্যাধ যখন ক্রৌঞ্চমিথুনের মধ্যে একটিকে বধ করিল, তখনই বাল্মীকির মুখে ছন্দোবদ্ধ শ্লোক উচ্চারিত হইল। যুদ্ধ নহে, স্ত্রীপুরুষের প্রেম নহে, জীবে দয়াই ভারতবর্ষে প্রথম শ্লোক উৎপত্তির কারণ। কথাটা ঐতিহাসিক সত্য না হইতে পারে, বাল্মীকির পূর্ব্বেও দেবস্তুতি উপলক্ষ্যে অনুষ্টুভ্ ছন্দ রচিত হইতে পারে, কিন্তু গল্পটির মধ্যে একটি গভীর সত্য নিহিত আছে। সেটি এই যে, সর্ব্বভূতে দয়া ভারতীয় প্রকৃতির মূল উৎস। সামান্য একটি ক্রৌঞ্চপক্ষিহনন পবিত্র শ্লোকসৃষ্টির আদিকারণ বলিয়া যে দেশে প্রচলিত হইতে পারে, সে দেশের হৃদয়ের কথাটি কি, তাহা আর বুঝিতে বাকি থাকে না। এই জন্য

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥

এ শ্লোকটি পবিত্র শ্লোক। না—ব্যাধ কখনই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, ভারতে সে চিরকাল অভিশপ্ত হইয়া রহিয়াছে। যে একটা পাখীর দুঃখ বুঝিতে পারে না, কামমোহিত বিহঙ্গকে যে অকাতরে হত্যা করিতে পারে, যাহার চিত্তবৃত্তি এতই অসাড় অচেতন, সে কখনই শাশ্বতী গতি প্রাপ্ত হইতে পারে না—ইহার মধ্যে বড় একটি গভীর কথা আছে।—দুর্ব্বলের প্রতি স্নেহ, অসহায়ের প্রতি সহানুভূতি পৃথিবীতে বড় কম। কিন্তু যেখানে ইহা দেখা যায়, সেখানে মর্ত্ত্য স্বর্গ হইয়া উঠে, সেখান হইতে কুৎসিত অত্যাচার চিরদিনের মত নির্ব্বাসিত হয় এবং সেখানে বৃহৎ মনুষ্যত্ব সমস্ত বিশ্বকে আপন বক্ষনীড়ে টানিয়া আনিয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে।*

---

* এইখানে প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক আমিয়েলের দৈনন্দিন লিপি হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহার মধ্যে বড় একটি সার কথা আছে। জন্তুদের প্রতি অবিচার ক্রমে যে মানুষ পর্য্যন্ত উঠে, ইহা একটি চিন্তনীয় বিষয়।

6th October, 1866.—I have the just picked up on the stairs a little yellowish cat, ugly and pitiable. Now, curled up in a chair at my side, he seems perfectly happy, and as if he wanted nothing more. Far from being wild, nothing will induce him to

ভারতবর্ষের হৃদয়ে মনুষ্যত্ব অনেকাংশে সেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। তাহার কারণ বোধ হয় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম সর্ব্বলোকে, সর্ব্বজীবে, দেবতা হইতে কীটাণু এবং কীটাণু হইতে অচেতন পরমাণু পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র দেবতার অধিষ্ঠান উপলব্ধি করে। এবং সর্ব্বত্রই দেবতার অধিষ্ঠান জানিয়া সর্ব্ববিশ্বকে প্রীতি করিয়া সেই দেবতাকেই প্রীতি করে।

---

leave me, and he has followed me from room to room all day. I have nothing at all that is eatable in the house, but what I have I give him—that is to say, a look and a caress—and that seems to be enough for him, at least for the moment. Small animals, small children, young lives,—they are all the same as far as the need of protection and of gentleness is concerned... ... People have sometimes said to me that week and feeble creatures are happy with me. Perhaps such a fact has to do with some special gift or beneficent force which flows from one when one is in the sympathetic state. I have often a direct perception of such a force ; but I am no ways proud of it, nor do I look upon it as anything belonging to me, but simply as a natural gift. It seems to me sometimes as though I could woo the birds to build in my beard as they do in the headgear of some cathedral saint ! After all, this is the natural state and the true relation of man towards all inferior creatures. If man was what he ought to be he would be adored by the animals, of whom he is too often the capricious and sanguinary tyrant. The legend of Saint Francis of Assisi is not so legendary as we think ; and it is not so certain that it was the wild beasts who attacked man first... ... But to exaggerate nothing, let us leave on one side the beasts of prey, the carnivora, and those that live by rapine and slaughter. How many other species are there, by thousands, and tens of thousands, who ask peace from us and with whom we persist in waging a brutal war ? Our race is by far the most destructive, the most hurtful, and the most formidable, of all the species of the planet. It has even invented for its own use the right of the strongest,—a divine right which quiets its conscience in the face of the conquered and the oppressed ; we have outlawed all that lives except ourselves. Revolting and manifest abuse ; notorious and contemptible breach of the law of justice ! The bad faith and hypocrisy of it are renewed on a small scale by all successful usurpers. We are always making God our accomplice, that so we may legalise our own iniquities. Every successful massacre is consecrated by a Te Deum, and the clergy have never been wanting in benedictions for any victorious enormity. So that what, in the begining was the relation of man to the animal becomes that of people to people and man to man.

If so, we have before us an expiation too seldom noticed but altogether just. All crime must be expiated, and slavery is the repitition among men of the sufferings brutally imposed by man upon other living beings ; it is the theory bearing its fruits.— The right of man over the animals seems to me to cease with the need of defence and of subsistence. So that all unnecessary murder and torture are cowardice and even crime. The animal renders a service of utility ; man in return owes it a need of

সুতরাং তাহার অন্তরে হিংসা ও অপ্রীতি স্বভাবতই সঙ্কুচিত হইয়া আসে। এবং পশু পক্ষী সচেতন হইয়া মনুষ্যত্বের সহবাস লাভ করে। সেই জন্যই বৈষ্ণব কবির গান—

আজু বনে আনন্দ বাধাই।
পাতিয়া বিনোদ খেলা আনন্দে হইলা ভোলা
দূর বনে গেল সব গাই॥
ধেনু না দেখিয়া বনে চকিত রাখালগণে
শ্রীদাম সুদাম আদি সবে।
কানাই বলিছে ভাই খেলা ভাঙ্গা হবে নাই
আনিব গোধন বেণুরবে॥
সব ধেনু নাম কৈয়া অধরে মুরলী লৈয়া
ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব ধায় ধেনু বৎস সব
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি হাম্বা হাম্বা রব করি
দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে প্রেমের তরঙ্গ উঠে
স্নেহে গাবী শ্যামঅঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ আবা আবা ঘন ঘন
কানুরে করিল আলিঙ্গন।
প্রেমদাস কহে বাণী কানাইর মুরলী শুনি
পশু পাখী পাইল চেতন॥

এবং সেই জন্যই এই চেতনালব্ধ সর্ব্বজীবের তৃপ্ত্যর্থে সর্ব্ববিশ্বের উদ্দেশে ভারতবর্ষ প্রতি দিন তর্পণ করিয়া থাকে—

দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জৃম্ভগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥ ['সাধনা,' চৈত্র ১৩০০]

---

protection and of kindness. In a word, the animal has claims on man, and the man has duties to the animal.—Buddhism, no doubt, exaggerates this truth, but the Westerns leave it out of count altogether. A day will come, however, when our standard will be higher, our humanity more exacting, than it is to-day. *Homo homini lupus* said Hobbes : the time will come when man will be humane even for the wolf—*homo lupo homo*.

কাব্যে প্রকৃতি

শেক্ষপীয়রের নাটক পড়িতে পড়িতে একটা কথা মনে হয় যে, শেক্ষপীয়র সমস্ত হৃদয়ে প্রকৃতিকে ভালবাসিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার সামাজিকতা বড় নাই। এবং তাঁহার নাটকে নাটকীয় চরিত্র ও ঘটনাবলীর উপর প্রকৃতির যে প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা কেবল ছায়ার মত চতুর্দ্দিকের মানব-হৃদয়ে ও ঘটনার উপরে ঘনাইয়া আসে মাত্র; কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যের ন্যায় প্রকৃতি সেখানে মানবজীবনের সহিত বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া মানবহৃদয়ের সহমর্ম্মিণী সঙ্গিনী হইয়া উঠে নাই, এবং মানবী সখীর সুখে দুঃখে মানবীর ন্যায় সে বিচলিত হয় না বা মানবীর বিরহে একান্ত সন্তপ্ত ও মিলনে অতিমাত্র হৃষ্টও হয় না।

যেখানে সমগ্র নাটকটিকে শেক্ষপীয়র লোকালয় হইতে বহু দূরে এক জনহীন দ্বীপে লইয়া ফেলিয়াছেন, সেখানেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার পারিবারিক প্রীতি সংস্থাপিত হয় নাই—প্রকৃতির অনেকগুলি দানবী শক্তি যেখানে নির্ব্বিবাদে আধিপত্য করিতেছিল, সেইখানে তিনি এক মহামহিম মানব প্রভুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন। এই মানব প্রভু প্রস্পেরোকে বন্য শক্তি আরিয়েল ও ক্যালিবান যমের মত ভয় করিয়া চলে এবং যদি কালক্রমে এই দাসত্ব হইতে মুক্ত হইয়া আপন স্বাধীনতা ফিরিয়া পায়, এই আশায় দাসের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া থাকে। কিন্তু প্রস্পেরো অথবা মিরান্দার সহিত এই সকল প্রাকৃতিক শক্তির কাহারও কোনরূপ সমকক্ষতা নাই এবং বহু দিন একত্র বাসে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতাও জন্মে নাই। কেবল প্রস্পেরো আদেশ করেন, আরিয়েল ও ক্যালিবান—প্রকৃতির দুই বিভিন্ন শক্তি—স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সেই আদেশ পালন করে। প্রস্পেরো বলেন, ঝড় উঠাও; প্রকৃতির সমস্ত শক্তি সাগরে তরঙ্গ তুলে, আকাশে বজ্রধ্বনি করে, পৃথিবীতে প্রলয়ের রোল উঠাইয়া দেয়। প্রস্পেরো বলেন, এই চাহি—দাসেরা তাহাই সুসাধন করে। শেক্ষপীয়রে প্রকৃতির উপর মানব জয়ী হইয়াছে—প্রকৃতির উপর সে কর্তৃত্ব করে, প্রকৃতির সহিত ঘর করে না।

কিন্তু সংস্কৃত দৃশ্য কাব্যে প্রকৃতি মানবের সহিত সমান আসন পাইয়াছে এবং পরস্পরের প্রতি প্রীতিতে উভয়ের মধ্যে একটি সুমধুর গার্হস্থ্য বন্ধন সংস্থাপিত হইয়াছে। ভবভূতির নাটকে তমসা, মুরলা, বাসন্তী প্রভৃতি, নদ নদী ও আরণ্য প্রকৃতি সীতার দুঃখে যেরূপ সমবেদনা অনুভব করিয়াছে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে যেরূপে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহা শেক্ষপীয়রে নিতান্ত দুর্লভ। রাম যখন বনে আসিলেন, তখন সীতার দুঃখরজনী অবসান আশায় সেই গোদাবরীপ্রদেশের বন্য প্রকৃতি কিরূপ আনন্দিত হইয়াছিল। পরিপাণ্ডুদুর্ব্বলকপোল-সুন্দর বিলোলকবরী মূর্ত্তিমতী করুণা বা শরীরিণী বিরহব্যথার ন্যায় জানকীর বর্ণনায় তমসার

কত প্রেম প্রকাশ পাইয়াছে। বাসন্তী রামকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ছত্রে ছত্রে সীতার প্রতি তাঁহার কি গভীর সহানুভূতি ব্যক্ত হইয়াছে! এমন শুশ্রূষাপরায়ণা সান্ত্বনাদায়িনী প্রকৃতি ইংরাজি নাটকে কোথায়? এই প্রেমে, করুণায়, শুশ্রূষাপরায়ণতায় উত্তরচরিতের প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছে।

কালিদাসের নাটকেও প্রকৃতি এইরূপ মানবেরই সখী। শকুন্তলার সখীগণের নাম করিতে হইলে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার সহিত সেই মালিনীতীরস্থা শ্যামলা প্রকৃতিরও উল্লেখ করিতে হয়। তপোবনের প্রতি তরুলতার সহিত শকুন্তলার সোদরস্নেহের সম্বন্ধ। এবং শকুন্তলার বিদায়কালে প্রিয়ম্বদা অনসূয়ার চক্ষু যেমন জলে ভরিয়া আসিয়াছিল, অসহায় হরিণ-শিশু যেমন অঞ্চল ধরিয়া টানিয়া গমনোদ্যতা শকুন্তলাকে বার বার নিবারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তপোবনের এই পল্লবিত প্রকৃতিও সেইরূপ অশ্রুছলছল নতনেত্রে আপন নির্ব্বাক্ বেদনা জানাইয়া শাখাবাহু দ্বারা প্রিয়সখীকে বুকভরা আলিঙ্গন দিয়াছিল।

শকুন্তলায় এই প্রকৃতি নাটকের মেরুদণ্ড। মানবী সখী যখন শকুন্তলার বল্কল-বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, প্রকৃতি তখন কুরবকশাখায় বল্কল আট্‌কাইয়া দিয়া মানবী সখীর সহিত সেই প্রণয়ব্যাপার ঘনাইয়া আনে। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেমকে তপোবনের এই রমণীয় প্রকৃতি যেন ভরাট্ করিয়াছে। এই প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে শকুন্তলার কিছুই অবশিষ্ট থাকে না—দুষ্মন্ত, শকুন্তলা, প্রিয়ম্বদা, অনসূয়া, কণ্ব, গৌতমী, সমস্ত মিলিয়া একটি নির্জ্জীব মানবস্তূপ পড়িয়া থাকে মাত্র—এবং কালিদাসের প্রেম সহসা অত্যন্ত শিথিল ও ক্ষণিক বলিয়া মনে হয়।

কেবলি শকুন্তলায় নহে, কুমারসম্ভবে যেখানে মহাদেবের প্রতি মদন বাণ উদ্যত করিয়াছে, সেখানেও সমস্ত প্রকৃতি অনুকূল ভাবে পূর্ণ হইয়া হরপার্ব্বতীর প্রেমকে সর্ব্বাঙ্গে পূর্ণ করিয়াছে। কালিদাসের মানবপ্রেম আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে—চতুর্দ্দিক্ হইতে তাহার উপরে প্রকৃতি ঘনাইয়া আসিয়া সেই প্রেমকে সম্পূর্ণ করে। এই জন্য যোগিজনবিচরিত তপোবনেই তাঁহার প্রেম সম্পূর্ণ সফল হয়—যেখানে আরণ্য প্রকৃতি মানবের স্নেহে সিঞ্চিত হইয়া কোমল ও মধুর হইয়া আসিয়াছে এবং মানব-হৃদয় নাগরিকতা পরিহারপূর্ব্বক আরণ্য শ্যামলতায় সরস হইয়া উঠিয়াছে; যেখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, সিংহ মৃগশিশুকে হত্যা করে না, মৃগশিশু মানবের পদপ্রান্তে বসিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নীবার রোমন্থ করে, এবং সর্ব্ব লোক, সর্ব্ব জীব, চেতন অচেতন জড়, সকলের মধ্যে একটি প্রীতিশুভ্র পারিবারিকতা সংস্থাপিত হয়।

শেক্ষপীয়রে প্রেমের সহিত প্রকৃতির এত ঘনিষ্ঠতা দেখা যায় না। সেখানে সুখসুপ্ত চন্দ্রালোকে প্রণয়িযুগলের মনে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালের বহু প্রণয়কাহিনী আসিয়া উদয় হয় এবং

পুরাতন কালের সমস্ত প্রেম এই নবীন প্রেমে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। এবং এইরূপে যুগযুগান্তের মানবপ্রেম আসিয়া মানবকে আপনার মহিমায় অধিকতর ফুটাইয়া তুলে। কিন্তু প্রকৃতি সেখানে মানবের সখীরূপে ফুটে না, হয় ছায়ার মত, নয় মানবের আজ্ঞাধীন সেবকরূপে অবস্থিতি করে। যেমন, মার্চ্যাণ্ট অফ্ ভেনিসে লোরেঞ্জো ও জেসিকার প্রণয়দৃশ্যে, অথবা টেম্পেষ্টে ফার্দিনান্দ ও মিরান্দার প্রণয়ঘটনায়।

সংস্কৃত কবিরা প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখেন। সেই জন্যই সংস্কৃত নাটকে প্রকৃতি মানবের সহকারিণী সখী। ভবভূতির নিকট তিনি শুশ্রূষাপরায়ণা গভীরহৃদয়া; এবং কালিদাসের নিকট তিনি সুন্দরী। কালিদাস নারীকে সৌন্দর্য্যেই সম্যক্ দেখিয়াছেন—প্রকৃতিকেও তিনি এই ভাবেই উপভোগ করেন।

কিন্তু এই সৌন্দর্য্য উপভোগে আধুনিক কবিদিগের সহিত কালিদাসের অনেক প্রভেদ। সেকালের কবি যেমন রমণীকে, অল্প হউক্ অধিক হউক্, পুরুষের ভোগ্যা বলিয়া জানিতেন, প্রকৃতিকেও কতকটা সেই ভাবেই দেখিয়াছেন। সেই জন্য কালিদাস যখন প্রিয়া সহ সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে দীর্ঘ বর্ষ যাপন করেন, ছয় ঋতু আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন মদিরা দিয়া তাঁহার পাত্র ভরিয়া দেয় এবং সুন্দরী দাসীর ন্যায় তাঁহার পরিচর্য্যা করে।

ভবভূতিতে যে, প্রকৃতি দেবী হইয়া উঠিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, ভবভূতির প্রকৃতি জননীর ন্যায় শুশ্রূষাপরায়ণা ও কল্যাণদায়িনী। আমাদের দেশে নারী সৌন্দর্য্যে পূজিতা নহেন; জননী ও সতীরূপে গৃহের কল্যাণ ও আনন্দরূপেই তিনি এদেশের পূজা গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রকৃতিও যখন আমাদের নিকট এই ভাবে প্রতিভাত হয়, তখনই আমরা তাহাকে দেবী করিয়া তুলি।

য়ুরোপে শিভল্‌রি নারীকে অন্যরূপে দেখিয়াছে। সেখানে কবিদিগের রচনায় যে সৌন্দর্য্যের পূজা প্রচারিত হইয়াছে, সে সৌন্দর্য্য কেবল ইন্দ্রিয়মাত্রের দ্বারা উপভোগ্য নহে। জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরে যে সৌন্দর্য্যশক্তি নিহিত আছে, নারীসৌন্দর্য্যে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট বলিয়া নারীপূজায় সেই সৌন্দর্য্যেরই পূজা করা হয়। এবং এই সৌন্দর্য্যপূজা নারী হইতে ক্রমে সমস্ত প্রকৃতিতে যেন ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক কবি এই সৌন্দর্য্যশক্তিকে অদৃশ্য প্রভাবের মত অনুভব করেন। বসন্তের বাতাস যেমন চঞ্চল পক্ষে ফুলে ফুলে নিশ্বাস ফেলিয়া বহিয়া যায়, এই অদৃশ্য প্রভাবের ছায়াও সেইরূপ সর্ব্ববিশ্বের উপর দিয়া—লোক-লোকান্তর স্পর্শ করিয়া প্রবাহিত হয়। এই অদৃশ্য প্রভাব—এই ছায়া—শুধু সঙ্গীতের স্মৃতির মত—অত্যন্ত রহস্যময়, কিন্তু এই রহস্যবশতই প্রিয়তর। এই সৌন্দর্য্যের মূলশক্তি, বাহ্য প্রকৃতিতে, মানবহৃদয়ে, প্রেমে, আশায়, স্বপ্নে, সর্ব্বত্র ছায়া ফেলিয়াছে। কবি এই চরাচরপ্লাবী সৌন্দর্য্যরহস্যে নিমগ্ন হইয়া

দেখিতেছেন যে, এই সমস্তই সেই মহাসৌন্দর্য্যে ওতপ্রোত; এবং এই সৌন্দর্য্য অবলম্বন করিয়াই মানবের অন্তরের সহিত প্রকৃতির অন্তরের অনির্ব্বচনীয় যোগসূত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে।

সৌন্দর্য্যের এই অদ্বৈতবাদই আধুনিক পাশ্চাত্য কবিতার মর্ম্মস্থল। ইহাকে অদ্বৈতবাদ না বলিয়া ঐক্যবাদ বলা উচিত। সমস্ত চরাচর চেতন অচেতনের মধ্যে যে একমাত্র মহীয়সী সৌন্দর্য্যশক্তি উদ্ভাসিত, ইহাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে।—

এই অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি দ্বারা সমস্ত খণ্ড জগৎ একটি সর্ব্বব্যাপী সুমধুর মিলনে আবদ্ধ হইয়া একটি অখণ্ড সঙ্গীতের ন্যায় বৃহৎ এবং এক হইয়া উঠিয়াছে। সঙ্গীতের বিচ্ছিন্ন সুরগুলি স্বতন্ত্র ভাবেও শ্রুতিমনোহর হইতে পারে, কিন্তু যখন তাহাদের মধ্যে আদ্যোপান্ত একটি অবিভক্ত সৌন্দর্য্য একটি মহা-রাগিণীর সমগ্রতা আবিষ্কার করা যায়, তখন আনন্দ সুনিবিড় হইয়া উঠে এবং একটি বিপুল রহস্যময় পুলকে সমস্ত অন্তরাত্মা চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের ন্যায় আন্দোলিত হইতে থাকে। প্রাচীন কাব্যে প্রকৃতি কোথাও এরূপ সম্মিলিত সমতানে অনাদ্যন্ত নভস্তল হইতে মানবের অন্তর-গুহা পর্য্যন্ত ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই। সেখানে খণ্ড প্রকৃতি—খণ্ড সৌন্দর্য্য—মানবের সাহচর্য্য করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এক বিশ্বব্যাপিনী মহীয়সী সত্তা মানবাত্মাকে চরাচরের সহিত সৌন্দর্য্য-পুষ্পমাল্যে আবদ্ধ করিয়া মহীয়ান্ করে নাই।

কেবল আমাদের প্রাচীনতম কাব্যগ্রন্থে, বেদে, এই মহাসঙ্গীত উদ্গীত হইয়াছে। তেমন সহজে, তেমন সতেজে, তেমন সংক্ষেপে আর কোন দেশের কোন কাব্যে জগতের এই রহস্যবার্ত্তা প্রচারিত হয় নাই। ঋষিরা বলিয়াছেন—

> আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে,
> আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
> আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।

আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী জন্মলাভ করিয়াছে, আনন্দের দ্বারাই সমস্ত প্রাণী জীবিত রহিয়াছে এবং আনন্দের অভিমুখেই প্রবেশ করিতেছে।

ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে সকল কথাই বলা হইয়াছে। সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত সুখ, সমস্ত চেতনা, সমস্ত প্রাণ এক অনাদি অনন্ত মহানন্দের দ্বারা সন্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—সেই জগচ্চরাচরের জগদতীত আনন্দ-ঐক্য যে মহাত্মা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, তিনি আর

> ন বিভেতি কুতশ্চন,
> ন বিভেতি কদাচন। ['সাধনা,' বৈশাখ ১৩০১]

রবিবর্ম্মা

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মধ্যে সাহিত্যের যেরূপ অনুশীলন হইয়াছে, কলাবিদ্যার অন্যান্য অঙ্গের তাহার শতাংশের একাংশও আদর হয় নাই। বিশেষতঃ চিত্রকলা এদেশে তাহার সেই আদিম রঙ্‌লেপা বর্ব্বর অবস্থা হইতে অল্পই অগ্রসর হইয়াছে। ইংরাজিশিক্ষিতদের নিকট র‍্যাফেল টিশিয়ান প্রভৃতি বড় বড় পাশ্চাত্য চিত্রকরদিগের বৃত্তান্ত অবিদিত নাই এবং কাহারও কাহারও ভাগ্যে ঐ সকল চিত্রশিল্পীদিগের রচনা দর্শনও ঘটিয়াছে, কিন্তু র‍্যাফেল টিশিয়ানের মাহাত্ম্য অনুভব অপেক্ষা অনুমানের দ্বারাই আমরা প্রধানতঃ আয়ত্ত করি। এক ত আমাদের দেশে চিত্রশিল্পের তাদৃশ অনুশীলন অভাবে আমাদের চিত্রসৌন্দর্য্য উপভোগের বৃত্তিগুলিই সম্যক্ উন্মেষিত হয় নাই; দ্বিতীয়তঃ য়ুরোপীয় চিত্রশিল্পে আমাদের ভাবের, দেশীয় কল্পনার, পৌরাণিক সৌন্দর্য্যের কোনরূপ বিকাশ লক্ষিত হয় না—সুতরাং তাহা তেমন সহজে অবিলম্বে আমাদের অন্তরের অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে না। সেই জন্য, পৌরাণিকী কল্পনাকে তুলিকার স্পর্শে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিতে পারেন, আমাদের মধ্যে এইরূপ এক প্রতিভার আবশ্যক হইয়াছে। ভাষায় যাহা কতকটা বর্ণনায়; কতকটা আভাসে, কতকটা লেখকের রচনায়, কতকটা পাঠকের মনে মনে গঠিত হইয়া পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, সেই সুন্দর ভাবগুলিকে সমগ্রভাবে—যে অংশ ব্যক্ত ও যে অংশ অস্ফুট, মিলাইয়া—রেখায় রেখায় অনুবাদ করিতে হইবে। এই নব চিত্রাঙ্কনী প্রতিভার ইহাই কার্য্য।

আমাদের কলিকাতার আর্ট-ষ্টুডিয়ো কতকটা এই ভাবেই পরিচালিত বোধ হয়। কিন্তু আর্ট-ষ্টুডিয়ো হইতে বৎসর বৎসর যে সকল পৌরাণিক চিত্রাবলী বাহির হয়, কালীঘাটের পয়সা পয়সা পটের সহিত—কাগজের উৎকর্ষতা ও বর্ণ বৈচিত্র্যের অধিকতর ঘনঘটা ভিন্ন—তাহার প্রভেদ অল্পই; এবং তাহা দেখিয়া মনে বড় আশার সঞ্চার হয় না। কারণ, ঐ সকল বিচিত্রবর্ণ চিত্রে কোথাও কোনও ভাবের বিকাশ হয় নাই, শরীরের কোনরূপ গঠনপারিপাট্য প্রকাশ পায় নাই, এবং বর্ণবিন্যাসে সৌন্দর্য্য-বোধ আভাসেও আপনাকে ব্যক্ত করে নাই। করাল কালিকার ভীষণ-গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া মন কোথায় ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িবে, না, আর্ট-ষ্টুডিয়োর চিত্র মনে কেবল একটা ভাববিহীন কুৎসিত কাষ্ঠপুত্তলিকার মূর্ত্তি স্থাপনা করে এবং তাহাতে বিরক্তি ভিন্ন মনে কোনপ্রকার সাধুভাবের সঞ্চার হয় না। সরস্বতীর মুখে চোখে প্রতিভার দীপ্তি দেখিয়া হৃদয় কোথায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, না, আর্ট-ষ্টুডিয়োর চিত্রকর বহু পরিশ্রমে সকল ভাব বর্জ্জনপূর্ব্বক

একটি অতি নির্ব্বোধবৎ নিষ্প্রভ মুখমণ্ডল রচনা করিয়াছেন—সকল কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর সহিত তাঁহাদের যে সপ্ত জন্মে মুখ-দেখাদেখি নাই, তাহাতে ইহাই প্রকাশ পাইয়াছে মাত্র। চৈতন্যের দারুণ পীতকান্তি চিত্র দেখিলে ধারণা জন্মে যে, চিত্রকরের দৃষ্টিপথে যকৃৎ-রোগী ভিন্ন কখনও কোনও সুস্থদেহ মনুবংশীয় পতিত হয় নাই; এবং তাঁহার নেত্রনীরপতন দেখিলে মনে হয়, মস্তকমুণ্ডনের ন্যায় চক্ষে ক্ষীরলেপনও বুঝি নবদ্বীপে একসময়ে ফেসান ছিল এবং আবশ্যকমত সভাস্থলে বৈষ্ণবদিগের চক্ষু হইতে বিন্দু বিন্দু তাহাই ঝরিত। সুতরাং আর্ট-ষ্টুডিয়োর উদ্দেশ্য সাধু হইলেও দুঃখের সহিত তাহার ভরসা ছাড়িতে হয়।

দাক্ষিণাত্য এবিষয়ে বঙ্গদেশ অপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। সেখানে ঠিক যাহা আবশ্যক, তাহাই মিলিয়াছে—সভা নহে, সমিতি নহে, কোম্পানী নহে, কলিকাতার মত আর্ট-ষ্টুডিয়ো নহে—একটি যথার্থ চিত্রকরী প্রতিভা, যে কেবল কাপি না করিয়া সৌন্দর্য্য অনুভব ও প্রকাশ করিতে পারে, যে মধুপের মত পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া গিয়া সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া আনে এবং সেই সৌন্দর্য্যের চাক বাঁধিয়া চিত্ত হরণ করিতে জানে। এই প্রতিভা রবিবর্ম্মা। তিনি পৌরাণিক এবং অন্যান্য নানাবিষয়ক অনেকগুলি চিত্র রচনা করিয়াছেন। এবং এই সকল চিত্রে তাঁহার সৌন্দর্য্যবোধ ও রসগ্রাহিতার বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণা নায়ার রূপসীর চিত্র, শ্যামাঙ্গী গোপাঙ্গনার সুডোল নিটোল গঠন ও নয়ন ও অধরের ভাব, লালা রুখ্, রামসীতার পরিণয় বা সুভদ্রার্জ্জুনের প্রণয়দৃশ্য কাহার না চিত্ত হরণ করে? তাঁহার শান্তনুর নিকট হইতে পুত্র সহ গঙ্গার পলায়ন, বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গার্থে প্রেরিত মেনকা, শান্তনুর প্রশ্নজিজ্ঞাসায় সরলা সত্যবতীর সলজ্জ অথচ মুক্ত অকপট ভাব, কোন্‌টি না সুন্দর? যশোদার গোদোহন ও হৃষ্টপুষ্ট গোপালের চিত্র, পূতনাবধান্তে মঙ্গলাচরণকালে শিশু নন্দদুলালের ভাবমাধুর্য্য, এবং কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাৎ হইতে গিয়া রাধিকাকে প্রেমভরে আক্রমণ, কোন্‌টিতে না আমাদের অন্তরে একটি পৌরাণিক আনন্দ সঞ্চার করিয়া দেয়? হয় ত ইহার মধ্যে এমন কিছু ত্রুটি থাকিলেও থাকিতে পারে, যাহা আর্ট-সমালোচক ভিন্ন অপরের চক্ষে প্রতিভাত হয় না—এবং এই বাঙ্গালা দেশের আর্ট-ষ্টুডিয়ো ও কালীঘাটের পটের চতুঃসীমা মধ্যে বর্দ্ধিত আমাদের সে সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র—কিন্তু চিত্রগুলির মধ্যে যে একটি মনোহর ভাব আছে এবং সেই ভাবটুকু ভারতবর্ষের অন্তরতম হৃদয় মথিত হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। পৌরাণিক চিত্র এমন সুন্দর ভাবে এদেশে ইতিপূর্ব্বে কখনও অঙ্কিত হয় নাই। এবং খুঁটিনাটি ত্রুটি থাকিলেও রবিবর্ম্মাই এদেশের প্রথম প্রতিভাশালী চিত্রকর।

রামসীতার পরিণয়চিত্রটি তিনি কি সুন্দরই আঁকিয়াছেন! রাম তখন বালকমাত্র এবং সীতা বালিকা—ঈষৎ উন্মেষিত সুকুমার কুসুমকোরকবৎ দুইখানি কচি মুখ, তাহাতে

যে কি পুণ্য মাধুরী, তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। রামচন্দ্রের দক্ষিণ পাণিমধ্যে সীতার নবনীসুকোমল পাণিতল সমর্পিত ; এবং সেই স্বভাববিনম্র মুখে ও চারু আনত নেত্রে একটি অনির্ব্বচনীয় মহিমা দীপ্তি পাইতেছে। তাতগণ ও মাতৃকুলের দৃষ্টিতে কি স্নেহ! সমস্ত পরিজন ও অনুচরবর্গের মুখে কি ভাব! এমন বিবাহ বুঝি, পৃথিবীতে আর কখনও ঘটে নাই।

তখন কে জানিত, এই শুভ উৎসবদিনের কি পরিণাম! কে জানিত, এই মূর্ত্তিমতী আনন্দের কপালে কত দুঃখ আছে! রাজার নন্দিনী, রাজার বধূ হইয়া বনে বনেই তাঁহার চিরদিন কাটিবে, কে মনে করিয়াছিল! রাক্ষস হরণ করিল, স্বামী বনবাস দিলেন, পরীক্ষার পর পরীক্ষা; নারীর কোমল হৃদয়ে এত সহে না। সভামধ্যে দাঁড়াইয়া পতিব্রতা ডাকিলেন, বসুন্ধরে, বিদীর্ণ হও ; রসাতল ভেদ করিয়া স্নেহময়ী ধরিত্রী আপনি বাহির হইয়া আসিলেন ; বলিলেন, আয় মা আয়, তুই আমার রাণী, আমার কোলে আয়।—রাখ রাখ, ফির ফির।—কে ফিরিবে ? জননী আপন বক্ষে বাঁধিয়া সীতাকে লইয়া গেলেন।

রবিবর্ম্মার এই পাতালপ্রবেশটিও সুন্দর চিত্র। পরিণয়চিত্রের সমকক্ষ না হইলেও লক্ষ্মণের অশ্রুম্লান অধোবদন, রামের উদ্বেল ব্যাকুলতা, কুশলবের ভয়বিস্ময়বেদনাবিমিশ্রিত ভাব, রামের প্রতি সীতার সকরুণ বদ্ধদৃষ্টি, ধরিত্রীর বিষাদঘন মুখ, সমস্ত মিলিয়া পাতালপ্রবেশ দৃশ্যে একটি মনোহর যাথার্থ্য অর্পণ করিয়াছে।

কিন্তু অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রেমচিত্রের মত ভাবের গৌরব বুঝি কোনটিতেই নাই। সুভদ্রা ঈষৎ হেলিয়া দাঁড়াইয়া, দক্ষিণ করতল প্রস্তরবেদীর উপরে রক্ষিত, শাড়ীর কোঁচার ভাঁজে ভাঁজে ছায়া আলোকের খেলা ; খোপায় ফুলের মালা, ললাটে টিপ, আনত নেত্র-পল্লবে হ্রীর আবেশ ও চারু অধরপুটে শুভ্র হাসির মত লজ্জা। অর্জ্জুন স্বীয় দক্ষিণ করে সুভদ্রার বাম হস্ত ধারণ করিয়াছেন। এবং অপর হস্তে সুমধুর স্নেহভরে সুভদ্রাকে প্রায় বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছেন—যেন পুরুষহৃদয়ের সমস্ত স্নেহ প্রেম করুণা ঐ বাহুপাশে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। প্রশস্ত ললাটে উদার দীপ্তি, নয়নে নিবিষ্ট প্রেম, সুগঠিত অধরপ্রান্তে সুসংযত স্মিতমাধুরী এবং ঈষৎ আনমিত অর্দ্ধবেষ্টনে একটি পরম শরণ ভাব।

এই প্রণয়দৃশ্যে সংযমী অর্জ্জুনের চরিত্রগৌরব যেন সম্যক্ ব্যক্ত হইয়াছে—সেই গভীর হৃদয়ের সমস্ত প্রেম, সেই করুণ হৃদয়ের সমস্ত করুণা, সেই নির্ভীক স্বভাবের ত্রিভুবনবিজয়ী তেজস্বিতা এবং সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ অবিচলিত ধী। আলঙ্কারিকদিগের মতে মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের প্রাধান্য হইলেও, অর্জ্জুনের চরিত্র এই সকল গুণে সকল পাণ্ডবদিগের মধ্যে সমধিক উজ্জ্বল। অর্জ্জুনের পার্শ্বে যুধিষ্ঠির অতি মৃদু। হয় ত নীতিবিধান অনুসারে তাঁহার প্রেম অর্জ্জুনের ভালবাসা হইতেও উচ্চতর—কারণ, দ্রৌপদীই তাঁহার একমাত্র

প্রেয়সী এবং রূপসীর সমস্ত অনাবৃত সৌন্দর্য্য হয় ত তাঁহাকে বিচলিত করে না; কিন্তু সে অটল নীতিও নারীর হৃদয় তেমন আকর্ষণ করিতে পারে না, অর্জ্জুনের প্রেমদৃষ্টিতে তাহা যেমন সহজে আকৃষ্ট হয়। যুধিষ্ঠিরের অস্খলিতপদ সংসারযাত্রা প্রবীণদিগের দুর্লভ প্রশংসা আকর্ষণ করে; কিন্তু অর্জ্জুনের সংস্পর্শ যেমন হৃদয় হইতে হৃদয়ে তড়িৎ সঞ্চার করিয়া দেয়, তাঁহার সমস্ত শাস্ত্রানুসারী ধীরতা হৃদয়ে সে উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলিতে পারে না। অর্জ্জুনের চরিত্রে মানবপ্রকৃতির অনেকগুলি বিভিন্ন ভাবের সুন্দর সমাবেশ হইয়াছে; *তাঁহার দয়া এত যে, শত্রুকে বধ করিতেও অন্তরে ব্যথা লাগে, আবার তেজ এমনি যে,* গাণ্ডীবের সামান্য নিন্দামাত্রও সহে না; যুধিষ্ঠিরের মত অবিচলিত ধীরতার সহিত সকল সহ্য করিতে তিনি অক্ষম, ভীমের মত বৈরনির্য্যাতনে তাঁহার একটা বর্ব্বর উল্লাসও নাই। সবশুদ্ধ তাঁহার চরিত্রে প্রতিভার এমন একটি মহিমা আছে, ভাবে এমন একটি অবলীলা-সুশোভনতা আছে, যাহাতে তিনি হৃদয়ের অত্যন্ত নিকট হইয়া উঠেন। এবং রবিবর্ম্মার চিত্রে তাঁহার এই সংযত গম্ভীর প্রসন্ন সুরসিক আবেগপূর্ণ সুন্দর ভাবটি অতি সুন্দররূপে ফুটিয়াছে।

মহাভারতীয় বিষয় লইয়া রবিবর্ম্মা অনেকগুলি চিত্র আঁকিয়াছেন—কীচকমন্দিরে সৈরিন্ধ্রী, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নলদময়ন্তী, শকুন্তলার লিপিরচনা, আরও গুটিকতক আছে; কিন্তু অর্জ্জুন ও সুভদ্রার প্রণয়দৃশ্যে অর্জ্জুন যেমন কেবলমাত্র প্রণয়িরূপে নহে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের সম্পূর্ণ গৌরবে ফুটিয়াছেন, অন্য চিত্রগুলি ভাল হইলেও কোন চরিত্রকে তেমন করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছে কি না সন্দেহ। হয় ত সে সকল চরিত্রের গৌরবও অর্জ্জুনের সমকক্ষ নহে। এবং এত করিয়া ফুটাইবার আবশ্যকও হয় নাই।

নলদময়ন্তী উপাখ্যানের প্রধান চিত্র—কলির প্রভাবে ধীরস্বভাব নল প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে কিরূপে ত্যাগ করিয়া যান। নলের সমস্ত চরিত্রের সহিত ইহার বড় সম্পর্ক নাই। সেই অন্ধকার বনমধ্যে বাহূপরি নিদ্রিতা দময়ন্তীর চিত্র এবং অর্দ্ধবাস ছিন্ন করিয়া পলায়নোদ্যত রাজা নলের কলিপ্রবিষ্ট ভাবটি ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই দর্শকের মনে উপাখ্যানটি নিঃশব্দে সম্পূর্ণ হইয়া আসে এবং দময়ন্তীর দুঃখে হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠে। রবিবর্ম্মা তাহা ঠিক ধরিয়াছেন এবং সেই অন্ধকার দৃশ্যপটে এই শোচনীয় ঘটনাটি এমনি মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন যে, তাহা বুঝিতে কালবিলম্ব হয় না।

হিমালয়ের পাদদেশে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি বসিয়া ললাটান্তোপবদ্ধদৃষ্টি বিশ্বামিত্র একাগ্রমনে তপস্যা করিতেছেন; অদূরে স্বচ্ছ শ্বেতধারায় পর্ব্বতের গাত্র ধৌত করিয়া বেগবতী নিঝরিণী গম্ভীর নিনাদে অবিরাম ঝরিতেছে। এই মনোহর শৈলদৃশ্যের মধ্যে মেনকা রূপযৌবন-মাধুর্য্যচেষ্টিতস্মিতভাষিতের দ্বারা বিশ্বামিত্রের মনোহরণ করিতে আসিয়াছেন। মুখে

কোনরূপ চাপল্য নাই, মোহাবেশী কৃষ্ণতারক নেত্রযুগলে একটি স্নিগ্ধ মৃদু গাঢ়তা, বিশ্বামিত্রের পার্শ্বে বসিয়া কত সকরুণ দৃষ্টিতে যেন তাঁহার ধ্যানভঙ্গের প্রতীক্ষা করিতেছেন। এমন কোমল, এমন করুণ, এমন উজ্জ্বল মধুর কমনীয় ভাব ; বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গের জন্যই যেন এ রূপ সৃষ্ট হইয়াছে।

বাস্তবিক রবিবর্ম্মা পৌরাণিক ভাবগুলির মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন ; সেই জন্যই চিত্রে তিনি এমন সুন্দর ভাববিকাশ করিতে পারেন। তাঁহার কীচকমন্দিরে প্রেরিত সৈরিন্ধ্রীর মুখে রমণীজনোচিত ভীতিভাবের সঙ্গে দেবতার উপরে কেমন অটল নির্ভর প্রকাশ পাইয়াছে। বস্ত্রহরণ চিত্রে তেজস্বিনীর পাণ্ডবদিগের প্রতি সাশ্রু তীব্রদৃষ্টি এবং আত্মসম্ভ্রমরক্ষণে প্রাণপণ চেষ্টা, পাণ্ডবদিগের প্রতি জনের ভিন্ন ভিন্ন মুখভাব, ধৃতরাষ্ট্রের নত শির, ধার্ত্তরাষ্ট্রদিগের উল্লসিত গর্ব্ব, সকলই কেমন যথাযথ। আমরা এই সকল চিত্রে মহাভারতকারের সেই অতুল্য প্রতিভার ছায়া অনুভব করি।

কিন্তু শকুন্তলার লিপিরচনা চিত্রে চিত্রকর তপোবনের বিরহকৃশাঙ্গী শকুন্তলাকে আঁকিতে পারেন নাই। উন্মুক্ত বনচারিণী মৃগাঙ্গনার মত তাঁহার শরীরে সুন্দর সুকুমার লাঘবতা প্রকাশ পায় নাই ; অন্তঃপুরপালিতা অতিপুষ্টা যুবতীর মত তাঁহার দেহখানি গুরুভারকাতর দেখাইতেছে। কালিদাসের শকুন্তলা মধুরাকৃতি ও তন্বী—এবং লতা ও কুসুমের সহিতই তাঁহার দেহ ও যৌবনের যাহা কিছু সাদৃশ্য। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যে এই কৃশমধ্যা তন্বঙ্গীই রূপসীর শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সৌন্দর্য্যপিপাসা তখন মেদস্ফীত পীবর স্থাবরতার প্রতি ধাবিত হইত না এবং তুরস্ক প্রথানুসারে স্ত্রীগুলিকে বহুযত্নে ঘৃতনবনী-ক্ষীরসরের সাহায্যে পিণ্ডীকৃত করিয়া তোলা হইত না। এ আদর্শ এদেশে অপেক্ষাকৃত আধুনিক—কত দিন, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না, বোধ হয় মুসলমান আমলের।

কিন্তু আমাদের এই দেশীয় চিত্রশালায় প্রবেশ করিয়া প্রথম আনন্দের উচ্ছ্বাসে নিন্দার কথা আর মুখে আনিতে ইচ্ছা করে না। যখন ভারতবর্ষে অনেক চিত্রকরের অভ্যুদয় হইবে এবং আমাদের চিত্রসম্পদ্ অজস্র হইয়া উঠিবে, তখন আমরা সূক্ষ্ম বিচারের অধিকারী হইব। এখন যাহা পাওয়া যায়, তাহাই পরম লাভ বলিয়া মনে হয়। চিত্রকলার কতটা দূর পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, তাহাও আমাদের জানা নাই। আমরা হয় ত বালকের মত আকাশের চাঁদ প্রত্যাশা করিয়া বসিব। ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের চিত্রে আমরা ক্ষত্রতেজ ও ব্রহ্মতেজের যে সম্মিশ্রণ দেখিতে চাই, তাহা হয় ত রেখায় ও বর্ণে প্রকাশ করা অসাধ্য। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দৃশ্যে তেজস্বিনী অবমানিতা দ্রৌপদীর লজ্জা ক্রোধ অভিমান বিস্ময় একত্র পাইতে চাই ; আমরা দেখিতে চাই, অপমানিত হইয়াও দ্রৌপদী আমাদের নিকট অপমানিত হইতেছেন না, বরঞ্চ প্রজ্বলিত

তেজোরাশির দীপ্তিতে তিনি আমাদের চক্ষে আরও দ্বিগুণ মহীয়সী হইয়া উঠিয়াছেন— কিন্তু এ সকল হয় ত আমাদের কল্পনার দুরাশা মাত্র।

যেখানে চিত্রের সহিত আমাদের কল্পনার বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানেও আমরা একটা মহৎ ফল লাভ করি। চিত্রকরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমাদের চিত্ত নব উদ্যমে মানসপটে আপনার ভাবকে পরিস্ফুটতর করিয়া আঁকিতে চেষ্টা করে। যেটাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া মনে হয়, মনে মনে তুলি ধরিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিবার একটা প্রয়াস চলিতে থাকে— ইহাতেও আমাদের বড় একটি শিক্ষা ও আনন্দ লাভ হয়। ['সাধনা,' আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০০]

হিন্দু দেবদেবীর চিত্র

দেবতাপ্রিয় ভারতবর্ষীয় কল্পনা বহিঃপ্রকৃতি ও মানবচরিত্রে যেখানে যে সৌন্দর্য্যটুকু অনুভব করিয়াছে, তাহাতে একটি নির্দ্দিষ্ট গঠন দিয়া নিঃশব্দে আপন দেবতা গড়িয়া তুলিয়াছে। সেই জন্য ভারতবর্ষের পৌরাণিক দেবভূমিতে আসিয়া হৃদয় যেমন পরিতৃপ্ত হয়, এমন আর কিছুতে নহে। গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির অতুলনীয় দেহসৌন্দর্য্য হয় ত আমাদের দেবলোকে সর্ব্বত্র তেমন সুলভ নহে, কিন্তু এই সকল দেবমূর্ত্তিতে আমাদের অন্তরের বহু গভীর আকাঙ্ক্ষা মূর্ত্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে এবং ভারতবর্ষের অনাবিল অন্তরতম অন্তর সুন্দর অভিব্যক্ত হইয়াছে।

আমাদের সুখ দুঃখ, বেদনা আশা, সৌন্দর্য্য প্রেম, মোহ আকাঙ্ক্ষা, সকলই এই দেবলোকে। যাহা কিছু মর্ত্ত্য—নিতান্তই ঐহিক—তাহাও আমরা মর্ত্ত্যলোকে সাহস করিয়া রাখিতে পারি নাই; দেবতাকে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছি। তাই যোগী শিবকে পার্ব্বতীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া এই মর্ত্ত্য গার্হস্থ্যকে কৈলাসের অমরলোকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কন্দর্পকে কেবলমাত্র সামান্য নরনারীর হৃদয়বন্ধন না করিয়া হরপার্ব্বতীর চিরবন্ধনরূপে চিত্রিত করা হইয়াছে। যমুনাতীরের তমালছায়াসুপ্ত সুন্দর আহীরপল্লীটিকে মানবের না রাখিয়া দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ, দ্বন্দ্ব কোলাহল, মান অভিমান, প্রণয় বিরহ যেমন যাহা ঘটে, দেবলোকে সকলই বজায় আছে; কেবল, এখানে মৃত্যু আছে, সেখানে মৃত্যু নাই। মৃত্যুও সেখানে অমর।

কিন্তু এই মৃত্যুই মর্ত্ত্যের প্রধান সৌন্দর্য্য—পৃথিবীর সকল সুখদুঃখ বেদনা আনন্দের চরম পরিণাম। এই যে সকলি আছে অথচ সর্ব্বদাই হারাইবার ভয়, এই যে নশ্বরতা,

ইহাতেই ইহলোকের সকল সুখদুঃখ নিহিত। দেবলোকে যদি এই মৃত্যুই না রহিল, তবে দেবতাদের সুখদুঃখের সহিত আমাদের সুখদুঃখের সম্বন্ধ কিসের? ভারতবর্ষীয় হৃদয়, সুতরাং অমরধামেও মৃত্যুর ছায়া রচনা না করিয়া থাকিতে পারিল না। সতীর দেহত্যাগে ও রতিপতির অনঙ্গীকরণে এই মৃত্যুরই অনুরূপ চিত্র সূচিত হইয়াছে।

এইরূপে সমস্ত মর্ত্ত্য গুণাবলী দেবতায় আরোপিত হইয়া দেবলোকেই আমাদের অন্তর বিকাশ লাভ করিয়াছে। মানবের অতি তুচ্ছ সুখদুঃখ পর্য্যন্ত দেবতার। এবং বৃহৎ দেবলোক এই মর্ত্ত্যধামেরই একখানি সুন্দর চিত্র। এই গঙ্গাই সেখানে মন্দাকিনীরূপে চিরপ্রবাহিত; এবং এখানকার মলয়ানিলস্নিগ্ধ চূতমুকুলিত বসন্ত মন্মথের সখারূপে নিত্য বিকশিত। অপ্সরাগণ সেখানে জলক্রীড়া করে এবং চারু-অঙ্গসন্নদ্ধ যৌবন চতুর্দ্দিকে চিত্ত উদ্ভ্রান্ত করিয়া তোলে। মানবহৃদয় স্পর্শ করে না, দেবরাজ্যে এমন কিছুই নাই।

সেই জন্যই ভারতবর্ষের সাধারণ্যে দেবদেবীর চিত্র যেরূপ সমাদৃত, এমন আর কিছুই নহে। এবং চিত্রের দ্বারা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে হইলে এই সকল চিত্রই সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। শিব, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণের বাল্য যৌবন বিবিধ লীলা, দেবলোকের নানাবিধ কাহিনী আমাদের সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ে বহু যুগ ধরিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এবং মনে মনে আমরা এই সকল দৈব সৌন্দর্য্যের একটি অসম্পূর্ণ চিত্র গড়িয়া রাখিয়াছি। চিত্রকরের শিল্পনৈপুণ্যে এই অসম্পূর্ণ অপরিস্ফুট ভাব সৌন্দর্য্যে ও জীবনে পূর্ণ হইয়া উঠে।

দুঃখের বিষয়, বঙ্গদেশে ধর্ম্মচিত্রাবলী এ পর্য্যন্ত যাহা বাহির হইয়াছে, তাহাতে হৃদয়ে সৌন্দর্য্য উন্মেষিত ত হয়ই না, বরঞ্চ অনেক সময় প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের সৌন্দর্য্যটুকু ক্ষুণ্ণ হইয়া থাকে। দেবতার প্রাচীন আদর্শ আমাদের মনেও যে সর্ব্বত্র অক্ষুণ্ণ আছে, তাহা নহে। সেনাপতি কার্ত্তিকেয় বঙ্গনারীর সন্তানকামনার দেবতা হইয়া অবধি ধীরে ধীরে বর্ম্ম ছাড়িয়া ধুতি চাদর ধরিয়াছেন এবং ময়ূরে চড়িয়া যখন বাহির হন, তখন হিন্দুস্থানী কাঠিন্য সে দেহে কিছুমাত্র প্রকাশ পায় না। বাঙ্গলার চিত্রকর যদি এই অধুনাতন বঙ্গীয় ভাবে কিঞ্চিৎ অধিকমাত্রায় বিচলিত হয়েন, সে জন্য তাঁহাকে তত দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু কার্ত্তিকেয়কে বাঙ্গালী করিয়া আঁকিলেও তাঁহার গঠন ও মুখশ্রীতে সৌন্দর্য্যের বিশেষ বিকাশ হওয়া আবশ্যক। কারণ, সংস্কৃত আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও আমাদের মনে কার্ত্তিকেয়ের রূপের প্রতিষ্ঠা অটল।

কিন্তু বাঙ্গলার চিত্রশিল্পে রূপ যে কোথায় প্রচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেবতারাও জানেন না। সৌন্দর্য্য উন্মেষিত করিতে পারিলে স্থলবিশেষে প্রচলিত আদর্শের অনুসরণ করিয়াও চিত্রকর আপন গৌরব রক্ষা করিতে পারিতেন। তাহাতেও ত বিশেষ একটা ভাবের বিকাশ থাকিত। এবং সেই ভাবের গুণে সংস্কৃত আদর্শ হইতে অল্পবিস্তর বিচ্যুতি কাহারও

নিকট তেমন মারাত্মক বলিয়া বোধ হইত না। চিত্রকর যে ভাবেই চিত্রিত করুন, ভাবটি চিত্রে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইবে; এবং চিত্র যেন কোথাও অসঙ্গত না হয়।

কিন্তু সঙ্গতি বঙ্গীয় চিত্রাবলীতে কদাচ লক্ষিত হয়। মানবদেহের বর্ণ মানুষের মত না হওয়া, গঠনে প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম, এবং মুখশ্রীতে সকল ভাবের আত্যন্তিক অভাব, ইহাই এখন আমাদের চিত্রশালার গৌরব। গৌরাঙ্গ পীতবর্ণ; কারণ, কাব্যে গৌর অঙ্গের সহিত তপ্তকাঞ্চনের সাদৃশ্য উল্লিখিত হইয়াছে এবং তপ্তকাঞ্চনে হরিদ্রার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। রাধার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ যেন যুগ যুগ ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গে প্রাণপণে নীল পেন্সিল ঘষিয়াছেন; এবং এই বহু পেন্সিলঘর্ষণের ফলে কেবলমাত্র শ্রীমতী রাধিকার হৃদয় নহে, কিন্তু বাঙ্গলার রাধিকাগঞ্জন ধর্ম্মচিত্রকরদিগেরও হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। রণোন্মাদিনী শ্যামা এই অঙ্গারধূমোদ্গারী কলিযুগে মূর্ত্তিমতী রাণীগঞ্জগঞ্জিনী অবিশ্রাম আলকাতরা লেপন ভিন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতাও মানবশরীরে সে বর্ণের আভাস ব্যক্ত করিতে অক্ষম।

কিন্তু এই অদ্ভুত বর্ণসঙ্গম চিত্রকরের দোষে ঘটিয়াছে অথবা সংস্কৃত আদর্শের দোষে? সংস্কৃত সাহিত্যে শ্যামা রাত্রির ন্যায় কৃষ্ণবর্ণা; এবং কৃষ্ণেরও বর্ণ মেঘের ন্যায়। সুতরাং মানবদেহে এই রাত্রি অথবা মেঘের বর্ণ ফুটাইতে হইলে চিত্রকর রাণীগঞ্জ, নীল পেন্সিল প্রভৃতির শরণাপন্ন না হইয়া কি করেন? কিন্তু, সাহিত্যরসজ্ঞ মাত্রেই জানেন, উপমা সাদৃশ্যসূচক মাত্র। চন্দ্রবদন বলিলে কাহারও মনে একটি কলঙ্করেখালাঞ্ছিত দীপ্ত গোলাকার মুখমণ্ডল উদিত হয় না—মনে একটি প্রস্ফুটিত সৌন্দর্য্যের ভাব উদ্রেক করে মাত্র। শ্যামার বর্ণ কালরাত্রির ন্যায় বলিলে সত্য সত্যই শ্যামা যে রাণীগঞ্জসম্ভবা, এমন বুঝায় না—কেবল একটি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ভীষণগম্ভীর সৌন্দর্য্যের আভাস দেওয়া হয়। কৃষ্ণেরও বর্ণ সেইরূপ বাস্তবিকই মেঘ নহে। এবং নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের বর্ণও নবোদ্‌গত দূর্ব্বাহরিৎ নহে—নবদূর্ব্বার স্নিগ্ধশ্যাম লাবণ্যবিশিষ্ট বটে। মানবের বর্ণ কখনও মেঘ অথবা রাত্রি অথবা দূর্ব্বার মত হয়?

বর্ণও বস্তুভেদে বিভিন্ন। আকাশের নীল বর্ণ সমুদ্রের নীল নহে এবং নীলকণ্ঠের কণ্ঠ এতদুভয় হইতেই স্বতন্ত্র। শ্বেতকায় মানব শ্বেতকায় গোবৎসের সহিত একবর্ণ নহে; এবং দুগ্ধ, তুষার, ধবল বস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় শ্বেত পদার্থ মানবের শ্বেতবর্ণের চিত্র নহে। আমাদের দেশের গৌরবর্ণে হরিদ্রার ঈষৎ আভাস পাওয়া যায়, তাই বলিয়া তাহা হরিদ্রারঞ্জিতবৎ নহে। শ্যামবর্ণও সেইরূপ যতই শ্যাম হউক্ না কেন, মসীর মতও নয়, অঙ্গারসদৃশও বলা যায় না। সাহিত্যে এরূপ সাদৃশ্যগত অতিশয়োক্তি তাদৃশ দোষের নহে; কারণ, সাহিত্য পাঠকের মনে এই সকল সাদৃশ্যের দ্বারা বস্তুর যথার্থ চিত্রগ্রহণের বিঘ্ন

উৎপাদন করে না। কিন্তু চিত্রে এ সকল আতিশয্য সর্ব্বথা পরিহর্ত্তব্য—চিত্র বস্তুকেই যথাযথ চিত্রিত করে।

ইহাও কে না জানে যে, নীল অথবা হরিদ্বর্ণ মানব আমাদের কাহারও মনে কোনরূপ সৌন্দর্য্য উদ্রেক করিতে পারে না? কৃষ্ণ যদি আকাশের মত নীল হইতেন, তাহা হইলে কি সমস্ত গোপীকুল তাঁহার জন্য কুলমানে জলাঞ্জলি দিতে বসিত? না, গৌরাঙ্গী রাধিকা অহর্নিশি গুরুজন ও ননন্দার বাক্যবাণ সহ্য করিয়াও ঐ শ্রীপাদপদ্মে সমস্ত শরীর মন আত্মা সমর্পণ করিতেন? নীল মানববর্ণের কোনও আকর্ষণ নাই। কৃষ্ণবর্ণে একটি সুকুমার উজ্জ্বল লাবণ্য দেখা যায়, তাহাতে একটি প্রশান্ত কমনীয়তা আছে। সেই জন্যই মহাভারতকার সাহস করিয়া কৃষ্ণা দ্রৌপদীকে স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে কবি নারীসৌন্দর্য্যের মধ্যস্থলে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও অম্লান রাখিয়াছেন।

কিন্তু এ সকল ত গেল প্রেমসিক্ত সৌন্দর্য্যের কথা। যখন করাল কালিকার ভীষণ ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে, তখন একটু অস্বাভাবিক কালো না করিলে চলিবে কেন? সে উলঙ্গিনী উন্মাদিনী মূর্ত্তি দু' এক পোঁছ আলকাতরা নহিলে ত খুলে না। কিন্তু কালীর ভীষণতা ব্যক্ত করিতে হইলে এই অমানুষিক মিথ্যাবর্ণের আশ্রয় লইতে হইবে, এ কথা নূতন। ভীষণতা তাঁহার কিসে ব্যক্ত হয় নাই? নারীহৃদয় কঠিন হইয়া গিয়া শুধু শোণিত-লালসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে, এ দৃশ্য ভীষণ নহে? যে বক্ষে সন্তান স্নেহ পান করিয়া পরিপুষ্ট হইত, সে বক্ষ জুড়িয়া সহস্র নৃমুণ্ড হইতে তপ্ত রক্ত ঝরিতেছে—ইহাতে কি ভীষণতার অভাব আছে? সে কৃপাণহস্তা উলঙ্গিনী মূর্ত্তিই কি যথেষ্ট ভীষণ নহে? যে চিত্রকর শ্যামার দৈহিক গঠনে সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ করিয়া, জিহ্বাকে হস্তাধিক বিস্তৃত করিয়া দিয়া এবং সর্ব্বাঙ্গে অদ্ভুত রং লেপন করিয়া তাঁহার ভীষণতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করেন, সে চিত্রকরের প্রতিভার প্রশংসা করা যায় না।—সাহিত্যের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া এবং নিরক্ষর কুম্ভকারগণের পদানুসরণ করিয়া আমাদের চিত্রকরেরা এই ত্রুটিগুলি ঘটাইয়াছেন।

চিত্রকরের প্রথম কর্ত্তব্যই এই যে, এই সকল দেবদেবী সৃষ্টির মূলে যে সৌন্দর্য্যকল্পনা নিহিত আছে, সেইটিকে আয়ত্ত করা। নহিলে, অসংখ্য সরল এবং বক্র রেখাপরম্পরার সমাবেশেও চিত্র কখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমাদের চিত্রকরদিগের হস্তে মহাদেবের যে সকল দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মহাদেব আমাদের পুরুষসৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ। কেবলি দৈহিক গঠনে নহে, অন্তরের ভাবে ও বাহিরের চালচলনেও তিনি পরম পুরুষ। একদিকে বৈরাগ্য, অন্য দিকে গার্হস্থ্য; এবং সেই অবিচলিত চরিত্রে উভয়েরই সমান প্রতিষ্ঠা। তাঁহার গৃহিণী অন্নপূর্ণা;

অনুচর নন্দী ভৃঙ্গী; তিনি স্বয়ং ভোলানাথ শিব সদানন্দ। নিজের জন্য তাঁহার কিছুই নাই। সর্ব্বস্ব অন্নপূর্ণার হস্তে সমর্পণ করিয়া দিয়া শিব ভিখারী।

এই যোগি-গৃহস্থ আমাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। গৃহে গৃহে শুভ্রবসনা কুমারীরা এই আদর্শের অনুরূপ পতিকামনায় নিত্য শিবপূজা করে। ঐ রূপ, ঐ অনিন্দিত উদার স্বভাব, ঐ অতুল প্রতাপ এবং ক্ষমাশীল ধৈর্য্য নারীহৃদয়ের সমস্ত পূর্ণ করিয়া আছে।

কিন্তু চিত্রপটে পেশীবিহীন গঠন, বাবু-মুখশ্রী, তাম্বুলরাগরক্ত অধর এবং নিষ্প্রভ ভাব মন্থন করিয়া এ শিবত্বের কিছুই পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ ভাব সম্বন্ধে আমাদের চিত্রকরেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। নহিলে, মদনভস্মের চিত্রে চিত্রকর মহাদেবের ললাটদেশ হইতে একটি তাম্রলোহিত ঝাঁটা বাহির করিয়া দিবেন কেন? যে দীপ্ত রোষানলে মদন ভস্ম হইয়াছিল, ইহাতে তাহা প্রকাশ পায় নাই; প্রকাশ পাইয়াছে কেবল উক্ত স্থূলকায় ঝাঁটা— যাহার অগ্রভাগে অগ্নি সংযুক্ত হইয়া মদনকে দগ্ধ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

শুধু শিব নহে, দেবতাদের অনেকেই এইরূপ চিত্রকরের হস্তে পড়িয়া বহুবিধ বিকৃতি লাভ করিয়াছেন। দেবীগুলির উল্লেখ না করাই ভাল—আমাদের চিত্রশালায় এমন একখানি চিত্র নাই, যাহা দেখিয়া দেবীকে দেবকুলোদ্ভবা বলিয়া মনে হয়। বোধ করি, চিত্রকরেরা যদি কিছুকাল স্ব স্ব মানসী সৌন্দর্য্যকে মনান্তরিত করিয়া দিয়া মানবী মডেল দেখিয়া চিত্র আঁকিতে সুরু করেন, তাহা হইলেও দেবতারা ইহলোকে কতকটা প্রকৃতিস্থ থাকিতে পারেন।

এবং সেই সঙ্গে দেশের সর্ব্বসাধারণেরও কিছু উপকার হয়। দেবতায় ভক্তি স্থাপন করিতে গিয়া পৃথিবীর যাবতীয় কুৎসিত বিকৃতিতে হৃদয় প্রতিষ্ঠিত হয় না। অন্তরে সৌন্দর্য্যের একটি অক্ষুণ্ণ আদর্শ জাগ্রত হইয়া উঠে। এবং এই সৌন্দর্য্যজ্ঞান সংসারের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় অনুষ্ঠানে প্রযুক্ত হইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দরতর করিয়া তোলে।

চিত্রকরের হস্তে এই এক মহা সংস্কার নির্ভর করিতেছে। সাহিত্যকারের দায়িত্ব অপেক্ষা তাঁহার দায়িত্ব কম নহে। সাহিত্য বরঞ্চ অনেকের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সময় লাগে। চিত্র আপন নির্দ্দিষ্ট গঠনপ্রভাবে সহজেই অন্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই জন্যই বিশেষতঃ চিত্রকরেরা যখন সাহিত্যের সুন্দর আদর্শকে নষ্ট করিতে বসেন, তখন তাঁহারা দেশের যে কত দূর ক্ষতি করেন, তাহা বলা যায় না। একটি রাজনৈতিক অধিকার লাভ অপেক্ষা জাতির হৃদয়ে একটি সুন্দর আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা গুরুতর কার্য্য। এই গুরুতর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের প্রাচীন সৌন্দর্য্যসমূহকে যে চিত্রকর অক্ষুণ্ণ বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন, তিনি দেশের একজন মহাত্মা। ['সাধনা,' মাঘ ১৩০০]

মাধবিকা

[১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত]

মাধবিকা

পঞ্চ ঋতু থাক্ নিয়ে যাহে খুসী যার,
মধুমাস থাক্, প্রিয়ে, তোমার আমার।
শুধু এই যৌবনের অনন্ত উচ্ছ্বাস,
অনুরাগরঙ্গে ভরা নিত্য নব আশ,
এই তন্দ্রা, এই স্বপ্ন, এই নিশিশেষ;
এই মনোমোহকর মদির আবেশ,
শুধু এই মুকুলিত আম্রকুঞ্জবন,
গন্ধভরা দিশাহারা প্রভাতপবন,
শুধু এই পত্রে পত্রে মধুর মর্ম্মর,
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিত সঙ্গীতনির্ঝর,
এই স্বচ্ছ নীলাকাশ, কুলুকুলু নদী,
এই বর্ণ, এই গন্ধ, গীতি নিরবধি
এই প্রাণ, এই প্রেম, এ পূর্ণ পুলক
থাক্ যতক্ষণ থাকে দিনের আলোক।

আশঙ্কা

তোমারে মথিয়া, প্রিয়ে, পাই সুধামৃত,
তাই বড় ভয় হয় অধিক মন্থনে,
পাছে মিলে হলাহল ; রেখেছ আবৃত
মৌন বক্ষতলমাঝে অতি সঙ্গোপনে
যে গভীর স্নেহ, অগাধ গাহনে তার
যদি মিলে তল, যদি থাকে সীমাহীন
বালুকার চর ! শুষ্ক হয় পারাবার
যদি মন্থনের ভরে ! যায় চিরদিন

তাই সহে কি না সহে এত স্বর্গ-সুধা :
আমি নহি নীলকণ্ঠ, নাহিক সে ক্ষুধা
নিতে পারি যাহে বিষে সুধাসম করি',
হে সুন্দরি, তাই সদা ডরি মনে মনে
কি জানি গরল উঠে অমৃতমন্থনে!

মূঢ়তা

রমণী প্রলয়ঙ্করী বলেছে যে কেহ
বিষম সাহস তার নাহিক সন্দেহ,
বুদ্ধি কিছু কম, নহিলে সে মূঢ়মতি
এক বাক্যে হারায় কি সকল সদ্‌গতি ?
বৈকুণ্ঠে আছেন লক্ষ্মী, কৈলাসে ভবানী,
ইন্দ্রালয়ে শচীদেবী, মর্ত্ত্যে সুনয়ানী
ঘরের গৃহিণী মহাদেবী ;—হে অজ্ঞান,
কোথা হবে ঠাঁই তব ? করিবে প্রয়াণ
কোন্ রসাতলপুরে নাহি নাগবালা
যেথা অনুক্ষণ দিতে তীব্র বিষ-জ্বালা
শিরায় শিরায় তব ? জেনেছিলে মনে
প্রলয় লুকান' যদি ওই আঁখিকোণে,
ফুৎকারে জাগালে কেন তাহা ? মর দহি'
তুষানলে পলে পলে রহি' রহি' রহি'।

অকলঙ্ক

কলঙ্কে মলিন যদি হয়ে' থাকে কেহ,
দেবি, তুমি নহ, নহে তব শুভ্র দেহ
নবনীকোমল। নিত্য আছ আপনার
গরবে গৌরবে তুমি, ওগো বসুধার
প্রিয় পরিজন, তপ্ত গৌরকান্তি তব
রয়েছে অম্লান শুভ্র যশে ; নব নব

সুখরসে ভরিতেছ স্বর্ণ-প্রেমপাত্র
নিশিদিন ধরি', অবসর তিলমাত্র
নাহি চাহিবারে ফিরে' এই ধূলিম্লান
ধরণীর পানে ; চির-উচ্ছ্বসিত প্রাণ
সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়া উঠে তীব্র সুখভরে
মদিরার ফেণসম, শতধারে ঝরে
রূপরাশি নিরুপম, কাণায় কাণায়
তনুখানি ভরি' উঠে নবীন আভায়।

অগ্নিহোত্র

উন্মেলিয়া শত শিখা দীপ্ত অনুরাগে
আজি খুঁজিতেছ কারে ? তপ্ত হৃদে জাগে
কোন্ পূর্ব্বস্মৃতি, কার শ্যাম স্নেহমুখ,
অরণ্যের কোন্ বেদগাথা ? দুঃখসুখ
কোন্ অতীতের ব্যাকুলিছে চিত্ত তব
দিবসে নিশীথে, ওহে অরণিসম্ভব ?
দহিতেছ কার লাগি' অনন্ত দহনে
ক্ষীয়মাণ নিতি নিতি ?

পড়েছে কি মনে
কোন পুরাণ কাহিনী—সরস্বতীতীরে
যবে ঋষিকন্যাগণ চারিধারে ঘিরে'
গুঞ্জন করিত বসি' মৃদু মৃদু স্বরে
দিবসের দুঃখসুখ যত, মৌনভরে
শুনিত একান্তচিতে কথা অভিনব
ঋষিমুখে, লাজাঞ্জলি দিত শিরে তব
বাষ্পাকুলচোখে ধীরে মন্ত্র পাঠ করি'
স্মিতমুখে শুচিমনে দেবতারে স্মরি',
দীপ্তি তব ঝলকিত চারু চন্দ্রানন
উজ্জ্বল আভায় ; সেই স্মৃতি পুরাতন

উঠিছে কি জাগি' আজি অরুণবরণে
তপ্ত বক্ষতলে, তাই শ্বসিছ সঘনে
শত শিখা মেলি' ?

অথবা পড়েছে মনে
কোন পরিচিতমুখে করুণনয়নে,
প্রতিদিন প্রাতে যার নিশ্বাস-সমীর
লাগি' চিত্ত তব নিত্য হইত অধীর
স্বর্ণস্নেহভরে, তপ্ত তাম্র শিখা তব
উঠিত উজলি' নব রাগে, অনুভব
করিতে অন্তরে কি বেদনা মৌনভাষে
কেহ নাহি জানে, শুধু চাহিয়া আকাশে
বেপমান বক্ষমাঝে রহিতে নীরবে
যবে সর্ব্বাঙ্গ সম্বরি' ; সেই মুখ তবে
করেছে চঞ্চল কি গো অচঞ্চল হিয়া ?
তারি লাগি' জ্বলিতেছ শ্বসিয়া শ্বসিয়া
নিশিদিন ধরি' ?

এখনো কি মনে আছে
মাহিষ্মতী-পুরী, দুইবেলা বসি' কাছে
দু'খানি অধরপুটে করিত বীজন
যেথা রাজার নন্দিনী, লভিতে চেতন
তুমি তন্দ্রা পরিহরি' ; লেলিহ নয়ন
সর্ব্ব অঙ্গ হ'তে ধীরে করিত চয়ন
কনক যৌবনখানি চুম্বনের ছলে
বেপথু জাগায়ে তুলি' নীলাম্বরতলে ;
সোনার অঞ্চলখানি ভূমিতলপরে
পড়িত লুটিয়া ধীরে অবসাদভরে,
তব তাপে শ্রান্তি আসি' অলক্ষ্যে কখন্
নীরবে খুলিয়া দিত নীবীর বন্ধন

জানিবার আগে, বাঁধা যেথা সঙ্গোপনে
পিনদ্ধ যৌবনখানি মেখলাবন্ধনে :
সেই কথা সেই মুখ সেই সুলোচন
অতনুবেদন তনু চম্পকবরণ
দহিছে কি চিতে ? গুমরি' গুমরি' তাই
মরিতেছ তিল তিল করি', শান্তি নাই
মনে ?

বল বহ্নি যদি পড়ে' থাকে মনে
সেই মাতৃগর্ভবাস, প্রবালশয়নে
যবে কাটিত জীবন সুখদুখহীন,
রুদ্ধ তেজ হিম হয়ে' আছিল বিলীন
আপনার মাঝে, মৌন মাতৃস্নেহ হ'তে
করিত সঞ্চয় শুধু যত্নে বহুমতে
জীবনের তাপ ; বিস্তারিয়া শত ফণা
আছিল ঘেরিয়া শত নাগের ললনা,
দিবসনিশীথ ধরি' বিনিদ্রনয়নে
পাছে ভাঙ্গে নিদ্রা তব কল্লোলতাড়নে
সমুদ্র গরজে যবে শিয়রের কাছে
শতোচ্ছ্বাসে।

বল খুলে' কি বেদনা আছে
ওই বুকে, হুতাশন ! যুগে যুগে কবি
গাহে তব যশোগান, ভক্ত দেয় হবি
তপ্ত বক্ষে, সুখে দুঃখে মানবের গৃহে
চিরদিন আছ বিজড়িত শতস্নেহে
মিলনে বিরহে প্রেমে জীবনে যৌবনে
আজন্মের সর্ব্বকার্য্যে সকল বন্ধনে ;
তবু যদি ব্যথা কোন বাজে ও হৃদয়ে,
বল বহ্নি, কিসে তার হইবে বিলয়।

অন্ধের যষ্টি

মার্জ্জনা করিয়ো মোরে, মন্ত্রী নাই ঘরে—
বুদ্ধি পড়িয়াছে একা, সদা মরি ডরে
কোথা ফেলিবারে পদ কোথা গিয়া পড়ি
আমি মূর্খ মানবক! হে মূর্খের ছড়ি,
এস ত্বরা পৃষ্ঠোপরি পড় আছাড়িয়া
হুহুঙ্কার ছাড়ি'; বুদ্ধি উঠুক্ ঝাড়িয়া
মজ্জার তন্দ্রিমা তার, কর্ণ হোক্ খাড়া
পেয়ে কর্ণধারে, অন্তরাত্মা দিক্ সাড়া
অন্তরে হেরিয়া তার অন্তরের ছায়া
সুনিবিড়, দিকে দিকে বিস্তারিয়া মায়া
কলশব্দে পূর্ণ কর দিশি; অনাদর
ঘুচুক্ আমার! তবে ছাড়ি' যাই ঘর
বিশ্বমাঝে বিশ্বতত্ত্ব করিতে প্রচার—
তুমি আসিয়াছ ঘরে আর ভয় কার!

উপমা

একে একে ফুরাইল সকল উপমা—
বয়ান হেরিয়া লাজে মলিন চন্দ্রমা,
আঁখি লজ্জা দেয় হরিণীরে স্নেহভরে,
পুষ্পশর ছাড়ে ধনু ভ্রূবিলাসডরে,
নাসিকায় শুকশিশু, অধরে প্রবাল,
গ্রীবাদেশে হারে কম্বু, বাহুতে মৃণাল,
অভ্রভেদী মহিমায় পয়োধরভূমি
হিমগিরি ছাড়ি' উঠে সপ্তলোক চুমি',
কেশরী মরিছে হেরি কটির তনিমা,
সুপীন নিতম্বে মজে সকল প্রথিমা,
উরুদেশে হার মানে কদলীগঠন,
দেহযষ্টি সুললিত লতার মতন ;—

ত্রিভুবন আছে শুধু, অয়ি মনোরমা,
তোমার অঙ্গের তরে যোগাতে উপমা !

দুর্নিমিত্ত

একি দুর্লক্ষণ, রমণী হয়েছে মৌন
মুনির মতন ! নাহি জানি কি অগৌণ
বিপদ্‌পতন ঝুলিছে শিরের পরে !
ঝটিকার আগে বায়ু রহে মৌনভরে
দেখেছি এ লোকে, কিন্তু রমণীরসনা
ক্ষণকাল রহে স্থির যেন পদ্মাসনা
তপস্বিনী—হেন দৃশ্য অভিনব বটে !
তাই মরি ডরে, বুদ্ধি না যোগায় ঘটে
যথাকালে। চিরদিন ওই মুখবাণী
সম্বল করিয়া মানি, আর নাহি জানি
কিছু ত্রিভুবনে ; তা'ও যদি বন্ধ হয়
কপালের গুণে অকারণে, নাহি সয়
আর। মনোভার বাঁধা থাক্ মনোমাঝে
ভয়ে মরি কোন্ কথা কোন্‌খানে বাজে !

শিঞ্জন

সর্ব্ব অঙ্গে ধ্বনি তব বাজিছে, সুন্দরী
কঙ্কণ মেখলা হার নূপুর গুর্জ্জরী
নানা সুরে নিশিদিন ; রতিপতি বুঝি
কায়া ত্যজি' তব অঙ্গে ফিরে কায়া খুঁজি'—
চঞ্চল অধৈর্য্যভরে তারি পঞ্চ শর
তব অঙ্গে অঙ্গে আজি হয়েছে মুখর
মধুর নিক্বণে। তাই মরিবারে আসে
পুরুষের মন তব যৌবনের ফাঁসে
মুগ্ধ মৃগসম ; নূপুরশিঞ্জন শুনি'
ধ্যান ভাঙ্গি' উঠে' আসে মনোজয়ী মুনি

ধ্বনির পশ্চাতে ; ছন্দে ছন্দে প্রতি ঘাতে
বিরহীর মন নাচে মেখলার সাথে ;
তরুণ অরুণরাগে কঙ্কণকিঙ্কিণী
বক্ষমাঝে তালে তালে বাজে রিণিরিণি ;

সমস্যা

দেবতার মতিগতি তা'ও বুঝা যায়,
তোমারে বুঝিয়া ওঠা সেই মহা দায়,
হে ভামিনি ! কিসে যে প্রসন্ন হও কবে
কিসে বা বিমুখ, কোন শাস্ত্র নাহি ভবে
এ তত্ত্ব জানিতে পারি যাহে। চতুর্ম্মুখ
বাখানিতে বেদ রহিলেন হয়ে' মূক
তব নামে আসি' ; জ্যোতিষ আসিল জানি'
দূরতম নক্ষত্রকাহিনী, মৌন মানি'
রহিল সে হৃদাকাশে নামি'—ধ্রুবতারা
জাগিছ যেখানে তুমি। ভয়ে ভয়ে সারা
মোরা মূঢ়মতি, সে সাহস নাহি মনে
প্রবাল এনেছি হরি বরুণসদনে
পশি' যে সাহসবশে। ও অগাধতলে
নামিলে ফিরিয়া আসা বহু জন্মফলে !

কলবেদনা

আমারে বাঁধিয়া লহ কটিতটে তব,
হে সুরসুন্দরি, চারু অঙ্গে অভিনব
রহিব সন্নদ্ধ ওই বসনের মত
তনুখানি সযতনে সম্বরি' সতত
মোর স্বচ্ছ জলধারে ; মৃদু মন্দ বায়ে
বিথারিয়া তন্তুজাল অঞ্চলের প্রায়
লুণ্ঠিব চঞ্চলহিয়ে কাঞ্চীপরিক্ষীণ
ওই তনুতটমূলে, যৌবন নবীন

পড়িছে স্খলিয়া যেথা কাঞ্চনবরণে
নিবিড়নিবদ্ধ ওই নীবীর বন্ধনে
করিয়া লঙ্ঘন, মৃদু কনকনিক্কণে
ধ্বনিছে ঘন্টিকা শত বিজন বেদনে
বিঁধি' বিরহীর মন ; পরশ লাগিয়া
উঠিবে আমারো চিত্ত আকুল হইয়া
নব রাগে, ইন্দ্রধনুসম দিশি দিশি
বিচ্ছুরিব বিম্বজাল মম অহর্নিশি
দিবালোকে চন্দ্রিকায় বর্ণে নব নব
মৌন সুখভরে ; স্নিগ্ধ শুভ্র কান্তি তব
স্বচ্ছ অম্বরের তলে উঠিবে ফুটিয়া
শরৎ কৌমুদীসম অম্বর টুটিয়া
চারু রশ্মিজালে।

বড় আশা আছে মনে
আমারে লইবে তুলি', অয়ি সুগঠনে,
বক্ষতলে তব। তাপে খিন্ন হবে যবে
পীন স্তন দুটি রাখিব আচ্ছাদি' তবে
সলিল-অম্বরে, স্তনাগ্রশিখরপরে
শুধু দুটি বারিবিন্দু স্বচ্ছ স্নেহভরে
রহিবে উজলি' ; পয়োধর অন্তরালে
বিগলিত হারলতা লঘু বাষ্পজালে
মনে হবে মরীচিকা—বক্ষের স্পন্দনে
যেথা বহু আশা বহু ব্যথা সঙ্গোপনে
নিশিদিন ফুটে আর ঝরে।—অয়ি প্রিয়ে,
মানবপ্রেয়সি, চিত্ত উঠে আকুলিয়ে
আলিঙ্গন-আশে তব, ওই বক্ষোপরি
চাহে লভিতে বিরাম চিরদিন ধরি'
তপ্ত স্নেহতলে, কোমল পরশে তব
লভি' নিত্য অনুপম শান্তি অভিনব
আনন্দ-নিশ্চল।

আর নাহি লাগে ভাল
সারাদিন কূলে কূলে ছায়া আর আলো
নিয়ে মিথ্যা বিড়ম্বনা, গুরু মনোভার
বহি' কলকলছল নিত্য অভিসার
কোন্ অজানা অকূলে। এবে হয় মনে
চিরদিন রব পড়ি' কমলচরণে.
তব, নূপুরগুঞ্জন শুনি' কাটি' যাবে
দীর্ঘ দিন সুখে দুখে এইমত ভাবে
যুগ পরে যুগ ; রহিব ঘিরিয়া তব
তরল যৌবনখানি—তনু অভিনব—
শত নাগিনীবেষ্টনে অনঙ্গের মত
লঘু স্বচ্ছ আবরণে ; খেলিব সতত
অঙ্গ হ'তে অঙ্গে তব যৌবননন্দনে
নিঃশব্দ ঠুঙ্কারে কভু বাজিয়া কঙ্কণে
মৃদু ; হারলগ্ন হয়ে' পড়িব খসিয়া
বক্ষতল হ'তে নীবীতটে, উঘারিয়া
হিয়া তব—হরকোপানলে মনমথ
ভস্মীভূততনু পড়েছিল যেই পথ
বাহি' রসাতলে ; কভু মেখলার মাঝে
হারাইয়া পথরেখা কোন দিন সাঁঝে
ঝুরুঝুরু বায়ুবশে পড়িব এলায়ে
বিবশ আবেগে তব শিথিলিত কায়ে
তাপজরজর ; পুলক উদঞ্চি' উঠি'
সর্ব্ব অঙ্গে সর্ব্ব বন্ধ ফেলিবেক টুটি'।

কর্ণধার

মনসিজ চক্ষু মুদি' ভাবে মনে মনে
আমি সর্ব্বমনোজয়ী এই ত্রিভুবনে।
রতি আসি' কহে কাণে, নহে নিজগুণে
প্রভু, শুধু চল বলে' মোর বুদ্ধি শুনে' ;

তোমার যতেক গুণ জানাই ত আছে,
আপন টঙ্কারে নিজে হঠে' এস পাছে
মোর অঞ্চলের কাছে—এমনি সাহস!
গর্ব্ব কর বিশ্বজয়—তুমি কার বশ
তাই ভেবে দেখ মনে। কহে রতিপতি,
মার্জ্জনা করিয়া মোরে, আমি মূঢ়মতি,
পঞ্চপুষ্পশরগর্ব্বে উন্মত্ত আবেগে
মনে নাহি ছিল, প্রিয়ে, তুমি আছ জেগে।
তরী যবে পালভরে ছুটে দুর্নিবার,
মাঝে মাঝে ভুলে যায় আছে কর্ণধার।

বৃথা গর্ব্ব

নরজাতি অস্ত্রহীন অক্ষম অগতি,
নারীদল সর্ব্ব অঙ্গে মায়া-অস্ত্রমতী।
বল, হে মন্মথ, তব কারে পক্ষপাত—
কার প্রতি খরতর তব শরঘাত?
আপন জাতির কিছু রাখ কি খাতির,
অথবা তাহারে হান' বাছা বাছা তীর
নারীর যৌবনদুর্গে লুকাইয়া বসি'!
এই কি গৌরব তব, হে মহাসাহসী,
যে জন মরিয়া আছে নূপুরতাড়নে,
জর্জ্জর নির্জ্জীব বন্দী মেখলাবন্ধনে—
পঞ্চত্বের বাকি নাই, পঞ্চশর তায়?
যে মরেছে মৃগলোচনের মৃগয়ায়
সে মৃগবধের গর্ব্ব তুমি কর কে হে
তব নামাঙ্কিত শর বিঁধি' তার দেহে?

পরীক্ষা

একদিন রতি আসি' মদনসদনে
আঁখি ঠারি' কহে ধীরে সহাস্য বদনে :—

চুরি করি' রাখিয়াছি পুষ্পধনু তব,
দেখিব বাহির কর কি উপায় নব।
বিনা ধনু বিনা শরে কারে কর জয়
এইবারে দেখা যাবে, ওহে ফুলময়;
মাধবী আসিবে যবে ফুটিবে বকুল
গাহে কি না গাহে পিক পঞ্চমে আকুল;
বাপীতটে ছায়াতলে বিরহিণী বালা
আসন্ন-মিলন-আশে গাঁথে কি না মালা;
বর্ষপরে সমাগত মধুর মিলনে
কাটে কি না কাটে রাতি প্রণয়গুঞ্জনে;
নবীন যৌবন, ছাড়ি সর্ব্ব চপলতা,
জয়দেব পড়ে কিম্বা পড়ে নীতিকথা।

সফলতা

থাক্ তবে তব হস্তে শর আর ধনু,
আজ হ'তে অঙ্গে তব রহিল অতনু।
বড় সাধ ছিল মনে বহুদিন ধরি'
দেখিব মৃগয়াবেশে তোমারে, সুন্দরি—
তূণীর ঝুলিছে পৃষ্ঠে, ফুলধনু হাতে,
ফুলবাস অঙ্গে তব, কিরীটিকা মাথে,
শরভয়ে ধাবমান শীকারের পিছু
ছুটিয়াছ বাধাবিঘ্ন নাহি মানি' কিছু,
নয়ন নিমেষহীন, নিরুদ্ধ নিঃশ্বাস,
পিছে পিছে ছুটিয়াছে সখা মধুমাস
লয়ে' তার পুষ্পভার, চূতশাখা করে
তোমার সহায় হয়ে'—লঘুপদভরে।
এতদিনে সাধ বুঝি পূরিল এবার
তোমাতে হেরিয়া, প্রিয়ে, স্বারূপ্য আমার।

বিষামৃত

একদিকে বিষ আর একদিকে সুধা
মিটাইতে জগতের সর্ব্ববিধ ক্ষুধা
দুটি কুম্ভ পূর্ণ করি' দিয়াছেন বিধি
নারীর হৃদয় জুড়ি' দুটি পয়োনিধি।
আদিযুগে দেবাসুর মন্থনসমরে
মহামায়া হরেছিল অসুরের ডরে
সকল অমৃত বুঝি ওই বক্ষতলে,
ছলিতে অসুরে শেষে ভরিয়া গরলে
অনুরূপ কুম্ভ বিধি বসাইল আনি',—
দেবাসুরে ভাগ করি' লয় দুইখানি।
সে অবধি নারীবক্ষ বিষামৃতে ভরি'
তুষিতেছে সর্ব্বলোকে দিবসশর্ব্বরী।
কেহ বা বাসনাবিষ পান করে' যায়,
কেহ স্নিগ্ধ উৎস হ'তে শুধু সুধা পায়!

কুম্ভমেলা

নাহিক সন্ন্যাস হেথা, নাহি ভস্মরাগ,
কূলে কূলে ভরি' উঠে শুধু অনুরাগ।
ঘাটে রাখি' শূন্য কুম্ভ নামে কুতূহলে
ভাসাইতে পূর্ণ কুম্ভ যমুনার জলে
গোপবধূজন যত; দেহবন্ধ হ'তে
কুচকুম্ভ দুটি বুঝি ভেসে যায় স্রোতে
কোন্ দূরদেশে কোন্ শ্যামের উদ্দেশে
যৌবনপীযূষভরা মুগ্ধ প্রেমাবেশে।
কি না জানি উছলিবে প্রেমের তুফান
যমুনার স্রোত যবে বহিবে উজান,
চির-নারীহৃদয়ের উৎসবভরে
ধ্বনিবে শতেক কুম্ভ পূর্ণ কলস্বরে।

এই সেই কুম্ভমেলা, এই সে প্রয়াগ,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে উথলয় নব অনুরাগ।

পরিণাম

হে নারীর মনোভূমি, হে বালির চর,
প্রভাতে দেখেছি তোরে বড় মনোহর।
নদীপার হয়েছিনু লয়ে' ভাঙ্গাতরী
এইখানে চিরদিন র'ব আশা করি'।
সব শস্য ছড়াইনু তব বালুপরে,
বাঁধিনু বালির ঘর মহা যত্নভরে।
ভাবিনু নির্জ্জনে হেথা নদীকলগানে
স্বর্ণশস্য কাটি' লব সফল অঘ্রাণে।
মধ্যাহ্নে দেখিতে পাই একি রুদ্ররূপ—
কঠিন বহ্নির মত জ্বলে বালুস্তূপ!
তপ্ত ঝড়ে গৃহ মোর কোথা গেল উড়ে',
যত বীজ রোপেছিনু সব গেল পুড়ে'।
আজি হেরি চারিদিকে শুধু মরুরাশি
সর্ব্ব চিহ্ন লোপ করি' হাসে শুষ্ক হাসি।

সর্ব্বস্বান্ত

আর কোন অস্ত্র নাই—বাঁশীটি কেবল
বিরহ-বিপিনে মোর সাথী ও সম্বল।
কটাক্ষ আছয়ে তব নয়নের কোণে—
অমোঘ সন্ধান কর ভ্রূধনুযোজনে,
অধরে রয়েছে ঢাকা তৃষিত চুম্বন—
হৃদয় হইতে করে শোণিত শোষণ,
বচনে করিয়া আন হৃদয়হরণ,
বন্দী করি' রেখে দেয় বাহুর বন্ধন,
রেখেছ বরুণবাণ অশ্রুর উচ্ছ্বাসে,
অগ্নিবাণ আছে তব উপহাস-হাসে ;—

এত অস্ত্র আছে তব তবু কেন মোরে
রাখিতে চাহ গো, রাধে, বাঁশীহীন করে' ?
মন চুরি করেছিলে সয়েছিনু সব,
বাঁশী যদি চুরি কর তা' হ'লে নীরব।

ভীমরতি

ভীমরতি ধরিয়াছে বৃদ্ধ মনমথে—
নহিলে সে দাঁড়াত কি আসি' তব পথে ?
জলে নামি' কুম্ভীরের সহিত বিবাদ—
এইবারে বৃদ্ধ বুঝি ঘটায় প্রমাদ।
পাঁচখানি শরমাত্র সহায় তাহার,
একমাত্র ফুলধনু তা'ও মান্ধাতার।
তোমার যুগল ধনু ললাটের মাঝে
নিমেষে শতেক শর মর্ম্মে গিয়া বাজে
যারে চাহ বিঁধিবারে। তোমার সহিতে
কি সাহসে নামিল সে বিবাদ করিতে
অন্তিম দশায় আজি ? বৃদ্ধ যম বুঝি
এতদিনে পাইয়াছে সিধা পথ খুঁজি'
করিবারে বন্দী এই ফুলধনুবীরে,
পথ চাহি আছে তাই বৈতরণীতীরে।

ভিক্ষা

হে মন্মথ, খুলে দাও তব খেয়াতরী,
মিলনের পারে যাত্রী দাও পার করি'।
নদীতে উঠেছে ঢেউ, আকাশেতে মেঘ,
সন্ধ্যার পবনে ক্রমে বাড়িতেছে বেগ।
পারাণীর কড়ি চাহ—নির্লজ্জ নাবিক,
কত যে দিয়াছি আমি আছে তার ঠিক ?
মন ছিল, প্রাণ ছিল—কিবা আছে বাকি,
তার পরে আরো চাও—আরো দিবে ফাঁকি !

যৌবন সঁপিয়া দেছি চরণে তোমার,
সুখশান্তি কড়াক্রান্তি কিছু নাহি আর।
আমার হইত যদি বিশ্বচরাচর,
বেচিয়া দিতাম তোরে, ওরে দস্যুবর।
সর্ব্বস্ব দিয়েছি তবু—তুলিনে সে কথা—
ভিক্ষারূপে মাগি আজি তব সহায়তা।

দোষ

আমারি সকল দোষ, অনিন্দ্যসুন্দরি,
অপরাধ তোমা হ'তে পড়ে ঝরি' ঝরি'
শুভ্র হংসপক্ষ হ'তে জলবিন্দুপ্রায়
মুক্তার ধারার মত সুন্দর শোভায়।
কেমনে বাঁধিয়াছিলে, বিঁধেছিলে শর,
কেমনে করিয়াছিলে গরলে জর্জ্জর
জীবন যৌবনে মোর, সে কি আছে মনে—
শুধু সুধামুখখানি জাগিছে স্মরণে।
ছুরিখানি দেখি নাই, দেখেছিনু হাসি,
চুম্বনের মাঝে কোথা ছিল বিষরাশি
সে কথা কি মূঢ় জন মনে করে' রাখে?
সুন্দর তোমার লীলা মধুর বিপাকে
টানে অন্ধজনে। তাহে মরে যেই জন
তারে লাগে সর্ব্ব দোষ—বিধির লিখন।

মান

মান কর, কর সখি, যে যাহা বলুক্,
ওই দিক্‌পানে কভু ফিরিয়ো মুখ।
গ্রীবাটি বাঁকায়ো ধীরে মরালীর মত,
আখি দুটি রাগভরে কর' অবনত—
অপাঙ্গে চাহিয়া মৃদু অবহেলাভরে
এই দীনজন পানে; স্ফুরিত অধরে

জাগ্রত করিয়া মোর চুম্বন-পিপাসা
বঞ্চিত করিয়ো শেষে না পূরায়ে আশা
মোর লুব্ধ অধরের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করি';
অঞ্চলের প্রান্তখানি রাখিয়ো সম্বরি'
বক্ষতলে দৃঢ়-করে। তবু রোষচ্ছলে
চাও যদি মোর মুখে অবশ্য তা' হ'লে
নিশি না হইতে শেষ শাসনের পাশ
আসিবে শিথিল হয়ে' মনে আছে আশ।

বিড়ম্বনা

চুম্বন গুঞ্জন আর সরস বসন্ত
অদ্যাবধি হয়েছে বিস্তর, হোক্ অন্ত
এবে এ সবের। পুরাতন পুষ্পশরে
বিদায় করিয়া দাও এই অবসরে,—
পুষ্পে তার পশিয়াছে কীট, ধনুকের
ছিলা গেছে ছিঁড়ে এতদিনে, শুধু এর
আছে মাত্র পূর্ব্ব আস্ফালন; এত দিনে
অতিব্যয়ী সর্ব্বস্বান্ত যৌবনের ঋণে
বিকায়ে গিয়াছে তার পরিপূর্ণ তূণ;
মদনের মদপাত্রে তরল আগুন
নিঃশেষিত এবে; দ্বারে এসে বারম্বার
ফিরে যায় মধুঋতু দৈন্য হেরি' তার;—
তবু যদি তার পরে মায়া থাকে, তবে
বহিয়ো গোপনে তাহা, রহিয়ো নীরবে।

অবসান

হে মোর সঙ্গীত তোর পতঙ্গের প্রাণ
এক বসন্তেই শুধু হ'ল অবসান।
একবেলা নৃত্য শুধু একবেলা গান,
ছড়ায়ে রঙীন্ পাখা কুসুমে শয়ান।

একটুকু স্বর্ণরেণু, পুষ্পপরিমল,
একটুকু রবিকর, শিশিরের জল,
কিছুক্ষণ খেলাধুলা মুগ্ধ অভিনয়,
তার পরে দিনশেষ—আর বেশি নয়।
রে স্বল্পায়ু, তাহে তোর কোনো খেদ নাই,
যে পারে অমর হ'তে হোক্ না সে, ভাই,
বৃদ্ধ যশ, উচ্চাসনে বসি' তার পাশে
চিরকাল বেঁচে থাকা, মহা লাঞ্ছনা সে!
তার চেয়ে ঢের ভাল, ছড়াইয়া পাখা
খেলাশেষে কুসুমের বক্ষে মরে' থাকা।

শ্রাবণী

[১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম প্রকাশিত]

চিরনব

ঋতু পরে যায় ঋতু, মাস পরে মাস,
নিত্য নব নব ভাবে তোমার প্রকাশ।
মধুমাস ছিল যবে তুমি ছিলে মধু
গোপন মর্ম্মের মাঝে, অয়ি নববধূ।
এখন ছেয়েছ তুমি প্রাবৃটের মেঘে
হৃদয়তমালকুঞ্জ, চিত্ত ওঠে জেগে
মত্ত ময়ূরের মত পান করি' তব
স্নিগ্ধ সুধাবৃষ্টিধারা, গন্ধ নব নব
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারি ধারে বসুধার,
মুগ্ধ মন কোথা যেন করে অভিসার
কোন্ বৃন্দাবনধামে—কোন্ মধুদেশে—
কেতকীবেষ্টিত কোন্ নিকুঞ্জ উদ্দেশে
কার লাগি ;—সেই মোর হৃদয়ের রাণী—
দিশে দিশে গীতিগন্ধে তাহারি বাখানি।

অন্তরবাসিনী

মেঘ নামিয়াছে আজি ধরণীর গায়ে,
তুমি এস নেমে এস হৃদয়গুহায়
অন্তরের মাঝে, অয়ি অন্তরবাসিনি।
ঘনায়ে আসুক্ আরো তিমির-যামিনী
তব চারি ধারে, ঘন ঘন-গরজনে
পরিপূর্ণ হোক্ দশ দিশি, সনসনে
বহুক্ পবন খরবেগে ; তুমি রহ
অহরহ পূর্ণ করি' সকল বিরহ

অন্তরমন্দিরমাঝে ; তব স্নেহছায়ে
সজীব হইয়া উঠে নব মহিমায়
পুরাণ বিরহ যত কুঞ্জ-অভিসার
ঝঞ্ঝাঘনগরজন শ্রাবণনিশার ;
মত্ত দাদুরীর রোলে দ্বিধা কেকারবে
তুমি যেন ভরি' উঠ সর্ব্ব অবয়বে।

স্নানযাত্রা

ঘাটে ভীড়াইনু তরী প্রভাতবেলায়,
বধূরা নেমেছে জলে গাহনখেলায়।
অঞ্চল ভাসায়ে দিয়ে চঞ্চল তরঙ্গে
দুই হাতে জল ছোড়ে কত না বিভঙ্গে।
কেহ ভরে শূন্য কুম্ভ যমুনার জলে,
কেহ হেরে চারু অঙ্গ মার্জ্জনের ছলে,
কেহ আঁখি মুদি' ধীরে ডুব দিয়া উঠে,
স্বর্ণকান্তি ফুটে কারো নীলাম্বর টুটে',
কেহ কলরব করি' মাজে গ্রীবাদেশ,
সিক্তবস্ত্রে উঠি' কেহ নিঙ্‌ড়ায় কেশ,
শ্যামাঙ্গ ভাসায় কেহ নীল জলস্রোতে—
তনু চাহে বাহিরিতে স্বচ্ছাম্বর হ'তে ;
যমুনা উছলি' উঠে রূপের তরঙ্গে—
ঢেউ ওঠে ছন্দে ছন্দে শ্রীঅঙ্গে শ্রীঅঙ্গে।

আবাহন

অমনি এস হে তুমি হৃদয়নন্দনে
বিগলিতনীলাম্বরে স্নানার্দ্রবসনে।
নাহি কোন লাজ হেথা, নাহি কোন্ ভয়,
এ আমার অন্তরের নিভৃত নিলয়।
হেথা তুমি রাণী শুধু নিজ মহিমায়,
নহ কেহ বাহিরের বসনভূষায়।

বাহুপাশে বাঁধা র'বে কনকবন্ধনে
দু'টি প্রাণ দু'জনার ঘন আলিঙ্গনে।
বহিয়া আসিবে ওই বক্ষতল হ'তে
আতপ্ত যৌবন তব তপ্ত স্বর্ণস্রোতে
এই বক্ষমাঝে, এই হৃদয়ের পরে,
উছসি' উঠিবে হিয়া নব রাগভরে।
এস তবে, অয়ি প্রিয়ে, অয়ি অবন্ধনে,
লাজভয় ত্যজ আসি' মর্ম্মনিকেতনে।

অপরাহ্নে

আবার বাঁধিনু তরী আর ঘাটে এসে,
ঝিকিমিকি বেলাটুকু উপনীত শেষে।
কলস লইয়া কাঁখে গ্রামবধূজন
গ্রামপথে হেলে দুলে করিছে গমন।
দুই ধারে শস্যক্ষেত্র লুটায় চরণে,
ফুলরেণু উড়ি' আসি' লাগিছে বদনে।
তুলিয়া বসনখানি জানুর উপরে
জলে নেমে আসে বধূ অবলীলাভরে;
পূর্ণ করি' শূন্য কুম্ভ তুলে' লয় ধীরে,
চলে' যেতে বার বার দেখে ফিরে' ফিরে'
গৃহতটিনীর পানে সকরুণ চোখে—
কি জানি আবার দেখা না হয় এ লোকে।
তপোবনমৃগসম প্রকৃতির নীড়ে
চিরজন্ম বৰ্দ্ধিত সে এই নদীতীরে।

দিনযাপন

মনে হয়, নিজ মনে সুখে আছ বেশ,
দিন কাটে অবহেলে—নাই চিন্তালেশ।
একরত্তি দেহযষ্টি তারি গবেষণা,
নিশিদিন অনুক্ষণ তাহারি সাধনা।

নানা ভঙ্গে নানা ছন্দে গ্রীবার মার্জন,
মুহুর্মুহু অঙ্গে অঙ্গে করসঞ্চালন ;
উলটি' পালটি' কভু পীন পয়োধর
মুগ্ধনেত্রে হের শোভা মূর্চ্ছামনোহর ;
শিথিলিত করি' কভু নীবীর বন্ধন
অপাঙ্গে হেরিতে থাক মেখলালাঞ্ছন ;
ছড়াইয়া পা ছু'খানি নিশ্চিন্ত আলসে
আর্দ্রবাসে সিক্ত কর' ঘাটে বসে' বসে' ;
বিধাতা মেনেছে হার তব প্রসাধনে,
যুগ পরে কাটে যুগ তাহা সমাপনে।

উৎসব

মাধবী গিয়েছে চলি', নেমেছে বরষা,
অনঙ্গ নবীন সাজে উদয় সহসা।
পরণে মেঘের বাস, ইন্দ্রধনু করে,
বৃষ্টিধারা শরজাল শোভে পৃষ্ঠপরে ;
বিজলী ঝলকে ঘন ধনুর টঙ্কারে,
দিশে দিশে মেঘমন্দ্রে মহিমা প্রচারে।
আজিকে মদন রাজা বিজয়গৌরবে
নেমে আসে স্বর্গ হ'তে নব মহোৎসবে ;
উঠিছে বসুধাগন্ধ ছাইয়া গগন,
ছেয়ে গেছে ফুলে ফুলে কেতকীর বন ;
কদম্বতোরণে বসি' গাহে বিহঙ্গিনী,
নানা ভঙ্গে তালে তালে নাচে শিখণ্ডিনী ;
বসুধা পরেছে চারু শ্যামল বসন,
পীনোন্নত বক্ষমাঝে উচ্ছল যৌবন।

মেঘদূত

বর্ষা নামিয়াছে আজি ছুই তীরপরে,
নদী কাঁপে থরথর নীল নীরভরে।

তরীমাঝে বসি' বসি' পড়ি মেঘদূত,
মনোমাঝে জেগে ওঠে সেকাল নিখুঁত।
সেই পুরী উজ্জয়িনী, কবি কালিদাস,
বিরহবেদনাবিদ্ধ বর্ণনাবিলাস;
সেই সে অলকাধাম, পুণ্য রামগিরি,
মাঝখানে দীর্ঘপথ শতপাকে ফিরি'
নিরুদ্দেশ বুঝি কোন্ কেতকীর বনে—
কোন্ নীপকুঞ্জমাঝে বিরহীর মনে।
পর্ব্বতের সানুদেশে একমাত্র মেঘ—
বিরহী শুনায় তারে হৃদয়-আবেগ।
স্মরশরে জরজর যেই মূঢ় জন,
অচেতন চেতন কি বুঝে তার মন!

পথে পথে

মনে হয়, হে কবীন্দ্র, তব সাথে যদি
পথে পথে দিন শুধু যেত নিরবধি!
দেশ হ'তে দেশান্তরে, পথ হ'তে পথে,
পুরীমাঝে, নদীতটে, প্রান্তরে, পর্ব্বতে,
যৌবনের কুঞ্জগৃহে, প্রণয়ীর মনে,
নারীর রূপের মাঝে, বিরহগহনে,
পুষ্প হ'তে পুষ্পবনে সরস অন্তরে
কাটিত সুদীর্ঘ বেলা অবলীলাভরে!
ঋতু পরে ঋতু আসি' পিয়াইত মধু,
সসাগরা বসুন্ধরা হ'ত মোর বধূ;
কালস্রোত বহে' যেত পথপার্শ্ব দিয়া—
তব সঙ্গরসে ভোর মুগ্ধ মোর হিয়া!
দুই ধারে ক্ষীয়মাণ ছবি পরে ছবি—
সৌন্দর্য্যচয়নে দোঁহে মগ্ন শুধু, কবি।

কোথা ?

বুঝিতে না পারি, প্রিয়ে, আছ কোন্‌খানে—
বুকের পঞ্জরমাঝে অথবা নয়ানে ?
হিয়া যবে ধকধকে বক্ষতলমাঝে
ভয় হয় পাছে তব অন্তরেতে বাজে ;
অশ্রু যবে ভরি' উঠে নয়নের পাতে
তোমারে ব্যথিছে বুঝি কি বেদনাঘাতে
তাই হয় মনে। চোখে চোখে আছ যবে
তখনো বিরহ যেন দহিছে নীরবে
অন্তরে অন্তরে,—মনে হয়, স্বপ্নসম
মায়ায় ছলিলে না ত মূঢ় মন মম
ক্ষণভরে ; প্রবাসে বিরহে হয় মনে,
নিশিদিন সাথে বুঝি আছ সঙ্গোপনে।
বাহিরে তোমারে চাহি' পাই অন্তঃপুরে,—
অন্তরে খুঁজিতে গিয়া হেরি বহু দূরে।

বিরহের মিলন

বিরহ কেমনে কহি আছ যবে মনে—
যদিও মিলিতে চাহে দেহ দেহ সনে।
বাহু চাহে বাহুবন্ধ, বক্ষ আলিঙ্গন,
তৃষিত অধর চাহে অমৃত-চুম্বন,
শ্রবণ শুনিতে চাহে বাণী সরস্বতী,
নয়ন নিমেষ ত্যজে হেরিতে মূরতি,
পুলক কণ্টকি' উঠে পরশের আশে,
ঘ্রাণ চাহে তৃপ্ত হ'তে অঙ্গের সুবাসে,
তনু চাহে তনু অঙ্গে পাইতে বিলয়,
যৌবন করিতে চাহে আপনারে ক্ষয়
ওই রূপবেলাতটে, লাবণ্যসৈকতে,
ভক্তজন পূজে যেথা কামদ মন্মথে ;

হৃদয় নীরব শুধু হৃদয়ের মাঝে
তোমারে হেরিয়া সেথা অভিনব সাজে।

সুনিপুণা

সাম দান ভেদ দণ্ড চারি রাজগুণে
অমোঘ প্রয়োগ তব, অয়ি সুনিপুণে!
সামে যবে বাঁধ’ মন নাগপাশসম,
মনে হয় স্বর্গ বুঝি কাছে আসে মম;
দান কর’ সুধা যবে বিম্বাধর হ’তে
হৃদয় প্লাবিয়া যায় যৌবনের স্রোতে।
কিন্তু তবু মাঝে মাঝে অভাগার প্রতি
ভেদবুদ্ধি ঘটে কেন, অয়ি বুদ্ধিমতি,
বুঝিতে না পারি তাহা। করেছি কি দোষ
উপজয় যাহে তব নিদারুণ রোষ—
একেবারে গুরুদণ্ড করহ বিধান
নির্ব্বিচারে? মন্ত্রী তব আছে পুষ্পবাণ,
নিরন্তর আজ্ঞাবহ সকল ভুবন—
আমা প্রতি, মহারাণি, কেন এ পীড়ন!

গৃহলক্ষ্মী

তখন আছিলে শুধু রূপে সমুজ্জ্বল,
আজিকে তোমারে হেরি’ সর্ব্ব অমঙ্গল
ধীরে সরে’ যায় দূরে; মৌন প্রেমভরে
সকরুণ আঁখি অমিয় সেচন করে
অন্তরনিভৃতে শতধারে; হে প্রেয়সি,
গৃহলক্ষ্মীরূপে আজি তুমি মহীয়সী
আপন মহিমালোকে; সংসারের মাঝে
ধ্রুবতারাসম তুমি সর্ব্ব শুভকাজে,
অয়ি অচঞ্চলে! পাতিয়াছ সিংহাসন
সর্ব্বজনমনোমাঝে গৌরবে আপন;

ঘেরিয়াছে চারি ধারে কত দুঃখ সুখ,
কত উন্মেষিত আশা, কত ম্লান মুখ।
সকল হৃদয়ভার বক্ষে লহ টানি'—
তাই তুমি, গৃহলক্ষ্মি, সকলের রাণী।

বধূ

রূপে তুমি আলো কর সকল ভুবন,
প্রেমে উজলিয়া রাখ ক্ষুদ্র গৃহকোণ।
প্রতিদিন উঠি' প্রাতে দু'টি দৃষ্টিধারে
নীরবে ভরিয়া দাও স্নেহাশীষভারে
বিকচ হৃদয়গুলি; মঙ্গলাচরণ
যেন দীর্ঘ দিবসের হেরি' চন্দ্রানন
শুচিস্মিত প্রীতিশুভ্র কল্যাণবরষী—
নীহারনিস্যন্দী যথা পৌর্ণমাসী শশী
শরতের। হে কল্যাণি, প্রতি ক্ষুদ্র কাজে
তোমার কল্যাণ-রূপ অন্তরের মাঝে
আরো আসে ঘনাইয়া; তব স্নেহহাসি
সরাইয়া দেয় ধীরে অন্ধকাররাশি
হৃদয়ের; তুমি সেথা জাগ নববধূ,
রূপে তব দিক্ আলো, প্রেমে চিরমধু।

বারুণী

যখনি তোমারে হেরি, সকালে কি সাঁঝে,
আধেকমগনতনু আছ জলমাঝে
লীলালস হেলাভরে; আলোকে ছায়ায়
স্বচ্ছ তনুতট হ'তে জলের রেখায়
বেলা ধীরে যায় নেমে; নীবীবন্ধতলে
শতেক তরঙ্গ টুটে মৃদু কলকলে
ফেনহাস্যে; গা ভাসায়ে দিয়ে মহাসুখে,
হে সুখিনি, তুমি রহ চিরহাসিমুখে

তরঙ্গকল্লোলমাঝে উছসিত মনে ;
মরালীর মত ফিরাইয়া ক্ষণে ক্ষণে
সুঠাম গ্রীবাটি হের চারু অঙ্গখানি,
কভু ফেলি' দিয়া বাস, কভু বক্ষে টানি' ;
বুঝিতে না পারি তুমি নেমেছ কি জলে
অথবা খেলিছ তুমি অন্তরের তলে।

দ্বিধা

কেহ বলে, স্বর্গ তব বাঁধা বক্ষপরে—
দু'টি কুম্ভ কূলে কূলে পূর্ণ সুধাভরে ;
রসাতল, কেহ বলে, বক্ষের অতলে
বিশ্বের হৃদয় শোষি' পূরিত গরলে।
চিরদিন কাছে কাছে আছি আমি তব,
অন্তর বাহির তবু চির-অভিনব
মোর চোখে—কোথা বিষ, কোথা সুধাসর,
কোথা মন্থনের দণ্ড, কোথা নিরন্তর
ঘুরিতেছে ভাগ্যচক্র বিষামৃতে ভরি'
নাহি পাই কোন খোঁজ। সারাদিন ধরি'
চেয়ে আছি অনিমেষে অসীম বিস্ময়ে
ওইখানে—ওই তব রহস্য-নিলয়ে।
মনে হয়, আছি যেন আঁখির পলকে,
দেবতাও নাহি জানে, স্বর্গে কি নরকে।

দোঁহে

হে বধূ, তোমারি নদী, তুমিও নদীর,
অন্তরে অন্তরে দোঁহে মিলন গভীর।
তুমি না আসিলে ঘাটে সকালে সন্ধ্যায়
কপোলে ছলকি' উঠি' জানাবে সে কায়
হৃদয়বেদন যত ? কার কানে কানে
উছল যৌবনভরে মৃদু কলতানে

ঢালিবে পীযূষধারা ? সুললিত স্নেহে
জড়ায়ে শতেক পাকে সুবন্ধুর দেহে
চুম্বনে ভরিয়া দিবে ললাটে কুন্তলে
পেলব অধরপাতে ? বিবশ অঞ্চলে
আর্দ্র করি' শতধারে প্রেমলীলাভরে
ঝাঁপায়ে পড়িবে আসি' কার বক্ষপরে
দিনশেষে ? কারে দিবে ভালবাসা যত
মৌন হৃদয়ের ? আশা ও দুরাশা শত
অগাধ তলের ?
তুমি শুধু বুঝ ওই
হৃদয়বেদনা—ভাষা কলকলময়ী।
তাই দিনে শত বার নানা কর্ম্মছলে
এস এই নদীতীরে, পীন বক্ষতলে
নীলাম্বরীখানি সম্বরিয়া সযতনে,
কলসী লইয়া কক্ষে মরালগমনে।
আঁচল খসিয়া পড়ে ধীরে শিথিলিয়া
যৌবনশিখরদেশ হ'তে ! মুগ্ধ হিয়া
পুলকে মুকুলি' উঠে গাহনলালসে
ওই নীলনীরে ; না জানি কি নব রসে
চিত্ত ওঠে ভরি' ; বিবসনা লজ্জাভরে
ঝাঁপাইয়া পড় আসি' নদীবক্ষপরে
চারু বক্ষতলে ; পরিরম্ভনিপীড়নে
কি বেদনা কি সুখাশা জেগে ওঠে মনে
তন্দ্রাবেশবশে !
চারি দিকে ঘিরে' আসে
শত বাহু বাড়াইয়া তরঙ্গ-উল্লাসে
ফেনিল নীলিমা বক্ষতলে বাহুমূলে
বঙ্কিম গ্রীবার ভঙ্গে নীবীবন্ধকূলে
সর্ব্ব অঙ্গে। সুধাস্মিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে
শান্ত কর অন্তর-আবেগ ; দুই হাতে

মুছি' দাও নিদারুণ জ্বালা বিরহের ;
অধরের রাগে দূর কর হৃদয়ের
অন্ধ তমোভার ; সুখ উঠাও উথলি'
মুগ্ধ চিত্ততট ভরি' ছলছলছলি'।
অবশেষে কিছুতে না মিটে যবে আশ,
কোন মতে নাহি মিটে দারুণ পিয়াস,
সকল হৃদয়ভার কলসীতে ভরি'
লয়ে' যাও গৃহমাঝে কক্ষতলে করি'।

কলসীর সুখ

সারাদিন কক্ষে কক্ষে ঘুরি আমি তব,
চিত্তে লভি, হে প্রেয়সি, সুখ নব নব।
জলভরে নাহি হাসি ; তোমার পরশে
শূন্য কুম্ভ ভরি' উঠে কি মদির রসে।
ছল-ছল করি' উঠি' কাণায় কাণায়
বন্যা আসে রসাবেশে নিতম্বের ঘায়ে,
বাহুপাশে বিবশিয়া আসে সর্ব্ব দেহ,
বক্ষমাঝে রিণিরিণি বাজে তব স্নেহ।
পয়োধরগিরিশিরে ছেয়ে আসে মেঘ,
হৃদয়ে কলিয়া উঠে পুলক-আবেগ
শ্যাম ছায়াতলে। ঝুরু ঝুরু মৃদু বায়ে
আর্দ্র চুল উড়ে' এসে পড়ে মোর গায়ে।
সকল হৃদয় মোর ছলকি' উঠিয়া
তোমার হৃদয়তলে পড়ে বিগলিয়া।

দুর্বিপাক

লক্ষ্মী উঠেছিলা, শুনি, মন্থনের পাকে
আদি যুগে দেবতার ঘরে ; কলিকালে
নারী আসি' ধরা দেয় কিসের বিপাকে
হতভাগ্য পুরুষের ছিন্ন ভাগ্যজালে,

তাই ভাবি মনে। কি বন্ধনে বেঁধে রাখে
অচঞ্চলা করি' এই চিরচঞ্চলারে
ক্ষুদ্র বক্ষমাঝে! শূন্য বক্ষ দেয় তাকে
কি যে নিধি; মূঢ় জন বুঝিতে না পারে।
ভয় হয়, দেবতা ত করে নি ছলনা
কেহ নারীবেশ ধরি'! বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া
নেমে আসে নি ত কোন ত্রিদিব-অঙ্গনা
কুতূহলভরে—শুধু কৌতুক লাগিয়া!
কি বলি' সম্ভাষি তারে, কোথা দেই ঠাই,
আমি মুগ্ধ মানবক ভাবিয়া না পাই।

মুকুরমায়া

সম্মুখে মুকুর লয়ে' রহিয়াছ বসি',
হেরিতেছ কত ছলে চারু মুখশশী।
কখনো কজ্জলরেখা মুছ আঁখিকোণে,
কখনো কুন্তলভার সরাও যতনে
ললাটিকা হ'তে; দু'টি অঙ্গুলিকাভরে
টিপি' টিপি' বহু যত্নে অম্লান অধরে
হের রাগরক্ত আভা; স্মিত গণ্ডদেশে
টোল খায় কতখানি তাই দেখ হেসে,
অয়ি শুচিস্মিতে! অঞ্চলের প্রান্ত দিয়ে
মুছ অকলঙ্ক মুখে কলঙ্ক খুঁজিয়ে;
বাঁকায়ে গ্রীবাটি ধীরে মরালনিন্দিত
হের কবরীর শোভা মুকুরবিম্বিত।
নিজে আর প্রতিবিম্বে দুই চিরসখী
নিরন্তর আছ দোঁহে হয়ে' চোখোচোখী।

চুলবাঁধা

সকলি তোমার, সখি, হেরি অভিনব,
দেখিতে এসেছি আজি চুলবাঁধা তব।

এক হস্তে কঙ্কতিকা, অপরে সম্বরি'
দীর্ঘ কৃষ্ণ কেশপাশ সারাবেলা ধরি'
বিনায়ে বিনায়ে বেণী কি করি' কেমনে
নিবিড় কবরীবন্ধ বাঁধ আনমনে।
কি মন্ত্রে ফুটিয়া উঠে স্বর্ণসীঁথিরেখা
দু'টি করতলচাপে—স্মরপথলেখা
যেন অভিসার লাগি'। কি পরশভরে
কুন্তল কুঞ্চিয়া আসে ললাটের পরে—
মদনে বাঁধিয়া রাখ' যার শতপাকে।
অবাক্ বিস্ময়ভরে আঁখি চেয়ে থাকে ;
ভাবিয়া না পায় চিত্ত এ কি মায়াবিনী
অথবা পুরাণ' সেই ঘরের কামিনী!

সন্তরণ

আর কত বেলা ধরি' কাটিবে সাঁতার!
দিন হ'য়ে আসে ক্ষীণ, দিগন্তে আঁধার।
কখন্ নেমেছ জলে না ডুবিতে রবি,
কখন্ আসিল ঘিরে' সন্ধ্যাঘন ছবি
চারি ধারে, জানিবার আগে ; মিলে' আসে
আকাশ ধরণী ঘন আলিঙ্গনপাশে
স্রোতস্বিনীস্বুবর্ণ সৈকতে ; অন্ধকার
কৃপণের ধনসম মূরতি তোমার
ঢাকিছে অঞ্চল অন্তরালে। ছড়াইয়া
দুই বাহু, পায়ে কাটি' জল, বিথারিয়া
হেলাভরে সুখাবেশে শিথিলিত কায়,
বাঁধি লয়ে' কেশপাশ, নীবীতে জড়ায়ে
বিবশ অঞ্চলভার, যেন যাও ভেসে
বাসনার সাধনার অতীত প্রদেশে।

শ্রাবণী

নিত্য নব ছন্দোভরে চিত্ত ভরি' উঠে,
হে বরষা, তব ওই দীর্ণ বক্ষ টুটে'।
এত ধ্বনি, এত বর্ণ, এত মেঘখেলা,
এত পুষ্প, এত গন্ধ, লাবণ্যের মেলা,
এত নৃত্য, এত গান, এতেক ঝঙ্কার,
কোথা তব ছিল ঢাকা এত মনোভার!
কি নির্ঝরে বাহিরিল মুক্ত নব প্রাণ,
কি প্রবাহে মুখরিল পূর্ণ কলতান;
কি আলোকে, হে মায়াবি, তুলিলে ফুটায়ে
বিচিত্র এ চিত্রলেখা, কি ঘন ছায়ায়
নিবিড় করিয়া আন নিখিল সংসারে
অন্তরকুলায়মাঝে; কি কুহকহারে
হৃদয়ে হৃদয়ে কর চকিত-বন্ধন;
কূল নাহি পেয়ে কোথা' আকুল যৌবন!

অসমাপ্ত

মনে হয় শেষ করি—কিন্তু কোথায়?
বলিবার যাহা ছিল সব রয়ে যায়।
এ বাদলে কোন কথা জমে নাকো ভাল,
এ বাতাসে আর্দ্রবক্ষে নাহি জ্বলে আলো।
নিবিড় তিমিরভরে ঘনায় যে ব্যথা
মন-অন্তস্তলে, ভাষা তার নাহি কোথা
পাই খুঁজে' খুঁজে'। মেঘচন্দ্রে, বৃষ্টিধারে,
তড়িত-চকিতে, সুচিভেদ্য অন্ধকারে,
ঘননীল মেঘে, নিবিড় তমালবনে,
আর্দ্র বসুধাসৌরভে, বিরহগহনে,
কোন্ ব্যর্থ অভিসারে, কখন্ কোথায়
ফুটে ফুটে করি' যেন মিলাইয়া যায়।
মিছে আশে দিশে দিশে ঘুরিছে হৃদয়,
বলিতে আসিয়া আর বলা নাহি হয়।

মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনা

এক রাত্রি

(বালকের রচনা)

বসন্তের মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। গাছপালাগুলি শ্যামল পত্রের নূতন বসন পরিধান করিয়া যৌবনগর্ব্বে স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। এইরূপ একটি দিনে বর্দ্ধমান হইতে কিঞ্চিৎ দূরস্থিত একটি মাঠে একটি মনুষ্যের আব্‌ছা আব্‌ছা ছায়া দেখা যায়।

দিবাকর সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রামলাভার্থে অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। পৃথিবী এখন তাঁহার তীব্র কটাক্ষপাতের হস্ত হইতে মুক্তি পাইয়া কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিদ্রার আয়োজন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। চন্দ্রমা একটু একটু করিয়া আপনার হাসি হাসি ঢল ঢল মুখখানি বাহির করিতেছেন, মেঘগুলি হিংসায় সেই মধুমাখা মুখখানি আপনাদের কালো কালো কাপড় দিয়া ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছে। বাতাস থাকিয়া থাকিয়া এক-একবার সজোরে সোঁ সোঁ করিয়া উঠিতেছে। বৃষ্টি পড়িব পড়িব করিতেছে; কিন্তু বোধ হয়, বসন্তের খাতিরে পড়িয়া লজ্জায় পড়িতে পারিতেছে না। ঠিক এইরূপ সময়ে সেই ছায়াটিকে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকটে দেখিতে পাওয়া গেল।

বৃক্ষটি বহুদিনের পুরাতন। উহা ঐ স্থানে যে কত দিন হইতে বিরাজিত, তাহা কেহই বলিতে পারে না। নিকটস্থ গ্রামের বৃদ্ধদিগের মতে ঐ বৃক্ষটি তাঁহাদিগের প্রপিতামহের বয়স্ক। কিন্তু তাহাও তাঁহারা নিশ্চয় বলিতে পারেন না। গাছটির চারি ধারে মাটি উঁচু করিয়া একটি বসিবার স্থান প্রস্তুত আছে। ঐ উচ্চ ঢিপির নিম্নদেশে চারিধারে সবুজ রঙের ঘাস। নিকটস্থ গ্রামের কৃষকগণ যখন মাঠে চাষ করিতে আসে, তখন মাঝে মাঝে ঐ বৃক্ষতলস্থ ঢিপির উপর বসিয়া বিশ্রাম করে। দুই প্রহরের রৌদ্রের সময় ঐ বৃক্ষটি কৃষকদিগের একমাত্র আশ্রয়স্থান। বিকাল বেলায় দু'একদিন দুই চারিটি অল্পবয়স্ক বালককেও সেই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা ঐ গাছটির চারি ধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করে। কখনও কখনও খেলিতে খেলিতে দুই একটি বালকের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদও হইয়া থাকে, কিন্তু হাতাহাতি বড় একটা হয় না। গাছটির নিম্নদেশে এক আধ দিন দুই চারিটি বৃদ্ধেরও সমাগম হয়। ছুটাছুটির পরিবর্ত্তে বৃদ্ধদিগের মধ্যে তাস খেলা, দাবা খেলা ও খোস গল্পেরই কিছু প্রাদুর্ভাব, এই জন্য যে দিন বৃদ্ধ-সমাগম হয়, সে দিন গ্রামের নানা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ধান্য কি রকম হইল, এ বৎসর কয় আনা আন্দাজ হইবে, কা'র ঘরে চালে কটা কুমড়া হইয়াছে, অমুকের বিবাহ কবে, পাত্রটি কেমন, এবং ইহা বাদে অমুক কেমন লোক, অমুক কেমন খাইতে পারে, কা'র বাড়ী আজ কি রান্না হইয়াছিল, এবং

পরিশেষে কে কেমন ভোজন করাইতে পারে, ইত্যাদি নানা রকম কথা সে দিন সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল কথার মাঝে মাঝে 'ইস্তক পঞ্চাশ' 'কিস্তি মাৎ' প্রভৃতি দুই চারিটি কথার উচ্চ নিনাদ, এবং তাশ পেটার চটাশ্-চট্ শব্দও শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ শব্দের সহিত হুঁকার ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ খানিকটা করিয়া ধোঁয়ার সহিত আকাশে উত্থিত হইতে থাকে। বৃক্ষটির একটি উচ্চ ডালে একটি বেশ বড় রকমের মধুমক্ষিকার, চাক্ আছে। সেই চাকের চারি ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মৌমাছিরা প্রায়ই গান করিতে থাকে। বৃক্ষটি সেই গুন্ গুন্ শব্দে নিদ্রাপরবশ হইয়া মধ্যাহ্নকালে বাতাসে ঢুলিতে থাকে। গাছটির গাত্রে স্থানে স্থানে প্রায়ই দুএকটি পিপীলিকার দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গগুলির নিকটে যাইলে অনেক সময় মনুষ্য-মহারাজগণকেও বিপদে পড়িতে হয়। বাল্যকাল হইতে সৈনিককার্য্য শিক্ষা করিয়া পিপীলিকা-সৈন্যগণ তাহাতে এত পাকা যে, তাহাদের কোন কার্য্যই বড় একটা সৈনিক ধরণধারণের বিপরীত হয় না। তাহারা সৈন্যশ্রেণীর ন্যায় সারি সারি চলিতে থাকে। সন্ধ্যার সময় নানা স্থান হইতে আসিয়া পাখীগুলি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ডালে ডালে কিচিমিচি করিতে থাকে। রাত্রিকালে গাছটি নীরবে বসিয়া কত কি ভাবিতে থাকে—কত দুঃখের সুখের কথা তাহার মনে পড়ে, কত অতীতের কথা তাহার সেই বৃহৎ গুঁড়িটির মস্তকে আসিয়া উপস্থিত হয়, কত বালকের খেলা, কত বৃদ্ধের মাথা চুলকান, কত হুঁকার বাদ্যধ্বনি এবং কত শত মধুমক্ষিকার গুন্ গুন্ গান তখন তাহার মনে ধীরে ধীরে প্রবেশ করে, অবশেষে কখন্ নিশীথে নিদ্রা আসিয়া স্বপ্নে তাহার ডালপালা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে।

পথিক এক্ষণে সেই বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া এক এক বার আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। মেঘের ছিদ্র দিয়া দুই চারিটি মাত্র তারা দেখা যাইতেছে। দূর হইতে বজ্রের গম্ভীর গর্জ্জন শুনা যাইতেছে; অবিরল বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চকিতচ্ছটা মাঠে বৃক্ষে বৃক্ষে আঘাত করিতেছে। কিন্তু বৃষ্টি অধিক পড়িতেছে না, কেবল মাঝে মাঝে তড়বড় করিয়া দুই চারি ফোঁটা মাত্র বৃষ্টি পড়িতেছে, আবার থামিয়া যাইতেছে। চন্দ্রমা এক এক বার মেঘের কৃষ্ণসাগরে ডুব দিতেছেন, আবার এক এক বার আপনার সেই মধুমাখা মুখ পৃথিবীর দিকে তুলিতেছেন। বৃক্ষের নিম্নদেশ দিয়া একটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট শৃগাল দৌড়িয়া গেল। পথিক ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না যে—কি গেল, সুতরাং পথিকের মন কল্পনা সর্ব্বোচ্চ ডালে চড়িয়া বাদুড়ের মত দোদুল্যমান হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে শৃগালপাল "হুক্কা হুয়া" রবে চীৎকার করিতেছে, দু একটা খেঁকী কুকুর শৃগালদিগকে সাড়া দিতেছে, ইহা ভিন্ন সে সময় ঐ স্থানে অন্য আর কোন শব্দ হয় নাই। পথিক এই সব শব্দ শুনিয়া এক এক বার চমকিয়া উঠিতেছে। রাত্রি অধিক হয় নাই। চন্দ্রমা মেঘে

জ্বালায় কোন্ দিক্ দিয়া মুখ বাড়াইবেন, ভাবিয়া পাইতেছেন না। এদিকে বৃক্ষটির একটি কোমল পত্র আস্তে আস্তে খসিয়া পড়িতেছে—এখনও পৃথিবীর বক্ষ স্পর্শ করে নাই। একটি বাদুড় একাকী নিঃশব্দে গগনপথে সন্তরণ করিতে করিতে চলিয়াছে, এমন সময়ে পথিকের মনে কে জানে, এক কি ভয় আসিয়া উপস্থিত হইল। পথিক মনে মনে 'ত্রাহি মধুসূদন' 'ত্রাহি মধুসূদন' করিতে লাগিল। ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর ঘুমের ঘোরে একটি পাখী ডানা ঝাড়া দেয়, তাহারই ঝটপট শব্দ পথিকের ভয়ের কারণ। পথিক কল্পনা-চক্ষু দ্বারা কি সব অদ্ভুত জন্তু দেখিতে পাইল, এবং স্থির করিল যে, উহারাই কোথায় যেন উসুখুসু করিতেছে। এই ভাবিয়াই তাহার প্রাণটা 'ত্রাহি ত্রাহি' করিতেছিল।

চাঁদ আর দেখা যায় না। কেবল ঘোর কালো মেঘের ভিতর দিয়া এক স্থানে কা'র একটি চাপা হাসি ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বৃষ্টি মুষলধারে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই জলে অশ্বত্থ বৃক্ষটি মনের সাধে স্নান করিতেছে, সেই জল পান করিয়া, মাঠের ফসলগুলি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতেছে, ঘাসগুলি আপন গাত্র হইতে মনুষ্যের ও অন্যান্য জীবের পদধূলি ধুইয়া পরিষ্কার করিতেছে। পথিক জলে ভিজিয়া ভিজিয়া এক এক বার আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, মেঘগুলিকে প্রকাশ্যে না হউক, মনে মনে গালি দিতে ছাড়িল না। খুব খানিকটা বৃষ্টি হইয়া মেঘ শীঘ্র কাটিয়া গেল। বৃষ্টি থামিয়া গেল। চন্দ্রমা এত ক্ষণে মেঘের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পৃথিবীর সমস্ত জলস্থলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, পথিক আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

আকাশে মেঘ না থাকাতে পূর্ণিমার চাঁদ আবার হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার সেই স্নিগ্ধ আলোকের জ্যোতি বৃক্ষের পত্রে, ঘাসের শ্যাম মখমলের উপর প্রতিফলিত হইতেছে। নালা নর্দ্দমায় জল দাঁড়াইয়াছে, সেই জলের মধ্যে জ্যোৎস্নালোক ঝিকিমিকি করিয়া খেলা করিতেছে। পথিক এখন ধীরে ধীরে একটির পর একটি করিয়া পদ অগ্রসর হইতেছে। কাদার উপরে পা পড়াতে পথিকের পদতল, পথিকের পাঁচটি অঙ্গুলি কর্দ্দমের উপর অঙ্কিত হইয়া যাইতেছে। চলিতে চলিতে পথিক মাঝে মাঝে দুই এক খাবল করিয়া মুড়ি খাইতেছে।

পথিকের রং শ্যামবর্ণ, দেখিতে নেহাৎ মন্দ নহে, ললাটদেশের দক্ষিণভাগে একটি আঁচিল আছে, সেই আঁচিলের চারি ধারে দুই-চারিগাছি পাতলা চুল ফর্ ফর্ করিতেছে; তাহাদিগকে দেখিলে মনে হয় যে, তাহারা যেন এক একটি 'তালপত্রের সিপাহী'। ললাট-দেশের বামভাগে একটি কাটা দাগ আছে, সেটি বোধ হয়, বাল্যকালে পড়িয়া যাওয়ার দাগ। নাসিকা মধ্যম গোছের, সেই নাসিকাগিরির দুইটি গহ্বর হইতে অবিশ্রাম ফোঁস্ ফোঁস্ শব্দ হইতেছে। পথিকের হস্তে একটি বংশের লাঠি ও একটি মান্ধাতার আমলের

ছাতি। ছাতিটিতে যে বিশেষ জল আটকায়, তাহা ত বোধ হয় না। পথিকের স্কন্ধদেশে একটি ঝুলি। সেই ঝুলির মধ্যে পথিকের 'সর্ব্বস্ব' বিদ্যমান। তেল বল, তামাক বল, মুড়ি বল, যাহা যাহা প্রয়োজনীয়, সেখানে সব আছে। পথিকের বিষয় যাহা বলা হইল, ইহাই হইয়াছে; সুতরাং এইবারে আস্তে আস্তে সরা যাউক।

আকাশের তারাগুলি সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা এক একটি করিয়া বিশ্রামের জন্য আকাশগর্ভে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে, সূর্য্যদেব সমস্ত রজনী নিঃশব্দে ঘুমাইয়া এখন উঠিবার জন্য পাশ ফিরিতেছেন, পূর্ব্বদিক্ শীঘ্রই প্রাতঃসূর্য্যের রক্তিমাছটায় রঞ্জিত হইবে। আমরা পথিকের সহিত এক রাত্রি জাগরণ করিয়া এখন ধীরে ধীরে গৃহে ফিরি। ['বালক', জ্যৈষ্ঠ ১২৯২]

চন্দ্রপুরের হাট

(বালকের রচনা)

চন্দ্রপুর হাট নদীর খুব নিকটেই। নদী হইতে উঠিয়া একটি সরু গলির মতন রাস্তা আছে। এই রাস্তা দিয়া খানিকটা যাইলেই হাট।

রাস্তাটি অত্যন্ত সরু। দুই জনের অধিক মনুষ্য এক সঙ্গে পাশাপাশি যাইতে পারে না। রাস্তার দুই ধারে গাছপালা জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে এক একটি পর্ণকুটীর। কিন্তু কুটীরগুলির দরজা এই সরু রাস্তার দিকে নয়। এই রাস্তাটিতে বর্ষাকালে প্রায় এক হাঁটু জল দাঁড়ায়। অন্যান্য সময়েও রাস্তাটি কর্দ্দমময় হইয়া থাকে। রাস্তার জায়গায় জায়গায় আবার দুএকটা লতাগাছ এদিক্ হইতে ওদিকে গিয়াছে। অনেক সময় মুটেদের মাথার মোট লাগিয়া লতাগাছগুলি ছিঁড়িয়া যায়। এই পথটি দিয়া যাইলেই হাট।

হাটের দিন এই পথ দিয়া সমস্ত দিনই লোকজন যাতায়াত করে। সকলেরই মুখে একটা ব্যস্তসমস্ত ভাব। কাহারও মুখে বড় একটা হাসিখুসীর ভাব পাওয়া যায় না। সকলেই গম্ভীর। এই পথের সম্মুখেই নদী।

নদীর ধারে সারি সারি নৌকা। কোন নৌকায় আলু পটল, কোন নৌকায় শাক সবজি, কোন নৌকায় হাড়ি কলসী ইত্যাদি রহিয়াছে। নৌকার মাঝিরা এ ওঁকে ডাকে, ও তাকে ডাকে, এইরূপ ব্যস্ত। কোন মাঝি হয় ত কাঁচকলা তুলিতেছে, কোন মাঝি হয় ত হাত নাড়া দিয়া কাহাকেও ডাকিতেছে, আবার কোন মাঝি হয় ত দাঁত খিঁচাইয়া কাহাকেও তাড়া দিতেছে। মাঝির পাশেই একজন গম্ভীর মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সেই এই

সকল জিনিষের অধিকারী। সে ভারি ব্যস্ত—একে ডাকে, ওকে ডাকে, তাকে ধমকায়, কেবল ইহাই করিতেছে।

নদী হইতে যে পথটি গিয়াছে, সেই পথ দিয়া জিনিষপত্র যায় বটে, কিন্তু জনসাধারণ সে পথ দিয়া বড় একটা কেহ যায় না। আমরা একবার জনসাধারণ যে পথ দিয়া হাটে প্রবেশ করে, সেই পথ দিয়া যাই। এ পথটি চন্দ্রপুরের বাবুরা প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন, সেই জন্য ইহার নাম "বাবুদের রাস্তা" হইয়াছে।

এ পথটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নদীতীরের পথের ন্যায় অপ্রশস্ত ও কর্দ্দমময় নহে। পথটি বরাবর চন্দ্রপুরের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। পথের দুই ধারে জল যাইবার জন্য নালা কাটা আছে। বর্ষাকালে বৃষ্টি হইলে পথে জল না দাঁড়াইয়া এই সকল নালা দিয়া গিয়া একেবারে নদীতে পড়ে। নালার ধারে ধারে বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে। নালার ওদিকে বাঁশঝাড়, আমবাগান, নিচুবাগান ইত্যাদি রহিয়াছে। এই সকল গাছপালার মধ্য হইতে এক একটি ক্ষুদ্র কুটীর উঁকি মারিতেছে। এই পথের ধারেই হাট।

হাট প্রতি শনি মঙ্গল বারে বসে এবং ইহাতে অনেক লোকের সমাগম হয়। বিশেষতঃ পর্ব্বোপলক্ষে হাটে ভয়ানক জনতা হয়। বারোয়ারি পূজার সময় ভিড়ে একটা গাছ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সময় সময় চন্দ্রপুরের বাবুরা জনতা নিবারণের জন্য হাটে চার পাঁচ জন দ্বারবান রাখিয়া দেন।

হাটে প্রবেশ করিয়াই একটি প্রকাণ্ড বটগাছ। গাছটির তলায় জনকতক দোকানদার বসিয়া তামাকু টানিতেছে ও ক্রেতাগণের সহিত দরকষাকষি করিতেছে। এই গাছটির পরেই একটি কামিনীফুলের গাছ। কামিনী গাছটির তলায় বসিয়া একজন ত্রেতাযুগের বুড়ী হাঁড়ি কলসী ইত্যাদি বিক্রয় করিতেছে। কোনও জায়গায় একটি আম্রবৃক্ষের তলে বসিয়া কেহ কতকগুলা আতা বিক্রয় করিতেছে, কোথাও একটি গুণচটের উপরে বসিয়া এক বুড়ী আমড়া বিক্রয় করিতেছে, কেহ হয় ত হাজার দু হাজার জাম লইয়া এক জায়গায় বসিয়া রহিয়াছে এবং "ওগো মশায়, এই আমার কাছে নেও'সে খুব ভাল জাম" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। মেছুনীরা নানা জাতের মাছ লইয়া বসিয়া আছে, হয় ত একজন ক্রেতা চারি আনার জায়গায় দুই আনা বলিয়াছে, অমনি পালে পালে মেছুনী একেবারে নথ নাড়া দিয়া তাহাকে খাইতে আসিয়াছে। দু একজন মেছুনী এক আধ টান তামাকু টানিতেও ছাড়িতেছে না। এক জায়গায় জনকতক তন্তুবায় মোটা মোটা কাপড় লইয়া বসিয়াছে, এবং ক্রেতাকে "আর দুগণ্ডা পয়সা দিও, আর দুগণ্ডা পয়সা দিও" বলিয়া ডাকিতেছে। খরিদ্দারও "হবে না, হবে না" করিতে করিতে চলিয়াছে। তন্তুবায়গণ "আচ্ছা, নাওসে গো" বলিয়া খরিদ্দারকে ডাকিতেছে এবং নিকটে আসিলে "আর দু'ট পয়সা দিয়ে

যাও” বলিয়া আপ্যায়িত করিয়া খরিদ্দারের কথানুযায়ী মূল্য লইয়াই ছাড়িয়া দিতেছে। হাটের মধ্যে এইরূপ ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে যত দূর সম্ভব, দর কষাকষি চলিতেছে।

আজ মঙ্গলবার। দ্বিপ্রহর। একটুও বাতাস নাই; এমন কি, একটি গাছের পাতাও নড়িতেছে না। স্নানের বেলা হইল, লোকে কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, অনেকেই অল্প কথায় চটিয়া গরম হইয়া উঠিতেছে।

হাটের মাঝখান দিয়া একটি বেশ প্রশস্ত পথ গিয়াছে। এই পথ দিয়া চন্দ্রপুরের বাবুদের একজন সরকার ও একজন হিন্দুস্থানী দ্বারবান চলিয়াছে। হাটটি চন্দ্রপুরের বাবুদের, এই জন্য তাঁহারা প্রতি হাটে তোলা পাইয়া থাকেন। কেহ একটা মৎস্য, কেহ আধ সের আলু, কেহ গোটাকতক কাঁচকলা, আবার কেহ কেহ দুই তিনটি পয়সা দিয়া থাকে। ইহারা সেই তোলা আদায় করিয়া বেড়ায়।

আমাদের ঘোষেদের বাড়ীর মধুসূদন, গায়ে তেল মাখা, গলায় কাঠের মালা, কাঁধে গামছা, হাতে ঝুড়ি, আম্রবৃক্ষের তলায় গিয়া কতকগুলি শাক সবজির দিকে অঙ্গুলি বাড়াইয়া বিক্রেতাকে কহিল—“এ কত করে?”

সে বলিল—“আধ পয়সা।”

মধুসূদন কহিল—“কড়ি আছে?”

সে বলিল—“আছে।”

এই বলিয়া সে অর্দ্ধ পয়সার কড়ি আনিয়া মধুসূদনকে দিল। মধুসূদন তাহাকে একটি পয়সা দিয়া কতকগুলি পুঁইশাক লইয়া চলিল। আজ আহারের ব্যবস্থাটা হইবে ভাল।

এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সূর্য্যের প্রখর জ্যোতি অনেকটা ম্রিয়মাণ হইয়া আসিয়াছে। দু একটি সাদা সাদা মেঘ দূরস্থিত বৃক্ষাবলীর মস্তকের উপরে ঢুলিয়া পড়িতেছে। হাটের অধিকাংশ লোকই গৃহে ফিরিয়া গিয়াছে। দুই চারি জন দোকানদার কত পয়সা পাইয়াছে, তাহাই গণিতেছে। নদীতীরে কেবল একখানি মাত্র নৌকা আছে, আর সমস্ত নৌকা ফিরিয়া গিয়াছে। “বাবুদের রাস্তা” দিয়া মাঝে মাঝে রাখালেরা এক এক পাল গরু চরাইয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ খুব ধুলা উড়ার ধুম পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে এক একটা গাভী হম্বা হম্বা রবে ডাকিতেছে। ঐ দেখ, একটি লোক এখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই। নদীতীরে দাঁড়াইয়া আছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। অন্ধকারে চারি দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে কিন্তু এখনও একটু একটু আলো আছে। সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছে, নীলিমা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছে। পাখীগুলি চারি দিক্ হইতে আসিয়া স্ব স্ব বাসস্থানের দিকে চলিয়াছে।

আকাশের এক বিজন প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র তারকা আপন মনে চাহিয়া আছে। লোকটি এই সময়ে আবার হাটে প্রবেশ করিল।

হাট এখন জনশূন্য। সেথায় একটিও জনপ্রাণী নাই। গাছগুলি মস্তক অবনত করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে দুএকটি পরিত্যক্ত খড়ের চাল চারটে বাঁশের খুঁটির উপর দাঁড়াইয়া। হাটের মধ্যস্থিত পথটির স্থানে স্থানে দুএকটি শাক সবজির পাতা ডাঁটা ইত্যাদি পড়িয়া রহিয়াছে। লোকটি এই পথ দিয়া বরাবর চলিতেছে।

তাহার হস্তে একটি গামছা রহিয়াছে। সেই গামছায় কতকগুলি ফল মূল বাঁধা আছে। লোকটি ধীরে ধীরে এই পথ দিয়া আসিয়া "বাবুদের রাস্তায়" উপস্থিত হইল।

নগরপ্রান্তে একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর। কুটীরের সম্মুখে কতকগুলি গাছপালা রহিয়াছে। এই গাছপালাগুলির এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র ডোবা। এই ডোবার দুই চারি হাত তফাতেই কুটীরদ্বার। দ্বারের এক পার্শ্বে গোটাকতক ঘাস আর এক পার্শ্বে গোটাকতক ধানের গাছ গজাইয়াছে। দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে একটু ছোট বারাণ্ডা মতন আছে, বারাণ্ডার এক পার্শ্বে ঢেঁকি। ঘরের মধ্যে কতকগুলি হাঁড়িকুড়ি সাজান রহিয়াছে, কোনও হাঁড়িতে চারিটি চাউল, কোনও হাঁড়িতে চারিটি কলাই, কোনও হাঁড়িতে চারিটি ক্ষুদ ইত্যাদি রহিয়াছে। ঘরের কোণে ইন্দুরের গর্ত্ত। ইন্দুর মহাশয়গণ সুরঙ্গপথ দিয়া আসিয়া কুটীরস্বামীর দানশীলতার পরিচয় লইয়া থাকেন এবং কিচিকিচি করিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যান। কুটীরস্বামী কলিযুগের লোক, এই জন্য তিনি এরূপ নিঃস্বার্থ উপকারীদিগকে মারিবার চেষ্টায় ফিরিয়া থাকেন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কদাচিৎ কৃতকার্য্য হয়েন। এই ঘরের লাগাও আর একটি ঘর আছে। ঘরের উপর হইতে একটি বাঁশ ঝুলিতেছে, সেই বাঁশের পরে কতকগুলি ময়লা কাপড় ঝুলিতেছে। ঘরের এক পার্শ্বে একটি সিন্দুক। তাহার উপরে একখানি মাদুর পড়িয়া আছে। ইহা ভিন্ন সে ঘরে অন্য কোন আসবাব নাই। উঠানের অপর দিকে যে দুএকটি ঘর আছে, তাহারা আরও ক্ষুদ্র, সেই জন্য তাহাদের কথা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

লোকটি কুটীরদ্বারে গিয়া বারকতক "দরজা খোল, দরজা খোল" বলিয়া কাহাকে ডাকিল, দরজা শীঘ্রই খুলিয়া গেল। লোকটি আস্তে আস্তে ভিতরে প্রবেশ করিল।

এক্ষণে বেশ অন্ধকার হইয়াছে। সূর্য্যতেজ একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে। অসংখ্য তারকামালা আকাশবক্ষে শোভা পাইতেছে। জোনাকী পোকা এক এক বার টিপ টিপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। ঝিঁঝিঁ পোকা ঝিঁঝিঁ করিতেছে। লোকটি আপন গৃহে পঁহুছিয়াছে এবং আমরা তাহাকে পঁহুছাইয়া দিয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছি।

['বালক,' শ্রাবণ ১২৯২]

বনপ্রান্ত

(ছবি)

বনটি বহুদূরবিস্তৃত নয়, কিন্তু খুব ঘন। স্থানে স্থানে, এমন কি, সূর্য্যালোক পর্য্যন্তও পঁহুছায় না। নানাপ্রকার বড় বড় গাছপালার মধ্যে মধ্যে এক একটি পলাশগাছে লাল লাল ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহা ভিন্ন কোথাও বড় বড় তালগাছ আকাশ ধরিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। কোথাও একটি বৃদ্ধ বটবৃক্ষ একটি পুরাতন ভগ্ন প্রাচীরের সহিত সহস্র বন্ধুত্ব-বাঁধনে মিলিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া সহস্র বাহুতে কোলাকুলি করিতেছে। কোথাও একটি ক্ষুদ্র বন্যলতা একটি বড় পেয়ারা গাছকে জড়াইয়া উঠিতেছে এবং পেয়ারা গাছটি তাহার সমস্ত ডালপালা সমেত তাহার পানে সস্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচুটি গাছ বড় গাছের ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। কোন কোন স্থানে একটি বৃক্ষ হইতে আর একটি বৃক্ষ পর্য্যন্ত মাকড়সারা জাল নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সকল গাছপালার মধ্য দিয়া ভাঙ্গা বাঁকাচোরা রাস্তা গিয়াছে।

রাস্তাটি যে বরাবর স্পষ্ট, তাহা নহে। রাস্তার মধ্যে মধ্যে বড় বড় ঘাস জন্মিয়া আশেপাশের ঘাসগুলির সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া বা এই বন দিয়া গরুর গাড়ীটি ক্যাঁচ-কোঁচ করিতে করিতে চলিয়াছে।

সহরের গরুর গাড়ীর মত এ গাড়ী খোলা নহে। দুই চারিটা বাঁশের খিলান মত করা আছে, তাহার পরে একটি কাপড় বিছান। গাড়ীর সম্মুখভাগে গাড়োয়ান একটা চাবুক হস্তে বসিয়া রহিয়াছে এবং আবশ্যক হইলে বা না হইলে সেই চাবুকের বাঁট দিয়া গরুদিগের পৃষ্ঠে মাঝে মাঝে গুঁতা দিতেছে। ইহা বাদে মাঝে মাঝে তাহাদিগকে দুই চারিটি মনুষ্যোচিত গালি এবং অসংখ্য 'হ্যাট্ হুট্' দিবারও বিরাম নাই।

যাইতে যাইতে গাড়ীর সম্মুখে একজন বুড়ী পড়িল। গাড়োয়ান "এই বুড়ী" করিয়া অমনি একটা হাঁক্ দিল। বুড়ী কিঞ্চিৎ সরিয়া গিয়া বিড়বিড় করিতে করিতে কহিল, "আ মর, মিন্সে চোকে কি দেখ্‌তে পাস্ নে! আ মোলো যা।" কিন্তু ইহা বলিয়াও বুড়ীর মনস্তুষ্টি হইল না। বুড়ী আপন মনে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাল বক্‌বক্ করিয়া কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইল। গাড়োয়ান আর অধিক কিছু না বলিয়া গরুদিগকে এক এক বার লেজমলা দিয়া "হেট্ হুট্" করিতে করিতে চল্লিল।

বেশ বেলা হইয়াছে। সূর্য্যদেব বহুক্ষণ উঠিয়াছেন। তাঁহার উজ্জ্বল রশ্মিগুলি বৃক্ষের পত্রে, কোথাও শ্যামল ঘাসের পরে, কোথাও একটা ভগ্ন প্রাচীরের উপরে বিভক্ত হইয়া

পড়িয়াছে। নীলাকাশের অধিকাংশই শাদা হইয়া আসিয়াছে। সমীরণের শীতলতা কতকটা কমিয়া আসিয়াছে। গরুর গাড়ীটি এই সময়ে বনের প্রান্ত ভাগে আসিয়া দাঁড়োইল।

বনের প্রান্তভাগে একটি প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের ধারে ধারে নালাগুলিতে জল দাঁড়াইয়াছে। সূর্য্যালোক তাহারই মধ্যে ঝিকিমিকি করিয়া উঠিতেছে। কৃষকেরা এখনও কেহ কেহ আসে নাই। এই মাঠের মধ্যে গাড়োয়ান গরু দুইটিকে খুলিয়া দিল।

গরু দুইটি খোলা পাইয়া মনের সাধে ঘাস খাইয়া বেড়াইতে লাগিল। গাড়োয়ান একটা গাছে ঠেস দিয়া মুড়ী চিবাইতে লাগিল। আরোহীরা গাড়ী হইতে নামিয়া কেহ গাছতলায় বসিল, কেহ জল পান করিল, কেহ স্বীয় শরীরে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিল, এবং কেহ কেহ সজোরে এক আধ টান তামাকু টানিয়া অনেকটা ধোঁয়া বাহির করিয়া দিল। যাহা হোক, আরোহীদিগের স্নানাহার শীঘ্রই শেষ হইল এবং সকলে নিদ্রার আয়োজন করিতে লাগিল।

বনের প্রান্তভাগে অধিক গাছপালা না থাকায় কেহ কেহ গাড়ীর মধ্যে শয়ন করিল। দুএকজন বাহিরে শয়ন করিল। গাড়োয়ান প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা এদিক্ ওদিক্ করিয়া গরু দুইটিকে ধরিল এবং নিজে মাটিতে শয়ন করিল। বলা বাহুল্য যে, শীঘ্রই সকলে নিদ্রামগ্ন হইল।

এখন দ্বিপ্রহর। সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে পৃথিবী তাতিয়া উঠিয়াছে। গাছপালাগুলি গ্রীষ্মের প্রখর তাপে অবসন্ন হইয়া ম্লানমুখে ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাতাস একটুও নাই, সব নিস্তব্ধ। কৃষকেরা মাঠে আপন মনে কাজকর্ম্ম করিতেছে। কেহ স্নান করিতেছে, কেহ পুষ্করিণীতে নামিতেছে, কেহ কাপড় ছাড়িতেছে, কেহ একটি গাছের তলায় বসিয়া ভাত খাইতেছে, কেহ ভাতের গ্রাস মুখে করিয়া একটা ডাঁটা চিবাইতেছে, এবং কেহ ভাত খাইয়া তামাকু টানিতেছে।

মাঠের মধ্যস্থলে একটি অশ্বত্থবৃক্ষ আছে। তাহার তলে বসিয়া একজন কৃষক তাহার ছোট মেয়েটির সঙ্গে গল্প করিতে করিতে ভাত খাইতেছে। মেয়েটি বলিল, “বাবা, আজ চচ্চড়িটা কেমন হয়েছে?”

বাবা। বেশ হয়েছে মা, তুমি আমার মা, যা রাঁধ, তাই কেমন বেশ খেতে হয়।

এই বলিয়া কৃষক কাঁসার ঘটি হইতে ঢক্ঢক্ করিয়া খানিকটা জল পান করিল। জল পান করিয়া কৃষক মেয়েটির নিকট হইতে একটি পান লইয়া খাইল এবং তাহাকে এক ছিলিম তামাকু সাজিতে বলিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ হুঁকার জল ফিরাইয়া চক্মকি ঠুকিয়া আগুন করিয়া তামাক ঠিক করিল। কৃষক তামাকু টানিতে লাগিল। মেয়েটি স্থানটি

জল দিয়া পরিষ্কার করিয়া ভাতের বাসনকোসনগুলি লইয়া একটি পুষ্করিণীর ধারে গেল এবং বাসনগুলি বেশ করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া লইয়া গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল।

মেয়েটি চলিয়া গেলে কৃষক খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু গ্রীষ্মের প্রখরতা-প্রযুক্ত তাহার শীঘ্রই তন্দ্রা আসিল। কৃষক থাকিয়া থাকিয়া এক এক বার ঢুলিতে লাগিল এবং শীঘ্রই নিদ্রাদেবীর অনুগ্রহভাজন হইল।

আমার সেই গরুর গাড়ীটি আবার চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গাড়ীও চলিয়াছে, বেলাও চলিয়াছে। কিন্তু তাহার চাকার শব্দ নাই, তাহার চলার বিরাম নাই, তাহার যাত্রার শেষ নাই। সে যে সুনীল অনন্ত ক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া অবিশ্রাম চলিতেছে; সেই সুনির্ম্মল ক্ষেত্রে তাহার চাকার একটি চিহ্নও পড়ে না, কেবল তাহার চারি দিকে তাহার পথের পার্শ্বে তারা ফুটিয়া উঠে, চাঁদ হাসিয়া চায়, সূর্য্য জাগিয়া উঠে; তাহার চারি দিকে জনকোলাহল, জন্ম মৃত্যু, সংসারের যোঝাযোঝি; কিন্তু সে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, মুখের উপরে গভীর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া, একাকী নিঃশব্দে মাঝখান দিয়া চলিয়া যাইতেছে। কোথাও বা বীজ বপন করিয়া যাইতেছে, কোথাও বা শস্য কাটিয়া যাইতেছে। কেহ তাহাকে কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে কথার উত্তর দেয় না। ['বালক', আশ্বিন-কার্ত্তিক ১২৯২]

পুলের ধারে

চাঁদ উঠিয়াছে। পূর্ণচন্দ্র পৃথিবীতে জ্যোৎস্না ঢালিয়া দিতেছে। সহরের বড় বড় বাড়ীগুলি যেন স্নানের পর শুভ্র নববস্ত্র পরিধান করিয়া হাসিতেছে। আর গঙ্গার জলে চন্দ্রকিরণ পড়িয়া তাহাকে কি চমৎকার সাজাইয়াছে। তাহার ছোট ছোট তরঙ্গগুলি যেন এক একটি জ্যোৎস্নার ঢেউ। জলের সঙ্গে যেন গঙ্গার কোনও সম্পর্ক নাই—সবই জ্যোৎস্না। দুই পার্শ্বে বড় বড় জাহাজের মাস্তুলগুলা চাঁদের দিকে দীর্ঘ হাত বাড়াইয়া আছে। মাঝখানে পুলটা যেন একটা বৃহৎ অজগর সর্প পড়িয়া রহিয়াছে—হিমে তাহার শরীর ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, নড়িতে চড়িতে পারিতেছে না। রজনী যেন এই পুলটার বুকের পরে তাহার সমস্ত ভর দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া আছে। আজ এই পুলের এক ধারে দাঁড়াইয়া স্বর্গ মর্ত্ত্যের মিলনদৃশ্য দেখিতে বড় চমৎকার! পৃথিবীর সহিত চাঁদের স্নেহ মিশিয়াছে, আর পৃথিবীর সন্তানগণের হৃদয়ের প্রেম তাহাতে গিয়া মিলিয়াছে। কি মধুর ভাব! কি মধুর কবিত্ব! আকাশের মেঘগুলি (কেন বলিতে পারি না) মধ্যে মধ্যে চাঁদের মুখের পরে ঢাকা দেয়, পৃথিবী এবং চাঁদের মধ্যে আড়াল করিয়া

দাঁড়ায়। তুইটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তুই ভগ্নী কিয়ৎকালের জন্য অশ্রুভরা চোখে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

জ্যোৎস্না রাত্রে গঙ্গার ধারে দাঁড়াইলে শ্মশানের মাধুরী কেন মনে উদয় হয়? আমি এই পুলের ধারে দাঁড়াইয়া জ্যোৎস্নায় শ্মশানের চিতাধূম দেখিতেছি। তুমি হয় ত কঙ্কাল মড়ার মাথা দেখিয়া বলিবে যে, ইহাতে আবার মাধুর্য্য কোথায়? কিন্তু শ্মশানদৃশ্যে যে মাধুর্য্য আছে, লোকালয় দৃশ্যেও সেরূপ মাধুর্য্য আছে কি না সন্দেহ। মনে কর দেখি যে, যখন গভীর নিশীতে চতুর্দ্দিকের নিস্তব্ধ ভাবের মধ্যে নিশীথিনীর ঘোর অন্ধকারের আবরণ ভেদ করিয়া "হরি বোল" শব্দের সহিত একটা চিতা শবসমেত পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইতেছে আর চতুর্দ্দিক্ হইতে সহস্র কঙ্কাল এক ভয়ানক গম্ভীর স্বরে বলিতেছে "আয়"— সমস্ত শ্মশানভূমি তাহার সুদীর্ঘ শুষ্ক বিশাল্ বক্ষ প্রসারিত করিয়া মেদিনীর গভীর অভ্যন্তর হইতে ডাকিতেছে "আয় আয়"—তখন তুমি একলা যদি সেই শ্মশানে বসিয়া থাক, তাহা হইলে তোমার মনে একটি গম্ভীর ভাবের অস্পষ্ট ছায়া পড়ে কি না। সেই যে অস্পষ্ট ভাবের ছায়া পড়ে, তাহাতেই তুমি মাধুর্য্য দেখিতে পাইবে—বালকবালিকার পুতুলখেলা দেখিতে পাইবে। কি মজার খেলা! এই আজ আসিলাম, কাল হাসিলাম, একবার কাঁদিলাম আর এক বৃহৎ সমুদ্রে গা ভাসাইয়া দিলাম। দিয়া কোথায় চলিলাম? কে জানে। সবই যেন খেলা, আবার সবই যেন সত্য। সবই যেন মধুর, আবার সবই যেন ম্লান। সবেতেই যেন গাম্ভীর্য্য, আবার সকলেতেই যেন অট্টহাসি। অভিনয় অভিনয়, এ জগতের সবই অভিনয়—না সব সত্য ঘটনা। অভিনয় কোথায়! সব ছেলেখেলা—না, তাহাও নহে, এ ছেলেখেলা নয়। তবে কি! কিছুই না, আবার সবই। এ যেন একটা মস্ত হাসি, আবার এ যেন একটা মস্ত কান্না। এ কি পাগলামি! না, তাহাও নহে। এই এক মজা—হাস কাঁদ।

* * * *

পুলটার যেন এই কয় ঘণ্টার মধ্যে একটা ভয়ানক পরিবর্ত্তন দেখিতেছি। তাহার উপর দিয়া যেন একটা পরিবর্ত্তনের ঝড় বহিয়া গিয়াছে।—একটা ফরাসী বিপ্লব-গোছ কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তুমি বিশ্বাস করিবে না; বলিবে যে, এ কোন গুলির আড্ডার কথা, আগাগোড়া নেশার ঝোঁকে দেখা। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এ কোন গুলির আড্ডার কথা নহে। জগতের বৃহৎ ইতিহাসের এক জায়গায় খুলিয়া দেখ, আমি যাহা যাহা বলিলাম, সমস্তই দেখিতে পাইবে। শুদ্ধ তাহাই নহে, আমি যে এই এখানে বসিয়া লিখিতেছি—কলমদেবের কমল-চরণে অবিরাম কালি অঞ্জলি দিতেছি, তাহাও সেই বৃহৎ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা আছে। আমার এই লেখার প্রতি অক্ষর সেই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাইবে। আর

আমার এ লেখার যে আগাগোড়া সব সত্য, তাহারও পরিচয় পাইবে। গভীর নিশীথে চন্দ্রের সেই যে শোভা দেখিয়াছিলাম, এখন আর তাহা নাই। সেই যে প্রেমের মিলন দেখিয়াছি, তাহা এখনও আছে; কিন্তু সে প্রেমের জ্যোতি যেন ম্লান হইয়া গিয়াছে। চাঁদের মুখ যেন শুকাইয়া আসিয়াছে। রজনী উষার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া অগাধ নিদ্রায় মগ্না। তাহার কালো চুলগুলি আলুথালু হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার মুখের উপর উষার স্নেহদৃষ্টি ও শুভ্র কান্তিচ্ছটা পড়িয়াছে। গঙ্গা নিয়মিত কাজ করিয়া যাইতেছে, কিন্তু সে জ্যোৎস্না নাই। গঙ্গা এখন জলেরই গঙ্গা—জ্যোৎস্নার নয়। এ কি কম বিপ্লব! কোথায় গেল সেই সব আকাশভরা তারা, কোথায় গেল চাঁদ! কোথা হইতে চোখ রাঙাইয়া সূর্য্য উঠিল! আমি পুলের ধারে এই ক'ঘণ্টা দাঁড়াইয়া আছি, ইতিমধ্যে কখন পৃথিবীটা ঘুরিয়া গেছে—আকাশের গ্রহ-তারকারা কে কোথায় সরিয়া গেছে—কেবল আমি আর এই সহস্রচরণবিশিষ্ট হাবড়ার পুল এক জায়গায় খাড়া দাঁড়াইয়া আছি। প্রতি দিনই এক রাত্রির মধ্যে এত বড় বড় বিপ্লব ঘটিয়া যায়, অথচ আমরা তখন কেমন আরামে ঘুমাইয়া থাকি, জানিতেই পাই না, আমাদের সে জন্য কিছু চিন্তা করিতেই হয় না।

পুলের শেষে জনকতক লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক জন পরমানন্দে দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে তামাকু টানিতেছে। পাহারাওয়ালা বেচারী নীরবে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভদ্রলোক গুঁতাইতে না পারার দুঃখে গান ধরিয়াছে। একজন সাহেব দুইটা ঘোড়া লইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। আলো সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু আর দেরীও নাই। অসংখ্য মাড়োয়ারি গঙ্গার ধারে বসিয়া বসিয়া "সীতারাম" করিতেছে। আর মধ্যে মধ্যে "শ্রীকৃষ্ণ মুরারি" ও "রাধাকৃষ্ণ" ধ্বনি তাহাদের কর্ণকুহরে গিয়া বজ্রের ন্যায় আঘাত করিতেছে। মাড়োয়ারি স্ত্রীলোকেরা কেহ গানে, কেহ পূজায়, কেহ স্নানে, আর কেহ পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্তা। পুরুষেরা কাপড় নিংড়াইতে নিংড়াইতে অনেকে গান করিতেছে, কেহ লাউরূপী ভুঁড়িটি বাহির করিয়া দিয়া মুরুব্বির ভাবে বসিয়া রহিয়াছে, কেহ উপবীত পরিষ্কার করিতে করিতে স্নান করিতেছে,-আর কেহ কেহ (বলিতে সাহস হয় না) গাঁট কাটিবার সহজ উপায়ের বিষয়ে চিন্তামগ্ন রহিয়াছেন। পাণ্ডারা গঙ্গার ঘাটে যেন ভারি পরিচিত, এই ভাবেই অনেকের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। টাঁকশালের ধারে সারি সারি গাছগুলির বড় শোভা হইয়াছে। একটা ঘাটের পার্শ্বে গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানদিগের মহাসভা বসিয়াছে। নদীর ধারে বিশ ত্রিশখানা নৌকা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছে। গঙ্গার ধারে মালগাড়ীর জন্য যে রেলপথ আছে, তাহার উপরে একটা এঞ্জিন ফোঁস্ ফাঁস্ করিতে করিতে যাইতেছে আর আসিতেছে। একজন দ্বারবান এক অপ্রয়োজনীয় লাঠনের বোঝা বহিয়া এদিক্ ওদিক্ ঘুরিতেছে। একটা রোগা

খিট্‌খিটেগোছের খোট্টা আর এক জনকে বলিতেছে, "আরে মৎ যাও, রেল আতা হ্যায়।" সে "কাঁহা" বলিয়া তাহার ক্ষীণকণ্ঠে যতদূর সাধ্য, এক চীৎকার ছাড়িয়া আপনাকে পরম বীরপুরুষ বলিয়া মনে করিতেছে। টাঁকশালের উত্তর-পুর্ব্ব কোণে দুইটা পাহারাওয়ালা এক জায়গায় জড় হইয়া ষোল আনা দন্তের ছটা বাহির করিয়া হাস্যরস আস্বাদনে নিযুক্ত। তাহাদের নিকটেই একজন খালাসী গাদাখানেক কয়লা লইয়া অগ্নিশর্ম্মাকে চটাইবার চেষ্টা করিতেছে। রাস্তার এ ধারে একজন সন্ন্যাসী আগুন জ্বালিয়া বসিয়া আছে। এবং লোকের কাছে নিজের পরম সাধুভাব জানাইতে কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পথের ধারে একটা বাড়ীতে "জয় গোবিন্দ" ইত্যাদি গান হইতেছে। আর রতন সরকারের পথে দুই জন লোক ঝগড়া করিতে করিতে চলিয়াছে। ঝগড়া মুখে মুখেই চলিয়াছে—বাঙ্গালীর হাতে পক্ষাঘাত। মনে মনে বকিতে বকিতে কোথায় আসিলাম। এ যে দেখি, আমাদেরই সেই বাড়ী—যে বাড়ীর প্রতি ইটকাঠের সহিত আমাদের কত দিনের স্নেহ প্রেম ভক্তির যোগ আছে। ইহার পুরাতন দেয়ালের ফাটলগুলিও মনে হয়, যেন অতীতের স্বহস্তে লিখিত সোনার অক্ষর। গলির মোড়েতেই দেখি না একখানা বেরুশ গাড়ী রাস্তা জুড়িয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর আড়াল ছাড়াইতেই বাড়ীর সমস্ত মুক্ত দ্বারগুলি হইতে যেন শত স্রোতে প্রেমের সম্ভাষণ আসিয়া আমাকে টানিয়া লইল। সে প্রেমের মাধুরী কি বলিব! তাহার জ্যোতিতে আমার মুখমণ্ডল জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিল, তাহার হাসিতে আমার হাসি মিলাইয়া গেল। সমস্ত জগৎ যেন আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার ছাতে দেয়ালে আশে পাশে অদৃশ্য হইয়া মিশিয়া গেল, বাড়ীর বাহিরে আর কিছু বাকী রহিল না। ['বালক,' ফাল্গুন ১২৯২]

সন্ধ্যা

গিয়েছে ডুবিয়া রবি,
জগত সেজেছে কবি,
মধুর সুকণ্ঠ ল'য়ে গাহিছে অমৃত গান ;
সাঁঝের অবশ কায়,
তাপিত দক্ষিণা বায়
শুনি সেই মহাগান শীতল করিছে প্রাণ।
ধীরি ধীরি তারাগুলি
আসিতেছে আঁখি মেলি
জগতের মহাগানে মিলাইতে নিজ তান।

চন্দ্রমার হাসি মুখ,
সেথা আর নাহি দুখ,
আনন্দে উঠেছে মাতি আর মুখ নাহি ম্লান।
গগনের নীল কোলে
ভেসে ভেসে যায় চ'লে
শাদা শাদা মেঘগুলি "চাঁদ আয় আয়" বোলে।
চুমিয়া চাঁদের মুখ
পাসরিয়া সব দুখ
চুমটী ফিরিয়ে নিয়ে হেসে হেসে যায় চ'লে।
আকাশ সিন্দূর কায়া
ধরণীতে রাঙা ছায়া
রাঙা সুত্রে ধরা যেন মিলেছে নীলিমা সনে।
প্রণয়ের সুখে ভোর,
ছেয়ে আসে ঘুম ঘোর,
রাঙা মেঘ নেমে আসে ধরণীর কালো বনে।
প্রেম-সুধা পিপাসায়
গৃহ পানে সবে যায়
ভাই ভাই খেলা করে ভাই ভাই হাসে খেলে।
মাতিয়াছে আলিঙ্গনে
গানে গানে প্রাণে প্রাণে
রাগিণী গলিয়া গিয়া মিলায় রাগের কোলে।

['বালক,' ফাল্গুন ১২৯২]

মিলন

(বালকের রচনা)

জগতের প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটা মজ্জাগত মিলন আছে। প্রতি বড় বড় জিনিষের মধ্যে একটি মিলন আছে আর প্রতি ছোট খাট জিনিষের মধ্যেও একটি মিলন আছে। পৃথিবীর সহিত চন্দ্রের একটা মিলন আছে আবার পৃথিবীর সন্তানেরও তাহার সঙ্গে একটা

মিলন ভাব আছে। যখন চন্দ্রের প্রেমের হাসির উজ্জ্বল অথচ মধুর রশ্মিগুলি পৃথিবীর বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়া আবার চন্দ্রে গিয়া পঁহুছায় আর তাহার সঙ্গে গঙ্গার প্রেমের হাসি নৌকার প্রেমে প্রতিবিম্বিত হইয়া পৃথিবীর প্রেমের একটি ফোঁটা হইয়া গিয়া চাঁদের প্রেমের সহিত গাঢ় আলিঙ্গন করে, তখনই বুঝা যায় যে জগতে প্রেমের কিরূপ মিলন, অগাধপ্রেমের সহিত কণা প্রেমের কি মধুর সম্বন্ধ। আরও খুঁটাইয়া দেখিতে গেলে আরও মধুর ভাব দেখিতে পাইবে। এই প্রেমের মধ্যে সহস্র প্রেমকণা ভাসিতেছে। এইরূপে ক্রমে দেখিবে যে অসংখ্য প্রেমকণা অসংখ্য প্রেমসমুদ্রে মিলাইয়া গিয়া মধুরে মধুর মিশাইতেছে।

জ্যোৎস্না রাত্রে যদি নদীতীরে দাঁড়াইয়া থাকা যায়, আকাশের নিবিড় নীলিমার মাঝে চাঁদের মুখের পানে এক এক বার চাহিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে জগতের অনন্ত প্রেমের কিরূপ মিলন, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। তুমি যদি খানিক ক্ষণ চাঁদের দিকে একমনে চাহিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, চাঁদ তাহার সহস্র কিরণ-হস্ত বাড়াইয়া দিয়া তোমাকে—শুদ্ধ তোমাকে কেন, সমস্ত পৃথিবীকে "কোলে আয়" বলিয়া ডাকিতেছে। জগতে যদি প্রেমের মিলন না থাকিত, প্রেমের উৎস না থাকিত, তাহা হইলে পৃথিবীর সন্তানকে কি কখনও চাঁদ স্নেহের চক্ষে, প্রেমের চক্ষে দেখিতে পারিত। আরও দেখ, সে সময়ে তোমার হয় ত চাঁদের কোলে যাইতে ইচ্ছা হইবে, তথাপি যাইতে পারিবে না। কেন পারিবে না? জগতে প্রেমের মিলন আছে, আকর্ষণী শক্তি আছে, তাই পারিবে না। চাঁদ তোমাকে প্রেমভরে স্নেহভরে ডাকিতেছে বটে, কিন্তু পৃথিবীও তোমাকে তাহার প্রেমে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অনেক সময় আমরা পৃথিবীর স্নেহের গভীর তল স্পর্শ করিতে পারি না। মায়ের গভীর ভালবাসা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। সন্তান হইলেই যদি মায়ের গভীর ভালবাসা বুঝিতে পারিত তাহা হইলে মিঠাইএর লোভে ছোট ছেলে ভুলিত না। কিন্তু সকলে বুঝে কি? এ স্নেহের গভীর জলে সকলে ডুবিতে পারে কি? সকলের সে ক্ষমতা কোথায়? সে মহত্ত্ব কোথায়? এই জন্য অনেক সময় আমরা পৃথিবীর স্নেহ প্রেম ভাল রকম না বুঝিয়া চাঁদে যাইতে, হেথা যাইতে, সেথা যাইতে চেষ্টা করি। কিন্তু পৃথিবী নাকি আমাদিগকে তাহার প্রেমে বিষম জোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছে; তাই যাইতে পারি না—খানিক পরে আবার পৃথিবীর প্রেমের গভীরতা বুঝিতে পারিয়া নিরস্ত হই। এইরূপ জগতের প্রতি অণু পরমাণু পর্য্যন্ত প্রেমের বন্ধনে বাঁধা আছে, কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না।

গঙ্গা যমুনা উভয়েই হিমালয়ের কন্যা, কিন্তু ভিন্ন পাত্রে সমর্পিতা, সুতরাং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাৎ হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। কিন্তু প্রেমের এমনি মিলন, হৃদয়ের যথার্থ

ভালবাসার এমনি মিলন যে, যমুনা গঙ্গাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিল না—সে গঙ্গাতে আসিয়া মিশিল, দুই ভগিনী একত্র হইল। আবার দেখ, কিছু দূর বহিয়া আসিয়া আসিয়া গঙ্গার কত সন্তান সন্ততি হইল। তাহারা এ এদিকে, ও সে দিকে করিয়া বিচ্ছিন্ন হইল—পরস্পরকে ছাড়িয়া চলিল। তুমি বলিবে এ দৃশ্য বড় কঠোর—এ দৃশ্যে বড় নিষ্ঠুর ভাব বড় সঙ্কীর্ণতা, জগৎ যদি প্রেমময় হয় তাহা হইলে জগতে এরূপ দৃশ্য থাকিতে পারে না, ইহাতে প্রেমের মাধুরী একটুও নাই। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে এ দৃশ্যে অতিশয় মাধুর্য্য আছে, প্রেমের কোমল ভাব আছে, উদার ভাবের পরিচয় আছে। মুরশিদাবাদে আসিয়া তাহারা কেন বিচ্ছিন্ন হইল, একত্র কেন রহিল না? ইহার কারণ তাহারা উদারতার ভাণ জানে না, উদারতার মধ্যেও যে সঙ্কীর্ণতা করিতে হয় তাহা তাহারা জানে না। তুমি একটা ছোট কার্য্যে হাত দিতে রাজি নহ কারণ তোমার মনে সঙ্কীর্ণতা বিদ্যমান। তুমি চাহ যে কিসে একটা মস্ত নামওয়ালা কাজ করিব, কাজ যত হোক্ না হোক্ নাম হইবে, উদারতার কার্য্য কর না কর বারকতক উদারতা উচ্চারণে তোমার জিহ্বার ব্যায়ামটা করিতে পারিবে। ইহাদের সে উদ্দেশ্য নহে, পৃথিবীর উপকার করিতে ইহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে—কার্য্য শেষ হইলেই আবার একত্র মিলিত হইবে। সমুদ্রের ধারে গিয়া ইহাদের কার্য্য শেষ হইয়াছে, ইহারা সমুদ্রের কোলে মিলিত হইয়াছে। হৃদয়ের অন্তস্তলে যথার্থ প্রেমের বীজ না থাকিলে এরূপে মিলিত হইতে পারে না। জগতের প্রতি ছোট বড় জিনিসের মধ্যেই এইরূপ অল্পবিস্তর প্রেমের ছটা দেখিতে পাওয়া যায়, প্রেমের মিলনের চমৎকার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারা যায়। এই প্রেম আছে বলিয়াই জগৎ টিকিয়া আছে, নয় ত সে নিতান্ত মরুভূমি বা শ্মশানের ন্যায় হইত। ['ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৩]

সন্ধ্যা

সন্ধ্যার লজ্জাশীলা তারকাগুলি যখন লজ্জাবনত মুখে আকাশের কোলে বাহির হয়, তখন ছাদের উপর দাঁড়াইয়া অনন্তের বিমল সৌন্দর্য্যের মুখচ্ছবি ভাবিতে কি আনন্দ! —তখন জগতের বিশালতা অনুভব করিতে কেমন ভাল লাগে! এই বিশাল সৌন্দর্য্যের কবিত্বের ছায়ায় আমাদের প্রাণ মন ঢাকিয়া যায়, আমাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে এ জগতের সৌন্দর্য্য বসিয়া যায়। সন্ধ্যার আধো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়া আমাদের প্রাণে ভাবের শত সহস্র হিল্লোল আসিয়া আঘাত করে এবং সংসারের সমস্ত কোলাহল ভাসাইয়া লইয়া গিয়া আমাদের প্রাণের মধ্যে শান্তি স্থাপন করে। সন্ধ্যার সুকোমল ছায়ায় আমাদের

প্রাণ শীতল হইয়া যায়। এই জন্য সন্ধ্যার ছায়া আমাদিগের অত ভাল লাগে—তাই আমরা সন্ধ্যার সময় জগতের সৌন্দর্য্য ও কবিত্ব বেশ অনুভব করিতে পারি।

এই বিশ্বজগতের প্রতি স্তরে স্তরে কবিত্ব মাখান। চরাচর শত সহস্র কবিতার সংগ্রহ। চন্দ্র সূর্য্য তারকারা একেকটি কবিতা। এই বিশ্বজগৎ এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার মালা। শত সহস্র উজ্জ্বল তারকাবলী এই মালায় গ্রথিত হইয়া শোভা পাইতেছে—কত শত চন্দ্র সূর্য্য এই মালার মধ্যে ফুল আকারে বিরাজ করিতেছে। সৌন্দর্য্যের সূত্রেই চন্দ্রতারকাবলী গাঁথা রহিয়াছে। সমস্ত দিবস মালাটির তেমন সুগন্ধ থাকে না। সন্ধ্যায় তাহার সুগন্ধ বিকশিত হয়—তাহার হাসি ফুটিয়া উঠে। সন্ধ্যার রক্তিমচ্ছটায় মালাটি হাসিতে থাকে। মনুষ্য হাসি ভাল বাসে, সুগন্ধও সে চায়। তাই সে সন্ধ্যার কোলে বসিতে চায়—তাই সে সন্ধ্যার মুখে চুম্বন করিতে ভাল বাসে। সন্ধ্যা তাহার হৃদয়ের ধন। সন্ধ্যায় সে ভাবুক।

মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশের তলে সন্ধ্যায় বসিয়া থাকিতে কি আরাম! আমাদের হৃদয়ের সমস্ত মালিন্য দূর হইয়া গিয়া সেও যেন আকাশের মত নির্ম্মল হয়। আমাদের প্রাণ আনন্দে উথলিয়া উঠে—মনে হয়, সাঁঝের তারার সহিত মিলাইয়া এক হইয়া যাই। সন্ধ্যা আমাদিগের মনের সঙ্গে খেলা করিতে বড় ভাল বাসে। সে মানবহৃদয়ে নানা রকম খেলার ভাব তুলিয়া দেয়, কিন্তু তাহার সকল খেলাগুলিই গাম্ভীর্য্যমাখা—তাহার খেলায় গাম্ভীর্য্যের মধ্য দিয়া যেন ফুটফুটে হাসি দেখা দিতেছে। হাসি সুন্দর, কিন্তু নিতান্ত ফেক্‌ফেকে হাসির সৌন্দর্য্য নাই। যে হাসি গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে ফুটিয়া বাহির হয়, তাহাই যথার্থ সুন্দর। এই কারণে সন্ধ্যার খেলা বড় সুন্দর; কেন না, তাহার হাসি গাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে বিকাশিত হইতেছে। এইরূপ সুন্দর হাসির আধার বলিয়াই সন্ধ্যা মানুষের প্রিয়।

সমস্ত গগন নীল। কেবল দূরে দূরে এক একটি শুভ্র মেঘের টুকরা ধীরে ধীরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার এই দৃশ্যে কি গম্ভীর ভাব। কি মধুর হাসি। মেঘগুলি যেন নীলিমার চাপা ঠোটের এক একটি হাসির টুকরা। তাহারা যেন চাপা থাকিতে না পারিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যা এই হাসিগুলিকে সাজাইয়া দেয়—তাহাদের সৌন্দর্য্যকে আরও সুন্দর করিয়া তুলে। সন্ধ্যার আশ্রয়ে এই হাসিগুলি ফুটিয়া উঠে। তাই সন্ধ্যার এত গৌরব—তাই সন্ধ্যার সময় জগতের সৌন্দর্য্য দেখিবার উপযুক্ত সময়—তাই সন্ধ্যার প্রাণ কবিত্বমাখা।

আবার সন্ধ্যার আধো আধো অন্ধকারের মধ্য দিয়া যখন সূর্য্যের সিন্দুর বর্ণ পদচিহ্ন-সকল আকাশের অবারিত নীলিমার একপ্রান্তে চন্দ্রের শুভ্র হাসিতে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া

হাসিতে থাকে তখন আকাশের কি চমৎকার শোভা! সন্ধ্যা না হইলে এ শোভা কেহ ফুটাইতে পারে না তাই সন্ধ্যা কবি।

সন্ধ্যায় আমাদের হৃদয়তন্ত্রী নাচিয়া উঠে—হাসির আলোকে প্রাণ ভরিয়া যায়। চারি দিকের কবিত্বের মধ্যে থাকিতে থাকিতে আমরাও যেন কতকটা কবি হইয়া পড়ি—আমাদের নিতান্ত অসাড় প্রাণেও যেন সন্ধ্যায় কবিত্বের হিল্লোল উথলিয়া উঠে। আমরা সমস্ত দিবস সংসারের কীট হইয়া শত সহস্র কোলাহলের বোঝা বহন করিয়া সন্ধ্যায় বিশ্রাম করিতে থাকি। আমাদের ক্লান্ত অবসন্ন পরাণকে শান্তির পথে অগ্রসর করিতে থাকি। সংসারের বাহ্য চাকচিক্যে আমাদের ঝলসিত চক্ষু সন্ধ্যার সময়ে যেন আবার তাহার পূর্ব্বদৃষ্টি লাভ করে। সমস্ত দিন আমরা কৃত্রিমতার মধ্যে থাকিয়া সন্ধ্যার সময় প্রকৃতির পানে ফিরিয়া চাই। সন্ধ্যায় আমরা প্রকৃতির সন্তান—সমস্ত দিন আমরা কৃত্রিমতার দাস।

আমরা প্রকৃতির সন্তান হইয়াও সংসারের কুটিলতার মধ্যে থাকিতে থাকিতে প্রকৃতিকে ছাড়িয়া অনেক দূরে চলিয়া যাই। চব্বিশ ঘণ্টা কৃত্রিমতার সঙ্গে বাস করিতে করিতে আমাদের আচার ব্যবহার প্রকৃতির অনুযায়ী না হইয়া প্রায় কৃত্রিমতার অনুযায়ী হয়। সন্ধ্যার ছায়ায় যেন আমাদের কৃত্রিম ভাব ঢাকা পড়িয়া যায়—কৃত্রিমতা দূরে চলিয়া যায়। সন্ধ্যা আমাদিগকে প্রকৃতির নিকটে লইয়া আসে, আমাদের হৃদয়কে কতকটা প্রাকৃতিক ভাবে গঠিত করিয়া তুলে। প্রকৃতি সত্য। সুতরাং সন্ধ্যা আমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়—আমাদের প্রাণের মধ্যে সত্য ঢালিতে থাকে। সন্ধ্যা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ সরল করিয়া তুলে, নিতান্ত কুটিলতা হইতে একটু দূরে লইয়া যায়।

সন্ধ্যা প্রেমের মিলনস্থান। সন্ধ্যায় জগতের প্রেম বেশ ফুটিয়া উঠে—সাঁঝের আলোকে তাহার পরিস্ফুট বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যা প্রেমের হাসি। সন্ধ্যা না হইলে প্রেমের হাসি ভাল দেখা যায় না—জগতের সৌন্দর্য্যের তেমন বিকাশ হয় না। সন্ধ্যার হাসিতে কত ফুল ফুটে—তাহারা আবার কত প্রেম ছড়ায়। এইরূপ সন্ধ্যাকালে চারি দিকে প্রেম ফুটিয়া উঠে—চারি দিকে সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়। সন্ধ্যা প্রেম বিলায়—আমাদের হৃদয়ে প্রেম ফুটাইয়া দেয়। তাই সন্ধ্যা প্রেমিক।

গাছেদের মাথায় সন্ধ্যার সময় যখন সূর্য্যের সোনালী রশ্মিগুলি খেলা করিতে থাকে—গাছেদের কোমল পত্রে বসিয়া দুলিতে থাকে, তখন প্রেমের কি চমৎকার হাসি দেখিতে পাওয়া যায়! তখন মনে হয় যেন চরাচর চরাচরের প্রেমে ঢলঢল—প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুর প্রেমে টলমল। তখন মনে হয়, বিশ্বসংসারে প্রেমের তরঙ্গ উঠিয়াছে—জগৎ প্রেমে গলিয়াছে, প্রেমের হিল্লোলে জগতের প্রাণের হিল্লোল মিলিয়াছে। তখন সন্ধ্যাকে প্রকৃত প্রেমিক—প্রেমের প্রকৃত শিক্ষয়িত্রী বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যা আমাদিগকে সসীম হইতে অসীমের পানে লইয়া যাইতে চায়—অসীমের পানে যাইবার জন্য আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দেয়। সসীম সৌন্দর্য্যে নিতান্ত মুগ্ধ না হইয়া সন্ধ্যা আমাদিগকে অসীম সৌন্দর্য্যের পানে ফিরিয়া চাহিতে বলে। সন্ধ্যা অসীমের ভাব কতকটা প্রকাশ করে। অসীমের সামান্যতা সন্ধ্যা আমাদিগকে স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়। সন্ধ্যা আমাদিগের হৃদয়-দ্বার খুলিয়া রাখিতে পরামর্শ দেয়। সে বলে যে, দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিজের উন্নতির পথ রুদ্ধ করিও না। সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক ভাবের মধ্যে আমাদিগের মন প্রাণ আবদ্ধ করিতে সন্ধ্যা সহজে দিতে চাহে না। আমাদের সম্মুখে অসীম ভাব আনিয়া দিয়া সে আমাদের প্রাণের দ্বার খুলিয়া দেয়। আমাদের প্রাণের বদ্ধ হাওয়া বাহির হইয়া যায়।

সন্ধ্যা প্রেমিক—সন্ধ্যা কবি। জগতে সন্ধ্যা প্রেম বিলায়—জগতে সে সৌন্দর্য্য বিকশিত করিয়া দেয়। কবি না হইলে কবিত্ব প্রকাশ করিতে পারে না। সন্ধ্যা কবি; তাই সে জগতের কবিত্ব বুঝাইতে কতকটা সক্ষম হয়। কবিত্ব সীমাবদ্ধ হইতে পারে না—তাহাতে তাহার শ্রী নষ্ট হইয়া যায়। সন্ধ্যায় আমরা জগতের যে কবিত্ব দেখি, তাহার মধ্যে কোথাও বদ্ধ ভাব দেখি না। সন্ধ্যার কবিত্ব এই জন্য বড়ই সুন্দর—সন্ধ্যার প্রাণ এই জন্য প্রেমপূর্ণ। সন্ধ্যায় আমরা দেখি ও বেশ বুঝিতে পারি যে,

"ছন্দে উঠিছে তারকা
ছন্দে কনক রবি উদিছে।" ['ভারতী ও বালক,' আষাঢ় ১২৯৩]

উষা ও সন্ধ্যা

মিলনদৃশ্য বড় চমৎকার। বিশেষতঃ দুইটি বিপরীত বস্তুর মিলন অতি সুন্দর। দুইটি জিনিসেরই সৌন্দর্য্যটুকু ফুটিয়া উঠে। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য বিরাজ করে। আলো আর অন্ধকার দুইটি বিভিন্ন বস্তু। দুইটি পরস্পরের ঠিক বিপরীত। উষায় ও সন্ধ্যায় এই দুই জিনিসের মিলন দেখিতে পাওয়া যায়।

বেশ ভূষাতেও সন্ধ্যা ও উষার মধ্যে কেমন একটা ঐক্য আছে। উষা সিন্দুর পরে—সন্ধ্যাও সিন্দুর পরে। উষার রক্তিম অধরে হাসি উথলিয়া উঠে—সন্ধ্যারও রক্তিম অধরে হাসি মাখান। কিন্তু উভয়ের হাসি যেন এক না। দুই জনের হাসি দুই রকমের। একজনের হাসি কতকটা যেন বালিকার মত। উষা বালিকা। উষাকে দেখিলে মনে হয়, যেন আলুথালু চুলে সে লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে। সন্ধ্যার যেন কিছু গম্ভীর হাসি। উষাপেক্ষা সন্ধ্যা যেন জগতের সুখ দুঃখ বুঝে বলিয়া মনে হয়। উষা ছোট মেয়ে।

ফুল তুলিয়া লাফালাফি করিয়া বেড়াইতে সে পটু। তাহার যেন ঐ কাজ! সন্ধ্যা যুবতী—উষার মত নিতান্ত ছোট মেয়ে নয়। সে সংসারের কাজ কর্ম্ম সারিয়া দু'দণ্ড ছাতে আসিয়া বসে। আবার খানিক পরে ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যায়। সন্ধ্যার সিন্দুররাগে সন্ধ্যাকে সধবা বলিয়া মনে হয়। উষার সিন্দুররাগ দেখিলে মনে হয়, উষা এখনও কুমারী। যেন দিদির কৌটা হইতে খানিকটা সিন্দুর লইয়া পরিয়াছে।

উষা বসন্তের গালভরা হাসির টুকরার মত ছুটাছুটি করিয়া আসে, ছুটাছুটি করিয়া যায়। সে জগৎকে মালা গাঁথিয়া পরাইবার জন্য আঁচল ভরিয়া কত ফুল লইয়া আসে—নিঃসঙ্কোচে টুপ্‌টাপ্ করিয়া ফুল পাড়িয়া আঁচল ভরিয়া ফেলে। সন্ধ্যার সহসা ফুলগুলি তুলিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। শুভ্র হাসির মত প্রাণের মত স্বর্গের ফুলগুলিকে সে কেমন করিয়া তুলিবে—কেমন করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গের শান্তি হইতে মর্ত্ত্যের কোলাহলে লইয়া আসিবে! কিন্তু ফুলেরা দুটি বোনকে বড় ভালবাসে। দুটি বোনের কাছে থাকিতে পারিলে তাহারা আর কিছুই চাহে না। উষা তাহাদের লইয়া খেলা করে বলিয়া তাহাদের কত আনন্দ, সন্ধ্যাকেও তাহারা প্রাণের মত ভালবাসে। সন্ধ্যা পাছে মর্ত্ত্যের কোলাহলে তাহাদের স্বর্গের শান্তি ডুবিয়া যায়, এই ভাবিয়া তাহাদিগকে সহজে আনিতে চাহে না। কিন্তু তাহারা সন্ধ্যার সঙ্গে না আসিয়া থাকিতে পারে না। সন্ধ্যা কাজে কাজেই অতি সন্তর্পণে তাহাদিগকে লইয়া আসে।

উষাকে আমরা স্নেহ করি। সে প্রত্যহ আমার বিছানার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়—তাহার কচি কচি হাত দুখানি দিয়া আমাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দেয়। আমার ঘুম ভাঙ্গিলেই উষা ক্রমে ক্রমে সরিয়া যায়। অনেক ক্ষণ ধরিয়া ডাকাডাকি করিলেও সে দিন আর ফিরে না।

সন্ধ্যা যেন কতকটা আমাদিগের সুখ দুঃখের কথা বুঝে, সন্ধ্যার সঙ্গে আমরা কত কি সাংসারিক কথাবার্ত্তা কই। জীবনটার কথা সন্ধ্যার সময় মনে পড়িয়া যায়। জীবনটা কি রকমে কাটিবে, জীবনের দশা কি হইবে, ইত্যাদি বিষয়ে সন্ধ্যার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। সন্ধ্যা আমাকে অনেক উপদেশ দেয়—জীবন, সংসারের বিষয় অনেক শিক্ষা দেয়। সন্ধ্যা সংসারের সব বেশ বুঝে। সে বলে যে, সংসারে থাক, কিন্তু সংসারেই থাকিও না। সন্ধ্যার সময়টা এই রকমেই কাটিয়া যায়।

উষা সন্ধ্যার ছোট বোন। সন্ধ্যা ঘরকন্না দেখে, উষা খায় দায়, হাসে খেলে। সন্ধ্যা ঘরে ফিরিয়া গিয়া উষার মুখে একটি স্নেহের চুম খায়। প্রত্যহ উষা আসিবার সময় সন্ধ্যা তাহার গায়ে মাথায় ছোট ছোট সাদা সাদা ফুল দিয়া সাজাইয়া দেয়।

সন্ধ্যা গোঁলাপ ফুল—তাহার হাসিখানি গোলাপের মত ; উষা শিউলী ফুল—তাহার হাসিটি শিউলির মত। ['ভারতী ও বালক,' ভাদ্র ১২৯৩]

অশ্রুজল

ডুবে আছি স্বপনের কোলে
ছায়াময় জগৎ সংসার,
একা আসি একা যাই চ'লে
কেহ নাই কথাটি কবার।

জীবনের মহান্ সম্বল
দু ফোঁটা নীরব অশ্রুজল,
ফোটে তাহে ফুল শত শত
জগতে বিলা'তে পরিমল।

আশা শুয়ে নিরাশার ছায়ে,
হাসি লেগে শ্মশানের গায়ে,
থেকে থেকে হুহু করে মন
অনন্তে মিলায়ে যেতে চায়।

চাহে না সে পৃথিবীর সুখ
সংসারের মোহ কোলাহল,
ডুবে আছে স্বপনের কোলে
অশ্রুজল মহান্ সম্বল।

মরমের ছিঁড়ে গেছে তার
হৃদয়ের থেমে গেছে গান,
অশ্রুজলে ফুটে উঠে হাসি
তাহাতেই জুড়াই এ প্রাণ।

আয় হৃদে আয় অশ্রুজল
শ্মশানে বিলা রে পরিমল,
তুই বিনে ফুটে না যে হাসি
তুই মোর মহান্ সম্বল।

['ভারতী ও বালক,' কার্ত্তিক ১২৯৩]

যাত্রা

ভোরের বেলার বাঁশীর স্বর শুনিয়া কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়াছি। অস্ফুট সূর্য্যকিরণে সেই বাঁশীর স্বরের উপর একটি মাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এত দিন শুধু লোকের মনে একটা অস্থির আশা মাত্র ছিল, এখন সেই আশা সপ্তমীর উষালোকে প্রথম বিভাসিত হইল। এ নিরাশার দেশে লোকের প্রাণ খুলিয়া আশা করিবার যো নাই—মুহূর্ত্তে প্রাণের আশা শুকাইয়া যাইতে পারে। আশা করিবারও আমাদের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। আমাদের আশাপূর্ণ ভাবের মধ্যে একটা নৈরাশ্য—একটা মরীচিকা। বাঙ্গালী হৃদয়ের উদারতায় ম্যালেরিয়াক্রান্ত হইয়া ক্ষুদ্রত্বের দুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আপনার গর্ব্ব করিতেছে—চতুর্দ্দিকে শুধু এই দৃশ্য।

আমরা চলিয়াছি—পশ্চাতে একটা কোলাহলময় আশা-নিরাশাময় ভাব ফেলিয়া রাখিয়া প্রকৃতির শ্যামল শোভার মধ্য দিয়া আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছি। আমাদের চারি দিকে মেঘ কাঁদিয়া ফিরে, বায়ু গাহিয়া যায়, স্বপ্ন ঝরিয়া পড়ে। অতীতের ক্ষীণালোকে আমরা ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া রহিয়াছি—একটা দূর শুভ মুহূর্ত্তের ছায়ার অপেক্ষা করিতেছি। সহসা ভোরের বাঁশী থামিয়া গেল—দেখিলাম যে, এই বাঁশীর স্বরে চড়িয়া বহু দূর আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে একটা অপরিচিতের মধ্যে পরিচিতের ভাব—পুরাতনের মধ্যে নূতনত্ব—বিস্মৃতির মধ্যে স্মৃতি।

এখানে প্রতি দিন সন্ধ্যা বেলায় মনটা কি রকম উদাস উদাস হইয়া পড়িত—মনের উপরে একটা দূরব্যাপী ঘুমন্ত স্বপ্নের ছায়া পড়িয়া তাহাকে উদাসী করিয়া তুলিত। দূর বৃক্ষাবলীর মধ্য দিয়া কল্পনার মত আমার প্রাণে কি যেন আসিয়া আঘাত করিত—আমার চক্ষের সম্মুখে কলিকাতার একটি প্রাচীন কুটীরের ছবি ফুটিয়া উঠিত। সেখানে যেন একটা অস্থির স্থিরতা—শত বৎসরের প্রাচীন ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমানের নূতনত্বের একটা আবছায়া রকম সংযোগ—স্মৃতি বিস্মৃতির নীরব কোলাহলের মধ্যে একটা অসম্পূর্ণ মন। কলিকাতার এই সংযোগবিয়োগময় ভাবের মধ্যে গঙ্গাতরঙ্গের এক রকম প্রাণময়, প্রেমময়, ছায়াময় স্বপ্ন মিশাইয়া প্রাণের মধ্যে একটা গভীর প্রাণ—আত্মার মধ্যে একটা গভীর আত্মা—মরণের মধ্যে একটা জীবনের ছায়া ফুটাইয়া দিত। এখানকার রামধনুর পূর্ণভাবময় ছায়া—ধরণী তাহার জ্যা। কলিকাতার অসম্পূর্ণ রামধনুর সহিত এখানকার রামধনুর কেমন একটা বিভিন্নতা। কিন্তু এই বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য। এই রামধনুর মধ্যে সেখানকার রামধনুগুলি স্মৃতির আকারে বর্ত্তমান।

কলিকাতার ন্যায় এখানেও জীবনের অনেক ঘটনা সাজাইয়া গিয়াছি। সেই জন্য এখান দিয়া যাইতে হইলে খানিকটা করিয়া পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়া উঠে—বিস্মৃতির ঘুমন্ত ভাবের মধ্যে একটা অস্ফুট সজীবতা দেখা দেয়। এখানকার গঙ্গায় অনেক দিন অনেক মালিন্য প্রক্ষালন করিয়াছি, তাহারা হয় ত জগতের মহান্ স্রোতে ভাসিয়া গিয়া কত কত দূর হইতে দূরতর দেশের বালুকাময় বেলাভূমি চুম্বন করিয়া আবার এক দিন ঘুরিতে ঘুরিতে এইখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের তলায় আসিয়া আট্‌কাইয়া যাইবে। এখানকার রাস্তা ঘাটে আমার সহস্র জীবন্ত পদচিহ্ন বসিয়া গিয়াছে। তাহারা অস্ফুটভাবে আমার চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অস্ফুটাকারেই মিলাইয়া যায়।

এখানকার সঙ্গে কলিকাতার কি একটা মহাযোগ আছে। এখানকার প্রত্যেক বস্তুতে খানিকটা করিয়া কলিকাতার ধূলার চিহ্ন। এখানে মধ্যে মধ্যে যে দু'একখানা ষ্টীমার যায়, তাহারা সেখানকার রাজ্যশুদ্ধ ধোঁয়া এইখানে ছাড়িয়া দিয়া যায়—প্রকৃতির শ্যামল ক্রোড়ে তাহাদের ধূমময় উষ্ণ নিশ্বাসের খানিকটা করিয়া কয়লার গুঁড়া ছড়াইয়া দিয়া যায়। এখানকার নৌকার পালে খানিকটা যেন মহানগরীর বাতাস লাগিয়া থাকে। এখানে যাহারা বাস করে, তাহাদের অনেকেরই মুখে খানিক খানিক কলিকাতার ধূলা, খানিক খানিক রাজধানীর ছায়া দেখা যায়।

আমি শুধু এখানে নদীর ধারে বসিয়া থাকিতাম—বসিয়া বসিয়া ঢেউ গণিতাম—মধ্যে মধ্যে উপরের আকাশ দিয়া দু'একখানি ছোট ছোট মেঘের টুক্‌রা ভাসিয়া যাইত—আমার মনে হইত যে, উহারা বুঝি কোন্ দূর দেশ হইতে আমার জন্য কি সম্বাদ লইয়া আসিতেছে। মেঘেরা চলিয়া যাইত—আমার প্রাণে খানিকটা সন্ধ্যাময় ভাব পড়িয়া থাকিত।

সেই এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা উত্তর-বাতাস বন্ধ হইয়া গেল—প্রবল বেগে দক্ষিণা বায়ু বহিতে লাগিল। ফেনময় তুফানে তুফানে নদীর ফুটন্ত প্রাণ পূরিয়া গেল। সে সময়ে মাঝিদের কি আনন্দ! তাহাদের আনন্দময় কোলাহলে, বাতাসের সন্ সন্ শব্দে, পালতোলা নৌকাদের অহঙ্কারময় গতিতে, এবং নদীতরঙ্গের কল্লোলময়ী কাহিনীতে একটা যেন মহামহোৎসব পড়িয়া গেল। চারি দিকেই একটা উৎসাহ—চারি দিকেই একটা আনন্দের ফুটন্ত ভাব। গাছে পাতায় কুটীরে একটা নব আনন্দের—নূতন উৎসাহের জ্যোতি।

এখানকার মুক্ত বায়ুতে একটা মুক্তভাব। কলিকাতার দলাদলিময় দ্বেষহিংসাপূর্ণ সমালোচনার পরিবর্ত্তে এখানে কেমন শান্তি—এখানে কেমন নিস্তব্ধতা। সেখানকার বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর—সেখানকার মহামহা সংবাদপত্রের মিথ্যা কথার স্তূপ এখানে যেন

আসিয়াও আসিতে পারে না। এখানে একটা প্রকৃতির শান্ত শিষ্ট কোমল ভাব। সেখানে শুধু ছ্যাঁকড়া গাড়ীর আড়ম্বরপূর্ণ কোলাহল।

কিন্তু এই মহা আড়ম্বরময় নূতনত্বের মধ্যেও একটা প্রাচীনত্ব আছে—সেখানকার অশান্তিময় ভাবের মধ্যেও খানিকটা শান্তির ভাব আছে। দূর স্মৃতির মধ্যে তাহার একটা মাধুর্য্য—আরও দূর বিস্মৃতির মধ্যে তাহার আরও মাধুর্য্য। সেখানকার অনেক জিনিসেই খানিকটা করিয়া স্মৃতি জাগিয়া আছে, খানিকটা বিস্মৃতি ঘুমাইয়া আছে।

এখানকার গাছপালায় কেমন এক রকম ঔদাস্যের ভাব—বৈরাগ্যের ছায়া। সহরে শুধু বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা। সেখানে শুধু বিলাস—সেখানে শুধু অহঙ্কার—সেখানে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ ভাব। আর এখানকার কি অসীম উদার ভাব! এখানে জগতের মহান্ প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে।

এই প্রেমের শান্তিময় ভাবের মধ্যে ডুবিতে পারিলে আমাদের ক্ষুধিত হৃদয়ের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়—আমাদের পাষাণ অন্তঃকরণের পাষাণত্ব চলিয়া যায়—অনন্ত আনন্দের বিমল ছায়ায় আমাদের প্রাণ মন ভরিয়া যায়।

সেই যখন ধীরে ধীরে ও-পারের সন্ধ্যাদীপগুলি জ্বলিয়া উঠিত—টুপটাপ করিয়া সাঁঝের আকাশ হইতে ছু'একটি ঘুমন্ত তারকা পৃথিবীর বক্ষে খসিয়া পড়িত, আর ঐ দূর শ্মশানক্ষেত্রের এক প্রান্তে এক একটি অহঙ্কারের প্রতিমা পশ্চাতে শুধু একটা ক্ষণিক কান্নার রোল উঠাইয়া নির্ব্বাণপ্রায় চিতাগ্নিতে মানবজীবনের সমস্ত ক্ষুদ্রত্ব বিসর্জ্জন দিয়া প্রবাসীর মত চলিয়া যাইত, তখন মরমের মধ্যে মরণের সৌন্দর্য্যটুকু কেমন ফুটিয়া উঠিত।

আর সেই যখন মাঝিবর শম্ভুনাথ তাঁহার সুকোমল কোকিল-কণ্ঠে দিঙ্মণ্ডল মাতাইয়া ছুই চারিটি সুললিত রাগরাগিণী আলাপে মগ্ন থাকিতেন—তাঁহার পবিত্র একতারায় বারকতক বীরোচিত ঝঙ্কার দিয়া বত্রিশপাটী রাণীগঞ্জের হৃদয়-বিদারক দন্ত বাহির করিয়া তিনি যখন "মন-মাঝি রে সামাল সামাল" বলিয়া তানসেনের তানকে লজ্জা দিতেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণকুহর অতি পরিতৃপ্তি লাভে কেমন বধির হইয়া আসিত।

* * * *

মেঘের উপর মেঘের রেখা পড়িয়া ধীরে ধীরে বিজয়া কাটিয়া গেল। বিজয়ার পর আরও কত দিন কাটিয়া গিয়াছে—সন্ধ্যার শুভ্র মেঘগুলির কোমল বক্ষে প্রতিফলিত হইয়া কত দিনকার শেষ সূর্য্যকিরণগুলি ঢেউয়ের মত মিলাইয়া গিয়াছে—কত স্বার্থের কীট এত দিন ধরিয়া ক্রমাগত ভ্যান্‌ভ্যান্ করিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে প্রাণ হারাইয়াছে।

সেই যে স্মৃতিময়ী ভোরের বাঁশী শুনিয়া সে দিন উষালোকে যাত্রা করিয়াছিলাম, এত দিন প্রাণের মধ্যে সেই বাঁশীর স্বরের কি যেন অস্ফুট ছায়া পড়িয়াছিল, আজ সহসা

তাহা নাড়াচাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিল। সেই ছায়ার মধ্যে সেদিনকার শুকতারার ম্লান মূর্ত্তি শরতের ঘুমন্ত হাসির মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সেদিনকার সূর্য্যালোক—সেদিনকার স্মৃতি—সেদিনকার সেই শ্যামল-বসনা উষার প্রাণের কাহিনীগুলি মরমের চারি দিক্ ছাইয়া ফেলিল।

প্রাণে একটা আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা শুনার আশা—কলিকাতার সেই প্রাচীন কুটীরের একটুকু প্রেমময় হাসির আলোক—আর বহুদিন পরে আবার সেই মৃদু মন্থর গমনশীল ছ্যাকড়াগাড়ীর কোলাহল শুনিবার একটা কৌতূহল। খানিকটা আশা হাসি কৌতূহল লইয়া মনটা বোঝাই হইল—তাহাতে আর কিছু ধরিবার রহিল না। কিন্তু এই সকল হাসি আশা কৌতূহলের মধ্যে এক ফোঁটা শুভ্র অশ্রুজল—মরমের কাহিনী ভাঙ্গা সন্ধ্যার জ্যোৎস্নাময় তটিনীচুম্বিত শীতল বায়ুসংযুক্ত এক ফোঁটা নীরব অশ্রুজল।

এই একটি ফোঁটা অশ্রুজলের মধ্যে মরমের ছিন্নতন্ত্রী বীণাধ্বনিত পুরাতন গীতগুলি ভাসিয়া বেড়াইতেছে—কাহিনীময় জীবনের শেষ আশাগুলির উপরে একটুকু নৈরাশ্যের ছায়া পড়িয়া সেই ঘুমন্ত গানগুলিকে জাগাইয়া দিতেছে—ভগ্নহৃদয়ের নিভ নিভ স্বপনের কোলে তাহারা মিলাইয়া যাইতেছে।

কল্পনার মত প্রাণের উপর দিয়া কি চলিয়া গেল। মনে হইল যে, একটা অস্থিপঞ্জর-যুগলটানিত পুষ্পকরথে চড়িয়া ক্ষুদ্র পৃথিবীর উপর দিয়া সোঁ সোঁ করিয়া চলিয়াছি। এত ক্ষণের আকাশপাতালব্যাপী ভাবটা সহসা একটা সামান্য খরখরানি চাপা পড়িয়া মরিয়া গেল—চাহিয়া দেখিলাম যে, সম্মুখে সেই স্মৃতিময় প্রাচীন কুটীর। ['ভারতী ও বালক,' পৌষ ১২৯৩]

কাহিনী

পৃথিবীর মহাকোলাহলের এক প্রান্তে একটি ভগ্ন কুটীর—প্রাচীন ইতিহাসের ছায়ার মত অতীতের একটি ভগ্নাবশেষ। তাহার জীর্ণ শীর্ণ দেহখানি জড়াইয়া প্রতি দিন শত সহস্র আশালতা বর্দ্ধিত হইতেছে—তাহার মুমূর্ষু প্রাণের শেষ বাসনাগুলিকে মরমের বাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। তাহার যৌবনের বিলাসিতা এখন শুধু স্মৃতির কোমল বাঁশীর স্বরে আধো আধো জাগিয়া রহিয়াছে—শেষাবস্থার পারমার্থিক ভাবের খানিকটা ছায়া তাহার মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। তাহার দেওয়ালে একটু সেওলা কবিত্বের মাধুরীর মত একটুখানি ঘুমন্ত স্বপনের ছায়া। আর তাহার ম্রিয়মাণ মুখখানির উপরে মরণের চির আনন্দময়ী প্রতিমার একটুকু ক্ষীণ হাসি।

এই ক্ষীণ হাসির ছায়ায় ছায়ায় বহুদিন হইতে একটি ক্ষুদ্র প্রাণ বর্দ্ধিত হইতেছে—ঝড় বৃষ্টি রৌদ্রের দুর্দ্দান্ত অত্যাচারের মধ্য দিয়া ক্ষীণ আশার মত প্রতি মুহূর্ত্তে অল্প অল্প করিয়া মরণের পথে অগ্রসর হইতেছে। ছলনার সুতীব্র কটাক্ষের মত তাহার মরমের চারি দিকে সহস্র কণ্টকবৃক্ষ তাহার ক্ষীণ মরমের অন্ত্যেষ্টি সৎকারের জন্য সহস্র প্রসারিত বাহু। এই সকল কণ্টকবৃক্ষের মধ্য হইতে কোন প্রকারে সে সূর্য্যালোক দেখিতে পাইয়াছিল—মনুষ্যের ছলনাময় ভালবাসার মধ্য দিয়া মরমের ভালবাসার দুঃখময়ী ছায়া দেখিয়া নীরবে এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল।

ফুল ঝরিয়া পড়ে—জীবন ফুরাইয়া যায়—কাহিনী ঘুমাইয়া থাকে। ঘুমন্ত কাহিনী সময়ে সময়ে জাগিয়া উঠে—দুই চারিটা গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্য দিয়া এক এক বার দেখা দেয়। সংসারের অনন্ত সুখের মধ্যে কাহিনীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে একটুকু দুঃখের ছবি ফুটিয়া উঠে—অনন্ত সুখের কষ্ট যেন ধীরে ধীরে খানিকটা মুছিয়া যায়। প্রাণে শুধু কল্পনার এক আধটু খেলা ধূলা লাগিয়া থাকে।

কাহিনী অনন্ত—দুঃখময় জগতের ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত। সেখানেই কাহিনীর শেষ। শেষ! অনন্তের সীমা! না, কাহিনীর শেষ আছে—তবে মানুষে তাহার শেষ পায় না। তাহার শেষ সুখে—তাহার সীমা দুঃখের শেষ পর্য্যন্ত। সুখের কাহিনী নাই। সুখের বৈঠকী গল্প আছে—মোসাহেবের খোষামোদ আছে। দুঃখের শুধু কাহিনী—গঙ্গাতরঙ্গের স্নেহমাখা গীতগুলির মৃদু কল্লোল—লাজুক ঊষার রক্তিম রাগের কোমল চুম্বন—সাঁঝের আকাশের স্নিগ্ধতার স্বপন-ঝরান বায়—মৃতপ্রায় রজনীর শেষ আশা।

দুঃখের জগতের সেই ক্ষুদ্র প্রাণটির পরে দু'একটি কাহিনী ঝরিয়া পড়িয়াছে—সন্ধ্যার খানিকটা বিস্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। সেখানে বসিয়া 'বউ কথা কও' ম্রিয়মাণ ভাবে ভাঙ্গা গলায় অতীতের একটু স্মৃতি ফুটাইয়া দিতেছে—সংসারে বিলাসিতার মধ্যে ঔদাস্যের মাধুরীটুকু প্রকাশ করিতেছে। পাপিয়ার উন্মত্ত প্রাণ সেই ক্ষুদ্র প্রাণের ছায়ার পানে চাহিয়া গান বন্ধ করিতেছে—সহানুভূতির স্বরে আপনার জীবন-কাহিনী বলিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

ক্ষুদ্র প্রাণ সেইই ক্ষুদ্র। মরণের পথে ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হইতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে অল্প অল্প করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। সংসারের শত সহস্র হিংসা তাহার পানে তির্য্যক্ কটাক্ষপাত করিয়া তাহাকে অভিসম্পাত করিতেছে, বলিতেছে—"শীঘ্র সরিয়া পড়—অন্ত্যেষ্টি সৎকারের সুখ হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিও না।" ক্ষীণ প্রাণ তাহাতে অরাজি নহে, কিন্তু ভগবান্ তাহাতে অসম্মত। হিংসা তাহার নামে শিহরিয়া উঠে, মুহূর্ত্তের জন্য সরিয়া যায়—মরিয়া যায় না—অন্ততঃ যাইতে চাহে না। ক্ষীণের পানে হিংসার প্রখর দৃষ্টি।

এখনও সে সেই ক্ষুদ্র হিংসার প্রখর লক্ষ্য। হিংসা একমনে দিন গণিতেছে—দিন বুঝি পাইতেছে না। কুহকিনী আশার বলে বলীয়ান্ হইয়া হিংসার কায় প্রতি দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। মায়াবিনী হিংসা মনুষ্যের সন্তানের মনুষ্যত্ব হজম করিয়া ফেলিতেছে। মানব-সন্তান তাহার পদলেহনে জীবন উৎসর্গ করিতেছে।

সেই প্রাচীন কুটীরের এখানে সেখানে জীবনের খানিক খানিক ইতিহাস মরণের শুভ্র হাসি। তাহার বটের "শ্যামল স্নেহে" মরণ, তাহার পুকুরের জলে মরণের ছায়া, তাহার কাঁটাবনে মরণের সৌরভ। একটি ক্ষুদ্র মাছরাঙ্গা বটের ছায়ায় প্রতিপালিত। তাহার জীবনের একটুকু হাসি সেই ক্ষীণ প্রাণটির উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে—শুকতারার নিভ নিভ কাহিনীর স্বপ্নময়ী রাগিণীতে ক্ষীণ প্রাণ ছাইয়া ফেলিয়াছে।

সে এখনও সেইই, কিন্তু না, ঠিক সেই নহে। সে ঐ যে আপনাকে খুঁজিতেছে—দুর্ব্বল বলিয়া পাইতেছে না। তাহার মরণ ছিন্ন তন্ত্রী। মরণের সুরে এত দিন এক এক বার তাহার মরম বাজিয়া উঠিত, এখন তাহা বাজে না। ছিন্ন তারের সে এক এক বার ঝঙ্কার দেয়—জীবনের সমস্ত বাঁধন যেন ছিঁড়িয়া যায়। সেই ক্ষীণ প্রাণ যখন প্রথমে মর্ত্ত্যের ছায়ায় দেখা দেয়, তখন চারি দিকে কত হাহাকার, কত মূর্ত্তিমান্ আশার নৈরাশ্য, কত তৃষিত চাতকের তৃষিত হিয়ার কাতরতা। সে হাহাকার থামিয়া গিয়াছে, নিরাশার স্থানে নূতন নূতন পেঁচময়ী আশা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তৃষিত হিয়াকে প্রবোধ দিবার জন্য নূতন নূতন সান্ত্বনা আমদানি হইয়াছে। ঘটনার পর ঘটনা, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্ত—চাটুকারের আমদানি রপ্তানির মত আসিয়াছে—গিয়াছে। যে ঘটনায় যাহার স্বার্থ ছিল, তাহারই নিকট সে ঘটনা রহিয়া গিয়াছে, যাহার কোনও স্বার্থ ছিল না, তাহার নিকট তাহার হিসাব নাই।

রোগ শোক ও মৃত্যুর মধ্য দিয়া পৃথিবী কত বার ঘুরিয়া গেল, কত হতভাগার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার শ্যামল ছায়া পড়িয়া অশ্রু আকারে হতভাগ্যের আশাগুলি ঝরাইয়া দিল, অবশেষে মৃত্যুর প্রসারিত ক্রোড়ে আনন্দের উৎসে স্নাত হইয়া হতভাগা সেইখানেই আশ্রয় লইল। সংসারের উপর দিয়া এইরূপ শত সহস্র বিপ্লব চলিয়া গিয়াছে। পরিবর্ত্তনশীল মানবদেহের হাড়ে হাড়ে সেই সকল বিপ্লবের আংশিক ছায়া পড়িয়াছে। ধ্বংসশীল জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধ্বংসের উপর কত নূতন নূতন জগৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সেই ক্ষুদ্র প্রাণ আপনার ক্ষীণত্বের মধ্য দিয়া কোন প্রকারে জীবনের প্রবাহ রক্ষা করিতেছে, তাহার ধ্বংসের উপর অনেক নূতন আশার উৎপত্তি হইতে পারিত; কিন্তু সে এখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয় নাই, মরণের একটানা স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও সাগরে উপস্থিত হয় নাই।

সে ক্ষুদ্র, নিতান্তই ক্ষীণ। তাহার ধন নাই, 'আমার' বলিবার কিছুই নাই। কোনও জিনিসে তাহার অধিকার নাই, সুতরাং সে সংসারে নিতান্তই গরীব। সে যাহা খায়—তাহা তাহার নিজের নহে, সংসারে সে একজন ভিখারী। তাহার একমাত্র ভিক্ষা—প্রেম। ঈশ্বরের নিকট হইতে মনুষ্য প্রেম পাইতেছে, সে প্রেম বিতরণ করুক। ভিখারী মনুষ্যের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে—"আমাকে একটু প্রেম দাও; তোমাদের যে প্রেম আছে, তাহার কণামাত্র প্রেম ভিখারীকে ভিক্ষা দাও।" ভিখারী বড় গরীব, ভগবানের নিকট হইতে সে যে প্রেম পাইয়াছে, তাহা বুঝি সে নিজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছে, তাই আজ পথে পথে প্রেম ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। প্রেম জগতে বিতরণ করিতে সে বুঝি শিখে নাই, তাই আজ সে নিজের প্রেম খুঁজিয়া পাইতেছে না, যাহাদিগকে সে প্রেম বিতরণ করে নাই, তাহাদেরই দুয়ারে প্রেম ভিক্ষা চাহিতেছে।

কিন্তু না—ঐ দেখ, তাহাকে কে প্রেম দিতেছে, তাহার রৌদ্র-তপ্ত মুখের উপরে ঐ দেখ, মনুষ্যের প্রেম ফুটিয়া উঠিতেছে। এ ভিক্ষা তাহাকে কে দিল? যাহাদের দুয়ারে সে প্রতি দিন প্রেমের জন্য হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিত, তাহাদেরই বুঝি কেহ উহার নিকট ঋণী ছিল, এক্ষণে ঋণ পরিশোধ করিল? না,—যাঁহার নিকট সে চিরদিনই ঋণী, মানবের মধ্যে যাঁহার নিকট সে চিরদিন ভিক্ষা না করিয়াও প্রেম পাইয়াছে, তাঁহারই নিকট প্রেম পাইল।

সেই প্রাচীন কুটীর—অশান্তির মধ্যে সেখানে কেমন একটি শান্তি! সেখানে ঐ যে মরণের ছায়া পড়িয়াছে, তাই সেথায় এখনও জীবন আছে। উষার মাধুরীর মত তাহার বৃদ্ধ নারিকেলগাছগুলি এখনও কেমন সজীব। তাহাদের হৃদয়ে ঔদাস্যের ছায়া পড়িয়াছে, পাতায় পাতায় জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শুভ্র রেখাগুলি জন্মের মত লীন হইয়া গিয়াছে। সংসারের সকল বস্তুই বুঝি এইরূপে লীন হইয়া যায়—এইরূপেই বুঝি আত্মা পরমাত্মায় লীন হয়? না—আত্মা কখনও পরমাত্মায় লীন হইয়া যায় না, ঈশ্বর হইতে পারে না। সংসারের সহস্র অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হওয়ার নামই মুক্তি। আমাদের আত্মা অনন্ত কাল ঈশ্বরের অধীন থাকিবে, তাহাই তাহার আনন্দ। ভগবানের নামে সকল অশান্তির নিবৃত্তি হয়। আমরা তাঁহার নাম লইয়া আমাদের আশার বন্ধনে, প্রাণের বন্ধনে জরাজীর্ণ কুটীরটিকে রক্ষা করিতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা আছে। সেই ক্ষুদ্র প্রাণ সেই কুটীরের প্রেমের ছায়ায় ছায়ায় ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, মরণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে। সে এই যে এত দিন ধরিয়া অল্প স্বল্প প্রেম পাইয়াছে, তাহারই খানিকটা কুটীরের প্রেমে মিলাইয়া যাইবে। শান্তি সেই প্রেমের মিলনের পুণ্যভূমি হইবে।

* * * *

দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতেছে। নববর্ষের নূতন আশা লইয়া পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগগুলি স্ফীতবক্ষে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে, আপন আপন রক্তপিপাসা মিটাইবার জন্য রণদেবীর পদতলে কোটি কোটি নরবলি দিয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেছে। পৃথিবীর এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের এক প্রান্তে একটি ভগ্ন আশা দাসত্বের লৌহনিগড়ে বদ্ধ হইয়া মরমের অশ্রুজল মরমেই মুছিয়া ফেলিতেছে। পাশব বলের অধীনে তাহার দেহ জর্জ্জরিত। সে এখন নিজের রক্ষার ভার নিজের স্কন্ধে লইতে কুণ্ঠিত।

এই ভগ্ন আশার মৃতপ্রায় রাগিণীতে সেই ক্ষুদ্র প্রাণের একটুকু ঘুমন্ত ছায়া। পক্ষপাতময় সংসারের স্বার্থপরতার জটিল গোলোকধাঁধায় পড়িয়া ক্ষুদ্র প্রাণের শেষ আশাগুলি ঝরঝর—শুধু কি যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সেই আশাগুলিকে ঝরিতে দেয় না। শৈশবের উপকথাগুলি ধীরে ধীরে সেই প্রাণের গায়ে লাগিয়া যায়; "সাত ভাই চম্পা," "সুও রাণী দুও রাণী," "চিল মা" প্রভৃতি মিলিয়া তাহার আশাগুলিকে ধরিয়া রাখে। শৈশব-স্বপনের ভূতের নাচন মেঘের মত সেই প্রাণের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। ঠাকুরমার প্রেমপূর্ণ মুখখানি স্মৃতিতে ধীরে ধীরে যেন ফুটিয়া উঠে। নীরবে মরম হইতে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়ে।

নীরবে অতীতের স্মৃতিতে প্রাণ ছাইয়া ফেলে, অতীতের গান, অতীতের কথা, অতীতের সুখ দুঃখ প্রাণে মিলাইয়া যায়। মনে পড়ে—সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি আধো আধো ভাঙ্গা গলায় আপনার কত কথাই কহিত, কত গানই গাহিত! তাহাদের সলজ্জ হাসি, তাহাদের অপূর্ণ বাসনা, তাহাদের স্বাভাবিক সরলতা কি সুন্দর! হায়! তাহাদের মধ্যেও আবার মৃত্যু, তাহাদের শ্যামল প্রাণের উপরেও মৃত্যুর আধিপত্য। তাহারা বুঝি এ জগতের উপযুক্ত নয়, জীবনসংগ্রামের মহাকোলাহলের সহিত যোঝাযুঝি করিবার যোগ্য নয়। তাহারা নন্দনের—তাহারা স্বপনের—মরণের। মরণের আনন্দ উপভোগ করিবার তাহারাই যোগ্য। বিষয়-বাসনা তাহাদিগকে জীবনের দাস করিয়া তুলে নাই। তাহারা মরণের। মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যাইবার জন্য তাহাদিগের সরল ভাবই একমাত্র পথ। মরণ জীবনের সারটুকু, আমরা যাহাকে বলি অনন্ত জীবন। আর আমাদের এই যে অসাড় ভাব—সংসারে দাসত্ব—ইহাই মৃত্যু। শিশুপ্রাণে যেন ইহার ছায়া না পড়ে।

সেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইত, ম্রিয়মাণ ভাবে সময় সময় প্রাণে কেমন মাধুরী ঢালিত। তাহাদের একটি বুঝি কোন্ অজানা দেশে চলিয়া গিয়াছে, ছোট ভাইটির করুণ আঁখি দুটিতে আপনার ছায়াটুকু রাখিয়া সংসারের গহন বন

হইতে গৃহ পানে ছুটিয়াছে। তাই কি? না, পথহারা হইয়া ভাইটিকে পাইবার আশায় ছুটিতে ছুটিতে কোন্ অজানা দেশে গিয়া পড়িয়াছে। বিধাতা! তোমার এ কবিত্ব বুঝিয়া উঠা যায় না—জগৎ-সমস্যা মনুষ্যে পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্য বুঝি এই সমস্যা পূরণ করিতেই আসিয়াছে, অনন্তকাল ধরিয়া এই সমস্যাই পূরণ করিবে। পারিবে কি? কে জানে।

ছেলেবেলা হইতে ভাই বোনে কেমন খেলা করিয়া বেড়াইত, স্নেহের ভাইটিকে প্রাণের চুম্বনে চুম্বনে ছাইয়া ফেলিয়া মেয়েটি কেমন একটু চাপা হাসি হাসিত, ভাঙ্গা গলায় ছোট ভাইটি দিদির কানে কানে কত কথাই বলিত। আজ আর দিদি নাই, শূন্য সংসারে আজ সে একেলা—তাহাকে প্রাণের চুম্বন দিবার বুঝি আর কেহ রহিল না। হিংসার কুটিল ভ্রূকুটী প্রতি নিমেষে ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছে, তাহার সরল প্রাণে রাজ্যবিস্তারের সুবিধা পাইতেছে না।

দূরে—আরও দূরে। তখন সে ক্ষুদ্র প্রাণ পৃথিবীতে আসে নাই। কল্পনায় যেন খানিক খানিক তখনকার বিস্মৃতি জাগিয়া উঠে। আজিকার এই ক্ষুদ্র প্রাণের উপরে সেই জাগ্রত বিস্মৃতিগুলি ফুটিয়া উঠিতেছে। পতিব্রতা সীতা দেবীর ম্লানমুখ স্বামীর কঠোর আজ্ঞার মধ্য দিয়া যেন বাহির হইতেছে। শকুন্তলার বনফুলের মালার গন্ধে ক্ষুদ্র প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

নীরবে সেই প্রাচীন কুটীরের ছায়ায় এত দিন সেই প্রাণ বর্দ্ধিত হইতেছিল, জীবন-সংগ্রামের মহা আড়ম্বরের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। এখনও সে সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে, এখনও ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, আকাশকুসুম-কল্পনা শুকাইয়া আসিয়াছে। এত দিন কি এক মহাস্বপ্নে ভোর হইয়া সে জলের আশায় মরুভূমে ঘুরিতেছিল। এখন সে সব চলিয়া গিয়াছে। এখন সে সংসারের ছলনাময়ী মায়া যেন কতকটা বুঝিয়াছে।

জীবনের মহানাটকের একটি ক্ষুদ্র গর্ভাঙ্কও শেষ হইল না। সমস্তটাই বাকি। একটুখানি মাত্র অভিনয় হইয়াছে। যবনিকা এখন পড়িবার সময় নয়—অনেক দেরি। কিন্তু ঐ কাহারা তাড়াতাড়ি করিতেছে, এইখানেই যবনিকা ফেলিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছে। একটুকু অপেক্ষা কর, একটুকু—একটুকু। আর না, সজোরে যবনিকা পড়িয়া গেল; তাড়াতাড়িতে সমস্তটা পড়িল না, খানিক দূর আসিয়া আটকাইয়া গেল।

সেই অর্দ্ধ-উন্মুক্ত যবনিকার মধ্য দিয়া অনেক জিনিস নয়নগোচর হইতে লাগিল। জীবনের সম্পূর্ণ অভিনয় হইল না ভাবিয়া যাহাদের বিবর্ণ মুখমণ্ডল উৎফুল্ল ভাব ধারণ

করিয়াছিল, তাহাদের অনেকেরই হৃদয় বিষাদে ম্লান হইয়া গেল—অনেকেরই মহতী আশা নিরাশায় পরিণত হইল। ঐ শুন, কাহারা কানাকানি করিতেছে—"সে বুঝি মরিবে না।" ক্ষুদ্র প্রাণ নিভিয়া যাইলেই সব গোল চুকিয়া যায়। কিন্তু সংসারে ক্ষুদ্রেরাই মিটমিট্ জ্বলিতে থাকে। সূর্য্য অস্ত যায়, চাঁদ ডুবিয়া যায়, তারকারা নিভিয়া যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র প্রদীপ সহজে নিভে না—যত ক্ষণ পারে, প্রাণপণে জ্বলিবার চেষ্টা করে। সূর্য্য চন্দ্রের মত সে লক্ষ বৎসর টিকে না—সেই জন্য বার ঘণ্টার স্থানে চৌদ্দ ঘণ্টা জ্বলিলেই সে আপনাকে কত কি মনে করিয়া লয়। মহৎ লোকেরা অমর। ক্ষুদ্রেরা হয় ত শত বৎসর মরণের দাসত্ব করিয়া টিঁকিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের মত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারে না। ক্ষুদ্র প্রাণ হয় ত কত বৎসর সংসারের দাসত্ব করিবে। তাহার মরণই শ্রেয়। ক্ষুদ্রেরা সংসারের ঝটিকা সহিবার উপযুক্ত নয়—তাহারা শুধু সংসারের অভিশাপ কুড়াইতে আসে।

ক্ষুদ্র প্রাণ যত দিন টিঁকিয়া আছে—যত দিন সংসারের দাসত্ব করিতে নিযুক্ত আছে, তত দিন তোমরা তাহাকে অভিশাপ দাও—তোমাদের অভিশাপ মাথায় লইয়া সে যেন মরিতে পারে। ভাঙ্গা কুলার মত তাহার মস্তকে তোমাদের ঘরের যত ছাই ঢালিয়া দাও। সে ধূলিসাৎ হইয়া গেলে যেন "বাকি আছে" বলিয়া আক্ষেপ না করিতে হয়। তোমরা তাহাকে যে অভিসম্পাত কর, ইহাই তাহার পরম সৌভাগ্য। সে যে বিনা কারণে (হয় ত বা কোনও কারণ আছে) তোমাদের অভিশাপগুলি কুড়াইয়া লইবার যোগ্য বিবেচনা করিয়াছ, ইহাতেই সে কৃতার্থ হইয়াছে। তোমরা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহার মঙ্গলেচ্ছাপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ কর। সে তোমাদের দান বিস্মৃত হইবে না—তোমাদের নিকট হইতে যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিবে।

সেই ক্ষুদ্র প্রাণের চারি দিকে ছোট ছোট অনেকগুলি নূতন প্রাণ গজাইয়াছে—জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আশা নিরাশা লইয়া পৃথিবীর রণক্ষেত্রে বীরের মত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। প্রভাত-সূর্য্যের প্রতি রশ্মিতে তাহাদের কত নূতন আশা সঞ্চিত হইতেছে। এই সকল নূতন আশা—নব উদ্যমের মধ্য হইতে ক্ষুদ্র প্রাণের পুরাতন কাহিনীগুলি যেন আধ আধ দেখা দিতেছে। কত কাহিনী মিলাইয়া গিয়াছে—কত নিশীথ বাঁশীর গান সেখানে ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। অতীতের এই ঘুমন্ত ভাবের ছায়ায় ভবিষ্যতের একটি ক্ষুদ্র আশা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহার একটি ক্ষুদ্র পত্রে কে যেন সোনার অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে—

অন্তিমে একটি শুধু উদাসী পরাণ
ছিন্ন আশা ছিন্ন সুখ হারা শেষ তান।

ভবিষ্যতের এই উদাস ভাব প্রাণে কেমন বসিয়া যায়। ক্ষণিকের জন্য পৃথিবীর ধূলিরাশি ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে কেমন পবিত্র হয়। বিষয়-বাসনার তুচ্ছ কোলাহল সে সময়ে একেবারে যেন থামিয়া যায়—অনন্তের মহান্ সঙ্গীতে হৃদয় উথলিয়া উঠে।

ক্ষুদ্র প্রাণ নিজের পদশব্দে নিজেই চমকাইয়া উঠে। সে মনে করে যে, তাহার তুচ্ছ প্রতিধ্বনি সংসারের শান্তি নাশ করে। কিন্তু সংসারে শান্তি কোথায়? সংসারের বাহিরেই শান্তি। সংসারের অতীত হইতে পারিলেই শান্তি লাভ করা যায়।

সংসারে কিছুই নাই। হেথা শুধু আকাঙ্ক্ষা—লালসার সুতীব্র দংশন। যে সন্তানহীন, সে মনে করিতেছে—আমার কি দুরদৃষ্ট, আমার বংশ লোপ হইল। যাহার সন্তান আছে, সে তাহাদের রোগের জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া মনে করিতেছে—ভগবান্! আমায় কেন নিঃসন্তান করিলে না। যাহার অর্থ আছে, সে দেখিতেছে—অর্থ ই সর্ব্বনাশের মূল। যে নির্ধন, সে ভাবিতেছে—ধনই সকল সুখের মূল। মনুষ্য কিছুতেই পরিতৃপ্ত নহে। সংসারে শুধু কোলাহল—শুধু হট্টগোল। হেথায় শান্তি কোথা? হেথা শুধু কানাকানি—চোখটেপাটিপি।

তোমরা সংসারের পক্ষ সমর্থন করিবে—বলিবে যে, কতকগুলা যুক্তিহীন কথা সাজাইয়া সংসারকে গালি দেওয়া কিছু নয়। যথার্থই সংসার যে কাহাকে বলে, তাহা ভগবান্ জানেন। সংসার যেন একটা মহাসমস্যা—ক্ষুদ্র বুদ্ধির তাহাকে বুঝিবার শক্তি নাই। চারি দিকে শুধু অন্ধকার—চক্ষুর সে অন্ধকার ভেদ করিবার সামর্থ্য নাই। ভগবান্! তুমিই জান।

এই মহাসমস্যার এক প্রান্তে পথহারা সেই ক্ষুদ্র প্রাণটি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—জীবনের রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া সংসারের ছায়ায় মিলাইয়া যাইতেছে। তাহার চারি দিকে নূতন পুরাতনের কোলাহল—পরিবর্ত্তনশীল জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাবিপ্লবের রেখা—জগতের স্রোতভাঙ্গা উচ্ছ্বাসের সফেন তরঙ্গ। তাহার তুচ্ছ কাহিনী এই কোলাহলে ডুবিয়া গিয়াছে। নিতান্ত চীৎকার না করিলে কেহ তাহা শুনিতে পায় না। তাহার ভাঙ্গা গলার এত জোর নাই যে, জগতের কোলাহল ছাড়াইয়া উঠিতে পারে। ক্ষীণ প্রাণের ক্ষীণ কণ্ঠ ধীরে ধীরে থামিয়া আসিল। একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহার সাড়া দিল।

পরিবর্ত্তন। ইহ জীবনের কি যেন একটা প্রধান দৃশ্য সেই ক্ষুদ্র প্রাণের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইল। সে এত দিন যে পরিচিতের মধ্যে বাস করিতেছিল, আজ তাহার খানিকটা বই সমস্তটাই অপরিচিত। একটা অজানাভাব চাপা পড়িয়া সে মৃতপ্রায়।

আর সেই প্রাচীন কুটীর। তাহার শ্যামল শেওলাগুলি মনুষ্যের কঠোর হস্তে লুপ্তপ্রায়। মনুষ্যের কঠোর অনুগ্রহে সেই প্রাচীন দেবদারুর অন্ত্যেষ্টি সংকার সম্পন্ন হইয়াছে—তাহার ইহ জীবনের হর্ষ শোক চিরদিনের জন্য নিভিয়া গিয়াছে। এখন বর্ষাকালে আর সে কদম্ব ফুটে না—বর্ষার অশ্রুর মত ফুলগুলি চিরবিদায় লইয়াছে।

সে সব গিয়াছে। সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া পুরাতনের কাহিনী চলিয়া গিয়াছে। নূতনের কিছুই নাই। পুরাতনের কাহিনীগুলিকে জাগাইয়া দিয়া সে ধীরে ধীরে তাহার ছায়ায় বিলীন হইয়া যাইতেছে। পুষ্করিণীর অধর চুমিয়া সন্ধ্যার সময় ঝির্‌ঝির্ করিয়া যে মধুর বাতাসটুকু বহিয়া যাইত, তাহাই শুধু পড়িয়া আছে। পুষ্করিণীর প্রাণের উচ্ছ্বাস থামিয়া গিয়াছে—তাহার সেই উচ্ছ্বাসের ক্ষীণ হাসিটুকু সাঁঝের প্রথম অশ্রুবিন্দুতে মিশাইয়া গেছে। সবই গিয়াছে। রুদ্র প্রাণও কোন্ না যাইবে? সে প্রতি মুহূর্ত্তে সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিরাম্বর আবর্ত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাইতেছে—দু'দিন পরেই চলিয়া যাইবে।

তাহার তুচ্ছ অভিমান অহঙ্কারের উপরে শ্মশানের শান্তিময় ছায়া পড়িয়াছে—তাহার ক্ষুদ্র মরমের বক্ষে মরণের সুমধুর গাম্ভীর্য্য প্রতিফলিত হইতেছে। কিন্তু সে কি যাইবে? সে যাইলে কত মূর্ত্তিমান্ বিষাদ হরষে কাঁদিয়া উঠে। ধরণী আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহাই হয়। তোমার আশীর্ব্বাদে সংসারের একটি বিষাদও যদি হরষিত হয়, তাহা হইলে মা, তুমি পুণ্যবতী। তাহা কি হইবে? তুমি বুঝি তোমার স্নেহ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহ না। কিন্তু তাহার জন্য তুমি কেন অভিশাপ কুড়াইবে? তোমার নিষ্কলঙ্ক প্রাণ তাহার জন্য কেন অভিশাপে ছাইয়া ফেলিবে? তুমি আনন্দের প্রতিমা—ভগবানের ইচ্ছায় তুমি দেবী। তোমার চরণে সে তাহার ভক্তিপূর্ণ প্রেম উৎসর্গ করিতেছে। ভগবানের অনুগ্রহে তুমি চিরদিন তোমার নিঃস্বার্থ প্রেম বিতরণ করিয়া সুখী হও। সে দীনকে শুধু এই আশীর্ব্বাদ কর যে, সে যেন কাহারও আড়াল না হয়—কাহারও তীব্র কটাক্ষপূর্ণ হাসির সম্মুখে না পড়ে।

স্বার্থময় সংসারের জটিল গোলোকধাঁধায় ক্ষুদ্র প্রাণ পথহারা। শত সহস্র কুটিলতা তাহার পানে তীব্রদৃষ্টিতে তাকাইতেছে। গর্ব্বিত পরশ্রীকাতরতা আপনার দেমাকে ল্যাজ ফুলাইয়া বেড়াইতেছে। ক্ষুদ্র প্রাণ একটুকু পথ পাইলেই সরিয়া যায়। কিন্তু হতভাগ্য পথ দেখিতে পাইতেছে না। হিংসার কুটিল কটাক্ষে সে জড়সড়। খাঁটি স্বার্থকে সে তেমন ভয় করে না। কিন্তু নিঃস্বার্থ-স্বার্থকে দেখিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

সেই শরৎকালের পূর্ণিমায় সে যখন ভাগীরথীর প্রাণের উচ্ছ্বাসে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সংসারের বাহিরে ঘুরিয়া আসিত, তখন তাহার ক্ষীণ মরমে কত আনন্দই না জানি ছিল। এখন কি তাহা আছে? কে জানে।

এখন ত কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বের উপহাস এখন উপহাসাস্পদ—দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্বের ঘৃণা এখন ঘৃণার্হ—গত কল্যের তাচ্ছিল্য এখন সুমধুর মৃদু সম্ভাষণ। আর সেই সে দিনকার দিদিহারা আজ গম্ভীর দাদা।

সেই প্রাচীন কুটীর। সংসারের সমস্ত কষ্টের মধ্যেও সেখানে কেমন আরাম। সেখানে শত সহস্র অশান্তি থাকলেও সে শান্তিময়। ক্ষুদ্র প্রাণ তাহার ছায়ায় জন্মিয়াছে, তাহার ছায়ায় মরিলেই সে সুখী হইবে। সে (সেই কুটীরটি) নিজেই একটি ক্ষুদ্র জগৎ—তাহার মধ্যে যেন জগতের সমস্ত সুখ দুঃখ লীন হইয়া আছে। ক্ষুদ্র প্রাণের নিকট সে "স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

ঐ শুন, সেই কুটীরে আজ কি মহাকোলাহল। সেখানে আজ কত লোক জমিয়াছে—কত হাসির উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ যে তাহার দুয়ারে কাঙ্গালিনী আঁচল পাতিয়া তৃষিত হিয়ায় বসিয়া রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশু সন্তান স্তন্য পান করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে—মাতা আজ তিন দিবস উপবাসের পর রুদ্ধকণ্ঠে ভিক্ষা মাগিতেছে। সে যদি জানিত যে, তাহার দুঃখে দুঃখী হেথায় কেহ নাই—হেথায় শুধু মনুষ্যের কঠোর কণ্ঠোচ্চারিত "চলা যাও" ভিন্ন মায়া মমতা নাই, তাহা হইলে সে কি এত আশা করিয়া বসিয়া থাকিত? দয়া তাহার জন্য হয় নাই—মনুষ্যত্ব তাহাব উপকারের জন্য নহে। তাহার জন্য আচক্ষু-কুঞ্চিত নাসিকা—সমদর্শী ঘৃণা—উদাস তাচ্ছিল্য। তাহার জন্য যদি মনুষ্যের মমতা থাকিত, তাহা হইলে তাহাকে তোমরা এত দিন গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিতে—সে সংসারের যমযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইত।

সে মরুক্। মৃত্যুই তাহার ইহ জন্মের পুরস্কার। কিন্তু শিশুটির তাহা হইলে কি হইবে? মাতৃহারা শিশু অনাহারে মরিবে। আর চারি দিকের দয়ালু ভাইগুলি অন্ধ সাজিয়া বসিয়া থাকিবে। জগতের কি ইহাই নিয়ম? হয় হোক্।

আবার সেই কাহিনী। পুকুরধারে একটি যে শিশু-কনকচাঁপা আপনার আশাগুলি লইয়া দাঁড়াইয়া আছে, দুদিন পূর্ব্বে সে বুঝি ছিল না। কিন্তু আজ সে ক্ষুদ্র প্রাণের প্রেমে বিগলিত। ক্ষুদ্র প্রাণ কাহার নিকট হইতে যেন বিদায় লইতে যাইতেছিল, তাহার প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া যাইতে পারিল না। এক দিন সন্ধ্যার ছায়ায় সে কনকচাঁপাকে মনে মনে বলিয়াছিল—"আজ তোর নিকট হইতে বিদায় লইলাম। যদি বাঁচিয়া থাকি, আবার দেখা হইবে।" আজ বুঝি সেই দেখা হইল।

কিন্তু এ কি? এ কি সেই কনক? দুদিন পূর্ব্বে সে একাকিনী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কাঁদিত, আজ তাহাকে জড়াইয়া কত লতা বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাকে ত জড়াইয়া

তাহারা উঠিতেছে, আর এখানে ?—এখানে ছিন্ন লতিকা জননী সৌন্দর্য্যের ম্রিয়মাণ ছবি দেখিয়া আকুল প্রাণ শীতল করিতেছেন। প্রকৃতির এ মর্ম্মখেলা কে বুঝে ?

সেই ক্ষুদ্র প্রাণ ধীরে ধীরে নিভিয়া আসিতেছে। তাহার দলিত হৃদয়ের মুমূর্ষু আশালতা চিরদিনের মত শুকাইয়া গেছে। জটিল স্বার্থের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কানাকানির ঢেউগুলি তাহার ক্ষুদ্র বক্ষের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। নিভ নিভ হইয়াও সে নিভিতে চাহে না। তোমাদের আশীর্ব্বাদে সে যেন শীঘ্রই ধূলিতে মিশায়। ['ভারতী ও বালক,' ফাল্গুন ১২৯৩, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪]

অবসান

নিমীলিত অধরের দু'টি ম্লান হাসি
দোঁহা পানে রহিল চাহিয়া।
মেঘাচ্ছন্ন হৃদয়ের দুইখানি মেঘ
গায় গায় পড়িল ঢলিয়া।
প্রেমপূর্ণ দুই ফোঁটা শেষ অশ্রুজল
পরস্পরে চাহিল বিদায়—
সন্ধ্যাময় জগতের নিঝুম আঁধারে
ঝ'রে গেল বনের ছায়ায়।

['ভারতী ও বালক,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪]

আশা

নিরাশার ম্লান মুখের উপর একটা গভীর আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া বঙ্গসন্তান ধীরে ধীরে জগতে বাহির হইতেছে—বহুদিন পরে সে একবার পৃথিবীর মুখ দেখিয়া প্রাণ শীতল করিবে। এতদিনকার সযতনে পালিত জড়ভাব পরিত্যাগ করিয়া জগতের কঠোর অনুগ্রহের সম্মুখে সে আজ একবার জীবন পরীক্ষা করিবে; দেখিবে—পূর্ব্ব, পশ্চিমের সমকক্ষ হইতে পারিবে কি না। শান্তিপ্রিয় বাঙ্গালী স্বদেশের জন্য কাজ করিতেছে—স্বদেশীয় সাহিত্যের উন্নতি করিয়া। বাঙ্গালী বুঝিয়াছে যে, চুপিচাপি বসিয়া থাকিবার দিন এখন নয়। এই জীবনসংগ্রামের মহাকোলাহলে সেও তাই আপনার ক্ষীণ কণ্ঠ

জাহির করিতে বাহির হইয়াছে। সে চাহে, যেখানে ইংলণ্ড দাঁড়াইবে, সেও সেইখানে দাঁড়াইবে—লেজ গুটাইয়া নীচের মত দাঁড়াইবে না—দাঁড়াইবে বীরের মত প্রসারিতবক্ষে।

তাই আজ বঙ্গের অভিশপ্ত সন্তান চারি দিক্ হইতে মধু আহরণ করিয়া স্বদেশীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিতে অগ্রসর, চতুর্দ্দিকের বাধা বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া একমনে আপনার কার্য্যে মগ্ন। আশার বলে বলীয়ান্ হইয়া বাঙ্গালী যেরূপ উৎসাহে কাজে লাগিয়াছে, তাহাতে বিফলমনোরথ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই।

কাগজ-পত্রে মধ্যে মধ্যে ভারতের সাধারণ ভাষা সম্বন্ধে আন্দোলন আলোচনা শুনিতে পাওয়া যায়। সম্পাদকবর্গ সাধারণতঃ ইংরাজী অথবা সংস্কৃতকেই সাধারণের ভাষা করিয়া তুলিতে চাহেন। ইংরাজী যে দিন আমাদের ভাষা হইবে, সেই দিন আমরা ইংলণ্ডের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত হইব। ইংলণ্ড গর্ব্ব করিবে, ভারতবাসীকে আমরা কথা কহিতে শিক্ষা দিয়াছি। ইহাপেক্ষা কি বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়া মরা ভাল নয়? ডুবিয়া মরিতে কি এতই কষ্ট?

সংস্কৃতের দিন কাল এখন গিয়াছে। সংস্কৃত সাধারণের ভাষা ত কিছুতেই হইতে পারে না। আধুনিক কোনও সাহিত্যের সাহায্য ভিন্ন সংস্কৃত নূতন জ্ঞানোপার্জ্জনের পক্ষেও বিশেষ সুবিধাজনক নহে—সেই পুরাতন কালের হ য ব র এবং লয়ের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হইবে।

বাঙ্গলা সাহিত্য প্রাচীন ও আধুনিক জ্ঞানে পুষ্ট। যোগ্যতা ও উন্নতি দেখিয়া সহজেই মনে হয়, বাঙ্গালা একদিন বোম্বাই মান্দ্রাজে সাদরে গৃহীত হইবে। বাঙ্গালী কবি তখন ভারতের কবি হইবেন; শস্য-শ্যামল বঙ্গভূমির উর্ব্বর ক্ষেত্র দেখিবার জন্য চারি দিক্ হইতে লোকে ছুটিয়া আসিবে।

বাঙ্গলা এখন উন্নতিশীল। কাগজে আঁচড় কাটিয়া বঙ্গদেশ যাহা রাখিয়া যাইবে, কুরুক্ষেত্রের সমস্ত রক্তে তাহা মুছিতে পারিবে না। রুধির-কলঙ্কিত দেহে পঞ্জাব হাঁ করিয়া দেখিবে, কাগজে আঁচড় কাটিয়া বঙ্গ কি করিয়া গেল। হয় ত কিছু দিন পরে এই দেবভাষা পঞ্জাব-কণ্ঠে ধ্বনিত হইবে—কাশ্মীরের নিস্তব্ধ উপত্যকা কম্পিত করিয়া হিমালয়ের তুষারধবল শিখরে শিখরে প্রতিধ্বনিত হইবে। তখন লোকে বলিবে, বাঙ্গালী মানুষ বটে।

এখন আর সে দিন নাই; পাশব বল এখন বড় কার্য্যকরী নহে। কালের প্রস্তরপটে নাম খোদিত করিবার জন্য জগতে একটা যোঝাযুঝি পড়িয়াছে; সেই যোঝাযুঝিতে মাতোয়ারা হইয়া ইংলণ্ড ছুটিয়াছে; ফ্রান্স ছুটিয়াছে, ইতালী ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, আবার উঠিয়া ছুটিয়াছে। বঙ্গদেশও সেই সঙ্গে ভারতকে পৃষ্ঠে লইয়া ছুটিয়াছে।

ভাব দেখিয়া আশা হয় যে, বঙ্গদেশ ইহাদিগকে ধরিতে পারিবে। তখন দেখিবে, বাঙ্গলা স্বাধীন—শ্বেতদ্বীপের অবিরাম জুতাবর্ষণে কম্পিতকলেবর নহে।

অল্পদিনের মধ্যেই বঙ্গ-সাহিত্য যেরূপ উন্নতি করিয়াছে, তাহাতে আশা করা যায় যে, য়ুরোপের সাহিত্যের সঙ্গে সে প্রতিযোগিতা করিয়া চলিতে পারিবে। য়ুরোপ কান খাড়া করিয়া শুনিবে—ঐ সুদূর পূরবে কে বীণা বাজাইতেছে।

এখন আমাদের উন্নতি-অবনতি সকলই সাহিত্যের উপর নির্ভর করে। বাহুবল অবশ্য আবশ্যক, কিন্তু বিজ্ঞান-বলের নিকট তাহা কিছুই নহে। আমরা সাহিত্যের বলে যাহা করিব, অন্য দেশ বাহুবলে তাহা করিতে পারিবে না। বাহুবলের জন্য কাহার গৌরব? প্রাচীন ভারতের গৌরব—বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, ভবভূতি। নব্য ইংলণ্ডের গৌরব—সেক্সপীয়র, মিল্টন, শেলী। সাহিত্য দুর্ব্বলের হৃদয়েও বলসঞ্চার করিয়া দেয়। সাহিত্যে বলের অভাব?

বাঙ্গালী এখন বুঝিয়াছে, উদরের প্রসার-বৃদ্ধির উপর কাহারও উন্নতি নির্ভর করে না। সাহিত্য উন্নতির পথের দ্বারস্বরূপ। ইহা বুঝিয়া বাঙ্গালী সাহিত্যের অনুশীলনে মনোযোগ দিয়াছে। পথে হাটে প্রতি দিন প্রাতে যে সকল মিথ্যা কথার স্তূপ দু-এক পয়সায় বিতরিত হয়, তাহারা যে বাঙ্গালীকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, ইহা কেহ মনে না করেন। সাহিত্য অর্থে গালিগালাজ বুঝায় না।

অনেক সহৃদয় ব্যক্তি বঙ্গ-সাহিত্যের এই তরুণাবস্থায় এই সকল মিথ্যার স্তূপ আমদানি দেখিয়া তাহার উন্নতির বিষয় হতাশ হইয়া পড়েন। হতাশ হইবার কোনও কারণ নাই। সকল দেশে, সকল সময়ে ভালর সঙ্গে মন্দ মিশ্রিত থাকিবেই, এ মন্দের যে ফল কিছুই নাই, এমনো নহে। অন্ধকার আছে বলিয়া আলোকের এত সম্মান; এ মন্দ ভালকে ক্রমশঃ উজ্জ্বল করিয়া ফুটাইয়া—আপনার অন্ধকারের মধ্যে আপনি মরিয়া থাকিবে।

নবীন আশায় বাঙ্গালীহৃদয় উথলিয়া উঠিয়াছে। এতদিনকার দাসত্বের ভাবের প্রতি তাহার একটা অশ্রদ্ধা জন্মিতেছে। সে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করিতে চায়—স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে চায়। সাহিত্য তাহাকে দিন দিন স্বাধীনচেতা করিয়া তুলিতেছে। আশা হয়, বাঙ্গালী একদিন স্বাধীনতার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারিবে।

পাশ্চাত্য দেশ হইতে বাঙ্গলায় যে একটা বিপ্লবের তরঙ্গ আসিয়াছে, তাহার ফল ভাল বই মন্দ হইবার সম্ভাবনা নাই। বিপ্লব, সঙ্কোচের ভাবকে ভাঙ্গিয়া দিয়া আত্মনির্ভরের ভাব রাখিয়া যায়। বাঙ্গালী অল্পে অল্পে আত্মনির্ভর শিখিতেছে—সকল বিষয়ে তাহার য়ুরোপের আর মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে না।

ভবিষ্যতের দূর আশার বাঁশী শুনিয়া আজ বঙ্গদেশ যে নব উৎসাহে ছুটিয়াছে, তাহার গতিরোধ করে কে ? তাহার কঙ্কালাবশিষ্ট দেহে ছুটিতে ছুটিতে সে শত বার পড়িয়া যাইতে পারে, কিন্তু সে মরিবে না। হৃদয়ের বলে সে জগতের তুচ্ছ আঘাতকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে। দূর-ভবিষ্যতের পৃষ্ঠায় তাহার জয়শঙ্খধ্বনি ফুটিয়া উঠিবে—বহু দিন পরে ক্ল্যারিয়নেটের কঠোর স্বরের পরিবর্ত্তে সেই চিরসুমধুর পবিত্র শান্ত শঙ্খধ্বনি শুনিয়া পৃথিবী সুখী হইবে। এখন যাহা দূরস্মৃতিমাত্র, তখন আবার সেই ঋষিদের গান—সেই স্নিগ্ধ শ্যামল তপোবনের স্নেহমাখা হোমধূম—সেই প্রভাত-বিহঙ্গের স্বাধীনতাময় ভাব প্রত্যক্ষ করিবে।

সাহিত্যের বলে, হৃদয়ের বলে, ধর্ম্মের বলে বলীয়ান্ বাঙ্গালী পৃথিবীর বুকের উপর বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দিবে—সেই জয়-চিহ্নের পাদদেশে বসিয়া ভারত বাঙ্গালীর ভাবে, বাঙ্গালীর সুরে বাঙ্গালীর গান গাহিবে—"বন্দে মাতরম্"। ['ভারতী ও বালক,' আষাঢ় ১২৯৪]

প্রণাম

জীবনের একটা মহাশূন্যের উপরে দাঁড়াইয়া নিজের সঙ্কীর্ণতার স্ফীততায় আমরা প্রতি নিমেষে জগৎকে সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিতে চাই, আত্মাভিমানে ভেকের মত এমনি স্ফীত হইয়া উঠি যে, হস্তীকে দেখিলে মূষিকশাবক বলিয়া মনে হয়—মনে হয়, এই স্ফীত অহঙ্কারের মধ্যে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড এক রত্তি ধূলিকণার মত মিশিয়া গিয়াছে। মানবের হৃদয় জগৎকে আপনার মধ্যে টানিয়া লইতে পারে, যখন আপনার উদারতায় জগতের প্রতি পরমাণুর গভীরতা তাহার নিকট প্রকাশ পায়—যখন সে জগদতীতে বাস করিতে থাকে। নয় ত যখন অহঙ্কার তাহার বত্রিশপাটী দন্তচ্ছটা বাহির করিয়া নির্লজ্জের মত রুদ্ধ-হৃদয়ের অন্ধকারের উপর আসন বিছাইয়া বসে, তখন সেই ছটার মধ্যে জগৎ লুকাইয়া পড়ে।

অহঙ্কার স-সীমত্বের আড়ম্বরে অসীমকে ঢাকিয়া ফেলিতে চায়—আপনার চারি দিকে পৃথিবীর কলঙ্কিত ধূলিস্তূপ সংগ্রহ করিয়া অসীমের আলোকের প্রতিবন্ধকতা করে—মোহ-পাপের চাপে হৃদয়কে দলিত করিয়া মারিয়া ফেলে। অসীমের জ্যোতি অহঙ্কারের ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়—তাহার জীর্ণ দেহের উপর হইতে স্বাস্থ্যের অলীক আবরণ তুলিয়া লইয়া তাহার অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় প্রদান করে; অহঙ্কার নিজের ক্ষীণ অস্তিত্বের অন্ধকারে মিলাইয়া যায়।

বর্ত্তমান বাঙ্গলায় এই অহঙ্কারের একটা ভাব দেখা দিয়াছে—হৃদয়কে ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য অনেক উদ্যম আয়োজন হইতেছে। গৃহলক্ষ্মীকে দূর করিয়া দিয়া পর-পদসেবা—পরের গালিগালাজ ঝাঁটা লাথি সহ্য করিয়া গৃহের মান্য গণ্য গুরুব্যক্তি-দিগকে কদলীর অনুকরণে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই জন্য প্রতি প্রাতের নালা-নর্দ্দামা গলি-ঘুঁজি-প্রসূত অর্থহীন খেয়াল প্রলাপ গুলিতে নানাবর্ণের একটা আলখাল্লা পরাইয়া ব্যাখ্যা টীকা ও ভাষ্য-সমেত সংস্কৃত পকেটসমূহ বোঝাই করিয়া সাধারণের নিকট লইয়া আসা হয়; বৈদাৎ যদি কেহ আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া দলবৃদ্ধি করণে মনোযোগ দেয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমাদের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া যাহা কিছু পাশ্চাত্য, তাহাই যে পরম সেবনীয়, এরূপ নহে। পশ্চিমের দুর্দ্দমনীয় উদ্যম অধ্যবসায়—জীবনের এক ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তকে পর্য্যন্তও আলস্যের গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার বাসনা—হৃদয়ের শোণিত দিয়াও স্বদেশের স্বত্ব রক্ষা করিবার প্রাণপণ চেষ্টা, এ সকলের প্রতি কৈ, আমাদের ত তেমন লক্ষ্য নাই। ভবিষ্যতের রঙ্গভূমিতে আমাদের অনেক আশা আছে বলিয়া ঘরের কোণে বসিয়া স্বদেশের স্বত্ব লোপ করিবার জন্য বিদেশীয় হৃদয়হীনতার জঞ্জাল টানিয়া আনিবার আবশ্যক কি? বিদেশীয় উদ্যম অধ্যবসায় শিক্ষা কর—স্বদেশের চিরপ্রচলিত সুপ্রথা বিসর্জ্জন দিও না।

অনুকরণে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে যখন মানবজাতি হইতে অনেক উচ্চে মনে হয়—আত্মাভিমানে যখন আর সকলই ক্ষুদ্র হইয়া উঠে, তখনই এই সকল দুর্ব্বুদ্ধি ঘটে; বিদেশীয় চটুল হস্তপীড়নের অনুরোধে স্বদেশীয় প্রণাম প্রথার উপরে একটা ঘৃণা জন্মিয়া যায়; আপনার মহত্ত্বে এতটা স্থির বিশ্বাস জন্মায় যে, জগতে অন্যের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা দায় হইয়া উঠে—সুতরাং প্রণামকে নীচতার কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

রাজা দিলীপ যখন সস্ত্রীক বশিষ্ঠাশ্রমে গিয়া গুরু ও গুরুপত্নীকে প্রণাম করিলেন, তখন সেই প্রণামের মধ্যে তপোবনের কেমন একটি পবিত্র শান্ত ভাব যেন ফুটিয়া উঠিল—সংসারের সমস্ত শোক তাপ, দুঃখ ভয় ধীরে ধীরে মুছিয়া গেল—সুখ, বাসনা, কিছুই রহিল না—রহিল শুধু এক শান্তি।

প্রণামের সহিত আমাদের চিরসম্পর্ক। তাহার বিপুল ছায়ায় আমাদের সেই প্রাচীন তপোবনের সরলতার প্রতিমা ঋষিকন্যাগণের প্রতি দিনের সান্ধ্য জলসিঞ্চন—তৃষিতাক্ষী হরিণ হরিণীর নীবাররোমন্থন—অনাসক্ত হৃদয়ের স্বতঃ উৎসারিত "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং"—এই সকল স্মৃতির মত জাগিয়া আছে। আজ আমরা সহসা যদি আমাদের এতদিনকার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া হৃদয়হীন পাশ্চাত্য প্রথার অনুরোধে ইহাকে বিসর্জ্জন করি, তাহা হইলে আমরা কি মনুষ্য?

মিল স্পেন্সরের গদীর উপরে স্বর্ণসিংহাসন স্থাপন করিয়া যদি কেহ প্রণামকে হেয় বলিয়া নাসিকা সঙ্কুচিত করে—করুক। আমাদের প্রণামের মধ্যে অহঙ্কার নাই, লালসা নাই—কৃত্রিমতা নাই। উচ্ছ্বসিত ভক্তির আবেগে হৃদয় স্বতই নত হইয়া পড়ে। হিংসা দ্বেষ, কটাক্ষ তাচ্ছিল্য তাহার নিকট ঘেঁষিতে পারে না। বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী সেখানে পরাজিত হয়।

আমরা আজ হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পথপ্রান্তে বসিয়া যে অনর্গল অশ্রুপাত করিতেছি, ইহাতে কোন ফল হইবে না। এ নির্ম্মম জগতে পরের নিকট কে কবে কি আশা করিয়াছে? এখানে বিদ্রূপের হাসি অজস্র মিলিবে—কিন্তু পরের দুঃখে দুঃখী মিলিবে না।

তাই বলি, স্বদেশীয় সুপ্রথায় জলাঞ্জলি দিয়া স্বদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়োজন নাই। হৃদয়হীনতা মনুষ্যকে দুর্ব্বল করিয়া তুলে। বিদেশীয় হৃদয়হীনতার আমদানিতে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। প্রণাম আমাদের নৈরাশ্যের ক্ষুব্ধ গর্জ্জনের মধ্যে আশা ফুটাইয়া দেয়—গৃহহীন অনাথকে সক্রিয় করিয়া তুলে। প্রণাম আমাদের নিজস্ব। আমাদের মাতৃদুগ্ধের সহিত সে হৃদয়ে প্রবেশ কয়িয়াছে। প্রাচীনত্বের অজ্ঞাত ইতিহাসের সহিত সে আমাদের যোগ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

তাই বলি বঙ্গসন্তান, ভক্তির সহিত একবার মাতাকে প্রণাম কর। তাঁহার স্নেহ আশীর্ব্বাদ ফুটিয়া উঠিয়া আমাদিগকে চিরদিন জয়যুক্ত করিবে। ['ভারতী ও বালক,' শ্রাবণ ১২৯৪]

বন্দিনী

অত্যাচারের দারুণ কঠোরতার হস্তে প্রতি মুহূর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া জগতের একজন ভিখারিণী পরের দুয়ারে এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য দাঁড়াইয়া অশ্রুপাত করিতেছে—লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সন্তানের মঙ্গলের জন্য যুক্তকরে মঙ্গলনিদানের নিকট আপনার দুঃখ জানাইয়া অবসন্ন হৃদয়কে সান্ত্বনা দিতেছে। উদারতার গভীরতম প্রদেশ শূন্য দেখিয়া মনুষ্যের মমতায় তাহার আর আস্থা নাই। সে বুঝিয়াছে, মনুষ্যের নিকট উপকার প্রত্যাশা করা নিতান্তই অধর্ম্মের ভোগ।

বন্দিনী সেই জন্য ভিখারিণীবেশে পরের দুয়ারে দাঁড়াইয়াও ভিক্ষা মাগিতে পারিতেছে না। নৈরাশ্যের আঁধারের মধ্য দিয়া তাহার নিস্তরঙ্গ হৃদয়ে এক একবার আশার বিজলী হানিতেছে—কারাযন্ত্রণার সমস্ত কষ্টের উপর দিয়া যেন একটা বজ্রের কম্পন চলিয়া

যাইতেছে। তৃষিত নয়নে সে দূর গৃহের পানে চাহিয়া দেখিতেছে—কুজ্‌ঝটিকা ভিন্ন কিছুই চক্ষে পড়ে না।

এখানে একটা ভাঙ্গাচোরা পড়িয়াছে—পুরাতন নূতনে অবিশ্রাম সংঘর্ষণে একটা মহা-পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এখানে নিদ্রা স্বপ্নে—স্বপ্ন আশায়—আশা উৎসাহে—উৎসাহ উদ্যমে পরিণত হইতেছে। ভবিষ্যতের নূতন পৃষ্ঠার প্রতিই সকলের দৃষ্টি।

অত্যাচার আপনার উনপঞ্চাশ অহঙ্কারের উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া ক্ষুদ্র জীবনের বহু কষ্ট রচিত নীড়টুকুর পানে এমনি ভাবে ভ্রুকুটি করিতেছে, যেন একটুকু সুবিধা পাইলেই সেই ক্ষুদ্র নীড়টুকু ভাঙ্গিয়া দেয়। ক্ষমতা, ধন, তাহার সাহায্যার্থে চারি দিক হইতে অযাচিত চাটুকারের মত ছুটিয়া আসিতেছে—যদি অত্যাচারের কৃপাবলে দেহখানির আয়তন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়।

সাধুতার আবরণ দিয়া অত্যাচার স্বীয় অসদভিসন্ধি চাপিয়া রাখে। তাহার অধরৌষ্ঠের উপরে একটা বিদ্রূপের রেখা—ঘৃণার ঔদাস্য। আপনার কিষ্কিন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রসারিত লাঙ্গুলের জটিল কুণ্ডলীর মধ্যে সে জগতের সমস্ত নিরীহকে চাপিয়া মারিতে চায়।

বন্দিনী অত্যাচারের নিজকক্ষে অবরুদ্ধা, নিষ্ঠুর পাষাণের প্রতি কঠোর অবজ্ঞা কর্তৃক লাঞ্ছিতা। গৃহে বসিয়া শীর্ণদেহ সন্তান ক্রমাগত অশ্রু মুছিতেছে। এ সংসারে দুর্ব্বলের অশ্রু ভিন্ন গতি নাই।

আজ বহুদিন পরে সন্তান মাতার উদ্ধারের জন্য বদ্ধপরিকর হইতে চায়—নির্ম্মমতার দুয়ারে অশ্রুবিসর্জ্জনে কোনও ফল নাই। কমলাসনা ভারতীর ছিন্নতন্ত্রী বীণায় তাই আজ পুনরায় আঘাত লাগিয়াছে—স্তব্ধ বীণা বহুদিনের নিস্তব্ধতা পরিত্যাগ করিয়া মৃদুল ঝঙ্কারে জগৎকে আপনার কাহিনী উপহার দিতেছে। জগতে সকলে জানুক, সভ্যতার আবরণে অত্যাচার কিরূপে লুকাইয়া থাকে। জগৎ জাগিয়া উঠিলে—দিবালোকে মাতাকে নাগপাশে কে আবদ্ধ রাখিতে পারে? সন্তান স্বহস্তে সে নাগপাশ ছিন্ন করিয়া দিবে—আমাদের গৃহে লক্ষ্মী সরস্বতী একাসনে বিরাজ করিবেন।

ভগবানের নাম লইয়া কোটিকণ্ঠে একবারে মাতার জয়গানে জগৎকে কাঁপাইয়া তোল—প্রাণ খুলিয়া একহৃদয়ে একবার সকলে বল 'মা'। সংসারের হাহাকার ঘুচিয়া যাইবে—দুর্ভিক্ষ মারী নিমেষের মধ্যে কোথায় অন্তর্ধান করিবে, কেহ জানিতেও পারিবে না।

জগতে যাহার জননী বন্দিনী, তাহার শান্তি কোথা? পরের নিকট হইতে ভিক্ষা লইয়া সহস্র সুখলাভ ঘটিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অশান্তি বই শান্তি বৃদ্ধি হইবে না। ঐ দেখ, জননী বন্দিনী হইয়াও ভিক্ষার দুয়ারে যাইতে সঙ্কুচিত। ছিন্নবসনা দেবী কারাগারের অশেষ যন্ত্রণার মধ্যেও অনুগ্রহের দান লইতে চাহেন না—পুত্রের জন্য এক মুষ্টি তণ্ডুল ভিক্ষা

মাগিতে গিয়াও পশ্চাৎপদ। আজ তাঁহার সন্তান কি ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবনের প্রতিষ্ঠাভূমি করিতে পারে?

পুরাতন স্বাধীনতার উপর নূতন স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, পুরাতন জাতীয়ত্বের উপর নূতন জাতীয়ত্বের ভিত্তি। আমাদের এক কালে স্বাধীনতা ছিল—এক কালে মান সম্ভ্রম সকলই ছিল। এখন তাহা নাই। কিন্তু নাই বলিয়া যে তাহা আর হইবে না, এমন নহে। বাঙ্গালী পুরাতন জাতি—কিন্তু পুরাতন হইয়াও আজ সে এক নূতন জাতি। নূতন আশা ভরসায়, নব উদ্যমে সে দিন দিন উন্নত হইতেছে। পুরাতনের প্রতিষ্ঠা-ভূমির উপরে দৃঢ়পদে দাঁড়াইয়া সে স্বাধীনতার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবে।

সম্মুখে চাহিয়া আমাদিগকে ক্রমাগত অগ্রসর হইতে হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবৃত্তির দাসত্ব ছাড়িয়া আপনার কাজ আপনি না করিলে করিবে কে? পূর্ব্বগৌরবের পদানুসরণ করিয়া এক দিন আমরা জন্মভূমিকে গৌরবান্বিত করিতে পারি। প্রাচীনতার উপর খড়্গহস্ত হইলে—অতীতের প্রতি নির্ম্মমের মত কলঙ্কিত দন্তপংক্তি বাহির করিয়া থাকিলে কিছুই হইবে না।

প্রেম চাই—যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহার প্রতি আন্তরিক টান চাই। বিদেশীয়ের দুয়ারে আমরা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়াছি—হৃদয়টুকুও কি বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

সত্যের দুয়ারে—ধর্ম্মের দুয়ারে—ন্যায়ের দুয়ারে হৃদয়ের সাধু ইচ্ছাকে উপহার দাও। জগতে চিরদিন পশুত্ব থাকিবে না। আজ এই যে এখানে সেখানে পশুত্বের উল্লাস শুনা যাইতেছে, দুই দিন পরে ইহা কোথায় মিলাইয়া যাইবে। নিভ নিভ উল্কা শেষ মুহূর্ত্তে একবার জ্বলিয়া উঠে—নিভ নিভ পাপ শেষ মুহূর্ত্তে একবার প্রতাপ দেখাইয়া যায়।

হৃদয়কে প্রেম দিয়া বাঁধিয়া একবার ডাক 'মা'। সেই ধ্বনিতে মিলাইয়া গিয়া জগৎ একাকার হইয়া যাক্—আর্য্যাবর্ত্তের নূতন জাতির গৌরবে বিশ্ব উজ্জ্বল হইয়া উঠুক।
['ভারতী ও বালক,' ভাদ্র ১২৯৪]

হৃদয়াঞ্জলি

আশপাশের কোলাহল হইতে বিশ্রাম করিবার জন্য দূরে সরিয়া বসিয়াছ—এ কোলাহল-স্রোত তোমার হৃদয়ের মধ্য দিয়া পথ করিতে পারিল না। রুদ্ধ উচ্ছ্বাসের মত সে আপনার প্রবাহের মধ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে—শাখা-প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া কল্লোল-কাহিনীর স্মৃতিতে মাত্র অবসিত হইতেছে। তুমি দূরে সরিয়া বসিয়াছ—সেখানকার নূতন

জ্যোৎস্না, নূতন আলোক, নূতন সুখ দুঃখে ইহাদের ছায়া পড়ে না ; এখানকার হাসি কান্না তুমি শুনিতে পাও না।

এখানে অশোক-শাখা আলস্যভরে হেলিয়া পড়ে—তোমার জ্যোৎস্নালোকে তাহার ক্ষীণ কম্পনমাত্র প্রতিভাত হয় ; তুমি মনে কর, সুরপুরে উপবন হইতে দেবতারা ছায়াপথে আসিয়া বীণা বাজাইতেছেন, বীণার তারে নাচিয়া নাচিয়া দেবলোকের অমর সঙ্গীতের মৃদু কম্পন পৃথিবীতে আসিয়া মিলাইয়া যাইতেছে। তোমার যেন মনে হয়, পৃথিবীতে নন্দনের সৌরভ আসিতেছে—তোমার আশার প্রতিফলে আমাদের আশা জাগিয়া উঠে। আশাপূর্ণ-হৃদয়ে মর্ত্ত্য নিকেতনে তুমি যে সঙ্গীত রচনা কর, অমরালয়ের উপছায়া তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। নরলোকে দেবলোকের আদর্শ গঠিত হয়।

যমুনার তীরে দাঁড়াইয়া কে একজন একদিন বাঁশী বাজাইয়াছিল—সে বাঁশীর স্বর হারাইয়া গিয়াছে, বাঁশী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, যে বাঁশী বাজাইয়াছিল—সেও আর নাই ; তোমার মরমে সেই ভাঙ্গা বাঁশীর ভাঙ্গা সুর এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তুমি সেই ভাঙ্গা সুরে যে রাগিণী ফুটাও, তাহাতে জগৎ উদাস হইয়া পড়ে—সেই আশাপূর্ণ শান্তিরাজ্যের ছায়ায় মর্ত্ত্য-কোলাহল ধীরে ধীরে নিভিয়া আসে।

পশ্চিমে সূর্য্যালোক অবসিত হয় ; পূরবে সন্ধ্যা জাগিয়া উঠে। ধূসর-বসনা সন্ধ্যার স্নেহমধুর অধরে তোমার পূরবী রাগিণী প্রতিফলিত হয়। জগৎ নিদ্রায় ঢলিয়া পড়ে। ফুলে ফুলে অনন্তের মহিমা-সৌরভ বিকশিত হইয়া উঠে। নীলাম্বরে ধরণীর প্রতি চুম্বন ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায়। সসীমে অসীমে মধুর মিলন প্রতিভাত হয়।

সেই চিরস্থির চিরসুন্দর ধ্রুব-আঁখির পানে চাহিয়া জগৎ চলিয়াছে। মৃত্যু তাহার চারি দিকে যে নীড় রচনা করিয়াছে, তিনি তাহার মধ্যে নূতন জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মৃত্যুর আবর্ত্তে জগতের প্রাণ প্রতি দিন নূতন হইয়া বিকশিত হইতেছে। তাই জগতে সন্ধ্যা উদয় হয়, ঊষা অস্ত যায়। তাই আকাশে তারকা ফুটে, চন্দ্রমার ম্লান হাসিতে নব নব সৌন্দর্য্য চিত্রিত হয়।

এই অতৃপ্তি-মরুর মোহময় বালুকারাশির ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া আমাদের দীন আত্মা সেই অসীম আত্মার পানে চাহে না ত। চারি দিকের আধ কাঠা জমির বাহিরে সে সাধ করিয়া পদনিক্ষেপ করে না ত। তোমার সঙ্গীতে আমাদের হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত হয়। সেই শান্তিনিকেতনের কথা মনে পড়ে। আমাদের ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিতে পারি। সেই ধ্রুব অসীমের চরণে এই কলঙ্কিত আত্মাকে সমাধান করিয়া সুখী হই।

সেখানে মোহ নাই, অশান্তি নাই, মিথ্যা নাই, পাপ নাই, শোক নাই, ভয় নাই। সেই ধ্রুবপদে চিরশান্তি। সেই ধ্রুবপদ আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল। দ্বেষ, হিংসা,

সাম্প্রদায়িকতা, কানাকানি সেখানে পঁহুছায় না। সেখানে প্রেম, আনন্দ, অমরতা। সেই পরমপদে বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত। সেই পরম ইচ্ছায় নিমেষ মুহূর্ত্ত সকলই ধ্বংস হইয়া যায়—কাল কোথায় হারাইয়া যায়।

সংসারক্লিষ্ট আত্মাকে তুমি সেই দয়াময়ের মহিমা বুঝাইয়া দাও—অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস দিয়া তাহার মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চার কর। তোমার সঙ্গীতে জগতের সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়।

তুমি দূরে সরিয়া বসিয়াছ; এখানকার হাসি কান্না তুমি শুনিতে পাও না। কিন্তু এখানকার প্রতি তোমার সহানুভূতি আছে। তাই সে অপার্থিব জ্যোতির্ম্ময় গৃহ ছাড়িয়া তুমি এখানকার দুরবস্থা দেখিয়া ভ্রমণ করিয়া থাক—এখানকার হাসির উল্লাস দেখিয়া নীরবে অশ্রুমোচন কর—যাহাতে এ অশান্তি ঘুচে, তাহার জন্য জগতের হইয়া প্রার্থনা কর।

কোন্ দিন ম্লানমুখে দুঃখিনী শুকতারা শরতের ম্লান চন্দ্রের পানে অনিমেষ-নেত্রে চাহিয়াছিল, নিস্পন্দ জগতের সুগভীর নীরবতায় মুগ্ধ হইয়া নয়নের কোণে এক ফোঁটা অশ্রুজল মর্ত্ত্যভূমির অশান্তি-কালিমার মধ্যে নিজের সমাধি রচনা করিতেছিল, তুমি বুক পাতিয়া দিলে—নীরবে সেই অশ্রুজল স্বর্গের কাহিনী লইয়া তোমার হৃদয়ে আসন স্থাপন করিল। মর্ত্ত্যের পাপী তাপীরা ঐ নক্ষত্রখচিত নীলিমার কাহিনী শুনিতে পাইল। সঙ্গীতের জাল রচনা করিয়া তাহারই উপরে তুমি তাহার জন্য যে বনফুলের শ্যামল শয্যা প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাই সে মর্ত্ত্যের অশান্তির মধ্যেও শান্তি লইয়া জাগিয়াছে। তোমার সঙ্গীতে সঙ্গীতে, বনফুলের মধু সৌরভে, স্নেহ প্রেমের কাহিনীতে, ভগ্ন হৃদয়ের নৈরাশ্যে সেই অশ্রুজল প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

কোন্ দিন হৃদয় দিয়া হৃদয়ের কণ্ঠ চাপিয়া স্বর্গের দুই জন আত্মহারা নদীবক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে অন্তরীক্ষে একবার শিহরিয়া উঠিয়াছিল মাত্র, তুমি তাহাদের সঙ্গে নদীতে ডুবিলে—জ্যোৎস্নায় ডুবিলে—আনন্দে ডুবিলে—প্রেমে ডুবিলে—সেই আত্মহারাদের আত্মায় ডুবিলে। ডুবিয়া কি করিলে? স্বর্গের অনাদৃতদের জন্য তোমার হৃদয়ে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিলে। সেই আত্মহারা জ্যোতির্ম্মুখী আত্মা দুইটি তোমার হৃদয়ে বাসস্থান করিল। বুঝিল, মঙ্গলময়ের রাজ্যে আশ্রয়হীন কেহ নাই।

কবে একদিন কৈলাসশিখরে বিবাহের হুলুধ্বনি উঠিয়াছিল, পার্ব্বতীর দীর্ঘ কেশগুচ্ছের সহিত শিবের মস্তকস্থ ফণাজালের প্রেমালিঙ্গন সংঘটিত হইয়াছিল, তুষারধবল কৈলাসগিরির সমুচ্চ শিখরে চন্দ্র সূর্য্যের মিলন দেখা গিয়াছিল, জ্যোৎস্না ফুটিয়া পড়িয়াছিল, রবিকরের তেজ চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়াছিল, সুরবালারা ছায়াপথ দিয়া মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছিল, দেবর্ষিরা বীণা বাজাইয়াছিলেন, সেই দিন—সেই শান্তিময় পুণ্যদিনের কথা তোমার স্বপ্নময়ী,

উচ্ছ্বাসময়ী, প্রাণময়ী রাগিণীতে এ মর্ত্ত্য অধিবাসীদিগের নিরানন্দের মধ্যেও কেমন আনন্দ-বারতা প্রচার করিতেছে।

তোমার সঙ্গীতে এত আনন্দ, এত সহানুভূতি, এত প্রেম। কিন্তু তাহার জন্য মানবসমাজের নিকট হইতে কখনও কি দুইটা সহানুভূতি শুনিয়াছ? বিজ্ঞতা চশমা আঁটিয়া তোমাকে উপেক্ষা করিতে চায়। কিন্তু সে তোমাকে উপেক্ষা করিবে কিরূপে? তুমি যে উপেক্ষার অনেক উর্দ্ধে। অনুগ্রহলিপ্সা ত তোমার হৃদয়ের সম্মুখে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে পারে নাই। তুমি যে অপার্থিব,—কিন্তু তুমি পৃথিবীর জন্য সহানুভূতি অনুভব কর।

পাপিয়া গান গাহিয়া যায়; তুমি সেই ভাঙ্গা গানে ভগ্ন হৃদয়ের স্মৃতি ফুটাইয়া দাও। তুমি তাহার গানের উত্তর না দিলে সে কি এমন গান গাহিত? তুমি তাহার গানের মাধুরী প্রচার না করিলে সে কি এমন পঞ্চমে তান ধরিত? সে কি তাহা হইলে আকাশ মাতাইয়া তুলিত? পৃথিবীতে বসিয়া বীণা বাজাইয়া দেবতাদিগকে তুমি মুগ্ধ করিয়াছ; দেবতারা তোমার বীণাঝঙ্কার শুনিতে আসেন, পাপিয়া তোমার হৃদয় হইতে ডাকে—'চোক গেল'। দেবতারা নরলোকের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়েন। ছায়াপথে দেবসঙ্গীত ধ্বনিত হয়; পৃথিবীতে তাহার প্রতিধ্বনি গীত হয়। দেবসভার জ্যোতিতে ছায়াপথ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। চন্দ্রলোকের অধিবাসীরা স্বর্গের দুয়ার খুলিয়া মর্ত্ত্যের পানে চাহিয়া থাকে, তাহাদের রূপের আলোকে চারি দিক্ আলোকিত হয়।

চন্দ্রলোকে বুঝি এত অশান্তি নাই—এত দ্বন্দ্ব-কোলাহল নাই। কিন্তু সেখানে কি এমন বাঁশী বাজে, এমন সঙ্গীত শুনা যায়, এমন উচ্ছ্বাস, এমন প্রেম, এত আনন্দ জাগে? ভয়চকিত নৈরাশ্যের মধ্যে সেখানে কি কেহ এমন উদাস গান গাহে? ঐ সুদূর কলঙ্ক-কালিমার মধ্যে কি কাহারও নিভৃত অশ্রুজলসিক্ত নয়নাঞ্জনের রেখা নাই? চন্দ্রলোকের জ্যোৎস্নাবালারা বুঝি ঐখানে বসিয়া চক্ষে অঞ্জন দেয়—ঐখানে বসিয়া তাহারাও বুঝি মর্ত্ত্যবালাগণের ন্যায় কেশবিন্যাস করে, দুঃখের কাহিনী গায়, ভবিষ্যৎগর্ভে সুখের শয্যা রচনা করে। অন্যান্য গ্রহবালারা গবাক্ষ হইতে উঁকি মারিয়া দেখে।

বামনাবতারের পদচিহ্ন ধরিয়া ঐখান হইতে যখন সন্ধ্যা নামিয়া আসে,—তাহার ছায়াময় কেশগুচ্ছের মধ্যে দু একটি নক্ষত্র ফুটিয়া থাকে, তাহার ফুলসাজের স্নিগ্ধ সৌরভে চারি দিক্ সৌরভান্বিত হইয়া উঠে—তখন অস্তমান রবিকিরণের শেষ ছায়ায় নরলোকে কি মহোৎসবের ভগ্নাবশেষ ফুটিয়া উঠে! পশ্চাতে দ্বন্দ্ব প্রতিদ্বন্দ্বিত স্মৃতি—সম্মুখে শান্তির ছায়া; পশ্চাতে জগতের অস্তমান জ্যোতি—সম্মুখে সন্ধ্যার শ্যামল স্নেহ। এই সৌরভান্বিত সন্ধ্যার ছায়ায় তুমি এক দিন একটি ম্লান মুখের 'বিদায়-চাওয়া-চোখ' ফুটাইয়াছিলে, আর

একদিন আর এক বেশে সেই বিদায়-চাওয়া মাধুরীতে তোমার ছায়াস্বপ্ন বিকশিত করিয়াছিলে।

তুমি জীবনের আবরণ উদ্ঘাটিত করিয়া মৃত্যুর মোহন মূর্ত্তি বাহির করিয়াছ। তাপহরণ বিরামসদন মৃত্যুর অসীম-প্রসারিত ক্রোড়ের উপর ত্রিভুবন নির্ভয়ে ক্রীড়া করিতেছে। তুমি এই আশ্চর্য্য গম্ভীর মনোহর দৃশ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছ। এই অনন্ত শিখাবিপুল চিতানল হইতে অবিশ্রাম জীবনস্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া আকাশে ব্যাপ্ত হইতেছে। সুগভীর রহস্য-নিশীথ ভেদ করিয়া এই সর্ব্বগ্রাসী দীপ্ত চিতার পবিত্র আভা তোমার উদাস মুখে, উদার ললাটে, প্রশান্ত নেত্রে, তোমার বীণার কনকতন্ত্রীর উপরে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই রহস্যময় জীবন-অন্ধকারে এই মৃত্যুর স্তিমিত আলোকে দাঁড়াইয়া তোমার জন্য হৃদয় উৎসর্গ—হৃদয় অঞ্জলি— ; এইখানে এই ভাবে তুমি চিরদিন এই গান গাহিও—এই অনন্তজীবন-প্রবাহময় মৃত্যুর স্নেহ-আকর্ষণে নিখিল জগতের অবিরাম অভিসার-গীতি। ['ভারতী ও বালক,' কার্ত্তিক ১২৯৪]

দু'জনায়

নীলিমার স্বপন-উপকূলে দুইখানি সান্ধ্য-হৃদয়ের গভীর নিরাশা শেষ চুম্বনের দুইটি কনকরেখায় পরস্পরের গভীর বিস্মৃতি রাখিয়া ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। দু'জনার মিলন-আশার বিকাশে যে দুইটি সুন্দর চম্পকমাধুরী ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ম্লানমুখে ছলছল নয়নে তাহা অবসিত হইল। সন্ধ্যার আলুথালু কেশজালের মধ্য দিয়া সেই নৈরাশ্যচ্ছিন্ন বিরহ-আকুলদের চিরবিদায়ের স্মৃতির আকুলতা ফুটিয়া উঠিল। সান্ধ্য নীলিমার একটি গবাক্ষদ্বার খুলিয়া একজন গ্রহবালা সেই নিরাশ আকুলতার জন্য এক ফোঁটা অশ্রু মোচন করিল।

মন্দাকিনীর তীরে দাঁড়াইয়া তাহারা বুঝি এক দিন পরস্পরকে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল—দুই ফোঁটা মরমের অশ্রুজলে পরস্পরের সমস্ত সুখ দুঃখ, আশা নিরাশা, হর্ষ শোকের বন্ধন দৃঢ় করিয়া বাঁধিয়াছিল। সেদিনকার কত স্নিগ্ধ নয়ন-মার্জ্জন, কত অব্যক্ত আধবিকশিত অধরমিলন, দু'জনার ম্লান হাসিতে আজ বিদায়পরশে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই কল্পতরুমূলে বসিয়া দু'জনে কত কাহিনী গাহিয়াছিল, কত লুকান কথা, মরম-বেদনা, ধীরে ধীরে সেই সুরতরুর চিরবিকশিত পল্লবরাশির শ্যামল যৌবনে ছায়া রাখিয়া দু'জনার হৃদয়কুটীরে সুখের সংসার পাতিয়া বসিয়াছিল, আজ এই নিরাশাচ্ছিন্ন শেষ মিলনে সেই সকল নিবাতনিষ্কম্প স্মৃতি একবার জ্বলিয়া উঠিল—দূর অন্ধকার, ভবিষ্যৎ

ধূ ধূ মাত্র জাগিয়া রহিল। সেই মন্দাকিনীতীরে, সেই বীচিবিক্ষোভশীতল মৃতুস্পর্শ সমীরণে, সেই সুরতরুর শ্যামল যৌবনাচ্ছন্ন হৃদয়মিলনে, সে দিন পরস্পরের মধ্যে যে আশা-বন্ধন সংঘটিত হইয়াছিল, আজ এই জ্বালাময় মুহূর্ত্তে, সম্মুখস্থ ভবিষ্যৎ অন্ধকারের মহা-নৈরাশ্যে, নির্ব্বাপিত চিতানলের মত সেই মহা-আশার অবশিষ্ট ভস্মস্তূপ মাত্র পড়িয়া আছে। সেই ভস্মস্তূপের অন্ধকারে সম্মুখস্থ মরুভূমি ভীষণতর প্রতীয়মান হইতেছে।

তুষারধবল হিমালয়ে তুষারাবৃত উপত্যকায় তাহারা একদিন আত্মীয়স্বজনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিল—গন্ধর্ব্বেরা সঙ্গীত আলোচনা করিতেছিল, গন্ধর্ব্বদিগের মধুর সঙ্গীতের তালে তালে কিন্নরেরা নাচিয়া বেড়াইতেছিল, দূর কৈলাসগিরির জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ নীরবতায় প্রতিধ্বনিত হইয়া পর্ব্বতপতির মৃদঙ্গের সাগরগম্ভীর ধ্বনি আসিতেছিল—সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তাহারা বন্ধুবর্গের নিকট বিদায় লইতে ভুলিয়া গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিবার সময় গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে ধ্যানমগ্ন মহর্ষির পাদবন্দনা করিয়া, গঙ্গা যমুনাকে সাক্ষী করিয়া কি কথা বলিয়াছিল। নিরাশ হৃদয়ের বিচ্ছেদমুহূর্ত্তে আজ সেই সকল সুখের স্বপ্ন এই শিথিল বন্ধনে ফুটিয়া উঠিল। নীলিমার স্বপন-উপকূলে তুইখানি সান্ধ্য হৃদয়ের গভীর নৈরাশ্য ধীরে ধীরে ডুবিয়া গেল। ধরণীর নীল চন্দ্রাতপে একটি নীলাভ জ্যোতি চমকিয়া উঠিল।

সেই এক দিন, আর এই দিন। স্তিমিত নীলিমার বিমল মুখশ্রীতে নিরাশ হৃদয়ের কত স্মৃতিজ্বালা ফুটিয়া উঠিয়া নীরবে অবসিত হইয়াছে। সেই নীরব অবসানের অপরিস্ফুট স্নেহচিহ্নে আজ যেন কেমন একটু ম্লান সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিতেছে—স্থিরাননা সন্ধ্যার বিকচ অধরের রক্তিম আভায় সেই ম্লান সৌন্দর্য্যের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। সে দিন চন্দ্রলোকের নীল শৈলমালার শিখরদেশে স্বপনশিশুরা খেলা করিতেছিল—পর্ব্বতের পাদস্থিত শুভ্র হ্রদের প্রসন্ন সলিলে ছায়া দেখিয়া হাসিতেছিল, পরস্পরের মুখের পানে চাহিতেছিল, ছায়ার সঙ্গে ছুটাছুটি খেলিতেছিল। আজ সকলই নীরব। সেই উত্তুঙ্গমস্তক শৈলমালা দাঁড়াইয়া আছে, হ্রদের প্রসন্ন সলিলে ছায়া পড়িয়াছে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাসময়ী খেলাধূলা আজ নীরব। ধরণীর নীল চন্দ্রাতপের উষাবরণা জ্যোতি ফুটিয়া পড়িতেছে। অন্তরীক্ষের একজন পাগলিনী সেই জ্যোতিতে আত্মহারা হইয়া ধরণীতে আপনাকে খুঁজিতে ছুটিয়াছে।

ঐ—দূরে একখানি নৈরাশ্য-দগ্ধ মেঘ জীবনের সমস্ত সুখে বিসর্জ্জন দিয়া ধীরে ধীরে সন্ধ্যার নিকট মরণাশীর্ব্বাদের জন্য আসিতেছে। সে শুষ্ক অধরপ্রান্তে চুম্বনের চপলা আর চমকে না, জটাচ্ছন্ন কেশজালে ঐরাবতের রজতজলধারা আর বর্ষিত হয় না। গভীর মর্ম্মযাতনায় তাহার নয়নের অশ্রু শুকাইয়া গেছে। এই অসীম জগৎ তাহাকে ঘিরিয়া

বিভীষিকার মত নৃত্য করিতেছে। সুখ দুঃখের শুভ সম্মিলন দেখিয়া সে আজ দিনান্তে মরণ আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছে।

ম্লানমুখে সন্ধ্যাকে সে প্রণাম করিল। সুরলোকের কাহিনীগুলি একে একে প্রকাশ করিল। কত দিনের লুপ্তপ্রায় বিস্মৃতি সেই সুর-কাহিনীতে জাগিয়া উঠিল। মন্দাকিনীর অবিরাম কল-স্রোতে কত দিন কত মরাল-যুগল পশ্চাতে অর্দ্ধবিকশিত শুভ্র লাবণ্যচ্ছায়া মাত্র রাখিয়া নিঃশব্দে ভাসিয়া যাইত; সুরকাননের অসংখ্য পারিজাতের বিন্দু বিন্দু ঝিকিমিকে মৃদু রেণুগুলি তাহাদের কোমল তুষারধবল গ্রীবাদেশে কত না কুঞ্চিত বঙ্কিম রেখা ফুটাইত—কত না জগতের অসীম রহস্য সেই শুভ্র কোমলতার মধ্যে সমাধি নির্ম্মাণ করিত, অবশেষে একদিন সহসা মরালদম্পতীর প্রাণের উচ্ছ্বাসে এক একটা রহস্য প্রকাশিত হইয়া লক্ষ রহস্যশ্রেণী বাহির হইয়া পড়িত। সুরনদীর তীরে সন্ধ্যার হাত ধরিয়া তখন সে কেমন অজ্ঞাতসারে জীবনের প্রথম কলরব অনুভব করিত। দেবকন্যারা তাহার চারি দিকে দাঁড়াইয়া কত আগ্রহের সহিত তাহাকে কোলে লইতেন। সে সন্ধ্যার পানে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া থাকিত।

জীবনের সেই প্রথম বিকাশে কি সুনির্ম্মলা শান্তি ছিল। কত ঝরা ফুল তাহার চারি দিকে পদদলিত হইয়া শুষ্ক পত্রের নীরব মর্ম্মরে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিত, সে জানিতেও পারিত না। এখন ঝরা ফুল দেখিলেই নিজের জীবনের কথা মনে হয়। মনে হয়, ইহাও একটি ঝরাফুল; সংসারের সহস্র কঠোরতায় দলিত হইয়া ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাইতেছে।

সন্ধ্যার স্নেহমস্তকাঘ্রাণ পাইয়া সে বিদায় লইল। জীবনের অবসানে শৈশবের বারতাগুলি যেমন একে একে ফুটিয়া উঠে, সেই নৈরাশ্যদগ্ধ হৃদয়ের মধ্যেও সেইরূপ পুরাতন কাহিনীগুলি জাগিয়া উঠিল।

যামিনীর সুগভীর নীরবতায় মুগ্ধ হইয়া জগৎ ঘুমাইতেছে। অসীম আকাশে অসীম অন্ধকার ব্যাপ্ত হইয়া দুএকটি ক্ষীণ দীপালোকের ঔজ্জ্বল্য মাত্র প্রকাশ করিতেছে। নীলিমার কনক-উপকূলে মহাসাগরের উচ্ছ্বসিত জলরাশি সেই তিমির-বসনা যামিনীর অন্ধকার কেশগুচ্ছের মধ্যে মহোল্লাসে তরঙ্গোৎসব করিতেছে—জলরাশি উঠিতেছে, পড়িতেছে, ভীত বেলাভূমি সঙ্কুচিত ভাবে এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

দলে দলে মেঘেরা জল পান করিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। কেবল একখানি নিরাশাদগ্ধ মেঘ সেই নীলিমা উপকূলে দাঁড়াইয়া অতীত জীবনের পানে চাহিয়া দেখিতেছে। শত অতীত কাহিনী তাহার চারি দিকে ধোঁয়ার মত জড় হইতেছে। এই সমস্ত অতীত-স্মৃতি-পরিবেষ্টিত হইয়া সেই নিরাশাদগ্ধ মেঘ ধীরে ধীরে সাগরে ডুবিয়া গেল। পশ্চাৎ হইতে আর একটি মেঘ ছুটিয়া আসিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সে দিন সেই বিচ্ছেদসময়ে যেখানে পরস্পরের বিদায়-চাওয়া ম্লান মুখে দুইটি স্নেহের চুম্বনরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছিল—যেখানে জীবনের সমস্ত ঘটনার উপর বিস্মৃতি চাপা দিয়া তাহারা ধীরে ধীরে ডুবিয়াছিল, ধীরে ধীরে পরস্পরের অজানা আলিঙ্গন খুলিয়া গিয়াছিল—নীলিমার সেই স্বপন উপকূলে, সেই মোহময় কনক-রেখায়, সেই উচ্ছ্বসিত সাগরকল্লোলে, আজ দু'জনার সমাধি মাত্র অবশেষ রহিল। সে দিনও ত তাহারা এমনি ডুবিয়াছিল, সে দিনও ত এমনি বিস্মৃতি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সে যে আলিঙ্গনে, সে যে চুম্বনে, সে যে দু'জনার নীরব আকুলতায়। আজ সে নিরাশা-জড়িত মৃদু আশা নাই, সে মদির-বিহ্বলতা নাই। জীবনের অবসানে এইখানে দু'জনার সমাধি রচিত হইল। কে জানে, সেখানে তাহাদের অজানা নিশ্বাস কাঁদিয়া বেড়ায় কি না। ['ভারতী ও বালক,' অগ্রহায়ণ ১২৯৪]

বিরহ

সান্ধ্য নীরবতার ঘুমন্ত জ্যোৎস্নায় জগতের অজানা রহস্যের অস্ফুট ছায়া রাখিয়া পাপিয়া হৃদয়ের মধ্য হইতে গাহিল—'চোক গেল'। বিরহিণীর অজানা হৃদয়ে পাপিয়ার সেই বিরহ-আকুল কণ্ঠস্বর পুরাতন কালের হারান স্মৃতির মত ধীরে ধীরে আসিয়া মিলাইয়া গেল। সে শুভ্র কৌমুদী-স্নাত কণ্ঠস্বরে কবে কোন্ বিরহী আপনার হৃদয়ের জ্বালা প্রকাশ করিয়াছিল—বিরহদীপ্ত অক্ষরে আপনাকে রচনা করিয়া পাপিয়ার পঞ্চম কণ্ঠে হারাইয়া গিয়াছে। সেই অবধি পাপিয়ার হৃদয়োচ্ছ্বাসে বিরহিণীর মরমের কথা লিখিত। পাপিয়া পঞ্চমে তান চড়াইয়া গায় 'চোক গেল'—বিরহিণীর আকুল নিশ্বাস নীরবে বলিয়া যায় 'হায়'। সেই অবধি বসন্তে বিরহিণীর মরমে মরমে পাপিয়া ডাকে—বসন্তের কুসুমসৌরভে, বসন্তের মলয়-বাতাসে বিরহের উদাস ভাব বিকশিত হয়। পরশ্রীকাতর কোকিল হিংসা করিয়া বলে, পাপিয়ার স্বর 'কু—উঃ।' কিন্তু বিরহিণীরা বলেন, কোকিলের স্বরই কু উ।

বর্ষাকালে ভেকেরা বিরহের গান গায়। ঝমঝম করিয়া বৃষ্টি পড়িতে থাকে, চারি দিকে বিষাদের ঘনান্ধকার ছাইয়া থাকে,—সে অন্ধকার দিনে ভেকের বিরহসঙ্গীতই উপযুক্ত। ভেককণ্ঠোচ্ছ্বাসে একটা অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে বিরহিণীর হৃদয়েও কি যেন একটা বিভীষিকা জাগিয়া থাকে। বসন্তের পাখী পাপিয়ার কণ্ঠস্বরে হৃদয়ে একপ্রকার অনির্দ্দেশ্য ভাবের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু বিভীষিকা হইতে তাহা অনেক দূরে। স্তরে স্তরে স্তরে পাপিয়ার গান যেমন অসীম আকাশে বিস্তৃত হয়, বসন্তের বিরহও সেইরূপ জগতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে—কবিতায়, সঙ্গীতে, নির্ঝর-ঝর্ঝরে,

নদীকল্লোলে, কুসুমবিকাশে, ফুটিয়া উঠে। জগতের সহিত বিরহিণীর হৃদয়ের ভাবের আদান-প্রদান চলে। জ্যোৎস্নায়, মলয়ে সহস্র রহস্য বিকশিত হয়। সেই মহারহস্যে কোথা আমি! কোথা তুমি! কোথা কে!—সেখানে সকলই অনির্দ্দেশ্য।

বর্ষার বিরহ গুমরিয়া মরে। সে জগতে ব্যাপ্ত হইতে চায়, অমনি গম্ভীর মেঘগর্জ্জন তাহাকে থামাইয়া দেয়। বসন্তের বিরহের মত তাহার স্বাধীনতা নাই। বসন্তে একটা দূরব্যাপী আকুলি ব্যাকুলি উপলব্ধি করা যায়—সেই আকুলি ব্যাকুলি সুরে বসন্তের পাখী হৃদয় খুলিয়া গায় 'চোক গেল'। বর্ষাকালে পাপিয়া 'চোক গেল' বলিবে কেন—বর্ষার বসন্তের মত উজ্জ্বল লাবণ্য কোথায়? সে বিষাদময় অন্ধকারময় আকাশে স্বাধীন পাপিয়ার সুর ব্যক্ত হইবে কিরূপে? বর্ষার বিরহ শ্বাসহীন, বসন্তের বিরহ নিশ্বাসময়। বর্ষা মেঘাচ্ছন্ন—বসন্ত মেঘমুক্ত, নির্ম্মল, চন্দ্রকিরণখচিত।

এই লাবণ্যময়ী বসন্ত-সুন্দরীর মৃদু নিশ্বাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পাপিয়ার সুর যখন আকাশে ভাসিয়া যায়—শেষ সূর্য্যকিরণ-মুগ্ধ মেঘমালার স্তরবিন্যস্ত সৌন্দর্য্যে লাবণ্য বিকশিত করিয়া, দেবকন্যাগণের উদ্‌ঘাটিত হৃদয় স্পর্শ করিয়া ধীরে ধীরে কোথায় মিলাইয়া যায়—তখন বিরহ কি আপনার সঙ্কীর্ণ কুটীরের মধ্যে নীরব থাকিতে পারে? তখন সে বাহির হইয়া পড়ে—প্রকৃতির সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতে চায়। কবিরা হৃদয়ে বিরহিণীদের এই উচ্ছ্বসিত নিশ্বাস অনুভব করেন—এবং সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাহাদের সহিত অশ্রু মোচন করিতে থাকেন।

বর্ষার বিরহ নীরবে হৃদয় দহন করে—বসন্তের বিরহের মত তাহা সহজে ধরা দেয় না। এই জন্য সামান্য কবিরা বর্ষার বিরহ অনুভব করিতে পারেন না। বিরহিণীর হৃদয়ে না ডুবিলে তাহা অনুভব করা যায় না। বসন্তের বিরহ আপনি ধরা দেয়। সেই জন্য কোকিল, মলয়, জ্যোৎস্না সকলেরই আয়ত্তাধীন। বর্ষার মেঘ, অন্ধকার, বিষাদ, প্রাণের কবি ভিন্ন অপরে বুঝিতে পারে না।

কিন্তু বর্ষার মধ্যে যতখানি অভিশাপ লুকান থাকে, বসন্তে তাহার কিছুই থাকে না। বসন্তে হৃদয় নিশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া পড়ে; বর্ষার হৃদয় হৃদয়-রুদ্ধ হইয়া মরে—শ্বাস রোধ হইয়া আসে। তাহার কারণ, বসন্তে বিরহ সুখান্বেষী—সুখের ভাগী খুঁজে; বর্ষার বিরহ দুঃখের সহভোগী চায়।

বসন্তে বিরহের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা খানিকটা প্রকাশ পায়। শ্যামল পল্লব, মধুর মলয়, নবযৌবন-স্ফীতা ধরণী,—চারি দিকেই আনন্দ। ইহার মধ্যে বিরহিণীর অসম্পূর্ণতা। বসন্তের কবি পাপিয়া বিরহিণীর হৃদয়ের মধ্য হইতে চারি দিকে চাহিয়া এই জন্যই আক্ষেপ করে 'চোক গেল'। মিলন মনে মনে হাসিয়া বলে—'তোমার চোক যাইলেই ভাল'।

কিন্তু পাপিয়া তাহা শুনিবে কেন ? পাপিয়া আবার বলে—'চোক গেল'। এবারে পাপিয়া আর থামে না—স্থর হইতে রেখাব, রেখাব হইতে গান্ধার, গান্ধার হইতে মধ্যম, মধ্যম হইতে পঞ্চমে উঠিয়া পাপিয়া অনবরত বলে—'চোক গেল,' 'চোক গেল,' 'চোক গেল'। কোকিল পাপিয়ার হিংসা দেখাইয়া বলে—'কু' 'কু' 'কু'। ভাবোন্মত্ত পাপিয়া সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করে না—বিরহকাতর কণ্ঠস্বরে বসন্তের অবিরল প্রবাহিতা জ্যোৎস্নার মধ্য হইতে গাহিয়া উঠে—'উ-উ-উ, চোক গেল'। বসন্তের শুভ্র জ্যোৎস্না আরও জ্যোৎস্নাময়ী হইয়া উঠে ; বিরহিণীর হৃদয়ের আকুলতা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠে।

এইরূপে অজানা নিশ্বাসের মত বসন্ত ধীরে ধীরে অবসিত হয়। তখন যদি বা পাপিয়া ডাকে, তেমন মধুর লাগে না। তখন ফুল ফুটে, জ্যোৎস্না ফুটে—কিন্তু সে সহস্র স্মৃতি অগণ্য বিস্মৃতি-জড়িত জ্যোৎস্না আব ফুটে না। জীবনের উচ্ছ্বাস মরিয়া আসে। বিরহিণী চমকিয়া উঠেন—"কখন্ বসন্ত এল এবার হ'ল না গান।"

বসন্তে বিরহিণীর হৃদয়ের ভাবে কেমন শৃঙ্খলা আছে। বসন্তে ভাবের ক্রমবিকাশ উপলব্ধি করা যায়। বর্ষার প্রথম হইতেই যেন একটা ভাব ফুটিয়া থাকে। তাহাতে স্তর নাই, ক্রমবিকাশ নাই। বসন্তে ভাবের বড় বড় উপন্যাস রচিত হয়—তাহাতে বাসুকীর মত সহস্র দীর্ঘনিশ্বাস ফণা তুলিয়া আছে, তাহাতে মান আছে, ভঞ্জন আছে, হাসি বাঁশী, নৈরাশ্য মিলন, সকলই আছে ; এবং এই সমস্তের মধ্যে একটি শোভন শৃঙ্খল আছে। বর্ষায় 'সুও রাণী ও দুও রাণী'র মত ছোট ছোট গল্প রচিত হয়। বর্ষায় মান থাকিতে পারে, ভঞ্জন থাকিতে পারে, কিন্তু তেমন ঘটা নাই ; বর্ষার বাঁশী আছে, কিন্তু বসন্তের মত সে মৃদু কম্পন নাই। বসন্তশেষে বিরহিণী চমকিয়া উঠেন—তাঁহার নিশ্বাস যেন থামিয়া আসে। বর্ষাশেষে হৃদয় হইতে একটি ম্লান দীর্ঘনিশ্বাস উছলিয়া উঠে। ['ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৪]

বসন্তের কবিতা

কবিতার সৌন্দর্য্য সকলে অনুভব করিতে পারে না—সকলে চাহেও না। আত্মম্ভরিতার সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে বাস করিয়া যাহাদের হৃদয়ের স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে, তাহারা কবিতাকে প্রলাপের হিসাবে দেখে—ভাব আয়ত্ত করিতে না পারিয়া গালি দেয়। কিন্তু তাহাদের কথায় কবি গান বন্ধ করিতে পারেন না—যেমন গাহিয়া যান, সেইরূপই গাহিবেন। বসন্তের কবিতার মৃদু স্পর্শন অনুভব করা তার্কিকের সাধ্যাতীত। মলয়ানিলের মত তাহা আমাদের হৃদয়কে ধীরে ধীরে স্পর্শ করিয়া যায়—আমাদের হৃদয় উথলিয়া উঠে। প্রশান্ত সাগরবক্ষের উপর দিয়া ঝির্ ঝির্ করিয়া যেমন বাতাস বহিয়া যায়, বসন্তের

কবিতাও সেইরূপ আমাদের স্থির হৃদয়ের উপর দিয়া নীরবে বহিয়া যায়। আমাদের হৃদয়ের উথলিত ভাব ঈষৎ শিহরণে প্রকাশ পায়। বসন্তের কবিতায় ঝঞ্ঝা ঝটিকা নাই। মেঘমুক্ত নির্ম্মল আকাশ, নিষ্কলঙ্ক শুভ্র জ্যোৎস্না, মৃদুমন্দ পবনহিল্লোল তাহার প্রাণ। মেঘ, অন্ধকার বসন্তের কবিতায় থাকিবে কিরূপে? বসন্তে তেমন মাতামাতি দেখা যায় না—কিন্তু তাহার মৃদু স্পর্শনগুলি অতি সুন্দর।

বর্ষার কবিতার মধ্যে মধ্যে একটা একঘেয়ে ভাব আছে। এই একঘেয়েত্ব সময় সময় এমনি বিরক্তিকর বোধ হয় যে, ঐখানেই পুঁথি বন্ধ করিতে ইচ্ছা করে। সাত আট পৃষ্ঠা ধরিয়া হয় ত টিপিটিপি বৃষ্টিই পড়িতেছে—আকাশের মুখ ভার—পৃথিবী বিষণ্ণা—এক গৃহের দুই কোণে যেন দুই জনে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। পাঠকের মন এরূপ অবস্থায় উৎসাহহীন হইয়া পড়ে—সকল উদ্যম, উৎসাহ যেন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। বর্ষার কবিতায় যে মহান্ সৌন্দর্য্য আছে, তাহা তখন উপলব্ধি করা যায় না। কিন্তু আষাঢ়ারম্ভে যখন নূতন ছন্দে, নূতন সুরে বর্ষা গানারম্ভ করে, তখন হৃদয় কিছুতেই নিরুদ্যম থাকিতে পারে না। বর্ষার তালে তালে হৃদয়ও নাচিয়া উঠে।

বসন্তের কবিতায় পদবিন্যাস অতি চমৎকার। কথাগুলি ছোট ছোট, কিন্তু মর্ম্মস্পৃক্। জয়দেবের সহিত বসন্তের কবিতার কোমলতা তুলনা হইতে পারে। 'কোকিলকূজিতকুঞ্জ-কুটীর' বসন্তেরই সৃষ্টি। জয়দেব বসন্তের কবিতার হেলিয়া দুলিয়া বাতাসের সঙ্গে টলমল করিয়া যাওয়ার ভাব আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার কবিতাও হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। বসন্তের কবিতা ফুলসৌরভে, জ্যোৎস্নালোকে ভাসিয়া বেড়ায়। তাহা ক্রমে ক্রমে আকাশে উঠিয়াছে। উর্দ্ধগামী পক্ষীর গতির সহিত বসন্তের কবিতার গতির অনেক সাদৃশ্য আছে। বর্ষার কবিতা স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থলে বাসস্থান নির্ম্মাণ করে—বৃষ্টির ভারে পৃথিবী হইতে অধিক উর্দ্ধে উঠিতে পারে না। বসন্তের গান অনেক উচ্চে উঠে।

কিন্তু বর্ষার কবিতায় তত্ত্বকথা অধিক আছে বলিয়া মনে হয়। বর্ষার দার্শনিক কবিতা। রূপকের প্রাদুর্ভাবও বর্ষায়। বসন্তের কবিতায় মৃদুস্পর্শনের ভাব অনেকটা প্রকাশ পায়। কিন্তু সে ভাব অন্তঃসলিলা নদীর মত হৃদয়ে বহিতে থাকে। বর্ষার ভাব অন্তঃসলিলা নহে বটে—বসন্তের মত স্থায়ীও নহে। বৃষ্টিতে খাল বিল ভরিয়া উঠে—বৃষ্টি ধরিয়া যায়, খালবিলও শুকাইয়া আসে। বর্ষার কবিতার এই ভাব। গাম্ভীর্য্য কিন্তু বর্ষার কবিতায় অধিক। ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা যেমন কূলে কূলে পরিপূর্ণ—গম্ভীর, বর্ষার কবিতাও সেইরূপ গম্ভীর। বর্ষার ছন্দ মহাকাব্য রচনার উপযোগী। বসন্তের ছন্দ গীতিকাব্যেরই উপযুক্ত। বসন্তে বীররসের সংস্রব নাই—বর্ষায় বীররসই অনেক স্থলে আসর

জমকাইয়াছে। বসন্তকে দেখিলে আমাদের সহসা বিষ্ণুভক্ত বলিয়া মনে হয়। বর্ষাকে সহজেই শৈব মনে করিয়া লই।

বসন্তের কবিতায় বিবাহের বাঁশী শুনিতে পাওয়া যায়। সে বাঁশীর সুর উদাস বটে, কিন্তু তাহাতে মিলনের গানই বাজে। বর্ষার বাঁশীর স্বরও কেমন ভিজা ভিজা ঠেকে। তেমন ষোলকলার মিলন উপলব্ধি করা যায় না। মধ্যে মধ্যে বীররসের অবতারণায় মিলনের ভাব অনেকটা মারা গিয়াছে। বর্ষায় নায়কের একটা প্রধান দোষ—দাপাদাপি। বসন্তের নায়কের মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাস বর্ষায় কোথায়? বর্ষার নায়ক কাঁদিয়াই আকুল, ক্রোধেই অজ্ঞান। সে অনেকটা খামখেয়ালী বলিতে হইবে।

বর্ষার কবিতায় কেহ না মনে করেন যে, কোমল রস নাই। বর্ষার কবিতায় কোমল রসের অভাব নাই, কিন্তু বসন্তে বীররসের অভাব আছে। বর্ষার সহিত বসন্তের মজ্জাগত প্রভেদ এই যে, বর্ষা আমাদিগকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করে—বসন্ত আমাদিগকে জগতে প্রতিষ্ঠিত করে। বর্ষায় আমরা জানালা খুলিয়া প্রকৃতির পানে চাহিয়া থাকি—বসন্তে প্রকৃতির সহিত মিশাইয়া গিয়া তাহার সৌন্দর্য্য অনুভব করি। বসন্ত ও বর্ষার কবিতা তুলনা করিয়া আমরা আরও বলিতে পারি—বসন্ত অদ্বৈতবাদী, বর্ষা দ্বৈতবাদী।

বসন্তের কবিতায় উদাস ভাবের প্রভাব লক্ষিত হয়। বসন্তের বিরহ-গানগুলিও কেমন উদাস ভাবে ঢালা। বর্ষার কবিতায় উদাস ভাবের আধিক্য দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই বোধ হয়, বর্ষার বিরহে অভিশাপ লুকান থাকে। বসন্তে উদাস ভাবেরই প্রাধান্য। বর্ষার গানে একটা জমাট্ ভাব আছে। বসন্তের গানে ততটা আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু বসন্তের গান খুব হৃদয়স্পর্শী। সুর হিসাবে আমরা বলিতে পারি যে, বসন্ত সর্ব্বাপেক্ষা চড়ায় উঠিতে সমর্থ।

বর্ষার কবিতায় অনেক পুরাতন স্মৃতি জাগিয়া উঠে। অনেক পুরাতন কাহিনী মনে পড়ে। বসন্তে স্মৃতির আকুলি ব্যাকুলি অনুভব করা যায়। স্মৃতির সহিত বসন্তে সহস্র বিস্মৃতি জড়াইয়া থাকে। বর্ষার স্মৃতি বিস্মৃতিতে এতটা মেশামেশি থাকে না। এই জন্যই বোধ করি, অনেকে বসন্তকে মিলনের কাল বলিয়া থাকেন।

বর্ষা ও বসন্তের কবিতার মধ্যে তুলনা করিয়া দেখিলে আরও অনেক প্রভেদ বুঝা যাইবে। কিন্তু প্রবন্ধ বাড়াইবার আর আবশ্যকতা নাই। উপসংহারে আমরা বর্ষার কবিতাকে গোলাপের সহিত এবং বসন্তের কবিতাকে চম্পকের সহিত তুলনা করিতে পারি। বসন্তের কবিতা—যৌবনের প্রথম বিকাশ। বর্ষার কবিতা—যৌবন বটে, কিন্তু প্রথম যৌবন নহে। ['ভারতী ও বালক,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫]

আষাঢ়ে গল্প

দীর্ঘ গ্রীষ্মের পর আষাঢ়ের প্রথম দিবসে যখন আকাশের এক প্রান্তে একখানি শুভ্র মেঘ কোন্ পুরাতন দিনের স্মৃতির মত আসিয়া দেখা দেয়, আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তখন কেমন এক নূতন ভাবের উদয় হয়! সুপ্তোত্থিত যেমন উষার প্রশান্ত মুখচ্ছবি দেখিয়া বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়, গ্রীষ্মের প্রখর তাপের পর আষাঢ়ের নূতন জলদজাল দেখিয়া আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। আষাঢ়ের গল্পের আশায় আমরা তৃষিত চাতকের মত চাহিয়া থাকি। সে আশাপূর্ণ উৎসাহ মনে করিতে কল্পনা স্তম্ভিত হইয়া পড়ে।

আষাঢ়ের গল্প আমাদের স্মৃতির তীর্থক্ষেত্র। সহস্র স্মৃতি তাহার সহিত সুখে দুঃখে জড়িত। বাহির হইতে উঠাইয়া আনিয়া আমরা মনকে গৃহের অন্ধকারে যে বদ্ধ করিতে পারি, সে কেবল আষাঢ়ে গল্পের আকর্ষণে। আষাঢ়ের ঝম্ ঝম্ বৃষ্টির মধ্যে যখন আফিসের তাড়া পড়ে—গৌরাঙ্গ প্রভুর গুম্ফশোভিত দন্তকিড়মিড়ি মনে পড়ে, তখন প্রাণে কি গভীর নৈরাশ্য উপস্থিত হয়! জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিয়া যায়, সংসারকে নিষ্ঠুর মনে হইতে থাকে, খুঁৎ খুঁৎ করিয়া কোন প্রকারে দিন কাটে মাত্র। আষাঢ়ে বন্ধু বান্ধব লইয়া—আত্মীয় স্বজন লইয়া গৃহের অন্ধকারে বসিয়া থাকিতেই লাগে ভাল। এ সময় আফিস কেন? আষাঢ়ে গল্প—হিসাবনিকাশ কিসের?

আষাঢ়ে গল্পের কৈফিয়ৎ নাই। বসন্তের উপন্যাসে সম্ভব অসম্ভবের মধ্যে একটা ছেদ আছে। আষাঢ়ে গল্প সম্ভব অসম্ভব এক হইয়া গিয়াছে—একীকরণের চূড়ান্ত উদাহরণ। প্রতি মুহূর্ত্তেই ষোড়শী রূপসী মরা-বরের সহিত মালাবদল করিতেছে, সাতটি ভাই সাতটি চাঁপা হইয়া ফুটিতেছে; কেহই আপত্তি করে না। অধ্যায়ের পর অধ্যায়, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ নাই—ঔপন্যাসিক কমা সেমিকোলনেরও সম্পর্কশূন্য। সহসা সপ্তম পরিচ্ছেদে দু'জনের বিরহনিশ্বাসে আসিয়া তাহার অবসান হয় না। অন্তিমে মৃত্যুর চিত্র থাকিলেও আষাঢ়ে গল্পে ট্র্যাজেডি হইতে পারে না। যদি বা তর্ক তাহাকে ট্র্যাজেডি বলিয়া প্রমাণ করে, তথাপি স্বীকার করিতে হইবে যে, ট্র্যাজেডির মত তাহার প্রভাব লক্ষিত হয় না।

আষাঢ়ে গল্পের নায়ক প্রায়ই সৃষ্টিছাড়া কোন জীব, কিম্বা নায়কের স্থান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ অনুপযোগী এক ব্যক্তি। অনেক সময় রাক্ষস, পিশাচ, ব্রহ্মদৈত্য, ভূত, ব্যাঘ্র, শৃগাল এবং হনুর বংশধরেরাই গল্পের নায়ক। গল্পও অনেক সময় বেগুনক্ষেতের কাঁটায়

কোন প্রকারে বিঁধিয়া থাকে মাত্র। দৃশ্য বর্ণনা ইহাতে প্রায় নাই—ষোল আনার মধ্যে এক আনা থাকে ত যথেষ্ট। রাজপুত্রেরা দেশভ্রমণে বাহির হইলেই স্ত্রী এবং শ্বশুরের অর্দ্ধেক রাজ্য লাভ করেন। আষাঢ়ে গল্পের এই স্ত্রীলাভ ঘটনাটিতে রামায়ণ মহাভারতের খানিকটা প্রভাব আছে বোধ হয়। থাকে ত আমাদের জিৎ। না থাকিলে আষাঢ়ে লেখার কৈফিয়ৎ দিতে পারিব না।

আষাঢ়ে নায়িকা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা বাহুল্য মাত্র। নায়িকার চরিত্রে মহৎ ভাব অতি সামান্যই—নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নায়িকার কুল শীল সময় সময় উচ্চ হয় বটে, কিন্তু সে কেবল রাজপুত্রের বিবাহের সুবিধার জন্য। অসম্ভব ঘটনা কোন কোন নায়িকাকে বড় করিয়াও দেয়। সময়বিশেষে নায়কের জ্যেষ্ঠতাত হইবার মত নায়িকাও দু'একটি মিলে। কিন্তু উপন্যাসের যোগ্য নায়িকা আষাঢ়ে গল্পে বড় একটা মিলে না।

আধুনিক বাঙ্গলা উপন্যাসে মধ্যে মধ্যে দু'একটি আষাঢ়ে নায়িকাও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে, আষাঢ়ে গল্পে বিশেষ মন্দ না লাগিলেও উপন্যাসে এইরূপ নায়িকা ভাল সাজে না। নায়িকাকে পুরুষ করিলেই তাহার চরম উন্নতি হইল না। স্ত্রীলোকের স্ত্রীভাব থাকা বিশেষ আবশ্যক। পুরুষবেশ স্ত্রীজাতিকে কিম্ভুতকিমাকার করিয়া তুলে মাত্র। আষাঢ়ে গল্পে তাহা যদি বা শোভা পায়—তাহাও সকল সময়ে পায় না—উপন্যাসে কিছুতেই শোভা পায় না।

বসন্তের সহিত বর্ষার যে তফাৎ, উপন্যাসের সহিত আষাঢ়ে গল্পেরও সেই তফাৎ। একটি রীতিমত উপন্যাসে আমাদিগকে জগতের অভ্যন্তরে খানিক দূর টানিয়া লইয়া যায়; আষাঢ়ে গল্প আমাদিগকে চারি দিক্ হইতে আনিয়া গৃহে বন্ধ করে। আষাঢ়ের সহিত শীতের গল্পের প্রভেদ এই যে, আষাঢ়ে গল্প বৃদ্ধার গল্প—শীতের গল্প বৃদ্ধের গল্প। শীতের গল্পে খানিকটা বিজ্ঞান, খানিকটা এ-ও-তা' গুঁজিয়া দিলে বেশ চলিয়া যায়। আষাঢ়ের গল্পে বিজ্ঞানের গন্ধ সহ্য হয় না। ভিজা ভিজা ভাব আষাঢ়ে গল্পে বিশেষ আবশ্যক। শীতের গল্প ঝর্‌ঝরে হৌক না কেন।

উপসংহার আষাঢ়ে গল্পে সকলগুলিতেই এক। গল্পের সঙ্গে উপসংহারের বড় একটা সম্পর্ক নাই। বরঞ্চ গল্প-বক্তার সহিত তাহার সম্পর্ক থাকিতে পারে। আষাঢ়ে গল্পের সাধারণ উপসংহার "আমার কথাটি ফুরোলো—নটে শাকটি মুড়োলো" ইত্যাদি। রাজার কথাই হৌক, রাখালের কথাই হৌক, শৃগাল ব্যাঘ্রের কথাই হৌক, এ উপসংহারটি সর্ব্বত্রই বসিয়া থাকে।

আষাঢ়ে গল্পে আমাদের জাতীয় জীবনের ভাব যেরূপ সুস্পষ্ট ব্যক্ত হয়, অন্য কিছুতে সেরূপ হয় না। আষাঢ়ে গল্প শুনিলে বাঙ্গলার শারীরিক মানসিক অবস্থার কতকটা

পরিচয় পাওয়া যায়। অন্য দেশে আষাঢ়ের কিরূপ আদর জানি না। কিন্তু যেখানে আষাঢ় আছে—রীতিমত আমাদের এই বাঙ্গলা দেশের মত জমাট্ আষাঢ় আছে, সেখানে নিশ্চয়ই তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। আমাদের এখানে জমাট্ বর্ষা—জমাট্ গল্প। যেখানে বর্ষা জমাট্ নয়, সেখানে গল্পও জমিতে পায় না। হায়! সে দেশের কি দুর্ভাগ্য! ['ভারতী ও বালক,' আষাঢ় ১২৯৫]

আষাঢ় ও শ্রাবণ

সহসা বাহির হইতে দেখিলে অনেক জিনিসের মধ্যে কেমন সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দিন দিন যত নিকটে আসা যায়—বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতে থাকি, সাদৃশ্যের মধ্যে ততই বৈসাদৃশ্য মাথা উঁচু করিয়া উঠে। প্রতি দিন সহস্র প্রভেদ চক্ষে পড়ে—সাদৃশ্য কমিয়া যায়, বৈসাদৃশ্যের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ উভয়েই বর্ষার পরিবারমধ্যে গণ্য। কিন্তু এক পরিবারের হইলেও মুখশ্রী উভয়ের এক নহে। মানব-হৃদয়ে উভয়ের প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন। আষাঢ়, শ্রাবণ আমাদের উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে না। দুই জনের ভাবগত প্রভেদ আলোচনা করিলে সময় সময় এমন সন্দেহও হয় যে, উভয়ে বুঝি এক পরিবারের লোক নহে। ভাদ্রের দুর্ভাগ্য—ভাদ্র শরতের পরিবারভুক্ত। কিন্তু শ্রাবণের সহিত তাহার বন্ধুত্ব আছে বলিয়া বোধ হয়। অনেকে নাকি ভাদ্রকে আশ্বিনের আত্মীয় না জানিয়া শ্রাবণের আত্মীয় ঠাহরাইয়া থাকেন। যাক্, সে কথার আলোচনায় আমাদের আবশ্যক নাই। আষাঢ় ও শ্রাবণের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য লইয়াই আমাদের কথা।

আষাঢ়ে গল্প পৃথিবীবিখ্যাত। শ্রাবণের এ বিষয়ে বড় খ্যাতি নাই। খ্যাতি নাই থাক্, তাই বলিয়া শ্রাবণের যে গল্প নাই, তাহা নহে। শ্রাবণের কাব্যরচনায় ক্ষমতা অধিক। আষাঢ়ে গল্পে চোখের জলের তেমন ঘটা নাই—নেহাৎ যদি কান্না পায়, দুই মুহূর্ত্তের অধিক তাহা থাকে না। শ্রাবণে অশ্রুজলে হৃদয় ঝরিয়া পড়ে—নয়নে যে জল বহে, তাহার প্রতি বিন্দুতে হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস প্রকাশ পায়। বাসন্তী উপন্যাস শ্রাবণের বারিধারায় অবশ্য আশা করা যায় না। কিন্তু শ্রাবণের কাব্যে উচ্চদরের চরিত্রও পাওয়া যায়। আষাঢ়ে চিল, ব্যাঘ্র, ব্রহ্মদৈত্য নায়ক, শ্রাবণের গল্পে বড় দেখা যায় না। আষাঢ়ে গল্পে গাম্ভীর্য্য নাই—শ্রাবণের গম্ভীর ভাষা, গম্ভীর ভাব। আষাঢ়ে গল্পে অসম্ভবের যেমন প্রাদুর্ভাব, শ্রাবণের গল্পে তেমন নাই। তবে শ্রাবণের গল্পেও বর্ষার প্রভাব একেবারে মুছিয়া

যায় নাই। আষাঢ়ের সহিত তুলনায় শ্রাবণের গল্প গম্ভীর বটে, তাই বলিয়া তাহা উপন্যাস-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না।

বিরহিণীর হৃদয়ে আষাঢ় শ্রাবণ উভয়েরই প্রভাব লক্ষিত হয়। কিন্তু আষাঢ়ের ভাবের সহিত শ্রাবণের ভাবের কেমন একটু তফাৎ আছে। আষাঢ়ে বিরহিণীর হৃদয়ে একটা নূতন ভাব আসিয়াছে—সে ভাবে একটু আশাপূর্ণ ঔৎসুক্য। শ্রাবণে বিভীষিকাটা কিছু পাকিয়া দাঁড়ায়। আষাঢ়ে বিরহিণী মেঘের নিকট প্রণয়ীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রাবণে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভরসা হয় না—নির্জ্জনে নীরবে আপনার বিভীষিকামধ্যে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা করে। মোটের উপর, বর্ষায় সহচরীসঙ্গ বড় ভাল লাগে না—একেলা থাকিতেই ইচ্ছা করে। সহচরীদের সান্ত্বনাবাক্য এ সময়ে হৃদয়ে শেলের মত বিঁধিতে থাকে। সুখের সময় সান্ত্বনা সহিতে পারা যায়—দুঃখের সময় যায় না। বসন্তে সহচরীসঙ্গ ভাল লাগে—বর্ষায় বিজনে বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা করে।

উদ্ধবদাসের একটি কবিতার অংশবিশেষ উঠাইয়া বসন্ত ও বর্ষার বিরহের প্রভেদ আরও পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। আষাঢ় শ্রাবণের তুলনার মধ্যে বসন্ত ও বর্ষার কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইবে বোধ হয় না। কবি বসন্তে বলিতেছেন,—

"সো বরনারী, তোহারি লাগি ঝুরত,
রোয়ত সহচরী সঙ্গে।"

বর্ষা সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন,—

"বর্ষা ঋতু ভেল, ঝরয়ে নয়নে জল,
দুখ সায়রে ধনী ভাসে॥"

বসন্তে ক্রন্দন আছে—কিন্তু 'রোয়ত সহচরী সঙ্গে,' বিজনে একেলা বসিয়া নয়, সহচরীরা সঙ্গে আছেন। আর বর্ষায় নয়নে অশ্রু ঝরিতেছে, দুঃখও গুরুতর। তাই সহচরীর নাম গন্ধ নাই।

বসন্ত ও বর্ষায় যেমন, আষাঢ়ে শ্রাবণেও কতকটা সেইরূপ। আষাঢ়ে দুঃখ গভীর বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু আশা আছে। শ্রাবণে কেবলই অন্ধকার ঘনাইতেছে—কোথায় আশা! কোথায় ভরসা! আষাঢ়ে মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার কথা মনে করিতে পারা যায়—মনে হয়, এমনিতর মেঘের মত সেও যদি আসে। শ্রাবণে সব একেবারে স্তম্ভিত।

রসিক ভাব আষাঢ়ে শ্রাবণের চেয়ে বেশী। শ্রাবণে রসিকতা সব সময়ে জমে না—অনেক রসিকতা এমনি দীনহীন বেশে ম্লানমুখে বাহির হয় যে, তাহাদিগকে দেখিলে মায়া করে। বর্ষাকালীন দেশলায়ের মত অনেক কথা হাওয়া লাগিলেই ভিজিয়া যায়। চকমকির আগুনে সময় সময় তাহাদিগকে না তাতাইয়া লইলে চলে না। আষাঢ়েও এমন ঘটিতে

পারে। কিন্তু শ্রাবণেই যেন চকমকির অধিক আবশ্যক। এ বিষয়ে রসিক রসিকারাই বুঝেন ভাল, আমরা সাদাসিধা যাহা মনে আসিল, বলিলাম মাত্র। কৈফিয়ৎ তলব হইলে আমরা এ বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ দিতে পারিব বোধ হয় না। কিন্তু আষাঢ়ে লেখার সহিত কৈফিয়তের নাকি বড় একটা মুখদেখাদেখি নাই, তাই সাহস করিয়া অনেক কথা বলিয়া ফেলিলাম। কৈফিয়ৎ তলব হইলে রসিক রসিকারা আমাদের হইয়া ঝগড়াঝাঁটি করিতে বোধ হয় সম্মত আছেন। সে তাঁহাদের অভিরুচি।

শ্রাবণের মুখশ্রীর অনেকে খুব সুখ্যাতি করেন—তাঁহারা বলেন, শ্রাবণের মুখে কি একটি মিষ্ট ভাব আছে। আষাঢ়েরা অবশ্য এ কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, যে কেহ একবার রথের ভেঁপু শুনিয়াছে, সে আর এমন কথা বলে না। গাল দুটি ফুলাইয়া রথের দিনে ছেলেরা কেমন ভেঁপু বাজায়—আষাঢ় না হইলে সে ভেঁপু বাজে না। আষাঢ়ের মিষ্ট ভাবে ভেঁপু মধুর শুনায়। তাঁহারা আষাঢ়ের মাধুর্য্য সম্বন্ধে আরো অনেক প্রমাণ দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু এই প্রমাণটি নাকি সকলের সেরা। দিদিমারাও আষাঢ়ের তরফে —কেন না, আষাঢ়ের গল্প তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সম্বল। বিরহিণীরা কিন্তু আষাঢ়কে কি শ্রাবণকে ভালবাসেন সন্দেহ। আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তাঁহাদের টান অধিক, কি "শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা" তাঁহাদের অধিক প্রিয়, বুঝিবার যো নাই। এ বিষয়ে তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমাদিগকে প্রবন্ধ শেষ করিতে হইবে।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, আষাঢ় শ্রাবণের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে, তাহা না বলিলেও চলে—কারণ, সকলেই তাহা জানেন। গুটিকতক সামান্য তফাৎ দেখাইয়াই আমরা বিদায় লইতেছি—আরও অনেক তফাৎ আছে; কিন্তু সে সকল বিস্তারিতরূপে বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। অতএব এইখানেই শেষ করা যাক্।
['ভারতী ও বালক,' শ্রাবণ ১২৯৫]

অতীত

বর্ত্তমান হইতে আমরা প্রতি দিন যত নূতন নূতন বর্ত্তমানে উপস্থিত হই—দূর যত ক্রোড়ের নিকট অল্পে অল্পে সরিয়া আসে, আমাদের পশ্চাতে ততই অতীতের ছায়া পড়িতে থাকে। আমাদের পশ্চাতে স্তরবিন্যস্ত মেঘমালার হৃদয়ে রামধনু ফুটিয়া উঠে—সেই রামধনুর বিচিত্র লাবণ্যে জীবনের শুভ মুহূর্ত্তগুলি জ্বলিতে থাকে, অন্ধকার আলোক—বিস্মৃতি স্মৃতি মিলিয়া সন্ধ্যার পুষ্পবন রচনা করে—জীবনের সহস্র কুসুম সেই পুষ্পবনে প্রতি দিন ঝরিয়া পড়ে। কত লোকে তাহা দলিত করিয়া যায়, কেহ বা একটি ঝরা ফুল কুড়াইয়া

লইয়া হৃদয়ে রাখিয়া দেয়—জীবন-জ্বালার মধ্যে এক এক বার ঝরা ফুলের সৌরভে চমকিয়া উঠে। কিন্তু বর্ত্তমান থাকে না। মুহূর্ত্ত হইতে মুহূর্ত্তে সে যতই লুকাইয়া বেড়ায়, অতীতের দ্রুত অনুসরণ হইতে কিছুতেই রক্ষা পায় না। আশ্রয় লইবার জন্য সে ভবিষ্যতের ক্রোড়ে ছুটিয়া যায়, অতীত আসিয়া বর্ত্তমানকে ধরিবার ছেলে ভবিষ্যতের খানিকটা জমি দখল করিয়া বসে। এইরূপে দিনে দিনে অতীতের দখল বাড়িতে থাকে ; কিন্তু লোকে বলে, অতীত বড় উদাসীন। কে জানে, অতীতের পরে আমাদের এত টান কেন? অতীতের ছলনায় আমরা চিরদিনই কেন ভুলিয়া থাকিতে চাই, বর্ত্তমানকে কঠোর বলিয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার স্থির করিয়া, অতীতকেই জড়াইয়া ধরি। অতীতের সহস্র বিশৃঙ্খলার মধ্যে আমরা সুগভীর শান্তির ছায়া বৈ কিছুই দেখি না—অতীতের বিবাদ বিসম্বাদের মধ্যে প্রেমের চুম্বক-আকর্ষণ, জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যে আনন্দের পবিত্র স্পর্শ, অতীতে যেন সকলই সুখ—যত দুঃখ বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে। কে জানে, অতীতের উপর আমাদের এ কি মায়া!

তবে কি এই অতীতের প্রতি প্রেমের মূল চিরবিরহ? তাহা নয় ত কি। মিলনে প্রেম আরম্ভ হয়, কিন্তু বিরহ না হইলে প্রেম ধরা দেয় না। বিরহে অভাব অনুভব করা যায়, হৃদয়ের আকুলতা ধরা পড়ে, সুপ্ত প্রেম জাগিয়া উঠে। বর্ত্তমান নাকি কেবলই মিলন, তাই তাহাতে প্রেম তেমন বিকশিত হইয়া উঠে না। কিন্তু যখনই বর্ত্তমান হইতে আমরা তফাৎ হই—বর্ত্তমান অতীত হইয়া দাঁড়ায়, তখনই তাহার প্রতি কেমন একটা টান দেখা যায়। বিরহে প্রেম ঘনাইয়া আসে। সীতাকে বনবাস দিয়া রামচন্দ্র থাকিতে পারিয়াছিলেন ; কারণ, সীতা তখনও বর্ত্তমান। কিন্তু সীতার সহিত যখন তাঁহার চিরবিরহ হইল, যখন ইচ্ছার উপরে মিলন নির্ভর করিতেছে না, যথার্থ বিরহ হইয়াছে, তখন রাম আর থাকিতে পারেন না—পর্ব্বতের মত অটল হইয়াও রামচন্দ্র অধীর। অতীতের সহিত নাকি সম্বন্ধ ঘুচিয়াছে—তাহাকে ধরিবার, স্পর্শ করিবার, উপভোগ করিবার উপায় নাই, তাই তাহার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। অতীতের দুঃস্বপ্ন ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়, জ্যোৎস্নালোকই পড়িয়া থাকে।

দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন কালকে আমরা কেমন মধুর বলিয়া কল্পনা করি। আমাদের মনে হয়, সে কালে লোকে মিথ্যা কথা জানিত না, অধর্ম্মাচরণ করিত না, সে কাল সত্য যুগ—তখন অসৎ কিছুই ছিল না। কিন্তু আমরা অতীতের প্রতি প্রেমপ্রভাবে যাহা কল্পনা করি, তাহা অনেক সময় সত্য হইতে বহু দূর। তখন দেশশুদ্ধ লোক কিছু আর রাম লক্ষ্মণ, যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন, সীতা সাবিত্রী ছিল না। দেশে কৈকেয়ী মন্থরা, রাবণ সূর্পণখা, দুর্য্যোধন দুঃশাসন, অনেক ছিল। প্রহ্লাদের সময়ে সকলেই যদি প্রহ্লাদ হইত, তাহা হইলে প্রহ্লাদকে কেহই জানিত না, বিশ্বশুদ্ধ লোকে

শুকদেব হইলে শুকদেবকে জানিবার কেহই থাকিত না। সে যাহা হৌক, অতীতকে আমরা যুক্তির বাঁধনে বাঁধিতে চাহি না—হৃদয়ের ভালবাসায় সহস্র ঝঞ্ঝা ঝটিকা, রক্তপাত, যুদ্ধকোলাহলও শান্তি বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমানকে লইয়া নাকি ঘর করিতে হয়, তাই পদে পদে তাহার দোষ দেখিতে পাই। আর অতীত আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহার সহিত আর দেখা সাক্ষাৎ হইবে না, সুতরাং অতীতের সহস্র বড় বড় খুঁৎও আমরা ধরিতে চাহি না। বিরহে কাতর হইয়া আমরা চিরদিন তাহার জন্য বিলাপ করিতে থাকি। তাহাকে পাইব না বলিয়াই তাহাকে পাইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে।

যাহা সকল সময়ে পাওয়া যায়, তাহার অভাব কল্পনা করা সহজ নহে—মনে হয়, তাহা চিরদিন বুঝি থাকিবে, নয় ত তাহার কথা মনেই হয় না। বাতাস দুই দিন বন্ধ হইলে আমাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়ে, কিন্তু দায়ে না পড়িলে বাতাসের কথা মুখে আনে কে? বর্ত্তমান চিরদিনই আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে বলিয়া তাহার অভাব অনুভব করা অত্যন্ত দুরূহ। অতীতের রহস্যচ্ছায়ায় আমরা ক্রমাগতই হারাইয়া যাইতে চাই—বর্ত্তমানের কথা মনেও করি না। কিন্তু বর্ত্তমানকে আমরা দূরে রাখিতে চাহিলেও পারি না; কারণ, বর্ত্তমানের উপরেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইবে। বর্ত্তমানের অভাব হইলে অতীত এবং ভবিষ্যতেরও অভাব হইবে, কালের মধ্যে একটা গোলমাল বাধিয়া যাইবে, কালের প্রলয় আসিয়া দাঁড়াইবে।

মিলনে স্মৃতি নাই—বিরহ স্মৃতিময়। বর্ত্তমানের স্মৃতি কোথায়? অতীতেরই স্মৃতি। আমরা বর্ত্তমানে অনেক জিনিস এত বেশী করিয়া দেখি যে, তাহার রহস্যটুকু, সৌন্দর্য্যটুকু মুছিয়া যায়। ছবি নিকটে আসিয়া দেখিলে অনেক সময় দেখা এত অধিক হয় যে, রঙের আতিশয্য বই আর কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু দূর হইতে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নালোকে সেই ছবিই মধুর হইয়া উঠে। যখন চক্ষের সম্মুখে একটি খোলার ঘর দেখি, তখন আমরা হয় ত একবার ফিরিয়া চাহি না, কিন্তু চিত্রে যখন সেই ঘরটি দেখি, তখন জন্মের মত হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, প্রথমাবস্থায় আমরা তাহার সমস্তটাই দেখিতে পাই। চিত্রে তাহার অস্ফুট ছায়ামাত্র দেখি—বস্তু গিয়াছে, ভাব মাত্র অবশিষ্ট। অতীতেও বস্তু গিয়াছে—ভাব আছে মাত্র। সেই ভাবই স্মৃতি। স্মৃতিতেই অতীত মধুর। বর্ত্তমানে বস্তুরই অধিকার—ভাব যেন ফুটিতে পায় না। বস্তু স্থায়ী নহে, ভাব স্থায়ী। এই জন্য অতীত হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে—অতীতের জন্য আমরা বিলাপ করি। বর্ত্তমান প্রতি দিন শুকাইয়া যায়। অতীত আসিয়া সেই শুষ্ক ভূমির উপরে শ্যামল উদ্যান রচনা করে।

কিন্তু তাই বলিয়া অতীতই আমাদের সর্ব্বস্ব নহে। বর্ত্তমানের প্রতি যাহার প্রেম নাই—অতীতের স্বপ্নে যে চিরদিন আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তাহার দ্বারা সংসারের কোন

উপকার সাধিত হয় না। আপনার চতুর্দ্দিকে কুজ্ঝটিকার আবরণ টানিয়া দিয়া বর্ত্তমানের দিকে পা ছড়াইয়া সে সুখে নিদ্রা দিতে চায়। তাহার হৃদয়ে প্রেম নাই—অতীতের প্রতি স্বার্থপ্রণোদিত টান আছে মাত্র। আলস্যই তাহার হৃদয়ের অধীশ্বর! অতীতের প্রতি কাল্পনিক প্রেম সেই আলস্যকে সহৃদয়তা বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহে! বর্ত্তমানকে ছাঁটিয়া ফেলা অতীতপ্রিয়তা নহে—আলস্যপ্রিয়তা। তাহাতে মহত্ত্ব কিছুই নাই, সহৃদয়তাও তাহাতে প্রকাশ পায় না। অভিমানীর দুই বিন্দু অশ্রুজল তাহার মধ্যে ফেনাইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু সমাজের হিতসাধন হইতে পারে না। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বিবাহ সংঘটন করাই প্রকৃত মহত্ত্ব। ['ভারতী ও বালক,' ভাদ্র ১২৯৫]

জন্মভূমি

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

অভাগিনী জন্মভূমির মুখের পানে চাহিয়া জড়হৃদয় পাষাণও কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু সেই শ্যামল স্নেহে চিরবর্দ্ধিত সন্তানের কোমল হৃদয় ত কাঁদে না। শ্যামল জননীর প্রস্ফুটিত হাসিমুখ আমরা আর দেখিব না, জননীর হৃদয় শোষণ করিয়া মৃত্যু চলিয়া গিয়াছে। সে বিকশিত প্রাণ ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; তাহার চারি পার্শ্বে আজ রোগ শোক জরা, অন্ধকার পিশাচের রুধিরোন্মত্ত চীৎকার, বেদনাকাতর মুমূর্ষুর হাহাকার বিলাপ। নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, শান্তিনিকেতন মাতৃক্রোড়ে অরণ্যের পশু ঘর বাঁধিয়াছে; রৌদ্রপীড়িত ক্ষুধাকাতর সন্তানেরা প্রবৃত্তির ছলনায় পরস্পরকে বঞ্চিত করিয়া অসীম সুখ লাভ করিতেছে—দরিদ্রা মায়ের কথা হৃদয়ে আর ঠাঁই পায় না। আজি একবার আত্মবিচ্ছেদ ভুলিয়া, উচ্চনীচ অহঙ্কার অভিমান ভুলিয়া, একহৃদয়ে যদি আমরা মায়ের পূজা করিতে পারি, কাল প্রভাত-কিরণে হাসিমুখে অন্নপূর্ণা অন্ন ঢালিয়া দিবেন—ক্ষুধার যন্ত্রণা আর সহিতে হইবে না। জননী জন্মভূমির শুষ্ক হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে; সে হৃদয়োচ্ছ্বাসে যে অমৃত ঝরিবে, পান করিয়া তাহা কেহ নিঃশেষ করিতে পারিবে না। এ রক্তের নদী বহিবে না, এ কঙ্কালের স্তূপ জমিবে না। হিমাচলনিঃসৃতা শান্তিবারি পান করিয়া পৃথিবী শীতল হইবে।

আমাদের জন্ম দিয়া পুণ্যভূমি চিরদুঃখিনী। ভিখারীর মত আমরা পদে পদে পরের দুয়ারে মান ভিক্ষা করিতে যাই—স্বজাতিকে পদদলিত করিয়া, সহোদরের মস্তক অবনত করিয়া, মাতার নাম কলঙ্কিত করিয়া আমরা মনে করি, মান বাড়িল। পরে দেখিয়া হাসে,

আমরা ভাবে গদগদ হই। দরিদ্রা জননীর কাছে শত বার প্রার্থনা করিয়া বিফল হইলে অপমান নাই, কিন্তু পরের নিকট ভিক্ষা পূর্ণ হইলেও অপমান ঘুচে না। সেখানে স্নেহের বন্ধন নাই, প্রেমের টান নাই, আদুরে ছেলের মত কথায় কথায় আবদার করিতে গেলে শুনিবে কে? দুই এক বার ভিক্ষা মিলিবে, তাহার পর উপহাস বিদ্রূপ, অবশেষে সম্মার্জ্জনী। ভিক্ষা জীবনের মূলভিত্তি হইয়া উঠিলে এ জীর্ণ কঙ্কাল প্রতি দিন শীর্ণ হইবে বৈ উন্নতি করিবে না। ক্ষণিক সুখমোহে জীবনের উন্নতিস্রোত রুদ্ধ হইয়া যাইবে। ক্রন্দন থামিয়া আসিবে, কিন্তু হাসি ফুটিবে না, বাক্য স্তব্ধ হইবে, কিন্তু নয়নে আনন্দজ্যোতি প্রকাশ পাইবে না; ধীরে ধীরে অবসান ঘনাইয়া আসিবে। এ ভারতভূমিতে তাহা হইলে চিতা আর নিভিবে না; চারি দিকে শ্মশান শবদাহ, শৃগাল কুক্কুরের যুদ্ধ, শকুনি গৃধিনীর পাল বিরাজ করিবে।

অভাগিনীর কপালে কি আছে কে জানে? যেখানে মাতার শীর্ণ দেহ, ম্লান মুখ দেখিয়া সন্তানের হৃদয়ে শোক উথলে না, অত্যাচারপ্রপীড়িত ভ্রাতার কাতর ক্রন্দনে হাই উঠিতে থাকে, পরের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য সন্তানেরা পরস্পরের বিপক্ষে দাঁড়াইতে সম্মত হয়, সেখানে মঙ্গলের আশা কোথায়? মাতার দারিদ্র্য দেখিয়া যেখানে সন্তান আপনাকে ধনী মানী বিবেচনা করিতে পারে, যেখানে তুচ্ছ স্বার্থের জন্য দুই বেলা মিথ্যা সম্মানিত হয়, সামান্য পৃষ্ঠথাবড়ানিতে সমস্ত অপমান জ্বালা ঘুচিয়া যায়, সেখানে মঙ্গল আসিতে চাহে না। জন্মভূমি জননীর সম্মানেই আমাদের সম্মান, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিতেই আমাদের শ্রীবৃদ্ধি। আমরা যখন জননীকে ভক্তি করিতে শিখিব, অপরে তখন তাঁহাকে তাচ্ছিল্য করিতে সাহস করিবে না। সে দিন প্রভাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে—ভারতবর্ষের বুকের মধ্য হইতে একসুরে মায়ের নাম উঠিতেছে—সন্তানেরা মা বৈ আর জানে না, মায়ের নামে সকলেই এক। সে দিন কলহ বিবাদ থাকিবে না, সমস্ত পৃথিবীকে আমরা ভায়ের মত আলিঙ্গন করিতে পারিব—পৃথিবী আমাদের নিকট সরিয়া আসিবে।

আজ একবার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া দেখ, আপনাদের দারিদ্র্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। মায়ের করুণ আঁখির পানে একবার চাহিয়া দেখ, হৃদয় পুলকে পূরিয়া উঠিবে। ঐ স্নেহমধুর অধরে আজ কেন বিষাদের রেখা ফুটিয়াছে, ঐ পবিত্র সৌন্দর্য্যে শোকের ছায়া পড়িয়াছে। সে শুভ্র উষার মত কান্তি ম্লান, সে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি বিষণ্ণা। অন্নপূর্ণার অন্ন সন্তানেরা আর দেখিতে পায় না। অবনতমুখে জননী সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া চোখের জল মুছিতেছেন। দুর্ব্বল সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিয়া জননীর চোখের জল ভিন্ন দিবার আর আছে কি? সন্তানেরা আপনার মধ্যেই কলহ করিতেছে; ভাইকে বঞ্চিত করিয়া ভাই বড় হইতে চায়। ন্যায়ের পথে না চলিলে এখন আর উপায় নাই—সমূলে বিনষ্ট হইতে হইবে। জন্মভূমি! ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবি ভারতি! দুর্ব্বল সন্তানের হৃদয় তোমার পবিত্র ভাবে পূর্ণ কর।

সেখানে মহত্ত্বের বীজ অর্পণ কর মা, অনেকতা একতায় পরিণত হৌক্। মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে সন্তান যেন পশ্চাৎপদ না হয়।

অতীত স্মৃতির স্বপ্নে ভোর হইয়া ঘরের কোণে কানাকানি করিলে চলিবে না, মায়ের পূজা করিতে হইবে। ভীষ্ম দ্রোণের নাম লইলে হইবে না, হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব অনুভব করা চাই। ভগবানের নামে বাধাবিপত্তি কাটিয়া যাইবে। ভারতবর্ষের শূন্য মন্দিরে আমরা পুনরায় মায়ের প্রতিষ্ঠা করিব। চারি দিক্ হইতে এখানে লোকে মাতৃভক্তি শিখিতে আসিবে। এখানে আসিয়া সকলে স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে—নরহত্যা শিখিবে না। শিখিবে—মায়ের সেবা করিতে; শিখিবে—সত্যের সম্মান রাখিতে। ভারতীর বীণাধ্বনি জগতে ব্যাপ্ত হইবে। পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের নামে শত শত উন্নত শির নত হইয়া থাকিবে। আমাদের গৃহে সে দিন মায়ের প্রতিষ্ঠা। ['ভারতী ও বালক,' অগ্রহায়ণ ১২৯৫]

ভূতকথা

প্রাচীন কাল হইতে লোকে ভূত সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু মানবজাতির অদৃষ্টে ভূতদর্শন কখনও ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। দেশভেদে কালভেদে ভাবের পরিবর্ত্তন হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে ভূত সম্বন্ধে যে সকল গল্প প্রচলিত আছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, মোটামুটি ভূতের কল্পনা অনেক দেশেই এক। শ্মশানে এবং গোরস্থানেই অধিকাংশ ভূতের বাস। তবে শুভাদৃষ্টের বলে আমাদের দেশের অনেক ভূত বৃক্ষশাখায় আধিপত্য লাভ দ্বারা সম্মানিত হইয়াছে। যাহাদের অদৃষ্টে বৃক্ষশাখা জুটে নাই, তাহারা এখানে সেখানে ছড়াইয়া থাকে। কিন্তু শাখাবলম্বীদিগের ন্যায় তাহারা বিখ্যাত হইতে পারে না।

বিলাতী ভূতেরা মোরগের ডাক শুনিলে যেমন অন্তর্হিত হয়, আমাদের দেশের ভূতেরা সেরূপ কোন পাখীর ডাকে পলাইয়া যায় না। তাহারা ওঝার মন্ত্র ও রামনামের বশ। দেশের গুণে তাহাদের সাহস কিছু কম—লৌহের ত্রিসীমায় তাহারা আসিতে চাহে না। কিন্তু সাহসের অভাব আনুনাসিক স্বরের দ্বারা একরকম পুষাইয়া গিয়াছে। নাকি সুরে বক্তৃতা করিতে দেশীয় ভূত যত পারদর্শী, বিদেশের ভূতগোষ্ঠী তাহার সিকিও নহে। এই জন্য আশা করা যাইতে পারে যে, ভূতেরা যদি কোন কালে সভা করিতে শিখে, তাহা হইলে বাঙ্গলার ভূতই সভাপতি এবং বক্তার আসন গ্রহণ করিবে।

সে কথা যাক্, আর ভবিষ্যদ্বাণীতে কাজ নাই। বাঙ্গলাদেশের ভূতেদের মধ্যে অনেক প্রকার শ্রেণীবিভাগ আছে। তাহাদের মধ্যে কেহ ব্রহ্মদৈত্য, কেহ শুধু ভূত, কেহ

পেত্নী ইত্যাদি। মাম্‌দো ভূত নামক আর এক জাতীয় অত্যাচারী ভূতেরও এদেশে নাম শুনা যায়। কিন্তু এই জাতীয় ভূত হিন্দু নহে—মুসলমান। প্রাচীন কালে এদেশে ইহাদের প্রাদুর্ভাব ছিল না। মুসলমান অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে এই অত্যাচারী ভূতদলের নাম প্রচার হয়। কিন্তু কালের গতিক দেখিয়া মনে হয়, গৌরাঙ্গ ভূতের নামে মাম্‌দোর ভয় ডুবিয়া যাইবে।

ব্রহ্মদৈত্যেরা ভূতজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব—হাজার হউক, ব্রাহ্মণের গৃহে জন্ম কি না। ইহাদের মনে তেমন নীচ ভাব নাই। পূজা আহ্নিকের দিকেই ইহাদের মতি। তবে অনিষ্ট করিলে ইহারা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। শুনা গিয়াছে, বাসবৃক্ষে থুথু ফেলার জন্য অনেকে প্রাণ হারাইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও ব্রহ্মদৈত্যকে শান্তিপ্রিয় বলিতে হইবে। ইহাদের বেশভূষা ব্রাহ্মণের মত। গলায় উপবীত, কাঁধে চাদর, পায়ে খড়ম। শুনা যায়, আকৃতি নাকি অমানুষিক। এমন কিছু নয়—হস্তদ্বয় তালগাছ অপেক্ষা দুই হাত লম্বা, পদযুগল যোজনলম্বিত।

সামান্য ভূতেরা ব্রহ্মদৈত্যের মত প্রভাবশালী নহে। কিন্তু তাহারাই লোকের অনিষ্ট করিবার জন্য লালায়িত। কোন প্রকারে মনুষ্যের স্কন্ধে চাপিতে পারিলে তাহারা আর কিছুই চাহে না। পায়ের গঠন দেখিয়াই তাহাদিগকে সহজে চেনা যায়। আমাদের শ্রীচরণের সম্মুখভাগ তাহাদের পশ্চাৎ, আমাদের পশ্চাৎ তাহাদের সম্মুখ। আমরা এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পাই নাই। তবে আষাঢ়ের গল্পে এইরূপ বর্ণনা আছে বলিয়া মনে হইতেছে।

আষাঢ়ে গল্পে অনেক ভূতের নামোল্লেখ আছে। মৃত্যুর গন্ধ থাকিলেই ভূত মহাশয় হাজির। মরিলে যেন ভূত হইতেই হইবে—একেবারে গভর্মেণ্টের আইন। ভূত না হইয়া আষাঢ়ে গল্পে যাহার মৃত্যু হয়, তাহার কথা মন দিয়া কেহ শুনিতে চাহে না। প্রধান চরিত্রের মধ্যে তাহার ত গণ্য হইবার অধিকার নাই। আষাঢ়ে ভূতের বড় প্রাদুর্ভাব। গল্প শুনিয়া ছেলেরা ভয়ে বাহির হইতে পারে না। বৃদ্ধারা গল্প বলিয়া ভয়ে আকুল হইয়া উঠেন—রাত্রিতে স্বপ্নে কত বার রামনাম জপা হইয়া যায়।

পেত্নীজাতি স্ত্রী ভূত। তাহারা স্ত্রীলোকের মত সাজগোজ করে—স্ত্রীলোকের মত ধরণধারণ। মায়াবিদ্যায় সকল ভূত অপেক্ষা ইহারা পটু। কিন্তু পেত্নীরা বড় মাছের কাঙ্গাল। গল্প আছে, বিরক্ত হইয়া একজন গৃহস্থের বউ একবার মাছের পরিবর্ত্তে পেত্নীর হস্তে তপ্ত ফেন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, লোভী পেত্নী চূড়ান্ত নাকাল হইয়াছিল।

পেত্নীরা সাধারণতঃ পুকুরপাড়ে ঝোপঝাপের মধ্যে বাস করে। কেহ মাছ ধুইতে গেলে তাহার নিকট চাহিতে থাকে। কিন্তু সাবধানী লোকেরা কখনও ইহাদিগকে দান

করিতে চাহেন না। ভয়, পাছে প্রশ্রয় পাইয়া ইহারা মাথায় উঠে। নোংরামির জন্য পেত্নীরা বিখ্যাত। প্রমাণ অধিক দূরে নয়। নোংরাকে কথায় কথায় লোকে পেত্নী নামে অভিহিত করে। যাঁহারা কখন পেত্নীর পাল্লায় পড়েন নাই, তাঁহাদিগকে আমরা সাবধান করিয়া দিতেছি, নোংরা মাছের কাঙ্গালকে কখনও বিশ্বাস না করেন।

অন্য দেশে আমাদের পেত্নীর মত ভূত-কল্পনা আছে কি না জানি না। কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এদেশে ছাড়া এপ্রকার ভূত নাই। বিলাতী ভূতের কল্পনায় কেমন একটা গাম্ভীর্য্য আছে। সে গম্ভীর মূর্ত্তি, গম্ভীর ভাব দেখিলে লোকে স্তম্ভিত হইয়া থাকে। আমাদের ভূতেরা কিছু বাজে বকিতে ভালবাসে। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিলে এক এক সময় হাসি পায়। গাম্ভীর্য্য তাহাদের প্রায় নাই—ছিবলামীর ভাব কিছু বেশী। তবে ব্রহ্মদৈত্যেরা তেমন ছিবলা নহে। তাহাদের একটু গম্ভীর মনে হয়।

বিলাতী অনেক ভূতের কথা শুনা যায়, যাহারা রুদ্ধ দ্বারের মধ্য দিয়া বাহির হয়। তাহারা কাগজের মত স্থূল—সুতরাং সহজেই ফাঁক দিয়া বাহির হইতে পারে। বিলাতী মহিলারা অনেকেই রাত্রিতে গির্জা প্রাঙ্গণ হইতে ইহাদিগকে উঠিয়া আসিতে দেখিয়াছেন। তাঁহাদের কথায় নিতান্ত অবিশ্বাস না করিলে আমাদিগকেও ইহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু বিলাতে ভূতের অভাব না হইলেও সেখানে ভূতেদের এত জাতিভেদ নাই। আমাদের ভূতেদের মধ্যে আগাগোড়া জাতিভেদ। স্ত্রীভূতের মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ আছে। পেত্নী ছাড়া শাঁকচুন্নী নামক আর এক জাতি স্ত্রীভূত আছে। ইহারা অপরিষ্কার স্থানে বাস করে। ইহাদের স্বভাব বড় ভাল নয়। সুবিধা পাইলে মানবের ঘাড় মট্‌কাইতে ইহারা কখনও ভুলে না। পেত্নী জাতি ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হয়।

শুধু মানুষ ভূতেই ক্ষান্ত নয়। আযাঢ়েরা গোভূত পর্য্যন্ত দেখিয়াছেন। গোভূতের বর্ণনায় একটু নূতনত্বও আছে। ইহাদের আকৃতি গোবৎসের মত। কিন্তু ইহারা মজার উপায়ে লোকের প্রাণবধ করে। পায়ের নীচে দিয়া কোন প্রকারে একবার যাইতে পারিলেই হইল। এই জন্য গোভূতের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার উপায়, জোড়-পায়ে চলা।

গোভূতের মত বানরভূত, কুকুরভূত, সর্পভূত প্রভৃতি আরও পাঁচ রকম অবশ্য আছে। এদেশে ইহাদের নাম বড় শুনিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু আরব দেশে ইহাদের কিছু নাম আছে। শুনা যায়, আরবীয়েরা জানিতে পারিয়াছে যে, সর্পেরা 'জিনি'র অবতার। জিনিরা অন্যান্য পশুর বেশ ধরিয়া ছলনা করিয়া থাকে। আরবীয় মরুভূমিতে যে ঘূর্ণবায়ু উঠে, তাহাই বাস্তবিক জিনির আকৃতি।

আরবীয় ভূতের সহিত আমাদের ভূতের এক বিষয়ে বড় সাদৃশ্য আছে। উভয়ই লৌহের নিকটে ঘেঁষিতে চাহে না। আরবীয়েরা ভূতের ভয় পাইলে লৌহের নাম করে। ভূত তাহা হইলে ভয়ে পলায়ন করে।

স্বদেশীয় বিদেশীয় ভূত সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইল। সমালোচনা পড়িয়া ভূতেরা হয় ত লাঠি ঠিক করিয়া রাখিবে। অদৃষ্টদোষে ভূতদর্শন কপালে জুটে নাই। ভরসা, সমালোচনার জোরে সে কার্য্য সমাধা হইবে। না হইলে লেখাই সার। হা কপাল!

['ভারতী ও বালক,' পৌষ ১২৯৫]

কুন্দনন্দিনী ও সূর্য্যমুখী

গভীর দুঃখ যন্ত্রণায় যাহাদের হৃদয় গঠিত, তাহারা সুখের তীব্র সূর্য্যালোক সহিতে পারে না। সূর্য্যালোকে তাহারা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, মুদিত নয়ন অবনত করিয়া জীবনের উপকূলে কম্পিতপদে দাঁড়াইয়া থাকে মাত্র। সংসারের কটাক্ষকুঞ্চিত হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহাদের মৃদু নিশ্বাস-মলয় শিহরিয়া উঠে, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ হইতে কি যেন বিভীষিকা আসিয়া চারি দিকে অন্ধকার পক্ষপুট বিস্তার করিতে থাকে। অবশেষে সহসা তরঙ্গাঘাতে তটভূমি ভাঙ্গিয়া যায়, পার্থিব কোলাহল মিলাইয়া যায়, জীবনের জ্বালামাধুরী অনুভব করিবার পূর্ব্বেই অতল সমুদ্রকল্লোলে তাহাদের সমাধি রচিত হয়। কুন্দনন্দিনীর হৃদয় এইরূপ কাতর দুঃখের রচনা। নগেন্দ্রনাথের ভালবাসার তীক্ষ্ণ রশ্মিছটায় তাহার আঁখি মেলিতে সাহস হইত না। নিস্পন্দের মত সে জীবনের তীরে দাঁড়াইয়াছিল—তাহার আশে পাশে ফুল ফুটিত, পাখী গান গাহিত, জ্যোৎস্নাহিল্লোলে কোকিলের কুহুস্বর নিশীথের ফুলসৌরভের প্রেমালিঙ্গনস্পর্শ অনুভব করিত—কুন্দ নগেন্দ্রের স্মৃতিতে বিলীন।

নিমীল-নয়নে সে জগতের কুঞ্চিত কটাক্ষের সম্মুখে জড়সড় হইয়া নগেন্দ্রের অধরপ্রান্তে বিলীন হৃদয়ের মৃদু উচ্ছ্বাস অনুভব করিত, সেই মৃদু উচ্ছ্বাস ভোর হইয়া ধীরে ধীরে হৃদয় খুলিয়া দিত; সেখানে নগেন্দ্রের ভালবাসা প্রতিফলিত হইত—কুন্দকুসুম বিকশিত হইয়া উঠিত, সেই সলজ্জ স্নেহময়ী আঁখি দু'টি নীরবে নিঃশব্দে স্তরে স্তরে খুলিয়া যাইত, নগেন্দ্রের পানে চাহিয়াই আবার অবনত হইয়া পড়িত। কুন্দের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিত, নিশ্বাসে জীবনের দীর্ঘ দুর্দ্দিনের ছায়া শিহরিয়া উঠিত। সেই নিশ্বাস-সৌরভে নগেন্দ্র কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছেন—কূল নাই, কিনারা নাই—সংসার, গৃহদ্বার, বিষয় সম্পত্তি, মান সম্ভ্রম, সকলেই শূন্যে। তাঁহার গৃহ শ্মশানে পরিণত—যে গৃহে লক্ষ্মী নাই, সেখানে শ্মশান ভিন্ন আর কি হইতে পারে? তাঁহার বিষয় সম্পত্তি—বিপদে বন্ধু, সম্পদে

সখী সূর্য্যমুখী নাই—সে বিষয় সম্পত্তি ক'দিন টিঁকিবে? তাঁহার মান সম্ভ্রম—প্রাণ নাই, থাকিবে কোথায়? নগেন্দ্রনাথের বৃহৎ সংসারে কালের করাল মূর্ত্তি অন্ধকার অমাবস্যার মত সকল শান্তির অবসান জন্য অতি ধীরে ধীরে প্রকাশিত হইতেছে—সেখানে জ্যোৎস্না ফুটিবে না, মলয় বহিবে না, বসন্ত জাগিবে না। সেখানে সম্মুখে শান্তি অবসান।

কিন্তু এই অশান্তির কারণ কি অভাগিনী কুন্দনন্দিনী? স্বপ্নদৃষ্ট ছায়ামূর্ত্তির প্রতিকৃতি দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনা কুন্দ ত নগেন্দ্রের দিকে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে নাই, নগেন্দ্রই ত তাহাকে আশা ভরসা দিয়া, সান্ত্বনা মন্ত্রণা দিয়া আপনার সুখ শান্তির পথে কণ্টক করিবার জন্য লইয়া আসিলেন। দোষ কাহারও নাই—বিধাতার নির্ব্বন্ধ খণ্ডন করিবে কে? নগেন্দ্র কুন্দকে দেখিয়া সূর্য্যমুখীকে ভুলেন নাই, কুন্দের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার পদতলে হৃদয়-সিংহাসন পাতিয়া দেন নাই। দুরবস্থা দেখিয়া তিনি তাহাকে আশ্রয় দেন মাত্র—সূর্য্যমুখীই এ কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহায়। তখন কমলমণি, নগেন্দ্রনাথ, সূর্য্যমুখী, কেহই জানিতেন না যে, এই সরলতার প্রতিমা বালিকা কুন্দনন্দিনী একদিন দত্তগৃহে অশান্তির কারণ হইয়া উঠিবে, যে সূর্য্যমুখী তাহার মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেন, সেই পতিপ্রাণা সাধ্বীর একমাত্র আশা ভরসা সম্বল স্বামীর স্নেহে কুন্দই ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইবে। সূর্য্যমুখী হাসিতে হাসিতে নগেন্দ্রনাথকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, কুন্দকে বিবাহ করিতে তাঁহার যদি অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সূর্য্যমুখীই বরণডালা সাজাইতে বসেন। তামাসা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, কে জানিত—চারি পাঁচ বৎসর পরে তাহাই সত্য ঘটনায় পরিণত হইবে? কিন্তু হইয়াছিল তাহাই। কুন্দনন্দিনী যাহা স্বপ্নেও জানিত না, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে যাহা এক দিনের জন্যও ঠাঁই পায় নাই, কালের অনিবার্য্য ঘটনায় তাঁহাদের কপালে তাহাই ঘটিয়াছিল। কুমারী কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রকে আকর্ষণ করে নাই, কিন্তু বিধবা কুন্দ নগেন্দ্রময়ী হইয়া সূর্য্যমুখীকে স্বামীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল।

তাই বলিয়া কুন্দকে দোষ দেওয়া যায় না। সে নগেন্দ্রকে ভাল বাসিত মাত্র—ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। কিন্তু সে কখনও সূর্য্যমুখীর হিংসা করে নাই। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই তাহার সুখ—সূর্য্যমুখীকে নগেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার কথা তাহার মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও উদয় হয় নাই। বাপীতটে একাকিনী দেখিয়া নগেন্দ্র যে দিন্ কুন্দকে সহস্র কাতরবচনে আপনার প্রেম জানাইয়া বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, ইচ্ছা করিলে কুন্দ সেই দিনই আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে পারিত, কিন্তু সরলা কুন্দ ত তেমন নহে, সূর্য্যমুখীর মুখ চাহিয়াই কুন্দ তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, একবার বল কুন্দ, তুমি আমার গৃহিণী হইবে কি না? কুন্দ উত্তর দিল, না। নগেন্দ্র বলিলেন, একবার শুধু বল,

আমায় ভাল বাসিবে কি না? হৃদয়ের কষ্ট হৃদয়ে চাপিয়া কুন্দ উত্তর দিল, না। কুন্দের কথায় অভিনয় নাই, অভিমান নাই, ইহা সাধাইবার ফাঁদ পাতা নহে। প্রেমের পাক দেওয়া রোগ কুন্দের জ্ঞানের অতীত।

আর সূর্য্যমুখী—সূর্য্যমুখী আপনাতে আর নাই। নগেন্দ্রনাথ ধনে, মানে, জ্ঞানে, কিছুতেই নীচ নহেন। তাঁহার স্বভাব কত লোকের আদর্শ হইবার মত। আজ কি না এমন দেব স্বামী পতিব্রতার অকপট প্রেম তুচ্ছ করিয়া, সংসার বিষয়-বিভব মানসম্ভ্রম পায়ে ঠেলিয়া, লালসার মোহে অকূলে ভাসিয়া চলিয়াছেন; ইহা দেখিয়া পতিহিত-কারিণীর হৃদয়ে আঘাত লাগিবে না ত লাগিবে কাহার? সূর্য্যমুখী বিশেষ উদ্যোগী হইয়া কুন্দকে গোবিন্দপুরে আনাইয়াছিলেন, তাহার সহিত তারাচরণের বিবাহ দিলেন, তারাচরণের মৃত্যুর পর অনাথিনীকে আপনার আলয়ে আশ্রয় দান করিলেন, কুন্দকে চিরদিনই তিনি স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। কুন্দের উপর তাঁহার কিছুমাত্র হিংসা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া উদারতার আত্যন্তিকতাবশতঃ স্বামীর স্নেহ হইতে কে বঞ্চিত হইতে চায়? সূর্য্যমুখী দেখিলেন, অনিন্দ্যস্বভাব সংযমী নগেন্দ্রনাথের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শ করিতেছে, তাঁহার অবহেলায় সোণার সংসার ছারখার হইয়া যায়, হৃদয়ের সুগভীর বেদনা তিনি আর চাপিতে পারিলেন না, ভগিনীসমা ননন্দা কমলমণিকে একখানি পত্রে সকল কথা জানাইলেন। পত্রখানি যেন তাঁহার চোখের জলে লেখা—সেখানি পাঠ করিলেই সূর্য্যমুখীর মনের অবস্থা বুঝা যায়। যথাসময়ে কমলমণি পত্রের উত্তর দিলেন; পত্রের ছত্রে ছত্রে সূর্য্যমুখীকে বুঝাইয়াছেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বাসিনী হইও না।

কমলের পত্র পাইয়া সূর্য্যমুখী মনকে অনেক করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মন কিছুতেই প্রবোধ মানে না। নগেন্দ্রের অত্যাচার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল—নগেন্দ্র মদ্যপ পর্য্যন্ত হইয়া উঠিলেন। সূর্য্যমুখীর কষ্টের আর অবসান নাই। অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়াই তাঁহার দিন কাটে। নগেন্দ্রকে কোন কথা বলিতে গেলে তিনি রাগিয়া যান, ফল না হইয়া হিতে বিপরীত হয়। সুতরাং সূর্য্যমুখীকে আপনার মনেই গুমরিয়া থাকিতে হইত।

এই সময়ে একদিন সূর্য্যমুখীর গৃহে আবার হরিদাসী বৈষ্ণবীর আবির্ভাব হইল। দুই একটি গানের পর কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী এ কথা সে কথা অনেক কথা পাড়িল। সন্দেহ হওয়ায় সূর্য্যমুখী হীরাদাসীকে চর লাগাইয়া জানিলেন, হরিদাসী বৈষ্ণবী আর কেহ নহে—ছদ্মবেশী দেবেন্দ্র দত্ত। হীরা আরও প্রতিপন্ন করিল যে, দেবেন্দ্র দত্ত কুন্দের প্রণয়ী, তাহার সহিত কুন্দের অনেক দিনের পরিচয়। এই কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দকে যথেচ্ছা ভৎর্সনা করিলেন। তাঁহার ভৎর্সনায় সেই দিন রাত্রেই কুন্দ নগেন্দ্রনাথের গৃহ ছাড়িয়া গেল।

এত দিন যে প্রেম ধুঁয়াইতেছিল, কুন্দের বিরহে আজ তাহা জ্বলিয়া উঠিল। কুন্দকে পাইবার জন্য নগেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন,—সূর্য্যমুখীর উপর তাঁহার আরও বিরক্তি জন্মিল। নগেন্দ্র একদিন কথায় কথায় সূর্য্যমুখীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুন্দনন্দিনীকে তিনি কি বলিয়াছিলেন। সতীলক্ষ্মী সূর্য্যমুখী প্রাণাধিক স্বামীর চরণে সকল কথা খুলিয়া বলিয়া সুস্থ হইলেন। অন্যা নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ভাগিনী জানিয়া তিনি আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলেন—কিন্তু প্রাণ অপেক্ষা প্রিয় স্বামীর মুখ চাহিয়া তিনি মরিতেও পারেন না। নগেন্দ্রও সূর্য্যমুখীকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। বলিতে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল, কিন্তু সূর্য্যমুখীকে না বলিয়া তিনি থাকিতে পারিলেন না। শেলসম হইলেও তিনি সূর্য্যমুখীকে বলিলেন যে, তিনি দেশত্যাগী হইয়া চলিলেন, যদি কুন্দকে ভুলিতে পারেন, তবেই প্রত্যাগমন করিবেন, নহিলে ইহাই শেষ দেখা। স্বামীর পায়ে ধরিয়া সূর্য্যমুখী তাঁহাকে আর এক মাস মাত্র অপেক্ষা করিতে বলিলেন। নগেন্দ্র মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

নিরপরাধিনী কুন্দকে ভৎর্সনা করিয়া অবধি সূর্য্যমুখীর অন্তরে শান্তি নাই। রাগের মাথায়ই তিনি কুন্দনন্দিনীকে যথেচ্ছা ভৎর্সনা করিয়াছিলেন; রাগ পড়িয়া গেল, ক্রমে অনুতাপ উপস্থিত হইল। নগেন্দ্রনাথ আবার কুন্দনন্দিনীর জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। এক মাসের মধ্যে কুন্দকে না পাইলে তিনি দেশত্যাগ করিবেন। ভাবিয়া ভাবিয়া সূর্য্যমুখীর দেহ শুকাইয়া গেল। বিধাতা সূর্য্যমুখীর প্রতি সদয় হইলেন—নগেন্দ্র-বিরহকাতরা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের দর্শন-কামনায় অন্তঃপুরের উদ্যানে আসিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট ধরা পড়িল। "এসো দিদি এসো" বলিয়া সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিয়া তাহাকে লইয়া আসিলেন। কিছু দিনের মধ্যেই নগেন্দ্রের সহিত কুন্দনন্দিনীর বিবাহ হইল। এ বিবাহে ঘটক—সূর্য্যমুখী স্বয়ং। কিন্তু বিবাহের পরে ঘটক নিরুদ্দেশ হইলেন। কমলমণিকে একখানি চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গেলেন, "জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াছি।" আরও কমলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, যে দিন স্বামীর প্রেম হইতে বঞ্চিত হইবেন, সেই দিনই যেন তাঁহার আয়ুঃশেষ হয়। সূর্য্যমুখীকে এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।

নগেন্দ্রের গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়ার জন্য সূর্য্যমুখী আদবেই দোষী নহেন। গৃহ-ত্যাগেও সূর্য্যমুখীর লাবণ্যহানি হয় নাই—বাহিরেও সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের। হৃদয়ে নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহাকে বল দিয়াছিল। কিন্তু পৌরুষিক কাঠিন্য কখনও সূর্য্যমুখীতে দেখা যায় নাই। হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় তাঁহার আহার নিদ্রা বন্ধ হইয়াছিল, সূর্য্যমুখী মরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি নগেন্দ্রনাথ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়েন নাই। সূর্য্যমুখী

দেখিলেন, নগেন্দ্রনাথ কুন্দের সৌন্দর্য্যে হৃদয় বাঁধা দিয়াছেন, যেখানে তাঁহার ভিন্ন কাহারও কখনও আসন বিছাইতে সাহস হয় নাই, সেই নগেন্দ্রনাথের হৃদয়ে কুন্দ এখন অনুক্ষণ জাগিতেছে, সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের ভয়ের কারণ—ভালবাসার প্রতিবন্ধ মাত্র, সূর্য্যমুখী গৃহ ত্যাগ করিলেন—শ্বশুরের গৃহ ও স্বামীর গৃহ, আপনার গৃহ ছাড়িয়া অসহায়া একাকিনী কুলবধূ সূর্য্যমুখী উন্মাদিনীর মত সংসারের ভীষণ তরঙ্গে ঝাঁপ দিলেন। কুন্দ এবং নগেন্দ্রের মধ্যে তিনি ব্যবধান থাকিবেন কেন? সূর্য্যমুখী দেখিলেন, স্বামী তাঁহার কথা শুনেন না, তাঁহার মঙ্গল পরামর্শ গ্রহণ করেন না, ভোগলালসাপরিচালিত নগেন্দ্রনাথের সংসার তীরবেগে উৎসন্নের পথে ছুটিয়াছে; সূর্য্যমুখী কুন্দকে নগেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া সংসারে যথাসাধ্য শান্তি স্থাপন চেষ্টা করিলেন। হৃদয়বেদনায় অস্থির হইয়া আপনি আর দাঁড়াইতে পারিলেন না—আত্মহারার মত ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

কুন্দনন্দিনীকে স্বর্গের শোভায় উঠাইবার জন্য বিজ্ঞ সমালোচকেরা সূর্য্যমুখীর এই কার্য্যকে যতই নিন্দনীয় বলুন না কেন, সূর্য্যমুখীর কুলবধূসৌন্দর্য্যের ইহাতে যে কিছু মাত্র হানি হয় নাই, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কুন্দ স্বর্গের শোভা হইতে পারে, কিন্তু সূর্য্যমুখী শোভামাত্র নহে, স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। নগেন্দ্রনাথের পার্শ্বে দুই জনকে দাঁড় করাইয়া দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের সংসারে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী—নগেন্দ্রনাথের "গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।" সূর্য্যমুখীতে গুণের অভাব নাই—তিনি গৃহকার্য্যে দক্ষা, পড়াশুনায় নিপুণা, পতিভক্তিতে সীতাসমা। সূর্য্যমুখী মানবী—দেবী—লক্ষ্মী। লক্ষ্মী বলিয়াই এত কষ্টেও তিনি আত্মহত্যা করিতে পারেন নাই—নগেন্দ্রনাথের জন্য হৃদয়ে জ্বালা বহন করিয়া জীবন্তে মৃত হইয়া ছিলেন।

কুন্দ যে নগেন্দ্রকে হৃদয় ঢালিয়া ভাল বাসিত, সে কথা কেহ অস্বীকার করিবে না; ভালবাসার জন্যই কুন্দের যাহা সৌন্দর্য্য। কিন্তু সূর্য্যমুখীর ভালবাসা ত কুন্দ অপেক্ষা হীন নহে। নগেন্দ্রে তিনি হৃদয় মিশাইয়াছিলেন—নগেন্দ্র হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে পারিতেন না। কুন্দ বিবেচনা-শক্তিতে, গৃহকর্ম্মে তাদৃশ দক্ষা নহে—সূর্য্যমুখীর নিকট সারা জীবন শিক্ষা পাইলেও কুন্দের এবিষয়ে বিশেষ উন্নতি হয় কি না সন্দেহ। কিন্তু কুন্দের এই সংসারানভিজ্ঞতাতেই আমরা অনেকটা মুগ্ধ হইয়া পড়ি, তাহার কষ্টে আমরাও দুঃখ অনুভব করি, সেই সরলতার প্রতিমার পানে চাহিয়া নীরবে অশ্রুমোচন করিতে থাকি। তাহার জীবনে আমরা একটা রহস্যচ্ছায়া দেখিতে পাই। আরম্ভ ও অবসানের মধ্যে কি যেন নীরব মাধুরী কুন্দের মুখে চোখে ফুটিয়া পড়িয়াছে—তাহার হৃদয়ের অন্তরতম আকুলতা হইতে কে বুঝি নীরবে সুধা ঢালিতেছে। কিন্তু তাহার জন্য যতই সহানুভূতি প্রকাশ করি না কেন, স্বীকার করিতে হইবে, সূর্য্যমুখী স্বর্গেও দুষ্প্রাপ্য। কুন্দনন্দিনীর বেশ একটি ভাব

আছে বটে, তাই বলিয়া কুন্দকে আদর্শ স্ত্রী বলা যায় না। সূর্য্যমুখী যথার্থ সহধর্ম্মিণী; কুন্দ ভার্য্যা মাত্র। তথাপি আবার বলি, কুন্দ নগেন্দ্রকে সমস্ত হৃদয় দিয়া যেরূপ ভালবাসিত, সেরূপ ভালবাসিতে অনেক ভার্য্যা অক্ষম। অন্যান্য অনেক গুণে সূর্য্যমুখী অপেক্ষা হীন হইলেও কুন্দ এবিষয়ে তাঁহার অপেক্ষা কম নহে।

সূর্য্যমুখীকে আমরা যে সহধর্ম্মিণী বলিলাম, তাঁহা কথার কথা নহে। নগেন্দ্রনাথও তাঁহারে সহধর্ম্মিণী বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। দুই দিনের জন্য মেঘ আসিয়া সূর্য্যমুখীকে আড়াল করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু সূর্য্যমুখী "সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।" সূর্য্যমুখী তাঁহার সর্ব্বস্ব। মোহের ছলনায় এমন প্রাণপ্রিয়া সহধর্ম্মিণীকেও তিনি ভুলিয়াছিলেন। এখন বিরহে সূর্য্যমুখী জাগিয়া উঠিতেছে। সূর্য্যমুখীর জন্য নগেন্দ্র দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছেন, একবার কোনও প্রকারে দর্শন পাইলে যেমন করিয়া হৌক্ লইয়া আসিবেন। এবারে তিনি সূর্য্যমুখীর অভাব হাড়ে হাড়ে অনুভব করিয়াছেন। বুঝিয়াছেন, সূর্য্যমুখীর অভাব সহস্র কুন্দনন্দিনীতে পূরণ করিতে পারিবে না।

সন্ধ্যার সহিত সূর্য্যমুখীর মুখশ্রীর কেমন একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়—দুই জনের ভাবে যেন বিশেষ ঐক্য আছে। সন্ধ্যার যেমন পবিত্র মহান্ ভাব, দেখিলেই কেমন স্নেহময়ী গৃহিণী বলিয়া মনে হয়, সূর্য্যমুখীরও সেইরূপ বড় একটি সুন্দর ভাব দেখা যায়। সে মুখে পরদুঃখকাতরতা, সহানুভূতি মাখান। সেখানে হৃদয় খুলিয়া আনন্দ আছে—প্রাণ বলি দিয়া প্রাণ পাওয়া যায়। কুন্দনন্দিনীকে আমরা সন্ধ্যা কি উষার সহিত তুলনায় আনিতে পারি না। উষা অপেক্ষা তাহার ধীর গতি—উষার মত সে ফুল তুলিয়া, পাতা কুড়াইয়া, লাফাইয়া বেড়ায় না। উষার মত বালিকা কুন্দ নহে। উষার ভালবাসায় যৌবন নাই—প্রণয়ে হতাশ হইয়া উষা মরিবে না। কুন্দের ভালবাসা যৌবনের প্রণয়—তাহাতে নৈরাশ্য, ভয়, শিহরণ সকলই আছে। সন্ধ্যার মত কুন্দ গৃহিণীও নহে—মাতৃভাব কুন্দে বড় পরিস্ফুট নয়। সূর্য্যমুখীর সন্তানাদি ছিল না বটে, কিন্তু মাতৃভাব তাঁহাতে সমধিক পরিস্ফুট। এই মাতৃভাব না থাকিলে তিনি নগেন্দ্রের অত বড় সংসারে লক্ষ্মী হইয়া বিরাজ করিতে পারিতেন না।

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া যখন আর কোথাও পাইলেন না, জানিলেন, সূর্য্যমুখী হরমণি বৈষ্ণবীর গৃহদাহে পুড়িয়া মরিয়াছেন, তখন হতাশচিত্তে গোবিন্দপুরে ফিরিবেন স্থির করিলেন। গোবিন্দপুরে তাঁহার আর বাস করিতে ইচ্ছা নাই, চিরজীবনের মত একবার তাহার নিকট বিদায় লইয়া যাইবেন—একবার সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে এককোঁটা চোখের জল ফেলিয়া সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিবেন। গৃহধর্ম্ম তাঁহার আর ভাল

লাগে না। শ্রীশচন্দ্রের সহিত কলিকাতায় নগেন্দ্র দেখা করিলেন। বিষয় কর্ম্মের বিলি ব্যবস্থা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কলিকাতায় আবশ্যকীয় কার্য্য শেষ করিয়া নগেন্দ্রনাথ গোবিন্দপুরে চলিলেন, শ্রীশচন্দ্র সপরিবারে গোবিন্দপুরে গিয়া বাড়ীঘর পরিষ্কার করাইয়া রাখিলেন। নগেন্দ্র গিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখী শোকে কাতর নগেন্দ্রনাথ কুন্দনন্দিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ বড় ব্যথিত হইল।

সেই দিন রাত্রিকালে নগেন্দ্রনাথ সূর্য্যমুখীর শয়নকক্ষে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার চারি দিকে ঘরের দেয়ালে দেয়ালে সূর্য্যমুখীর স্মৃতি। একস্থানে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন,

"১৯১০ সম্বৎসরে

ইষ্টদেবতা

স্বামীর স্থাপনা জন্য

এই মন্দির

তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী

কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।"

নগেন্দ্র এই লেখাটি অনেক বার পড়িলেন, তাঁহার আর আশ মিটে না—চোখের জল চোখে মুছিয়া তিনি পড়িতে লাগিলেন। ক্রমে দীপ নির্ব্বাণ হইয়া আসিল, আলোকের চিহ্নমাত্র রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। সেই অন্ধকারালোকে নগেন্দ্র একটি স্ত্রী রূপিণী ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিলেন—চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে তিনি দেখিলেন যে, তিনি যেন কাহার কোলে শয়ন করিয়া আছেন। তখনও ঘুমের ঘোর ছাড়ে নাই—কুন্দের নাম সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে। রমণী উত্তর করিলেন, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি এত সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।" নগেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিলেন—সূর্য্যমুখী। আর আনন্দের সীমা রহিল না—বাড়ীতে মঙ্গল শঙ্খধ্বনি বাজিয়া উঠিল। চারি দিকেই আনন্দ উল্লাস—সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসিয়াছেন।

এ দিকে সূর্য্যমুখী ও কমলমণি কুন্দকে দেখিতে আসিয়া দেখিলেন যে, কুন্দ বিষ পান করিয়াছে। কমল গিয়া তাড়াতাড়ি নগেন্দ্রকে ডাকিয়া আনিলেন। ডাক্তার আসিল, বৈদ্য আসিল, একে একে জবাব দিয়া চলিয়া গেল। কুন্দের আজ প্রথম মুখ ফুটিয়াছে। নগেন্দ্রকে বলিল, তোমাকে দেখিয়া মরিবার ইচ্ছা ছিল, সে সাধ পূর্ণ হইল, কিন্তু তোমাকে দেখিলে মরিতে আর ইচ্ছা হয় না। কুন্দের ধীরে ধীরে শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যমুখী

বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। কমলও অতিশয় কাতর। নগেন্দ্রনাথও রোরুদ্যমান। অনেক কষ্টে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া নগেন্দ্র কুন্দের যথাবিহিত সংকার করিলেন। শেষ দিন পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের হৃদয়ে এই দুর্ঘটনা জাগিয়াছিল।

কুন্দের মৃত্যুতে সূর্য্যমুখীর সকল শান্তি অবসান হইল। কুন্দকে তিনি আপনার কনিষ্ঠার ন্যায় স্নেহ করিতেন, কুন্দের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল। কুন্দও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভালবাসিত। আজ দুই জনের ভালবাসার মধ্যে অশ্রুজল মাত্র অবশেষ, আনন্দ সুখ শান্তি সকলই নির্ব্বাণ হইল। বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডিতে দাঁড়াইল।

['ভারতী ও বালক,' ফাল্গুন ১২৯৫]

রঙ্ ও ভাব

প্রকৃতিতে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে যেমন বিভিন্ন সুরের প্রাদুর্ভাব, সেইরূপ স্বতন্ত্র রঙেরও প্রাদুর্ভাব। বসন্তে, বর্ষায়, শরতে এক একটা নূতন রঙ্ প্রকৃতিতে আধিপত্য করে। আমাদের হৃদয়ের উপরেও তাহাদের প্রভাব সামান্য নহে। বিভিন্ন রঙে যেন স্বতন্ত্র ভাব লুকাইয়া আছে, সুরের মতন ধীরে ধীরে তাহারা প্রাণে আসিয়া আঘাত করে। আমাদের হৃদয়ে নূতন নূতন ভাবের বিকাশ হয়। প্রকৃতিতে ভাববিহীন রঙ্ নাই—রঙ্ মাত্রেরই সঙ্গে এক একটা ভাবের বিশেষ রকম যোগ আছে। উষার রঙে কেমন এক রকম বিমল পবিত্রতার ভাব—সে ভাবে সংসারের কলঙ্ক কোথাও স্পর্শ করে নাই ; সন্ধ্যার রঙে স্নেহমাখা শান্তিময় ভাব—প্রাণ যেন জুড়াইয়া যায় ; বাসন্তী রঙে ভাব ঢলঢল টলমল—প্রাণ বদ্ধ থাকিতে পারে না, বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে।

আমরা সাধারণতঃ ছয় ঋতুতে যে ছয় প্রকার বিভিন্ন রঙের প্রাদুর্ভাব দেখি, তাহা চম্পক, শ্যামল, গোলাপ, ধূসর, ধূসরে অন্ধকার, ঘনীভূত অন্ধকার। বসন্তেই চম্পকের বিশেষ প্রভাব। চম্পকের মত বসন্তের উথলিত হৃদয়। গ্রীষ্মে চারি দিক্ শ্যামলবর্ণ। প্রখর রবিতাপে সকলই দগ্ধ হইয়া যাইত, কেবল এই শ্যামল বর্ণেই তাহার যাহা কিছু স্নিগ্ধ ভাব। বৈশাখের রঙের সঙ্গে কাঁঠালী চাঁপার অনেকটা সাদৃশ্য অনুভব হয়। সে বিষয় বিস্তারিতরূপে এখন কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। প্রথম আষাঢ়ের রঙ্ গোলাপের মত নহে, কিন্তু বর্ষা ঘনাইয়া আসিলে টুক্‌টুকে গোলাপবর্ণ বেশ ফুটিয়া উঠে। শরতের সন্ধ্যার মত বর্ণ—যেন ছায়া ছায়া। ভাবেও সন্ধ্যার সঙ্গে শরতের বিশেষ সাদৃশ্য। হেমন্ত, শরৎ এবং শীতের সম্মিশ্রণ মাত্র। শীত অন্ধকার।

কিন্তু এই সকল রঙে কি কি বিশেষ বিশেষ ভাবের সমাবেশ হইয়াছে, বলা সহজ নহে। ঋতুবিশেষের ভাব দেখিয়া রঙের ভাব সম্বন্ধে কতকটা বলা যায় বটে, কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে নিঃসংশয়চিত্তে কিছু বলা যায় না। কারণ, প্রতি ঋতুতে ভাবের যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার মূলে শুধু রঙ্ নহে, সুর প্রভৃতিও বিদ্যমান। তবে রঙে সুরে মিল খায় বটে। সেই জন্য রঙের প্রভাব কতকটা বুঝিবার সুবিধা বলিতে হইবে।

বাসন্তী রঙে যেমন একটা অধীরতার ভাব আছে, বৈশাখী রঙে সেরূপ কিছু নাই। বাসন্তী সুরে গন্ধেও রঙের মতন অধীরতার ভাব পরিস্ফুট। বসন্তের পাখী, বসন্তের কবি এই অধীরতার গান গাহিয়া গাহিয়া ভগ্নকণ্ঠ। বৈশাখে সেই মলয়সমীরণ বহে বটে, সেই পাখীরাই গাহে বটে, কিন্তু ভিন্ন সুরে,—সে বসন্তের রাগিণী আর নাই। এ মলয়সমীরণ সে অধীর আকুলতা প্রকাশ করে না, এ বিহগকণ্ঠে সে ব্যাকুল বাসনা ব্যক্ত হয় না। বৈশাখী রঙেও অধীর ভাব নাই—বসন্তের মত ঔজ্জ্বল্য না থাকিলেও বৈশাখের রঙে স্নিগ্ধভাব অধিক। জ্যৈষ্ঠের রঙ্ বৈশাখ অপেক্ষা গাঢ়। কিন্তু গাঢ় হইলেও সে রঙের মধ্যে বৈশাখী মাধুরী নাই। তবে মোটামুটি গ্রীষ্মের রঙ্ কতকটা এক। অর্থাৎ অন্যান্য ঋতুর রঙের সঙ্গে তাহার রঙের ধরণে প্রভেদ লক্ষিত হয়।

বর্ষার গোলাপ চম্পক অপেক্ষা কিছু গম্ভীর রঙ্। বসন্তের চম্পক—বড় খোলাখুলি ভাব। চম্পক রঙে আপনার বাহিরে বিস্তৃতির একটা ভাব আছে; গোলাপ আপনার মধ্যেই থাকিতে চায়। চম্পক ছড়াইয়া পড়ে; গোলাপ গুটাইয়া আনে। রঙের কথায় আমরা যাহা বলিলাম, চম্পক ও গোলাপের সৌরভ সম্বন্ধেও তাহাই ঠিক খাটে। বর্ষার উষায় গ্রীষ্মকালের যুঁই বেলের শ্রীবিকাশ হয় না। কলঙ্কিত আকাশের নীচে নিষ্কলঙ্ক শুভ্র প্রাণের স্ফূর্ত্তি হইবে কেন? বসন্তে এ সকল শুভ্র কুসুমের তেমন সৌন্দর্য্য বিকশিত না হৌক্, শ্রীহানি হয় না। চম্পকের মত যদিও যুঁই বেল ছড়াইয়া পড়ে না, তত্রাচ ইহাতে যে ছড়াইয়া পড়ার ভাব আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ষার ফুল কদম্বের ভাব কিরূপ, এইখানে তুলনা করিয়া দেখা যাক। কদম্ব গোলাপ-গম্ভীর নহে। গোলাপ অপেক্ষা তাহার বিস্তৃতির ভাব আছে। তাই বলিয়া অবশ্য বাসন্তী বিস্তৃতির ভাব কদম্বে নাই। কদম্ব কতকটা আষাঢ়ের রঙ্—শ্রাবণের নহে। চম্পক একেবারে ছড়াইয়া পড়ে, কদম্ব আপনার আশপাশ পর্য্যন্ত, গোলাপ আপনা পর্য্যন্ত।

বর্ষার পর শরৎ—ভাদ্র, আশ্বিন। ভাদ্র মাসকে শরৎ বলিতে কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু আইনভঙ্গ না করিয়া তাহাই রাখিয়া দিলাম। বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায় সাধারণতঃ প্রথম মাসে কেমন একটি মাধুরী আছে; শরতে তাহা নাই। শরতের মাধুরী শেষে—আশ্বিনে। সে যাহা হৌক্, শরতের সান্ধ্য বর্ণে কি ভাবের বিশেষ প্রাদুর্ভাব, দেখা যাক্।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সন্ধ্যার সঙ্গে ভাবেও শরতের সাদৃশ্য আছে। শরতের রঙে কেমন একটি ম্লান ভাব, অথচ স্নেহমাখা বসন্তের অধীরতা নাই, বর্ষার গুমরিয়া থাকার ভাব নাই, শরতের ম্লানভাবে কি যেন নিষ্কাম পবিত্রতার ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। শরতের মুখশ্রী প্রকাশ করিতে পারে, শরতের শুকতারা।

হেমন্ত, শরৎ ও শীতের সম্মিশ্রণ—শরতের সন্ধ্যায় শীতের রজনীর ছায়া। হেমন্তকে দেখিলে মনে হয়, শরতের মৃত্যুতে বুঝি, বিলাপ গাহিতে আসিয়াছে। কিন্তু তাহার রঙে কি বিশেষ ভাবের প্রাধান্য, তাহা একেবারে ঠিক বলা যায় না। মোটামুটি মনে হয়, হেমন্তে জরজর ভাব খানিকটা আছে। কিন্তু এ ভাব শুধু বিরহিণীর, কি সাধারণ, সন্দেহ। সেই জন্য বলিতেছি, হেমন্তের বিষয় জোর করিয়া আমরা কিছু বলিতে পারি না।

শীতের ভাব সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ উঠিতে পারে; কিন্তু বর্ষার মত শীতের রঙেও যে গুটাইয়া আনার ভাব আছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ভিজা ভাবের অভাববশতঃ শীতের রঙে বর্ষার কোমলতা দেখা যায় না বটে, তথাপি দুয়ের রঙেই জড়াজড়ি জড়সড় ভাব আছে বলিতে হইবে। যাহা হৌক্, বর্ষা ও শীতের ভাবের আংশিক সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদ বিস্তর। সে সকলের এ স্থলে সবিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। রঙের উপর ভাবের পরিবর্ত্তন যে অনেকটা নির্ভর করে, তাহা দেখানই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। ['ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৫]

গোধূলি ও সন্ধ্যা

বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্যই যদি সৌন্দর্য্যের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে প্রকৃতির মত সুন্দরী কোথায়? প্রকৃতিতে প্রতি মুহূর্ত্তেই ভাবের পরিবর্ত্তন হইতেছে, কিন্তু তাহাতে শৃঙ্খলা এমনি যে, বিপ্লব অনুভব করা যায় না। যে রঙের পর যে রঙ্ মিলে, যে সুরের পর যে সুর শুনায় ভাল, যে ভাবের পর যে ভাব বসিলে উভয়েরই সৌন্দর্য্য সম্যক্ স্ফূর্ত্তি পায়, প্রকৃতিতে সকলই এইরূপ ভাবে সন্নিবিষ্ট। অশোভন জাঁকজমক তাহার কোথাও নাই—সর্ব্বত্রই শোভন গাম্ভীর্য্য আছে, সৌন্দর্য্য আছে। এই জন্যই প্রকৃতিতে লোকের অরুচি ধরে না।

সে যাহা হৌক্, প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যের মধ্যে যেখানে যেখানে সাদৃশ্য অনুভূত হয়, সেখানে বিভিন্ন ভাবের বৈসাদৃশ্য সহজে অনুভব করা যায় না। সাদৃশ্যে দুইটি বিভিন্ন ভাব অনেক সময় এক বলিয়া প্রতিভাত হয়। গোধূলি ও সন্ধ্যা এইরূপে প্রায় এক হইয়া

দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু ভাবের মিলন থাকিলেও ইহাদের মধ্যে প্রভেদও অনেক আছে। আমরা একে একে যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব।

গোধূলির রঙে সন্ধ্যার স্নেহময় ভাবের বিশেষ অভাব। তাহাতে একটা আরামের ভাব আছে বটে, কিন্তু সন্ধ্যার শান্তি নাই। গোধূলিতে কাজকর্ম্ম সমাপন হইল, সন্ধ্যায় বিশ্রাম আসিবে। গোধূলি নির্ব্বাণ হইয়া আসার অবস্থা, সন্ধ্যায় দীপ নির্ব্বাণ হইয়াছে—নির্ব্বাপিত দীপশিখায় একটি সূক্ষ্ম সিন্দূররেখা মাত্র অবশিষ্ট।

গোধূলি পুরাতনের মৃত্যু, সন্ধ্যা নূতন সৃষ্টি। গোধূলির অবসানের মধ্য হইতে সন্ধ্যার নূতন সৃষ্টির বিকাশ হয়। গোধূলির পরে একটা ছেদ পড়িয়াছে। সন্ধ্যা যেন অবসন্ন জগৎকে কোলে লইয়া ঘুম পাড়াইতেছে—গোধূলি অপেক্ষা সন্ধ্যায় গার্হস্থ্যের বিকাশ হইয়াছে। সন্ধ্যায় যেমন প্রাণ পূরিয়া উঠে, গোধূলিতে তেমন নহে। যোগীর চিত্তবৃত্তি প্রশান্ত হইয়া আসিতেছে, ইহাই গোধূলির ভাব; এখন তাঁহার সেই ভূমানন্দলাভস্পৃহা বড়ই বলবতী। সন্ধ্যায় প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে—যোগীর মুখে চোখে সেই আনন্দভাব দীপ্তি পাইতেছে। কিন্তু এ আনন্দে বড়ই স্থির ভাব। উষার আনন্দভাবের সহিত ইহার তফাৎ আছে।

গোধূলিতে গির্জ্জার ঘণ্টা বড় মধুর শুনায়, কিন্তু দেবমন্দিরের শঙ্খ ঘণ্টা সন্ধ্যাতেই জমে ভাল। শঙ্খের শব্দ গোধূলিতে নিতান্ত কেমন কেমন ঠেকে। গির্জ্জার ঘণ্টায় কি যেন গোধূলির রাগিণী শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাতেও ধীরে ধীরে থামিয়া আসার ভাব আছে। দেবমন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে বন্দনার গান শুনা যায়—হৃদয় হইতে ভগবানের নাম উঠিতেছে। গোধূলি হৃদয়কে কতকটা সংযত করিয়া আনে; সন্ধ্যায় সংযত হৃদয় সেই প্রেমময়ের ধ্যানে নিযুক্ত হয়।

পূরবী ঠিক সন্ধ্যার রাগিণী—পূরবীর মত সন্ধ্যার ভাব অন্য কোনও রাগিণীতে ব্যক্ত হয় না। যে দেশেরই অধিবাসী হৌক্ না কেন, পূরবী রাগিণীতে তাহার মনে সন্ধ্যার ভাব উদয় হইবেই। সন্ধ্যার অন্যান্য রাগিণী সন্ধ্যা খানিকটা জমিয়া না আসিলে, জমে না। পূরবী রাগিণীতে সন্ধ্যার উদয় ঠিক ধরা পড়িয়াছে। গোধূলি ও সন্ধ্যার সন্ধিস্থলে পূরবী।

উষার সহিত সন্ধ্যার যেমন একটা সাদৃশ্য আছে, সূর্য্য উঠিবার পর উষার সহিত গোধূলিরও সেইরূপ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে দুয়ের ভাবে যে বিশেষ মিলন আছে তাহা নহে, কিন্তু আকারগত সাদৃশ্য কতকটা আছে। কিন্তু সে কথা যাক্, গোধূলি ও সন্ধ্যার সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

গোধূলিতে বিবাহের ভাব বিশেষ ব্যক্ত; সন্ধ্যায় বিবাহ হইয়া গিয়াছে, বিবাহদিনের বর কন্যার লজ্জা-সঙ্কোচের ভাব সন্ধ্যায় ততটা নাই। গোধূলিতে মিলনটা তেমন এখনও হয় নাই, কিন্তু এ সেই তাহারই আয়োজন হইতেছে।

সন্ধ্যায় মন খুলিয়া সুখ আছে—যেন মনে হয়, আমার দুঃখ বুঝিবার কেহ আছে। সন্ধ্যার ভাবে আমরা কেমন শান্তি অনুভব করি। সন্ধ্যায় আমরা হৃদয়ের সাড়া পাই—তাই আমাদেরও হৃদয় উন্মুক্ত হয়। বাহিরের সুখ দুঃখ হইতে টানিয়া আনিয়া সন্ধ্যায় আমরা আপনাকে আপনাতে প্রতিষ্ঠিত করি। বাহির হইতে গৃহে আসিয়া জুড়াই।

গোধূলিতে মন খুলিয়া তেমন তৃপ্তি নাই—সন্ধ্যার মত গোধূলি আমাদের সুখ দুঃখ বুঝে না। গোধূলিতে অনেক ভাব আসিয়া জমে, কিন্তু তাহারা চাপা থাকিয়া যায়। গোধূলিতে ফুল ফুটে ফুটে, সন্ধ্যায় বিকশিত কুসুমের সৌরভ বিকীর্ণ হয়। সন্ধ্যা ভাবের বিকাশ—সন্ধ্যা না হইলে ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না।

সংক্ষেপতঃ গোধূলি স্থিতির দিকে গতি, সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্ব আয়োজন মাত্র। সন্ধ্যায় সব থিতাইয়া আসিয়াছে। সন্ধ্যা স্থিতি—শান্তি। ['ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৫]

অতির গতি

অনেক দিন অবধি মানবেরা অতির উপরে খড়্গহস্ত। অতির জালে সহসা কেহ পা ফেলিতে চাহে না। কিন্তু কুহকিনীর ছলনায় মানবেরা অনেক বার ঠকিয়াছে। এই জন্য গান বাঁধিয়া, বচন রচনা করিয়া তাহারা পথে পথে তাহার নামে নিন্দা গাহিয়া বেড়ায় যে, আর কেহ না ঠেকে। অনেক কাল পূর্ব্বে একটা গান রচিত হইয়াছিল,

"অতিদর্পে হতা লঙ্কা
অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্ব্বদ্ধঃ
সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্॥"

তাহার পরে এই সংস্কৃত কবিতার ভাবে আরও গান রচিত হইয়াছে। বাঙ্গলায়ও দুই চারিটা বচন পাওয়া যায়। যেমন,

"অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।"
"অতি বাড় বেড় না ঝড়ে প'ড়ে যাবে।"

সংস্কৃত কবিতার সহিত বাঙ্গলা বচন দুইটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে—আর এক পা যাইলেই যেন অনুবাদ হইয়া উঠে। বচন দুইটি ও শ্লোকটির ভাব একই—অতি কিছুই ভাল নয়। তবে সংস্কৃত কবিতায় উদাহরণগুলি রামায়ণ মহাভারত হইতে গৃহীত। বাঙ্গলায় তাঁতীকুল। তাঁতীকুলের অতিবুদ্ধি সম্বন্ধে একটা গল্প আছে যে, তাহারা উলুবনে সাঁতার দিয়াছিল।

ইংরাজী বচন "Too much of anything is bad" "সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্"এর অবিকল অনুবাদ। ইংরাজেরা অবশ্য সংস্কৃত পুঁথি খুলিয়া তর্জ্জমা করেন নাই, কিন্তু উভয়-দেশীয় লোকের মনেই এক ভাব আসিয়াছে বলিতে হইবে। ইহাতে মনে হয়, অতি সম্বন্ধে মানবজাতি একমত।

অতি লোভ, দর্প, দান, মান ছাড়া আরও আছে। অতিরূপসী কি অতিগৃহিণী হইলে কি ফল হয়, তাহারও শ্লোক আছে।

"অতি বড় রূপসী না পান বর
অতি বড় ঘরণী না পান ঘর।"

ইংরাজীতে ঠিক এইরূপ বচন আছে কি না জানি না, কিন্তু রূপসী সম্বন্ধে একটা আছে—

"A fair woman and a slashed gown
will find some nail in the way"
"ছেঁড়া-খোঁড়া শাড়ি আর সুন্দরী স্ত্রীলোক
ঘটাবেই পথমাঝে পেরেক-আটক।"

আরও একটা এই ভাবে আছে যে, অতি-রূপসী নির্ব্বুদ্ধি হয়, অতি-কালো অহঙ্কারী হয়, ইত্যাদি। মোটামুটি, অতির প্রতি কেহই সদয় নহে।

অতিবক্তারাও ফাঁক যান নাই। তাঁহারা "কথার ঢেঁকি—কাজে ছাই।" কিন্তু শুভাদৃষ্টবশতঃ ইহাঁদের হত হইবার সম্ভাবনা বিরল। তাহা ছাড়া ঘর বর পাইবারও আটক নাই। ইংরাজীতেও আছে,

"He who talks much must talk in vain"

লেখকেরা এরূপ বচনের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। অতিলেখক সম্বন্ধে কেহ বচন রচনা করে নাই। করিবেই বা কেন? বিড়্‌বিড়্ বক্তৃতায় লোকের কান ঝালা-পালা হইয়া উঠে, লেখায় ত আর তাহা হয় না। লেখা না পড়িলেই চলে, কিন্তু কাণে তুলা দিয়া রাখা সর্ব্বদা পোষায় না।

আর একটা বচনে অতিভক্তিকে বিশ্বাস করিতে বারণ। অতিভক্তিতে লোকে নাকি বড়ই গলিয়া যায়, তাই বচনটি সাবধান করিয়া দিতেছে,

"অতিভক্তি চোরের লক্ষণ।"

চোরকে যেমন কেহ বিশ্বাস করে না, অতিভক্তিকেও যেন সেইরূপ বিশ্বাস না করে। অতিভক্তির ছলনায় দেবতারাও মুগ্ধ হয়েন। মানুষ ত কোন্ ছার!

অতি কিছুই ভাল নয়। "More than enough is too much" প্রচুরের চেয়ে বেশী বেজায়। অতি সাজসজ্জা, অতি লোকজন, অতি আত্মীয়তা, কোনটাই কাজের নহে। আমাদের কথাই আছে,—"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

বেশী লোক থাকিলেই কাজ ভাল হয় না। বচন আছে—

"অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।"

ইংরাজীতেও আছে—"Too many cooks spoil the broth."

অতি ঘনিষ্ঠতা ভাল নয়। বচন আছে—"Too much familiarity breeds contempt."

বাঙ্গলায় ঠিক ইহা না থাক্, একটা আছে—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।"

অতি ছোটরাই অধিক দুষ্ট হয়। যাহারা বেগুনগাছে আঁকৃশী দেয়, তাহারাই খোঁড়াইয়া বড় হইতে চায়। প্রমাণ,

"যিৎনা ছোটা ইৎনা খোটা।"

সংস্কৃত পণ্ডিতেরা অতি ভোজন পর্য্যন্ত বারণ করিয়াছেন—"অতিভোজনম্ পরিহরণীয়ম্।"

অতি আওয়াজ ফক্কিকায়। ইংরাজী বচন আছে—"Empty vessels sound much."

অতিরিক্ত বেদনায় পর্ব্বত মূষিক প্রসব করিয়াছিল, তাহারও এক গল্প আছে।

পল্লীগ্রামের লোকেরা আজও বলিয়া থাকে, বেশী লেখাপড়া শিখিলে ছেলে বাঁচিবে না।

আমাদের রামশর্ম্মা অতির গতি বুঝিয়াই বলিয়াছিলেন, "যত হাসি তত কান্না।" সকলেই জানেন, হাসির ধমকে শেষ কালে পেটে বেদনা হয়।

কিছুই-নার জন্য কষ্ট অধিক। কথা আছে,—"Much ado about nothing."

বাঙ্গলা পঞ্জিকায় গোঁফের আত্যন্তিক অভাববিশিষ্ট পুরুষের মুখ দেখিয়া যাত্রা পর্য্যন্ত নিষেধ,—

"যদি দেখ মাকুন্দ চোপা।
এক পা না বেরিও বাপা॥"

এইরূপ ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত প্রভৃতি সকল ভাষাতেই অতির বিপক্ষে দুই দশটা বচন ও রাশি রাশি গল্প পাওয়া যায়। এই সকল বচন ও গল্প হইতে মানবের অতির প্রতি ঘৃণার ভাব স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। কিন্তু ঘৃণা করিলেও অতির হস্ত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। অতির মায়ায় সে এক এক বার সকলই ভুলিয়া যায়। তাহা না হইলে অনেক বৃথা ঝগড়াঝাঁটি, রক্তপাত, হিংসাদ্বেষ বাঁচিয়া যাইত।

অতির স্বাভাবিক গতি অধঃপাতের মুখে। সে গতির মধ্য হইতে স্বর্গের পথ বাহির করা অসম্ভব। সত্যের পথে, স্বর্গের পথে যাইতে হইলে নিয়ম মানিয়া চলিতে হইবে। কিন্তু নিয়মলঙ্ঘন করাই অতি-ত্ব। ['ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৫]

হাসি

পড়েছে রজত রেখা রক্তিম অধরে,
মরমের ভাষা যেন হয়েছে বিকাশ।
জ্যোছনার স্নেহ যেন গোলাপের পরে
ফুটায়ে দিতেছে তার সুষমা সুবাস।
কোন্ শুভ দিবসের চুম্বনের স্মৃতি
অধরের রাঙিমায় হয়েছে বিলীন ;
কোন্ সুখরজনীর চাঁদের কিরণ
অধর-পরশে এসে আপনা বিহীন।
দুইটি তরঙ্গ মাঝে শুভ্র রশ্মি রেখা,
তরঙ্গের গতি যেন গিয়াছে থামিয়া।
দু'টি সুখস্মৃতি যেন আপনা ভুলিয়া
সহসা অধর কোণে মিশেছে আসিয়া।
পড়েছে রজত রেখা রক্তিম অধরে
মরমের ভাষা যেন গিয়াছে গলিয়া।

['ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৬]

হিমে

হিমসিক্ত রজনীর তিমির বসনে
ঘুমায়ে পড়েছে দু'টি চাঁদের কিরণ,
পত্রহীন পুষ্পহীন শীতের পরশে
নিস্পন্দ অবশতনু তুষার মতন।
নীরবে ধরণীবুকে ঝরিছে শিশির,

বিলাপ গাহিয়া যায় নিশীথের বায়,
সাড়া নাই, শব্দ নাই, স্তব্ধ চারি দিক্,
হিম কলেবর দু'টি জড়ায়ে দোঁহায়।
মেদিনীর প্রাণ হ'তে উঠিছে নিশ্বাস,
মৃত্যুর অঞ্চল যেন পরশিয়া যায় ;
স্বপনে শিহরি' উঠে পৃথিবী আকাশ—
বিরহের ভয়ে যেন কণ্টকিত কায়।
চাঁদের কিরণ দু'টি তিমির শয্যায়
হিমক্লিষ্ট স্মৃতি রেখে ধীরে ম'রে যায়।

['ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৬]

মেঘদূত

কত দিন নীরবে হৃদয়ের জ্বালা বহন করিয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে তৃষিতনেত্রে বিরহী যখন নবীন মেঘপ্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া দেখে, তখন তাহার বিরহকাতর হৃদয়ে না জানি, কোন্ স্মৃতিময়ী মায়াপুরীর সুখদুঃখের কথা উদয় হয়। সারা বৎসরের মধ্যে আষাঢ়ের প্রথম মেঘে বিরহের এমন কি স্মৃতি আছে যে, এত দিন প্রবাসের তীব্র যন্ত্রণায় যাহার বিরহ সহিয়া আসিতেছি, আজ সহসা তাহার জন্য প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠে—আজই তাহার বিরহ অসহ্য বলিয়া বোধ হয়। কি আছে কে জানে, কিন্তু আষাঢ়ে বিরহকে কেহ উপেক্ষা করিতে পারে না ; প্রাবৃটের নবীন মেঘের সঙ্গে সঙ্গে বিরহীর হৃদয়েও প্রিয়-বিরহ জাগিয়া উঠে। বিরহিণীরা প্রিয়তমের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া পথপানে চাহিয়া থাকেন। প্রবাসক্লিষ্ট প্রিয়তমেরা প্রবাসের বিজন অরণ্যে বসিয়া মেঘকে বিরহিণীর নিকট সংবাদ লইয়া যাইতে বলেন। মেঘই বর্ষার বিরহে প্রাণ।

অন্য ঋতুর বিরহে দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু বর্ষায় দিন আর কাটে না। মুহূর্ত্তকে তখন যুগান্তর বলিয়া মনে হয়—বিরহের বন্ধনে সময় যেন গতিশক্তিহীন হইয়া পড়ে। কুবেরশাপে অভিশপ্ত যক্ষ তাই বুঝি, আষাঢ়ের প্রথম দিনে রামগিরিশিখরে শ্যাম মেঘ দেখিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না—তাহার মনে সম্মুখের দীর্ঘ বিরহদুঃখ উথলিয়া উঠিতেছে। এক বৎসর প্রবাসের কয় মাস মাত্র অতিবাহিত হইয়াছে, যক্ষের শরীর এমনি শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে যে, প্রকোষ্ঠ হইতে বলয় খসিয়া পড়ে। এই দীর্ঘ বর্ষা প্রিয়ার সংবাদ হইতে বঞ্চিত থাকিয়া সে জীবন ধারণ করিবে কিরূপে ? নবপল্লবসজ্জিত বসন্তের জ্যোৎস্নাময়ী নিশির

দারুণ বিরহও প্রণয়িনীর সংবাদ বিনা কাটান যায়; কারণ, মিলনেচ্ছার প্রভাবেই বিরহ তখন গুরুতর, তাহাতে বিভীষিকার ছায়া নাই; কিন্তু এই দীর্ঘ অন্ধকার বর্ষায় বিরহিণীর কথা হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকা অতীব দুরূহ। যক্ষের বুক ফাটিয়া যাইতেছে যে, বিরহিণী কান্তার এই দীর্ঘ কাল আশাপথ চাহিয়াই দিন কাটিবে, কিন্তু যক্ষ প্রবাস হইতে ফিরিতে পারিবে না।

চিরদিন প্রবাসের তাপ ভোগ করিতেও যক্ষ কাতর নহে, যদি এই বর্ষার সময় প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পায়। কিন্তু কি করিবে, কান্তাদর্শনস্পৃহা যতই বলবতী হৌক্ না, তাহাকে গুমরিয়া থাকিতে হইবে; কুবেরের অভিশাপ ব্যর্থ হইবার নহে। যক্ষ ভাবিল, দর্শনলাভ কপালে না ঘটে, এক বার মেঘের দ্বারা প্রিয়তমার নিকট সংবাদ প্রেরণ করি, তবুও তাহার ব্যথার কিছু উপশম হইবে। এই স্থির করিয়া যক্ষ একদিন মেঘকে দৌত্যকার্য্য করিবার জন্য ধরিয়া বসিল। মেঘ দূত হইল।

কালিদাসের মেঘদূতে ঘটনা এইটুকু। কুবেরের শাপে অভিশপ্ত একজন যক্ষ মেঘের দ্বারা কান্তার নিকটে সংবাদ পাঠাইতে চাহে। কিন্তু ঘটনা এইটুকু বলিয়া মেঘদূত উপেক্ষণীয় নহে। মেঘদূতে ঘটনার আর আবশ্যক নাই। কারণ, ইহা নাটক অথবা উপন্যাস নহে যে, বিরহনিশ্বাসের মর্ম্মস্পর্শিত্ব প্রকাশ করিবার জন্য অসংখ্য সখীর অশ্রুসিক্ত সান্ত্বনাবাক্যের সাহায্য লইতে হইবে। মেঘদূত গীতিকাব্য—কালিদাস ইহাতে বর্ষাকালে বিরহের প্রভাব দেখাইতেছেন। বাহ্য জগৎ অন্তরের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, ইহা দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য তাঁহার সফলও হইয়াছে। যক্ষের মুখ দিয়া তিনি মেঘকে যে কথা বলাইয়াছেন, তাহার ছত্রে ছত্রে বিরহ জ্বল্‌জ্বল্‌ করিতেছে। ভাবের সহিত সম্পর্কশূন্য একটি কথাও তাঁহার লেখনীমুখে বাহির হয় নাই। ভাবের ঠিক রাগিণী ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যের এত গৌরব।

কালিদাস অপেক্ষা মানব-চরিত্রাভিজ্ঞ গভীর চিন্তাশীল অনেক কবি আছেন স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু তাঁহার মত বিরহের কবি আর কেহ আছেন কি না সন্দেহ। তিনি যেন বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া আপনাকে প্রকাশ করিয়াছেন। বিরহ ঔৎসুক্যের কোন স্থানই তাঁহার অপরিজ্ঞাত নহে। কালিদাস বুঝিতেন, মেঘকে সংবাদ লইয়া যাইতে বলা সচেতন প্রাণীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে, কিন্তু জানিয়া শুনিয়াও যে তিনি মেঘকেই যক্ষের সংবাদবাহী ঠাহরাইয়াছেন, তাহার কারণ আছে। যক্ষ বিরহে এমনি কাতর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার চৈতন্যভ্রংশ হইয়াছে বলা যায়। যক্ষের কতকটা উন্মাদাবস্থা। তাই সে মেঘকে ধরিয়াছে—হে মেঘ, তুমি আমার সংবাদ লইয়া যাও। কাজটা বেহিসাবী সন্দেহ নাই, কিন্তু কালিদাস যক্ষকে পাকা হিসাবী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না। সেই জন্য এই বেহিসাবী কাজেই মেঘদূতের কবিত্ব।

মেঘদূত বিরহের কাব্য; এবং বোধ হয়, বিরহের শ্রেষ্ঠ কাব্য। জয়দেব বল, বিদ্যাপতি প্রভৃতি বল, বিরহজ্বালা অনেকেই প্রকাশ করিয়াছেন, প্রকাশ করিতে সক্ষমও হইয়াছেন; কিন্তু কালিদাসের মত সংক্ষেপে অথচ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বিরহীকে কেহ বাহির করিতে পারিয়াছেন বোধ হয় না। মেঘদূতের প্রথম গুটিকয়েক শ্লোকেই কালিদাস যক্ষের অবস্থা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অনেক কথা বলেন নাই বটে, কিন্তু এক একটি কথায় তাঁহার বলা হইয়াছে অনেক। যক্ষের শরীরের অবস্থা তিনি এক কথায় বলিয়াছেন—কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ। কনকবলয় কথাটিতে যক্ষ যে কুবেরের অনুচর, তাহাও ব্যক্ত হইয়াছে। পরের শ্লোকে তিনি মেঘ সন্দর্শনে বিরহীর মনের ভাব লিখিয়াছেন; আর, একটি বিশেষণে যক্ষের সমস্ত যন্ত্রণা প্রকাশ করিয়াছেন—অন্তর্বাষ্পঃ। তাহার পর যক্ষ যখন মেঘের স্তব করিতেছে, তখন বেশ বুঝা যায় যে, যক্ষ আপনার কাজ ভুলে নাই, এদিকে জ্ঞানহারা হইলেও কিরূপে আপনার কার্য্য উদ্ধার করিতে হয় জানে। মেঘকে সে কেমন গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতেছে, "যাঞ্চা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

যক্ষের অবস্থা সম্বন্ধে যাহা বলিবার, তাহা কালিদাস এইটুকুর মধ্যেই একরকম সব ব্যক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে যক্ষ মেঘকে অলকার পথের কথা বলিয়া দিতেছে, তাহা না হইলে প্রিয়ার নিকট সন্দেশ পঁহুছিবে কিরূপে? পথের বর্ণনার মধ্যে মধ্যে যক্ষের ভাব বেশ ধরা দেয়। সে বর্ণনা বিরহীর মতই হইয়াছে। বর্ষাও তাহার মধ্যে এমনি পরিস্ফুট যে, পড়িতে পড়িতে চোখের সম্মুখে কদম্ব ফুটিয়া উঠে, ধরণী হইতে বৃষ্টিবারিসিক্ত একপ্রকার স্নিগ্ধ গন্ধ বাহির হইতে থাকে, চারি দিকে আনন্দোৎফুল্ল ময়ূর ময়ূরী বর্ষার তালে তালে নাচিয়া উঠে। পথের বর্ণনা করিতে করিতে ফাঁক পাইলেই যক্ষ বিরহকাতরতা প্রকাশ করিয়াছে। অথবা, অজ্ঞাতসারে তাহার হৃদয়ের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে বোধ হয়। কিন্তু যাহাই হোক্, কালিদাস যক্ষকে বর্ণনার স্রোতের মধ্যেও বিরহী রাখিতে পারিয়াছেন, মেঘদূতের সকল বর্ণনার মধ্যেই বিরহের ভাবের বরাবর কেমন একটা স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

মেঘকে যক্ষ বলিতেছে, "কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং।" এখন কি আর তাহাকে উপেক্ষা করা যায়? তাহার পর বুঝাইতেছে—তুমি সংবাদ লইয়া যাও, অনুকূল বায়ু তোমার সহায় হইবে, চাতকেরা গান গাহিবে, কোন সুখেরই ত্রুটি হইবে না। যাও ভাই, তুমি গিয়া সেই দিবসগণনতৎপরা, কেবল আমার প্রত্যাগমনাশায় জীবিতা বিরহিণীকে সান্ত্বনা দাও; নহিলে সে কি আর বাঁচিবে? পথে, ঐ রঘুপতিপদাঙ্কিত শৈলকে আলিঙ্গন করিয়া তোমারও বিরহ-যাতনার উপশম হইবে। তাহার পর কত গিরি

উল্লঙ্ঘন করিয়া, কত সভ্রূভঙ্গ নদীর অধর পানে পরিতৃপ্ত হইয়া, উজ্জয়িনাতে উপস্থিত হইবে। উজ্জয়িনী না দর্শন করিলে জীবনই বৃথা। বিরহ-কৃশদেহ সিন্ধুর কার্শ্য ঘুচাইতেও চেষ্টার ত্রুটি করিবে না। যাও মেঘ, আরও যাও। রজনীতে সূচিভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধালোক রাজপথে বিদ্যুৎ প্রকাশ করিয়া প্রিয়ভবনাভিমুখগামিনী যোষিৎদিগকে তুমি পথ দেখাইয়া দিও, কিন্তু তোমার গম্ভীর গর্জ্জনে তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শন করিও না। যাও মেঘ, আরও যাও। যাও, হিমাচল ছাড়াইয়া, মানস-সরোবর পার হইয়া যাও। কৈলাসগিরিবক্ষে জ্যোৎস্নাময়ী অলকার রমণীয় শোভা দেখিয়া নয়ন সার্থক কর।

এইবারে যক্ষ অলকার বর্ণনা করিতেছে ; অলকা বিলাসের লীলাক্ষেত্র। না হইবেই বা কেন, ধনপতির অনুচরেরা বিলাসী হইবে না ত হইবে কে? কালিদাস যক্ষকে বরাবর এই বিলাসের লীলাক্ষেত্রজাত রাখিয়াছেন। যক্ষের কথায় বিলাসলালসা সুব্যক্ত। অলকার বর্ণনা পড়িলেই আমরা বুঝিতে পারি, কালিদাস যক্ষের মুখে যে সকল কথা বসাইয়াছেন, তাহা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে—তাঁহার যক্ষের চিত্র কত দূর নিখুঁৎ। যক্ষকে বিলাসপ্রিয় দেখিতে যাঁহারা কাতর, তাঁহারা কালিদাসকে দোষ দিতে পারেন। কিন্তু বুঝা উচিত, কালিদাস আদর্শ মনুষ্য খাড়া করিবার চেষ্টা করেন নাই, যক্ষের প্রকৃত চিত্র আঁকিয়াছেন মাত্র। আরও মনে রাখিতে হইবে, মেঘদূত কালিদাসের সৃষ্টি বটে, কিন্তু যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে।

বায়রণের চাইল্ড্ হ্যারল্ড্ একটি বিলাসীর চিত্র—বায়রণের নিজের সৃষ্টি। চাইল্ড হ্যারল্ডকে ইচ্ছা করিলে বায়রণ আর এক সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছাঁচে গড়িতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার তাহাতে আবশ্যক কি? তিনি ত বিলাসীই আঁকিতে চাহেন। শিব গড়িতে বানর গড়িলে কবি নিন্দার্হ সন্দেহ নাই, কিন্তু যেখানে বানর গড়াই উদ্দেশ্য, সেখানে নিন্দা কিসের? তবে উদ্দেশ্যের কেহ নিন্দা করেন, করুন—আমাদের কিছু বলিবার আবশ্যক নাই। কালিদাসের যক্ষ বিলাসপ্রিয় বটে, কিন্তু চাইল্ড হ্যারল্ডের মত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি নহে। আর এরূপ হইলেও কালিদাস যক্ষকে আপনার ইচ্ছানুরূপ ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতে পারেন না। কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যক্ষ তাঁহার সৃষ্টি নহে। তাঁহার নিকট আমরা যক্ষের প্রকৃত চিত্র দেখিবার আশা করি, যক্ষকে বাল্মীকি মুনির মত দেখিতে চাহি না।

মেঘদূতে ছন্দের কেমন একটি গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখা যায়। বর্ণনার সঙ্গে ছন্দের বেশ মিল খাইয়াছে। ছন্দের সঙ্গে, ভাবের সঙ্গে, কথার সঙ্গে এইরূপ প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছে বলিয়াই মেঘদূত এত উচ্চ অঙ্গের কাব্য। তাহাতে অনুপ্রাস আছে, কিন্তু অনুপ্রাসবাহুল্যে কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য্য ভাবের কোথাও হানি হয় নাই। এক কথার পাশাপাশি দুই বার ব্যবহার আছে, কিন্তু ভাব সুব্যক্ত হইয়াছে বৈ বিরক্তিকর পুনরুক্তি

কখনও হয় নাই। বর্ণনা যথেষ্ট আছে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি নাই ; যাহা আছে, তাহা স্বভাবের সুন্দর চিত্র। বাস্তবিক, মেঘদূত পড়িতে পড়িতে আষাঢ় মাস হইয়া আসে, আকাশে নবীন মেঘ দেখা দেয়।

আমাদের ইচ্ছা ছিল, মেঘদূত হইতে গুটিকতক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দি, কিন্তু কোন্‌টিকে রাখিয়া যে কোন্‌টি উঠাইয়া দিব, তাহা ঠাহরাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। অগত্যা এ কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল শ্লোক উদ্ধৃত করিতে না পারিলেও কালিদাসের ভাবপ্রকাশক কথানির্ব্বাচন-শক্তির পরিচয়স্বরূপ দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। উত্তরমেঘের প্রথমেই সঙ্গীতপূর্ণা অলকার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, "সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।" মৃদঙ্গ বাজিতেছে—তাহার শব্দ কিরূপ ? না, স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর। কথাগুলি এমনি বসিয়াছে যে, শুনিলেই মৃদঙ্গধ্বনি মনে পড়ে। যেন মেঘগর্জ্জন হইতেছে। রঘুবংশের প্রথম সর্গে দিলীপের রথের গম্ভীর নিনাদপ্রকাশক এইরূপ একটি শ্লোক আছে,—

"স্নিগ্ধগম্ভীরনির্ঘোষমেকং স্যন্দনমাশ্রিতৌ।
প্রাবৃষেণ্যং পয়োবাহং বিদ্যুদৈরাবতাবিব ॥"

এখানেও স্যন্দন কথাটিতে কালিদাসের ভাবপ্রকাশক শব্দনির্ব্বাচন-শক্তির যথেষ্ট প্রকাশ হইয়াছে। অন্য কোনও প্রতিশব্দ বোধ হয় এমন বসিত না। আর স্নিগ্ধ গম্ভীর নির্ঘোষের ভাবপ্রকাশত্বের ত কথাই নাই। সমস্ত শ্লোকটি গম্‌গম্ করিতেছে। পূর্ব্ব-মেঘে এক স্থানে আছে, "তন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধাগন্ধসম্পর্করম্যঃ।" ইহার মধ্যে বৃষ্টির ভাব কেমন জাগ্রত—কি যেন ঝম্‌ঝম্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্যন্দ ও উচ্ছ্বসিত, এই দুইটি কথা উঠাইয়া লইলে সমস্ত ভাবই যেন মারা যায়। নিষ্যন্দ শব্দে যেমন বৃষ্টির ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে, উচ্ছ্বসিত শব্দে সেইরূপ বসুধাগন্ধের ব্যাপ্তির ভাব অনুভব হয়। এইরূপ কালিদাসের ভাবপ্রকাশক শব্দনির্ব্বাচন-শক্তির পদে পদে পরিচয় পাওয়া যায় ; এবং বোধ হয়, এই ভাবময় শব্দনির্ব্বাচনের জন্য তাঁহার কাব্যে এত সৌন্দর্য্য।

যক্ষের অলকাবর্ণনা এমন পরিষ্কার যে, তাহার আলয় খুঁজিয়া লইতে মেঘের কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। তাহার পর যক্ষ বিরহিণীর বর্ণনা করিতেছে। সে বর্ণনায় কান্তার প্রতি যক্ষের প্রেম সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত। বাস্তবিক, সে বর্ণনা পড়িলে যক্ষের দুঃখে চোখের জলে বুক ভাসিয়া যায়। যক্ষ স্ত্রীর সৌন্দর্য্যের কথা বলিতেছে, "যা তত্র স্যাদ্‌যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।" কান্তার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়া যক্ষ বলিতেছে,—

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাং।

গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥"

মেঘদূতের এইখানকার শ্লোকগুলি বড়ই মধুর—ভাবপ্রকাশক। বিরহীর বেদনা এইখানে বড় চমৎকার ব্যক্ত হইয়াছে। যক্ষ মেঘের নিকট হৃদয় খুলিয়া সকল কথা বলিতেছে, কিছুমাত্র সে গোপন রাখিতে চাহে না। যক্ষ বলিতেছে, তুমি যখন অলকায় গিয়া উপস্থিত হইবে, তখন হয় ত দেখিবে, প্রিয়া আমার বিরহক্লশ চিত্র আঁকিতেছে, কিম্বা আমার মঙ্গলের জন্য দেবতার নিকট যুক্তকরে প্রার্থনা করিতেছে। হয় ত দেখিবে, মলিন-বসন উৎসঙ্গে বীণা রাখিয়া আমার নামসংযুক্ত কোনও পদ গাহিবার চেষ্টা করিতেছে, নেত্রনীরে বীণার তন্ত্রী আর্দ্র। হয় ত দেখিবে, উদয়গিরিপ্রান্তে কলামাত্রাবশিষ্ট চন্দ্রের মত তাহার দেহ বিরহে কৃশ হইয়া পড়িয়াছে, চোখের জলেই তাহার নিশিদিন কাটিয়া যায়। ভাই মেঘ! তুমি আমাকে বাচাল মনে করিতে পার, কিন্তু শীঘ্রই এ সকল তোমার প্রত্যক্ষ হইবে। দেখিবে, আমার বিরহে তাহার কি কষ্টে দিন কাটে।

প্রিয়াকে কিরূপে কি বলিতে হইবে, তাহাও যক্ষ বলিয়া দিল। মেঘ বলিবে, আমার দ্বারা তিনি বলিয়া দিয়াছেন,—

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতম্
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাম্ বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ কচিদপি ন তে চণ্ডি! সাদৃশ্যমস্তি ॥
ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্
আত্মানম্ তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥"

তোমার তুলনা কোথাও পাই না; চিত্র আঁকিয়া যে তোমার মিলনসুখ অনুভব করিব, তাহাতেও বাধা, চোখের জলে দৃষ্টি আবৃত হইয়া আসে। প্রিয়াকে সান্ত্বনাও আছে। হে কল্যাণি, তুমি নিতান্ত কাতর হইও না, চিরসুখী বা চিরদুঃখী সংসারে কেহই নয়। নয়ন মুদিয়া এই কয় মাস কাটাইয়া দাও,

"পশ্চাদাবাং বিরহগণিতং তং তমাত্মাভিলাষম্
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥"

জ্যোৎস্নাময়ী শারদীয়া নিশিতে আমাদের আবার মিলন হইবে।

কাব্যের শেষে যক্ষ মেঘকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে,—

"ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী-
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥"

যাও মেঘ, বর্ষায় সম্ভৃতশ্রী হইয়া অভিলষিত প্রদেশে বিচরণ কর, বিদ্যুতের সহিত তোমার যেন ক্ষণমাত্রও বিরহ না হয়। বিরহ-কাতরের হৃদয়ের আশীর্ব্বাদে মেঘদূত সমাপ্ত হইল। আমরা বিদায় গ্রহণ করি। প্রার্থনা এই যে, কালিদাসের সৌন্দর্য্যে আমাদের হৃদয় যে প্রতি দিন নূতন নূতন আনন্দ লাভ করিয়া তৃপ্ত হয়—তাঁহার সৌন্দর্য্য আমরা যেন দিনে দিনে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। ['ভারতী ও বালক,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৬]

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

কালসহকারে ভাষার পরিবর্ত্তন বুঝিতে গেলে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। প্রাচীন সাহিত্য পুরাতন কালের ভাবের ইতিহাস, সেই জন্য পুরাতনকে জানিতে হইলে পুরাতন সাহিত্যকে বিশেষ করিয়া জানিতে হয়। সে সময়ের সাহিত্য না জানিলে সে সময়ের লোকের অবস্থা সম্যক্ বুঝিয়া উঠা অসম্ভব, সেই পুরাতন ভাবের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে কিরূপে আমাদের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থা গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। সাহিত্য আমাদের অতীতের সহিত বর্ত্তমানের বন্ধনসূত্র—প্রাচীন সাহিত্য অতীতের ভাবের একমাত্র স্মৃতি। এই জন্য পুরাতন সাহিত্যের মধ্যে আমাদের গভীর আনন্দ আছে—পুরাতন সাহিত্যে কোথাও ভাবের মহত্ত্ব দেখিলে হৃদয় পূরিয়া উঠে, পুরাতন সাহিত্যে বর্ণনার সৌন্দর্য্য দেখিলে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, পুরাতনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর আমরা যেন ভাল করিয়া দাঁড়াইবার ভরসা পাই।

বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য ইংরাজী প্রভাবের পূর্ব্ব পর্য্যন্তই ধর্ত্তব্য। সে কালে বাঙ্গলায় গদ্য লেখা প্রচলিত ছিল না, পদ্যই সকলের বিদ্যা বুদ্ধি প্রকাশের একমাত্র উপায় ছিল। গদ্য কেবল কথাবার্ত্তায় এবং চিঠি পত্রে ব্যবহৃত হইত। সেই জন্য প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আর কিছুই নহে, কেবল কবিতা। কিন্তু যাহাই হৌক্, এই সকল প্রাচীন কবিতা হইতেই আমাদিগকে বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। এইগুলি ভাল করিয়া না দেখিলে আমরা বঙ্গসাহিত্যের উপরে কোন্ কোন্ ভাষার কিরূপ প্রভাব পড়িয়াছে—সম্পূর্ণরূপে বলিতে পারি না। এইগুলি বিশেষরূপে আলোচনা না করিলে বঙ্গসাহিত্যের প্রাণ কোথায়, তাহাও বুঝা যায় না। বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিতে

হইলে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য অধ্যয়ন করিতেই হইবে—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে অনেকে অশ্লীল বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন। প্রাচীন সাহিত্য অশ্লীল কি না, সে কথা পরে বিবেচনা করা যাইবে, আপাততঃ দেখা যাউক, বাঙ্গলার পুরাতন সাহিত্যে কোন্ রসের বিশেষ প্রাধান্য। এ বিষয়ে মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন, আমাদের প্রাচীন সাহিত্য আদিরসের আধার। আদিরসের আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই সমধিক আদর দেখা যায়—তখন বাঙ্গলা সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই, এ বাঙ্গালী জাতির তখন জন্ম হইয়াছে কি না সন্দেহ। জয়দেবের নাম উল্লেখ করিতে চাহি না, আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস আদিরসের দ্বারাই বিখ্যাত হইয়াছেন। তবে বঙ্গসাহিত্যই অশ্লীল হইয়া পড়িয়া থাকে কেন? কারণ অবশ্যই আছে, সে কারণ বিশেষ দূরও নহে—সে সময়ের বঙ্গসমাজের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা বুঝা যায়। সমাজের অবস্থা এত হীন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অশ্লীলতা বই আর কিছুতেই মন উঠিত না—ভাল জিনিসকে মন্দ করিয়া না লইলে তাহাতে আমোদ উপভোগ হয় না, দেবতাকে বানর করিয়া না গড়িলে মন প্রবোধ মানে না। শিবের প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি ইদানীং লক্ষ্মীছাড়া গঞ্জিকা-সেবকের অস্থিপঞ্জর হইয়া উঠিয়াছে—কৈলাসধাম হইয়াছে গঞ্জিকার প্রধান আড্ডা, রাজনীতিবিশারদ অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ছলনাপটু বংশীধর রমণীমোহনে পরিণত হইয়াছেন; মহত্ত্ব গাম্ভীর্য্য সুবিধামত ছিব্‌লামিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রথম কবিরা এই পরিণতির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহেন। তাঁহারা পূর্ব্বতন কবিদিগের নিকট হইতে এই আদর্শ পাইয়াছেন। তবে তাঁহারা ইহার উপর যেরূপ কবিত্ব ফলাইয়াছেন, সে জন্য তাঁহারা অবশ্য সম্পূর্ণ দায়ী। আরও একটি কথা। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বিলাসের সাহিত্য বটে, কিন্তু তাহা যে সব সময়ে অশ্লীল, তাহা বলা যায় না। সে কালের লোকের রুচি অনুসারেই সে কালের সাহিত্য হইয়াছে। তাহাতে বর্ত্তমান কালের রুচিবিরুদ্ধ যদি কিছু থাকে, তাহা হইলে তাহা মার্জ্জনীয়। অশ্লীলতা সাময়িক সমাজের ভদ্র নিয়মের ব্যভিচার মাত্র। বর্ত্তমান কালে কেহ যদি সে কালের রুচি অনুযায়ী বর্ণনা করিতে বসে, তবে তাহাকেই রীতিমত অশ্লীল বলা যায়। বঙ্গসাহিত্য অধ্যয়ন করিতে হইলে বর্ত্তমানের রুচিবিরুদ্ধ অনেক কথা পড়িতে হইবে। সে জন্য প্রাচীন কবিদিগকে বরতরফ করা চলে না; কারণ, তাঁহারা ভিন্ন প্রাচীন বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানের কত আদরের গ্রন্থও হয় ত ভবিষ্যতে রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কিন্তু সমাজ যেখানে রুচির জন্য দায়ী, সেখানে গ্রন্থকারকে দোষী করা যায় না।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে যে কেবলই আদিরস, অন্য রসের ঐকান্তিক অভাব, তাহা নহে। অন্যান্য রসের একেবারে অভাব হইলে এ সাহিত্য এত দিন টিঁকিত না। কিন্তু একটি জিনিসের বাঙ্গলায় অভাব আছে—বীররস। বীররস বাঙ্গলা সাহিত্যে যেখানে যেখানে বসিয়াছে, ভালরূপ ফুটিতে পায় নাই। তাহার কারণ, বীররস বাঙ্গালীর প্রাণের রস নহে। প্রাচীন সাহিত্যে বীররস মধ্যে মধ্যে মাথা উঁচু করিয়াছে বটে, কিন্তু জমাইতে পারে নাই—কতকগুলা ঢাল তলোয়ার, লাঠি শড়কি সংগ্রহ হইয়াছে মাত্র, তাহার অধিক কিছু নয়। তাহা মোদ্দা বাঙ্গালীর মত হইয়াছে। নব্য সাহিত্যে বিদেশ হইতে বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র, সেনা সেনাপতি আসিয়াছে, কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ বৈ আর অধিক কিছু করিতে হয় নাই। বন্ধুর গৃহ হইতে দুই চারিটা কামান বন্দুক ধার করিয়া আনিয়া শত্রুকে দেখাইবার জন্য গোটাকতক ফাঁকা আওয়াজ আর কি। আসল কথা, বাঙ্গলা সাহিত্যে বীররস অনেক সময় কোমল রসে ভিজান অথবা একেবারেই রসসম্পর্কশূন্য। বীররস আমাদের পক্ষে বিদেশীয়, অথচ তাহাকে আমরা স্বদেশীয় বলিয়া ধরিয়া লইতে চাই, সুতরাং ভয়ে ভয়ে একটা গোল বাধাইয়া বসি, ইহাতেই সহজে ধরা দি। এ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই; এইখানেই শেষ করা ভাল।

বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের মত এই যে, মৈথিলী হিন্দী হইতে তাহার জন্ম। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, কাশীরাম দাস প্রভৃতির লেখার সহিত বিদ্যাপতি প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন লেখকগণের রচনা তুলনা করিয়া তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিদ্যাপতির কবিতায় হিন্দীর বিশেষ প্রাদুর্ভাব বটে, তাঁহার সমসাময়িক চণ্ডীদাসের কবিতা তাঁহার অপেক্ষা বাঙ্গলা, কিন্তু তথাপি বাঙ্গলা ভাষা মৈথিলী হিন্দীজাত—এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না। চণ্ডীদাসের কবিতায়ও এমন কিছু আছে, যাহাতে বুঝা যায়, বাঙ্গলা হিন্দীজাত—একেবারে সংস্কৃতজাত নহে। সংস্কৃত বাঙ্গলা ভাষার পিতামহ অথবা প্রপিতামহ। বাঙ্গলা ভাষা অনেক পরিবর্ত্তনের ফল সন্দেহ নাই। সে কালের ভালরূপ ইতিহাসাভাবে এ বিষয়ে আমরা অধিক কথা বলিতে সমর্থ নয়, তবে বহুদর্শী চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের অনুসরণ করিয়া যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি বলিলাম।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ভাবের সাহিত্য এবং পাণ্ডিত্যের সাহিত্য। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের আমলে ভাবেরই প্রাধান্য ছিল, অক্ষরের বড় একটা ক্ষমতা ছিল না; ইদানীং ক্রমে ক্রমে ভাবের নদীতে চড়া পড়িয়াছে, পাণ্ডিত্যের অক্ষর-শাসনে ভাবের সে স্বাধীনতা নাই, ভাবকেও আইন কানুনে বদ্ধ হইতে হইয়াছে। ইদানীন্তন কবিতায় মাজাঘষা কথার বিলক্ষণ পারিপাট্য দেখা যায়, দোষ হয় ত প্রায়ই মিলে না, কিন্তু দুই ছত্রে কবির ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। রসিকতা অনেক সময়

কবিত্বের ছদ্মবেশে চুপিচাপি বসিয়া যায়, এবং গোঁফে চাড়া দিয়া আপনাকে অসাধারণ কবিত্ব বলিয়া প্রতিপন্ন করে। কিন্তু তাহা হইলেও শেষ প্রাচীন কবিদিগের নিকট বঙ্গসাহিত্য যে বিশেষ ঋণী, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহাদের কল্যাণে বাঙ্গলা ভাষার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে—বাঙ্গলা মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁহাদের সহস্র দোষ থাকিলেও নিগু'ণ তাঁহারা নহেন। কারণ, যেমন করিয়াই হোক্, তাঁহাদেরই পরিশ্রমের ফল আজিকার এই নবীন বঙ্গসাহিত্য।

বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা এত কথা বলিয়া আসিলাম, অথচ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের পরিপূর্ণ ধর্ম্মভাবের কথার উল্লেখ করা হইল না, ইহাতে অনেক পাঠক বিশেষ বিরক্ত হইবেন। আমাদের বিবেচনায় বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলা হয় নাই, কেবল কোটাকতক পুরাতন জানা কথা সংক্ষেপে পুনরুল্লিখিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু যাহাই হৌক্, বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্মের ভাব সম্বন্ধে আমাদিগকে দুই চারি কথা বলিতে হইবে। নহিলে ধর্ম্মতর্কমগ্ন বঙ্গদেশের ধর্ম্মসর্ব্বস্ব অযুত নরনারীর চক্ষে এ মর্ত্ত্য লেখকের অক্ষরবৃন্দ নাও পড়িতে পারে। বাঙ্গলা দেশের অনেক দুগ্ধপোষ্যও আজিকালি থুঁথু ফেলায় এবং মাথা চুলকানয় ধর্ম্মের মহিমা দেখিতে পায়। সে কালের সাহিত্যে ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল প্রভার উল্লেখ না করিলে লেখকের যে দুর্নাম রটিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? অনেকের মত এই যে, সে কালে যে কিছু সাহিত্য বাহির হইয়াছে, সকলই ধর্ম্মের জন্য—সকলেরই হৃদয়ে ধর্ম্মনদী অন্তঃসলিলা বহিতেছে। এ মত যে কত দূর অভ্রান্ত, বলিতে পারি না, কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, দুই চারিটা গণেশবন্দনা ও সরস্বতী-বন্দনার উপরেই ইহার প্রতিষ্ঠা। এখন দেখিতে হইবে, যে ভিত্তির উপরে এই মত প্রতিষ্ঠিত, সে ভিত্তি কিরূপ দৃঢ়।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে সংযুক্ত কতকগুলি পুঁথি আছে স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া কাব্যগ্রন্থ মাত্রই যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষ কোনও সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, তাহা বোধ হয় না। গণেশবন্দনা বা সরস্বতীবন্দনা সে কালের ফেসান ছিল বলা যাইতে পারে। এ কালেও এ ফেসান সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। কিন্তু এই বন্দনাটুকুর জোরে কবিবিশেষকে ধর্ম্মপ্রাণ অথবা সবন্দনা কাব্যগ্রন্থগুলিকে ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লইতে পারি না। আজকালের সাহিত্য অপেক্ষা সে কালের সাহিত্যে ধর্ম্ম বিশেষরূপ থাকিত, এরূপ কোনও প্রমাণ যত ক্ষণ না পাওয়া যায়, তত ক্ষণ প্রাচীন সাহিত্যকে কিছুতেই ধর্ম্মসাহিত্য বলা চলে না। ভারতচন্দ্র রায় তাঁহার গ্রন্থে শিব কর্ত্তৃক দক্ষযজ্ঞধ্বংস বর্ণনা করিয়াছেন, বিদ্যাপতি ঠাকুর রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব তাঁহাদের গ্রন্থের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম, এ কথার কোনও অর্থ নাই। যাঁহারা এ সকলের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গভীর আধ্যাত্মিক রূপক দেখিতে পান, তাঁহারা তাহাতে তৃপ্ত হউন, কিন্তু কবি যে বরাবর এক মহা আধ্যাত্মিক

উদ্দেশ্যের পশ্চাতে ছুটিয়াছেন, এ কথা সহজে বিশ্বাস হয় না। রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ পড়িয়া কেহ যদি বলেন, এ গ্রন্থের সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে, তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায়; কিন্তু প্রাচীনতা-মোহমুগ্ধের বর্ত্তমানবিদ্রূপী হাস্যের উপরে বিশ্বাস করিয়া বলা যায় না যে, সে কালের সাহিত্য ধর্ম্ম বৈ আর কিছু নয়।

তবে সে কালের সাহিত্য কি? এ কালের সাহিত্য যাহা, সে কালেরও তাই—তবে সে কালে গদ্য ছিল না, সে কালের সাহিত্য আগাগোড়া পদ্যে। সকল দেশের সাহিত্যই প্রায় প্রথমাবস্থায় পদ্য। সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ মহাভারতের পূর্ব্বে গদ্য ছিল না। গ্রীক-সাহিত্যে ইলিয়াদের পূর্ব্বে কোনও বিখ্যাত গদ্য গ্রন্থের ত কৈ, নাম শুনা যায় না; আর আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ত গদ্য আমদানি হয় নাই। ইংরাজ আসিবার কত পরে গদ্যে আমাদের হাতে খড়ি।

বাঙ্গলা সাহিত্যের আরম্ভ গীতিকাব্যে। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের রচনা তান লয়ে গাহিবার মত ছোট ছোট কবিতা। শুধু বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কেন, বসন্ত রায়, গোবিন্দদাস প্রভৃতি গীতিকাব্যরচয়িতা বাঙ্গলায় অনেক; প্রাচীন সাহিত্য ছাড়িয়া দিলে নব্য বঙ্গসাহিত্যেও গীতিকাব্যের অভাব নাই। বলিতে কি, বাঙ্গলা সাহিত্য একরকম গীতিকাব্য। নব্য সাহিত্যে নাটক, উপন্যাস, অন্যান্য জিনিস মিলে, কিন্তু বাঙ্গলায় পড়িবার মত গীতিকাব্য যত আছে, এত নাটকও নাই, উপন্যাসও নাই, এত কিছুই নাই। গীতিকাব্যে বাঙ্গলা সাহিত্যের আরম্ভ, গীতিকাব্যেই তাহার শ্রীবৃদ্ধি; জানি না, কালে হয় ত আরও কত সুমধুর সরস কবিতায় এই তরুণ সাহিত্য সুশোভিত হইবে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের উপরে জয়দেবের কিছু বিশেষ প্রভাব অনুভব হয়। জয়দেব বাঙ্গলা সাহিত্যের কবি নহেন বটে, কিন্তু তিনি বাঙ্গালী ছিলেন, এবং তাঁহাকে সংস্কৃতের শেষ কবি বলা যাইতে পারে। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরা এক হিসাবে তাঁহারই শিষ্য—অন্ততঃ তাহারা তাঁহার গীতগোবিন্দে মুগ্ধ। তাঁহাদের রচনায় জয়দেবের ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দদাসের পদাবলীতে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের ন্যায় জয়দেবেরও নামে একটি গান আছে। বিদ্যাপতির কথায় তিনি বলিয়াছেন, "যাক গীতে জগতচিত চোরায়ল।" আর চণ্ডীদাস "প্রেমধনেহি ধনী।" আর জয়দেব "রাধারমণ-চরিতরস বর্ণনে কবিকুলগুরু দ্বিজ দেব।" বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সমালোচনা আমাদের এখানে আবশ্যক নাই, কিন্তু গোবিন্দদাসের লেখা হইতে বৈষ্ণব কবিদিগের উপর জয়দেবের প্রভাব সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। জয়দেব বাঙ্গলা ভাষার আদি কবি না হৌন্, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাবের প্রথম কবি বটে। কিন্তু যাহাই হৌক্, সে কথার আলোচনা এখন থাক্। প্রাচীন সাহিত্য আমাদের বিষয়।

প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা বলিবার—বলা হইয়াছে। দেখা গেল, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল কবিতা, তাহার প্রধান রস আদি, গীতিকাব্যেই তাহার আরম্ভ, এবং সাময়িক সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সে কালের কবিদিগকে অশ্লীল বলা যায় না। পৌরাণিক অনেক মহচ্চরিত্রের বঙ্গসাহিত্যে অবনতি লক্ষিত হয় বটে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্য সে জন্য সম্পূর্ণ দায়ী নহে। তাহার কারণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর পুনরুল্লেখ আবশ্যক বোধ হয় না। বাঙ্গলা সাহিত্যে ধর্ম্মের সহিত বিশেষরূপে জড়িত কতকগুলি গ্রন্থ আছে, সে রূপ সকল সাহিত্যেই আছে, সে জন্য বঙ্গসাহিত্যকে বিশেষরূপে ধর্ম্মসাহিত্য বলাও যাইতে পারে না। এ সম্বন্ধে মোটামুটি আর অধিক কথা না বলিয়া বিশেষ বিশেষ কবির লেখা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাক্। এখন আমাদের কপালে অমৃতই উঠুক্, চাই গরলই উঠুক্, যাহা হয় ঘটিবে। ['ভারতী ও বালক,' আষাঢ় ১২৯৬]

অশ্রুজল

জীবনের সুখদুঃখের স্মৃতিতে মুখ লুকাইয়া এক বারও কাঁদে নাই, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। সকল মনুষ্যেরই হৃদয়তন্ত্রীতে এক একটি সুর কেমন লাগিয়া থাকে, সেই সুরে যে দিন আঘাত পড়ে, সেই দিন সহসা যেন তাহার জীবনে কি পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহার হৃদয়ের মর্ম্মে মর্ম্মে কি যেন তড়িৎস্রোত ছুটিয়া বেড়ায়; আপনাকে কোথায় যেন ধরিতে পাইয়া সে এক বার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, তাহার নয়ন বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিতে থাকে। কিন্তু কোন্‌খানে কবে কি আঘাত লাগিয়া তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে, সে কি তাহা বুঝিতে পারে? সে আপনার মনে কাঁদিয়া যায়—না কাঁদিয়া সে থাকিতে পারে না—কিন্তু তাহার সেই হৃদয়মথিত অশ্রুবিন্দুতে কত দিনের হয় ত গভীর সুখদুঃখের স্মৃতি আছে, সে তাহা জানেও না। প্রথম উচ্ছ্বাস যখন সংযত হইয়া আসে, তখন যদি সে ভাবিয়া দেখে, তবে হয় ত দেখিতে পায়, বিন্দুর মধ্যে হারাইয়া যাওয়া যায়, এমন কিছু আছে—সেখানে সকলই শূন্য নহে।

অশ্রুজল ত আর কিছু নহে, হৃদয়ের নীরব ভাষা। হৃদয় উথলিয়া উঠিয়া আপনাতে আর থাকিতে পারে না, বাহির হইয়া পড়ে। সুতরাং অশ্রুবিন্দুর মধ্যে হৃদয় কতখানি লুকাইয়া আছে বলিতে হইবে না। কিন্তু হৃদয়ের এই অশ্রুভাষায় কি ভাব ব্যক্ত হয়? হৃদয়ের ভাষা ত আরও আছে। নৈরাশ্যের বিজন কাননে যখন আত্মহারা দীর্ঘনিশ্বাস শিহরিয়া উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন সেও ত সেই হৃদয়ের ভাষা; আসন্ন নির্ব্বাণের বিবর্ণ অধরে যখন ক্ষীণ দীপশিখার মত একটি ম্লান অস্ফুট রজতসৌন্দর্য্য বিকশিয়া উঠে, তখন

সেও ত সেই অবসন্ন হৃদয়ের নীরব ভাষা। তাই বলিয়া এ সব ভাষাই ত আর সম্পূর্ণ এক নহে—ভাবের সাদৃশ্য থাকিতে পারে মাত্র, কিন্তু এক ভাব হওয়ার সম্ভাবনা বিরল। অশ্রুজলের মর্ম্মের ভাব দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অবশ্য এক নয়—বেশ একটু তফাৎ আছে।

নয়নে অশ্রু বহে কখন্? অভিমান, অনুতাপ, হৃদয়ের সুগভীর বেদনাতেই ত অশ্রুজলের উচ্ছ্বাস। আনন্দেও অশ্রু ঝরে। সুখের শুধু অশ্রু নাই। দীর্ঘনিশ্বাসও হৃদয়ের বেদনা-উচ্ছ্বাস। কিন্তু দুয়ের মধ্যে ভাবের তারতম্য কি? দীর্ঘনিশ্বাসে অতৃপ্তির ভাব কিছু বিশেষরূপে অভিব্যক্ত, অশ্রুজলে শান্তির ভাব। হৃদয় যখন ব্যথিত হইয়া আপনার মধ্যেই মিলাইয়া থাকিতে চায়, একা একা আপনার মধ্যে যখন সে অজ্ঞাতবাস করে, তখন তাহার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে দীর্ঘনিশ্বাস হাহাকার করিয়া মরে। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয়ের ভয়ানক অন্তর্দাহ হয়, হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। অশ্রুজলে এ দাবানলভাব নাই, হৃদয় যেন গলিয়া গিয়া অশ্রুরূপে ঝরিয়া যায়; বেদনার অনেকটা উপশম হয়। দীর্ঘনিশ্বাসে অশ্রুজলের এ তৃপ্তি কোথায়? হৃদয় গুমরিয়া গুমরিয়া প্রতি দিন অবসন্ন হইয়া আসে, প্রাণে যে শেল বিঁধিয়া থাকে, তাহার জ্বালা আরও বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সে শেল ঘুচে না। এই দীর্ঘনিশ্বাস যখন বুকে আসিয়া আটকাইয়া যায়, সহসা আসিতে আসিতে আর আসিতে পারে না, তখন লোকে উন্মাদ-হাসি হাসিয়া উঠে। তখন সে এক দারুণ যন্ত্রণার অবস্থা—ভাবিতে কল্পনা শিহরিয়া উঠে। সহসা উথলিত উচ্ছ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়া হৃদয় পাষাণের মত যেন হিম হইয়া যায়। অশ্রু যখন ঝরিতে পায় না, হৃদয়েই শুকাইয়া আসে, তখন উন্মাদ হাসি দেখা দেয় না, অধরে হাসি মিলাইয়া যায়—ম্লান, ক্ষীণ, নিভ নিভ। সে যাতনায় শান্তি আছে,—দীর্ঘনিশ্বাসের রৌদ্রতপ্ত মরুভূমি-ভাব নাই।

অভিমান যখন চোখের জল মুছিতে থাকে, তখন নৈরাশ্যের মধ্যেও কিছু আশা আছে। তখন অভিমানকে শান্ত করা যাইতে পারে, পুরাতন স্মৃতির উপর একটা আবরণ টানিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু অভিমানের চোখে যখন জল নাই, হৃদয়ে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়, তখন তাহাকে শান্ত করা দায়, তখন অবস্থা বড় ভাল নয়। অনুতাপও চোখের জল ফেলিলে ভরসা হয়, পুরাতন স্মৃতি ভুলিয়া এইবারে সে বুঝি নব উদ্যমে কাজে লাগে। আর অনুতাপের হৃদয়ে যখন কেবলই দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া উঠে, তখন স্মৃতির দংশনে দংশনে সে কাতর, তাহার অবস্থা মৃত্যুর সন্নিকট।

কিন্তু দুঃখের গভীরতা কোথায়—অশ্রুজলে, কি দীর্ঘনিশ্বাসে? এ কথা বলা কিছু কঠিন। দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যেও যেমন, অশ্রুজলের হৃদয়েও সেইরূপ দুঃখ লুকাইয়া থাকিতে পারে। স্বতন্ত্র ভাবের হৃদয়ে স্বতন্ত্র ভাবের উচ্ছ্বাস। তবে রুদ্ধপ্রবাহ, রুদ্ধ-উচ্ছ্বাস যন্ত্রণাই যে অধিক কষ্টদায়ক, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যেখানে হৃদয় বড়ই গভীর, সেখানে

উচ্ছ্বাস ততই কম বলিয়া উপলব্ধি হয়, যন্ত্রণাও সেখানে অধিক বলিয়া বোধ হয় না, কিন্তু বাস্তবিক সেখানে যন্ত্রণার অবসান নাই। লঘু হৃদয় সহজেই ঝরিয়া যায়, যন্ত্রণা সেখানে আঁকড়িয়া থাকিতে পারে না। গভীর দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাসে বড়ই কষ্ট—চোখে জল আসিলে কষ্টের কতকটা উপশম হয়।

দীর্ঘনিশ্বাসে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে—হৃদয়ের মধ্যে এমন একটা উলট্‌পালট্‌ হয় যে, কিছুই যেন ধরিয়া ছুঁইয়া পাওয়া যায় না। দীর্ঘনিশ্বাস সান্ত্বনা পায় না। অশ্রুজলে কতকটা তবু সান্ত্বনা আছে—আপনাকে ব্যক্ত করিয়া তৃপ্তি হয়। সমদুঃখীর নিকট কাঁদিয়া অনেক সময় সুখ আছে, কিন্তু দীর্ঘনিশ্বাস আপনার বাহিরে প্রায় বাহির হয় না। দীর্ঘনিশ্বাসে জীবন যেন বাহির হইতে চায়, কিন্তু পারে না, প্রতি উদ্যমে আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আছে।

অশ্রুজলে প্রেমের মধুর ভাবটি বড় পরিস্ফুট—নৈরাশ্য নয়, হাহাকার নয়, প্রেমের মধ্যে যে একটি পবিত্র সৌন্দর্য্য চিরবিকশিত, সেই ভাবটি। সে ভাবে উগ্র ভাবের একেবারে অভাব; তাহা বড়ই কোমল, মধুর, পবিত্র। তাহার তুলনায় দীর্ঘনিশ্বাসের কতকটা রৌদ্র ভাব বলা যাইতে পারে। অশ্রুজলের এই মধুর ভাবেই প্রধান সৌন্দর্য্য। এ ভাবে যতই ডুবা যায়, ততই তাহার গভীরতা উপলব্ধি হয়। সমস্ত জগৎকে আপনার মধ্যে আনিয়া আমরা এই ভাবে ডুবিয়া যাই; যত ডুবি, আপনাকে ততই ভুলিতে থাকি। এমন আত্মবিস্মৃতি আর কোথাও বুঝি নাই।

দীর্ঘনিশ্বাসে আপনাতে আর আপনি থাকি না, কিন্তু আপনাকে পাঁচ জনের মধ্যে হারাইয়া ফেলি না। দীর্ঘনিশ্বাসে আত্মহত্যা; অশ্রুজলে আত্মবিসর্জ্জন। দীর্ঘনিশ্বাসে হৃদয় ছারখার হইয়া গিয়াছে, প্রতীকারাশা বিরল; অশ্রুজলে হৃদয়ের মোহ ধুইয়া গিয়াছে, কিন্তু হৃদয় যায় নাই। অশ্রুজলে জগৎ ডুবিতে পারে; দীর্ঘনিশ্বাসের কাছে জগৎ ঘেঁসিতে পারে না—তাপ বড় প্রবল।

কিন্তু এ ছলনার সংসারে স্বর্গের অশ্রুজল ত প্রায় মিলে না। এখানে সকল বিষয়েই প্রতারণা আছে, হৃদয়ের ভাষায় ভাণ না থাকিবে কেন? হৃদয়হীন লোকে হৃদয় লইয়া উপহাস করে, হৃদয়ের বিরুদ্ধে সারি সারি শাণিত দন্ত ও নিষ্ঠুর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ খাড়া করিয়া দিয়া তামাসা দেখে। এই জন্য হৃদয়ের অশ্রুজল বিজন অরণ্যের শান্তিনিকেতনেই ঝরিয়া যায়। আর লোকালয়ে তার কণ্ঠস্ফীত বদন চোখ মিটিমিটি করিয়া দু'এক ফোঁটা নীরস জল বাহির করে; তাহার চারি দিকে পরহৃদয়ছিদ্রানুসন্ধিৎসুর আইনবদ্ধ বাহবাগুলি চাটুকারের মত ঘিরিয়া বসে, ইহাই তাহার অভিলাষ। কিন্তু যেমন লোকই হোক, তাহার হৃদয়ে স্বর্গের অশ্রুজল একদিন না একদিন দেখা দিবেই।

অশ্রুজলের মত আমাদের বন্ধু কেহ নাই। এই অসীম সংসারসমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত যাহা উঠে অশ্রুজল। দীর্ঘনিশ্বাসের তীব্র দংশন সেখানে নাই—সেখানে কি সুগভীর স্নেহ, শান্তিময় প্রেম! রোষে, ক্ষোভে, অভিমানে আমরা যখন আপনাকে ছাড়িয়া দি, তখন অশ্রুজল যদি দেখা না দেয়, তাহা হইলে প্রাণ কি বাঁচে? আমরা পদে পদে হৃদয়ে অনন্ত নরককুণ্ড রচনা করিতে বসি, কিন্তু এ সংসারে নাকি অশ্রুজল আজিও শুকায় নাই, তাই নরকযন্ত্রণার মধ্যে স্বর্গের সোপান দেখিয়া বিস্মিত হই। অশ্রুজলে যে কি পবিত্রতা আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

বুকে যাহার দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়া আছে, তাহার জীবন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার আশা ভরসা কিছুই নাই। অশ্রুজলে দলিত হৃদয় নবজীবন লাভ করে। অশ্রুজল সম্পদে সুখ, বিপদে বন্ধু, রোগে আরাম, শোকে শান্তি। অশ্রুধৌত হৃদয় ধ্রুবলোকের ছায়া।

হে অশ্রুজল! নিশ্বাস-শপ্ত হৃদয়ে তুমি চিরদিন শান্তি বর্ষণ কর, সেখান হইতে নির্ম্মম হাহাকার ঘুচিয়া যাক্। সংসারের শোক তাপ ভয়ে জরজর প্রাণে তুমি সেই অভয় পদের প্রতিষ্ঠা কর, ধরণীর পাপভার লঘু হৌক। তুমি এস, এই ক্ষুদ্র মানবশিশুর মলিন হৃদয়ে একবার এস, এ মরুভূমি ঘুচিয়া যাইবে। একবার শুধু এস, তুমি এস। ['ভারতী ও বালক,' শ্রাবণ ১২৯৬]

শ্রাবণের বারিধারা

ধরণীর সুগভীর অন্ধকারে আষাঢ়ান্তে মেঘাচ্ছন্ন হৃদয় ঢালিয়া দিয়া অন্ধকার আকাশ যখন বিরহ-নিশ্বসিত সুরে অবসাদ গাহিতে থাকে, তখন ঝরঝর ধারায় শ্রাবণের গভীর হৃদয় কোথায় ঝরিয়া যায়। প্রবহমান জীবনস্রোতে কি গম্ভীর ছায়া পড়ে, আপনার প্রবল আবর্ত্তের মধ্যে নিশিদিন ঘূর্ণ্যমান হইয়া জীবন যেন ফেনাইয়া উঠে। শ্রাবণের হৃদয় অবিরল ঝরিতে থাকে; গভীর হৃদয় একবার ঝরিতে আরম্ভ করিলে আর সহজে থামে না ত। আকাশে যতই মেঘ ঘনাইয়া আসে, বর্ষা ততই জমিয়া যায়, ধরণী মুখের উপর ঘন অন্ধকার অবগুণ্ঠন টানিয়া দিয়া স্তম্ভিতহৃদয়ে একাকিনী বিজনে বসিয়া থাকে। চারি দিকেই ক্রমাগত অন্ধকার ঘনীভূত হয়, সূর্য্যালোকে মেঘের ছায়া পড়ে, তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে অন্ধকারের উপর অন্ধকার যেন নৃত্য করিতে থাকে। এই অন্ধকারময় ভাবপ্রবাহের মধ্যে মানবের হৃদয়ও অন্ধকার না হইয়া কি থাকিতে পারে?

বর্ষায় আমাদের হৃদয় অন্ধকার হইয়া আসেই ত। অন্ধকার না হইলে শ্রাবণের বারিধারা কখনও কি উপভোগ করা যায়? অন্ধকারের সহিত তাহা যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে

আবদ্ধ। শ্রাবণের বর্ষণ আরম্ভ হইলে ভেকের মকমকধ্বনি চাই, পৃথিবী তমসাচ্ছন্না চাই, চাই অনেক জিনিস,—কিন্তু আলোক চাহি না, কোকিল পাপিয়ার দিগন্তব্যাপী আকুল স্বরলহরী চাহি না, আপনার মধ্যে থিতাইতে না দিয়া জগতে টানিয়া লইয়া যায়, এমন কিছু চাহি না। কোকিল কি শ্রাবণে ডাকে না? পাপিয়া কি চোখ গেল বলিয়া ভুলিয়াও বিলাপ করে না? শ্রাবণের বাদলেও দৈবাৎ বসন্তের পাখীর হৃদয়-বেদনা শুনা যায়। কিন্তু সে কিরূপ? প্রশান্ত হৃদয়েও এক এক সময়ে যেমন দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া উঠে। ঝমঝম বৃষ্টি পড়িতেছে, আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন, বসন্তের পাখী আর থাকিতে পারিল না, স্মৃতি-কাতর হৃদয়ে একবার বসন্তকে আহ্বান করিয়া গাহিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তাহার ভুল ভাঙ্গিল—দেখিল, সে বসন্ত নাই, বসন্তের সুরও তেমন জমে না।

শ্রাবণের বারিধারার ছন্দ স্বতন্ত্র কিনা, তাই শ্রাবণের ভাব পরিত্যাগ করা চলে না। অন্ধকারটুকু—এটুকু সেটুকু বাদ দিলে ছন্দ ভাঙ্গিয়া যায়। আবশ্যকমত একটি বিজলী না হানিলে, একবার মেঘগর্জ্জন না হইলে হয় ত কতখানি ভাবহানি হয়। শ্রাবণত্ববিহীন শ্রাবণধারা কি হইতে পারে? আর ছন্দ বল, ভাষা বল, ভাবপ্রকাশই ত সকলের উদ্দেশ্য। তাহা হইলে বক্তব্য ভাব যাহাতে ভালরূপ প্রকাশ করা যায় না, তাহা লইয়া কি হইবে? এই জন্য শ্রাবণের কোন-একটি-কিছু বাদ দিয়া তাহার বারিধারাটুকু উপভোগ করা যায় না। সমগ্র ভাবই তাহা হইলে বদলাইয়া যায়।

বারিধারা ত অন্যান্য মাসেরও আছে। আষাঢ়ে কি মেঘ বর্ষায় না? বৈশাখে জ্যৈষ্ঠেও ত বারিবর্ষণ হয়। তবে শ্রাবণের বারিধারাই বিখ্যাত কেন? ভাবের জন্যই না? শ্রাবণের বারিধারার ভাব আর কোথাও নাই—এমন সুন্দর, এমন গম্ভীর, এমন মধুর। আষাঢ়ের নবীন মেঘ বিখ্যাত, সে মেঘের শোভা আর কোন কালে দেখা যায় না। ভাদ্রের ভরাভাব তেমনি। কিন্তু বারিধারা শ্রাবণের। বর্ষায় অনেক সময় পাঁচ সাত দিন ধরিয়া টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ে, এক এক বার যেন বিরক্তি বোধ হয়। আর শ্রাবণের দিন নাই, রাত নাই, অবিশ্রান্ত ঝরঝর ঝরঝর—তাহাও কেমন ভাবে মধুর।

কিন্তু শ্রাবণের বারিধারায় বিশেষ ভাব কি? সংক্ষেপে বলিতে গেলে—গাম্ভীর্য্য। ভাদ্রের ভরা ভাবও ত সেই গাম্ভীর্য্য। কিন্তু ভাদ্রের সহিত শ্রাবণের গাম্ভীর্য্যে মূলগত প্রভেদ। শ্রাবণ-বর্ষণই কেমন গম্ভীর। ভাদ্রের তাহা নহে। শ্রাবণের বারিধারায় নদ নদী খাল বিল সব ভরিয়া উঠিয়াছে, সকলই কূলে কূলে পূর্ণ, তাই ভাদ্র ভরা। ভরা ভাদ্রের সূচনা শ্রাবণের জলধারায়।

শ্রাবণবর্ষণে মনের উপর কেমন একটা স্থির প্রভাব পড়ে, কিন্তু তথাপি মনের আকুলতা ঘুচে না। সদাই ভয় হয়, কোথায় যেন চিরবিরহ রচিত হইতেছে, কোথায় কে

যেন একেবারে হারাইয়া যাইতেছে। একটা কোন অনির্দ্দেশ্য বিভীষিকার পশ্চাতে মন যেন সারাক্ষণ ঘুরিয়া বেড়ায়। জানালা খুলিয়া একেলা আকাশের পানে তাকাইয়া থাক, বসিয়া বসিয়া সেই ঝম্‌ঝম্ ধারাপতন শব্দ শ্রবণ কর, মন যেন আপনার মধ্যে উদাস হইয়া বসিয়া আছে। বসন্তে মন যেমন আপনা হারাইয়া উদাস, এ তেমন নহে। এ আর এক ভাব।

কিন্তু শ্রাবণের বারিধারায় হৃদয় মুহুর্ম্মুহু চমকিয়া উঠে না। মন চমকিয়া উঠে বিজলীতে। তড়িল্লতায় সহসা যেন জীবনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে একটা আঘাত দিয়া যায়—কোথাকার কোন রহস্য বুঝি ব্যক্ত হইতেছিল, আর ব্যক্ত হইল না। শ্রাবণধারা নাকি বিজলীহীনা প্রায় হয় না, তাই ধারাসম্পাতে হৃদয় এক এক বার শিহরিয়া উঠে। গুরুগুরু মেঘগর্জ্জনে, চপলাচমকে শ্রাবণধারার সঙ্গত হইতে থাকে।

শ্রাবণের একটা কেমন ঝাপ্‌সা ভাব আছে। অবিশ্রান্ত ধারাসম্পাতে চারি দিক্ কেমন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ঠেকে। আষাঢ়ের মেঘ যখন বর্ষিত হইতে থাকে, তখনও চারি দিক্ ঝাপ্‌সা, কিন্তু সে ঝাপ্‌সায় একটা নবীন জ্যোতির স্ফূর্ত্তি দেখা যায়। শ্রাবণে আষাঢ়ের সে নবীন মেঘ আর নাই, মেঘের উপর মেঘ ঘনাইয়া অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়াছে, সুতরাং তাহার ঝাপ্‌সা ভাবে খানিকটা কালো ছায়া।

শ্রাবণের বারিধারায় কিন্তু আষাঢ়ের মত গল্প জমে না। তাহার কারণ বোধ হয়, শ্রাবণে আষাঢ়ের নব উৎসাহের ভাব অনেকটা ম্লান হইয়া পড়ে। আষাঢ়ে গল্প করিয়া করিয়া শ্রাবণে বিশ্রাম আবশ্যক হয়। আর প্রথম নবীন মেঘে যত গল্প আম্‌দানি হয়, আষাঢ়ান্তে তাহা প্রায় নিঃশেষিত হইয়া যায়। হৃদয়ের মধ্যে আষাঢ় জমিয়া জমিয়া একটা নূতন ভাব রাখিয়া যায়, শ্রাবণে সেই ভাবের বিশেষ বিকাশ। গল্পগুজব তখন কিছু কমিয়া আসে, তবে তাহার ঐকান্তিক অভাব অবশ্য হয় না। বর্ষার দিনে গল্পের অল্পবিস্তর স্ফূর্ত্তি হয়ই।

ঝর—শ্রাবণ ঝর। তোমার বারিধারায় যে গম্ভীর কাব্য রচিত হইতেছে, তাহা উপভোগ করিবার জন্য যক্ষ কিন্নর, দেব মানব তৃষিত নেত্রে চাহিয়া আছে। এক ফোঁটা বারিপতনশব্দ হইতে বঞ্চিত হইলে তোমার এ মহাকাব্যের ভাব বুঝি হারাইয়া যাইবে। তাই সকলে নীরব। তুমি শুধু ঝরিয়া যাও—তোমার ঝরঝরে বর্ষে বর্ষে এমনি নূতন নূতন কাব্য রচিত হোক্। আমরা সেই কাব্যের সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া একটু আনন্দ উপভোগ করি।

['ভারতী ও বালক,' শ্রাবণ ১২৯৬]

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস

বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। দুই জনে সমসাময়িক লোক ছিলেন, সমান বিষয় লইয়াই দুই জনের কবিতা—রাধা কৃষ্ণের মিলন বিরহ, মানাভিমান, পূর্ব্বরাগ অনুরাগ। কিন্তু বিষয় এক হইলেও দুই জন কবির ভাব অবশ্য সম্পূর্ণ এক নহে, দুই জনের বর্ণনার মধ্যে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। বিদ্যাপতি আপন হৃদয়ের মধ্য দিয়া রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন, আপন রুচি অনুযায়ী আঁকিয়াছেন, সাজাইয়াছেন; চণ্ডীদাসও নিজের মত করিয়া তাঁহাদিগকে গড়িয়াছেন, নিজের হৃদয়ের ভাব দিয়া তাঁহাদের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং হৃদয়ের একই ভাব বর্ণনা করিতে বসিলেও উভয় কবির বর্ণনা যে বিভিন্ন হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই। বিদ্যাপতিও রাধার রূপ খুলিয়া বসিয়া গিয়াছেন, চণ্ডীদাসও রাধার রূপের বর্ণনা করিয়াছেন; তাই বলিয়া দুই জনের রূপবর্ণনা কি একই রকম? দুই জনেই রাধার রূপের সুখ্যাতি করিয়াছেন, দুই জনেই রাধাকে সুন্দরী বলিয়াছেন, সে সুন্দরী বাঙ্গলাদেশের সুন্দরী—সেই কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ, সেই মৃগলোচন, সেই চন্দ্রবদন, কিন্তু তথাপি দুই জনের বর্ণনা কি তফাৎ! এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যাপতি, আর এক বর্ণনার মর্ম্মে মর্ম্মে চণ্ডীদাস। লেখার সহিত গ্রন্থকার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধে জড়িত।

শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাষারও বিস্তর প্রভেদ। বিদ্যাপতি হিন্দীর ধারে ধারে ফিরিয়াছেন, তাঁহার অনেক কথা স্পষ্ট হিন্দী; চণ্ডীদাস বাঙ্গালী, তাঁহার লেখায় হিন্দী বড় একটা জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই, তবে প্রাচীন বাঙ্গলার হিন্দীর সহিত সম্পর্ক আছে যে, ইহা বুঝা যায়। বিদ্যাপতি বাছিয়া বাছিয়া মধ্যে মধ্যে শ্রুতিমধুর কথা সংগ্রহ করেন, তাঁহার সাজসজ্জার একটু পারিপাট্য আছে; চণ্ডীদাস সাদাসিধা, ভাব আসিতেই হুহু করিয়া লিখিয়া যান, অন্য দিকে তাঁহার বড় একটা লক্ষ্য থাকে না। বিদ্যাপতি যেন কিছু গুছাইয়া বসিয়াছেন; চণ্ডীদাসের কোন দিকে খেয়াল নাই। কিন্তু সে যাহা হৌক, পাঠকেরা ভুল না বুঝেন যে, বিদ্যাপতি ভাবের অভাবেই পরিচয়স্থল। বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের ভাবে ভাষায় তফাৎ থাকিতে পারে, কিন্তু একজনের একেবারে ভাবের অভাব নাই। আর ভাবের স্বাতন্ত্র্যই যদি না থাকিবে, তবে দুই জন কবি বলা কেন?

বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। চণ্ডীদাসের কবিতায়

সর্ব্বত্রই প্রেমের বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। সুখের প্রতিই তাঁহার একমাত্র টান নহে। একটা উচ্চ ভাবের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য আছে—প্রেম আর মোহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ, তাহা তিনি জানেন। চণ্ডীদাস ত বলিয়াছেন,

"পিরীতি না কহে কথা।
পিরীতি লাগিয়া পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলায় তথা॥"

বাস্তবিক, প্রেম কি যেখানে সেখানে মিলে? প্রেমের দুয়ারে যে প্রাণ বলি দিতে পারে, সেই প্রেম পায়। আপনাকে প্রেমে ঢালিয়া দিতে হইবে, প্রেমে আর আপনায় স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। যাহারা সুখের জন্য প্রেম চাহে, তাহাদের কপালে সুখ উঠে না।

"সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঞি॥"

আমাদের বর্ত্তমান একজন কবিও তাহাই বলিয়াছেন, "এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।" চণ্ডীদাস পিরীতিকে সকল রসের সার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,

"পিরীতি রসের সার।
পিরীতি রসের রসিক নহিলে
কি ছার পরাণ তার॥"

বিদ্যাপতিও প্রেমের উপরে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু চণ্ডীদাসের মত উচ্চ ভাবের কথা তাঁহার মন্তব্যে পাওয়া যায় না। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন,

"প্রেম কারণ জীউ উপেখয়ে
জগজন কো নাহি জানে।"

প্রেমের জন্য জীবন উপেক্ষা করে, বিদ্যাপতি স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি চণ্ডীদাসের উপরি উদ্ধৃত কবিতায় প্রেমের মহান্ ভাব যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির লেখায় কি এ ভাব তেমন পরিস্ফুট হইয়াছে? চণ্ডীদাসের কথার ধরণে একটা সরল সুন্দর ভাব আছে, বিদ্যাপতিতে তাহা নাই। কিন্তু পাঠকেরা একেবারে হতাশ হইবেন না, বিদ্যাপতির দুই একটি গান যাহা আছে, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব, অন্য কোনও সাহিত্যে বোধ করি তেমনটি নাই।

চণ্ডীদাস প্রেমের জ্বালা বেশ বুঝেন, যাহারা জ্বালা সহিতে পারে না, তাহারা প্রেমের রাজ্যে বাস করিবার অযোগ্য। জ্বলনেই ত প্রেম, সুখের মাঝে কি প্রেম তেমন ফুটিতে পায়?

"দ্বিজ চণ্ডীদাসে বলে পিরীতি এমতি।
যার যত জ্বালা তার ততই পিরীতি ॥"

চণ্ডীদাস আর এক স্থলে বলিয়াছেন,

"সদা জ্বালা যার, তবে সে তাহার
মিলয়ে পিরীতি ধন।"

কিন্তু থাক্, শুধু শেষ দুই লাইনের মন্তব্যটুকু দেখিয়া দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় না। দুই জনের রূপ বর্ণনা, দুই জনের মিলন বিরহের ভাব প্রকাশ, দুই জনের উপমা অলঙ্কার, এ সকল বিশেষ করিয়া মিলাইয়া দেখিতে হইবে। তবেই না দুই জন কবির স্বাতন্ত্র্য সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম হইবে? চণ্ডীদাস যে প্রেমধনে ধনী, সে বিষয়ে আমাদের সংশয় না থাকিতে পারে, কিন্তু আরও কিছু না বলিলে—আরও ভাল করিয়া বিদ্যাপতির রচনার সহিত তাঁহার লেখার তুলনা না করিলে আমরা দুই জন কবির প্রাণ ধরিতে পারি না।

চণ্ডীদাসকে বিদ্যাপতির সহিত তুলনায় আমরা দুঃখের কবি বলিতে পারি। চণ্ডীদাস যে তাঁহার লেখায় অনবরত দুঃখের কথা পাড়িয়াছেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার রচনায়, হয় ত অজ্ঞাতসারে, কেমন একটা দুঃখের ভাব প্রবেশ করিয়াছে। লেখা দেখিয়া মনে হয়, কবির জীবনে তেমন সুখের প্রসাদ লাভ ঘটে নাই। প্রাচীন কবিদিগের সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে আমরা কিছু বলিতে পারি না, যেখানে পণ্ডিতদিগেরই পদস্খলন সম্ভাবনার অসদ্ভাব নাই, সেখানে আমরা জোর করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করি কিরূপে? কিন্তু সম্ভব বলিয়া বোধ হয়, চণ্ডীদাসের জীবনে দুঃখকষ্টের বিশেষ প্রভাব পড়িয়াছে। মোদ্দা তাহা হৌক্ বা না হৌক্, তাঁহার হৃদয় দুঃখভাবসিক্ত ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আপাততঃ সে কথা লইয়া তর্ক করিতে বসিবার আবশ্যক দেখি না। কথাটায় তর্কের বিশেষ কিছু নাইও।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস উভয়েই শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ রাধার রূপে হৃদয় হারাইয়াছেন, রাধার সৌন্দর্য্যে কোনও পবিত্র মহান্ ভাবের বিকাশ দেখিয়া নহে, রাধার রাঙ্গা অধরে, নলিন-নয়নেই তিনি আকৃষ্ট। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—যদি ইহাকেও প্রেম বলিতে হয়!—রূপজ মোহ মাত্র। অতীন্দ্রিয় ভাবের এখানে সম্পূর্ণ অভাব। এ প্রেম যৌবনের জোয়ারেই টিঁকিয়া থাকে, তাহার পর যৌবনাবসানে মরিয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ গুণের অথবা উচ্চ ভাবের ধার দিয়াও যান নাই। ভোগলালসাপরিতৃপ্তি বৈ তাঁহার অপর কোনও উদ্দেশ্য দেখা যায় না। এখন দেখিতে হইবে, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ রাধার সৌন্দর্য্য কিরূপ দেখিয়াছেন।

বিদ্যাপতির শ্রীকৃষ্ণ রাধার বাহ্য সৌন্দর্য্য বৈ কিছুই দেখেন নাই। তিনি রাধার প্রত্যেক অঙ্গ স্বতন্ত্র ভাবে দেখিয়াছেন—অধরের রাঙিমা, নয়নের চাহনি, চরণের গজেন্দ্রগমন। রাধা হাসিয়া কথা বলিতেছেন, সে হাসির সৌন্দর্য্য কিরূপ? না, শরৎ-পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বর্ষণ করিতেছে। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার সকল বাহ্য সৌন্দর্য্য এক করিয়া মোটামুটি ভাবে প্রায় দেখেন নাই। কেবল দু'এক জায়গায় রাধাকে এক করিয়া দেখিয়াছেন মাত্র। সেখানে রাধার সহিত নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের তুলনা করিয়াছেন। অন্য উপমাও এক আধটি আছে। কিন্তু সকল উপমাগুলিই রাধার বাহিরের জিনিষে—তা' চন্দ্রেই হৌক্, বিদ্যুতেই হৌক্, আর যাহাতেই হৌক্। শ্রীকৃষ্ণের উপর সে সৌন্দর্য্যের প্রভাব একটি শ্লোকে বেশ ভাল করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। সে শ্লোকটি,

"সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘ মালা সঞে তড়িত লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥" ইত্যাদি।

চণ্ডীদাসের কৃষ্ণও রাধার বাহ্যসৌন্দর্য্য-মুগ্ধ। তিনিও রাধার বদনকমল, হরিণনয়ন দেখিয়াছেন। কিন্তু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ বিদ্যাপতির কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধাকে দেখিয়াছেন ভাল করিয়া। বিদ্যাপতির কৃষ্ণ রাধার তাঁহার প্রতি লক্ষ্যই অধিক নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, সমস্ত রাধাকে দেখিবার—তেমন বিশেষ করিয়া দেখিবার—তাঁহার সুবিধা হইয়া উঠে নাই, কিন্তু খানিকটা রাধাকে তিনি বেশ করিয়া দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ রাধার আড়নয়নে ঈষৎ হাসি লক্ষ্য করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত রাধাকে—আপাদমস্তক—তিনি দেখিতে ভুলেন নাই। রাধাকে ভাগে ভাগে অঙ্গে অঙ্গে ছাড়া এক করিয়াও তিনি অনেকটা দেখিয়াছেন। বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস রাধার মধ্য হইতে দেখিয়া তুলনা দিয়াছেন। যেমন,

"হিয়ার মালা, যৌবনের ডালা,
পসারী পসারল যেন॥"

এখন এই পূর্ব্বরাগে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কিরূপভাবের রাধাকে দেখিয়াছেন, দেখিতে হইবে। দুই জনের রাধাই হাবভাবশূন্যা নহেন। কিন্তু বিদ্যাপতির রাধা ফিকির কৌশলে দক্ষা অধিক। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ দেখিয়াছেন, রাধার হাসির চাহনি পর্য্যন্ত। কিন্তু বিদ্যাপতির কৃষ্ণ দেখিয়াছেন আরও ঢের। রাধা হাসিয়া তাঁহার পানে ফিরিয়া দেখেন, দূরে গিয়া সখীদিগের ডাকিবার ছলে শ্রীকৃষ্ণের পানে চাহিয়া লয়েন, ইত্যাদি। শুধু ইহাই নহে, মুক্তাহার ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সখীদিগকে মুক্তা কুড়াইতে বলেন, এই অবসরে তাঁহার শ্যামদর্শন হয়। এ রাধা চণ্ডীদাসের রাধা অপেক্ষা পাকা। চণ্ডীদাসের রাধার এতটা কৈ ত শুনা যায় না।

কিন্তু শুধু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের উপর নির্ভর করিয়া রাধা সম্বন্ধে এত কথা বলা কি ভাল দেখায়? নায়িকার পূর্ব্বরাগটাও মনোযোগ সহকারে দেখা আবশ্যক। রাধিকা সুন্দরীও ত শ্রীকৃষ্ণে মজগুল। বিদ্যাপতির রাধিকা, চণ্ডীদাসের রাধিকা, দুই জনেই শ্যামের রূপে মুগ্ধ, দুই জনেই বংশীধরের বাঁশীর সুরে আকুল। কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার কথায় এই আকুলতা যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির রাধায় তেমন হয় নাই। বিদ্যাপতির রাধা সখীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর কথা বলিতেছেন,

"কি কহব রে সখি ইহ দুঃখওর।
বাঁশী নিশাস গরলে তনু ভোর॥
হঠ সঞে পৈঠয়ে শ্রবণক মাঝ।
তৈখনে বিগলিত তনু মনোলাজ॥" ইত্যাদি।

আর চণ্ডীদাসের রাধিকা? এক কথায় তাঁহার সব বলা হইয়াছে—"বাঁশী কেন বলে রাধা রাধা?" তাই ত, এত নাম থাকিতে বাঁশীতে রাধানামই বাজে কেন? রাধাপেক্ষা কি সংসারে আর মিষ্ট নাম নাই? তাহা ত নয়, নাম ত ঢের আছে। কিন্তু—কিন্তু মাধবের নিকট রাধা বৈ আর নাম নাই। তাই না? তাহা নয় ত কি।

বিদ্যাপতির কবিতায় অনেক কথা বলিয়া একটি ভাব প্রকাশ হইয়াছে, চণ্ডীদাস ভাবটুকু ছুঁইয়া গেছেন মাত্র। আর যেখানে অনেক কথা তিনি বলিয়াছেন, সেখানে ভাবেরও প্রায় বিস্তৃতি লক্ষিত হয়। এই আকুলতার ভাবপ্রকাশক তাঁহার একটি গান আছে। তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দি। পাঠকেরা শুনিলেই বুঝিতে পারিবেন, এ গান মর্ম্ম বিঁধিয়া উঠিয়াছে কি না।

"সই কে বা শুনাইল শ্যামনাম।
কাণের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥
না জানি কতেক মধু,
শ্যামনামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে?
নামপরতাপে যার
ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কি বা হয়?

যেখানে বসতি তার, নয়নে দেখিয়া গো,
যুবতীধরম কৈছে রয় ?
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো,
কি করিব, কি হবে উপায় ?
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে, কুলবতী কুল নাশে,
আপনার যৌবন যাচায় ॥"

এ আকুলতা, হাসি বাঁশী বাদ দিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের নায়িকার পূর্ব্বরাগে নায়কের যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহা দেখিলেও বুঝা যায়, বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস কত উচ্চদরের কবি। বিদ্যাপতির বর্ণনায় কেমন যেন একটা ভাবের আঁটাআঁটি আছে বলিয়া বোধ হয়। সব সময়ে ভাবগুলি যেন আপনি আসে নাই—বিদ্যাপতির সংস্কৃত সাহিত্যে দখল ছিল বলিয়া আসিয়া গিয়াছে। চণ্ডীদাসে ভাবের কি স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি! হৃদয়ের কি স্বতঃ উচ্ছ্বাস! লেখনী হস্তে কড়িকাষ্ঠের পানে চাহিয়া তাঁহাকে ভাবিতে হয় নাই। তিনি জ্যোৎস্নাকে চাহিলেন, তাঁহার সম্মুখের কাগজের উপর জ্যোৎস্না ফুটিয়া পড়িল। তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে কোটি যুগ চাহিলেন, তাঁহার কৃষ্ণের অঙ্গুলি-উপরে যুগযুগান্তর প্রতিবিম্বিত হইল। বিদ্যাপতি অধরের রাঙিমা, বদনের ছাঁদটি লইয়াই প্রায় সন্তুষ্ট। চণ্ডীদাস অধরের রাঙিমায় ডুবিতে চাহেন, অধরের হৃদয়ে বসিয়া তাঁহাকে চুম্বনের সুখ অনুভব করিতে হইবে। বিদ্যাপতি বলিলেন, মুখখানি ত বেশ, চাঁদই বা লাগে কোথায় ? চণ্ডীদাস বলিবেন, তাহা ত বটেই, কিন্তু শুধু তাহা দেখিয়া কি ফল, একবার চাঁদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখ—দেখিবে, চন্দ্র নিংড়াইয়া যে সারের সার বাহির হইবে, ঐ মুখখানি তাহা দিয়া গঠিত। বিদ্যাপতি দূরে দাঁড়াইয়া বলিলেন ; চণ্ডীদাস আপনাকে সেই সৌন্দর্য্যে হারাইয়া বলিলেন।

পাঠকেরা এত ক্ষণ মনে করিতেছেন, চণ্ডীদাসের দিকে আমরা কিছু ঢলিয়া পড়িয়াছি, নহিলে বিদ্যাপতির বিরহবর্ণনার এখনও উল্লেখ করা হইল না কেন। আমরা একেবারে কাহারও দিকে ঢলিয়া পড়ি নাই, তবে ক্রমে ক্রমে সকল কথা বলিব, একেবারে চারি দিক্ লইয়া আলোচনার বিশেষ সুবিধা বোধ হয় না। বিদ্যাপতির বিরহ ছাড়িবার জিনিস নহে। তাঁহার বিরহের কতকগুলি গান বড়ই চমৎকার ভাবময়। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন,

"সজল নয়ান করি, পিয়া পথ হেরি হেরি
তিল এক হয় যুগ চারি।"

প্রিয়তমের পথ চাহিয়া দিন আর কাটে না। সময় ত আগেকার মতই চলিয়াছে, আগেকার মতই দিন আসে যায়, কিন্তু রাধার কত যুগ কাটিয়া গেল। পথ পানে চাহিয়া থাকিলে কি তবে যুগ যুগ কাটিয়া যায়? যায় বৈ কি। দিন হুহু করিয়া চলিয়া যায়, তবু দিন ফুরায় না। রাধারও তিলে তিলে যুগ কাটিয়া যাইতেছে, তাই তাঁহার দিন কাটিতেছে না। আর এই দিন কাটে না বলিয়াই তাঁহার সজল নয়ান। রাধার "তিল এক হয় যুগ চারি।"

রাধা যে শুধু সজল নয়নে পথ চাহিয়াই থাকেন, তাহা নহে। বিরহের মধ্যে অভিশাপ লাগিয়া আছে। কিন্তু অভিশাপ কাহাকে? কালকে বুঝি? কালকে হইলে ত রক্ষা ছিল, কিন্তু রাধা কালকেই বিরহের কারণ ঠাহরান নাই, তাঁহার লক্ষ্য সচেতন পদার্থে। রাধার অভিশাপ শুনিলেই তাহা বুঝা যায়।

"নারীর দীর্ঘ নিশ্বাস, পড়ুক তাহার পাশ
পিয়া মোর যার পাশ বৈসে।"

তাহার পাশে এই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ুক। এ কি সহজ কথা! তাহার বুকে শেল বিঁধাইয়া দিলে বুঝি প্রাণের আশ মিটে না, দীর্ঘনিশ্বাসে তাহার কোমল হৃদয় খাক্ হইয়া যাক্—সে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরুক্। রাধা, রাধা, তুমি তাহার হৃদয়ে ছুরিকা বিঁধাইয়া দাও, তাহার হৃদয়ের শোণিতে তোমার বিরহজ্বালার উপশম কর, কিন্তু এ অভিশাপ দিও না গো। এ অভিশাপ তাহাকে—কাহাকে কে জানে?—তাহাকে দিও না।

চণ্ডীদাসের রাধাও আগেভাগে অভিসম্পাত করিয়া বসেন। কিন্তু তাঁহার আবার এ রোগ কেন? কারণ অবশ্যই আছে।

"সই কেমনে ধরিব হিয়া?
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায়
আমার আঙ্গিনা দিয়া!
সে বঁধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া,
এমতি করিল কে?
আমার অন্তর যেমন করিছে,
তেমতি হউক সে॥
যাহার লাগিয়া সব তেয়াগিনু,
লোকে অপযশ কয়।
সেই গুণনিধি, ছাড়িয়া পিরীতি,
আর জানি কার হয়?

আপনা আপনি, মন বুঝাইতে,
পরতীত নাহি হয়।
পরের পরাণ হরণ করিলে
কাহার পরাণে সয়?
যুবতী হইয়া, শ্যাম ভাঙাইয়া,
এমতি করিল কে?
আমার পরাণ যেমতি করিছে,
তেমনি হউক সে॥"

পাঠকেরা চণ্ডীদাসের রাধার অভিশাপের সহিত বিদ্যাপতির রাধার অভিশাপের তুলনা করিয়া দেখিলে দুই জনের মধ্যে একটা বিশেষ প্রভেদ দেখিতে পাইবেন। দুই জনেরই অভিশাপের মর্ম্ম কি এক নয়? মর্ম্ম একই বটে, দুই জনেই সেই "পিয়া মোর যার পাশ বৈসে," তাহাকে অভিশাপ দিতেছেন। দুই জনেরই শাপের মূল এক। কিন্তু দুই জন একভাবে অভিশাপ দিলেও দুই জনের কি তফাৎ! একজন বলিলেন, তাহার পার্শ্বে এই দীর্ঘনিশ্বাস পড়ুক, তাহার হৃদয়ে আর কিছুই বাঁচিয়া থাকিয়া কাজ নাই, কেবল এই মর্ম্মভেদী অনন্ত যাতনাময় নিশ্বাস সেখানে কাঁদিয়া বেড়াক্। আর একজন বলিলেন, আমার হৃদয় যেরূপ করিতেছে, তাহার হৃদয়ও সেইরূপ হৌক। তোমার হৃদয় কি করিতেছে তুমিই জান, আমরা তাহা জানিতে চাহি না, কিন্তু পরের হৃদয় তুমি ভাঙ্গিতে চাহ কেন? তোমার হৃদয়ের সুখশান্তিটুকু কি তাহাকে দিতে পার? কৈ, তাহা ত চাহ না। তাহা চাহিবে কেন? তবে আর অভিশাপ কিসের? তোমার দীর্ঘনিশ্বাস তাহার হৃদয়ে মাথা ঠুকিয়া কাঁদিয়া মরুক, ইহাই না তোমার বাসনা? তুমি সেই রাধা—বিদ্যাপতির হাত হইতে চণ্ডীদাসের হাতে আসিয়াছে মাত্র, কিন্তু তুমি সেই।

সে যাহা হৌক্, বিদ্যাপতির বিরহ-গানগুলিতে কেমন একটি ভাব আছে। তাঁহার "এ ভরা বাদর" শুনিলে বর্ষাকালের বিরহের ভাব কেমন যেন হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাঁহার "সময় বসন্ত, কান্ত রহু দূরদেশ" শুনিলে বসন্তের বিরহও তেমনি ফুটিয়া উঠে। কিন্তু বিরহের অথবা মিলনের কথা ছাড়িয়া দিয়া, বিদ্যাপতির কবিতার মর্ম্মগত একটা কি ভাব আছে, আমাদিগকে দেখিতে হইবে। চণ্ডীদাসের কবিতায় পিরীতি ভরপুর। তাঁহার কবিতা পিরীতিময়। তাঁহার ভাব, "পিরীতি নগরে বসতি করিব, পিরীতে বাঁধিব ঘর।" তিনি পিরীতি পিরীতি করিয়া মাতিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গানগুলিতে এত পিরীতি আছে যে, সকলগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলে একখানি রীতিমত পুঁথি হয়। বিদ্যাপতির কবিতাকে চণ্ডীদাসের তুলনায় যৌবনাচ্ছন্ন বলা যাইতে পারে। চণ্ডীদাসের

কবিতায় যৌবনের অভাব দেখা যায় না বটে ; কিন্তু তাই বলিয়া তাহা যৌবনাচ্ছন্ন নহে। আর বিদ্যাপতিতে কেমন একটা অতৃপ্তির ভাব দেখা যায়। তাঁহার এই অতৃপ্তির একটি গান একেবারে বিখ্যাত। সে গান আমাদের,

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণহিঁ শুননু,
শ্রুতিপথে পরশ না গেল॥
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়াইনু,
না বুঝনু কৈছন কেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥"

এ গানটি আমরা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করি নাই, মধ্যে খানিকটা তুলিয়া দিয়াছি মাত্র। বিদ্যাপতির কবিতায় আরও স্থানে স্থানে এই ভাবের বিকাশ হইয়াছে। তাঁহার একটি বাসন্তী বিরহের গানেও আছে,

"অনিমিখ নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত না হোয় নয়ান।"

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক কথা বলা হইয়াছে। আর অধিক বকাবকি করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি করিব না। এখন সংক্ষেপে ইহাঁদের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিয়া শেষ করা যাক্। বিদ্যাপতির কবিতা দেখিলে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, তাঁহার লেখায় সংস্কৃত সাহিত্যের ছায়া দেখা যায়। তাঁহার উপরে জয়দেবের বিশেষ প্রভাব। চণ্ডীদাস ঠাকুরে কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না। জয়দেব তিনি পড়িয়াছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁহার লেখায় জয়দেবের তেমন প্রভাব ত কৈ লক্ষিত হয় না। চণ্ডীদাসের লেখার স্থানে স্থানে তাঁহার নাট্যরসাস্বাদন-ক্ষমতারও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। মানময়ী রাধার নিকট শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ংদৌত্য দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে। চণ্ডীদাসের ছন্দ প্রায়ই কিছু ছুটন্ত ; বিদ্যাপতি কিছু ধীর। কিন্তু লেখা দেখিয়া চণ্ডীদাসকে যেমন সহজে চেনা যায়, বিদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না। চণ্ডীদাস আপনার লেখায় ফুটিয়াছেন অধিক। ['ভারতী ও বালক,' শ্রাবণ ১২৯৬]

জীবন-ট্র্যাজেডি

মরণের কথা উঠিলেই লোকে সাধারণতঃ ট্র্যাজেডি ভাবিয়া গম্ভীর হইয়া আসে, বাক্য সংযত করিয়া স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকে—চিরজন্ম হৃদয়ে মুদ্রিত থাকিবার মত কি বুঝি ঘটনা আসিতেছে। হাসিতে ভরসা হয় না, কোথায় রসভঙ্গ হইবে, ভাব মারা যাইবে। লোকে কতকটা কাঁদিবার অবস্থায় আসিয়া অপেক্ষা করে। হাসির কথা যদি উঠে, হাসে বটে, কিন্তু নয়নের ছলছল ভাব তখনও যায় নাই। মৃত্যুর রহস্যরাজ্যে আমরা বিভীষিকার একটা করাল কাল মূর্ত্তি খাড়া করিয়া রাখিয়াছি, দিন রাত্রি সেই মূর্ত্তি পানে চাহিয়া বিরহের স্বপ্ন দেখিতেছি; সুতরাং মৃত্যু আমাদের নিকট ট্র্যাজেডি বৈ আর কি? আরম্ভের কথা ভাবিবার আমরা বড় একটা অবসর পাই না, জীবন পড়িয়া থাকে; উপসংহার পড়িয়া দেখি, নায়ক নায়িকার কে একজন সরিয়া গিয়াছে। আমরা কাঁদিয়া উঠি।

কিন্তু যে ঘটনা-স্রোতের মধ্য দিয়া সে উপসংহার রচিত হইয়াছে, তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিলে আমরা কখনই নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না। উপসংহারেই ত কাব্য বুঝা যায় না—গঠন দেখিয়াই ট্র্যাজেডি কি না বলা যায়। সুতরাং মৃত্যুকে ট্র্যাজেডি প্রমাণ করিতে হইলে জীবনের গঠনে তাহার অনুকূল ঘটনা আছে কি না—আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। তাহার পর দেখিতে হইবে, মৃত্যুর পরিচ্ছেদটি উঠাইয়া লইলে জীবন কিরূপ প্রতিভাত হয়। বিরহমাত্রই ট্র্যাজেডি নহে, বিরহবিশেষ ট্র্যাজেডি বটে। সেইরূপ মিলনবিশেষ ট্র্যাজেডি, আবার মিলনবিশেষ ট্র্যাজেডি ছাড়িয়া সামান্য প্রহসন। একটি সূক্ষ্ম সূত্রের উপরে ট্র্যাজেডি নির্ভর করে। মিলনই হৌক, বিরহই হৌক, তাহার ভিতরে অন্তঃসলিলা নদীর মত একটি ভাব বহিয়া চলিয়াছে; ট্র্যাজেডি সেই ভাবে। এই জন্য কাঠাম দেখিয়া কিছু বুঝিবার নাই—জীবনের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া দেখিতে হইবে।

জীবন সম্বন্ধে আমরা হাসিয়া কথা কহি, এই হেতু তাহাকে ট্র্যাজেডি হইতে বিস্তর তফাৎ মনে হয়। জীবন যেন কিছুই নয়, কতকগুলা দিনসমষ্টি মাত্র—কোন প্রকারে কাটিয়া যাওয়া বিষয়। দৈনন্দিন ঘটনাসমূহের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আমরা তাহার ট্র্যাজেডি-গাম্ভীর্য্য তেমন উপলব্ধি করিতে পারি না, নিতান্ত প্রহসন না বলিলেও মৃত্যুর তুলনায় লঘু রকম একটা কিছু বুঝি। আমরা জীবনটা উপভোগ করিয়া লই, তাহার দেহটা যত দেখি, আত্মা তত দেখি না। আর মৃত্যুর দেহের দিকে চাহিতে বড় ভরসা হয় না, কল্পনায় তাহার যে ভাব আছে, সেই ভাবেই মুগ্ধ হইয়া থাকি।

জীবনের ট্র্যাজেডি কিন্তু কোথায়? সুখের গভীরতায় আমরা যে দুঃখপ্রবাহ অনুভব করি, সেইখানেই জীবনের ট্র্যাজেডি। বাহিরে সারাদিন হাসিলেও আমাদের অন্তরে একটা

অশ্রুসিক্ত ভাব বহিয়া যায়, আমাদের মিলনের মধ্যে এমন একটা বিরহ-বিদ্ধ ভাব থাকে, যাহাতে জীবন নিতান্ত লঘু হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। আমাদের শত সহস্র অস্ফুট ভাবেই ট্র্যাজেডি বজায় থাকে—সুখের মধ্যে দুঃখ, শান্তির মধ্যে অতৃপ্তি ইত্যাদি। কাঁদিয়া ফেলিলেই অনেক স্থলে কমেডি হইয়া দাঁড়ায়, দীর্ঘনিশ্বাস আসিয়া ট্র্যাজেডি রচনা করে। আমরা অতীতে দাঁড়াইয়া বর্ত্তমান অনুভব করি, সেই বর্ত্তমানে দাঁড়াইয়া ভবিষ্যতের পানে চাহিয়া দেখি, ট্র্যাজেডি ক্রমাগতই যেন ঘনাইয়া আসে।

এত বড় ট্র্যাজেডি আর আছে নাকি? কোথা হইতে কোন্ হৃদয় আসিয়া অপর হৃদয়ের সহিত মিলিত হইল, সমস্ত মিলন-আনন্দের মধ্যে ভাবনা চিন্তা ভয় মাত্র জাগিয়া। যে উদ্দেশ্যের জন্য খাটিয়া যাও, উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই ট্র্যাজেডি। সব যেন ফুরাইল, অবসন্ন উদ্যম এখনও সেই অতৃপ্ত। এই অতৃপ্তিতেই ট্র্যাজেডি; এবং এই জন্যই মৃত্যু উপসংহারে জীবন-ট্র্যাজেডি ভালরূপে ফুটিতে পারিয়াছে।

মৃত্যু আসিয়া জীবনের হৃদয়ে একটা ছায়া ফেলিয়া দিল। তাহার মধ্যে এমন একটা অব্যক্ত অস্ফুট রহস্য-সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়া উঠিল যে, হৃদয়ের গভীরতায় তাহা চিরদিন মুদ্রিত হইয়া থাকে। উপসংহার লঘু হইলে ত ট্র্যাজেডি মাটি হইয়া যায়। মৃত্যুর উপসংহার জীবন-ট্র্যাজেডির উপযুক্তই হইয়াছে। এমন গম্ভীর ভাবময় উপসংহার কোথায় মিলিবে? বিস্তৃত অতীত এবং আরও বিস্তৃত ভবিষ্যৎ, এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য-বন্ধন। ভবিষ্যতের পৃষ্ঠা আর খুলিল না, অতীতের মধ্য হইতেই ভবিষ্যৎকে অতি ক্ষীণ দেখা যাইতেছে।

জীবনবিশেষ যে ট্র্যাজেডি এবং অনেক জীবন ট্র্যাজেডি নয়, তাহা নহে। পাষাণের মধ্যে দিয়াও এক দিন নিভৃতে নির্জ্জনে অশ্রুস্রোত বহে, সেইখানেই তাহার ট্র্যাজেডি। অশ্রুস্রোত জমিয়া গিয়া যখন কঠিন হইয়া যায়, হৃদয় উঠিতে পারে না, তখনও তাহা ট্র্যাজেডি। তবে সকল জীবন অবশ্য সমান ট্র্যাজেডি নয়, এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

জীবন যদি তবে ট্র্যাজেডিই হইল, হাস্যরস কোথা হইতে আসিল? হাস্যরস যে ট্র্যাজেডিতে থাকিতেই পারে না, এমন কোন আইন নাই। তবে হাস্যরসের প্রাচুর্য্যে গাম্ভীর্য্য অনেক সময় নষ্ট হইবার সম্ভাবনা বলিয়াই তাহা ট্র্যাজেডির অনুকূল রস নহে। তাই বলিয়া প্রথম হইতে চোখ রগড়াইতে আরম্ভ করিলেও ট্র্যাজেডি হয় না। আমাদের জীবনে সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য। হাস্যের অধরে অশ্রুর রেখা—হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া যাও, কিন্তু কাঁদিতে হইবে। এমন চমৎকার নিখুঁৎ ট্র্যাজেডি আর নাই। যত বড় আলঙ্কারিক আসুন না কেন, ইহার একটি দোষ বাহির করিতে পারিবেন না।

আর ইহা ট্র্যাজেডি নয়, এ কথা কেহ বলিতে পারে? জন্মের মধ্যে মৃত্যু বসিয়া—আরম্ভের মধ্যে অবসান। আর শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য, যতই আলোচনা করিয়া দেখ, প্রত্যেক পরিচ্ছেদে ট্র্যাজেডি। শৈশবের সারল্যের মধ্যেও সন্দেহের বীজ রহিয়াছে—কৈশোর যৌবনের অনুরাগ উৎসাহ উদ্যমের মধ্য দিয়া গিয়া সেই সন্দেহ বার্দ্ধক্যে ফুটিয়া উঠে। পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়া নীরবে এই গম্ভীর মহাট্র্যাজেডি গঠিত হইতেছে। এই ট্র্যাজেডির আদর্শেই মহাভারত, রামায়ণ, হ্যাম্‌লেট।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা কিন্তু জীবন ট্র্যাজেডি বুঝেন নাই। জীবনের উপসংহার মৃত্যু; তাঁহাদের নিয়মানুসারে গ্রন্থের উপসংহারে মৃত্যু থাকিবার যো নাই। নায়ক নায়িকার মিলন না হইলে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। মিলন হইলেও ট্র্যাজেডি অবশ্য হইতে পারে, দুই চারি জনের মৃত্যুতেও ট্র্যাজেডি না হইতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে আইন থাকা অবশ্য ভাল নয়। স্বভাবে যাহা নাই—সাহিত্যে তাহা জোর করিয়া রাখা কেন?

স্বভাবে ট্র্যাজেডিরই অভিনয় চলিয়াছে বোধ হয়। প্রহসন দেখিয়া আমাদের এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা থাকিতে পারে, কিন্তু প্রহসনের মধ্যে অনেক সময় ট্র্যাজেডি ঘুমাইয়া থাকে। প্রহসন কাষ্ঠহাসি হাসিয়া ট্র্যাজেডির অভিনয় দেখাইয়া দেয় মাত্র। অনেকেই দেখিয়া হাসে, কিন্তু যাহাদের হৃদয় আছে, ঘরে আসিয়া কাঁদে। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্যবিহীন কতকগুলা বিদ্বেষপূর্ণ ব্যঙ্গোক্তি প্রহসন নহে। কিন্তু প্রহসন অবশ্য ট্র্যাজেডিও নহে, তবে অনেক সময় ট্র্যাজেডির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বটে।

জীবন ট্র্যাজেডিকে ব্যক্ত করিবার জন্য প্রহসন-ঘটনা দুই চারিটা থাকে। কিন্তু সে প্রহসনের পরিণাম ট্র্যাজেডি। বৈচিত্র্যের জন্য তাহাতে সৌন্দর্য্য সুব্যক্ত হয়। তবে তাহাকে প্রহসন বলা কত দূর সঙ্গত সন্দেহ। জীবন কাঁদিয়া জন্মগ্রহণ করে, কাঁদিয়া হাসিয়া মরে; দর্শকেরা কিন্তু তখনই কাঁদিয়া উঠে। এইখানেই জীবনের সমস্ত ট্র্যাজেডি।

['ভারতী ও বালক,' ভাদ্র ১২৯৬]

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী

ভাবগত সাহিত্যের আলোচনা করিয়া জাতিবিশেষের মধ্যে উন্নত ভাবের কত দূর চর্চ্চা হইয়াছিল যেমন বুঝা যায়, সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিবার তেমন সুবিধা হয় না। কবির ভাব সাধারণের অপেক্ষা চিরকালই উন্নত, এই জন্য তাহা দেখিয়া সাধারণের ভাব সম্বন্ধে অকাট্যরূপে বিশেষ কিছু বলা যায় না, তবে জাতির অবস্থা যে এমনতর উন্নত

হইয়াছিল, যাহাতে তেমন কবি জন্মাইতে পারিয়াছেন—এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় বটে। সমাজের সাধারণ অবস্থা বুঝিতে হইলে ভাবের হিমাদ্রিশিখর হইতে একটু নামিয়া আসিতে হয়, যে সাহিত্যে সমাজের বাহ্য চিত্র যথেষ্ট অঙ্কিত হইয়াছে, এইরূপ সাহিত্যের অনুশীলন আবশ্যক। কারণ, মুখভঙ্গী দেখিয়া তাহা হইলে সহজেই মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিবার সুবিধা হইবে।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর গ্রন্থই এ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামে ভাবের হিল্লোল কোথাও বড় খেলিতে পায় নাই, কবিত্ব বিকশিয়া উঠিয়া সৌন্দর্য্যের রহস্যদ্বার খুলিয়া দেয় না। বস্তুর অতীত প্রদেশে তাঁহার তেমন আকাজ্ক্ষা দেখিতে পাওয়া যায় না—চর্ম্মচক্ষুতে যাহা যেরূপ দেখিয়াছেন, তিনি সেইরূপই বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। উচ্চদরের কবি তিনি নহেন, কিন্তু সাজাইয়া গল্প করিবার তাঁহার ক্ষমতা আছে। আর থোড় বড়ি মোচার ঘণ্টে তাঁহার অভিজ্ঞতারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। হাটে যাইলে তিনি হাটশুদ্ধ জিনিসের দর জানিয়া আসেন, ঘরে আসিয়া পাকশালায় গিয়া পাচককে রন্ধন সম্বন্ধে নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান করেন, সংসারের কাজকর্ম্মে অনেক গৃহিণী তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত মুকুন্দরাম হৃদয়ের সুগভীর ভাব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহারও বিরহবেদনা আছে, মিলন-আনন্দ আছে, কিন্তু সে বেদনায় দেহই জ্বলিয়াছে অধিক, সে মিলনে দেহই বাঁচিয়া গিয়াছে। দেহকে বাঁচান তাঁহার কতকটা আবশ্যকও হইয়াছিল—তাঁহার স্ত্রীচরিত্রগুলির কি কীলযুদ্ধে সামান্য ব্যুৎপত্তি! মুকুন্দরাম হৃদয়ের ভাষায় গান গাহিলে সপত্নীবর্গের গুম্‌গুম্ কীলশব্দে এবং সম্মার্জ্জিত তারকণ্ঠ সম্ভাষণে তাহা ডুবিয়া যাইত। যাহা হৌক্, এখন আর সে আশঙ্কা নাই, কবিকঙ্কণ বিরহবিধুরাদিগের রুদ্ধ নিশ্বাস বড় অনুভব করেন নাই; বিরহিণীদ্বয়ের কীলাকীলি দেখিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণের বোধ করি হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, দূর হইতেই তাই তিনি কাজ সারিয়াছেন।

মুকুন্দরাম জীবনে কষ্ট পাইয়াছেন অনেক। জীবনী লেখা উদ্দেশ্য না হইলেও এখানে আমরা তাঁহার দুঃখ কষ্ট সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতে পারি। কারণ, চণ্ডীগ্রন্থের উৎপত্তি কারণে কবি নিজেই আপনার দুরবস্থার কথা বলিতে বসিয়াছেন। অত্যাচারী মুসলমান ডিহিদারের নিষ্ঠুরতায় তাঁহাকে গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে হইয়াছিল; অনশনে, অর্দ্ধাহারে, দয়াবানের ভিক্ষাদানে কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া অবশেষে নরপতি রঘুনাথের আশ্রয়ে আসিয়া তিনি বাঁচিয়া যান। পথে চণ্ডীর আদেশে তিনি যে কাব্য রচনা করিতে বসেন, এইখানে আসিয়াই সম্ভবতঃ তাহা পরিপুষ্ট ও সম্পূর্ণ হয়।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী মোটামুটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে কালকেতুর কথা বর্ণিত হইয়াছে—কালকেতুর জন্ম, বিক্রম, বিবাহ, যুদ্ধ ইত্যাদি; দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কথা—লহনা খুল্লনার দ্বন্দ্ব, বিরহ, অভিসার প্রভৃতি। সাময়িক সমাজের অবস্থা বুঝিবার সুবিধা অবশ্য দ্বিতীয় খণ্ডে। কিন্তু প্রথম খণ্ডটিও বাদ দেওয়া যায় না, তাহাতেও শিখিবার বিষয় অনেক আছে। আমরা প্রথম খণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল কথা আলোচনা করিব।

স্বর্গের নীলাম্বরের প্রতি কোনও বিশেষ কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া মহাদেব তাহাকে অভিশাপ দেন যে, মর্ত্ত্যভূমে ব্যাধকুলে তাহার জন্ম হইবে। মহাদেবের শাপে ধর্ম্মকেতুর গৃহে তাহার জন্ম হয়—নাম হইল কালকেতু। কালকেতু নিতান্ত দুধের ছেলে নয়—ব্যাধের ঘরে ব্যাধ হইয়াই সে জন্মাইয়াছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু। কবিকঙ্কণ বর্ণনা করিয়াছেন,

"নাক মুখ চক্ষু কাণ কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার সাবল।"

শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই—কালকেতুর প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। মৃদুস্পর্শনে বীরভাব প্রকাশ করিতে তিনি পারেন নাই, কিন্তু মোটা মোটা বর্ণনা করিয়া একরকম বুঝাইয়াছেন। কালকেতুর শারীরিক বলই সম্বল, অসাধারণ হৃদয়ের বল তাহার চরিত্রে দেখা যায় না। আমাদের মুকুন্দরামও শরীরের কবি। তাঁহার ভাবময় বর্ণনা নহে—প্রচলিত নিয়মানুসারে তিনি বক্ষ বর্ণনা করিতে বসিলেই কপাটের সহিত তুলনা করেন, নেত্র বর্ণনা করিতে হইলেই আকর্ণ দীর্ঘ। কালকেতুর বর্ণনা আর একটু উদ্ধৃত করিয়া দি, পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন।

"কপাট বিশাল বুক, নিন্দি ইন্দীবর মুখ,
আকর্ণ দীঘল বিলোচন।
গতি জিনি গজরাজ, কেশরী জিনিয়া মাঝ,
মতি পাঁতি জিনিয়া দশন॥
দুই চক্ষু জিনি নাটা, ঘুরে যেন কড়ি-ভাঁটা,
কাণে শোভে ফটিক কুণ্ডল।"

কালকেতুর বিক্রমও সাধারণ নহে। তাড়া দিয়া সে হরিণ ধরিতে পারে, ধনুক শরের আবশ্যক হয় না।

এমন পুত্রের বিবাহের জন্য ব্যাধকে সুতরাং চিন্তিত হইতে হইয়াছিল। অনুরূপ কন্যা মিলে কোথায়? বিধাতা সদয় হইলেন, ফুল্লরা মিলিল। পুরোহিত সোমাই পণ্ডিতের

সহিত ধর্ম্মকেতুর বিরলে একদিন অনেক কথাবার্ত্তা হয়—কথাবার্ত্তা আর কি, কালকেতুর বিবাহ। এ কথাবার্ত্তাগুলি কিন্তু পড়িয়া সুখ আছে—সব কেমন স্বাভাবিক। প্রাচীন বঙ্গের সামাজিক অবস্থা ইহাতে বেশ বুঝা যায়। তাহার পর কালকেতুর বিবাহ হইল। মুকুন্দরাম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, চোখে যাহা পড়িয়াছে—কিছুই বাদ যায় নাই।

বিবাহাদি করিয়া কালকেতু স্বগৃহে ফিরিল। ধর্ম্মকেতুর পুত্রবধূটিও মিলিয়াছে ভাল। ধর্ম্মকেতুর সুখের অন্ত নাই। নিদয়াও আনন্দিতহৃদয়। ফুল্লরা রাঁধে বাড়ে, শ্বশুর শাশুড়ীকে মন দিয়া খাওয়ায়, তাঁহাদের সেবার কোনও ত্রুটি হয় না। সংসারে এখন সব সুশৃঙ্খলা, গোলযোগ ঝঞ্ঝা নাই। সংসারে শান্তি ভোগ করিয়া অবশেষে নিদয়া সহিত ধর্ম্মকেতু বারাণসীধামে মুক্তি চিন্তা করিতে চলিয়া গেল। ফুল্লরাই গৃহের গৃহিণী হইল।

কালকেতু বনে বনে প্রতি দিন শীকার করিয়া বেড়ায়। হস্তীর শুণ্ড ধরিয়া সে আছাড় মারে, ব্যাঘ্রকে ফাঁদ পাতিয়া ধরে, মহিষকে তাড়া দিয়া ধরিয়া ফেলে। ফুল্লরা হাটে গিয়া গজদন্ত, ব্যাঘ্রচর্ম্ম, মহিষশৃঙ্গ বিক্রয় করিয়া পয়সা আনে। এইরূপে দম্পতির দিন কাটিয়া যায়। ফুল্লরার গৃহিণীপনায় কালকেতুর বিপুল উদর পরিপূর্ণ থাকে—সে চিরপ্রদীপ্ত জঠরানলও পরিতৃপ্ত হয়। গৃহিণী না হইলে কালকেতুর ক্ষুধা কি যে সে নিবারণ করিতে পারে? কবিকঙ্কণ বর্ণনা করিয়াছেন,

"মুচড়িয়া গোঁপ দুটা বান্ধে নিয়া ঘাড়ে।
একশ্বাসে সাত ঘড়া আমানি উজাড়ে॥
চারি হাঁড়ি অন্ন বীর খায় ক্ষুদ জাউ।
দালি খাইল ছয় হাঁড়ি মিশাইয়া লাউ॥
ঝুড়ি দুই তিন খাইল আলু ওল পোড়া।
বনপুঁই ভার দুই কলমী কাঁচড়া॥"

বীরের ছোট গ্রাস মুকুন্দরাম তালসমান বলিয়াছেন। বড় গ্রাস বোধ করি ছোটখাট লোকে আঁকড়িয়া পায় না।

কালকেতুর সহিত অরণ্যের পশুদের একবার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। পশুরা তাহার তাড়নে অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে চণ্ডীর শরণাপন্ন হইয়া তাহারা বাঁচিয়া যায়। চণ্ডী গোধিকাবেশে কালকেতুকে দর্শন দেন। মৃগয়ায় বিফলমনোরথ হইয়া কালকেতু সেই গোধিকাকে জাল দড়ি দিয়া বাঁধিয়া আনে। গৃহে আসিয়া ব্যাধ গোধিকাকে চুপড়ি চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। গোধিকা কিয়ৎক্ষণ পরে নিজ যথার্থ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহির হইল।

কালকেতু গৃহে নাই, ফুল্লরা আসিয়া দেখে যে, তাহার গৃহে এক ষোড়শী রূপসী নীরবে বসিয়া আছে। রূপসীর লাবণ্য দেখিয়া ফুল্লরা অবাক্ হইয়া গিয়াছে—এমনতর সুন্দরী সে বুঝি জীবনে দেখে নাই। সুন্দরী আবার এত দেশ থাকিতে ফুল্লরার কুটীরদ্বারে বসিয়া। সুতরাং ব্যাধনিতম্বিনীর আরও আশ্চর্য্য ঠেকিতেছে। ফুল্লরা বিস্ময়পূর্ণ হৃদয়ে সাহস করিয়া যুবতীর একাকিনী এরূপ ভাবে পরগৃহে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। ফুল্লরা সন্দেহ করিতেছিল—কুলবধূ কেহ স্বামীর সহিত অথবা শাশুড়ী ননদের সহিত ঝগড়া করিয়া রাগের মাথায় চলিয়া আসিয়াছে। সেই জন্য সে খুলিয়া বলিল, যদি এরূপ কিছু হইয়া থাকে, সুন্দরীর সঙ্গে গিয়া দুই পাঁচ কথা বুঝাইয়া বলিয়া তাঁহাদিগকে সে শান্ত করিয়া আসিবে।

ফুল্লরার সান্ত্বনায় চণ্ডীর মুখ ফুটিল। তিনি বাঁধা আইনানুসারে উগ্রপতি এবং সোহাগিনী সপত্নীর বিরুদ্ধে ফুল্লরা সমীপে এক নালিস রুজু করিলেন। বীরের জন্য তিনি যে সকল কষ্ট সহিতে পারেন, সে কথারও আভাস দিতে ভুলিলেন না। ফুল্লরার কিন্তু তাহাতে মন উঠিল না ; সীতা, সাবিত্রী, বেদবতীর উদাহরণ সমেত একটা লম্বা রকম বক্তৃতা ঝাড়িয়া বুঝাইল, ভালয় ভালয় দিন থাকিতে স্বামিগৃহে প্রতিগমন করাই কর্ত্তব্য। চণ্ডী ঘাড় নাড়িলেন—ফুল্লরার কুটীর হইতে সহজে তিনি নড়িতে সম্মত নহেন।

ফুল্লরা মহাবিপদে পড়িল—এ ষোড়শী রূপসীটাকে কিছুতেই যে বিদায় করা যায় না। ফুল্লরা বার মাসের দুঃখ গাহিল। কিন্তু গাহিলে হইবে কি ? চণ্ডী নড়িবার কথা ভুলিয়াও বলেন না—তাঁহার ধনে এবার অবধি ফুল্লরার অংশ রহিল বলিয়া ভরসা দিলেন। ফুল্লরা বেগতিক দেখিয়া স্বামীর নিকটে দৌড়িয়া গিয়া বলিল যে, কাহার ষোড়শী কন্যা ঘরে আনিয়া তিনি মরিবার উপায় করিতেছেন। কালকেতু শুনিয়াই অবাক্। ফুল্লরাকে চোখ রাঙ্গাইয়া বলিল, মিথ্যা হইলে নাসিকা শূর্পণখার অবস্থা প্রাপ্ত হইবে বুঝিয়া যেন সত্য বলা হয়। ফুল্লরা কালকেতুকে লইয়া আসিয়া দেখাইল। কালকেতু ভাবিল, তাই ত, এ ব্যক্তি এখানে কে ?

কালকেতু রূপসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, ফুল্লরা সমেত গিয়া তাঁহাকে আত্মীয় স্বজনের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে চাহিল। অনেক পীড়াপীড়িতে চণ্ডী মহিষমর্দ্দিনী-রূপ ধারণ করিলেন। তখন কালকেতু ভয়ে মূর্চ্ছা যায়। চণ্ডী অভয় প্রদান করিলেন, এবং কালকেতুকে অনেক ধনরত্নের অধিকারী করিয়া দিলেন। সেই অবধি ব্যাধনন্দনের কপাল খুলিয়া গেল।

চণ্ডীর অনুগ্রহে কালকেতু গুজরাট দেশে এক নূতন নগর নির্ম্মাণ করিল। বীরের নগরে অনেক হিন্দু মুসলমান প্রজা আসিয়া জুটিল। মুসলমানেরা সহরের পশ্চিমভাগে

বাস করিবার অনুমতি পাইল। মুকুন্দরাম মুসলমানপাড়ার এক দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনাটি হইয়াছে ভাল। তাহা পড়িতে মজা লাগে। মোটা মোটা মুসলমানী কথায় তাহার মধ্যে যেন একটা হাস্যতরঙ্গ উথলিয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ হইলেও আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"কলিঙ্গ নগর ছাড়ি, প্রজা লয় ঘর বাড়ী,
নানা জাতি বীরের নগরে।
বীরের লইয়া পান বৈসে যত মুসলমান,
পশ্চিম দিক্ বীর দেয় তারে॥
আইসে চড়িয়া তাজি সৈয়দ মোল্লা কাজি,
খয়রাতে বীর দেয় বাড়ী।
পুরের পশ্চিম পটী বসাইল হাসনহাটী
এক মুদনী গৃহ বাড়ী॥
ফজর সময়ে উঠি, বিছায়া লোহিত পাটী,
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ।
ছিলিমিলি মালা ধরে জপে পীর পগম্বরে,
পীরের মোকামে দেয় সাঁজ॥
দশ বিশ বেরাদরে বসিয়া বিচার করে,
অনুদিন কিতাব কোরাণ।
বেসাইয়া কেহ হাটে পীরের শীরিনি বাঁটে,
সাঁঝে বাজে দগড় নিসান॥
বড়ই দানিসবন্দ, কাহাকে না কয়ে ছন্দ,
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।
ধরয়ে কাম্বোজ বেশ, মাথে নাহি রাখে কেশ,
বুক আচ্ছাদিয়া রাখে দাড়ি॥
না ছাড়ে আপন পথে, দশ রেখা টুপি মাথে,
ইজার পরয়ে দৃঢ় নাড়ি।
যার দেখে খালি মাথা, তা সনে না কহে কথা,
সারিয়া ঢেলার মারে বাড়ি॥
আপন টবর লৈয়া বসিলা গাঁয়ের মিয়া,
ভুঞ্জিয়া ত গায়ে মুছে হাত।

স্থুর লোহানি পানী, কুড়ানি বটুনি ছুনি,
পাঠান বসিল নানামত॥
বসিল অনেক মিয়া আপন তরফ লৈয়া,
কেহ নিকা কেহ করে বিয়া।
মোল্লা পড়ায়া নিকা দান পায় সিকা সিকা,
দোয়া করে কলমা পড়িয়া॥
করে ধরি খর ছুরি, কুকুড়া জবাই করি,
দশ গণ্ডা দরে পায় কড়ি।
বকরি জবাই যথা, মোল্লারে দেয় মাথা,
দান পায় কড়ি ছয় বুড়ি॥
যত শিশু মুসলমান তুলিল মক্তবখান
মখদম পড়ায় পঠনা।"

মুকুন্দরাম ব্রাহ্মণপাড়ারও বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা আরও দীর্ঘ। বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইতে মূর্খ বিপ্র পর্য্যন্ত কেহই তাঁহার বর্ণনার হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। তাহার পর ক্রমে ক্রমে কায়স্থ বৈদ্য প্রভৃতিরও বর্ণনা হইয়াছে। কবিত্বরস এ সকল বর্ণনায় লোকে বড় নাকি আশা করে না, তাই এগুলি পড়িতে মন্দ নয়। নহিলে স্বভাবের সৌন্দর্য্য কিম্বা হৃদয়ের গভীর ভাব বর্ণনা করিতে মুকুন্দরাম আদবেই পারেন না। তিনি কাঠাম গড়িতে পারেন, কিন্তু কাঠামোয় প্রাণ সঞ্চার করিতে পারেন না। সাধারণ ভাব কথাবার্ত্তা যেমন, তেমনি তিনি বেশ বর্ণনা করেন বটে।

যাহা হউক, কালকেতুর অদৃষ্টে নিরাপদে রাজ্যভোগ অধিক দিন ঘটিল না। ভাঁড়ু দত্তের ধূর্ত্ততায় কলিঙ্গরাজের সহিত কালুর যুদ্ধ হইল। জয়লক্ষ্মী কলিঙ্গরাজের দিকেই ঢলিয়া পড়িলেন। কালকেতু কারাগারে বন্দী; সে স্বাধীনতা নাই, সে রাজ্যসুখ নাই, কালকেতুর লক্ষ্মী বুঝি চঞ্চলা হইয়াছেন। চণ্ডীর অনুগ্রহে কালুর অদৃষ্ট আবার ফিরিল। কলিঙ্গাধিপতি সসম্মানে কালকেতুকে পুনর্ব্বার স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গুজরাটের রাজা হইয়া কালকেতু ভাঁড়ু দত্তকে মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দিয়া যথেষ্ট অপমানিত করিলেন। তাহার পর কিছুদিন অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া পুত্র পুষ্পকেতুর করে রাজ্যভার সমর্পণ করিলেন, এবং ব্যাধজন্ম হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নীলাম্বর স্বর্গধামে উপনীত হইলেন।

কবিকঙ্কণচণ্ডীর পূর্ব্বভাগ এইখানেই সমাপ্ত হইল। উত্তরভাগের সহিত এ খণ্ডের বিশেষ কিছু যোগ নাই। সে উপাখ্যান সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—কালকেতু, ফুল্লরা, ভাঁড়ু দত্তের

তাহাতে নাম গন্ধও নাই। তবে গ্রন্থের প্রায় শেষে চণ্ডী কালকেতুর উদ্ধারের কথা একবার বলিয়াছেন বুঝি। পূর্ব্বখণ্ডের পাত্র পাত্রী উত্তরখণ্ডে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। চণ্ডীর প্রভাব দেখান বোধ করি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য, সেই জন্য দুইটি বিভিন্ন উপাখ্যান রচনা করিয়া কেবল মাত্র চণ্ডীর অনুগ্রহসূত্রে দুইটিকে একত্র গাঁথিয়া দিয়াছেন। সংসারের সকল সুখ দুঃখের মধ্যেই চণ্ডীর মঙ্গলহস্ত বিদ্যমান—তাঁহার অনুগ্রহ বিনা এখানে কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না।

কবিকঙ্কণের লেখায় বরাবর কেমন একটি ধর্ম্মের সুর আছে। লেখা পড়িলেই মনে হয়, ব্রাহ্মণ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। মুকুন্দরাম জীবনে দুঃখ কষ্ট সহিয়াছেন অনেক, আর এই সকল দুঃখ কষ্টের মধ্যে তিনি যেন মায়ের স্নেহ অনুভব করিয়াছেন। তাঁহার লেখার ধরণ কতকটা পৌরাণিক—অসম্ভব রকম বর্ণনা করিয়া একটা গম্ভীর মূর্ত্তি খাড়া করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বুঝা যায়। জমকালো মূর্ত্তি আঁকিবার তাঁহার যতটা চেষ্টা ছিল, গম্ভীর প্রশান্ত হৃদয় গঠন করিবার তেমন ঝোঁক ছিল না। কালকেতু উপাখ্যানখণ্ডেই কি, আর ধনপতি সদাগর কথাই বা কি—তাঁহার একটি চরিত্রও গম্ভীর হয় নাই। স্বয়ং চণ্ডীই গম্ভীর নহেন।

যাহাই হৌক্, সাধারণ চরিত্র-চিত্রণে তাঁহার ক্ষমতার নিতান্ত অভাব দেখা যায় না। কালকেতু, ভাঁড়ু দত্ত প্রভৃতির চিত্র বেশ স্বাভাবিক হইয়াছে। ধনপতি সদাগর, খুল্লনা, লহনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতির চরিত্রও অস্বাভাবিক হয় নাই। কিন্তু থাক, এ সকল চরিত্র সম্বন্ধে এখন কিছু না বলাই ভাল। ধনপতি উপাখ্যান আলোচনার সময় দেখা যাইবে।

ফুল্লরার বারমাস্যা বঙ্গদেশে খুব বিখ্যাত। অনেকে কবিকঙ্কণের কবিত্বের নমুনা-স্বরূপ বারমাস্যা হইতে দু'এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখান। বারমাস্যায় ফুল্লরা দুঃখ করিতেছে, আষাঢ় মাসে নিত্য ঘর পড়ে, শ্রাবণ মাসে ভগ্ন কুটীরে জল পড়িতে থাকে—গায়ে আচ্ছাদন নাই, ভাদ্র মাসে দুরন্ত বাদলে কিরাতের উপার্জ্জন করিবার তেমন সুবিধা নাই, আশ্বিনে সকলে উত্তম বসন পরিধান করে—ফুল্লরার তখন উদরচিন্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু ফুল্লরার বারমাসের দুঃখে কবিত্ব কোথাও ত দেখা যায় না। ফুল্লরার দুঃখ যদি কবিত্ব-রসসিক্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ারে দুয়ারে দুই বেলা যে সকল অভাগিনীরা একমুষ্টি অন্নের জন্য কাঁদিয়া বেড়ায়, তাহাদের কথাই বা কবিত্ব নহে কেন? ফুল্লরা আপনার দুঃখগুলি আওড়াইয়া গিয়াছে মাত্র, এমন করিয়া কিছু বলে নাই, যাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় ভাবে একেবারে গলিয়া যায়। তবে দুঃখের কথা শুনিলেই লোকের দয়াবৃত্তি উত্তেজিত হয়। ফুল্লরার দুঃখ দেখিয়া আমাদের সাহায্য করিতে ইচ্ছা করে বটে। বারবাস্যা অতিদীর্ঘ না হইলে পাঠকদের দেখিবার জন্য আমরা উঠাইয়া দিতাম—ফুল্লরার বারমাস্যায় কবিত্ব

আছে কি না, তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন। কান্না মাত্রই কবিত্ব হইলে এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য ছিল না, কিন্তু তাহা ত আর নয়, কবিত্ব স্বতন্ত্র জিনিস।

কালকেতুপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে আর অধিক কথা না বলিয়া এইবারে আমরা ধনপতি সদাগরের গৃহে দৃষ্টিপাত করি। ইন্দ্রাণী নীলাম্বরকে পাইয়া সুখী হইয়াছেন, সমালোচনা করিয়া তাঁহার সুখের মধ্যে আমরা একটা ভয় রাখিয়া দি কেন? আমাদের ধনপতি স্ত জুটিয়াছেন।

কবিকঙ্কণচণ্ডীর দ্বিতীয় খণ্ড—ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান। পূর্ব্বখণ্ডের উপাখ্যান অপেক্ষা এ উপাখ্যানটি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালীর ঘরের ব্যাপার ইহাতে বেশ চিত্রিত হইয়াছে, আলোচনা করিবার মত চরিত্রও আছে। তবে চরিত্রগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের কিছু বিশেষ প্রভাব। বিশেষতঃ খুল্লনার জীবনের দু'একটি ঘটনায়। মৃত স্বামী ক্রোড়ে লইয়া খুল্লনা যখন ক্রন্দন করিতেছে এবং হৃদয়ের কাতরতা দেখিয়া চণ্ডী ধনপতিকে বাঁচাইয়া দিলেন, তখন মহাভারতের কথা কাহার না মনে পড়ে? তদ্ভিন্ন স্বর্গচ্যুতদিগের মর্ত্ত্যবাস, স্বর্গগমন প্রভৃতি ঘটনায়ও পুরাণের অল্পবিস্তর অনুচিকীর্ষা প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। মুকুন্দরামের নিজত্ব যথেষ্ট আছে, তাঁহার চরিত্রগুলি বাঙ্গালী বটে।

স্বর্গের নর্ত্তকী রত্নমালা তালভঙ্গ অপরাধে মর্ত্ত্যে আসিয়া খুল্লনারূপে জন্মগ্রহণ করে। ঘটনাচক্রে খুল্লনার সহিত ধনপতি সদাগরের বিবাহ হয়। ধনপতির অনুপস্থিতিতে দাসী দুর্ব্বলার পরামর্শে জ্যেষ্ঠা সপত্নী লহনার নিকট খুল্লনা অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করে। ধনপতি গৃহে আসিয়া লহনার অত্যাচার সকলই জানিতে পারেন, লহনাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনাও করেন। তাহার পর বিশেষ কারণে অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় খুল্লনাকে ছাড়িয়া তাঁহাকে সিংহলে যাইতে হয়। অদৃষ্টদোষে সেখানে তাঁহার কপালে কারাগার জুটে। অবশেষে বহুদিন পরে চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত গিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া এবং রাজকন্যা সুশীলাকে বিবাহ করিয়া আনে। দেশে আসিয়া আবার জয়াবতীর সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। কিয়দ্দিবস পরে খুল্লনা স্বর্গে চলিয়া গেল।

সংক্ষেপে ধনপতি-উপাখ্যানের কাঠাম এই। কিন্তু ইহার মধ্যে কথোপকথন, মান অভিমান, জালপত্র, দ্বন্দ্ব কোলাহল, শিক্ষা দীক্ষা অনেক বিষয় অবশ্য আছে। তাহা না থাকিলে গ্রন্থ লোকে পড়িবে কেন? খুল্লনার সহিত ধনপতির বিবাহ হইল। সকলে বলিল, খুল্লনার বর মিলিয়াছে ভাল। যুবতীরা অনেকে স্বাভাবিক ঔদার্য্যগুণে এবং পরশ্রীতে অনাসক্তি হেতু অকাতরে অনুপস্থিত স্বামিবর্গের সবিশেষণ রূপগুণের বর্ণনা করিয়া লইলেন।

দিনকতকের জন্য পাড়া জমিল—গল্পের বিষয় কাহাকেও ভাবিতে হয় না, সাথী খুঁজিতে হয় না, সব কূলে কূলে পরিপূর্ণ।

লহনার একটু অভিমান হইল। শাস্ত্রে, কি চতুষ্পাঠীতে দুই বিবাহের ব্যবস্থা আছে বলিয়া স্ত্রী কি স্বামীর হৃদয় খানিকটা ছাড়িতে পারে? ধনপতি বুঝাইতে বাকি রাখিলেন না। লহনাও জবাব দিলেন। ধনপতি লহনার যথাসাধ্য মনস্তুষ্টি সাধনের চেষ্টা করিলেন। লহনা ঘাড় নাড়ে। ধনপতির উপর রাগের তালটা পড়িবে খুল্লনার পৃষ্ঠে।

এদিকে গৌড়াধিপতির শুকপক্ষীর সুবর্ণপিঞ্জর নির্ম্মাণের জন্য সদাগরের ডাক পড়িল। লহনার হস্তে খুল্লনাকে সমর্পণ করিয়া ধনপতি গৌড়ে চলিলেন। দিনকতকের জন্য সতীনে সতীনে বনিল ভাল। কিন্তু চিরদিন কি এ মিল থাকে? বিধাতা সপত্নীকে সহজশত্রু করিয়া গড়িয়াছেন, মানুষে কি করিবে? ধনপতি সদাগরের গৃহে আবার দাসী আছে। যে গৃহে পরিচারিকা আছে, সেখানে সপত্নী না থাকিলেও দ্বন্দ্বের কখনও অসম্ভাব হয় না। সেখানে প্রত্যেক ধূলিকণায় জীবন্ত নিঃস্বার্থ নিন্দা কীটাণুর মত বিচরণ করিতেছে, সুতরাং সেখানে চির-মনান্তর। ধনপতির গৃহে দুর্ব্বলার বলে দুই সতীনের মধ্যে অল্প দিনেই বেশ বাধিয়া গেল। এত দিনে ধনপতির গৃহে লক্ষ্মীশ্রী হইল।

দুর্ব্বলা বলিল, লহনা ঠাকুরাণী ত বুঝেন না—দুধ কলা দিয়া সাপ পুষিতেছেন। তা' দাসী বাঁদীর কিছু বলা ভাল দেখায় না, মোদ্দা এই বেলা দিন থাকিতে উপায় করা ভাল। লহনার মনের কোণে দুর্ব্বলার কথা ঠাঁই পাইল। লীলাবতীর ডাক পড়িল, অনেক রকম মন্ত্র তন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা হইল, ধনপতির নামে একটা জাল-স্বাক্ষর পত্রও বাহির হইল—তাহাতে অবশ্য খুল্লনাকে নিরাভরণা করিয়া ছাগরক্ষণকার্য্যে নিযুক্ত করিবার আদেশ আছে। খুল্লনা নিতান্ত বোকা মেয়ে নয়; লহনাকে সে চাপিয়া ধরিল, এ ত প্রভুর অক্ষর নহে—দিদির সব উপহাস। লহনাও বুঝাইল যে, পত্র ধনপতিরই বটে। খুল্লনা পত্রবাহককে দেখিতে চাহিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে জমিয়া গেল—দন্তযুদ্ধ দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরিণত হইল। তখন পাড়াপ্রতিবাসীর কাহারও কিছু জানিতে বাকি রহিল না। ব্যাখ্যা টীকারও সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ধনপতি সদাগর! তুমিই ধন্য।

খুল্লনা ছাগল চরাইয়া বেড়ায়। যথাসময়ে বসন্ত আসিল। মুকুন্দরাম খুল্লনার মুখে এক খেদ গুঁজিয়া দিলেন। সুতরাং খুল্লনা তাহা ভালরূপ হজম করিতে পারে নাই। দুর্ব্বলা খুল্লনার কষ্টের কথা তাহার পিত্রালয়ে গিয়া সুবিধামত গল্প করিয়া আসিয়াছে। রম্ভাবতী কাঁদিতেছেন। চণ্ডী খুল্লনাকে রম্ভাবতীবেশে এক দিন ছলনা করিলেন। তাহার পর খুল্লনার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া লহনাকে স্বপ্নাদেশ করেন। স্বপ্নাদেশের পর খুল্লনার একটু আদর যত্ন বাড়িল।

সাধুকেও স্বপ্নাদেশ হইল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কাজ সারিয়া ধনপতি তাড়াতাড়ি গৃহে ফিরিলেন। ধনপতি এক ভোজ খাইলেন, খুল্লনার উপর রন্ধনের ভার পড়িল। দুর্ব্বলা হাট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। মুকুন্দরাম তাহার এক নিখুঁৎ হিসাব দিয়াছেন ; হাট বাজারে মুকুন্দকে কেহ ঠকাইতে পারে না। ক্রমে ক্রমে জাল পত্র ইত্যাদি বাহির হইল। ভোজ-পরিতৃপ্ত সাধু লহনাকে ভর্ৎসনা করিলেন।

একদিন সাধুর বাড়ীতে কুটুম্বভোজন হইল। খুল্লনা এত দিন বনে বনে হেথা সেথা ছাগল চরাইয়া বেড়াইয়াছে, এই জন্য সে যদি পরীক্ষা দেয়, তবে সকলে সাধুর আলয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন, নচেৎ নয়। অগত্যা খুল্লনাকে পরীক্ষা দিতে হইল। জতুগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়া খুল্লনা তাহার মধ্যে রহিল। অগ্নিসংযোগে গৃহ পুড়িয়া গেল, চণ্ডীর অনুগ্রহে খুল্লনা বাঁচিল। নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য হইল।

কবিকঙ্কণের এইখানকার বর্ণনাগুলি পড়িলে বঙ্গসমাজের দলাদলির অবস্থা বেশ বুঝা যায়। লোকের ছিদ্র পাইলে বাঙ্গালী জাতি যেমন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, এমন আর কোনও জাতি নহে। খুল্লনাকে পঞ্চাশ বার পরীক্ষা দিতে হইয়াছে—জলে, স্থলে, অগ্নিতে, কিছুতেই আর বাকি নাই। আত্মীয় স্বজনেরা খুল্লনাকে সভামধ্যে পরীক্ষা করিয়া করিয়া মজা দেখিবার জন্য ব্যস্ত ; পরীক্ষায় চরিত্র নির্ম্মল প্রমাণ হইলে তাঁহাদের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে। কুলবধূকে কুলকলঙ্ক প্রমাণ করিতে পারিলে আনন্দের সীমা নাই—মহৎ কার্য্য করিয়া লোকে হৃদয়ে যে তৃপ্তি অনুভব করে, ইহার নিকটে তাহা কিছুই নহে। রামচন্দ্রের প্রজারা অগ্নিপরীক্ষার পর সতীকে সন্দেহ করিয়াছিল বলিয়া দুঃখিত হইয়াছিল। ধনপতির বুদ্ধিদৃপ্ত বাঙ্গালী আত্মীয়েরা খুল্লনাকে দুশ্চরিত্রা প্রমাণ করিতে পারিল না বলিয়া দুঃখিত হইল।

তাহার পর ধীরে ধীরে কিছু দিন কাটিয়া গেল। নৃপতির আদেশে গর্ভবতী খুল্লনাকে ছাড়িয়া চন্দনের জন্য সদাগরকে পুনরায় সিংহলে যাইতে হইবে। খুল্লনার বড়ই দুঃখ, ধনপতিরও সুখ নাই, কিন্তু কি করিবেন—রাজাজ্ঞা পালন না করিলে নয়। ধনপতি পোতাদি সজ্জিত করিতে বলিলেন। খুল্লনা স্বামীর মঙ্গল কামনায় প্রতি দিন চণ্ডীপূজা করে। লহনার কূট মন্ত্রে ভুলিয়া ধনপতি একদিন পূজার সময় খুল্লনা সুন্দরীকে চুল ধরিয়া টানিয়া অপমান করিলেন—পূজার ঘটবারি প্রভৃতি লঙ্ঘন করিতে সাধুর কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হইল না। আর স্ত্রীর গায়ে হাত তুলিতে বীর বঙ্গসন্তানের দ্বিধা ত কোন কালেই বড় উপস্থিত হয় না। স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন বাঙ্গলা দেশে স্ত্রৈণের লক্ষণ। খুল্লনা ত অপমান সহিল। চণ্ডী কিন্তু তাহা সহিতে পারিলেন না, সদাগরকে নাকের জলে চোখের জলে করিবেন স্থির করিলেন। মগরার নিকট সদাগরের ছয়খানা পোত ডুবিয়া গেল।

ঝড় বৃষ্টি হইতে অব্যাহতি পাইয়া অবশিষ্ট একখানি জাহাজ লইয়াই ধনপতি চলিলেন। মুকুন্দরাম উদার সিন্ধুর বিশেষ বর্ণনা করিতে পারেন নাই, অনেকগুলি জায়গার নাম করিয়াছেন মাত্র। কবি হইলে সিন্ধুর ভাবে তাঁহার কল্পনা উদ্দীপিত হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু মুকুন্দরাম ভূগোলজ্ঞান লইয়াই সন্তুষ্ট আছেন।

ধনপতি পথে কমলেকামিনী দর্শন করিলেন। সিংহলের রাজসভায় সে কথা বলিতে ভুলিলেন না। কিন্তু রাজা যখন ধনপতির সহিত কমলেকামিনী দেখিতে গেলেন, কিছুই দেখা গেল না। ফল হইল, ধনপতির কারাবাস। ধনপতি এখনও চণ্ডীকে ডাকেন না—স্ত্রী-দেবতা পূজা করিতে তিনি বড়ই নারাজ। আর ঘরে তাঁহার যে চণ্ডী আছেন, চণ্ডীকে ডাকিতে ভাল লাগিবে কেন?

এদিকে খুল্লনার সাধভক্ষণ। লহনা জ্যেষ্ঠা, সপত্নী হইলেও খুল্লনার এ সময়ে দেখিতে হইবে। খুল্লনাকে কি খাইতে ভাল লাগে না লাগে, জিজ্ঞাসা করিতে খুল্লনা বলিল,

"আপনার মত পাই, তবে গ্রাস চারি খাই
পোড়া মাছে জামীরের রস॥
উদরে পরম ব্যথা, শুন দিদি দুঃখ কথা,
ওদন ব্যঞ্জন নিমবারি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, বদরী-শকুল ঝোল,
তবে খাই গ্রাস পাঁচ চারি॥
লতা পাতা বন শাক, খর জ্বালে করি পাক,
সন্তলিবে যোয়ানী ফোড়ন দিয়া।
সম্ভাল লবণ তথি দিবে হিং জিরা মেথি,
বহিন গণি যদি কর দয়া॥
নিধান করিয়া খই, তাহাতে মহিষা দই,
আমড়া সংযোগে রাঙা শাক।
যদি পাই কিছু পূপ, আমে মসুরীর সূপ,
আমসিতে প্রাণ পাই, রাখ॥
আমি যেন পাই সোণা শকুল মাছের পোনা,
পোড়া কাসুন্দি দিয়া তথি।
হরিদ্রা রঞ্জিন কাঞ্জী, উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
বনশাকে বড়ই পিরীতি॥"

ক্ষুধা তৃষ্ণা দিন দশ না থাকাতে খুল্লনার এই কয়টি জিনিস খাইতে সাধ হইয়াছে। সুতরাং দুর্ব্বলা চুপড়ি হস্তে পাড়ার বাড়ী বাড়ী শাক তুলিতে বাহির হইল। মুকুন্দরাম শাকের এক লম্বা ফর্দ্দ দিয়াছেন ; সে ফর্দ্দ মুখস্থ করিয়া রাখিতে পারিলে গৃহিণীপনার অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ফর্দ্দানুযায়ী পঞ্চাশ রকম ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়। খুল্লনা সাধ ভক্ষণ করিল।

সাধ ভক্ষণের পর যথারীতি শ্রীমন্তের জন্ম হইল। শ্রীমন্ত রূপে গুণে অদ্বিতীয়। বিদ্যাটাও হইল বড় মন্দ নয়। গুরুর সহিত ঝগড়াটাও হইয়াছিল ভাল। আইনানুযায়ী অভিমান পালা সাঙ্গ করিয়া শ্রীমন্ত ধনপতির উদ্দেশে সিংহল যাত্রা করিল। খুল্লনার নিষেধ বড় টিকিল না। সিংহল যাত্রার বর্ণনা করিবার কিছুই নাই। মুকুন্দরাম পূর্ব্ববৎ দেশের নাম আওড়াইয়াছেন। শ্রীমন্ত কমলেকামিনী দর্শন করিল, রাজসভায় সে গল্প বলিল, ধনপতির মত সকল অবস্থাই ঘটিল। শ্রীমন্তকে মশানে পর্য্যন্ত লইয়া গেল। তবে চণ্ডী নাকি সহায় আছেন, তাই ছিরা বাঁচিয়া গেল। শুধু বাঁচিয়া যাওয়া নয়, সুশীলার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল। ধনপতি সসম্মানে কারামুক্ত হইলেন।

চণ্ডী খুল্লনাবেশে একদিন শ্রীমন্তকে স্বপ্ন দিলেন। শ্রীমন্ত কাঁদিয়া উঠিল। সুশীলার প্রবোধবাক্যেও শ্রীমন্তের মন বুঝিল না। অবশেষে ধনপতি, সুশীলা, শ্রীমন্ত সাধুর আলয়ে চলিলেন। মগরায় নষ্ট ধনসম্পত্তির পুনরুদ্ধার হইল। সাধু স্বদেশে আসিয়া পঁহুছিলেন। বিক্রমকেশরীর নিকট কমলেকামিনীর কথা হইল। শ্রীমন্তের মশানবাসও হইল। চণ্ডীর কৃপায় এ যাত্রাও কোনও অনিষ্ট ঘটিল না। বিক্রমকেশরী শ্রীমন্তের করে জয়াবতীকে সমর্পণ করিলেন। সুশীলার অভিমান হইল। এখন এ দুই সতীনে কিলাকিলি আরম্ভ হইলেই জমিয়া যায়।

কিন্তু তত দূর কিছু ঘটিল না। খুল্লনা পুত্র পুত্রবধূ সমেত স্বর্গে চলিলেন। শ্রীমন্ত স্বর্গের মালাধর ছিলেন—শাপে মর্ত্ত্যে জন্ম হয়। এখন সকলেই শাপমুক্ত। এইবারে আমরাও মুক্ত হইব। ধনপতি সদাগর কাঁদিতে লাগিলেন। দণ্ডী লহনার গর্ভে সুপুত্র জন্মিবে বলিয়া ধনপতিকে বুঝাইলেন। ধনপতির বুঝিতে বেশী ক্ষণ গেল না।

কবিকঙ্কণচণ্ডীর গল্প সম্বন্ধে এত দূর যাহা বলিয়া আসিয়াছি, তাহা বোধ হয় যথেষ্ট। ইহাপেক্ষা অধিক বলিতে গেলে সমস্ত গ্রন্থটি অক্ষরে অক্ষরে তুলিয়া দিতে হয়। এইবারে সংক্ষেপে তাহার প্রধান চরিত্রগুলি একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাক্—ধনপতি, শ্রীমন্ত, লহনা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা। সুশীলা, জয়াবতীকে গ্রন্থকার অন্তঃপুর হইতে বড় বাহির করেন নাই, বিবাহরজনীতে এবং অন্য দু'এক দিন মাত্র দেখিয়া ইহাঁদের সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা চলে না।

ধনপতি সদাগর জাতিতে গন্ধবণিক্। ব্যবসা বাণিজ্যে তিনি যথেষ্ট উপার্জ্জন করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধনী বণিক্‌সন্তানেরা যেরূপ হইয়া থাকে, তিনি তাহাই ছিলেন। অসাধারণ মহত্ত্ব অথবা বিশেষ কোনও কাজ করিবার দিকে লক্ষ্য তাঁহার ছিল না। ঘর সংসারই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব। তাঁহার নিকট স্বর্গও বোধ হয় তুচ্ছ। তদানীন্তন সমাজের প্রথা যেরূপ ছিল, ধনপতি তাহার সহিত ঠিক মিলিয়াছিলেন। আত্মসুখের জন্য তিনি দুই বিবাহ করেন। ভাবের দিক্ দিয়াও তিনি যান না। তবে, লহনার সন্তানাদি ছিল না বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় বিবাহের পক্ষে দুই চারি কথা অবশ্য বলা যায়। আর ইহাও বলিতে হয় যে, খুল্লনার রূপে মুগ্ধ না হইলে তাঁহার আবার বিবাহ হইত কি না সন্দেহ। বর্ত্তমানবিদ্রূপীরা উপহাস রসিকতায় প্রাচীন কালকে যাহাই প্রতিপন্ন করুন না কেন, রূপের আকর্ষণ তখন যে যথেষ্ট ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের ধনপতি সদাগর সে সময়ের একজন সাধারণ বাঙ্গালী। আদর্শ সৃষ্টি করিবার মত কল্পনা কবিকঙ্কণের ছিল না, তিনি সেরূপ চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার ধনপতি প্রতি দিন ঘরে ঘরে দেখা যায়। রাগ হইল, স্ত্রীকে দুই ঘা বসাইয়া দিয়া ধনপতি স্থির হইলেন। তাঁহার কাপুরুষত্বও মনে হয় না, স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন বলিলে অবাক্ হইয়া থাকেন মাত্র। সমাজ যন্ত্রে প্রতি দিন যে সকল জীব বাহির হইতেছে, ধনপতি তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র নহেন।

শ্রীমন্তের ভাবও পিতার মত। স্বর্গ হইতে আসিয়াছে বলিয়া তাহার নবীনত্ব কিছু নাই। কবিকঙ্কণের স্বর্গের ভাব যে তেমন উন্নত, তাহাও নহে। স্বর্গ পার্থিব সুখময় একটা স্বতন্ত্র দেশ মাত্র। শ্রীমন্ত সেই দেশের অধিবাসী। সুশীলাকে বিবাহ করিয়াই জয়াবতীর পাণিগ্রহণ করিতে শ্রীমন্তের বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইল না। বিবাহের পবিত্র উচ্চ আদর্শ ছিরার মনে কোনও কালে জাগিয়াছে কি না সন্দেহ। শ্রীমন্ত একীকরণ, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলন, এ সকলের বড় ধার ধারে না। হয় ত যাহার অর্থ ই বুঝে না, এমনতর কতকগুলা বড় বড় কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাকে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। স্ত্রী সেবা করিতেই আছে। সুতরাং পঞ্চাশটা বিবাহ করিলে চব্বিশ ঘণ্টা পাখার বাতাস খাইবার সুবিধা। জঠরানলবিহীনা স্ত্রী মিলিলে খরচের হিসাবে আরও ভাল। শ্রীমন্ত, বোধ হয়, এই ভাবের অধিক উর্দ্ধে উঠে নাই।

ধনপতি ও শ্রীমন্তের চরিত্রে কবিকঙ্কণের সৃষ্টি-কল্পনার অভাব বেশ বুঝা যায়। অদ্ভুতরকম কল্পনা বাঙ্গালী জাতির চিরকালই আসে, তাহার কথা অবশ্য বলিতেছি না। কবিকঙ্কণের যে কল্পনার অভাব, তাহা উন্নত, মহান্, গম্ভীর কল্পনা। লাগাম-ছাড়া কল্পনা আলস্যের চিরসহচর। আমাদের তাহার অভাব হইতেই পারে না। কবিকঙ্কণ যে তেমন কবি ছিলেন, তাহাও নহে। লেখক তিনি একজন বটে।

কিন্তু খুল্লনা লহনার কথা আলোচনা না করিয়া সম্মানার্হ প্রাচীন কবির সৃষ্টিকল্পনার অভাব বলাটা কি ভাল দেখায় ? ভাল অবশ্য দেখায় না, কিন্তু সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করা বোধ হয়, হয় না। লহনাকে কবি নিজেই বড় ভাল চক্ষে দেখেন নাই। চণ্ডীর প্রিয়পাত্রী খুল্লনাই তাঁহার প্রিয়। কিন্তু প্রিয় হইলেও খুল্লনা অসাধারণ গুণবতী নহে। লহনার সহিত দ্বন্দ্বে আঁটিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই খুল্লনাকে আমাদের মায়া করে। খুল্লনাকে কবি সীতা সাবিত্রীর মত করিবার কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন—অগ্নি-পরীক্ষা, মৃত স্বামী ক্রোড়ে ক্রন্দন দেখিলেই বুঝা যায়। খুল্লনাতে সে পাতিব্রত্যতেজের মোদ্দা তেমন বিকাশ হয় নাই। রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া খুল্লনা যেন অভিনয় করিয়াছে। খুল্লনা স্ত্রীমাত্রেই সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপই, তবে মুকুন্দরাম রামায়ণ মহাভারতের ছায়া দিয়া তাহার চারি দিকে একটা সৌন্দর্য্য ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্র, যে কারণেই হৌক্, সংস্কৃত মহাকাব্যের চরিত্রগুলির মত ফুটে নাই। সে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি, স্বতঃ উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্য এখানে কোথায় ? তবে খুল্লনার কুলবধূ ভাবটি রক্ষিত হইয়াছে স্বীকার্য্য। লহনারও সে ভাব আছে। খুল্লনাপেক্ষা কিন্তু লহনা ধূর্ত্তা, কঠিনা।

ভাবের চরিত্র কবিকঙ্কণে নাই। সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যেই মুকুন্দরামের অবস্থিতি। দুর্ব্বলা দাসী হাট বাজার করে, কবিকঙ্কণ তাহার নিখুঁৎ হিসাব প্রস্তুত করেন। দুর্ব্বলা তাঁহার সকল কার্য্যে দক্ষা। সে চোরকে চুরীর পরামর্শ দিয়া গৃহস্থকে সাবধান করিয়া দেয়। দুই সতীনে ঝগড়া লাগাইয়া দিয়া সে তামাসা দেখে। মন্থরার মত উচ্চশ্রেণীর হৃদয় তাহার নহে। পাঠকেরা মন্থরার সুখ্যাতি শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন; কিন্তু বাস্তবিক আমরা যতটা মনে করি—মন্থরা তত হীনপ্রকৃতি নহে। ভরতের মঙ্গল কামনা করিয়াই সে কৈকেয়ীকে দশরথের নিকট বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিল। ভরতকে সে হাতে করিয়া মানুষ করিয়াছে, তাহার টান হইবে না ? সে যদি ভরতের প্রকৃতি বুঝিত, এমন কাজ কখনই করিত না। তাহার বুদ্ধির অভাব থাকিতে পারে, দূরদৃষ্টির অভাব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যথার্থ ভালবাসা ছিল—তামাসা দেখার জন্য অথবা নিজের দুইখান কাপড়ের জন্য সে লাগালাগি করিয়া বেড়াইত না। তাহার যে দুর্ব্বলতা—ভদ্রগৃহেও সেরূপ দুর্ব্বলতা সাধারণ বলা যাইতে পারে। দুর্ব্বলার প্রকৃতি যথার্থই নীচ। সে লহনাকে কুপরামর্শ দিয়া খুল্লনার নিকটে আর একরকম সাজাইয়া বলে, খুল্লনার নামে লহনার কাছে আবার নিন্দা করে। মন্থরার মত ভালবাসা দুর্ব্বলায় নাই। দুর্ব্বলা টাকার ঘুঘু।

মুকুন্দরামের ভাষার কথা বিশেষ কিছু বলিবার আবশ্যক করে না; যে দু'এক স্থান উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠকেরা দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার বর্ণনা স্থানে স্থানে

একটু সংক্ষিপ্ত হইলে আরও ভাল হইত বোধ হয়। এক ভাব—এমন কি, প্রায় এক ভাষা লইয়া তিনি কিছু বাহুল্যরূপে মধ্যে মধ্যে বকিয়াছেনও। যাহা হৌক্, প্রাচীন কবি আমাদের গৌরবের স্থল। তাঁহাদের দোষ সংশোধিত হইয়াই ভবিষ্যৎ নূতন কবির রচনা ফুটিয়া উঠে। ['ভারতী ও বালক,' ভাদ্র ১২৯৬]

ভাদ্র মাসের ভরাগঙ্গা

ভাগীরথী কুলুকুলু কুলুকুলু চিরদিন যেমন, আজও সেইরূপ আপনার মনে সুখ দুঃখের গান গাহিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দুই পার্শ্বে তটভূমি স্নিগ্ধ শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত; তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া কূলে লুটাইয়া পড়িতেছে, তৃণ-শয্যার উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। কূলে কূলে বট অশ্বত্থ আম্রবৃক্ষ স্তবকে স্তবকে সজ্জিত, তাহাদের মাথার উপর দিয়া দিশাহারা নীলাকাশ গড়াইয়া গিয়াছে। নিম্নে জাহ্নবীপ্রবাহ, উর্দ্ধে নীলিমাপ্রবাহ। এই দুই প্রবাহের সন্ধিস্থলে প্রভাতে প্রদোষে কোকিল ডাকিয়া যায়, পাপিয়া গাহিয়া যায়; দুই প্রবাহেরও যেমন অন্ত নাই, কোকিল পাপিয়ার সুরেরও অন্ত নাই।

এই অনন্তভাবময় গঙ্গাতীরে দীর্ঘ বর্ষার পর নীরবে ভাদ্র আসিয়া দাঁড়াইল। অধীর আনন্দে তরঙ্গিণীর হৃদয় উথলিয়া উঠিয়াছে—তরঙ্গিণী পূর্ণতোয়া। চঞ্চল কল্লোল-প্রবাহ ভাদ্র চরণস্পর্শে আরও চঞ্চল। সে মৃদু কুলুকুলু ধ্বনির আর বিরাম নাই। পূর্ণ-যৌবনার পূর্ণ রূপরাশি কি স্থির থাকিতে পারে? সৌন্দর্য্যের তরঙ্গে তরঙ্গে উঠিয়া নামিয়া সে আবেগময় রূপরাশি গভীর সাগরহৃদয়ে মিশিতে ছুটিয়াছে। প্রেম উচ্ছ্বসিয়া উঠে, বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, আনন্দ আপনাতে আপনি ধরে না।

ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গা কূলে কূলে টলমল। আকাশে মেঘ আসিয়া সূর্য্যালোক আড়াল করে, ভরা গঙ্গায় ছায়া আলোক পাশাপাশি বহিয়া যায়। উজ্জ্বল আলোক বক্ষের উপর দিয়া মৃদু মলয়ানিলের মত কাল ছায়া ছুঁইয়া যায়, চঞ্চল আলোক-হৃদয় নীরবে ঈষৎ যেন শিহরিয়া উঠে। এই তরঙ্গভঙ্গিমান্ ছায়ালোকবৈচিত্র্যের কূলে দাঁড়াইয়া ভাদ্র—ছায়ালোকময়, মেঘরৌদ্রময়, গম্ভীর। ভাদ্রের আগমনে গঙ্গাও বড় গম্ভীর; এত চাঞ্চল্য, এত আবেগ, কিন্তু গাম্ভীর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। গাম্ভীর্য্য কাণায় কাণায়।

পূর্ণিমানিশায় জ্যোৎস্নালোকে ভাগীরথী ঝিকিমিকি খেলা করে। নভোমণ্ডলে শরচ্চন্দ্র কলায় কলায় পূর্ণ, জাহ্নবীও ধরিত্রীর কোলে কোলে পূর্ণ। বেলাভূমিতে গুচ্ছে গুচ্ছে সজ্জিত. বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে—শ্যামল-শাখা-পল্লব-ফল-পুষ্প-তরঙ্গে পূর্ণিমার রজত-প্রবাহ বহিয়া যায়। সে তরঙ্গায়িত সৌন্দর্য্য-প্রবাহেও কেমন পূর্ণ ভাব। রজতধারা যেন শাখায় শাখায়

কম্পিত হইয়া তীরদেশ হইতে জাহ্নবী-হৃদয়ে গিয়া মিশিয়াছে। সৌন্দর্য্যে সৌন্দর্য্য উথলিয়া উঠে। ভরা ভাদ্রের সৌন্দর্য্য ভরপূর।

অন্ধকার রজনীতে এ সৌন্দর্য্য-সম্মিলন তেমন উপভোগ করা যায় না, কিন্তু ভরা ভাদ্রের গাম্ভীর্য্য তখন পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সে এক শ্মশানগাম্ভীর্য্য; ভাগীরথীকূলে শ্মশানক্ষেত্রে বসিয়াই তাহা উপভোগ করিতে হয়। অন্ধকারের মধ্যেও কেমন যেন পূর্ণতা বিরাজমান। ধরণীর গায়ে গায়ে নদী, তাহার উপর পুঞ্জীভূত অন্ধকার ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে; পূর্ণ অন্ধকারে পূর্ণ তরঙ্গিণী-হৃদয়ে আলিঙ্গন। আর গভীর নিশীথে ভাগীরথী কূলে কূলে কুলুকুলু।

বাসন্তী নদী চুপি চুপি সৈকতদেশ চুম্বন করিয়া বহিয়া যায়। ভাদ্র মাসে ত আর সে গঙ্গা নাই। গঙ্গা সমস্ত হৃদয় দিয়া ধরণীকে আপনার মধ্যে অনুভব করিতে চায়। দুর্দ্দম্য অধীর আবেগে হৃদয় তোলপাড়। রুদ্ধ বাসনা আপনার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাহির হইবে। গঙ্গাহৃদয় আজ যৌবনপ্লাবিত। আপনার যৌবনে সে ধরণীকে আচ্ছন্ন করিতে চাহে। তবেই যেন তাহার সাগর-সঙ্গম পূর্ণ হয়।

চিরকল্লোলময়ীর কল্লোলতান আজ যেন কিছু স্বতন্ত্র। ঐ কল্লোলকাহিনী শুনিতে প্রতি দিন ঊষা আসিয়া তাহার তীরে ফুল ছড়াইয়া যায়, সন্ধ্যা আসিয়া সেই কুসুমশয্যার উপরে ম্লান মুখখানি নত করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু গঙ্গে! আজ এ কল্লোলে কি গান গাহিতেছ যে, ঊষার চিরবিকশিত কচি মুখখানিতেও সন্ধ্যার গম্ভীর ছায়া ফুটিয়াছে, সন্ধ্যা আজ আরও সন্ধ্যাময়ী? সন্ধ্যা প্রতি দিনই নিবিষ্টচিত্তে বসিয়া থাকে, আজ তাহার চিত্ত আরও নিবিষ্ট। আজ আর সে ভাগীরথীতীর ছাড়িতে চাহে না। ঊষা আজ আর ফুল ছড়াইতে পারিল না, তাহার আঁচল হইতে অজ্ঞাতসারে ফুলগুলি টুপ্‌টাপ্‌ ঝরিয়া পড়িল। গঙ্গে, এ কল্লোলে কি রাগিণী গাহ?

যে রাগিণীই হোক্‌, এ গান বড় মধুর। এ গান শুনিয়া যে কাঁদিতে জানে কাঁদে, যে কাঁদিতে না পারে, হাসিয়া যায়। আইনবদ্ধ কণ্ঠধ্বনির মত পদে পদে ইহার সঙ্কোচ নাই। কুলু কুলু কুলু কুলু স্বাভাবিক সুরে স্বাভাবিক ভাবে এ গান সেই অনন্ত সাগরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে—দিন নাই, রাত নাই, অবিরল মৃদু মৃদু তান।

সময় সময় গঙ্গা-হৃদয় এমন স্থির যে, একটি তরঙ্গ উঠে না, স্তিমিত পবনে চিরপ্রবহমান তরল স্রোতমাত্র বহিয়া যায়। দূরে দূরে নিস্তরঙ্গ নদী-হৃদয়ে বৃন্তচ্যুত শতবর্ণের ফুল প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে। ক্ষীণ নক্ষত্রালোকে কুসুমশ্রেণী বিন্দুপুঞ্জবৎ—ধরণী পূর্ণ-যৌবনার কণ্ঠে যেন মালা পরাইয়া দিয়াছেন, সে অনুপম যৌবন-লাবণ্যের নিকট সে মালা ক্ষীণদীপ্তি।

সহসা আবার নদী যখন উছলিয়া উঠে, কুসুমগুলি তরঙ্গে তরঙ্গে ব্যথিত হইতে থাকে। যৌবনোচ্ছ্বাসে মালা যেন ছিঁড়িয়া যায়। তড়িৎপ্রবাহে হৃদয় পূর্ণানন্দে কলকল গাহিয়া উঠে।

এইরূপে অধীর চাঞ্চল্য, আনন্দ, উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়া ভাদ্র ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। বেলাভূমিতে মধ্যে মধ্যে কেবল তাহার নিঃশব্দ পদচিহ্নগুলি ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। কালে কালে তাহাও মুছিয়া আসে। কৃশাঙ্গী জাহ্নবী ধরণীর কোল হইতে চরণে গিয়া দাঁড়ায়—চরণ ধৌত করিয়া প্রতি দিন ম্লানমুখে বহিয়া যায়। ['ভারতী ও বালক,' ভাদ্র ১২৯৬]

অন্তরঙ্গ-তত্ত্ব

১

একদল লোক আছে, যাহারা পরোক্ষ আত্মীয়তা প্রকাশ করিতে বড় ভালবাসে। কোনও রকমে সুবিধা করিয়া তোমার সহিত একদিন তাহারা আলাপ করিয়া লয়, এবং পরদিন হইতে আপনাদের তোমার অন্তরঙ্গ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পায়। পরোক্ষে এমনি ভাব দেখায়, যেন তাহাদের নিকট তুমি অন্তঃপুর বাহির করিয়াছ, অসজ্জিত অবস্থায় তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক রহস্য-দ্বারের মধ্য দিয়া যাচিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছ। কল্পনার সাহায্যে তোমার সম্বন্ধে তাহারা অনেক রহস্য উদ্ভাবন করে; তুমি অস্বীকার করিলেও তাহারা তাহাতে অবিশ্বাস করিতে পারে না। তোমার অন্তরঙ্গত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাদের বিশেষ কোন লাভ হয় না বটে, কিন্তু স্বভাব ত লাভালাভ দেখিয়া কাজ করে না। তুমি যাহা না জান, বাহিরে বসিয়া তোমার ঘরের কথা তাহারা তাহা সমস্তই জানে। কারণ, গোঁফে চাড়া দিয়া তোমার সম্বন্ধে তাহারা এরূপ অকাট্য সত্য বলিবে যে, তাহাদের আত্মাভিমানপূর্ণ বাক্যস্রোতের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া কোন প্রকারে তুমি নিজ সম্বন্ধে সামান্য অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করিতে পারিবে না।

এইরূপ অন্তর্যামী পরোক্ষ আত্মীয়বর্গের তোমার জন্য কিন্তু অনেক পরিশ্রম সহ্য করিতে হয়। তোমার পরিবারের পাঁচ সাত জন সভ্যের নাম, তোমার গাড়ী ঘোড়ার সংখ্যা, সত্য মিথ্যা তোমার গোটাকতক গুণ এবং দোষ, ইহা তাহাদিগকে নিশিদিন কণ্ঠাগ্রে বহিয়া বেড়াইতে হয়। কারণ, মর্ত্তভূমে তোমার সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিলে তাহাদের মন্তব্য না দিয়া থাকিবার যো নাই। সাধারণ মতের বিরুদ্ধেও তাহারা কতকগুলা স্বসাধারণ মত আঁটিয়া রাখে—অসাধারণ কিছু না বলিলে অন্তরঙ্গত্ব লোকে বিশ্বাস করিবে কেন?

বিশ্বাস করাইবার জন্য তাহারা যত প্রকার উপায় অবলম্বন করে, ধর্ম্মপ্রচারকেরা তত উপায় জানিলে ঘরে ঘরে বুদ্ধ খ্রীষ্ট চৈতন্যের আবির্ভাব হইত। তোমার মতামত তাহারা তোমাপেক্ষা নিঃসংশয়রূপে বুঝিয়াছে, যেহেতু দুই বেলা অন্ন ব্যঞ্জনের সহিত তাহারা এই বিশ্বাস নিঃশব্দে হজম করিতেছে। এই সকল আত্মীয়তাপ্রকাশকেরা যদি প্রচারকব্রতে ব্রতী হয়, তাহা হইলে দেশের লোকে জ্বালাতন হইয়া উঠিলেও তাহাদের বিরুদ্ধে কথা বলে না। সেটা কি সুবিধা নয়?

পরোক্ষ আত্মীয়দের কথায় বুদ্ধিমান্ বিবেচকেরা অবশ্য সহজে ভুলেন না। সকলেরই একটা দল আছে; সেই দলই তাহার সাধারণ। এইরূপ গায়েপড়া অন্তরঙ্গদিগেরও রীতিমত সমাজ আছে। সমাজমন্দিরে একটি ছিদ্র আছে; সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়া মিটিমিটি অবিশ্বাস-চক্ষুতে চাহিয়া ইহারা বিশ্বসংসার সম্বন্ধে অকাট্য সত্য সংগ্রহ করে। সংগ্রহ যাহার যত অধিক হয়, স্ব-সমাজে তাহারই তত প্রতিপত্তি।

২

প্রত্যক্ষ আত্মীয়ের সংখ্যাও সংসারে বিরল নহে। পরোক্ষ আত্মীয় অপেক্ষা তাহারা তোমার নিকটে নিকটে ঘুরে, এবং তোমাকেই তাহাদের অন্তরঙ্গত্ব বিশ্বাস করাইতে চায়। তোমার জন্য তাহাদের কাঁদুনির বিরাম নাই—তোমার ভাবনা ভাবিয়াই তাহারা আকুল। হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করা নাকি বড় শক্ত ব্যাপার, অথচ তাহারা তোমার হৃদয়ে বসিয়া কাঁদিবার ভাণ করে, এই জন্য সারাক্ষণই তাহাদিগকে চোখের জল মুছিতে হয়। তোমার শত্রুপক্ষ খাড়া করিয়া উদ্দেশে তাহারা গালি পাড়ে। অন্তরঙ্গত্ব প্রকাশ করিবার যত উপায় থাকিতে পারে, কোনটিকেই তাহারা বাদ দেয় না। হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-বাহুল্যে তোমার যথার্থ আত্মীয়দের সম্বন্ধে অনেক জটিল রহস্যও বাহির হয়, না বুঝ, তোমার দোষ, কিন্তু প্রত্যক্ষ আত্মীয়বর্গের বুঝাইবার যত্নের ত্রুটি লক্ষিত হয় না। তুমি না বুঝিলে তাহারা দুঃখিত হয়, ঘাড় নাড়ে, অন্ধকারে অন্ধকারে পুঞ্জীভূত হইয়া তোমার দুঃখের কাহিনী—তোমার সুদূর ভবিষ্যৎ, তোমার বোধশক্তির হীনতা, তোমার কত অজ্ঞাত অমঙ্গলবার্ত্তা—গাহিতে থাকে।

প্রত্যক্ষ আত্মীয়বর্গ যে বাহিরে অন্তরঙ্গত্ব প্রকাশ করিতে চাহে না, তাহা নহে। তোমার চারি দিকে মধুপের মত ঘুরিবার উদ্দেশ্যই তাই। কিন্তু তোমাকেও তাহারা অন্তরঙ্গত্ব না বুঝাইয়া তৃপ্ত হইতে পারে না। তোমার সকল অধিকারমধ্যে তাহারা গলা জাহির করে, দানপত্র লিখিয়া দিলেও লোকে এত চীৎকার করে না। তোমার বিষয় লইয়া তাহারা এরূপভাবে নাড়াচাড়া করে, যেন তাহাদের করকমলে সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়া

তুমি সন্ন্যাসী হইয়াছ। পরোক্ষ আত্মীয়বর্গের তোমার সহিত বড় সম্পর্ক নাই, প্রত্যক্ষ আত্মীয়বর্গ তোমার সহিত কতকটা জড়িত। তোমাকে তাহারা আত্মীয়তা জানাইতে চায়, এই জন্য অপরের আত্মীয়ভাবের অভাব প্রমাণ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। কিন্তু গায়ে-পড়া অন্তরঙ্গ উভয়ই। প্রেমের বন্ধন যেখানে নাই, সেখানে অন্তরঙ্গত্ব হয় কিরূপে? তর্ক করিয়া ত অন্তরঙ্গত্ব প্রমাণ করা যায় না। আর লৌকিকতার অনুরোধে বিনয় করিয়া লোকে যে আত্মীয়তা প্রকাশ করে, অন্তরঙ্গত্ব হইতে তাহা বহু দূর। তাহা কেবল সামাজিক প্রথার আবরণ।

যথার্থ অন্তরঙ্গত্ব আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যস্ত নয়। অগাধ জলেই অন্তরঙ্গত্ব জন্মায় কি না। শফরীবর্গ অল্প জলে লাফালাফি করে, এবং এই লাফালাফিতেই শীঘ্র ধরা দেয়। প্রত্যক্ষ আত্মীয়বর্গ স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। লম্ফ ঝম্পের উপরেই ইহাদের সমাজে প্রতিপত্তি নির্ভর করে। আর পণ্ডিতেরা এই লম্ফ ঝম্পের ব্যাপার দেখিয়াই আত্মীয়বর্গের জাতি নির্ণয় করেন।

৩

চারি দিক্ দেখিয়া শুনিয়া স্ত্রীজাতির মধ্যেই অন্তরঙ্গত্ব অধিক বলিয়া মনে হয় না? স্ত্রী-সম্মিলনীতে হৃদয়ের অন্তঃপুর ত আর থাকে না, যাহা কিছু গোপনীয় ছিল—ব্যক্ত হইয়া পড়ে। যেমন করিয়া হউক, দুইটি জিহ্বা একত্র হইলে স্বামিবর্গ সমালোচিত হয়েন, শত্রু মিত্র যথাযথ বর্ণে দেখা দেন, টীকা টিপ্পনী অলঙ্কার বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। সুতরাং স্ত্রীজাতির মধ্যে অন্তরঙ্গত্বের বিশেষ প্রাদুর্ভাব অনুমান করা নিতান্ত অন্যায় নহে। হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃপুরে যাহার দিন রাত্রি প্রবেশাধিকার আছে, সেই ত অন্তরঙ্গ। স্ত্রী-সম্মিলনীতে এ অধিকার প্রায় দেখা যায়। তাই ত বলিতেছি, স্ত্রীজাতি অন্তরঙ্গের দল।

সত্যই কি তবে স্ত্রীজাতি অন্তরঙ্গপূর্ণ? বাহির হইতে দেখিলে তাহাই মনে হয় বটে, কিন্তু তাহা যথার্থ নহে। স্ত্রীহৃদয়ে তেমন অন্তঃপুর বন্দোবস্ত নাই। লঘু হৃদয় সহজেই ঝরিয়া যায়—অন্তরঙ্গত্ব জন্মাইবার বহু পূর্ব্বেই স্ত্রীহৃদয় শূন্য হইয়া পড়ে। তাহাদের কথাবার্ত্তায় অন্তরঙ্গত্ব মনে হইলেও তাহার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে। স্ত্রীলোকেরা প্রথম আলাপেই লোহার সিন্দুক খুলিয়া বসে, সম্পর্ক পাতাইয়া লয়, কিন্তু পুরুষের মত স্থায়ী আত্মীয়তা তাহাদের অল্পই জন্মে। আর অন্তঃপুর ঘুরাইয়া লইয়া আসিলেও তাহারা যে যাহাকে তাহাকে সেখানে থাকিতে দেয়, তাহা নহে। আমার বোধ হয়, আল্‌গা স্বভাব-বশতঃ তাহারা অনেক সময় অন্তঃপুরের জানালা দরজা এরূপ ভাবে খুলিয়া রাখে যে, বাহির হইতে উঁকি মারিয়া লোকে ঘরের দেওয়ালের ঝুল কালি দেখিয়া লয়। কিন্তু তাহাতে

উকিবিদ্যাপারদর্শীদিগের অন্তরঙ্গত্ব ত প্রমাণ হয় না। আল্‌গা প্রকৃতিকেও অন্তরঙ্গ ঠাহরান যায় না।

অন্তরঙ্গত্ব কোথায়? যেখানে দুই হৃদয়ের মধ্যে ব্যবধান নাই, যেখানে অজ্ঞাতসারে নিন্দাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অথবা সারল্য প্রদর্শনার্থে কথা বাহির হয় না, হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে নিঃস্বার্থ নীরব প্রেম উছলিয়া উঠিয়া পরস্পরের সকল দুঃখ যন্ত্রণা মুছিয়া দেয়, সেইখানেই অন্তরঙ্গত্ব। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা হইতেই তাহার উৎপত্তি, কিন্তু এ আত্মীয়তা অবশ্য জাঁতায় পেষা নহে। স্বাধীন ভাব না থাকিলে অন্তরঙ্গত্ব জন্মায় না।

এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিবার আবশ্যক নাই। বলাটা কিছু বাহুল্যই হইয়াছে বোধ হয়। এখন পাঠকবর্গ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া একবার মধ্যম হইতে উত্তম পুরুষে আসিয়া দাঁড়াই। দাঁড়াইয়া স্ফীতবক্ষে গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সকলকে সাবধান করিয়া দি, শফরীবর্গকে অন্তরঙ্গ ভাবিয়া সে দিকে কেহ তাকাইয়া না থাকেন। কারণ, দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে জানিলেই শফরীবর্গ অধিক লাফালাফি আরম্ভ করে। ['ভারতী ও বালক,' আশ্বিন ১২৯৬]

মহত্ত্ব

১

মহত্ত্ব সকলে সহিতে পারে না। মহত্ত্বের সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া অনেকে তাহার উপর রাগিয়া থাকে—মহত্ত্বকে অবিশ্বাস করিয়া তৃপ্ত হইতে চায়। মহত্ত্ব কিছু বলে না, সারাক্ষণ তাহাদেরই পানে তাকাইয়া থাকে না, এই জন্য মহত্ত্বের প্রতি তাহারা আরও অধিক বিরক্ত হয়। মহত্ত্বের খুঁৎ ধরিবার জন্য তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে, মহত্ত্বের নিন্দা করিতে পারিলে আপনাদের ভাগ্যবান্ বিবেচনা করে। মহত্ত্বের উদার ভাবের মধ্যে আপনাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় দিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধন-উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, এবং প্রতি পলকে তাহার পদস্খলন আশা করিয়া অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকে। পদস্খলন হওয়া মানবের পক্ষে কোন কালেই অসম্ভব নয়, সুতরাং মহত্ত্বের সামান্য পদস্খলন হইলে মহত্ত্ব-অসহিষ্ণুদিগের সুখের সীমা থাকে না। দৈবাৎ যদি তাহার পদস্খলন না দেখিতে পায়, আড়াল হইতে মহত্ত্বের দেহে পঙ্ক নিক্ষেপ করে।

মহত্ত্বের কথা উঠিলেই তাহারা আরও মহত্ত্ব আশা করে, নহিলে মহত্ত্ব রহিল কোথায়? সামান্য উদারতা তাহাদের চক্ষে পড়ে না, আরও উদারতা নহিলে হইল কি? তাহাদের হিসাবে মহত্ত্ব ঈশ্বরের পর আর কাহারও থাকিতে পারে না, তবে স্বয়ম্ভূ মহত্ত্ব-

অসহিষ্ণু সমালোচকবৃন্দের কতকটা মহত্ত্ব আছে অবশ্য। তা না থাকিলে মহত্ত্ব যে বিচারবিহীন হইয়া মারা যায়। মহত্ত্ব আপনার কর্ত্তব্যে রাজপথ দিয়া সাহস করিয়া চলিয়া যায়, কাতর সমালোচকবর্গের বিবর্ণ বদনমণ্ডল সম্মুখে রাখিয়া চলা তাহার পোষায় না; এই জন্য তাহার নামে ছড়া বাঁধিয়া গল্প রটাইয়া তাহারা তৃপ্তি লাভ করে। তাহারা দেখায়, মহত্ত্বকে তাহারা পরম আয়ত্ত করিয়াছে, অপরে তেমন পারে নাই; সুতরাং তাহাদের মহত্ত্বের দোষ না দেখিলে চলে না।

মহত্ত্বকে বুঝিবার জন্য যে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক, ইহা তাহারা বুঝে না। উপযুক্ত শিক্ষা নহিলে উন্নত উদার মহত্ত্বকে কখনও ধরা যায় না। মহত্ত্বকে ভাণ বলিয়া মনে হয়—কাপট্য বৈ তাহাতে আর কিছুই যেন নাই। মহত্ত্বকে বুঝিতে হইলে তাহার সমাজভুক্ত হইতে হইবে, তাহার শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে হইবে, স্বপাণ্ডিত্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কিন্তু অসহিষ্ণুরা এত কষ্ট স্বীকার করিতে সম্মত নহে। তাহাদের বিশ্বাস, স্বভাবতই তাহারা শিক্ষিত। অন্ততঃ তাহারা এইরূপ ভাণ করে। এবং শিক্ষা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া বুদ্ধিদৃপ্ত স্ফীত বক্ষের জোরে মহত্ত্বকে গালি দিয়া তৃপ্ত হয়।

অক্ষমতাই মহত্ত্বের উপর বিরক্তির প্রধান কারণ। আলস্য পরিহার করিয়া কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নির্ভয়ে খাটিয়া যাওয়া অনেকের পোষায় না। তাহারাই আপনাকে প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় মহত্ত্বের নিন্দা রটাইয়া বেড়ায়। মহত্ত্বের উন্নত মস্তকের আড়ালে তাহারা ঢাকা পড়িয়া যায়, এই জন্য লাফালাফি না করিলে তাহাদের কেহ দেখিতে পায় না। অকারণে ভীত হইয়া কৃষ্ণ সর্প যেমন মানবশরীরে দংশন করে, মহত্ত্ব-অসহিষ্ণু অলসেরা সেইরূপ মহত্ত্বের উদার সরল দৃষ্টিতে সঙ্কুচিত হইয়া তাহার হৃদয়ে গোপনে ছুরিকা বিঁধাইতে পারিলে ছাড়ে না। অসহিষ্ণুরা কিন্তু মহৎ ভাবের প্রতি বিরক্তি বাহিরে প্রকাশ করে না, কেবল মহৎ জীবনকে কপট প্রমাণ করিতে গিয়াই তাহারা ধরা দেয়। জীবন্ত মহত্ত্বের সুখ্যাতি শুনিলেই তাহারা মৃত মহত্ত্বের নাম দিয়া তাহা ঢাকিতে চায়। প্রেতভূমির অন্ধকারেই তাহাদের যাহা কিছু আশা ভরসা।

শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে কতকগুলি মৃত মহত্ত্বের নাম তাহারা সংগ্রহ করিয়া রাখে, আবশ্যক হইলেই আওড়াইয়া যায়। নাম আওড়াইবার সময়ে তাহারা এমনি ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে, যেন পূর্ব্বজন্ম আসিয়া তাহাদের স্মৃতিপথে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। মৃত মহত্ত্বের কোষ্ঠী পর্য্যন্ত তাহারা প্রস্তুত করিয়া দেয়—কে বলিবে যে, কল্পনা সে কোষ্ঠীর

রচয়িতা ? জীবন্ত মহত্ত্বের মধ্যে স্বসমাজের অগ্রণী অসহিষ্ণুবর্গকেই তাহারা দেখিতে পায়। পাছে তাহাদের সারল্য সম্বন্ধে কাহারও মনে সন্দেহের উদয় হয়, এই জন্য তাহারা আগে-ভাগেই মহত্ত্বের কৌটিল্য প্রমাণ করিতে বসে। কিন্তু তাহাতেও তাহারা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, সুবিধামত কথায় কথায় আপনাদের সারল্য ব্যক্ত করে। তাহাদের হৃদয়ের জ্বালা কিন্তু কিছুতেই ঘুচে না।

মহত্ত্বকে আক্রমণ করার একটা সুবিধা এই যে, তাহার নিকট প্রতি-আক্রমণের বড় আশঙ্কা নাই। যদি বা সে ফিরিয়া দাঁড়ায়, তাহাতে সপক্ষ পিপীলিকাবর্গের গৌরব বৃদ্ধি বৈ হ্রাস হয় না। সুতরাং এরূপ অবসর ক্ষুদ্রেরা ছাড়িতে পারে না। সহিষ্ণু মহত্ত্বকে না ধরিলে ক্ষুদ্রত্ব ধরিবে কাহাকে ? এমন নিরাপদ্ ত আর কোথাও নয়। এই জন্যই তাহারা মহত্ত্বকে ভেংচাইয়া কৃতার্থ হয়, মহত্ত্বের নিন্দা রটাইয়া সুখ উপভোগ করে। মহত্ত্বের বিপক্ষতাচরণই তাহাদের জীবনের কার্য্য।

৩

কিন্তু মহত্ত্বকে তাহারা কি চাপিয়া মারিতে পারে ? সে আপনার প্রতিভার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে, নীরবে নিঃশব্দে চতুর্দ্দিকের অন্ধকার কুয়াসার উপরে হৃদয়ের জ্যোতি বিকীর্ণ করে। ক্ষুদ্রত্ব ক্ষণিকের জন্য তাহাকে আড়াল করিতে পারে, কিন্তু মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের কনক-কিরণমালা ক্ষীণ মেঘে কত ক্ষণ ঢাকা থাকে ? সহস্র বাধার মধ্য হইতেও মহত্ত্ব ফুটিয়া উঠে। এক বার জমি পাইলে মহত্ত্বকে চাপিয়া রাখা যায় না।

সমাধিমন্দিরেই কিন্তু মহত্ত্বের গৌরব। জীবনে তাহাকে চিরদিন সহিতেই হইয়াছে, মরিবার পর তাহার চিতাভস্ম পূজা করিবার জন্য লোকারণ্য। অসহিষ্ণুরা তাহার নাম জপিতে থাকে, তাহার নাম শুনিলে প্রেমে গলিয়া যায়। বোধ করি, তাহাদের তখন অনুতাপ উপস্থিত হয় যে, জীবনে তাহাকে অনর্থক কত কষ্ট দিয়াছে। মহত্ত্ব মরিয়াই যথার্থ বাঁচিয়া উঠে।

মহত্ত্বের মরিবার ক্ষমতা আছে। সত্যের জন্য সে অকাতরে জীবন দান করিতে পারে। এই জন্য অমরভবনে তাহার কখনও স্থানাভাব হয় না। তাহার রাজ্যে তুচ্ছ কানাকানি নাই, পরশ্রীকাতরা হিংসা মায়াবিনী নাই, সেখানে সত্যের সিংহাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রেম নিশিদিন সত্যের মন্দিরে প্রদীপ জ্বালিয়া বসিয়া আছে; যে এস, সে এস—সত্যের মঙ্গল-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া যাও। সত্যের বিভীষিকা ঘুচিয়া যাইবে। তাহার কি বিভীষিকা আছে ? মিথ্যারই ত যত বিভীষিকা।

সত্যের মন্দিরে মহত্ত্ব নির্ভয়ে উপাসনা করিতেছে। মিথ্যা-ছলিতেরা মন্দিরের বাহিরে দাঁড়াইয়া মহত্ত্বকে গালি পাড়িতেছে। তাহার কর্ণে সে গালি অমৃত বর্ষণ করিতেছে। মহত্ত্বের উদার হৃদয়ে সে সুবিন্যস্ত বাক্যাবলীর রেখা পড়ে না। মহত্ত্ব কাতর দৃষ্টিতে তাহাদিগকে ডাকিতেছে—সত্য হইতে কেহই না বঞ্চিত হইয়া থাকে! কর্ত্তব্য সাধনেই তাহার সুখ। সে নির্ভয়ে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে ; এখন যে এস, যে যাও।
['ভারতী ও বালক,' আশ্বিন ১২৯৬]

বিবিধ প্রসঙ্গ

কৃতজ্ঞতা

১

সহায়-ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন অনেক সময় এরূপ দুরূহ ব্যাপার যে, লোকে সহজে সাহায্য লাভ স্বীকার করিতে চাহে না। ভ্রান্ত সংস্কারবশতঃ সাহায্যদাতাকে সম্মান করা অনেকে খোসামোদ বলিয়া বুঝে। আশ্রয় পাইবার অল্প দিন পরে সে কথা ভুলিয়া যায়। মনে হয়, সংসারে সকলই স্বঘটিত। প্রথমে যেখানে আশ্রয়ের মহত্ত্ব বৈ আর কিছুই উপলব্ধি হইত না, অন্ধ অহঙ্কারের কল্যাণে ক্রমে সেখানে গূঢ় স্বার্থ-সাধনাভিলাষ বিকশিত হইয়া উঠে। দুর্দ্দম্য দুরাশায় শোষণস্পৃহা যতই বলবতী হইতে থাকে, ততই আত্মাভিমান স্ফীত হইয়া উঠিয়া সহায়ের খুঁৎ বাহির করিতে আরম্ভ করে। স্বীয় উদার মহত্ত্বের গুণে সহায় সে দিকে দৃক্‌পাতও করে না ; কিন্তু আশ্রিত শফরী সহায়কে অসাধারণ স্ফীতি দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে যত্নের ক্রুটি দেখায় না। সুবিধামত সহায়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আপনার ক্ষমতা অনুভব করে।

লোকে যতক্ষণ কাহারও নিকট সাহায্য না পায়, ততক্ষণ তাহাকে স্বর্গে রাখিয়া দেখে। কিন্তু আশ্রয় পাইলে তাহার মহত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আশ্রয়-দাতার পতনে নিজের যদি কোনও অসুবিধা না হয়, তাহা হইলে অনেকেই বিশেষ আনন্দ লাভ করে। এই জন্য ভূতপূর্ব্ব সহায়কে পদদলিত দেখিতে কত তৃপ্তি! আশ্রয় দিয়া সে ব্যক্তি যেন চোর-দায়ে ধরা পড়িয়াছে। সংসারের নিয়মানুসারে অতিথি সর্ব্বসুখ উপভোগ করিয়াও সামান্য ক্রুটি কল্পনায় অভিশাপ দিবার অধিকারী। আর যে ব্যক্তি অতিথির আশ্রয়, অভিশাপ না জুটিলেই সে ব্যক্তি কৃতার্থ। এমনি ধারাই বটে! তাই অনেক দুঃখেই থ্যাকারে বলিয়াছেন যে, যত নবাবীর মূলে ঋণ।

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, কৃতজ্ঞতা বড়ই কঠিন ধর্ম্ম। বাস্তবিক, সংসারে আশ্রিত অতিথিরই অত্যাচার অধিক। আশ্রয় সহিষ্ণু। উদাহরণের জন্য দূরে যাইতে হইবে না। সর্ব্বাপেক্ষা নিকট জননী সন্তানের উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট। উদাহরণ আরও অনেক মিলে, কিন্তু তাহার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র। আবশ্যক হয়, পাঠকেরা নিজেই খুঁজিয়া লইবেন।

২

কৃতজ্ঞতা ত আর কিছু নয়—হৃদয়ে আশ্রয়ের মহত্ত্ব অনুভব করিয়া তাহার নিকট আপনাকে বলিদান। মহত্ত্ব অনুভব করিতে আত্মাভিমান যদি স্ফীত হইয়া উঠে, কৃতজ্ঞতা আসিতে পায় না। আশ্রয়কে দায়গ্রস্ত বলিয়া বোধ হয়। মোহদৃপ্ত যেমন মোহাতীত মঙ্গলে অবিশ্বাস করিয়া আপনাকে ধন্য বিবেচনা করে, অতিবুদ্ধি-দৃপ্ত আত্মগণ্ডিবদ্ধ সেইরূপ আপনার চতুঃসীমার বাহিরে সন্দেহ-মিটিমিটি কুটিল কটাক্ষে চাহিয়া আত্মগৌরবে পুলকিত ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। আশ্রয়দানের মধ্যে সে গভীর রহস্যপূর্ণ জটিল উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, সুতরাং তাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা ঠাঁই পায় না। সরল চিত্তই কৃতজ্ঞতার প্রিয় আবাস।

কিন্তু সরল চিত্ত কাহাকে বলে? কথা-উদ্গীরণ-ক্ষমতাই কি সরল চিত্তের লক্ষণ? তাহা যদি হয়, তবে বাঙ্গলা দেশের দলাদলি-দক্ষ আল্‌গা-প্রকৃতিগুলিই সরলতার প্রতিমা। বাট্‌না বাঁটিতে, কুট্‌না কুটিতে যাহারা অম্লান বদনে প্রতিবেশীর কুষ্মাণ্ডের খুঁৎ এবং অলাবুর ছিদ্রের উল্লেখ করিয়া তৃপ্ত হয়, তাহারাই তাহা হইলে সরলচিত্তের আদর্শ। কিন্তু তাহা ত আর নয়। সরল চিত্ত সোজা কথার বাঁকা টীকা এবং অনর্থ অর্থ করে না। কৌটিল্য সারা দিন সরল রেখার অভাব লইয়া হাহাকার করিয়া মরে, সারল্য সংসারে সরলরেখা দেখিতে পায়। যাহা হৌক্, সরলতা সম্বন্ধে এখানে অধিক কথা বলা শোভা পায় না, কথায় কথায় আভাস যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট।

কৃতজ্ঞতা সরল হৃদয়ের স্বভাব। সরলহৃদয় সাধু অতিথি আশ্রয়ের ছোটখাট ত্রুটি লইয়া দিন কাটায় না। আশ্রয়ের ভাবের মহত্ত্বেই তাহার তৃপ্তি। সংসারে দোষ নাই কাহার? মানুষ কিছু আর পূর্ণ পুরুষ নহে। ইহা জানিয়া সরলহৃদয় কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ক্ষমাশীল। কৃতজ্ঞতা ক্ষমাশীলতার সহচর।

৩

সভ্যতার আইনের গুণে চিঠিপত্রে এবং বাক্যালাপে দুই বেলা রাশীকৃত কৃতজ্ঞতা ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ ইষ্টকস্তূপের মত বিতরিত হয়। কিন্তু আইন-ঐন্দ্রজালিকের এ

কৃতজ্ঞতা মুহূর্ত্তের শোভা মাত্র। ইহাতে হৃদয়ের অদম্য আবেগ, অন্তরের সুগভীর উচ্ছ্বাস আদবেই প্রকাশ পায় না। প্রকৃত কৃতজ্ঞতার নীরবতাই ভাষা। সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া সে দুরূহ সমাস-দীর্ঘ কতকগুলা জড় পাষাণ কথা সংগ্রহ করিয়া রাখে না। সহজ ভাষা, সরল ভাব লইয়াই তাহার কারবার। প্রাণ দিয়া সে যাহা করিয়া যায়, প্রাণান্তেও মুখে তাহা বলে না। কিন্তু না বলিলেও বুঝিতে কতক্ষণ? মেঘ করিয়া থাকিলেও উষার বিকাশ অনুভব করিতে বিলম্ব হয় না।

কৃতজ্ঞতার আইন আদালত নাই। আইন আদালত দুষ্ট অধার্ম্মিকের দণ্ডের জন্য। কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মপ্রাণ, সুতরাং তাহার আদালতের আবশ্যকতা কম। উপকার স্বীকার করিতে সে কোনও কালে কুণ্ঠিত নহে। প্রত্যুপকার করিতে পারিলে ত বাঁচিয়া যায়। এই জন্য প্রেমের মত কৃতজ্ঞ কেহই নয়। প্রেম নীরবে কাজ করিয়া যায়, কিছু প্রত্যাশা করে না। প্রেমহীন কৃতজ্ঞতা মায়ামরীচিকা মাত্র। যথার্থ কৃতজ্ঞতার প্রেমেই প্রতিষ্ঠা।

সংসারে কৃতজ্ঞ ব্যক্তির অবশ্য অভাব নাই, কিন্তু কৃতজ্ঞতা অনেক সময় দায়ে পড়িয়া আসে। সুবিধা পাইলেই সে বন্ধন ছিন্ন করিতে চায়। পাঠকেরা ভুল বুঝিতে পারেন যে, সংসারের উপর বিরাগবশতঃ আমরা সংসারের প্রকৃত কৃতজ্ঞতা দেখিতে পাই না, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা এই সংসারেই আছে। তবে কৃতজ্ঞতা যে বড় কঠিন ধর্ম্ম, ইহা দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ সংসারে যেরূপ দেখা যায়, তাহা হইতেই আমাদের সিদ্ধান্ত।

বড়মানুষী

১

বড়মানুষী সম্বন্ধে সাধারণ্যে নানাপ্রকার কল্পনা দেখা যায়। আমাদের দেশে বড়মানুষীর সহিত আলস্যাধার তাকিয়া-কুল এবং অবসর-লালায়িত মোসাহেববর্গবেষ্টিত শূন্যগর্ভ বিপুল উদরপুঙ্গবের ভাব অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। বড়মানুষীর তাম্রকূট-ধূমোদ্গীরিত পর-সমালোচনাচ্ছন্ন পাষাণ-সিংহাসনে নির্ম্মম শকুনি-ব্রতের প্রতিষ্ঠা না করিয়া অনেকে তাহার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও ভাব মনে আনিতে অক্ষম। বড়মানুষীর দুয়ারে নাগরা-ব্যবহার-দক্ষ চাপরাস-স্ফীত গালপাট্টাদীপ্তমুখশ্রী দোবে চোবে এবং পাঁড়ে বংশের ডাল-রুটিধ্বংসক্ষম চিরপ্রদীপ্ত জঠরানল প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত বলিয়া খ্যাত। শাসন-দণ্ড-হস্তে সে যেন কেবল সংসারে দাঁত খিচাইতেই আসিয়াছে। কিন্তু সাধারণের যাহাই বিশ্বাস হউক না কেন, তাহার চরিত্র বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হানি নাই।

প্রাচ্য বড়মানুষী সম্বন্ধে সাধারণের কল্পনা বিশেষ ভ্রমাত্মক বলা যায় না। নিরীহ পথিকপৃষ্ঠে গাড়োয়ানের পার্শ্বদেশ হইতে বিস্তৃত চাবুক-আস্ফালনই অনেক সময় ধনদৃপ্ত আত্ম-প্রকাশ-ব্যস্ত বড়মানুষীর পরিচয়। দানে ধন ব্যয় করিবার ক্ষমতা সকলের নাই, অথচ বড়মানুষী প্রদর্শন করিতে হইবে; সুতরাং কিংখাপের একটা জামা গায়ে দিয়া সারাক্ষণ পৃথিবীর দিকে কুঞ্চিত-কটাক্ষে চাহিয়া না থাকিলে চলে না। আপনাকে দিনরাত সাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে হইবে, সাধারণের জন্য পাদুকার তলদেশে একটা দাঁড়াইবার স্থান চাই মাত্র। তাহা নয় ত বড়মানুষী প্রমাণ হয় কিরূপে?

বড়মানুষীর সুখ আছে কি না জানি না, কিন্তু সোয়াস্তি নাই। বিনয় তাহার স্বভাব নহে, অথচ তাহাকে কথাবার্ত্তায় বিনয় প্রকাশ করিতে হইবে। এই জন্য ব্যস্ততায় সে ধরা পড়ে। দীর্ঘ আড়ম্বরের কল্যাণে তাহাকে অনেক কথা কণ্ঠস্থ করিতে হয়। বিনয়ীর এক কথার স্থলে বিনয়-প্রদর্শনেচ্ছু বড়মানুষীর দশ কথা চাই। কথায় কথায় তাহার রজত কাঞ্চনের আভা ব্যক্ত করিতে হইবে, এই জন্য সে বিনয়ের একটা কাচগৃহ নির্ম্মাণ করে, যাহাতে স্বর্ণ রজত প্রদর্শনের কোনও অসুবিধা না হয়, অথচ আন্তরিক প্রদর্শন-চেষ্টা না প্রকাশ পায়। স্বর্ণ-সম্পর্কশূন্য বড়মানুষী গিল্টিবিদ্যায় কাজ হাসিল করিয়া লয়। সংক্ষেপে বড়মানুষীর মূলমন্ত্র প্রদর্শনী।

২

অনেকে মনে করেন, বড়মানুষীর মূল কারণ অর্থ। অনেক সময় বটে, কিন্তু সকল সময় বড়মানুষী অর্থপ্রসূত নহে। বড়মানুষী একটা স্বভাব। অনেক অর্থহীন ব্যক্তি বড়মানুষী করিয়া মারা গিয়াছে। অর্থবান্ ব্যক্তিরও বড়মানুষীর অভাব দেখা যায়। আমার বোধ হয়, অর্থের উপরে যাহাদের প্রভুত্ব আছে, তাহাদের মধ্যে বড়মানুষী নাই। অর্থসর্ব্বস্ব অর্থের দাসেরাই বড়মানুষীপ্রিয়। বড়মানুষী প্রবৃত্তিবিশেষ। তাহাকে অর্থমূলক বলা ন্যায়সঙ্গত নহে, ধর্ম্মমূলক বলাও চলে না, প্রবৃত্তি অথবা স্বভাবমূলক বলাই বোধ করি ঠিক। অর্থের দাসেরাও অনেক সময় বড়মানুষীপ্রিয় নয়। কৃপণ তাহা হইলে থাকে কোথায়?

বড়মানুষীর জীবন উপভোগ করা হয় না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিভীত প্রদর্শনী-অনুষ্ঠান আচ্ছন্ন হইয়া সে হাবুডুবু খাইতে থাকে। কিন্তু স্ফীতি-আতিশয্যে নিজে তাহা বুঝিতে পারে না। আপনার বড়ত্ব সম্বন্ধে সে নিঃসংশয় কি না, তাই মনে করিতে পারে না যে, তাহাকে গ্রাস করিতে পারে, সংসারে এরূপ কিছু আছে। বিস্ফোটকের মত তাহার গায়ে মোসাহেবকুল আঁটিয়া বসিয়া থাকে, তাই তাহার যত স্ফীতি-সুখ। কিন্তু স্ফোটক-স্ফীতি দেখিয়া রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থ ঠাহরাইবে কে?

বড়মানুষীর জীবন উপভোগ করিবার সুবিধা নাই শুনিলে আশ্চর্য্য ঠেকে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য ঠেকিবার কিছু নাই। জাঁকজমকই উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত। সারাক্ষণ যদি আপনার ধনাগার খুলিয়া বসিয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে ধন উপভোগ করিবার সময় কোথায়? জীবন উপভোগ করিতে হইলে আপনাকে একটু টানিয়া রাখিতে হইবে—নিশিদিন অট্টহাস্যের মধ্যে কি শান্তি অনুভব করা যায়? আপনার প্রতি চাহিবার অবসর চাই। আপনার প্রাণের মধ্যে বসিয়া আপনার হৃদয়ে আপনাকে আলিঙ্গন করা চাই। কিন্তু সে অবসর ত আর হট্টগোলে মিলে না। এই জন্যই বড়মানুষীর মধ্যে জীবন উপভোগের ব্যাঘাত অনেক।

৩

বড়মানুষ আর বড়লোকে প্রভেদ বিস্তর। বড়লোকের ধন যথেষ্ট থাকিলেও অভিমান কম। সে সারাদিন ধন দেখাইবার জন্য, ক্ষমতা জাহির করিবার জন্য ব্যস্ত নয়। তাহার মধ্যে একটি উচ্চ ভাব আছে, সেই ভাবেই তাহার বড়লোকত্ব। আপনার কপালে ছাপ দিয়া, কপোলে ব্যাখ্যা লিখিয়া তাহার আপনাকে প্রকাশ করিতে হয় না। বড়মানুষী আপনার মূর্খতা লইয়া পণ্ডিতবর্গের সম্মুখে অকাতরে আস্ফালন করিয়া তৃপ্ত হয়। বড়লোকত্ব ধীর, গম্ভীর, আস্ফালনশূন্য। পণ্ডিতেরা বড়মানুষীর আস্ফালন দেখিয়া লাঙ্গুল কল্পনা করেন, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড রচনা করেন। বড়লোক অপেক্ষাকৃত হীনবিদ্য হইলেও তাঁহার সম্মান করেন। কারণ, তাহার আস্ফালন-অভাব।

বড়মানুষীর আস্ফালন অতি ভয়ানক, বিরক্তিকর এবং হাস্যকর। সে আস্ফালনে প্রতিবেশীবর্গের অৰ্দ্ধেক রাত্রি নিদ্রা হয় না। আপনার অশান্তিতে বড়মানুষী পাড়ার শান্তি পর্য্যন্ত বিনাশ করে। একপ্রকার অচেতন অজ্ঞানমত্ততায় অবরুদ্ধ হইয়া সে কেবল অশান্তি-যন্ত্রণা ভুলিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু কত ক্ষণ? মত্ততাসুখে মানুষ কি সর্ব্বক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে? তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠে, আপনার উপরে পর্য্যন্ত বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। তখন সে বিতৃষ্ণা ঢাকিবার জন্য, সে হৃদয়ভেদী যাতনা লুকাইবার জন্য বড়মানুষী আরও মত্ততাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। বাহিরের লোকে বড়মানুষীর নিরুদ্বিগ্ন সুখ কল্পনা করিয়া অবাক্ হইয়া দেখে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, বড়মানুষীর সোয়াস্তি নাই, তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। ধুমধাম কেবল একটা আবরণ মাত্র।

রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় বড়মানুষীগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয় স্ফূর্ত্তি পায় না, প্রাণের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না, নিশিদিন আপনায় ঘন অন্ধকারে আবৃত হইয়া তাহার অবসান হয়। সাময়িক অর্থস্বচ্ছলতার উপর মোসাহেব-ছারপোকাকুলের রক্তাভাবজনিত হাহাকার শুনা

যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ত আর সান্ত্বনা হয় না। বরঞ্চ কষ্ট বৃদ্ধি হয়। তাই বড়মানুষীতে তৃপ্তি কোথায়, আনন্দ কোথায়? কেবলই মুহূর্ত্তের ভোঁভাঁ।

উপভোগ

১

সংসারে সকলেই সব দেখে, কিন্তু উপভোগ করে কয় জন? ইন্দ্রিয়বিশেষের সাহায্যে ফুলের গন্ধ সকলেই পায়, কিন্তু সে সৌরভে আকুল হয় অল্প লোকে। উপভোগ করিবার ক্ষমতা স্বতন্ত্র—তাহা দর্শন স্পর্শনের অতীত। আমরা যে বস্তু যতটা উপভোগ করি, ততটা তাহাকে আত্মসাৎ করিয়া লই। বহির্জগতে রাখিয়া তেমন উপভোগ করা যায় না, বিস্তৃত অন্তর্জগতে আনিয়া এই জন্য ভোগ্য বস্তুকে আমরা প্রাণাবৃত করিয়া ফেলি। বাস্তবিক দেহকে কি কেহ উপভোগ করিতে পারে? আভ্যন্তরীণ প্রাণ পরিব্যাপ্ত হইয়াই দেহ হয় উপভোগ্য। মৃত দেহ ত কেবল স্মৃতির বিলাপমন্দির।

এই জন্য যাহারা দেহ উপভোগ করিতে চায়, তাহারা বঞ্চিত হয়। পাঁচজনকে দেখাইবার জন্য যাহার উদ্যান রচনা, তাহার উপভোগ করিবার অবসর অল্প। যে ব্যক্তির উদ্যান তাহার সৌন্দর্য্য-প্রেমের স্ফূর্ত্তি, সেই যথার্থ তাহা উপভোগ করে। উপভোগের মূলে হৃদয়ের সুগভীর প্রেম প্রকাশ পায়। মৃত্যুর পরেও আমরা প্রিয়জন-সঙ্গসুখ উপভোগ করিয়া তৃপ্ত হই কেন? যাহারা জড়দেহ উপভোগ করে, চিতাভস্মের সহিতই তাহাদের সকল অবসান হয়। কিন্তু প্রাণোপভোগীর উপভোগের বিনাশ নাই—কারণ, প্রাণ অবিনশ্বর।

দেহ অনুপভোগ্য। স্বর্ণের ফুল, রজতপত্র প্রাণহীন; তাহা উপভোগ করে কে? উপভোগবৃত্তিবিহীন বড়মানুষীর বাগানেই তাহা শোভা পায়। প্রকৃতির প্রাণময় আনন্দময় স্ফূর্ত্তি অভাবে তাহারা শুষ্ক। গোলাপ বেল চম্পকের মত তাহাদের ভাষা নাই। পরশ্রীকাতরতার মত তাহারা যেন আপনার মধ্যে মরিয়া আছে। তাহাদের দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায় না, দুঃখ হয় মাত্র। স্বর্ণকুসুমের মধ্যে যদি প্রকৃতির প্রাণ বিকশিয়া উঠিত, তাহা হইলে কি আর তাহা অনুপভোগ্য জড় হইয়া থাকে?

২

জড়তাই উপভোগের প্রধান ব্যাঘাত। জড়ের সহিত কেহ ত আর কথা কহিতে পারে না। সুতরাং হৃদয়ে হৃদয়ে আদান প্রদান বন্ধ হয়। এই জন্য প্রকৃতির যেখানে যত

প্রাণের বিকাশ, সেখানেই উপভোগের আনন্দ। মরুভূমি অপেক্ষা বৃক্ষসমাচ্ছন্ন বনভূমি তৃপ্তিকর, শ্যামল প্রান্তর অপেক্ষা কল্লোলধ্বনিত নদীকূল শান্তিপ্রদ। জড়সংঘর্ষণে হৃদয় জড়ীভূত হইয়া যায়। প্রাণ প্রাণকে আকর্ষণ করে, জাগাইয়া তুলে। প্রাণে প্রাণ উথলিয়া উঠে। প্রাণানন্দ জড় হৃদয় উপভোগ করিতে অক্ষম।

ভাষা যেখানে যেমন সু-অভিব্যক্ত, সেখানেই সেইরূপ আনন্দোপভোগ। শব্দময়ী কথার কথা বলিতেছি না, ভাবময়ী ভাষার কথা হইতেছে। প্রেমভাবের অভিব্যক্তিতেই ভাষার সৌন্দর্য্য। ভাষাই উপভোগের প্রধান উপায়। উপভোগ্য—ভাব। কবিরা ফুলের ভাষা শুনিতে পান, প্রকৃতির ভাষা বুঝিতে পারেন, এই জন্য তাঁহারাই প্রকৃতিকে যথার্থ উপভোগ করেন। তুমি প্রকৃতি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া থাক, ভাষাবিদ্ কবি প্রকৃতির কাহিনী শুনিয়া তাহার আনন্দটুকু আপনার মধ্যে অনুভব করেন। তাহার দীপ্ত মুখশ্রীতে আমাদের নিকট তাহা প্রকাশিত হয়। ছাপার অক্ষরের মধ্য হইতে এই দীপ্ত শ্রী উঁকি মারে বলিয়াই কবিতার আনন্দ।

যাহারা সাজসজ্জা লইয়া ব্যস্ত, তাহারা আমাদিগকে বোধ হয় ভালরূপ বুঝিতে পারিবে না। তাহারা ভাব চাহে না, আনন্দ চাহে না, চাহে আর বুঝে কেবল হাঁকডাক। গৃহসজ্জার আরামোপযোগী পারিপাট্য অপেক্ষা আধিক্য এবং অধিকমূল্যতার প্রতিই তাহাদের অনুরাগ, কবিতার সৌন্দর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাহারা দুর্বোধ্য সংস্কৃত অভিধান-মথিত শব্দাবলী লইয়া সন্তুষ্ট, সঙ্গীতের মুখ্য উদ্দেশ্য ভাবপ্রকাশ ছাড়িয়া উপায় সা-রে-গা-মায় তন্ময়। অন্তর্জগতে গতিবিধি অভাবে উপভোগের অতীন্দ্রিয়তা তাহাদের নিকট অজ্ঞাত।

৩

দুঃখ আমাদের উপভোগ-ক্ষমতার নিকষ-পাষাণ। দুঃখে অল্পবিস্তর কাতর হয় সকলেই। সুতরাং তাহাতে বিশেষ কিছু বুঝা যায় না। কিন্তু দুঃখকে উপভোগ করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দ অনুভব করে, তাহার উপভোগক্ষমতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুঃখের মর্ম্মস্থল বাহিয়া আশা নিরাশাময় অভাব-ভাবময় কি যেন একটা সূক্ষ্ম ভাবের নদী বহিয়া গিয়াছে, সেই সূক্ষ্ম মিলায়-মিলায় ভাবে দুঃখের উপভোগানন্দ। স্থুল-বস্তুগত-প্রাণ এ ভাব ধরিতে না পারিয়া সুখের স্বর্ণ-সিংহাসন উপভোগ করিবার কল্পনায় ফিরে।

সুখ কি উপভোগ করা যায় না? যায়, কিন্তু অনেকেই তাহা উপভোগ করিতে পারে না। সুখের সেবা করা যত সহজ, সুখ-উপভোগ তত সহজ নয়। সুখ উপভোগ করিতে হইলে দুঃখের প্রাণ চাই। উচ্চকণ্ঠ-হাস্যের উপরেই যদি সুখ নির্ভর করিত,

তাহা হইলে কথা ছিল বটে। কিন্তু তাহা ত আর নয়। দুঃখের মধ্যেই সুখের অজ্ঞাতবাস।

প্রাণের মধ্যে আনন্দ অনুভবই উপভোগ। উচ্ছৃঙ্খল সুখকে অনেক সময় আনন্দ বলিয়া ভ্রম হয়। এই জন্য আমরা অনেক বার যথার্থ উপভোগ হইতে বঞ্চিত হই। উপভোগানন্দে এমন একটি সংযমভাব আছে, যাহা সুখে নাই, মোহে নাই, যাহা টানিয়া বুনিয়া আনা যায় না। এই সংযমভাবেই উপভোগের মাধুরী। উচ্ছৃঙ্খলতায় একটা কাল্পনিক ক্ষণিক সুখ থাকিতে পারে, কিন্তু সংযমভাবের গভীর আনন্দ সেখানে কোথায়? উপভোগ সংযমপূর্ণ। এই জন্যই আনন্দ উপভোগে। ['ভারতী ও বালক,' কার্ত্তিক ১২৯৬]

স্মৃতি ও কবিতা

বস্তুর রাজ্যে কবিতার খেলিবার প্রায় সুবিধা হয় না, কোনও প্রকারে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া যায়। কিন্তু নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়া সে একেবারে রিক্তহস্তে ফিরে না, কাঠামর একটা আব্‌ছায়া স্মৃতি লইয়া ঘরে ফিরে। সেই স্মৃতি হইতে টানিয়া টানিয়া কবিতা আপনাকে ফুটাইয়া তুলে। বস্তুর আবছায়ার মধ্য হইতে প্রাণ বাহির করাই তাহার কাজ। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সহিত তাহার বড় একটা সম্বন্ধ নাই। এই জন্য কবিত্ব ভাবে। ছন্দে, কথায়, অনুপ্রাসে এবং শ্লেষপ্রয়োগে কবিত্ব নহে। ভাব প্রকাশের সহায়তা করে বলিয়াই ইহাদের যাহা কিছু মর্য্যাদা।

স্মৃতির মন্দিরেই কবিতার প্রতিষ্ঠা। প্রমাণস্বরূপ অনেক বড় বড় কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে, যাঁহারা বস্তু দেখিয়া কবিতা লেখেন নাই, অনেক কাল পরে অবশিষ্ট স্মৃতিটুকু লইয়াই কবিতা রচনা করিয়াছেন। হিমাদ্রির উন্নত শৃঙ্গ দেখিয়া হৃদয় ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন সে ভাব কি প্রকাশ করা যায়? কবির তখন আপনার উপরে দখল নাই। ধ্যানমগ্ন যোগীর মত আপনার হৃদয়ে তিনি তখন সেই মহান্ গম্ভীর ভাব অনুভব করিয়া আকুল। তখন কবিতা লিখিতে বসিলে সে ভাব অনুভব করা যায় না, সুতরাং কবিতা বাহির হয় না। কবির হৃদয়ে কবিতা রচিত হইলে তবে তিনি তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন।

চিত্রে বস্তুর ছায়া থাকে, কবিতায় ছায়াও থাকে না—যাহা থাকে, আবছায়া। তাহা ছায়া বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু ছায়ার যতটুকু বস্তুগত অস্তিত্ব, তাহাও তাহার নাই। কবিতায় ছায়া-ভাব; ছায়া-বস্তু কোথায়? ভাব স্মৃতিতেই জমিয়া আসে, বস্তু তখন

একেবারেই মুছিয়া গিয়াছে। এই কারণে কবিতা স্মৃতিময়ী। স্মৃতি-আচ্ছন্ন হইয়াই সে থাকে, বস্তু-আচ্ছন্ন হইয়া থাকে না। বস্তু-আচ্ছাদনে ভাবের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত হয়। মনোরাজ্য সম্বন্ধে যাঁহারা কখনও আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, কবিতায় বস্তু একেবারে বাদ যায় নাই, অথচ কবিতা বস্তু-আচ্ছন্ন নহে কেন। মনোরাজ্যে যাঁহাদের গতিবিধি নাই, তাঁহাদিগকে এ কথা বুঝান অসম্ভব।

কবিতার বিষয় অনেক সময় বস্তু। কিন্তু বস্তুর মধ্যে যে অশরীরী প্রাণ আছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া তুলাই যথার্থ কবিতার কাজ। কাঠাম গড়িতে কুম্ভকার মাত্রেই পারে, কিন্তু কাঠাম যে প্রাণে ওতপ্রোত, সেই প্রাণ প্রস্ফুটিত করা যে-সে ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে। কাঠামর বিশেষ বিবরণ জানিতে হইলে শারীর বিজ্ঞান আছে। কবিতার উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কবিতায় প্রতিভার বিকাশ, প্রাণের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি আবশ্যক। গণ্ডির মধ্যে কবিতা বাঁচে না, কবিতা বিশেষরূপে ভাবগত। তাহা যতই বস্তুর নিকটে সরিয়া আসে, ততই শ্লোকে ছড়ায় অথবা ঐ জাতীয় কোন-কিছুতে পরিণত হয়। বস্তুর আড়ালে ভাব ঢাকা পড়ে। অতি দীর্ঘ উচ্চ প্রাচীর গাঁথিয়া কে কবে গৃহের শোভা ব্যক্ত করিতে পারিয়াছে ?

কবির মনে স্মৃতিই প্রথম কবিতা রচনা করে। কিন্তু অপার্থিব, সুতরাং অদৃষ্ট বিষয়ে স্মৃতি রচনা করিবে কিরূপে ? বলা বাহুল্য, কল্পনারও একটা স্মৃতি আছে। কবি কল্পনায় একটা বিষয় খাড়া করিয়া তুলেন, তাহার পর তাঁহার মনে তাহার কেবল একটা অস্পষ্ট আকুলি ব্যাকুলি মাত্র থাকিয়া যায়। অদৃষ্ট বিষয়ের কবি এই স্মৃতি। একেবারে স্মৃতি-সম্পর্কশূন্য কবিতা বোধ হয় নাই। তবে স্মৃতি অবশ্য বস্তুরও আছে, ভাবেরও আছে। কিন্তু বস্তুর স্মৃতিও অনেকটা ভাবময়। স্মৃতিতে ত আর বস্তু থাকিতে পারে না।

স্মৃতিতে প্রথম উচ্ছ্বাসটা অনেক সংযত হইয়া আসে। উচ্ছ্বাসবাহুল্যে অভিভূত জড়ভাব থাকে না। উচ্ছ্বাসের যখন পূর্ণ আবেগ, তখন নীরবতা বৈ তাহার ভাষা নাই। উচ্ছ্বাসকে আপনার অধীনে আনিতে পারিলে তখনই ভাষা ব্যক্ত করা যায়। কিন্তু সে ভাষাও তেমনি উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী ; নীরস বাহবার মত তাহা কেবল মুখের ভাষা নয়—ভাবের ভাষা, হৃদয়ের ভাষা, আবেগের ভাষা।

সুবৃহৎ সংযত কল্পনাই যথার্থ কবির পরিচয়। অসংযত কল্পনা শিশুরই শোভা পায়। কবি কল্পনার চালক—দাস নহেন। যথেষ্ট সংযম না থাকিলে সুসংলগ্ন ভাবের কবি হওয়া যায় না। স্মৃতি সংযমের এক প্রধান উপকরণ বলা যাইতে পারে। এই জন্য বোধ হয় কবিতার জন্ম প্রায়ই স্মৃতিতে।

স্মৃতিতে সৌন্দর্য্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হয় কি না। অনেক জিনিসের সৌন্দর্য্য কেবল অতীতের মধ্য হইতেই বিকশিত হইয়াছে। ঝরা ফুলের সৌন্দর্য্য কেন ? তাহার মধ্যে

অতীতের সৌরভ বিলীন হইয়া আছে বলিয়াই নয়? সে যদি কলিকাবস্থা হইতে ব্যক্ত হইয়া না ঝরিয়া পড়িত, তাহা হইলে আমাদের নিকট কি তাহার বিশেষ সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হইত? অতীতের সৌরভ-স্মৃতি-সমাচ্ছন্ন হইয়াই সে সুন্দর। আমাদের হৃদয়ের অনেক ভাবেরও নিজস্ব সৌন্দর্য্য যত থাক না থাক, প্রাচীন স্মৃতিতে তাহা অনেক সময় বিশেষ সুন্দর হইয়া উঠে। গীতিকবিতার যাঁহারা অনুশীলন করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

বিদ্যাপতির রাধা গাহিয়াছেন, "জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" কৃষ্ণের বস্তুগত রূপ উপভোগ করিতে করিতে রাধা কি এমন কথা বলিতে পারিতেন? কৃষ্ণ যখন চোখের আড়ালে, তাঁহার রূপ কেবল স্মৃতিতে জাগিয়া আছে, তখনই রাধা এই কথা বলিয়া উঠিলেন। বস্তু উপভোগের সময় তাঁহার এ ভাব স্ফূর্ত্তি পায় নাই। বস্তু যখন সরিয়া গেল, ভাব বিকশিত হইল। উদাহরণের অভাব নাই, ঘরের কাছেই অনেক দৃষ্টান্ত মিলে।

বস্তু যতক্ষণ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য থাকে, ততক্ষণ তাহা হৃদয়ে তেমন মিশাইতে পারে না। নয়ন দেখিয়া দেখিয়া অবশ হইয়া আসে, নয়ন-তারাতেই বস্তুর ছায়া পড়ে। তাহার পর বস্তু যেমন দৃষ্টির অতীত হয়, ছায়া নয়ন-তারা ছাড়িয়া একেবারে হৃদয়ে মিশায়—ছায়া তখন ভাবে পর্য্যবসিত। এই ভাবময় হৃদয় যখন পূর্ণ উচ্ছ্বাসে বিকশিয়া উঠে, তখনই কবিতা সৃষ্ট হয়। সে প্রবল ভাবস্রোত রোধ করা যায় না। কৃত্রিম উপায়ও সে স্রোত বহাইতে পারে না। কবিতার প্রাণ স্বাভাবিকতা।

কবিতা স্মৃতির অভিব্যক্তি। স্মৃতির অভিব্যক্তি মাত্রই কিন্তু কবিতা নহে। কবিতার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট নয়। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের অন্ধকার গহ্বর হইতে অতি সন্তর্পণে একটি সুবৃহৎ সংজ্ঞা বাহির করিবারও আবশ্যক নাই। কবিতা কাহাকে বলে, সাধারণতঃ সকলেই বুঝে। চেষ্টা করিলেও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সর্ব্বতর্কখণ্ডনী সংজ্ঞা আমরা বাহির করিতে পারি কি না সন্দেহ।

সংস্কৃত অলঙ্কারের অনুবাদ করিয়া বলা যাইতে পারে, কাব্য রসাত্মক বাক্য। কিন্তু আমাদের নিকট এ অনুবাদিত সংজ্ঞা বিশেষ ভাবপ্রকাশক নহে। আমরা রসাত্মক বাক্য বলিতে যাহা বুঝি, কবিতা হইতে তাহা অনেক সময় বহুদুর। অতএব পাঁজি পুঁথি শাস্ত্র যথাসম্ভব বাদ দিয়া প্রবন্ধসমাপ্তির দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক্।

স্মৃতির সহিত কবিতা যে বিশেষরূপে সম্বন্ধ, ইহা দেখান গিয়াছে। সকল নিয়মেরই স্থলবিশেষে ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ কবিতারচনা স্মৃতিতে। স্মৃতিকে এই জন্য কবি বলিলে বোধ করি বড় অত্যুক্তি হয় না। ['ভারতী ও বালক,' কার্ত্তিক ১২৯৬]

সন্ধ্যা

জগৎকে আপনার ছায়ালোক-রহস্যে ঘিরিয়া শান্তনেত্রে সন্ধ্যা ধীরে ধীরে দিগন্তের কনকক্রোড় হইতে নামিয়া আসে। চঞ্চল চরণের চারি ধারে চুম্বন-অধীর শুভ্র মেঘখণ্ড লাবণ্যবিভাসিত হইয়া ভাসিয়া বেড়ায়। সন্ধ্যার অঞ্চলস্পর্শে তাহারা ঈষৎ দূরে দূরে সরিয়া দাঁড়ায়; সন্ধ্যা স্বর্ণরেখ সুরপথ দিয়া নীরবে নামিয়া যায়। ধরণীর কুঞ্জবনে বনে ফুল ফুটিয়া উঠে, সৌরভস্নেহে শ্রান্তি ভুলিয়া শাখায় শাখায় সমাগত বিহগেরা আনন্দ-আকুল স্বরে সন্ধ্যাকে সাদর সম্ভাষণ করে। স্বভাবের কুসুমশয্যায় সন্ধ্যা স্নেহময়ী মা'র মত আসিয়া বসে। জগৎ যেন এতক্ষণে পূর্ণ হইয়া উঠে।

ছায়াময়ী সন্ধ্যার আবির্ভাবে জগৎও ছায়াপুরী বলিয়া বোধ হয়। ছায়ার মত নীরবে নিঃশব্দে মানবেরা যায় আসে, ধরণীতে তাহার চিহ্ন পড়ে না। সন্ধ্যার অঞ্চল-বায়ে স্তব্ধতা কেবল মৃদু মৃদু শিহরে মাত্র, কিন্তু তাহার মুখ ফুটে না। ধ্যানরত যোগিহৃদয়ে সংযত নিশ্বাস যেমন বহে কি না বহে, সেইরূপ সন্ধ্যার হৃদয়ের মধ্যে জগৎস্রোত বহে কি না বহে। হৃদয়ের উত্থান পতন অনুভব করা যায় কি না যায়। সন্ধ্যা যেন কেমন ভাবে তন্ময়ী। স্থির অচঞ্চল নেত্রে জগতের কূলে বসিয়া মায়াময় অতীত সূত্রে মৃত্যু প্রতি দিনই শত শত ভগ্ন হৃদয় লইয়া গাঁথিতেছে, সন্ধ্যা অনিমেষনয়নে সেই দিকে চাহিয়া।

কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া সন্ধ্যা এইরূপ নীরবে ম্লাননেত্রে চাহিয়া থাকে? কে জানে! সন্ধ্যা আসে—মায়ের মতন জগৎকে স্নেহ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া যায়। হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহেই সন্ধ্যা সুন্দর, জগৎকে স্নেহ করিয়াই তাহার একমাত্র তৃপ্তি। দীপ্ত মুখশ্রীতে পূর্ণ স্নেহ বিভাসিত। সেই স্নেহে প্রতিভাসিত হইয়া জগৎ পুলকদেহ, আনন্দোদ্বেলিতহৃদয়, নীরব, শান্ত। শান্তিময়ী সন্ধ্যায় সকল কোলাহল অবসান হইয়াছে। সমাপনগান গাহিয়া দিবা অস্তাচলপাদদেশে লুটাইয়া পড়িল, গানের শেষ ক্ষীণ তানটুকু লীনপ্রায়।

সন্ধ্যা নীরব, গম্ভীর। নীরবতাই তাহার ভাষা। সে ভাষা ভাবে পূর্ণ, ভাবে ব্যক্ত, শব্দাড়ম্বরবিহীন। সন্ধ্যার নয়নের কোণে, অধররেখায়, বিকশিত মুখলাবণ্যে তাহার বিকাশ। সে আবেগময় মর্ম্মস্পর্শী গম্ভীর ভাব কি শব্দের ভাষায় প্রকাশ করা যায়। এ ভাব অস্ফুট, কোথাও অর্দ্ধস্ফুট, হৃদয়ের উপর ইহার পূর্ণ প্রভাব। ইহার কতকটা ব্যক্ত মাত্র, বাকিটুকু অনুভব করিয়া লইতে হয়।

সন্ধ্যার ভাবে জগতের প্রাণের মধ্যে কেমন একটা সৌম্য গাম্ভীর্য্য বিকশিত হইয়া উঠে। সুখের তীব্রতা মুছিয়া গিয়া দুঃখের আনন্দের মত সেখানে একটি মধুর স্নিগ্ধ ভাব থাকিয়া যায়। তীব্র সুখে ত আর গভীরতা নাই। সন্ধ্যার গভীর ভাবে এই জন্য সুখ-জ্বালা থাকিতে পায় না। সন্ধ্যা যেমন নীরবে ধীরে ধীরে মেঘাতীত মায়াপুরী হইতে নামিয়া আসে, আমাদের হৃদয়ও সেইরূপ নীরবে অজ্ঞাতসারে সান্ধ্য ভাবাচ্ছন্ন হইয়া আসে। দিবসের প্রখর ভাবাবসানে হৃদয় প্রশান্ত ভাব ধারণ করে।

সন্ধ্যা নামিয়া আসে; মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া জগৎ সংগ্রামকোলাহল হইতে বিরত হয়। মুক্ত নীলাকাশে শান্ত সৌন্দর্য্য—ভ্রূকুটি নাই, অন্ধকার নাই, আলোকের তীব্রতাও নাই; মুক্ত মানবহৃদয়েও নীরব পবিত্রতা—কুটিলতা মায়াবিনীর গরল-নিশ্বাসে হৃদয় দূষিত নহে। বহিঃপ্রকৃতি অন্তঃপ্রকৃতি যেন মায়ের কোলে আশ্রয় পাইয়া নিঃশঙ্ক, কলঙ্কমুক্ত, প্রেমাপ্লুত।

সন্ধ্যা একাকিনী বসিয়া। শিথিল কেশপাশ কপোল বাহিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছে। আলুথালু কেশগুচ্ছের মধ্য হইতে সন্ধ্যাতারা অস্পষ্ট দেখা যায়—অতি ক্ষীণ, মিটিমিটি। জগৎ সন্ধ্যার কোলের নিকট সরিয়া আসিয়া বসে। মৃদু শান্ত হাসি হাসিয়া সন্ধ্যা তাহাকে স্নেহ দেয়। সে সুগভীর স্নেহাকর্ষণে জগৎ আর বাহিরে যাইতে পারে না।

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহী ব্যক্তি যেমন সংসারে থাকিয়াও সংসারাচ্ছন্ন নহেন—অনাসক্ত, সন্ধ্যাকালে জগৎও কতকটা সেইরূপ হইয়া পড়ে। আপনার মধ্যেই সে শান্তি পায়, আপনার মধ্যে প্রতিষ্ঠা অনুভব করে; এই জন্য তাহার চাঞ্চল্য তখন স্থির হইয়া আসে, সে আপনাকে সংযত করিয়া আনে। তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া যোগানন্দের মত এক পবিত্র বিদ্যুৎ-অনুভূতিস্রোত বহিয়া যায়। তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

সন্ধ্যা খানিকক্ষণ বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উঠে। তাহার কি অধিকক্ষণ থাকিবার যো আছে? সে যেখানে না যাইবে, সেখানে প্রেম জাগিবে না, হাসি ফুটিবে না। সেখানে দিকে দিকে অট্টহাস্যময় হাহাকার শুধু প্রতিধ্বনিত হইবে। সন্ধ্যা উঠে—যেমন আসিয়াছিল, তেমনি ধীরে ধীরে নিঃশব্দে উঠিয়া যায়। সহস্র তারকাখচিত অন্ধকার-বসনে আলুলায়িতকুন্তলা নিশীথিনী সন্ধ্যাকে বিদায় দিতে আসে। জগৎকে তাহার হস্তে সঁপিয়া দিয়া সন্ধ্যা ম্লাননেত্রে বিদায় গ্রহণ করে।

সন্ধ্যা যায়—আলোকধৌত রজত-ছায়াপথ দিয়া একাকিনী চলিয়া যায়। চঞ্চল কোমল চরণ দুখানি ভূমি ছোঁয় কি না ছোঁয়। পথে যায় যায়, এক এক বার পশ্চাতে ফিরিয়া চায়। সে কি আর সাধ করিয়া যায়? সে না যাইলে সুরকাননে ফুল আর ফুটিবে না, সৌরভ ছুটিবে না। তাহাকে না দেখিলে উষার চিরবিকশিত কচি মুখখানি চিরদিনের

তরে ম্লান হইয়া থাকিবে। উষা আর ফুল কুড়াইতে আসিবে না। তাই সন্ধ্যা যায়—গিয়াই সে উষার শুভ্র কপোলদেশে চুম্বন করে। শুভ্র উষা আরও শুভ্র হইয়া উঠে।

সন্ধ্যার ভাবটি বড় কোমল, কিন্তু গভীর। কোমলে গম্ভীরে, উজ্জ্বলে ম্লানে, তাহার সৌন্দর্য্যে এমন একটি পূর্ণতা ব্যক্ত হইয়াছে যে, সে সৌন্দর্য্যের তুলনা মিলে না। সন্ধ্যা যখন চলিয়া যায়, তাহার অনেকক্ষণ পর পর্য্যন্ত এই ভাবটি কেমন থাকিয়া যায়—এই উজ্জ্বলে ম্লানে, কোমলে গম্ভীরে, শৈশবে পূর্ণযৌবনে আলিঙ্গন ভাব।

কত বার পশ্চাতে চাহিয়া, কত বার ধরণীপানে ফিরিয়া সন্ধ্যা নির্জ্জনে ছায়াপথ ছাড়াইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। ছায়াপথের স্বচ্ছতার মধ্য দিয়া আর তাহার চরণলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে না। সে অন্তর্হিত হয়। কুহক-আসন বিছাইয়া নিশীথিনী মায়া-দণ্ড হস্তে ধরণীর পরে রাজত্ব করিতে থাকে। ভয়ে কেহ কিছু বলে না—সকলই স্তম্ভিত, নিস্পন্দ, পাষাণ-জড়। ['ভারতী ও বালক,' কার্ত্তিক ১২৯৬]

কৃত্তিবাস ও কাশীদাস

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যত গ্রন্থ দেখা যায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত বিস্তৃত পাঠকমণ্ডলী কোন গ্রন্থেরই জুটে নাই। বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই হৃদয়ে রামায়ণের কাহিনী মুদ্রিত আছে, কৃত্তিবাসের দুই চারি ছত্র সকলেই আওড়াইতে পারে। ঐশ্বর্য্যবেষ্টিত স্বর্ণসিংহাসনের পার্শ্বে দেখ, এক খণ্ড কৃত্তিবাসের পুঁথি আছে; মধ্যবিত্তের বৈঠকখানার কোণে রামায়ণ একখান থাকা চাই; এমন কি, সামান্য দোকানদারের চাল ডালের হাঁড়ির মধ্য হইতেও রামায়ণ উঁকি মারে। বাঙ্গলা দেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা যে জানে না, তাহার জাতি ঠাহরাইয়া উঠিতে পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। রামায়ণ না জানিলে বাঙ্গালীত্বের অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়।

কিন্তু রামায়ণ লইয়া কৃত্তিবাসের গৌরব করিবার কি আছে? তিনি ত বাল্মীকির মত নূতন রচনা করেন নাই। রাঁধা ভাতে তিনি কেবল ঘৃত ঢালিয়াছেন, লবণ মিশাইয়াছেন বৈ ত নয়। বাল্মীকির সমান তাঁহাকে কেহ বলেও না—বাস্তবিক তিনি তাহা নহেনও। কিন্তু এই অপরাধে তাঁহার সকল যশ হরণ করা যায় না। তাঁহার গ্রন্থ বাল্মীকিগ্রন্থের অনুবাদ নহে—তাঁহাকে কতকটা নিজের মস্তিষ্ক খাটাইতে হইয়াছে। শুনা যায়, কথকতা হইতে কৃত্তিবাসের রামায়ণ সংগ্রহ। এই জন্য বঙ্গীয় কবি বাল্মীকি হইতে বিভিন্ন।

কৃত্তিবাসের রামায়ণে যে সকল সৌন্দর্য্য বর্ণনা আছে, তাহা অবিকল বাল্মীকির অনুরূপ নহে। তাঁহার রামায়ণের ঘটনাবিশেষও বাল্মীকি হইতে অনেক তফাৎ। প্রথমতঃ

উভয়ের আরম্ভ এক নহে। কৃত্তিবাসের রত্নাকর ব্যাপার প্রাচীন ঋষি কবির গ্রন্থে নাই। অন্যান্য পুরাণের সাহায্যে কৃত্তিবাস আরও অনেক ঘটনা অম্লানবদনে রামায়ণের মধ্যে গুঁজিয়াছেন। কথকের রসিকতাও মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছে। এই সকল কারণে বাল্মীকির রামায়ণ অপেক্ষা কৃত্তিবাসে আষাঢ়েরও কতকটা প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডি বেড়িয়া রাখিয়া যান, মূল রামায়ণে বোধ করি এ কথা নাই। বাল্মীকি কপিপুঙ্গবকে ছদ্মবেশে রাবণের মৃত্যু-বাণ হরণ করিতে দেখেন নাই। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব আদি-কবির অজ্ঞাত। এ সকলই কৃত্তিবাসের রচনা। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব পুরাণবিশেষেও অবশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে পুরাণ বাল্মীকিরচিত নহে।

কৃত্তিবাস যে সময়ের লোক, তাঁহার রচনায় তাহার বিশেষ প্রভাব আছে। সময়ের প্রভাব হইতে তিনি একেবারে মুক্ত নহেন। বাল্মীকিগ্রন্থ প্রাচীন সংস্কৃত-ভারতের সম্পত্তি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুদ্ধ বাঙ্গলাদেশের। তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালীত্ব যথেষ্ট। ইহা না থাকিলে তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ মূল্য থাকিত কি না সন্দেহ। তাঁহার নাম তাহা হইলে হয় ত অনুবাদকের ফর্দ্দের এক প্রান্তে সাহিত্যানুসন্ধিৎসু কতিপয় ছাত্রের গুরুভার মস্তিষ্কপীড়নীস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিত। গ্রন্থের এরূপ বহুল প্রচার হইত বোধ হয় না।

কিন্তু বাঙ্গালীভাবে গ্রন্থের যে বিশেষ হানি হয় নাই, তাহা নিশ্চিত বলা যায়। কৃত্তিবাস বেশ স্বাভাবিক। তবে দশমুণ্ড রাবণ, ষাণ্মাসিক নিদ্রাগ্রস্ত কুম্ভকর্ণ, এ সকল অসম্ভব কল্পনার জন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। এগুলি বাল্মীকির নিকট হইতে শুনিয়াছেন। সে কালে জম্‌কালো অসম্ভব বর্ণনা ফেসান ছিল—অদ্ভুত ব্যাপার নহিলে লোকে সহজে আকৃষ্ট হইত না। যোজন হস্ত, দ্বিযোজন পদ তখনকার লোকের কল্পনায় অভ্যস্ত ছিল। সম্ভব অসম্ভবের প্রতি এখনকার মত লক্ষ্য থাকিলে অনেক কেতাবেরই যশঃসৌরভে চারি দিক্ আমোদিত হইতে পারিত না। মানব অপেক্ষা দেব, দানব, রাক্ষস, পিশাচ, ঘোটক-বদন, লম্বোদরবর্গের সে কালে প্রভুত্ব খাটিত। এখন কল্পনা সংযত হইয়া আসিয়াছে—অসংযত অসম্ভব কল্পনার দিন কাল গিয়াছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুকুন্দরামের সমকালীন কবি। বাঙ্গলা সাহিত্যে পূর্ণ পৌরাণিক প্রভাব মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস হইতেই একরূপ আরম্ভ বলা যায়। কৃত্তিবাস কবির ভাষা পড়িয়া কিন্তু মুকুন্দরামের বাঙ্গলাপেক্ষা অনেক সময় ভাল লাগে। তাহার একটা কারণ বোধ হয়, কৃত্তিবাসে মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘশ্মশ্রুবর্গের জবাই-দক্ষ ছুরিকা-ভাষার বড় তীব্র কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না। কৃত্তিবাসের খাঁটি ভাষা পাওয়াও এখন বড় দুরূহ। সংশোধক পণ্ডিতদিগের জ্বালায় কৃত্তিবাসের শব্দচ্ছন্দ এখন অনেকটা অক্ষরচ্ছন্দে আসিয়া

দাঁড়াইয়াছে। ভালবাসার আতিশয্যে কৃত্তিবাসকে তাঁহারা মাজিয়া ঘষিয়া তুলিয়াছেন, কিন্তু নগ্ন সৌন্দর্য্য হারাইয়া কৃত্তিবাস কৃত্তিবাসত্ব হইতে যে কতটা বঞ্চিত হইলেন, তাঁহারা হিসাব করিয়া দেখেন নাই। যাঁহারা কৃত্তিবাসের ভাষার নমুনা দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এ কথা বিশেষরূপে বুঝাইতে হইবে না। পরচুলায় মুখশ্রী বুঝিবার পক্ষে যে বিশেষ হানি করে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

রামায়ণের গল্পের উল্লেখ এখানে আবশ্যক বলিয়া বোধ হয় না। সীতাহরণ, রাবণবধ, সীতার বনবাস বঙ্গীয় পাঠকবর্গের নিকট অপরিচিত নহে। নব্য সম্প্রদায়ের কেহ কেহ হয় ত কৃত্তিবাস নাও পড়িয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু রামায়ণের গল্প সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে অনুমান করা যাইতে পারে। যাত্রায়, নাট্যশালায়, বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে রামায়ণের ছিটাফোঁটা অল্পবিস্তর আছেই। তথাপি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দি,

"আদ্যকাণ্ডে রামজন্ম বিবাহ সীতার।
অযোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্যভার॥
অরণ্যকাণ্ডেতে সীতা হরিল রাবণ।
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডেতে হয় সুগ্রীবমিলন॥
সুন্দরাকাণ্ডেতে হয় সাগরবন্ধন।
লঙ্কাকাণ্ডে উভয় পক্ষের মহারণ॥
উত্তরাকাণ্ডেতে ছয় কাণ্ডের বিশেষ।
সীতাদেবী করিলেন পাতালে প্রবেশ॥
এই সুধাভাণ্ড সাতকাণ্ড রামায়ণ।
কৃত্তিবাস পণ্ডিত করেন সমাপন॥"

কৃত্তিবাস-রামায়ণের চরিত্রগুলি মূল রামায়ণেরই অনুরূপ। না হইবেই বা কেন? কৃত্তিবাস ত আর বাল্মীকিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া আপনাকে খাড়া করিয়া তুলিতে চাহেন না। সহজ ভাবে সহজ ভাষায় দেশের সাধারণের নিকট বাল্মীকির সৌন্দর্য্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বাস্তবিক, কৃত্তিবাসের আত্মপ্রকাশাভিলাষ তাহার তুলনায় নাই বলিলেও চলে। তবে ঘটনাচক্রে অজ্ঞাতসারে দু একটি চরিত্র অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে মূলে বড় প্রভেদ হয় নাই। ঘটনাবিশেষের পরিবর্ত্তনে চরিত্রপরিবর্ত্তন বোধ হয় মাত্র। বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন তাহা নহে।

যাহা হউক, কৃত্তিবাসের কথা আর অধিক বলা অনাবশ্যক। তাঁহার রামায়ণ পড়িয়া যে সুগভীর তৃপ্তি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গলা সাহিত্যের মহাকাব্যের মুখ রক্ষা করিয়াছেন বলিয়াই আমরা কৃত্তিবাসকে বড় বলিতেছি না, তাঁহার রামায়ণ আমাদের

সাহিত্যের গৌরব ত বটেই, তাহা ভিন্ন আমাদের ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবারও কারণ। সীতার নিষ্কাম পবিত্রতার কাহিনী দরিদ্র-স্বামী-পীড়নী অলঙ্কারগতপ্রাণা বঙ্গরমণীকে অনেক বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছে, অনেক স্বামীকে দিবানিশি গৃহিণীর সম্মার্জ্জনী সপ্‌সপানি ও কটাক্ষকুঞ্চিত তারকণ্ঠ জিহ্বা-আস্ফালনী বিদ্যার মহিমানুভব হইতে বঞ্চিত করিয়া শান্তি দিয়াছে। রামচন্দ্রের একপত্নীনিষ্ঠা সহস্র-একীকরণ-মত্ত দারপরিগ্রহশীল পিতাকে দুর্দ্দম্য প্রণয়াবেগ ও অধীর পরিণয়াকাঙ্ক্ষা হইতে রক্ষা করিয়া অনেক সতী সাধ্বীর মর্য্যাদা এবং মাতৃহীনের সান্ত্বনা রাখিয়াছে। শুধু তাহাই নয়, মহিষী-সমাচ্ছন্ন দশরথের শেষ দশা অনেক বঙ্গপরিবারের বিশেষ শিক্ষার স্থল। এ সকল শিক্ষা অবশ্য কৃত্তিবাসের স্বপ্রদত্ত নহে, কিন্তু তাহাতে যায় আসে কি? বাল্মীকির উপদেশগুলি বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচার করিয়াছেন তিনিই ত বটে। সে জন্য কৃত্তিবাসের নিকট আমরা বিশেষ ঋণী।

এখন কথা এই যে, কৃত্তিবাস কিরূপ ধরণের কবি? সে কালে পদ্যই একমাত্র সাহিত্য ছিল, এবং পয়ার-ত্রিপদী-দীর্ঘত্রিপদী-রচয়িতারাই কবি ছিলেন। সুতরাং কৃত্তিবাস সে কালের হিসাবে একজন উচ্চদরের কবি। কিন্তু বর্ত্তমানে আমরা কবির মধ্যে যে অসাধারণ প্রতিভা দেখিতে চাহি, যে সুগভীর ভাবপ্রবাহ অনুসন্ধান করি, কৃত্তিবাসে তাহা কোথায়? পুরাণপ্রভাবীকৃত কৃত্তিবাস মৌলিকতা যশাকাঙ্ক্ষাবিহীন। আমরা সে জন্য ব্যস্ত নহি। সে কালের বঙ্গসাহিত্যে ভাবের তরফে বৈষ্ণব কবিরাই যাহা আছেন। তেমন আর কৈ? পুরাণ-প্রভাবীকৃত মুকুন্দরামই বল, আর কীর্ত্তিপ্রতিষ্ঠ কৃত্তিবাসই বল। মুকুন্দরামের সৌন্দর্য্য-সামঞ্জস্যজ্ঞান কমলে-কামিনীর গজাহারকল্পনাতেই ধরা দিয়াছে। আর কালকেতুর বর্ণনা ত কুম্ভবর্ণ অপেক্ষা বিশেষ স্বাভাবিক নহে। অধিকন্তু গাম্ভীর্য্যের অভাব।

কৃত্তিবাসের পর বঙ্গীয় মহাকাব্যের মুখ রক্ষা করিয়াছেন কাশীরাম দাস। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের মত সমসাময়িক কবি ইহাঁরা নহেন, তেমন সমবৈষয়িক কবিও নহেন। কিন্তু বিষয় এক না হইলেও কাছাকাছি কতকটা বটে। একজনের রামায়ণ, আর একজনের মহাভারত। দুইখানি গ্রন্থই বঙ্গীয় পাঠকসমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত হইবার মতনও বটে। বিষয়ের মহত্ত্ব হিসাবেই দেখ, রচনার সৌন্দর্য্য হিসাবেই দেখ, আর প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মভাবের দিকেই দেখ, দুইখানি গ্রন্থেই নিন্দনীয় বিশেষ কিছু নাই। যথার্থই,

"কৃত্তিবাস কহে কথা অমৃতসমান।
রামনাম বিনা যার মুখে নাহি আন॥"
"মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥"

রামায়ণ অপেক্ষা মহাভারত বৃহৎ ব্যাপার। বাল্মীকির রামায়ণের অনেক পরে ব্যাস মহাভারত রচনা করিতে বসেন। তখন সূর্য্যবংশের দিন কাল গিয়াছে, চন্দ্রবংশ ভারতের মধ্যে প্রভাবশালী। ব্যাস বাল্মীকির অনুকরণ করিয়াছেন কি না, আমাদের দেখিবার আবশ্যক নাই। অনুকরণ হইলেও তাঁহার মৌলিকতা যথেষ্ট। কিন্তু মহাভারতের কাল যে রামায়ণের অনেক পরে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ বাল্মীকির রচনা ব্যাসের রচনাপেক্ষা সরল। তাহার পর মহাভারতের সময়ে যেরূপ জটিল রাজনীতি, লেখাপড়ার চর্চ্চা, রামায়ণের সময়ে সেরূপ কিছুই নাই। বাল্মীকির রামায়ণের মধ্যে লেখার কথা আছে, এমন মনে পড়ে না ত। মহাভারতের প্রথমেই গণেশের লেখনীর কথা। রামায়ণে কৃষ্ণের মত নীতিবিদ্‌ই বা কোথায়? ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণের মত ব্যূহরচনাদক্ষ সেনাপতিকুলই বা কোথায়? তখন সকল বিষয়েই অনেকটা সাদাসিধা ছিল। মহাভারতের আমলে উত্তরোত্তর সকল সমস্যাই জটিল হইয়া উঠিতেছে।

আমাদের বাংলাদেশেও প্রথমে রামায়ণ রচিত হয়, পরে মহাভারত। কিন্তু তাহা দেখিয়া কৃত্তিবাসের সমাজের অবস্থার সহিত কাশীরাম দাসের সমাজের প্রভেদ ছিল কি না বলা দায়। কাশীরাম দাসও কৃত্তিবাসের মত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অনুবাদ করেন নাই। কিন্তু কৃত্তিবাস, কাশীদাস, উভয়েরই চরিত্রগুলি মূল গ্রন্থের অনুরূপ ত বটে। সেই জন্য কৃত্তিবাস, কাশীদাস পড়িয়াও বাল্মীকি ব্যাসের সমাজের কথা বলিবার সুবিধা।

মহাভারতের প্রধান প্রধান স্ত্রীচরিত্র অপেক্ষা রামায়ণের প্রধান স্ত্রীচরিত্রগুলি উচ্চদরের। কুন্তীই বল আর দ্রৌপদীই বল, সীতার পার্শ্বে বসিবার মত কেহই নয়। কৌশল্যা কৈকেয়ীর পার্শ্বেও কুন্তী দাঁড়াইতে পারেন না। তবে দময়ন্তী, সাবিত্রী, সীতার পার্শ্বে বসিতে পারেন বটে। কিন্তু এ দুইটি চরিত্র মহাভারতের মধ্যে উপাখ্যানমধ্যে স্থান পাইয়াছে। উঠাইয়া লইলেও মূলে বিশেষ কিছু যায় আসে না। সীতার মত শান্ত সংযত অথচ স্বাভাবিক ভাব কিন্তু কোনও চরিত্রেই নাই। সাবিত্রী দময়ন্তীকে পতিব্রতা পতিপ্রাণা অস্বীকার করিবার যো নাই, তথাপি সীতার মত ইহাঁদের চরিত্র ফুটে নাই।

রামায়ণের সহিত মহাভারতের কতকগুলি চরিত্রে বেশ মিল বুঝা যায়। অর্জ্জুনের সহিত লক্ষ্মণের চরিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দুজনেরই প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম, দুই জনেরই বীরত্ব, দুই জনের জীবনেই প্রায় এক কারণে বনবাস। রাম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও সামান্য সাদৃশ্য অনুভব হয়, তবে লক্ষ্মণ অর্জ্জুনের মতন নয়। বিভীষণ আর বিদুর কতক একরকম। ন্যায় লইয়াই ইহাঁদের কারবার। অন্যায় দেখিলে উভয়েই জ্বলিয়া উঠেন। দুর্য্যোধনে রাবণে তেমন সাদৃশ্য নাই। দুর্য্যোধন অপেক্ষা রাবণ লোক ভাল। রাবণ গুণী, মানী, বীর, দুর্য্যোধন অপেক্ষা শতগুণে উন্নতপ্রকৃতি। তবে দোষ কাহার নাই? রাবণেরও অনেক

দোষ অবশ্য ছিল—প্রধানতঃ অহঙ্কার। রামায়ণে আর যাহাই থাকুক, মহাভারতের একটি চরিত্রের অভাব আছে—ভীষ্মদেব। ভীষ্মকে মহাভারত বৈ আর কোথাও দেখা যায় না। ভীষ্ম মহাভারতের সম্পূর্ণ নিজস্ব।

ঘটনা বিষয়েও রামায়ণে মহাভারতে সাদৃশ্য বিস্তর। সীতা উদ্ধারের জন্যই রামের লঙ্কাজয়, রাবণবধ, কিন্তু সীতাকে পাইয়াও রাম উপভোগ করিতে পারিলেন না। পাণ্ডবেরাও রাজশ্রীর জন্যই কুরুকুল ধ্বংস করিলেন, কিন্তু রাজ্য লাভ করিয়া সকলই শূন্য মনে হইল—যাহার জন্য জীবনের সকল সুখ স্বচ্ছন্দ বিসর্জ্জন দিলেন, হাতে পাইয়া তাহা ভোগ করিতে মন উঠে না। ইহা ভিন্ন মধ্যে মধ্যে খুঁটিনাটি ঘটনার সাদৃশ্যও বড় অল্প নহে। হরধনুর্ভঙ্গে সীতালাভ; সুদর্শন-চক্রভেদ ব্যাপারে দ্রৌপদীলাভ। মৃগভ্রমে মুনিপুত্র বধ করিয়া দশরথ শাপাক্রান্ত; মৃগরূপী মুনির নিধনে পাণ্ডু শাপাক্রান্ত। উভয়েরই মৃত্যুকারণ মুনিশাপ। বিমাতার চাতুরী বুঝিয়াও রামচন্দ্র পিতৃসত্যপালনার্থে বনগমন করিলেন; যুধিষ্ঠিরাদিও কপট দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়া সত্যপালনার্থে বনগমন করিলেন। কৈকেয়ী ভাবিয়াছিলেন, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস করিতে হইলে রামচন্দ্রকে বুঝি বা ভববাস উঠাইতে হয়, ভরতের পক্ষে তাহা হইলে রাজ্যসুখ ভোগের পথ নিষ্কণ্টক; কুরুকুলও ঠাহরাইয়াছিলেন, দ্বাদশ বৎসর অরণ্যে কাটাইতে হইলে পাণ্ডবেরা নাও টিঁকিতে পারেন, দুর্য্যোধন তাহা হইলে সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠেন। রাজ্যবঞ্চিত হইবার জন্যই উভয়ের বনবাস। কপালগুণে উভয় পক্ষেরই নিকটে যম ঘেষিতে সাহস করে নাই। অরণ্যে রাবণ সীতাহরণ করেন; জয়দ্রথ দ্রৌপদী হরণ করেন। তবে জয়দ্রথকে ভীমার্জ্জুনের হস্তে পড়িয়া বাপ্ বাপ বলিতে হইয়াছিল, তাই আশানুরূপ ফল ফলে নাই। এইরূপে রামায়ণে মহাভারতে ঘটনা-সাদৃশ্য বড় অল্প নহে। কিন্তু তাহা লইয়া আর অধিক নাড়াচাড়ায় কাজ নাই—রামায়ণ, মহাভারতের কথায় কৃত্তিবাস, কাশীদাস চাপা পড়িয়া যান বুঝি।

কৃত্তিবাসের কথা যথেষ্ট বলা হইয়াছে, নূতন বলিবার আর বিশেষ কিছু নাই। কাশীরাম দাস সম্বন্ধেই বা আর বলিব কি? উভয় কবিরই রচনা পয়ার-ত্রিপদী-সমাচ্ছন্ন। ভাবপ্রবাহ তেমন নাই। আর ঘটনা ও চরিত্র, তাহাও ত নিজের নূতন সৃষ্টি নহে। সে জন্য বাল্মীকি, ব্যাস পশ্চাতে আছেন। কাশীদাসের জীবনী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি সামান্য। আদিপর্ব্বের শেষ ভাগে তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল তাঁহার বাসগ্রাম ও কুলসংবাদ জানা যায়।

"ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥

কায়স্থ কুলেতে জন্ম বাস সিদ্ধিগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাসপুত্র সুধাকর নামে॥
অনুজ কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
কাশীদাস কহে কথা সাধুর চরণে।
হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে॥"

যাহা হৌক, কাশীদাসের জীবনী লইয়া আর মাথা না ঘামাইয়া মহাভারতের শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে দুই চারি কথা বলিয়া শেষ করা যাক্। কৃত্তিবাস যেমন ভাষা-রামায়ণ লিখিয়া সহজভাবে দেশের মধ্যে বাল্মীকির উপদেশ প্রচার করিয়াছেন, কাশীরাম দাসও সেইরূপ বঙ্গভাষায় মহাভারত রচনা করিয়া সহজে সর্ব্বসাধারণের নিকট ব্যাসের উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। কিরূপে জ্ঞাতিবিরোধ আরম্ভ হয় এবং তাহার ফল কিরূপ, মহাভারতের মত উজ্জ্বল বর্ণে বোধ করি তাহা কোনও পুস্তকে চিত্রিত হয় নাই। একটু ভাবিয়া দেখিলেই দেখা যায়, বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রতি দিন এই কুরুপাণ্ডবদ্বন্দ্বাভিনয় চলিয়াছে। কুণ্ডলীকৃত জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে দুর্য্যোধন শকুনির প্রেতাত্মা আবির্ভূত হইলেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়। শকুনি-মন্ত্রী দুর্য্যোধন পিতৃহীন পাণ্ডবদিগকে যদি লাঞ্ছনা করিবার চেষ্টায় না ফিরিয়া মিষ্টবাক্যে তুষ্ট করিতে প্রয়াস পাইতেন, ধৃতরাষ্ট্র দুর্য্যোধনের মায়ায় অভিভূত হইয়া পুত্রের ক্রুর চরণে যদি আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিকে বলি না দিতেন, তাহা হইলে ভারতের বীরকুল কি আর অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত? কিন্তু তাহা বলিলে কি হয়? হিংসাদৃপ্ত লোভ যখন জ্ঞাতিছদ্মবেশে দেখা দেয়, তখন সেখানে কি মঙ্গল থাকিতে পারে? ক্রূরকর্ম্মা দুর্য্যোধনের উৎপীড়নে সহিষ্ণু যুধিষ্ঠিরও স্থির থাকিতে পারেন নাই। বনবাস দিয়াও দুর্য্যোধনের আশ মিটে নাই। পাণ্ডবদিগকে অপমানিত অভিশপ্ত দেখিবার জন্য সহস্র অনুষ্ঠান। কেবলই ধর্ম্মের উপর নির্ভর করিয়া পাণ্ডবেরা জয়শীল। শ্রীকৃষ্ণের মত বন্ধু না পাইলে তাঁহাদের যে কি দশা হইত কে বলিতে পারে? ধার্ত্তরাষ্ট্রেরা চিরদিন আপনার জ্বালায় জ্বলিয়া মরিয়াছেন, তাহার উপর যুদ্ধে ত পরাজয় হইলই। সিংহাসনে বসিয়াও তাঁহাদের মুহূর্ত্তের তরে শান্তি ছিল না, পাণ্ডবদিগকে হিংসা-জ্বালায় জ্বালাইবার জন্য মধ্যে মধ্যে সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইতে হইয়াছে। দুই এক বার বিপদে পড়িয়া পাণ্ডবদিগের দ্বারাই মুক্তি লাভ করিয়াছেন। তাহাতে অশান্তি আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে বৈ হ্রাস হয় নাই। কিন্তু অরণ্যমধ্যেও পাণ্ডুপুত্রদিগের শান্তি ছিল। তাঁহারা ফল মূল যাহা পাইতেন, মাতা ও স্ত্রীর সহিত পরিতৃপ্তহৃদয়ে আহার করিতেন। সুখ-জ্বালায়

তাঁহাদিগকে জ্বলিতে হয় নাই। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও যে তাঁহারা রাজ্যলোভ সম্বরণ করিলেন, সে কেবল এই শান্তিটুকুর জন্য।

রামায়ণ, মহাভারত হইতে আমরা মানব-চরিত্র সম্বন্ধে যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করি। বিশেষতঃ মহাভারতে যেরূপ চরিত্র-বৈচিত্র্য দেখা যায়, এমন আর কোনও গ্রন্থে মিলে কি না সন্দেহ। খুঁটিনাটি অঙ্গ বাদ দিয়া সাধারণ ভাবের দুই একটি বেশ শিক্ষা পাওয়া যায়। উদাহরণ দিয়া বুঝাইতেছি। রামায়ণ দেখাইয়াছে, রাজা দশরথ সসাগরা ধরিত্রীর সুশৃঙ্খল শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াও অন্তঃপুরের সুশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, এই জন্য তাঁহার নিষ্কলঙ্ক বংশের কলঙ্ক রটিয়াছে, তাঁহার রাজ্যেও বিশৃঙ্খল বাধিত, কেবল সুগভীর ভ্রাতৃপ্রেম তাহা ঘটিতে দেয় নাই। মহাভারত দেখাইয়াছে, ধৃতরাষ্ট্র বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ হইয়াও অতিরিক্ত মায়াবশতঃ পুত্রবর্গের কাল হইয়াছেন, পুত্রশাসন-অক্ষমতাই তাঁহার কুলনাশের প্রধান কারণ। ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে, বহিঃশাসনক্ষমতা সকল সময়ে অন্তঃশাসন-ক্ষমতার পরিচয় নহে। রাবণ ও দুর্য্যোধনের চরিত্র হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শাস্ত্রজ্ঞান ও ক্রিয়াকর্ম্মের অনুষ্ঠান সংযম ও জ্ঞাতি-বঞ্চন-বিদ্যা-বিহীনতার প্রমাণ নহে। একই হৃদয় একই বিষয়ে বিপরীত ব্যবহার করে। এই জন্য মানবচরিত্র বুঝা বড় দায়।

মহাভারতের অনেকগুলি উপাখ্যান অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তিত আকারে আমাদের আষাঢ়ে গল্পের কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। সম্ভবতঃ কাশীরাম দাসই তাহার মূল কারণ। সে কালের কথক ঠাকুরেরাও তাহার কারণ হইতে পারেন। কিন্তু কারণ যাহাই হউক, ইহাতে ফল অবশ্য ভাল বৈ মন্দ নহে। সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগের হৃদয়গঠনে আষাঢ়ে গল্প যথেষ্ট সহায়তা করে। সেই আষাঢ়ে গল্পে যদি ধর্ম্মভাব মাখান থাকে, তাহা হইলে শিশুহৃদয়ে ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত করিবার কি কম সুবিধা? কিন্তু এখানে আর আষাঢ়ের কথা নয়। কাশীরাম দাস মহাভারত শুনিতে আহ্বান করিতেছেন, "হইবে নির্ম্মল জ্ঞান শুন একমনে।" সজ্জন পাঠকেরা মহাভারত শুনিতে থাকুন, আমরা জনতার মধ্যে গাঢাকা হই। ['ভারতী ও বালক,' কার্ত্তিক ১২৯৬]

স্বভাব ও সাহিত্য

চির বিচিত্রতাময়ী রহস্যাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সুগভীর হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া মানব যখন তাহার প্রবহমান আনন্দস্রোত আপন অন্তরে অনুভব করিতে পায়, তখন প্রকৃতির ভাষা ব্যক্ত করিবার জন্য সহজেই সে ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাহার হৃদয়ের শিরায় উপশিরায় সেই

সৌম্য সৌন্দর্য্য যতই মুদ্রিত হইতে থাকে, সে তাহা না ব্যক্ত করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিদীপ্ত হৃদয়কে জগতে বিকশিত করিয়া তুলাই তখন তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—মানবশিশুর নিকট সেই দীপ্ত রহস্যশ্রী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই রহস্যানন্দের প্রকাশেই সাহিত্য রচিত হয়। এই জন্যই সাহিত্যের আদি অন্ত মধ্য কেবলই আনন্দ। যে সাহিত্যে আনন্দের যত স্ফূর্ত্তি, সেই সাহিত্যই তত উন্নত, গভীর।

প্রকৃতির আনন্দ তাহার গভীর জীবনে। প্রকৃতি প্রাণে ওতপ্রোত। সেই প্রাণ আমরা যতই উপভোগ করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ততই বদ্ধমূল হইবে। প্রকৃতির জ্যোৎস্নায়, রৌদ্রে, শ্যামলতায়, সর্ব্বত্রই প্রাণ প্রস্ফুটিত। ছায়াময় শারদীয় নিশীথে শুভ্র-নীল গগনপ্রান্ত হইতে পূর্ণহৃদয় চন্দ্রমা যখন শ্রান্ত সুপ্ত জগৎকে জ্যোৎস্নাবরণে ছাইয়া ফেলেন, তখন আমাদের হৃদয় পুলকে শিহরিয়া উঠে কেন ? ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরে কত ভাবের সঞ্চার হয়, কত স্মৃতি বিস্মৃতির নীরব আকুলি ব্যাকুলিতে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। শত শুভ্র তাড়িতালোকে ত কৈ হৃদয় সেরূপ উঠে না। কারণ আর কিছুই নহে, প্রাণ। নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া, দূর অস্পষ্ট তরঙ্গায়িত ছায়া-বৃক্ষাবলীর শ্যামলতার পানে চাহিয়া যুগ যুগ কাটান যায়, কিন্তু সযতনে সজ্জিত কড়ি এবং জানালাবর্গের শুভ্র ও সবুজ রঙের উপরে দুই দণ্ড দৃষ্টি স্থির রাখা যায় কি না সন্দেহ। কারণ কি আর বলিতে হইবে ? কেবলই এই প্রাণ। প্রাণের যেখানে যেরূপ অভিব্যক্তি, সেখানেই সেইরূপ আনন্দ।

সাহিত্যের ক্ষেত্র কি তবে জ্যোৎস্না, আকাশ, নদী, সমুদ্র, নিবিড় বনানী, এবং রৌদ্রতপ্ত ধরণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ? না। প্রকৃতির প্রাণ যেখানে অভিব্যক্ত, সেখানেই সাহিত্যের সাম্রাজ্য। মানবের হৃদয়ও সাহিত্যের অধিকারের মধ্যে। মানবজীবনের মত জীবন্ত জটিল রহস্য সংসারে বিরল। সুতরাং সাহিত্যের এক প্রশস্ত ক্ষেত্র মানবজীবন। এই রহস্য-জীবনের সৌন্দর্য্য, ক্রমাভিব্যক্তি, ইহার প্রত্যেক খুঁটিনাটি, মিলন বিরহ, সুখ দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা অক্ষমতা, হাসি অশ্রুর মধ্যে কল্পনা হারাইয়া যায়।

ইহা ত গেল সাহিত্যের ক্ষেত্রের প্রসরের কথা। স্বভাবের সর্ব্বত্রই সাহিত্যের গতিবিধি। কিন্তু সাহিত্যে স্বভাব কিরূপ ভাবে ব্যক্ত হয় ? সংক্ষেপে বলিতে গেলে সমালোচনায়। তবে সমালোচনার মধ্যে প্রকারভেদ আছে। যেমন কবিতা, উপন্যাস, বিবিধ প্রবন্ধ। ইহাদের মধ্যেও আবার নানা বিভাগ আছে, তাহার উল্লেখ এখানে বোধ করি অনাবশ্যক। তবে সকল সমালোচনের মধ্যে বিশ্লেষণ সাধারণ নিয়ম বলা যাইতে পারে। একজন সমালোচক পাঠককে খুঁটিনাটি আচ্ছন্ন না করিয়া, কিছু না বলিয়া কহিয়া অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে প্রকৃতির হৃদয়ের মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দেন, পাঠক ভাব অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠেন। আর এক ব্যক্তি তন্ন তন্ন খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ দ্বারা

ভাব পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পান। কেহ লাইন টানিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করেন। কেহ প্রতিভার প্রভাবে ছায়া ধরিয়া আনেন, ছায়া দেখিয়া মূল বুঝ।

পাশ্চাত্য গ্রন্থকার ম্যাথু আর্ণল্ড সাহিত্যকে জীবনের সমালোচনা বলিয়া গণ্য করেন। বাস্তবিকই সাহিত্য জীবনের সমালোচনা। বিশেষরূপে প্রকৃতির প্রাণ আলোচনা করাই তাহার উদ্দেশ্য। সম্যক্ আলোচনা দ্বারা সেই প্রাণ যত প্রস্ফুটিত করিতে পারিবে, ততই সাহিত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। সাহিত্যে হৃদয়ে হৃদয়ে আদান প্রদান চলে, প্রাণে প্রাণে আলিঙ্গন হয়। জড় দেহের উপর একটা শুভ্র আচ্ছাদন টানিয়া দিয়া কাঠামকে লোকে অনেক সময় সাহিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়. কিন্তু প্রাণহীন দেহবৎ সে সাহিত্যের যথার্থ কোনও মূল্য নাই। আচ্ছাদনতলে কেবলই কুঞ্চিত গলিত শবদেহ।

সুকবির রচনা পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হই কেন? কারণ বিশেষ দূর নহে, আমরা প্রাণের সাড়া পাই বলিয়া, প্রাণ অনুভব করি বলিয়া। প্রাণ অনুভব করিয়া আমরা খেলাইবার খানিকটা জমি পাই, পিঞ্জরবদ্ধ সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া মুক্ত বায়ু সেবনে পরিতৃপ্ত হইয়া উঠি। জ্যোৎস্নায় ডুবিতে ডুবিতে কবি গাইলেন,—

“ডুবে যাই ডুবে যাই—
আরো আরো ডুবে যাই।”

আমরাও এই সঙ্গে ডুবিবার অবসর পাইলাম। যত ডুবি, ততই জ্যোৎস্না, ততই আনন্দ। ডুবিয়া ডুবিয়া কূল আর পাই না, আরও ডুবিতে চাহি, আরও ডুবিতে থাকি, অগাধ জ্যোৎস্না আর অগাধ আনন্দ। প্রাণ কতখানি মুক্ত হইল! তাহার রাজ্য কত দূর বিস্তৃতি লাভ করিল!

অনেক বিষয়ে যে আমরা আনন্দ পাই, তাহার মূলে প্রাণ। কিন্তু অভ্যাসবশতঃ কিম্বা কি কারণে জানি না, সেই প্রাণ অনেক সময় ধরিতে পারি না। চুম্বনের মধ্যে, আলিঙ্গনের মধ্যে, মিষ্ট কথার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বই আনন্দ বিকশিত করিতেছে। চুম্বন যদি শুধু দুটি অধরের ক্ষণিক মিলন মাত্র হইত, তাহার হৃদয়ের মধ্য হইতে দুইটি আত্মহারা প্রাণ ব্যাকুল বাসনা ঢালিয়া দিয়া প্রেমের মন্দির প্রতিষ্ঠা না করিত, তাহা হইলে কি তাহার মধ্যে আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইত? দেহের ব্যবধান ভাঙ্গিয়া প্রাণে প্রাণে মিলিতে চায় বলিয়াই না আলিঙ্গনের সুগভীর তৃপ্তি? মিষ্ট কথার অন্তরে প্রাণের আহ্বানধ্বনি শুনা যায় বলিয়াই তাহাতে প্রাণ জুড়াইয়া যায়। শব্দশাস্ত্রমথিত বহু যত্নে সংগৃহীত সুবিন্যস্ত বাক্যাবলীও প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না। প্রাণ চাহে প্রাণ, প্রাণ জাগে প্রাণে। এই জন্যই সাহিত্যে প্রাণের আবশ্যকতা। যেখানে প্রাণের অভাব, সেখানেই নিরানন্দ।

হৃদয়কে জড় নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে ক্রমে ক্রমে তাহার মধ্যে প্রাণ শুকাইয়া আসে। ইহাই বিকারের অবস্থা। জড়তা অস্বাভাবিক। স্বভাবে সৌন্দর্য্যের চিরপ্রবাহ। আমাদের হৃদয়েও প্রবাহ যাহাতে রুদ্ধ না হয় দেখা উচিত। মুক্তপ্রাণ কবি স্বভাবের মধ্যে যে আনন্দ অনুভব করেন, সে কেবল তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবলবেগে সৌন্দর্য্যপ্রবাহ বহিতেছে বলিয়া। প্রভাতে সুশীতল সমীরণান্দোলিত বৃক্ষ দেখিয়া তিনি গাহিয়া উঠিলেন, "পুলক নাচিছে গাছে গাছে।" বিদ্রূপপরায়ণ সঙ্কীর্ণহৃদয়—যে কখন প্রকৃতির মধ্যে এমন আনন্দ উপভোগ করে নাই, যে ব্যক্তি প্রকৃতির প্রাণে নিমগ্ন হয় নাই—চস্‌মার মধ্য হইতে অবিশ্বাসনেত্রে মিটিমিটি চাহিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না। তাহার নিকটে প্রাণ উপহাসের সামগ্রী। প্রকৃতিকে উপভোগ করিতে হইলে তাহাতে ডুবা চাই। আত্মদৃপ্তের নিকট স্বভাব জড়, নিশ্চেষ্ট।

স্বভাবের সহিত সাহিত্যের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। সাহিত্য স্বভাব ছাড়িয়া এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না। স্বভাবের অন্তর্গত কি না? চুম্বন বল, আলিঙ্গন বল, স্নেহ বল, প্রেম বল, বাহিরে অন্তরে সর্ব্বত্রই ত স্বভাবের রাজ্য। নহিলে সাহিত্যের মধ্যে এ সকল কি ঠাঁই পাইত? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বভাবের সর্ব্বত্রই সাহিত্যের গতিবিধি।

এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধহেতু স্বভাবের ন্যায় সাহিত্যেও ছায়া আলোকের সামঞ্জস্য বিশেষ আবশ্যক। বড় বড় কবির রচনা অনেক সময় এই ছায়া আলোকের যথোচিত সন্নিবেশেই সুন্দর। ঔজ্জ্বল্যের প্রতি সমধিক অনুরাগবশতঃ আলোকের আত্যন্তিক প্রাখর্য্যে অপরিপক্ক-হস্ত প্রাণ পরিস্ফুট করিতে প্রায় পারে না। স্বভাবে অন্ধকারই আলোককে উজ্জ্বলতররূপে ব্যক্ত করে। উন্নত সাহিত্যেও আলোকের দীপ্তি প্রকাশ করিতে হইলে পার্শ্বে স্থান বুঝিয়া খানিকটা অন্ধকার জড় করিয়া রাখা হয়। অন্ধকারের সান্নিকট্যে আলোকের সম্যক্ অভিব্যক্তি।

যে দিক্ দিয়াই দেখ, সাহিত্য, স্বভাবজাত—স্বাভাবিক। বিজ্ঞানের সহিত তাহার প্রভেদ প্রাণ লইয়া। বিজ্ঞান জড়দেহ বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া তাহার মূল-উপাদান সংগ্রহ করে; সাহিত্য ভাব বিশ্লেষণ করে—জড়দেহের মধ্যস্থ প্রাণ ধরিতে চায়। বিজ্ঞান মলয়-পবনের মধ্যে অম্লজানের অংশ অন্বেষণ করে; সাহিত্য মুক্ত মলয়পবন অনুভব করিয়া তৃপ্ত হয়। সে মলয়ানিলের স্নিগ্ধ ভাবে, মৃদু মধুর সৌরভে, ছায়াময়ী জ্যোৎস্নাময়ী কাহিনীতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সাহিত্য প্রাণব্যাপ্ত, আনন্দপূর্ণ। জড়বিজ্ঞানের বিশ্লেষণপদ্ধতি তাহার বিশ্লেষণ হইতে বিশেষ স্বতন্ত্র।

কিন্তু এখন বিশ্লেষণের কথা থাক্। সাহিত্যে যে ছায়া আলোকের কথা উল্লেখ করিলাম, ঘরের নিকট হইতেই তাহার দু একটি উদাহরণ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করি।

কুন্দনন্দিনীর চরিত্র আলোচনা করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? কুন্দ একজন বালিকা, সে নগেন্দ্রকে প্রাণ ঢালিয়া ভালবাসে মাত্র। তাহার চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কোনও জ্ঞান নাই। কিন্তু তবু কুন্দকে আমাদের এত ভাল লাগে কেন? উপন্যাসে ভালবাসার কথার অভাব নাই, নায়িকাকুলের দীর্ঘনিশ্বাস, অশ্রুজল, ইহা ত বারো আনা উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। কুন্দ অপেক্ষা গুণবতী ত সহজেই মিলিতে পারে। কিন্তু বিষবৃক্ষের গ্রন্থকার কুন্দকে যেরূপ ভাবে ফুটাইয়াছেন, এমন অন্যান্য অনেক উপন্যাস-রচয়িতা পারেন না। কুন্দকে তিনি প্রায় ছায়ায় ছায়ায় ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু দু এক জায়গায় তাহার মুখে চোখে এমনি ভাবে আলোক ফেলিয়াছেন যে, তাহাতেই কুন্দ ব্যক্ত হইয়াছে। কুন্দের পার্শ্বে আবার সূর্য্যমুখী থাকিতে দুইটি চরিত্রই পরস্পরের ছায়ালোকে ফুটিতে পারিয়াছে। চোখে আঙ্গুল দিয়া অবশ্য এ ছায়া আলোক দেখান যায় না, কিন্তু চোখ বুজিয়া ভাবিয়া দেখিলে বুঝা অসম্ভব নহে।

শেষ কথা, সাহিত্যের স্বাভাবিকতা। ভাবের পূর্ণতাই বোধ করি স্বাভাবিকতার লক্ষণ। পূর্ণতার মধ্যে সামঞ্জস্য অবশ্যই আছে। ভাববিশেষকে যেমন তেমনি ফুটাইতে পারিলেই সাহিত্যে স্বাভাবিকতা রক্ষিত হয়। দুরূহ দুর্ব্বোধ্য শব্দাম্বুধিমথিত কথাসমূহে ভাব চাপা পড়িয়া না যায়, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পদে, প্রত্যেক কথায় বক্তব্য ভাব যেমন ফুটিয়া উঠিবে, সাহিত্য স্বাভাবিক এবং সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। ভাবে ভাব উথলিয়া উঠে—রহস্যবিশেষ ব্যক্ত হইয়া রহস্যরাজ্যের শত দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। সাহিত্য এই বিস্তৃত স্বভাবরহস্য রাজ্যের চাবীস্বরূপ। ['ভারতী ও বালক,' অগ্রহায়ণ ১২৯৬]

মত্ততাসুখ

১

সংসারের কাজ অনেকেই করে, কিন্তু কাজ যথেষ্ট করিলেও প্রকৃত মহত্ত্ব অল্প লোকের মধ্যেই দেখা যায়। কাজ করিবার জন্য এখানে অনেক প্রলোভন আছে, প্রলোভনের প্ররোচনায় বড় বড় কাজ সমাধা করিতেও বিশেষ কষ্ট হয় না। তাই বলিয়া প্রলোভন-প্রসূত কার্য্য কি আর মহত্ত্বপ্রসূত অনুষ্ঠানের মত স্থায়ী হয়? মহত্ত্ব স্থির ধীর গম্ভীর ভাবে সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া নীরবে কাজ করিয়া যায়, মত্ততাসুখে গা ভাসাইয়া দিয়া সারাক্ষণ প্রবল আত্ম আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান হওয়া তাহার উদ্দেশ্য নহে। মত্ততাসুখ আপনাকে অনেক সময় মহৎ কল্পনা করিয়া থাকে, এবং এই কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া আপনার নিকট

হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে। কিন্তু তাহার চাঞ্চল্যেই সে ধরা পড়ে। মহত্ত্বের মধ্যে যে সংযত শিক্ষার ভাব নিহিত আছে, মত্ততাসুখ তাহা না বুঝিয়া মত্ত হস্তীর মত দাপাদাপি করিয়া বেড়ায়, সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া একপ্রকার উচ্ছৃঙ্খল দাসত্বের মোহে মগ্ন হইয়া থাকে, এবং যথেচ্ছাচারিতার আত্মসুখ পরিতৃপ্তি লক্ষ্য ক্ষণস্থায়ী নিয়মাবলীর মধ্যে স্ফীত হইয়া নিয়মলঙ্ঘনী বিদ্যাকেই স্বাধীনতা মনে করিয়া সেবা করে। মত্ততাসুখ অল্পেতেই নাচিয়া উঠে হৈ চৈ করিয়া কর্ম্মশীলতা অনুভব করিতে চায়। উচ্চ কণ্ঠকোলাহলে পলকের মধ্যেই লোক জমিয়া যায়, লোকারণ্যও মত্ততাসুখে উদ্বেলহৃদয় হইয়া উঠে। কাজের দিকে তখন লক্ষ্য থাকে না, অথচ মত্ততাশ্রান্তিতে পরিশেষে কাজ করিলাম বলিয়া বিশ্বাস জন্মে। স্থির সমুদ্রে যেমন জাহাজ অগ্রসর হইবার সুবিধা পায়, ঝঞ্ঝা ঝটিকায় কেবল গতির বিঘ্ন সম্পাদন করে, স্থির ভাবে সেইরূপ হৃদয় সেই ধ্রুব পথ পানে অগ্রসর হইতে থাকে, মত্ততা শ্রান্তিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে মাত্র।

মত্ততার ক্রিয়ায় একটা ভয়ানক লম্ফঝম্প হয়, জয়ঢাক বাজে, ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। তাহার পর যখন প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়, তখন কেবলই অবসাদ—তখন হাই উঠিতে থাকে, পা টলিতে থাকে, মাথা ঘুরিতে থাকে, অতিরিক্ত ব্যায়াম চালনা হেতু কতকটা যেন জ্বরভাব উপস্থিত হয়। মত্ততাসুখ পদে পদে নৈরাশ্যকাতর। মাতিবার জন্যই তাহার কাজ কি না, মাতামাতির ত্রুটি হইলেই নৈরাশ্য। সে কেবল ছাতা ঘাড়ে করিয়া, খাতা পকেটে পুরিয়া, পথে পথে, গলিতে গলিতে ত্বরিতগতিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। হৃদয়ের আবেগে যে কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সুসম্পন্ন হইলেও হাঁক ডাক বড় শুনা যায় না। আর মত্ততাবেগে যে কার্য্য আরম্ভ হয়, তাহা সম্পন্ন হোক না হোক, একটা কোলাহল উঠে। অলস হৃদয়সমাগমে ধীরে ধীরে যে নিন্দা চর্চ্চা ফেনাইয়া উঠে, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, এই মত্ততাসুখ। বলবতী সংশোধনস্পৃহা তাহার মূল নহে, কেবলই আত্ম-অগাধ-আলস্য পরিতৃপ্তি জন্য রসনার ব্যায়ামানুষ্ঠান। স্বদেশহিতৈষিতাও অনেক সময় মত্ততা-সুখোদ্ভূত—তখন সে কেবল ছট্‌ফট্ করিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে, বিদেশের নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠে; ঘন ঘন করতালির নিকট আপনাকে বিক্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে। সমাজসংস্কার, ধর্ম্মচর্চ্চা, সকলেরই মধ্যে মত্ততাসুখ বিরাজমান। সংযমই কেবল ইহার একমাত্র ঔষধ। যেখানে সংযম খুব গভীর, সেইখানেই মত্ততাসুখ জোর করিতে পারে না। সংযমেই মহত্ত্ব, সংযমেই স্বাধীনতা, সংযমেই আনন্দ।

মত্ততা আর কাহাকে বলে? কেবলই সংযমাভাব বৈ ত নয়। আপনার উপরে আর দখল নাই, নৃত্যই জীবনের একমাত্র অধীশ্বর। সত্যানুসন্ধানে লক্ষ্য নাই, তর্ক উঁচাইয়া রহিয়াছে; যোগানন্দ নৃত্যানন্দাচ্ছন্ন; কর্ত্তার কর্ম্মত্ব প্রাপ্তি। মত্ততাসুখেও কাজ হয় বটে,

কিন্তু সে কার্য্যের মধ্যে জাগ্রত জীবন্ত আনন্দ নাই, সে কেবল মৃত দেহকে তড়িৎসাহায্যে নৃত্য করান। অসংযত মত্ততাসুখ শুনিল ধর্ম্ম, অমনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। স্থির সংযত হৃদয় ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে ফিরিবে। মত্ততাসুখ ধর্ম্ম প্রচার করিতে পারে, কিন্তু দৃঢ় ভিত্তি গাঁথিয়া তুলিতে পারে না। তাহার সকল কার্য্যই সাময়িক ক্ষণিক আন্দোলন। সংযম কার্য্যের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া কাজ করে, মত্ততাসুখ একটা কিছু হৈ চৈ আবশ্যক ভাবিয়া কাজ করে। আসল কথা, মত্ততাসুখ চিন্তা করিতে চাহে না।

২

তবে চিন্তা করাই কি মত্ততাসুখের প্রতিবন্ধক ? না, তবে গভীর চিন্তাশীলতা বটে। চিন্তার মধ্যেও মত্ততাসুখ আছে। লাগামছাড়া কল্পনার অস্তিত্বই তাহার প্রমাণ। যোগী যেমন সংযত হৃদয়ে সেই ভূমা অজর অমরের ধ্যানে নিযুক্ত থাকেন, তাহার মধ্যে মত্ততা নাই। তাঁহার বিমল মুখজ্যোতিতে, অধরপ্রান্তের রজতরেখায় মত্ততাসুখাভাব অভিব্যক্ত। মত্ততাসুখের হাস্য সংযত নহে। সে গড়াইয়া পড়ে, লুটাইয়া যায়, তাহার মাতালগতি। তাহার উৎসব দেহের উৎসব, আত্মার উৎসব নহে। তাহাতে আত্মার ভূমানন্দ পরিব্যাপ্ত হয় না; সাময়িক উচ্ছ্বাসে ব্যায়ামসুখ লাভ হয় মাত্র।

অনেকে হয়ত আমাদিগকে ভুল বুঝিয়া মনে করিতেছেন যে, মত্ততাসুখকে দ্বীপান্তরিত করাই আমাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মত্ততাসুখের মন্দিরে মন্দিরে সংযমের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে অবশ্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। কিন্তু তাহা যখন সম্ভব নহে, তখন মত্ততাসুখকে একেবারে দ্বীপান্তরিত করিয়া মন্দির শূন্য রাখিবার প্রয়োজন দেখি না। মত্ততাসুখ অনেক স্থলে মন্দের প্রতিবন্ধক। সংসারে একেবারে বৃথা কিছুই নাই, মত্ততাসুখেরও কাজ আছে।

কিন্তু কাজ আছে বলিয়া তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া অকর্ত্তব্য। কারণ, প্রশ্রয় পাইলে সে তোমাকে এমনি আঁকড়িয়া ধরিবে যে, তাহার নাগপাশ হইতে কিছুতেই উদ্ধার পাইবে না। বহুরূপীর মত মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে তোমার নিকট ধর্ম্মরূপে, জ্ঞানরূপে, প্রেমরূপে, কর্ম্মরূপে আবির্ভূত হইবে, এবং মোহের আবরণ টানিয়া দিয়া তোমাকে কলুর বলদের মত ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া কর্ম্মশীলতায় সান্ত্বনা দিবে। মত্ততাসুখের দাসত্বে তুমি অনেক সৎকার্য্য করিতে পার স্বীকার করি, কিন্তু আবার নিমেষের মধ্যে তোমার সত্যনিষ্ঠা অন্যায়ের তরফে দাঁড়াইতে পারে। মত্ততাসুখের উপর ত আর নির্ভর করা যায় না—সে আজ খেয়ালবশতঃ সর্ব্বস্বান্ত হইতে পারে, কাল আবার হয় ত অপরকে সর্ব্বস্বান্ত দেখিবার জন্য লালায়িত হইবে। মানব-জীবনের অসংলগ্নতার কারণ অনেক সময় মত্ততাসুখ।

মত্ততাসুখ আপনার স্বাধীনতা অনুভব করিবার জন্য যষ্টিহস্তে নিরীহের পৃষ্ঠ অনুসন্ধান করে; সংযম আপনার প্রভু হইয়া স্বাধীনতা উপভোগ করিতে থাকে। সংযমের আস্ফালন নাই, অহঙ্কার নাই; মত্ততাসুখ আস্ফালনী বিদ্যার উপরেই বাঁচিয়া থাকিবার প্রয়াস পায়। যেমন করিয়াই হৌক্, মত্ততাসুখে যে স্বাধীনতা নাই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। উদাহরণ দিয়া একটু পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করি। পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন।

মনস্থিরার্থে মাদকব্যবহারকারী উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন কু-অভ্যাসবশতঃ প্রমত্তাবস্থা ভিন্ন ধর্ম্মভাব সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় না, মত্ততাসুখগ্রস্ত ব্যক্তির হৃদয়েও সেইরূপ মত্ততাবিহীন কোন ভাবই ঠাঁই পায় না। প্রকৃত পক্ষে মত্ততার দাসেরা যন্ত্রবৎ জড় পদার্থ—তাহাদিগকে উপায়স্বরূপ করিয়া মত্ততাই কার্য্য করে। বড়মানুষের চাকরেরা যেমন বড়মানুষীদৃপ্ত হয়, মত্ততার দাসেরাও সেইরূপ মদদৃপ্ত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, বড়মানুষের চাকরের মনে যে অহঙ্কার দেখা যায়, তাহা মত্ততাপ্রসূত। পানীয় মদ ভিন্ন সংসারে বিষয়-মদ, ধর্ম্ম-মদ প্রভৃতি নানাপ্রকার মদ আছে, তাহারও পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আর একটি কথা পাঠকেরা স্মরণ রাখিবেন যে, তন্ময়ভাব ও প্রমত্তভাব এক নহে। তন্ময়ত্ব মত্ততার অতীত।

মত্ততাসুখকে ধরিতে হইলে আত্মবিশ্লেষণই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক। আত্মবিশ্লেষণে আপনার কার্য্যপ্রবর্ত্তক ভাবটিকে সহজেই বুঝা যায়, সুতরাং মত্ততাতিশয্য হইতে বিরত হইতে কষ্ট পাইতে হয় না। আমরা যে সত্যপ্রিয় হইয়াও অনেক সময় স্খলিতাচরণ হই, তাহার এক প্রধান কারণ, মত্ততাসুখমোহে আমাদের আত্মবিশ্লেষণাভাব। সহসা লাফাইয়া না উঠিয়া ধীরে সুস্থে আপনাকে বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে। কর্ত্তা যেন দাসত্বের বন্ধনে পড়িয়া কর্ম্মে আসিয়া না পরিণত হয়েন।

কিন্তু আত্মবিশ্লেষণ হয় কিরূপে? বাস্তবিক, ইহা শুনিতে যত সহজ, কার্য্যে তেমন নহে। আপনাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে আমাদের সহজে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা আপন আপন কুটিল হৃদয়দর্পণে জগৎসংসারকে কুটিল দেখি, এবং আত্মছিদ্রের প্রভাবে সংসার ছিদ্রময় ঠাহরাইয়া থাকি। পরছিদ্রানুমানতৎপরতা হেতু আত্মবিশ্লেষণের অবসর প্রায় হয় না। কিন্তু মানবের চেষ্টার অসাধ্য কি আছে? দুই দিন অভ্যাস করিলেই আত্মবিশ্লেষণ সহজ হইয়া উঠে। আত্মবিশ্লেষণক্ষমতা জন্মিলেই যে মানুষ সকল প্রকার মত্ততা হইতে মুক্ত হয়, তাহা অবশ্য নহে; কারণ, আত্মছিদ্র বুঝিতে পারিলেও প্রবৃত্তিকে বশীভূত করা সময়সাপেক্ষ। আত্মবিশ্লেষণ চক্ষু খুলিয়া দেয়, এবং এই কারণে সংযমের যথেষ্ট সহায়তা করে।

পদে পদে আমরা যখন আপনার দোষ অনুভব করি, তখন সাধারণতঃ সাধু ব্যক্তির নিন্দা করিয়া তৃপ্ত হইতে চাই। নিন্দাপ্রিয়দিগের নিকট সাধুতার খুঁৎ যেমন তৃপ্তিকর, এমন আর কিছুই নহে। রীতিমত আত্মবিশ্লেষণ অভ্যাস করিলে এ ভাব কতকটা কমিয়া আসার সম্ভাবনা। বলা বাহুল্য, আত্মবিশ্লেষণের মূল আত্মসংশোধনস্পৃহা বৈ আর কিছুই নহে। বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া যখন আমরা নিজের খুঁৎগুলি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব, তখন ক্রমে ক্রমে তাহা ঘুচিবেই। কারণ, মানবসন্তানে সৎপথাবলম্বনেচ্ছা চিরকালই বলবতী। সে পঙ্কের মধ্যে থাকিতে পারে না; তাহার আনন্দ চাই, প্রাণ চাই, শান্তি চাই। আর আনন্দ সংযম ব্যতীত মিলে না। পরস্ত্রীকাতরতা নিজস্ত্রীর আনন্দ উপভোগ করিতে দেয় না, পরনিন্দা আত্মসাধু-অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করিতে দেয় না, কুটিলতা সরলতার আনন্দ হইতে বঞ্চিত করে। যেখানেই সংযমাভাব, সেইখানেই অন্ধকার নিরানন্দ। মত্ততাসুখে নৃত্যকোলাহল, শ্রান্তি, অবসাদ, অশান্তি এবং অবশেষে শূন্য। ['ভারতী ও বালক,' অগ্রহায়ণ ১২৯৬]

বঙ্গসাহিত্য ঃ রামপ্রসাদের গান

পুণ্যভূমি বঙ্গের স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের প্রেম-রাগিণী শুনে নাই, সংসারে এরূপ লোক বিরল। রামপ্রসাদ সেন গানের দ্বারাই বিখ্যাত। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী আর কোনও কবি বোধ করি, সঙ্গীতে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা তান লয়ে গাহিবার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা, তাহার সুর আছে, তাল আছে, বৈষ্ণবেরা আজও সে গান কতক কতক গাহিয়া থাকে, কিন্তু তথাপি আজকালের অনেক লোক তাঁহাদিগকে সঙ্গীতরচয়িতা বলিয়া জানেন কি না সন্দেহ, বাঙ্গলা সাহিত্যে কবির স্থান লাভ করিয়াই তাঁহারা বাঁচিয়া গিয়াছেন। রাম-প্রসাদ সেন কি তবে কবি নহেন? সে কথা পরে বিবেচ্য। কিন্তু স্বীকার করিতেই হইবে যে, তিনি তাঁহার সুরে অনেকটা বাঁচিয়া গিয়াছেন, কবি বলিয়া লোকে তাঁহাকে যত না জানে, সাধক ভক্তিসঙ্গীতরচয়িতা ভক্ত বলিয়া অধিক জানে। রামপ্রসাদী সুর তাঁহার এক প্রধান কীর্ত্তি। বাস্তবিক, তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের নাম কয় জন শুনিয়াছে। অথচ এই বিদ্যাসুন্দরই রামপ্রসাদের কবিরঞ্জন উপাধির মূল কারণ।

কিন্তু বিদ্যাসুন্দর তাঁহার উপাধির কারণ হইলেও সঙ্গীতেই তিনি বাঁচিবার যোগ্য। নবাবি বিলাসপ্লাবিত সে সময়ের বঙ্গদেশে প্রেমের সুরে গান গাহিবার লোকের বিশেষ অভাব হইয়াছিল, রামপ্রসাদ সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রেমের সুরও কিছু

নূতন ধরণের। আর তাঁহার ভাষায়ও এমন কিছু নাই যে, ব্যাখ্যাকারের কুহেলিকাচ্ছন্ন টীকা টিপ্পনীর অন্ধকারের মধ্য হইতে অন্ধ হইয়া অতিপ্রচ্ছন্ন সুগভীর জটিল আধ্যাত্মিক রহস্যসমূহ বাহির করিতে হয়। সরল ভাবে, সোজা কথায়, হৃদয়ের সুরে তিনি মাকে আপনার সুখ দুঃখ জানাইয়াছেন—মায়ের উপর কখনও অভিমান করিয়াছেন, কখনও তাঁহার চিরপ্রসারিত বক্ষে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছেন, মাতৃস্নেহে পূর্ণহৃদয় হইয়া মরণের বিভীষিকাকে অনায়াসে উপেক্ষা করিয়াছেন। সেই জগৎজননী চিরস্নেহময়ীর চরণেই রামপ্রসাদের সকল আশা ভরসা। এ বিপুল সংসারে করুণাময়ীর অপার করুণা ব্যতীত মানবের আর আছে কি? ধন মান যশ, সকলই ত মায়ার খেলা—কিছুতেই শান্তি নাই, সোয়াস্তি নাই, লালসা তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়া মানবসন্তানকে গ্রাস করে।

রামপ্রসাদ গান রচনা করিতেন মায়ের পূজার জন্য। ফুল চন্দন নৈবেদ্যের মত সঙ্গীতই তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ ছিল। যশোলিপ্সা তাঁহার সঙ্গীতরচনার মূল কারণ হইলে প্রসাদের অনেকগুলি সঙ্গীত লোপ পাইত না। ভাবাবেশে তিনি মায়ের চরণে বসিয়া গাহিতেন। সকল গান লিখিয়া রাখিবার তাঁহার অবসর হয় নাই; বস্তুতঃ তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। প্রভুর হিসাবের খাতার পার্শ্বে, ভক্তিরসপিপাসু ব্যক্তিবিশেষের ভক্তিসঙ্গীতসংগ্রহে, এখানে সেখানে তাঁহার দুই দশটা গান কোনও প্রকারে ছটকাইয়া পড়িয়া বাঁচিয়া গিয়াছে। রামপ্রসাদ সেন কি তবে গান লিখিতেন না? না লিখিলে তাঁহার এত গান আমরা পাইলাম কিরূপে? তবে অলেখা গানও তাঁহার যথেষ্ট ছিল শুনা যায়। সে সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের বিশেষ কিছু বলিবার সুবিধা নাই। লেখা গানই সকল পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। সে কালে ত আর এ অধমতারণ মুদ্রাযন্ত্র ছিল না।

অনেকে বলেন, রামপ্রসাদের প্রথম গান,

"আমায় দেও মা তবিলদারী।
আমি নিমক্‌হারাম নই শঙ্করী॥" ইত্যাদি।

ইহা তাঁহার প্রথম রচনা কি না, নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু এই রচনাই রামপ্রসাদকে প্রকাশ করিয়া দেয়। রামপ্রসাদ একজন ধনীর গৃহে কর্ম্ম করিতেন। হিসাবের খাতার ধারে ধারে কালীনাম ও গান লেখা তাঁহার অভ্যাস ছিল। ঘটনাক্রমে তাঁহার প্রভু একদিন খাতা দেখিতে চাহিলেন। দেখিলেন, হিসাবের শেষে "আমায় দেও মা তবিলদারী" গান লেখা রহিয়াছে। রামপ্রসাদের কপাল ফিরিল—প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া গীতরচয়িতাকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন।

রামপ্রসাদ সেনের প্রধান গুণ এই যে, তাঁহার রচনায় কাপট্য নাই। ভাব বন্ধক দিয়া, হৃদয় বিক্রয় করিয়া সঙ্গীতের মধ্যে আভিধানিক জ্ঞান এবং দুরূহগুণখ্যাত

তালাভিজ্ঞতা প্রকাশ করিবার চেষ্টা রামপ্রসাদে দেখা যায় না। ধ্রুপদ খেয়াল টপ্পায় তাঁহার কিছুই যায় আসে না—ভাব তাঁহার সুর গড়িয়া লয়। পাঠকেরা আমাদিগকে ধ্রুপদ খেয়ালের বিরোধী ঠাহরাইবেন না। ধ্রুপদের গাম্ভীর্য্য, খেয়ালের মাধুর্য্য পাষাণকেও মুগ্ধ করে; কিন্তু মূলে ভাব চাহি। রাগ রাগিণী আলাপ যন্ত্রে হইতে পাবে—সেখানে কেবল সুরের ভাবের প্রতি লক্ষ্য। কিন্তু কথা যেখানে স্থান পাইয়াছে, সেখানে কথানুযায়ী সুরের ভাব হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞ ওস্তাদির দন্তে চাপিয়া ভাবকে হত্যা করা হৃদয়হীনতার পরিচয় বৈ আর কি? রামপ্রসাদ এ দোষে লিপ্ত নহেন। নিজের প্রাণের গানগুলিকে তিনি প্রাণের সুরে বসাইয়াছেন। ভাবের মত সুরও তাঁহার হৃদয় হইতে স্বতঃ উৎসারিত।

রামপ্রসাদী সুর যে টিঁকিয়া গিয়াছে, সে কেবলই তাহা হৃদয়োত্থিত বলিয়া। বড় বড় বিখ্যাত ওস্তাদি সুরের পার্শ্বে সে অবশ্য দাঁড়াইতে পারে না কিন্তু ভাববিশেষের গানের সহিত সে চমৎকার বসিয়া যায়। অনেক হিন্দী গানের যেমন কথার বিশেষ মূল্য নাই, কতকগুলা বিবর্ণ স্বর ব্যঞ্জনের উপর দিয়া একটা সুর বহিয়া গিয়াছে, সেই সুরেই সকল মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত, রামপ্রসাদের সুর সেরূপ নহে। তাঁহার সুর গাহিতে গেলেই সেই সঙ্গে এক বিশেষ ধরণের ভাবসংযুক্ত কথা আসিয়া হাজির হয়। আমাদের হৃদয়ে রামপ্রসাদের একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ ছায়া পড়ে—মায়ের চরণে বসিয়া ভক্তিবিগলিতহৃদয়ে প্রেম-পুলকিতান্তঃকরণে তিনি যেমন গান গাহিতেন, যেরূপ ভাবে কাঁদিতেন, হাসিতেন, অজ্ঞাতসারে অতি ধীরে ধীরে দূর বিস্মৃত অতীতের আকুলি ব্যাকুলির মত সেই ভাবগুলি ঈষৎ যেন জাগিয়া উঠে। সুরের সহিত, গানের সহিত রামপ্রসাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

নিজের গানগুলি রামপ্রসাদ খুব ভাবের সহিত গাহিতেনও। শুনা যায়, রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর বিশেষ সুমিষ্ট ছিল না, কিন্তু তাঁহার ভাবে লোকে মুগ্ধ হইত। এমন কি, নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে নাকি তিনি স্বরচিত সঙ্গীতে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সিরাজ উদ্দৌলা একদিন নৌকাবিহারে বাহির হইয়াছেন, রামপ্রসাদ সেন তখন হৃদয় খুলিয়া ভাগীরথীবক্ষে কালীকীর্ত্তন করিতেছেন। কালীকীর্ত্তন শুনিয়া সিরাজের মনে কি ভাবের উদয় হইল কে জানে—তিনি প্রসাদকে আপনার নৌকায় আনাইয়া গাহিতে বলিলেন। রামপ্রসাদ গাহিলেন ধ্রুপদ; সিরাজের তৃপ্তি হইল না। রামপ্রসাদ গাহিলেন খেয়াল গজল; নবাবের ভাল লাগিল না। তখন নবাব তাঁহাকে সেই কালীর গান গাহিতে আদেশ করিলেন। রামপ্রসাদ প্রাণের ভিতর হইতে গাহিলেন। মুসলমান নবাবের পাষাণ হৃদয় গলিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

রামপ্রসাদের গানের আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়, তাহার ছন্দ। তাঁহার ছন্দ অবশ্য একেবারে নূতন ধরণের নহে, নূতনত্ব তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু

তথাপি বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের নিকট তাহাকে একবার হাজির করা আবশ্যক বিবেচনা করি। বাঙ্গলা ভাষায় অক্ষরগণনার উপর যাঁহারা একান্ত নির্ভর করেন, রামপ্রসাদী গানের ছন্দ আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, স্বরান্ত এবং হসন্ত উচ্চারণের উপর ছন্দ অনেক সময় যথেষ্ট নির্ভর করে। রামপ্রসাদের বড়ই জোর কপাল যে, বড় বড় অমরকোষবিদ্ ব্যাকরণগ্রস্ত সশস্ত্র সংশোধক পণ্ডিতবর্গ তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিবার অবসর পান নাই। ক্ষীণজীবী রামপ্রসাদ সেন তাহা হইলে কি আর দুই দণ্ড কাল শান্তিতে থাকিতে পারিতেন? পণ্ডিতবর্গের কৃপায় তাঁহার গানগুলি শিখাশোভিত মুণ্ডিতমস্তক হইয়া মুখস্থদক্ষ অনুর্ব্বর হৃদয়ের আনন্দ বিধান করিত সন্দেহ নাই, কিন্তু গুরুতর সংশোধনভাবাচ্ছন্ন হইয়া রামপ্রসাদের মস্তক উত্তোলন করিবার সামর্থ্য থাকিত না।

ভাব, ভাষা, ছন্দ ছাড়িয়া এইবারে আমরা ক্রমে ক্রমে রামপ্রসাদের মতামতের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার চেষ্টা দেখি। ভাব বর্জ্জন করা অবশ্য চলে না—বরঞ্চ সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিতে হইবে। রামপ্রসাদকে কেহ কেহ বাহ্য অনুষ্ঠানপ্রিয় বলিয়া থাকেন। এ কথা সত্য কি না, দেবতা জানেন; কিন্তু গান দেখিয়া আমাদের ত তাহা মনে হয় না। রামপ্রসাদ বেশ বুঝিতেন, লোলরসনা নরমুণ্ডমালাশোভিতা জড় পাষাণপ্রতিমার সম্মুখে সহস্র নিরীহ মহিষ এবং ছাগশিশু বলি দিয়া মায়ের পূজা হয় না। তিনি জানিতেন, এই স্নেহময়ী বিশ্বজননী শোণিতপাতে পরিতৃপ্ত হয়েন না, স্তূপাকার ফুল চন্দন নৈবেদ্যে তাঁহাকে পাওয়া যায় না, যিনি বাক্যের অতীত, মনের অতীত, তিনি ফুল, চন্দন, নৈবেদ্য, নর-মহিষ-ছাগ বলিরও অতীত। রামপ্রসাদ মন্দিরবিশেষবদ্ধা প্রতিমাকে কালী বলিতেন না। গানের মধ্যেই তিনি বলিয়াছেন, "ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তাই জান না।" শুধু ইহা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। নৈবেদ্য এবং বলির উপরেও তাঁহার মন্তব্য আছে। যথা,

"জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে, কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয় আলোচাল আর বুট ভিজানা।
জগৎকে পালিছেন যে মা সাদরে তাই কি জান না।
ওরে, কেমনে দিতে চাস্ বলি তাঁয় মেষ মহিষ আর ছাগলছানা।"

রামপ্রসাদ কালীর উপাসক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কালী-উপাসক বলিলে বঙ্গদেশে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা তিনি ছিলেন না। তাঁহার কালীও স্বতন্ত্র, পূজা-পদ্ধতিও বিভিন্ন। তাঁহার পূজায় লালে লাল ব্যাপার নাই।

চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে এইখানে রামপ্রসাদের সাকারবাদ নিরাকারবাদ লইয়া কথা উঠিতে পারে। রামপ্রসাদ সাকার-উপাসক ছিলেন, কি নিরাকার-উপাসক ছিলেন, বলা বড় কঠিন। গান দেখিয়া মনে হয়, তিনি প্রথমে যাহাই থাকুন, ইদানীং নিরাকার-উপাসক হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না—তাঁহার হৃদয়ে প্রেম ছিল, ভক্তি ছিল, প্রাণহীন কথাসমষ্টির মধ্যে তিনি নিমগ্ন ছিলেন না। আমরা রামপ্রসাদের নিকট হইতে এই প্রেম ভক্তি শিক্ষা করিতে পারি। রামপ্রসাদ সাকারবাদীই হৌন্ বা নিরাকারবাদীই হৌন্, ফাজিল ছিলেন না, ইহাই তাঁহার এক প্রধান গুণ। পরবর্ত্তী নকল-নবিশেরা অনেকে বিনা ভাবে গলা জাহির করিতে চেষ্টা করিয়া বরঞ্চ ফাজিলামি দোষে দোষী হইয়াছেন। ব্যাখ্যার জোরে সটীক সমালোচকবর্গ রামপ্রসাদকে নানারূপে প্রতিপন্ন করিতে পারেন, কিন্তু রামপ্রসাদ যে অকপট, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রেমময়ীর চরণে তাঁহার অটল নির্ভর ছিল, এই জন্যই কেবল সাহস করিয়া তিনি অনেক কথা বলিতে পারিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার অহঙ্কার প্রকাশ পায় না—প্রাণের টান প্রমাণ হয় মাত্র।

নির্ব্বাণ সম্বন্ধে রামপ্রসাদের মত বর্ত্তমান কালের অনেক একেশ্বরবাদীদিগের সহিত মিলে। আত্মার নির্ব্বাণ অথবা ঈশ্বরত্ব প্রাপ্তি তিনি বিশ্বাস করিতে নারাজ—মায়ের পদপ্রান্তে বসিয়া চিরদিন সেই বিমল প্রেমানন্দ উপভোগ করিতে পারিলেই রামপ্রসাদ পরিতৃপ্ত। তাঁহার গানেই আছে,

"নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
চিনি হওয়া ভাল নয়, চিনি খেতে ভালবাসি।"

উপহাসরসিক প্রচ্ছন্নার্থাবিষ্কারদক্ষ অতি দার্শনিক পণ্ডিতেরা ইহার কিরূপ ব্যাখ্যা করেন জানি না, কিন্তু সাধারণের সহজ বুদ্ধিতে বোধ করি, ইহার অন্য বিশেষ নিগূঢ় অর্থ বাহির হইবে না। নিতান্তই যদি বাহির হয়, নাচার।

রামপ্রসাদের মতামত সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা শোভা পায় না। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে লেখনীযুদ্ধে অনেক কথা ব্যক্ত হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমানে আমরা তাঁহার দু একটি গানের অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াই, পাঠকেরা স্ব স্ব যুক্তি অনুসারে বিচার করিয়া লইবেন।

"আর কাজ কি আমার কাশী।
ওরে, কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি।
ওরে, হৃদ্‌কমলে ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি।
কালী নামে পাপ কোথা, মাথা নাই মাথা ব্যথা,
অনলে দহন যথা করে তুলারাশি।

গয়ায় করে পিণ্ডদান, পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,
যে করে কালীর ধ্যান, তার গয়া শুনে হাঁসি।
কাশীতে মলেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী।"

আর একটা গানের অংশ,

"কেন গঙ্গাবাসী হব।
ঘরে ব'সে মায়ের নাম গাহিব।
আপন রাজ্য ছেড়ে কেন পরের রাজ্যে বাস করিব ॥"

রামপ্রসাদের তীর্থাদি দর্শন সম্বন্ধে মতামত পাঠকেরা ইহাতে যথেষ্ট বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তথাপি আমরা দু এক কথা বলিলে বোধ করি, নিতান্ত অন্যায় হইবে না। সাধারণ লোকের ন্যায় তীর্থবিশেষে মরিলে মুক্তি, তীর্থ দর্শন করিলে সর্ব্বপাপক্ষয়, এ সকল রামপ্রসাদ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু তীর্থাদি দর্শনের উপকারিতা বা অপকারিতা সম্বন্ধে তিনি কোন মত ব্যক্ত করেন নাই। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তার অপূর্ব্ব রচনা-কৌশল দেখিলে হৃদয় প্রসারিত হয়। ইহাতে শরীর মনের বিশেষ স্বাস্থ্য সম্পাদন করে। এই জন্যই বোধ করি, প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা তীর্থাদি প্রতিষ্ঠার বিশেষ পক্ষপাতী। রামপ্রসাদ এ বিষয়ে কিছুই বলেন নাই—কেবল দেশের কুসংস্কারের প্রতি কটাক্ষ করিয়াই উপরি উদ্ধৃত গান গাহিয়াছেন। এত করিয়া এ কথা আমাদিগের বুঝাইবার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু রামপ্রসাদের গানের সহিত দলে দলে অন্ধ গোঁড়ামির আবির্ভাব হয়, সেই ভয়ে অনাবশ্যক হইলেও অনেক কথা বকিতে হইল। ভরসা করি, অধীর পাঠকেরা অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

সঙ্গীত রচনার জন্য কেহ কেহ রামপ্রসাদকে সুবিধামত রামমোহন রায়ের পার্শ্বে আনিয়া খাড়া করিয়া থাকেন। রামপ্রসাদের ইহাতে বিশেষ সুবিধা হয় কি না জানি না, কিন্তু পাঠক সাধারণের তাহাতে বিশেষ জ্ঞান বৃদ্ধি হয় বলিয়া ত মনে হয় না। শিক্ষা, দীক্ষা, সমাজ, অবস্থা, বিদ্যা, বুদ্ধি, কোনও বিষয়েই ত উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায় না। কেবল একমাত্র ঐক্য—উভয়েই ধর্ম্মসঙ্গীতরচয়িতা। কিন্তু উভয়ের সঙ্গীতও সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের। রামমোহন রায়ের স্বর বরাবরই গম্ভীর। তিনি একভাবে লিখিয়াছেন, রামপ্রসাদের সে ভাব নহে। রামমোহন রায়ের উপরে এই বিচিত্র বিশাল সৃষ্টির এমন একটি গম্ভীর প্রভাব পড়িয়াছে যে, তিনি তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন; সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া মানবকে সেই পরম পদে মনোনিবেশ করিতে বলিয়াছেন, আর এই অচিন্ত্য বিশ্বরচয়িতার মহিমা দর্শনে আকুলহৃদয়ে গাহিয়া উঠিয়াছেন। রামপ্রসাদের মত

তাঁহার সঙ্গীতে গয়া কাশী প্রভৃতির উল্লেখ নাই, তাহা বিশেষরূপে সাধারণভাবে সর্ব্বদেশের উপযোগী হইবার মত রচিত। রামপ্রসাদ মায়ের কাছে অনেক আব্দার করিয়াছেন, মায়ের উপর অভিমান করিয়াছেন, কত কি বলিয়াছেন কহিয়াছেন ; রামমোহন রায় তাহা করেন নাই, জননীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি নীরব। আমরা কাহাকেও কমাইতে বাড়াইতে পারি না—কেবল বলিতে পারি, উভয় বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি সমালোচনার এ স্থান নহে, সুতরাং তাহা হইতে আমরা বিরত থাকি। বিশেষ কারণবশতঃ এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি যে, গান দেখিয়া পাঠকেরা ঈশ্বরপ্রেম সম্বন্ধে কাহাকেও হীন ঠাহরাইবেন না।

রামপ্রসাদের গান সম্বন্ধে আর একটি পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইবে। রামপ্রসাদের গান বৈঠকে গাহিবাব মত নহে—দশ বিশ জনে মিলিয়া গাহিবার গানও নহে। তাহাতে সে গানের প্রভাব অনুভব করা যায় না। বিজন নদীতীরে, প্রান্তরে, পথে একাকী পথিক যখন আপন মনে গাহিয়া চলে, তখনই রামপ্রসাদকে বুঝা যায়। বলিতে কি, নগরে ভিক্ষুকদিগের মুখে সে গানের যে মিষ্টতা থাকে, গলদ্‌ঘর্ম্ম বিপুলস্ফীতি ওস্তাদি কণ্ঠে অনেক সময় তাহা নষ্ট হইয়া যায়। প্রাণে না অনুভব করিয়া কেবলমাত্র সা রে গা মার ব্যায়াম করিলে রামপ্রসাদী গান মাটি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কথা ছাঁটিয়া ফেলিয়া কেবল সুরের জমাট্ করিতে হইলে রামপ্রসাদ পরিত্যাজ্য।

শেষ কথা, রামপ্রসাদের গান যথার্থ নিঃস্বার্থ ভক্তির পরিচয়। রামপ্রসাদের ভক্তি সম্বন্ধে অধিক কথা বলিতে যাওয়া বাহুল্যমাত্র। বাঙ্গলার কীট পতঙ্গ অবধি তাহা জানে। রামপ্রসাদের কথা হইতে তাঁহার ভক্তির গাঢ়তা দেখাইয়াই আমরা এ প্রবন্ধের উপসংহার করি।

"মায়ের নাম লইতে অলস হইও না রসনা, যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না হয় আরো পাবে।
ঐহিকের সুখ হলো না ব'লে কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে।
রেখো রেখো সে নাম সদা সযতনে,
নিও রে নিও রে নাম শয়নে স্বপনে।
সচেতনে থেক (মন রে আমার), কালী ব'লে ডেক এ দেহ ত্যজিবে যবে।"

['ভারতী ও বালক,' অগ্রহায়ণ ১২৯৬]

বিদেশের ঝরা ফুল

কোমল মধুর কণ্ঠ থেমে যায় যবে,
ধ্বনি তার স্মৃতিমাঝে বাজে মধুরবে ;
ঝরে ফুল, গন্ধ তার, শিরায় শিরায়
যে সুখ জাগায়ে তোলে, জেগে থাকে তায় ;

গোলাপ শুকায়ে যায়, পাতাগুলি তার,
প্রিয়ের শয্যার তরে হয় স্তূপাকার ;
তেমনি তোমার চিন্তা, তুমি গত যবে,
প্রেম নিজে তদুপরি ঘুমাইয়া রবে। (সেলি)

আমি ডরি হে কুমারী তোমার চুম্বনে ;
আমার চুম্বনে তব নাহি কোন ভয়,—
অবসন্ন হিয়া মোর যে ভার-বহনে,
অবশ করিবে না গো তোমার হৃদয়।

আমি ডরি ওই স্বর, লাবণ্য-ভঙ্গিমা,
আমারে তোমার বালা নাহি কোন ডর ;
এ যে প্রেম, যাহে পূজি ও দেবী-প্রতিমা,
পূজার ফুলের মত বিমল সুন্দর। (সেলি)

কুসুমের তরে আছে শিশিরের কণা,
ফুলমধু মধুপের মিটায় তিয়াষা,
বনের পাখীর আছে নিকুঞ্জ নিলয়,
তোমার আমার শুধু আছে ভালবাসা।

অশ্রু জল আছে হেথা অনেকের তরে,
ভাগ্যবান্ তরে আছে সুখের প্রসাদ ;
জগৎ চলিয়া যাক্ যেমন সে যায়,
তোমার আমার, প্রিয়ে, পিরীতি অগাধ।

ভাবনা রয়েছে শত, ছাড়িবে না তারা,
দুঃখ ক্লেশ কোন কালে পাবে না বিনাশ ;
তবু চিরকাল আছে গৃহে আমাদের,
তোমার আমার মাঝে প্রেমের আবাস।

এ প্রেমের পরিমাণ কেহ নাহি জানে,
শুধু জানি সত্য ইহা গভীর উদার—
এ আমার সংসারের আধখানা, প্রিয়ে,
তোমার নিকটে ইহা সমস্ত সংসার। (হুড)

['ভারতী ও বালক,' অগ্রহায়ণ ১২৯৬]

রমলা

চঞ্চল ক্ষুদ্র হৃদয় নিমেষের ঘটনায় বিচলিত হইয়া পড়ে, এই জন্য সেখানে কোন ঘটনাই চির-মুদ্রিত থাকিবার অবসর পায় না। সামান্য সুখে দুঃখে হৃদয় অধীর হইয়া উঠে, আপনার উপর হইতে দখল চলিয়া যায়, নিন্দা ভয়, শোক তাপের মধ্যে তাহার অবসান হয়। কিন্তু গভীর হৃদয় নাকি তৈলবিন্দুর মত মুহূর্ত্তের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায় না, তাই সেখানে যে ঘটনা এক বার গিয়া পঁহুছিতে পারে, তাহা আর সহজে মুছে না। সারা জীবন সে ঘটনা সেইখানে বসিয়া নীরবে কার্য্য করিতে থাকে, জীবনের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করে ; জীবনবন্ধন না টুটিলে তাহার বিনাশ নাই। রমলার হৃদয় এইরূপ বড় গভীর। সাধারণ স্ত্রীলোকের মত সে লঘুপ্রকৃতি নহে। দূর হইতে এই জন্য অনেক সময় তাহার জীবন যেন কেমন অস্বাভাবিক জটিল রহস্য বলিয়া ঠেকে। রহস্য নহে ত কি ? যেখানে এত সৌন্দর্য্য, সেখানে রহস্য নাই ? রহস্যেই ত তাহার সৌন্দর্য্য। কিন্তু রমলার চরিত্রে অস্বাভাবিকতা কোথাও বোধ হয় নাই। কেবলমাত্র এক অন্ধ যন্ত্র-আদর্শ খাড়া করিয়া বিচার করিলে এইরূপই মনে হয় বটে, কিন্তু জড়পিণ্ডের অতীত প্রদেশে দাঁড়াইয়া একটু উদার ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেই রমলার প্রশান্ত হৃদয়ের সৌন্দর্য্য অনুভব করা যায়। সে সৌম্য সৌন্দর্য্য বড়ই স্থির, ধীর, গম্ভীর।

স্বামীর সহিত রমলার ইদানীং কিছু মনান্তর ঘটিয়াছিল বলিয়া যে তাহার হৃদয়ের অভাব প্রকাশ পায়, তাহা নহে। হৃদয় না থাকিলে বরঞ্চ এ মনান্তর ঘটিত না। যেখানে ভালবাসা, সেইখানেই অভিমান। পরের উপর অভিমান করিয়া কে কোথায় কষ্ট পাইয়া

থাকে ? স্বামীর উপর নিঃস্বার্থ অভিমান করিবার স্ত্রীর অধিকার আছে। সে জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। রমলা যখন তাহার প্রতি অল্পে অল্পে মেলেমার ভাবের পরিবর্ত্তন বুঝিতে পারিল, দেখিল—স্বামী পূর্ব্বের ন্যায় তাহার নিকটে সরলভাবে কথাবার্ত্তা কহেন না, সেরূপ ভাবে তাহাকে স্নেহ করিতে পারেন না, রমলার নিকটে তাঁহার কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়, রমলার সঙ্গ আর তেমন ভাল লাগে না, তখন তাহার হৃদয়ে কি নৈরাশ্য! স্বামী স্ত্রীর নির্ম্মল প্রেমের মধ্যে দিন দিন ভয় সঙ্কোচ ব্যবধান হইয়া দাঁড়াইতেছে—রমলার বুক ফাটিয়া যায়। কিন্তু গভীরহৃদয়া রমণীর মুখ কিছুতেই ফুটে না। বুকে যে শেল বিঁধিল, সে শেল আর ঘুচিল না।

রমলা রাশীকৃত কীটদষ্ট পুঁথির মধ্যেই লালিত পালিত হইয়াছে। বার্দোর স্ত্রীর অনেক দিন কাল হইয়াছে। প্রাণপ্রিয় পুত্র পিতৃভবন ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ, সুতরাং বৃদ্ধবয়সে তাঁহার একমাত্র সহায় কন্যা রমলা। অন্ধ বার্দোর লেখাপড়া সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য তাহাকেই করিতে হয়। বার্দো নিজে পড়িতে পারেন না, রমলা, তিনি যে গ্রন্থ শুনিতে চাহেন, পড়িয়া শুনায়; বার্দো আবশ্যকীয় পদগুলি বলিয়া যান, রমলা সেইগুলি চিহ্নিত করে; যেখানে যেমন টীকা টিপ্পনী করিতে হইবে, বার্দো রমলাকে বুঝাইয়া দেন, রমলা নীরবে লিখিয়া যায়। পণ্ডিত পিতার জ্ঞানালোচনার সহকারিণী হইয়া রমলা শিক্ষিতা না হইবে কেন ? বার্দো-সংগ্রহের অনেকগুলি পুঁথিতেই তাহার বেশ দখল ছিল। আর সে সংগ্রহও ত বড় কম নয়। ফ্লোরেন্সের মধ্যে তেমন পুস্তকসংগ্রহ বোধ করি, তখন খুব অল্প লোকেরই ছিল।

এই পুঁথির রাজ্যে বার্দোর পাণ্ডিত্য-শাসনে রমলার চরিত্র যদি না গঠিত হইত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ আমরা এ গভীর গম্ভীর প্রকৃতি দেখিতে পাইতাম না। জীবনের বসন্তে বিজন পুস্তকারণ্যে বসিয়া রমলা জ্ঞানানুসন্ধিৎসু বৃদ্ধ পিতার সহায়তা করিতেছে। সংসারের সহিত তাহার কোনও সংস্রব নাই বলিলেই চলে। সুতরাং সাধারণ বালিকাদিগের সহিত তাহার চরিত্র স্বতন্ত্র হইবারই সম্ভাবনা। রমলার চরিত্র কতকটা স্বতন্ত্র বটেও। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহার স্ত্রীভাব একেবারে লোপ পাইয়াছিল ? না। স্ত্রীজাতিসুলভ সঙ্কীর্ণতার হ্রাস হওয়া এক, আর পৌরুষিক কাঠিন্যসঞ্চারে হৃদয়ের নম্রভাব নষ্ট হওয়া এক। রমলার অনেক বিষয়ে সঙ্কীর্ণতার হ্রাস হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু পাগড়ী মাথায় দিয়া কল্পনায় গোঁফে চাড়া দিতে রমলাকে ত কখনও দেখা যায় না।

বার্দোর সহিত পুস্তক লইয়াই রমলার দিন কাটে। একদিন নেলো নাপিতের দ্বারা মেলেমা বার্দোর নিকট পরিচিত হইলেন। যুবার মুখ রমলা কত দিন দেখে নাই।

বার্দোর নিকটে যাঁহারা আসিতেন, প্রায়ই বৃদ্ধ, নয় প্রৌঢ়। অনেক দিন পরে মেলেমার যুবা-মুখ দর্শন করিয়া রমলার হৃদয় যেন কেমন চমকিয়া উঠিল। কত দিন পূর্ব্বে এই বার্দো-গৃহে একজন যুবা পুরুষ ছিলেন, এখন আর নাই। এই কি সেই? না, এ ত সে ব্যক্তি নহে। কিন্তু সে ব্যক্তি না হইলেও এ ব্যক্তি সুন্দর বটে। তিতো মেলেমা পণ্ডিত, সুপুরুষ।

রমলার হৃদয়ে মেলেমা ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করিলেন, রমলাও তাঁহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিল। একদিন বার্দো রমলাকে পুস্তকমঞ্চ হইতে একখানি পুস্তক পাড়িতে বলিলেন। মেলেমা তাহার সাহায্য করিতে উঠিলেন। বিজন পুস্তকমঞ্চের পার্শ্বে তাঁহার প্রেম ব্যক্ত করিবার সুবিধা হইল। রমলার নিকট হইতে অনুকূল উত্তরও মিলিল। দুই জনের হৃদয়ে যেন তড়িৎ বহিয়া গেল। জীবনে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল।

কিন্তু রমলার প্রেমে যেমন ধীর গাম্ভীর্য্য, এমন প্রায় দেখা যায় না। ইহাতে হাবভাব, কটাক্ষ, শতনিশ্বাস-ফোঁসফোঁসিত অধীর চাঞ্চল্য আদবেই নাই। অথচ ভাবটি বড় সরল। না হইবেই বা কেন? আমাদের শকুন্তলার মত সমবয়স্কা সখী তাহার কেহই ছিল না, সংসারের অনেক বিষয়ে সে বিশেষ অনভিজ্ঞা। সুতরাং তাহার প্রেমে সরল গাম্ভীর্য্য ত থাকিবারই কথা। শকুন্তলার অধীরতা এখানে শান্ত। কিন্তু মিরান্দারও ত সঙ্গিনী কেহ ছিল না। রমলা মিরান্দার মত হইল না কেন? কারণ অনেক আছে। মিরান্দা একেবারে জনহীন দ্বীপে থাকিত, পিতা ভিন্ন অপর কোনও মানবের সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল না। রমলা সহরে থাকে, মানবের মুখ দেখিতে পায়, তবে গৃহ ছাড়িয়া সে বড় বাহির হয় না। মিরান্দার পিতা ভূত প্রেত লইয়া ব্যস্ত, তাঁহার বার্দোর মত পুস্তক-সংগ্রহও নাই, মিরান্দাকে পুস্তকের মধ্যে লালন পালন করাও হয় না। রমলা পণ্ডিতের সন্তান—বিদুষী। শিক্ষায় তাহার হৃদয়ে একটা সংযত ভাব আসিয়াছে। মিরান্দার সারল্যে অনেকটা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। রমলার সারল্যে সংযম-গাম্ভীর্য্য। এই জন্যই মিরান্দাতে অধীরতা, আর রমলা স্থির, ধীর।

শকুন্তলা আমাদের মিরান্দার মত অজ্ঞ নহে, কিন্তু রমলার মত পিতার সহিত পাঠগৃহের অন্ধকারে তাহার জীবনবসন্ত অতিবাহিত হয় নাই। শকুন্তলা প্রকৃতির শোভায় গঠিত হইয়াছে। তপোবনের আলবালবদ্ধ বৃক্ষমূলে মূলে জলসেচন করিয়াই তাহার সুখ। শকুন্তলাতে মাতৃভাবটি বড় প্রস্ফুটিত। রমলার এ স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তিভাব তেমন দেখা যায় না। এমন মুক্ত বাতাস সে কোথায় অনুভব করিবে? যাহা হৌক্, শকুন্তলা অপেক্ষা রমলার আপনার উপরে আধিপত্য আছে। দুষ্মন্তমুগ্ধা শকুন্তলা যেরূপ অধীরতা প্রকাশ

করিয়াছিল, তিতো মেলেমা প্রেম ব্যক্ত করিলেও রমলা তেমন অধীরতা প্রকাশ করে নাই। অতি স্থিরভাবে মেলেমার কথার উত্তরে রমলা নিজ প্রেম ব্যক্ত করিল।

এখন মেলেমা রমলায় মিলন হয় কিরূপে? বার্দোর মত না হইলে ত বিবাহ হইবে না। সুতরাং বার্দোর মত জানিতে হইবে। কথায় কথায় মেলেমা বার্দোর নিকটে আপন অভিলাষ খুলিয়া বলিলেন। বার্দো রমলার মত জিজ্ঞাসা করিলেন। রমলা সম্মতি প্রকাশ করিল। বার্দো কহিলেন, এ ঘটনা যদি ঘটে ত খুব সুখের বিষয়। রমলার ধর্ম্মপিতা বার্ণাদোর সহিত এ বিষয়ে এক বার বার্দো কথাবার্ত্তা কহিয়া দেখিবেন।

কিছু দিন কাটিয়া গেল। মেলেমার সহিত রমলার বিবাহ নিশ্চিত। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে রমলার হৃদয়ে একটা কাল-বিভীষিকা উঁকি মারিতেছে। নিরুদ্দেশ ভ্রাতার সংবাদ পাইয়া পিতাকে না বলিয়াই সে একদিন তাঁহাকে দেখিতে যায়। তাহার ভ্রাতা তখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান। মুমূর্ষু অবস্থায় তিনি রমলাকে আপনার স্বপ্নের কথা বলেন—রমলার বিবাহে কি যেন বিভীষিকা ছায়ার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই দিন হইতে রমলার বুকের মধ্যে সেই বিভীষিকা থাকিয়া থাকিয়া গুমরিয়া উঠে। রমলা মেলেমার নিকট সে কথা বলিল। মেলেমা উপহাস করিয়া রমলাকে আশ্বাস দিলেন। মেলেমার সহিত রমলার বিবাহ সম্পন্ন হইল।

কিন্তু রমলার সহিত বিবাহ হইলে কি হইবে, মেলেমা ইতিপূর্ব্বেই এক সরলা বালিকার পাণি গ্রহণ করিয়াছেন। মেলেমা বাস্তবিক যে তাহাকে বিবাহ করিলেন, তাহা নহে। তিনি কতকটা ঠাট্টার ভাবে গিয়াছেন, কিন্তু সরলা তেসা তাঁহাকে স্বামী বলিয়াই জানে। মেলেমাও তেসার মনে আঘাত দিবার ভয়ে ভুল ভাঙ্গিতে পারিলেন না। তিনি তেসাকে এ বিবাহের কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিয়া দিলেন। বলিলেন, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে সে আর স্বামীর দর্শন পাইবে না। সরলা বালিকা মেলেমার কথামত এ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিল না। তেসা বড় সাদাসিধা—নিতান্তই স্নেহের পুতলী বালিকা। সে শুধু সারাদিন মেলেমার জন্য প্রার্থনা করে। তেসার সারল্য শকুন্তলায় নাই, মিরান্দায় নাই, রমলায় নাই। এ এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতি—অথচ পূর্ণ-মাতৃভাবময়ী। কিন্তু এ মাতৃভাবেও তেসা বালিকা।

রমলা তেসার ব্যাপার কিছুই জানে না। জানিলে হয় ত সে মেলেমাকে বিবাহ করিত না, চিরদিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাটাইত। মেলেমাও রমলাকে এ কথা বলিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন, আর গোলযোগে কাজ কি? রমলার মত তাঁহার সংযমভাব নাই। তিনি কতকটা ঘটনাস্রোতেই ভাসিয়া যান। আপনার মন্দিরে উদ্দেশ্যকে বলি দিতে তাঁহার বড় সঙ্কোচ হয় না, কিন্তু উদ্দেশ্যের মন্দিরে তিনি আপনাকে

বলি দিতে পারেন না। সুতরাং সুবিধা-চালিত মেলেমা উভয় কুল বজায় রাখিবার জন্য নীরব হইয়া গেলেন। রমলাকেই তিনি সহধর্ম্মিণী ঠাহরাইয়াছেন, রমলার সহিতই তাঁহার দিন কাটে। রমলাও তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে। এইরূপে পরস্পরের ভালবাসায় জীবনের প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত হইল। এত দিন সংসার চলিয়াছে ভাল।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। এত দিন ভাল গিয়াছে বলিয়া ভবিষ্যতের কথা কে বলিতে পারে? দিন ত আর কাহারও সুখ দুঃখের মুখ চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে না। চির-হাসিমুখে পা টিপিয়া টিপিয়া নিঃশব্দে সে লোকের দুয়ারের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায়—কোথাও লোকে হাসিয়া সারা হয়, কোথাও ক্রন্দন আর থামে না। ফ্লোরেন্সের আকাশে কিছু দিন নীরবে কাটিয়া গেল। কিন্তু এ নীরবতা আর চলে না বুঝি। বিদেশীর আগমনে ফ্লোরেন্স উদ্বেলহৃদয় হইয়া উঠিল। এক দল, দুই দল, তিন দল—অল্পদিন মধ্যেই ফ্লোরেন্স দলময়। দলময় ফ্লোরেন্সে তিতো মেলেমারও এক বিশেষ ভয়ের কারণ উপস্থিত হইল। সামান্য ভয় নয়—প্রাণ লইয়া টানাটানি।

মেলেমার ভয়ের কারণ ফরাসীদের একজন বৃদ্ধ বন্দী। বৃদ্ধ মেলেমাকে বড় ভালবাসিত—মেলেমার রক্ষক, পিতা। কিন্তু মেলেমা এই ভালবাসার প্রতিদানে কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। বৃদ্ধের শেষ চিহ্নগুলি বিক্রয় করিয়া তিনি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছেন, বৃদ্ধকে প্রকাশ্য স্থানে লোকের সম্মুখে পাগল বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এখন এই বন্ধনমুক্ত পলিতকেশ লোলচর্ম্ম বন্দী বাল্‌দাসারের শাণিত ছুরিকার ভয়ে মেলেমাকে বর্ম্ম পরিধান করিতে হইয়াছে। নিদারুণ প্রতিহিংসার মত বৃদ্ধের করাল মূর্ত্তি তাঁহাকে প্রতি ক্ষণ কবর হইতে কবরান্তরে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে—রমলা হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করে বা। মেলেমার মনে মুহূর্ত্তের জন্যও শান্তি নাই। চলিতে ফিরিতে, উঠিতে বসিতে, এমন কি, রমলার সহিত কথা কহিতেও তাঁহার মনে বাল্‌দাসার জাগিয়া উঠে। তিনি আর পূর্ব্বের মত কথা কহিতে পারেন না। রমলার সঙ্গও আর তেমন সুখপ্রদ নহে। ভয়ে, নৈরাশ্যে মানবের যে কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়, মেলেমার জীবনে তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত।

রমলার চরিত্র এখন পর্য্যন্তও ভালরূপ অভিব্যক্ত হয় নাই। অবস্থাবিশেষে না পড়িলে চরিত্রের ত তেমন বিকাশ হয় না। এখন কেবল রমলা মেলেমার স্ত্রী মাত্র। অন্যান্য স্ত্রীর সহিত তাহার অধিক পড়াশুনা এবং স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য বৈ বিশেষ কোনও তফাৎ ত দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এইবারে ক্রমে ক্রমে তাহার স্বভাব ব্যক্ত হইতেছে। বার্দোর মৃত্যু হইয়াছে। মেলেমার আধিপত্য সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এদিকে বৃদ্ধ বাল্‌দাসারের ভয়ে ভয়ে মেলেমার ভাবের কিরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া পড়িতেছে। সে মেলেমা আর নাই। এইরূপ দুর্দ্দিনেই ত চরিত্র স্ফূর্ত্তি পায়। সেই জন্য রমলার হৃদয়ের

গঠন বুঝিতে হইলে তাহার জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদই বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক। প্রথম পরিচ্ছেদে স্বভাব বিকাশের অবসর হয় নাই। এখন তিতোর সহিত যখনই রমলার কথাবার্ত্তা হয়, রমলা যেন খানিকটা করিয়া বাহির হইয়া আসে। রমলার চরিত্রে বার্দোর প্রভাবও বেশ বুঝা যায়।

বার্দোর মৃত্যুর পর কয়েক মাস পরে রমলা একদিন লাইব্রেরীতে বসিয়া কি লেখাপড়া করিতেছে, এমন সময়ে মেলেমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মেলেমা আজ প্রথম বর্ম্ম লইয়া আসিয়াছেন। রমলা তিতোর মুখ শুষ্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার কি বিশেষ ক্লান্তি বোধ হইতেছে? রমলার মুখচুম্বন করিয়া মেলেমা নিকটস্থ আসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল পরে রমলাকে এ লাইব্রেরীগৃহ ছাড়িয়া তাঁহাদের নিজের গৃহে বসিবার কথা বলিলেন। রমলা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু স্বামী বিশেষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দিল। তাহার পর বর্ম্মের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই রমলা মেলেমাকে বর্ম্মের উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। মেলেমা ফ্লোরেন্সের বর্ত্তমান অরাজক অবস্থার উল্লেখ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁহার আত্মরক্ষার জন্য বর্ম্মের আবশ্যক। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক কথাবার্ত্তা হইল। রমলা ফ্রাজিরলামোর বক্তৃতা শুনিতে গিয়াছিল, সেখানে সেই বৃদ্ধ বন্দীকে দেখিতে পায়। তিতো তাহা শুনিলেন। তাঁহার কেমন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। মেলেমা বিশ্রাম করিতে উঠিলেন। তাঁহার দিনটা বড় ভাল গেল না।

এই ঘটনার দিন তিন চার পরে রমলা একদিন চিত্রকর পায়রোর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। পায়রো বার্দোর একখানি চিত্র আঁকিতেছিলেন, কত দূর কি হইল না হইল, দেখিয়া আসাই রমলার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ ছবি সে ছবি দেখিতে রমলার চক্ষে একটি পরিচিত ব্যক্তির ছবি পড়িল—তিতো মেলেমা, আর তাঁহার পার্শ্বে সে-দিনকার সেই পলাতক বৃদ্ধ বন্দী। রমলা বাল্‌দাসারকে সে দিন পলাতক অবস্থায় দেখিয়াছে, তাহার পর তিতোর সহিত বৃদ্ধের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিয়াছে, আজ আবার মেলেমার চিত্রের পার্শ্বে তাহার চিত্র! রমলা শিহরিয়া উঠিল। পায়রোকে এই দুই ব্যক্তির চিত্র একত্রে আঁকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। পায়রো তাঁহার খেয়ালের দোহাই দিয়া কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করিলেন। সে দিন বাল্‌দাসার পড়িয়া যাইতে যাইতে তিতোকে ধরিয়া বাঁচিয়া যায়, তাই তিনি এরূপ ভাবে দুই জনের চিত্র আঁকিতেছেন বলিলেন। রমলার মন বড় অস্থির হইল। স্বামীকে এ কথা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতে হইবে। কিন্তু না, যাহা তিনি স্বেচ্ছায় প্রকাশ করিতে চাহেন না, রমলা সে কথা জিজ্ঞাসা করিবে কেন? রমলা নীরব থাকিবে।

এই ভাবে দুই চারি দিন কাটিয়া যায়। তিতোর সহিত রমলার আর একদিন অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। তিতো কথায় কথায় রমলাকে জানাইলেন যে, বার্দোর

লাইব্রেরী তিনি বিক্রয় করিয়াছেন, শীঘ্রই লোকজন আসিয়া পুস্তকাদি সরাইয়া ফেলিবে। রমলার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। বার্দো চিরজীবনের সঞ্চিত ধন লাইব্রেরীটি বিশ্বাসপূর্ব্বক মেলেমার হস্তে দিয়া গিয়াছেন, সেই মেলেমা মৃত বার্দোর নিকট বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া লাইব্রেরী পরহস্তগত করিলেন। মেলেমা রমলার স্বামী—বার্দোর জামাতা—তাঁহার এই কাজ! রমলার মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সংযমীর ধ্যান ভঙ্গ হইলে যেরূপ অবস্থা হয়, বজ্রাহতা রমলার এখন ঠিক সেই অবস্থা। সে আর সে রমলা নাই। কি যেন ভীষণ নৈরাশ্যে আত্মহারা হইয়া সে তিতোকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সম্বোধন করিল। রমলার মধ্যে যেন বার্দোর প্রেতাত্মা গুমরিয়া উঠিতেছে। রমলা বার্ণাদোর নিকটে গিয়া লাইব্রেরী রক্ষার উপায় করিবে। তিতো অনেক করিয়া বুঝাইলেন। রমলাকে বার্ণাদোর নিকটে যাওয়া হইতে নিবৃত্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহিত রমলার বিচ্ছেদ আরম্ভ হইল।

রমলা সকল সহিতে পারে, কিন্তু আপনার স্বামীর কলঙ্ক দেখিতে পারে না। তাহার স্বামী যে স্বার্থের দুয়ারে বিশ্বাস ভঙ্গ করিবেন, ইহা তাহার অসহ্য। তিতো মেলেমা রমলার নিকটে বিশ্বাসভঙ্গের কথা তুলিতেই রমলা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিতোকে সে এত দূর পর্য্যন্ত বলিয়াছিল যে, বার্দো যদি মেলেমায় বিশ্বাসভঙ্গের সন্দেহ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সাধের লাইব্রেরী মেলেমার ক্ষমতায় রাখিতেন না। এমন কি, জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, জীবন্ত কাহাকেও কি তিনি প্রবঞ্চনা করিয়াছেন? সেই জন্যই কি এই বর্ম্ম পরিধান? কিন্তু এত কথাতেও মেলেমার চৈতন্য হয় নাই। নগদ মুদ্রার মায়া পরিত্যাগ করা মেলেমার পোষাইল না। বার্দো বাঁচিয়া ত নাই—তাঁহার আবার বিশ্বাসভঙ্গ কি? মেলেমা ভাবিলেন, রমলা তাহারই ত স্ত্রী। সহসা এ সংবাদ শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছে, দুই দিন পরে আর কিছুই মনে হইবে না। কিন্তু রমলা সে প্রকৃতির নহে। সে গভীর হৃদয়ে যে ঘটনা পৌঁছে, তাহা আর সহজে মুছে না।

লাইব্রেরী যথাসময়ে স্থানান্তরিত হইল। রমলাও ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিল। তিতোকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে, তাহার ভয়ানক কষ্ট হইতেছে। জোর করিয়া কেবল সে মনকে বুঝাইতে চায় যে, তিতোর প্রতি তাহার ভালবাসা নাই। কিন্তু কল্পনা করিলে কি হইবে? তাহার প্রত্যেক কার্য্যে তিতোকেই মনে পড়িতেছে—তিতোর স্নেহ, তিতোর কথা, তিতোর স্মৃতি। তিতোকে কেন সে সেদিন রূঢ় কথা শুনাইল? কেন তাঁহার নামে প্রতারণার কলঙ্ক বলিল? তিতো-আচ্ছন্না রমলা অন্তরে অন্তরে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। তবুও সে মন বাঁধিয়াছে—ফ্লোরেন্সে আর থাকিবে না। ম্যাসো চাকরের দ্বারা বলোনা হইতে স্বামীকে এবং ধর্ম্মপিতাকে দুইখানি পত্র পাঠাইয়া দিবে, সেই জন্য দুইখানি পত্র লিখিয়া লইল। তিতোকে লিখিল, তাঁহার প্রতি রমলার ভালবাসার

অবসান হইয়াছে, সুতরাং যত দূর তিতোর ছিল রমলাও মরিয়াছে। আইনের বলে তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করা না হয়; কারণ, মেলেমা তাহাতে সুখী হইতে পারিবেন না। যে রমলাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, সে আর ফিরে না। পরিশেষে, তাঁহাকে তাহার দানের সিন্দুকটি বার্ণাদোর নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছে। তাহারই মধ্যে তাহার বিবাহের কাপড়চোপড়, ছবি, পিতামাতার স্মৃতিচিহ্নগুলি আছে। ধর্ম্মপিতাকেও রমলা ধর্ম্মকন্যার অনুসন্ধান হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিয়া লিখিল।

পত্র দুইখানি বুকে করিয়া রমলা নীরবে ছদ্মবেশে গৃহ হইতে বাহির হইল। অনেক দূর গেল, কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না। কিন্তু এইবারে বুঝি সে ধরা পড়ে—ফ্রা জিরলামো আসিতেছেন। জিরলামো রমলার ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিলেন। রমলাকে গৃহে প্রতিগমন করিবার জন্য অনেক বুঝাইলেন। রমলা বুঝে না। সে বলে, স্বামীর প্রতি তাহার আর সে অকপট প্রেম নাই, ভাণ করিয়া চলা তাহার পোষাইবে না, এই জন্য সে গৃহে প্রতিগমন করিতে সম্মত নয়। জিরলামোর রমলার অবস্থা বুঝিতে বাকি রহিল না। তিনি তখন বুঝাইতে লাগিলেন যে, এরূপভাবে স্বামিগৃহ হইতে চলিয়া যাওয়া কেবল স্বার্থপরতা। কর্ত্তব্যের জন্য কার্য্য করিতে হইবে, সামান্য কারণে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ফেলা মানবের ধর্ম্ম নহে। ত্যাগস্বীকারেই প্রকৃত মহত্ত্ব। আত্মসুখের জন্য পলায়ন ত্যাগস্বীকার হইতে বহু দূর। এইরূপ উচ্চভাবের কথায় তিনি রমলাকে পলায়ন হইতে নিবৃত্ত করিলেন। রমলা বুঝিল। গৃহে আসিয়া পত্র দুইখানি ছিঁড়িয়া ফেলিল। রমলা আবার যে গৃহে, সেই গৃহে।

তিতো মেলেমার জীবনে ইতিমধ্যে কেবল দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। তেসার আলয়ে বাল্‌দাসারের সহিত তাঁহার একবার দেখাসাক্ষাৎ হয়। বাল্‌দাসারের নিকট তিনি মার্জ্জনা ভিক্ষা করেন, কিন্তু প্রতিশোধলিপ্সু বাল্‌দাসার কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে না। বাল্‌দাসারের অন্তরে একমাত্র স্পৃহা—প্রতিশোধ। আর একবার রুসেলাই উদ্যানে সান্ধ্যভোজে বাল্‌দাসারের সহিত মেলেমার বেশ একটু বাধিয়াছিল। বাল্‌দাসার প্রকাশ্য ভোজে সর্ব্বসমক্ষে তিতোকে বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন বলিয়া প্রকাশ করে। তিতো বাল্‌দাসারকে পাগল প্রমাণ করিয়া দেন। নানা কারণে তিতোর কথাই টিঁকিয়া যায়।

কিন্তু তিতো বাল্‌দাসার সম্বন্ধে আপাততঃ আর অধিক বলা আবশ্যক করে না। তিতো এখন চাণক্য-বিদ্যায় বেশ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছেন—রাজা, প্রজা, সন্ধি বিগ্রহ, ষড়্‌যন্ত্র, মন্ত্রতন্ত্র লইয়াই দিন কাটে। রমলার সহিত কিন্তু তাহার বিচ্ছেদ বাড়িতেছে বই কমিতেছে না। বিধির বিধান খণ্ডন করিতে পারে কে? ঘটনাচক্রে রাজনৈতিক বিষয়েও রমলার সহিত তাঁহার অল্পবিস্তর ঠোকাঠুকি হয়। মেলেমা যদি তেমন সত্যনিষ্ঠ

সচ্চরিত্র হইতেন, তাহা হইলে এ বিচ্ছেদ হয় ত হইত না। তিনি যেখানে রমলার ভয়ে লুকাইয়া চলেন, সেইখানেই রমলার নিকট ধরা পড়েন। জীবনের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ এইরূপ আধো-ছাড়াছাড়ি ভাবে কাটিয়া গেল। তৃতীয় পরিচ্ছেদে রমলার সহিত বিচ্ছেদ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

বাল্‌দাসারকে রমলা একবার মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করে। বাল্‌দাসার রমলার নিকটে মেলেমার সকল কথা প্রকাশ করিয়া দেয়—তেসার কথা পর্য্যন্তও বাদ যায় নাই। ভগবান্ রমলাকে তেসাকে দেখাইয়া দেন। মেলেমা যে তেসার স্বামী, তাহাও রমলা জানিতে পারিল। রাজনৈতিক দুএকটি ঘটনা লইয়াও রমলার মেলেমার সহিত অল্প অল্প মনান্তর চলিয়াছে। মেলেমার সহিত রমলার দুই তিন বার কথোপকথন হইয়াছে, বাল্‌দাসারের কথাও ফাঁক যায় নাই, কিন্তু তাহাতে বিচ্ছেদ ক্রমাগতই বাড়িয়াছে। রমলা সকল সহিতে পারে—মিথ্যাচরণ সহিতে পারে না। তিতোও একবার মিথ্যাকে অবলম্বন করিয়াছেন, আর ছাড়িতে পারেন না। সুতরাং দুই জনের মিলনাশা বিরল।

কিন্তু সে যাহাই হৌক্, গল্পের খুঁটিনাটি আর অধিক বলা যায় না। রমলা অল্পদিন পরে আবার ফ্লোরেন্স ত্যাগ করিয়া গেল। তিতোকেও প্রাণ লইয়া পলাইতে হইল। কিন্তু তিতোর প্রাণ বাঁচিল না। বৃদ্ধ বাল্‌দাসারের তৃষিত প্রতিহিংসা তাঁহার প্রাণ গ্রহণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইল। রমলা কেবল রোগীর শুশ্রূষা করিয়া বেড়ায়—তাহার জীবনের একমাত্র কার্য্য পরোপকার। ক্রমে সে তিতোর মৃত্যুসংবাদ শুনিল। কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিল না—ফ্লোরেন্সে ফিরিয়া আসিল। ফ্লোরেন্সে আসিয়া তেসার সন্ধান করিল। তেসার সন্তানদিগকে রমলা মায়ের মতন ভালবাসে। তাহাদিগকে লালন পালন করিয়াই তাহার এখন দিন কাটে। তিতোর প্রতি তাহার ভালবাসা এইখানেই অভিব্যক্ত। রমলার চরিত্রও ফুটিয়াছে এইখানে।

রমলার কিছু নূতন ধরণের চরিত্র। হৃদয়ের আবেগে সে কার্য্য করে, কিন্তু সে সংযত। তাহার যাহা সত্য ন্যায় বলিয়া মনে হয়, মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে না পারিলে তাহা হইতে সে কখনও বিচ্যুত হয় না। তিতোর চরিত্র যদি রমলাপেক্ষা উন্নত হইত, তাহা হইলে কোনও গোল ছিল না। রমলা তাহা হইলে আরও ভালরূপ ফুটিত, তাহার সৌন্দর্য্য আরও সুপরিস্ফুট হইত। স্ত্রী অপেক্ষা স্বামীর সকল বিষয়ে শিক্ষিত উন্নত হওয়া আবশ্যক। কারণ, স্বামীই স্ত্রীর পথপ্রদর্শক, সহায়, সর্ব্বস্ব। নহিলে পথপ্রদর্শক যদি অন্ধকার কূপের মধ্যে পথ দেখাইয়া দেন, চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির, তাঁহার প্রতি কতক্ষণ অটল বিশ্বাস থাকে? রমলার স্বামীর পুঁথি-পাণ্ডিত্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু হৃদয়ের এত দূর মহত্ত্ব ছিল না যে, রমলাকে সুচালিত করিতে পারেন। এই জন্য রমলা ফুটিল বটে, কিন্তু

সৌরভ বিস্তার করিতে পারিল না। এরণ্ডবৃক্ষকে জড়াইয়া উঠিলে মাধবীলতার কি আর তেমন শোভা ফুটে? হৃদয়ের সত্যনিষ্ঠ উদার মহত্ত্ব সম্বন্ধে তিতো মেলেমা এরণ্ড-দ্রুম বটে।

শিক্ষার বিরোধী পক্ষ রমলাকে তিতো হইতে বিচ্ছিন্ন দেখিয়া তাহাকেই গালি দিবেন, এবং সেই সঙ্গে স্ত্রীজাতির পুস্তকস্পর্শ-রহিতাজ্ঞা প্রচার করিতে ত্রুটি করিবেন না। রমলা তিতো হইতে দূরে থাকিয়া কি অবস্থায় ছিল, ইহা দেখিতে তাঁহাদের অবসর হইবে না। মিথ্যাচরণের ভয়েই কেবল রমলা দূরে সরিয়া গিয়াছিল। সরিয়া না গেলেও হয় ত চলিত—হয় ত আরও ভাল হইত। কিন্তু ফ্লোরেন্স ত্যাগের জন্যই তাহাকে পতিত স্থির করা যায় না। হৃদয়ের দারুণ যন্ত্রণায় লোকে সময় সময় হাসিয়া থাকে, রমলার অবস্থা এইরূপ। আত্মসংযমের প্রভাবেই কেবল সে বাঁচিয়াছিল—শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, সংসারের জন্য খাটিতে পারিয়াছিল।

রমলার চরিত্রে বরাবরই এই সংযমভাব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বার্দো-লাইব্রেরীতে দেখ, মেলেমার সহিত প্রথমালাপে দেখ, বিবাহের পরে দেখ, এমন কি, তিতোর মৃত্যুর পরেও দেখ, রমলার কি অসাধারণ আত্মসংযম! নভেলী ভাব রমলায় আদবে নাই। সংসারের জটিল রহস্যের মধ্য দিয়া সে কেবল অসাধারণ আত্মসংযমের বলেই দৃঢ়পদক্ষেপে চলিতে পারিয়াছে। নহিলে তাহার দশা কি হইত কে জানে! ['ভারতী ও বালক,' পৌষ ১২৯৬]

নগ্নতার সৌন্দর্য্য

দূর হইতে সৌন্দর্য্যের নগ্নতা দেখিয়া তাহাকে অনেক সময় সম্পূর্ণ আয়ত্ত মনে হয়, কিন্তু সান্নিকট্যে তাহার মধ্যে সহস্র এমন রহস্য বিকশিত হইয়া উঠে যে, নগ্নতার লাবণ্যে হৃদয় হারাইয়া যায়। নগ্নতার চতুর্দ্দিকে একটা দীপ্ত লাবণ্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে, সেই সেই লাবণ্য-দীপ্তির মধ্যে সৌন্দর্য্যের আত্মা সন্নিবিষ্ট। নগ্ন প্রকৃতির হৃদয়ে ডুবিয়া দীর্ঘ জীবন-পথের কাতর কোলাহল আমরা যে বিস্মৃত হই, সে কেবলই এই দীপ্ত আত্মার সৌন্দর্য্যে। দূরদেশ হইতে নগ্নতার মধ্যে বিচরণ করিবার ক্ষেত্র আছে বলিয়া মনে হয় না, নয়নাতীত অতীন্দ্রিয় কিছু ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। তাহার সৌন্দর্য্যে বিচরণ করিবার যত অবসর পাইতে থাকি, সে অনির্ব্বচনীয় রহস্য-মাধুরীমধ্যে নিমগ্ন হইয়া যাই, অনন্তের মুক্ত সৌন্দর্য্য সেবনে আকুল হইয়া উঠি। জীবনের মর্ম্মে মর্ম্মে সেই শুভ্র বিমল জ্যোৎস্না-নগ্নতা

তড়িৎকম্পনের মত স্পর্শ করিয়া যায়, চিরনবীন সৌন্দর্য্য-প্রবাহে জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি লক্ষিত হয়। নগ্নতার সৌন্দর্য্যে প্রাণ সম্যক্ প্রস্ফুটিত।

নগ্নতা আর কাহাকে বলে? অলঙ্কারশূন্যতা বৈ ত নয়। সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যের আবরণে অবগুণ্ঠিত সর্ব্বত্রই। যেখানে কৃত্রিমতার আড়ম্বরে সৌন্দর্য্য আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, সেখানেই নগ্নতা প্রচ্ছন্ন। চাক্‌চিক্যে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, ব্যক্ত হইতে পারে না। শুভ্র চন্দ্রালোকে যন্ত্রবিশেষের সাহায্যে সিন্দূরের আভা ফেলিলে কি সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হইবার সুবিধা পায়? এই জন্য প্রকৃতিতে নগ্নতা সৌন্দর্য্যময়ী। নগ্নতায় আত্মা পরিব্যাপ্ত। আচ্ছাদনে প্রাণের রহস্য উপভোগ করা যায় না, হৃদয় সৌন্দর্য্যে উথলিয়া উঠে না, কেবল একটা আনন্দবিহীন জড় দেহ জাগিয়া থাকে মাত্র। ম্লান অধরে অলক্তরাগ আপনাকেই ব্যক্ত করে, অধরের স্বাভাবিক সরল ভাষা মুছিয়া যায়; সুন্দরীর শুভ্র কপোলদেশে চূর্ণদ্রব্য তাহার সহজ লাবণ্য ঢাকিয়া ফেলে, সে নগ্ন-শ্রী অবসিত হয়। নগ্নতায় গভীরতা আছে, আনন্দ আছে, সেখানে শ্রী কলায় কলায়। অলঙ্কার-আবরণ চক্ষু আকর্ষণ করে; নগ্নতা হৃদয় টানিয়া আনে।

কালিদাসের শকুন্তলা সুন্দরী—কালিদাস তাহার মধ্যে কেমন একটা নগ্ন ভাব ফুটাইয়া দিয়াছেন। শকুন্তলা অলঙ্কারবিহীনা, নগ্ন প্রকৃতির সহিত সে যেন মিশিয়া আছে, প্রকৃতির শ্যামলতার সহিত তাহার যৌবন-লাবণ্য চিরসম্বদ্ধ। বল্কলবাসে যে শকুন্তলায় নগ্নতার সৌন্দর্য্য বিকশিত হইয়াছে, তাহা নহে—ভাবেই শকুন্তলার মধ্যে নগ্নতা। শকুন্তলার মধ্যে এই নগ্ন সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়াই কালিদাস বলিয়াছেন, "দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ।" আমাদের বঙ্কিম বাবুর কপালকুণ্ডলাও এই নগ্ন সৌন্দর্য্যে সুন্দরী। তাহার কোন প্রকার অবগুণ্ঠনের আবশ্যক হয় নাই, নগ্নতাতেই সে রহস্যময়ী। অরণ্যপালিতা কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে রাজা সীতারাম রায়ের অবগুণ্ঠনবতী ধর্ম্মপত্নী শ্রীকে এক বার দাঁড় করাইয়া দেখ, শ্রীমতী কে? শ্রী সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইতে পারে, গাছে চড়িয়া সহজে স্বকার্য্য উদ্ধার করিতে পারে, স্বামীকেও যে ভালবাসে না এমন নহে, কিন্তু এত চাক্‌চিক্যেও শ্রী স্ত্রী, কি পুরুষ, সহজে ঠাহরাইয়া উঠা যায় না, হাঁ করিয়া লোকের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয়, কে কি বলে।

নগ্নতার মধ্যে স্বভাবের স্ফূর্ত্তি হয়, এই জন্যই তাহার সৌন্দর্য্য কূলে কূলে। তাহার মধ্য হইতে নিংড়াইয়া রস বাহির করিবার চেষ্টা বিফল। নগ্ন জ্যোৎস্নাকে ছাঁকিয়া পরদার আড়ালে উপভোগ করা যায় না, পূর্ণ জ্যোৎস্নায় ঝাঁপাইয়া পড়িতে হইবে। নগ্ন সৌন্দর্য্য স্বপ্রকাশ। উষার সৌন্দর্য্য কি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতে হয়? শকুন্তলা, সূর্য্যমুখী, কুন্দ, কপালকুণ্ডলা, এ সকল চরিত্রের ব্যাখ্যা অসম্ভব। আর দেখ প্রফুল্লমুখী—ব্যাখ্যা না করিলে

তাহার সৌন্দর্য্য কোথায়? প্রাচীন নিষ্কাম ধর্ম্মের ধ্বজা উড়াইয়া চৌধুরাণী স্বামীকে স্ত্রীর পদসেবায় নিযুক্ত করিলেন; দরবার, রাজত্ব, সকলই ভাগ্যে জুটাইয়াছিল, ভাবও নিষ্কাম, তথাপি সে চরিত্র তেমন ফুটিল না—যেন জাঁতায় পেষা। এই নিষ্কাম চরিত্রের পার্শ্বে অভাগিনী শৈবলিনীকে দেখ, নগ্ন সৌন্দর্য্যে তাহার মধ্যে স্বভাব কেমন বজায় আছে। নগ্নতায় সৌন্দর্য্য ফুটে অধিক। তাহার মর্ম্মে কি যেন "লাজহীনা পবিত্রতা" জাগিয়া আছে।

অলঙ্কারে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে কেন? কারণ আর কিছুই নহে—প্রাণ চাপা পড়ে বলিয়া। দেহ-জগতে সর্ব্বত্রই প্রাণ অন্তর্নিবিষ্ট; এই জন্য তাহার প্রত্যেক উত্থানপতনে হৃদয়ের উত্থানপতন অনুভব করা যায়। অলঙ্কারে দেহের মধ্যস্থ আত্মা চাপা পড়িয়া থাকে, উত্থান পতন দেখা যায় না, এই কারণে তাহাতে সৌন্দর্য্য সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। শেলীর Skylarkএ সৌন্দর্য্যের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির কারণ, নগ্ন আত্মার অভিব্যক্তি। শেলী দেহাবরণের প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গে আত্মা প্রস্ফুটিত করিয়াছেন। তিনি তাহার গতির মধ্যে কেবলই তাহার আত্মার আকুল গীতি শুনিয়াছেন; পক্ষী স্বর্গের দুয়ার হইতে যতই আপনাকে ব্যক্ত করিতে থাকে, শেলী তাহার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যান, সমস্ত জীবন সৌন্দর্য্যপ্লাবিত হইয়া উঠে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের skylarkএ নগ্ন আত্মার এমন বিকাশ হয় নাই, সেই জন্য তাঁহার পক্ষীর কণ্ঠধ্বনিতে হৃদয় সেইরূপ আকুল করে না। শেলীর বিহঙ্গ-কণ্ঠ সৌন্দর্য্যস্নাত, সে স্বর-লহরীর মধ্যে জগতের ব্যবধান নাই, সে সৌন্দর্য্য অনাবৃত, সৌন্দর্য্যাচ্ছন্ন।

অবগুণ্ঠনে যে সৌন্দর্য্য নাই, আমরা এ কথা বলিতে পারি না, কিন্তু সৌন্দর্য্যের সম্যক্ অভিব্যক্তি নগ্নতায়। যে ভাব ভালরূপে ব্যক্ত করিতে হইবে, তাহাকে অলঙ্কার-আবরণে আচ্ছাদিত করিলে তাহার বিকাশ হয় না। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার আকাশে সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের শোভা কি কখনও ব্যক্ত হয়? নগ্ন সৌন্দর্য্য হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে প্রতিসৌন্দর্য্য জাগাইয়া তুলে। রূপ ব্যক্ত করিতে হইলে লেপ মুড়ি চলে না, গুণ ব্যক্ত করিতে হইলে জগতে বাহির হইতে হইবে। অভিব্যক্তি নহিলে সৌন্দর্য্য ব্যর্থ।

একটা কথা উঠিতে পারে, অভিব্যক্তিতে রহস্য থাকে কিরূপে? নগ্নতা যদি রহস্যময়ী হয়, তবে তাহাতে অভিব্যক্তি হইবার সুবিধা কোথায়? কিন্তু প্রকৃতিতে কি দেখা যায়? কোমল কুসুমকলিকা বৃক্ষের সৌন্দর্য্যোচ্ছ্বাসে পূর্ণহৃদয় হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাহাতে কি রহস্য নাই? রহস্য অভিব্যক্তির হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন। ক্ষুদ্র কলিকার মধ্যে পূর্ণযৌবনের সৌন্দর্য্য সন্নিবিষ্ট ছিল, ইহাতেই তাহার রহস্য। কলিকা যদি না ফুটিত, কুসুমরূপে ব্যক্ত না হইত, তাহা হইলেই সে সৌন্দর্য্য ব্যর্থ। বিকাশের মধ্যে অতীতের সহিত ভবিষ্যতের মায়াবন্ধন। এই বন্ধনসূত্রে ভাবের প্রলয় আবদ্ধ।

অভিব্যক্তির মধ্যে রহস্যের অবস্থিতির স্বতন্ত্র প্রমাণ আবশ্যক করে না—এই বিচিত্র বিশাল সৃষ্টিই তাহার যথেষ্ট পরিচয়। সৃষ্টির রহস্যই ত তাহার বিকাশে। দেশশূন্য কালশূন্য মহা-অন্ধকারের অন্তঃপুর হইতে এত বড় সামঞ্জস্যময় রহস্য-সৌন্দর্য্যের দীপ্ত উদ্ভাসন! অভিব্যক্তিতে রহস্য ব্যক্ত হইয়া শত রহস্য খুলিয়া দেয়, যেখানে রহস্য ছিল না, সেখানেও রহস্য বাহির হয়; অকূল রহস্যপাথারে দাঁড়াইয়া সৌন্দর্য্যের নগ্ন বৈচিত্র্যে মানব-হৃদয় হারাইয়া যায়। নগ্নতা রহস্যের প্রতিবন্ধক ত নহে, তাহাতেই সৌন্দর্য্যের সম্যক্ অভিব্যক্তি। প্রকৃতিতে সৌন্দর্য্য সৌন্দর্য্যাচ্ছন্ন, তাহার আর কোন আবরণ নাই।

সৌন্দর্য্যের কবিদিগের রচনা আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা নগ্নতার মধ্যেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ অনুভব করিয়াছেন। বাহ্য প্রকৃতিই কি আর মন প্রকৃতিই কি, সর্ব্বত্রই নগ্নতার সৌন্দর্য্য। হৃদয়ের উপর একটা কুটিল সন্দেহাবরণ টানিয়া দাও, তাহার সুকুমার সরল ভাব চাপা পড়িয়া যাইবে, হৃদয় বিকশিত হইতে পারিবে না। সৌন্দর্য্য সহজ ভাবেই সুব্যক্ত, তাহার উপর রং ফলাইয়া উজ্জ্বল করা যায় না। নগ্ন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হইলে তাহাতে ডুবিতে হইবে। কবিরা সৌন্দর্য্যের হৃদয়ে প্রবেশ করেন বলিয়াই আনন্দ পাইয়া থাকেন। আপনাকে দিয়া তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে আচ্ছন্ন করেন না, সৌন্দর্য্যের অন্তঃপুরে সৌন্দর্য্য-নিমগ্ন হইয়াই তাঁহাদের সুগভীর অতৃপ্ত তৃপ্তি।

নগ্নতায় প্রত্যেক সৌন্দর্য্য অপর সৌন্দর্য্য-ব্যক্ত! রঙবিশেষের পর অন্য রঙ, ছায়ার পর যথাস্থানে আলোক, ছায়ালোকের তারতম্য, সমস্ত মিলিয়া একটা প্রভাব বিস্তার করে। অথচ, সকল ভাব সম্পূর্ণ খেলিবার জমি পায়, সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয় না। এই জন্যই নগ্নতায় এমন সৌম্য গাম্ভীর্য্য। সকল ভাবের সর্ব্বাঙ্গীন অভিব্যক্তির মধ্যে যথোচিত সামঞ্জস্য—কি গভীর রহস্য! নগ্নতায় সৌন্দর্য্যের কনক-মিলন। নগ্নতা পূর্ণ-সুন্দরী। ['ভারতী ও বালক,' পৌষ ১২৯৬]

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর

এইবারে আমরা প্রচীন বঙ্গসাহিত্যের এক সমস্যাক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি—আমাদের আলোচ্যবিষয় বিদ্যাসুন্দর। বঙ্গীয় পাঠকের নিকট বিদ্যাসুন্দর অশ্লীল গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত, কিন্তু তাহাকে সরস কাব্য বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের কথা সকলে জানেন না, ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতেই তাহার যাহা কিছু সুনাম বা দুর্নাম রটিয়াছে। কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের নামের সহিত সাধারণের মনে এমন একটা বিশেষ সংস্কার জন্মাইয়া গিয়াছে যে, ইহার সহিত রামপ্রসাদ সেনের কোনও প্রকার সম্বন্ধ থাকিতে

পারে, লোকে সহজে বিশ্বাস করিবে না। একদল লোক রামপ্রসাদের নাম শুনিয়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে সহস্র নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য বাহির করিতে বসিবেন, বিদ্যার মধ্যে গৌরী এবং সুন্দরের মধ্যে মহাদেবের প্রেতাত্মা অনুভব করিয়া সনাতন ধর্ম্মের মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন ; আর একদল বিদ্যাসুন্দর শুনিয়া রামপ্রসাদের ভক্তির গভীরতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতে থাকিবেন, এবং সুবিধামত সঙ্গীতরচয়িতা রামপ্রসাদকে বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদ হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিবেন। বিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতাই যে বিদ্যাসুন্দররচয়িতা রামপ্রসাদ, সে বিষয়ে অন্য প্রমাণের আবশ্যক নাই, বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের মধ্যে রামপ্রসাদের আত্মপরিচয় দানেই তাহা জানা যায়। তবে তাঁহার গ্রন্থের আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কোনও প্রমাণ পাই না। যত দূর বুঝিতে পারি, বক্রগতি বুদ্ধিমানেরা স্বীয় অসাধারণ মেধার প্রভাবে রামপ্রসাদের ছদ্মবেশে জটিল তত্ত্বসমূহ বাহির করিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন বলিয়াই বোধ হয়। এরূপভাবে পার্থিবতার শত আবরণ দিয়া দুরূহ কষ্টসাধ্য ব্যাখ্যার দুয়ারে একটা আধ্যাত্মিকতাকে খাড়া করিয়া রাখিবার ত কোন কারণ দেখা যায় না। তাহাতে ত ফল মন্দ বৈ ভাল হয় না।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরেরই মত আদিরসের কাব্য ; তাহাতে চঞ্চলচিত্ততা আছে, রূপতৃষ্ণা আছে, হীরা মালিনী আছে, গুপ্ত প্রণয় আছে,—সে প্রণয়ও সম্পূর্ণ রূপজ ; সুড়ঙ্গ, সখী, চোর, কোটাল, কিছুই বাদ যায় নাই, যদি কিছু বাদ গিয়া থাকে ত তাহা ভারতচন্দ্রেও বাদ গিয়াছে—তাহা ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা। ভাবের গভীরতা, সুগভীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান, প্রেমের মহান্ উচ্চ আদর্শ, এ সকল রামপ্রসাদের গ্রন্থে নাই। নানা ভাষার কথায় বিবিধ ছন্দে বিস্তর অনুপ্রাস দিয়া তিনি বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রাপেক্ষা তাঁহার ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ হইয়াছে মাত্র। নহিলে, তাঁহার বিদ্যা ভারতের বিদ্যাপেক্ষা বিশেষ কম বিলাসিনী নহে, তাঁহার সুন্দরও সেই হাল্কাস্বভাব বিলাসী বাবুচরিত্র, সমস্ত কাব্যের মধ্যে গম্ভীর চরিত্রের একেবারেই অভাব। আদিরসের কাব্য বলিয়াই যে বিদ্যাসুন্দর হাল্কামিপূর্ণ, তাহা নহে। প্রাচীন সংস্কৃত অনেক কাব্যই আদিরসপূর্ণ; অথচ গম্ভীর। রচয়িতার মধ্যে সমধিক গাম্ভীর্য্যের অভাবেই বিদ্যাসুন্দর অতি হাল্কা হইয়াছে। আর রামপ্রসাদ যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সে সময়ে বিলাসিতাই ত সমাজের অস্থিমজ্জা। কিন্তু রামপ্রসাদের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে একটি কথা বলা যায়, সেগুলি অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। সহস্র সখীপরিবেষ্টিত হইয়া অন্তঃপুরের রুদ্ধ কবাটের মধ্যে নিশিদিন বসিয়া থাকিলে চরিত্রের দৃঢ়তা হয় কিরূপে? দুই-চারিখানা পুঁথির সাহায্যেও আর নিমেষের মধ্যে চরিত্র গঠন করা যায় না। বিদ্যার জীবন সহচরীবৃন্দের উপহাস-রসিকতার মধ্যেই গঠিত, ভোগবিলাসেই তাহার জীবনের প্রতিষ্ঠা, সুতরাং

স্বভাবতই সে বিলাসিনী। সদ্দৃষ্টান্ত ও রীতিমত ধর্ম্মশিক্ষার তাহার যথেষ্ট অভাব ছিল, আত্মসংযম এই কারণে তাহার পক্ষে অসম্ভব।

তবে বিদ্যার ধনুকভাঙ্গা পণের অর্থ কি? যাহার আত্মসংযম যথেষ্ট নাই, সে কিরূপে প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহাকে বিচারে পরাজয় করিতে না পারিলে কাহাকেও বিবাহ করিবে না? প্রতিজ্ঞাটা আসলে হইয়াছিল খেয়ালের মাথায়। সুন্দরের পাল্লায় পড়িয়া তাহা টিঁকিল না। সুন্দর মালাগাঁথায় নিজের পরিচয় প্রদান করিয়া বিদ্যাকে আকর্ষণ করেন। তাহার পর হীরা মালিনীর সাহায্যে বিদ্যার সুন্দর দর্শনলাভ হয়। আর কি বিদ্যা স্থির থাকিতে পারে? সুন্দরের জন্য বিদ্যা অধীরা হইয়া উঠিল। রামপ্রসাদ অধীরা বিদ্যার মুখে একটা আইনবদ্ধ সানুপ্রাস রূপবর্ণনা বসাইয়া দিয়াছেন—তাহাতে ভাব যত থাক্ না থাক্, বিদ্যাপ্রকাশচেষ্টা যথেষ্ট আছে। তাহার অর্থ বোধ হইতে খানিকটা সময় যায়। তবে যাহারা ভালরূপ অক্ষর চিনে না, সারি সারি কতকগুলা এক অক্ষর দেখিয়া তাহাদের কতকটা বর্ণপরিচয় হইতে পারে। কিন্তু রামপ্রসাদের সুন্দরের চৌত্রিশাক্ষরে যে কালীস্তুতি আছে, তাহাতে বর্ণপরিচয়ের আরও অধিক সুবিধা। বিদ্যার অধীরতাব্যঞ্জক কবিতাগুলিতে আদবেই যেন জোর নাই, বসিয়া বসিয়া শান্ত মনে সে যেন অনুপ্রাসালঙ্কার বুঝাইয়াছে। ভাবের কবিতার সহিত টানাবোনা। কবিতার প্রভেদ কত দূর, অনুপ্রাসাচ্ছন্ন রামপ্রসাদকে দেখিলেই বুঝা যায়।

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন যে, অনুপ্রাসাধিক্য দেখিয়াই রামপ্রসাদকে আমরা টানাবোনা ভাবের কবি ঠাহরাইয়াছি, অনুপ্রাস হইলেই যে সরল ভাব মাটি হয়, এমন ত কথা নাই। এরূপ মনে হওয়া সহজ বটে। সেই জন্য আমরা কেবল গুটিকতক পংক্তি মাত্র উঠাইয়া দি, পাঠকেরা নিজেই বিচার করিয়া দেখুন, আমাদের কথা সত্য কি না। বিদ্যা, সুন্দর দর্শনে সখীকে বলিতেছে,

"তনু তনু চিন্তায় কেমনে জ্বালা সই।
জীবন জীবন মধ্যে ত্যজি মেনে সই॥"

জীবন অর্থে যে জল বুঝায়, সহসা কোন্ পাঠকের তাহা মনে আসে? এ স্থলে যে রামপ্রসাদ অনুপ্রাস দিবার জন্যই কথা আমদানি করিয়াছেন, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? আর ইহা ত শুধু একটি উদাহরণ মাত্র। সুন্দর দর্শনে বিদ্যার সখী প্রতি উক্তি সমস্তটাই এইরূপ। তাহা ছাড়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে অন্যত্রও উদাহরণের অভাব নাই।

সুন্দরকে দেখিয়া বিদ্যা যেমন অধীরা, সুন্দরও বিদ্যাকে দেখিয়া সেইরূপ মুগ্ধ। রামপ্রসাদের সুন্দর অনেকটা স্ত্রীপ্রকৃতির লোক। সুন্দর মালা গাঁথিতে, মালিনী মাসীর সহিত গল্প করিতে, আর বিদ্যার হস্তে কলের পুঁতুলের মত সারাক্ষণ নাচিতেই পারেন।

পুরুষোচিত দৃঢ়তা সুন্দরে নাই। স্ত্রীজাতির মত বেশবিন্যাস করিতেই সুন্দর পটু অধিক। বিদ্যাকে দেখিয়া অবধি সুন্দর তাঁহার পুনর্দর্শনের জন্য লালায়িত। সুবিধা করিয়া একদিন সুন্দর বিদ্যার গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখন আর সুন্দর রাজপুত্র নহেন—সুন্দর চোর। বিদ্যার সহিত সুন্দরের বিচার হইল। এবারে পরাজয় বিদ্যার। এ অবস্থায় পরাজয় স্বীকার না করিলে ত সব মাটি হইয়া যায়। সুন্দরের বদনকমল দেখিয়া অবধিই ত বিদ্যা হারিয়া আছে, আজ কেবল প্রতিজ্ঞারক্ষা। বিদ্যার পরাজয়ের পরেই উভয়ের বিবাহ হইয়া গেল। গান্ধর্ব্ব বিধি বলাই বাহুল্য। পঙ্গপাল সহচরী উপস্থিত ছিল—হুলুধ্বনি জমিয়াছিল ভাল। কিন্তু হুলুধ্বনির মত রামপ্রসাদের কবিত্ব জমে নাই। রামপ্রসাদের এইখানকার বর্ণনাগুলি অতি পার্থিব, নিতান্তই অনাধ্যাত্মিক, যাহাকে অশ্লীল বলে তাহাই, কেবল তৎকালীন সমাজের রুচির জন্যই টিঁকিয়া গিয়াছে। সে কালের রুচি সম্বন্ধে এখানে কিছু বলিবার আবশ্যক নাই, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রথম প্রবন্ধে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে।

রামপ্রসাদের এ সম্বন্ধীয় কবিতা নিতান্তই বস্তুগত, তাহাতে সংসারের কোন পদার্থই বাদ পড়ে নাই। সুন্দর বর্দ্ধমান প্রবেশ করিলে রামপ্রসাদ বর্দ্ধমানের প্রত্যেক দোকানের বর্ণনা করিয়া গেলেন, সেখানে কি কি পাওয়া যায় না যায়, সব লিখিয়া ফেলিলেন। বর্দ্ধমানে কয়জাতীয় সৈন্য আছে, কত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, দেবালয় আছে, এ সকল বিষয়ে রামপ্রসাদ যথাসম্ভব খোঁজ রাখিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা পড়িতে পড়িতে কবিকঙ্কণকে মনে পড়ে। উভয়েরই বর্ণনা এক ধরণের কি না। তবে কবিকঙ্কণের লেখায় রামপ্রসাদের অপেক্ষা প্রাণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। কবিকঙ্কণ শতগুণে স্বাভাবিক। রামপ্রসাদ সরোবর বর্ণনা করিয়াছেন—স্ফটিক-নির্ম্মিত ঘাট, নির্ম্মল জল, তীরে নানাজাতীয় বৃক্ষমধ্যে ভ্রমরগুঞ্জন, সারসনর্ত্তন, বাঙ্গলাদেশের যাবতীয় বিহঙ্গকূজন। কিন্তু ভাবের অভাবে তাঁহার সরোবর মন প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

যাহা হৌক্, এখন এ সকল কথা থাক্। রাণীর সহিত বিদ্যার ঝগড়া বাধিয়াছে, সে চীৎকারে অন্য কথা শুনা যায় না। বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলনের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, তাই মায়ে ঝিয়ে কথাকাটাকাটি। উভয় তরফই গলাবাজি-বিদ্যায় দক্ষা। কেহই পশ্চাৎপদ হইবার পাত্রী নহেন। গলাবাজিতে কিন্তু বিদ্যার বিদ্যা প্রকাশ পায় নাই। সে সময়ে স্বাভাবিক সম্মার্জ্জিত তারকণ্ঠ ভাষাই তাহার সম্বল। সখীদের উপরেও রাণীর বাক্যবাণ বর্ষণ ফাঁক গেল না, তাহারাও সুবিধামত দুই চারি কথা শুনাইয়া দিল। রাজা বীরসিংহের প্রাচীরবদ্ধ জেনানা—সখী, রাণী এবং বিদ্যার কণ্ঠধ্বনিতে উদ্বেল হইয়া উঠিল; ক্রমে মহারাজা বীরসিংহের আসন পর্য্যন্ত টলিল। কোটালের ডাক পড়িল,

কোটালিনী অন্তঃপুরে রাণীর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে বাহির হইল। প্রহরীর গুঁতায়, সিপাহীর অত্যাচারে সহরে লোক আর টিঁকে না বুঝি। রামপ্রসাদ কোটালকে সুবিধা-মত পাইয়া অনর্গল হিন্দী বুলি আওড়াইয়া দিলেন। একটা খুব হুলস্থুল পড়িয়া গেল। বর্দ্ধমান সরগরম।

কোটাল একবার বিছু ব্রাহ্মণীর কাছে গিয়া সকল কথা বলিল। বিছু আশ্বাস দিল অনেক, কিন্তু চোরের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিল না। তখন কোটাল মাধাই ভায়ার শরণাপন্ন হইল। মাধাই রাজকন্যার সমস্ত গৃহ সিন্দূর মাখাইয়া রাখিতে পরামর্শ দিল। কোটাল তাহাই করিল। সুন্দর বিদ্যার গৃহে আসিতে তাঁহার বসন ভূষণ সিন্দূররঞ্জিত হইয়া গেল। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া সুন্দর হীরার দ্বারা কাপড়গুলি রজকালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। নিকটেই কোটালের চর লুকাইয়াছিল, সে রজককে ধরিয়া ফেলিল। ক্রমে খোঁজ করিতে করিতে চোর বাহির হইয়া পড়িল—সুন্দর। চোর বাহির হইল বটে, কিন্তু কোটাল যে নাকাল হইয়াছিল, তাহা বলিবার নয়। সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া, বিদ্যার গৃহে গিয়া কিছুতেই চোরকে পাওয়া যায় না। অবশেষে খন্দকলজ্ঘনে দক্ষিণ পদ এড়াইয়া সুন্দর ধরা পড়ে। কোটাল সুন্দরকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। বিদ্যা কাঁদিয়া আকুল—সুন্দরের দশা কি হইবে। কোটালকে অনেক করিয়া বিদ্যা অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল, ফল হইল না। চোরকে দেখিয়া রাণীও বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন চেহারা কি কখনও চোরের হয়? নাগরিকেরাও চোরকে দেখিয়া কান্নাকাটি জুড়িয়া দিল। কিন্তু কোটাল ছাড়িবার পাত্র নহে। এত দিন সব বেশ নির্গোল ছিল, এই ব্যক্তি আসিয়াই ত চতুর্দ্দিক্ তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছে। ইহাকে ছাড়িয়া দিবে? সে আজ নহে—একেবারে শেষ দিনে।

কোটাল সুন্দরকে রাজসভায় হাজির করিল। চোর সেখানে ব্যঙ্গ পরিহাস আরম্ভ করিয়া দিল। রাজারও সুন্দরকে পীড়ন করিতে ইচ্ছা নাই, তিনি কেবল মুখে হুকুম দিলেন যে, সুন্দরকে মশানে লইয়া যাও। কালীর কৃপায় সুন্দর মশানে বাঁচিয়া গেলেন। তখন ভূপতি বিনয়পূর্ব্বক সুন্দরকে জামাতা বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। কিছু দিন শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া বিদ্যা সহ সুন্দর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। সুন্দর রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎকাল প্রজাপালন করিয়া পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিলেন। তাহার পর বিদ্যাসুন্দর স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের গল্পাংশ এই। গল্পটি মন্দ নহে, তেমন যদি চরিত্রবিকাশ হইত তাহা হইলে কাব্যখানি উচ্চদরের গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইত সন্দেহ নাই। রামপ্রসাদ সে দিকে বড় লক্ষ্যই করেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি প্রধানতঃ অনুপ্রাসের দিকে। গল্পের মধ্যেও মজা করিবার জন্যই তিনি ব্যস্ত। চারি দিকে সামঞ্জস্য করিয়া একটা কিছু করা তাঁহার

পোষায় নাই। সে সময়ের লোকের রুচির দিকে তাকাইয়া আর সেই সঙ্গে কতকটা পাণ্ডিত্য মিশাইয়া তিনি বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছেন। এ রচনার মধ্যে প্রতিভার দুর্দ্দমনীয় বিকাশ লক্ষিত হয় না। নিতান্তই যেন কোন্ প্রাচীনা দিদিমার গল্প চলিয়া আসিতেছে। এ রচনা রক্তমাংসের দেহ মাত্র, ইহার মধ্যে প্রাণ নিশ্বসিত হয় নাই।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর তেমন উচ্চ অঙ্গের কাব্য হয় নাই কেন, তাহার কতকগুলি কারণ আছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আদেশেই তিনি বিদ্যাসুন্দর লিখিতে বসেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রেমকাহিনীতে তাঁহার হৃদয় স্বতঃ উদ্দীপিত হয় নাই। সুতরাং ফরমাসে কাব্যের মধ্যে যেরূপ আশা করা যায়, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে তাহাপেক্ষা অধিক কবিত্ব থাকিবে কেন? তাহা ভিন্ন রামপ্রসাদের কথার দিকে যত দৃষ্টি, ভাবের দিকে তত নহে। ভাব স্বাভাবিক। তাহার ত আর ফরমাস চলে না। রামপ্রসাদের মধ্যে ভাব ছিল না, বাঁধা আইনানুসারে তিনি যথাসাধ্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে কাব্যাংশে বিদ্যাসুন্দর তেমন জমাইতে পারে নাই।

বিদ্যাসুন্দরের আধ্যাত্মিকতার দুইটি কারণ আছে—সুন্দরের দক্ষিণকালিকামূর্ত্তি সংস্থাপন এবং শবসাধন। এই দুইটি ঘটনা হইতে অনেকে বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কত দূর কি বলা যায় সন্দেহ। চিরজীবন প্রবৃত্তির পদসেবা করিয়া অনেক ধনিসন্তান শেষ দশায় দেবমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তাহাতে কি তাঁহাদের জীবনকে কেহ বিশেষরূপে আধ্যাত্মিক বলে? রামপ্রসাদের গ্রন্থে ধর্ম্মের জয়, অধর্ম্মের পতন, ইহাও কোথাও দেখান হইয়াছে বোধ হয় না। তাহার আগাগোড়াই ভোগবিলাসের উপাখ্যান—তাহাও যত দূর সম্ভব পার্থিব দেহবদ্ধ, কেবল দুএকটা মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা হইতে কিরূপে বলা যায় যে, বিদ্যাসুন্দরের অন্তঃপুরে গভীর ধর্ম্মতত্ত্বসকল নিহিত আছে, বিদ্যাসুন্দরের উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক? তাহা হইলে সংসারে সকলই আধ্যাত্মিক—আধ্যাত্মিকতার বিশেষ সার্থকতা থাকে না।

কষ্টকল্পনা করিয়া বিদ্যাসুন্দরের মধ্য হইতে আমাদের আধ্যাত্মিকতা বাহির করিবার আবশ্যক নাই। আমরা বিদ্যাসুন্দর পাঠে বঙ্গদেশের সে সময়ের সমাজের অবস্থা বুঝিতে পারি, তাহাই যথেষ্ট। সে সময়ের সাহিত্য হিসাবেই বিদ্যাসুন্দরের যাহা কিছু মূল্য। ইহার উপাখ্যান লইয়া বর্ত্তমান কালের কোন কবি সুন্দর কাব্য রচনা করিতে পারেন। সে সমাজে অশ্লীল রুচির জন্যই বিদ্যাসুন্দরে যাহা কিছু রুচিবিরুদ্ধ ভাব। নহিলে, তাহার মূল উপাখ্যানভাগ নিতান্তই বর্ত্তমানের রুচিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। ['ভারতী ও বালক,' পৌষ ১২৯৬]

সে

সে ত আর নাই—তবে এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন? সে যখন হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিল, তখন এক দিন এ দীর্ঘনিশ্বাস দেখা দিলে জীবনের বন্ধন হয় ত আরও দৃঢ় হইত—হৃদয়ের কত না তৃপ্তি হইত, অশ্রুরেখায় চুম্বন-সৌন্দর্য্যস্পর্শে হৃদয়ের স্নেহ-উপবন কুসুমিত হইয়া উঠিত। কিন্তু আজ সে নাই—তবু এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন? এ নিশ্বাসে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন অনুভব হয়, তাহার মালা গাঁথার সৌরভ-স্মৃতিতে হৃদয় আকুল হইয়া উঠে, চক্ষের সম্মুখে একে একে তাহার প্রণয়-যাতনার অস্ফুট ছবিগুলি ফুটিতে থাকে; এ যেন তাহারই হৃদয়ের ভাষা—তাহারই মর্ম্মের কাতর ক্রন্দনধ্বনি। তাহার জীবনে এক দিনের জন্যও সুখ হয় নাই—তাহার জীবন দুঃখের তীর্থক্ষেত্র। সুখ স্পর্শ করিলে সে হৃদয় বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়, সুখ সকলের কপালে সহে না। তাহাই বুঝি হইয়াছিল। শেষ দিনে তাহার অদৃষ্টে বিধাতা বুঝি কি সুখের স্পর্শ দিয়াছিলেন, সে তাহা সহিতে পারে নাই—হাসি অশ্রুর মিলনক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিয়া সুখী হইয়াছে। কিন্তু তবে তাহার পশ্চাতে এ নিশ্বাস-আকুলতা কেন? যবনিকা ফেলিলে ত একেবারেই ফেলিলে না কেন? এ চির-বিরহের মধ্যেও যে স্মৃতির মিলন ঘুচে না—বিরহ-যন্ত্রণার মধ্যেও যেন মিলনের অভিশাপ। সে যখন ম্লানমুখে ছলছল নেত্রে নদীতীরে বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত—ঐ সুনীল অনন্ত ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত তারকাপুঞ্জের ম্লান হাস্যময়ী শোভা দেখিতে দেখিতে আপনাকে কোথায় হারাইয়া ফেলিত, তখন কেন এ দীর্ঘনিশ্বাস দেখা দিল না? জন্মের মত একবার—শুধু একবার—কেন সে এ গভীর বেদনা-উচ্ছ্বাস অনুভব করিতে পারিল না? তাহা হইলে ঐখানে—ঐ পুণ্যলোকে বসিয়া আজ সে সেই ব্যাকুল স্মৃতির আকুলি ব্যাকুলি অনুভব করিতে পারিত। সেই দীর্ঘনিশ্বাসের মধ্যে এই দীর্ঘনিশ্বাস সুখস্বপ্নের মত ফুটিয়া উঠিত।

মৃত্যুযন্ত্রণায় সে একবার শুধু কাহার আলিঙ্গনপাশে মরিতে চাহিয়াছিল—সেই আলিঙ্গনে তাহার সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, সকলই;—অদৃষ্টের বশে সে বাসনা তৃপ্ত হয় নাই। মৃত্যুর করাল মূর্ত্তির শিরায় শিরায় সেই অতৃপ্ত বাসনা জাগিয়া আছে। প্রেতাত্মার মত মৃত্যুর গৃহে সে বাসনা চিরদিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। তাহার আর প্রলয় নাই, বিনাশ নাই, অবসান নাই। এই দীর্ঘনিশ্বাসে সেই মৃত্যুর ছায়া যেন শিহরিয়া উঠে, সেই অতৃপ্ত বাসনা অতীত দুঃস্বপ্নের মত আরও জড়াইয়া ধরে, হৃদয়ের কোন্ শ্যামল ক্ষেত্রের উপর দিয়া নিরাশার হায়-হায়ের মত অন্ধকার অমাবস্যা কাঁদিয়া যায়। পশ্চাতে কালরাত্রির রহস্যময়

পদচিহ্ন মাত্র পড়িয়া থাকে ; পদচিহ্ন ধরিয়া বিভীষিকা হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে। আহা! সেই আলিঙ্গনে সকল কষ্টের পর কি পবিত্র শান্তি জাগিয়াছিল, জীবন মরণ সন্ধ্যায় একবার সে স্বর্গসুখ তাহার কপালে ঘটিল না। হৃদয় মন্থন করিয়া যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠিল, দুই দিন পূর্ব্বে তাহা যদি উঠিত! কিন্তু তাহা উঠিবে কেন? তাহার অভাবেই না এ সমুদ্রমন্থন। তাহার আলিঙ্গন কাতরতার স্মৃতিই—হৃদয়ের সুগভীর বেদনা-উচ্ছ্বাস। সে আজ নাই—কিন্তু তাহার স্মৃতি যেন ঘনাইয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে সে গৃহে আবদ্ধ ছিল, এখন সে জগতে বিস্তৃত। আকাশে সে, চন্দ্রালোকে সে, কুসুম-সৌরভে সে ফুটিয়া উঠিতেছে। আগে ত সে এমন ছিল না—এখন যেন সর্ব্বত্রই সে। কিন্তু সে আজ নাই—সে কোথায় কে জানে!

ওগো, সে কোথায়, কাহারও জানিয়া কাজ নাই ; সে গিয়াছে, বাঁচিয়াছে, তাহাকে লইয়া আর আলোচনা কেন? পরলোকেও কি তাহার একটু সুখ শান্তি নাই? জীবনে সে সহস্র জ্বালায় জ্বলিয়াছে, এখন জ্বালা অবসান হৌক্। জীবনের মরুভূমির উপর তাহার স্মৃতি-পদচিহ্ন মুছিয়া যাক্—হাহাকার উঠিয়া পরলোকে তাহার মর্ম্মের কাছে ঘুরিয়া না বেড়ায়। হৃদয়ে তবে এ দীর্ঘনিশ্বাস শিহরিয়া উঠে কেন? তবে সে কি এই নিশ্বাস-উচ্ছ্বাস শুনিতে পায়? কে জানে কি, কিন্তু দুই দিন পূর্ব্বে যদি এই দীর্ঘনিশ্বাস উঠিত!—শুধু দুই দিন পূর্ব্বে!

তাহা হইলে কি হইত? কি হইত কেহ জানে না, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা বুঝি হইত না। জগৎ তাহা হইলে আর এক ভাবে চলিত বুঝি, এ জগৎ ছাড়া তাহাতে আর কিছু থাকিত। কে জানে গো, সে যেন আর একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার, কিন্তু সেখানে সকলই পুরাতন। শুধু যদি এই দীর্ঘনিশ্বাস আজ না উঠিয়া আর এক দিন উঠিত! আজ এ শেলবিদ্ধ হৃদয়ের শান্তিনিকেতনে এ বিরহোচ্ছ্বসিত নিশ্বাস কাঁদিয়া বেড়ায় কাহার জন্য? সে কি আর আছে! ওগো, তোমরা কাহার মুখের পানে চাহিয়া চলিয়াছ, তাহাকে কেহ দেখিয়াছ কি, বল ত। সে কি আর আছে?

সে আর নাই। যে যায়, সে কি আর থাকে? সে আর ফিরিবে না। যে লতাকুঞ্জে বসিয়া প্রতি দিন সে আনমনে মালা গাঁথিত, কিন্তু তাহার মালাগাঁথা কখনও শেষ হইল না, ঊষা আসিয়া সেখানে এখন চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া থাকে, শ্যামল নবীন কিসলয়গুলির মধ্যে কোন্ নিশ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ের ভাষা শুনিতে গিয়া যেন চমকিয়া উঠে! বকুল ফুল ঝরিয়া ঝরিয়া লতাকুঞ্জের সম্মুখে স্তূপাকার হইয়াছে, ঊষা সেই ঝরা-ফুলের উপর দিয়া নীরবে পা টিপিয়া টিপিয়া চলিয়া যায় ; ঊষার মস্তকে, কেশগুচ্ছে, বাহূপরি আরও বকুল ঝরিয়া পড়ে। সেখানে যে বসিত, সে আর এখন বসে না। সন্ধ্যা একবার আকুলহৃদয়ে লতাকুঞ্জে আসিয়া

বসে, ঝরা ফুলগুলি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখে ; কিন্তু সন্ধ্যা আর থাকিতে পারে না, তাহার প্রাণ বুঝি কেমন করিয়া উঠে, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। সারাদিন সারানিশি উন্মত্ত পবন শুধু সেখানে হাহাকার করিয়া বেড়ায় ; লতাকুঞ্জ শিহরিয়া উঠে, বকুল ঝরিতে থাকে, আর জনপ্রাণীর সেখানে সাড়া শব্দ নাই।

এক দিন গিয়াছে, তখন ঐ লতাকুঞ্জে বিরলে বসিয়া মধ্যাহ্নের পাখী হৃদয় ঢালিয়া দিত। সে উদাস সুরে সে কি গান গাহিত কেহ জানে না, কিন্তু সে যাহা গাহিত, মধ্যাহ্নের হৃদয় হইতে। তখন ঐ লতাকুঞ্জে প্রতি দিন সেই কে একজন আসিয়া বসিত, সেখানে ঊষা আসিত, সন্ধ্যা আসিত, কুঞ্জ যেন পূর্ণ ছিল। আজ সেই একজন বুঝি আর নাই, তাই এ শ্মশাননিস্তব্ধতা।

সুখের সংসারে আসিয়া অবধি তাহার কপালে সুখ আর মিলিল না! কিন্তু তাহার দুঃখ কিসের জন্য ? চিরদিন স্বামীর সাদর সম্ভাষণ সে ত পাইয়াছে ; স্বামীর মুখ হইতে কখনও একটি তিরস্কারবাক্য বাহির হয় নাই, সে কখনও একটি রূঢ় কথা শুনে নাই। তবে তাহার যন্ত্রণা কিসের ? কোন্ একটি সামান্য ঘটনায় মানবের হৃদয় চিরদিনের মত ছারখার হইয়া যায়—একটি কথা, একটি হাসি, এক ফোঁটা অশ্রু—তাহা কে বলিতে পারে ? সহস্র সুখের মধ্যে সেই এক মুহূর্ত্তের ঘটনা হয় ত জাগিয়া থাকে, তাহাতেই জীবন জ্বলিয়া সারা হয়। চিরদিন স্বামীর অত্যাচারের মধ্যে সে অনায়াসে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত, সে জন্য তাহার কোনও কষ্ট হইত না ; কিন্তু স্বামীর সুধাময় বাক্যে তাহার জীবন শেলবিদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি কথায় তাহার কোন শুভদিনের কথা মনে পড়িত—বিবাহের বাঁশীর কথা মনে পড়িত—সেদিনকার দীপৌজ্জ্বল্যে সে যেন বিভীষিকার ঈষৎ ম্লান ছায়া দেখিয়াছিল, তাহাই মনে পড়িত।

বিবাহ-রজনীর আনন্দকোলাহলে বিভীষিকার ছায়া কি ? সে দিন ত চারি দিকে আলোকমালা, মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, আনন্দের লহরী। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এক বিন্দু রক্তপাতে কত অমঙ্গলাশঙ্কা, এক ফোঁটা অশ্রুজলে কত হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। আত্মীয় স্বজনের আনন্দপূর্ণ হুলুধ্বনিতেও হৃদয় হয় ত শিহরিয়া উঠিতে পারে। কিসে কি হয়, বুঝা বড় সহজ নহে। সমস্ত দিন অনাহারে উপবাসে ক্ষুদ্র বালিকা স্বামীর প্রসন্ন মুখ দেখিবার আশা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু শুভদৃষ্টির জন্য দুই জনের মাথার উপর দিয়া যখন রক্তবর্ণ আচ্ছাদন টানিয়া দেওয়া হইল, তখন—বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—বালিকার সমস্ত আশা ভরসা যেন নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামীর অবনত মুখ একবার উঠিল না, বালিকার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল।

সেই দিন অবধি তাহার জীবনে আর সুখলাভ ঘটে নাই। প্রতি দিন সে স্বামীর সাদর সম্ভাষণ শুনিত, কিন্তু তাহার তাহাতে আশ মিটিত না। সে যেন দেখিত, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত অন্ধকারে কি গভীর হাহাকার কাঁদিয়া বেড়াইতেছে—কৃপাপাত্রীর পানে না চাহিলে অন্যায় হয়, তাই তিনি কথা বলিতেন মাত্র। সে দেখিত, সে যেন তাঁহার সহধর্ম্মিণী নহে, তাঁহার দয়াবৃত্তি পূরাইবার একটা যন্ত্রবিশেষ। সে চাহিত, স্বামীর সাদর সম্ভাষণ একটু কমিয়া আসে, তাঁহার হৃদয়ে সে যেন মিশাইয়া যাইতে পারে।

স্বামী কি তবে তাহাকে ভালবাসিতেন না? তবে আজ এ দীর্ঘনিশ্বাস কেন? তাঁহার বুকে এত দিন বুঝি এই দীর্ঘনিশ্বাস বিঁধিয়াছিল, তাই তাঁহার হৃদয় উঠিতে পারিত না। তিনি হাসিতেন—ম্লান, ক্ষীণ, অন্ধকারে বিজলী। তিনি কথা বলিতেন—তাহাতে হৃদয় নিশ্বসিত হইত না, সে কথা কোন দূরদেশ হইতে তাঁহার মুখে আসিয়া বসিয়া যাইত। আজ বহুদিন পরে সেই রুদ্ধ নিশ্বাস বুঝি বাহির হইতে পারিয়াছে। কিন্তু সে ত আজ নাই—এ দীর্ঘনিশ্বাসে যাহার হৃদয়ের সুখ শান্তি ছিল, সে ত আজ নাই।

এখন সে কোন্ মহারহস্যে মিশিয়াছে। অন্তিম শয্যায় বিবর্ণ বিম্বাধরে একটি ম্লান হাসি ফুটিয়াছিল। সে বিবাহের বাঁশী অনেক দিন থামিয়া গিয়াছে, সে বাসরঘরের আনন্দ-কোলাহল অনেক দিন নিভিয়াছে, পুরাতন সকল স্মৃতির পশ্চাতে আজ সেও চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরে বিজন শ্মশানক্ষেত্রে তাহার চিতাভস্মের উপর বসিয়া একজন সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধমুখে ধ্যান করিতেছেন। সন্ন্যাসীর বিশাল ললাটে রজনীর অন্ধকার ছায়া পড়িয়াছে, রুক্ষ কেশমধ্যে বাতাস নিরাশার গান গাহিতেছে, হৃদয়ে চিতাভস্ম। ধ্যানরত সন্ন্যাসীর ধ্যান ভঙ্গ করিয়া হৃদয়ের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উথলিয়া উঠিল। সেই শ্মশানক্ষেত্রে, ভাগীরথী-হিল্লোলে মলয় পবনে শুধু হাহাকার মাত্র অবশেষ রহিয়াছে। আর সকলই একে একে অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। ['ভারতী ও বালক,' মাঘ ১২৯৬]

ভারতচন্দ্র রায়

ভারতচন্দ্র রায় প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শেষ কবি। তাঁহার পরে যে বাঙ্গলা ভাষায় কেহ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই এমন নহে, কিন্তু পরবর্ত্তী প্রাচীন লেখকদিগের কাহারও কপালে সেরূপ খ্যাতিলাভ ঘটে নাই। খ্যাতিলাভের মূলে ক্ষমতা আবশ্যক। তাঁহাদের সকলের বোধ করি তেমন ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং ভারতচন্দ্রকে ছাড়াইয়া উঠা সম্ভব হয় কিরূপে? ভারত অশ্লীলই হৌন্ বা যাহাই হৌন্, তাঁহার রচনাচাতুর্য্য সম্বন্ধে বড় মতভেদ দৃষ্ট হয় না; এবং সম্ভবতঃ এই রচনাকৌশলেই তিনি বঙ্গসন্তানের নিকট অল্প দিন মধ্যে

বিশেষ পরিচিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্র রায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন—সে সময়ের বঙ্গদেশে তিনি রাজকবি। সমসাময়িকদিগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত থাকিতেন—স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক, দার্শনিক—কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত কবির সে সভায় একেবারেই অভাব। সে সময়ের সাহিত্যে এক নাম দেখিতে পাওয়া যায় রামপ্রসাদের, কিন্তু রামপ্রসাদও কাব্যে তেমন জমাইতে পারেন নাই, তাঁহার আশা ভরসা সঙ্গীতে। ভারতচন্দ্রের ছন্দের পারিপাট্য, পরিহাস-রসিকতা, গল্প সাজাইবার ক্ষমতা, এই সকলে সহজেই মন আকৃষ্ট হয়। এমন কি, সাজসজ্জার প্রভাবে সময় সময় দোষগুলিকে সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক্ করা দায় হইয়া উঠে। বাস্তবিক, কথার কারিগরিতে ভারতচন্দ্রকে আঁটিয়া উঠিতে পারে কয় জন ?

ভারতচন্দ্রের সময়ে কথার উপর অনেক কবিরই দৃষ্টি ছিল। তাঁহার সমসাময়িক রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর কাব্যে যেখান হইতে পারিয়াছেন, কথা সংগ্রহ করিয়া আনিতে ভুলেন নাই। কথার জন্য কত স্থলে অর্থবোধ দুঃসাধ্য, তথাপি কথা চাই। ভারতচন্দ্রেরও কথার প্রতি একটু বিশেষ টান দেখা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহার কথা সাজাইবার ক্ষমতা ছিল। তাঁহার মধ্যে যে ভাব প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা তিনি ভাষায় সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারেন। তবে ভাবের অপেক্ষা কথার ভাণ্ডার তাঁহার পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। প্রকৃতির অন্তরে ডুবিয়া তাহার আনন্দ উপভোগ করিবার কবি ভারতচন্দ্র নহেন। তিনি ঘরকন্নার বর্ণনা করিতে পারেন, তাকিয়া তামাকের রসাস্বাদন করিতে পারেন, প্রাণ অপেক্ষা দেহকেই বুঝেন ভাল। মুকুন্দরামকে দারিদ্র্যের কবি বলিলে ভারতচন্দ্রকে বড়মানুষীর কবি বলা যায়। মুকুন্দরাম কি রাজা সদাগর লইয়া কারবার করেন নাই ? তবে তাঁহাকে দারিদ্র্যের কবি বলা যায় কিরূপে ? তাঁহার সুর দেখিয়া। দারিদ্র্য বর্ণনা করিলে কিম্বা বিলাসের চিত্র আঁকিলেই যে কবি ধরা পড়েন তাহা নহে, সেই বর্ণনার মধ্যে অন্তর্লীন সুরেই কবির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতচন্দ্রের সুরে বিলাসের মন্দিরের ছায়া—তিনি যাহাই বর্ণনা করুন না কেন, তাঁহার প্রাণ ধরা পড়িবে।

ভারতচন্দ্রের প্রধান গ্রন্থ অন্নদামঙ্গল। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র কাব্য নহে—অন্নদামঙ্গলের মধ্যে একটি দীর্ঘ উপাখ্যান মাত্র। অন্নদামঙ্গলে হরগৌরীর কথা আছে, ভবানন্দ, মানসিংহ, প্রতাপাদিত্য, জাহাঙ্গীর, অনেকেই আছেন, আর গ্রন্থারম্ভে কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনে রাজবাটীর টিক্‌টিকিটি অবধি বাদ পড়ে নাই। আর শ্লেষ, অনুপ্রাস, রসিকতা ভারতচন্দ্রের হাড়ে হাড়ে—অন্নদামঙ্গলে তাহা যথেষ্ট। প্রাচীন রীতি অনুসারে ভারতচন্দ্র গণেশ, শিব, বিষ্ণু, কৌষিকী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেব দেবীগণকে বন্দনা করিয়া কাব্য আরম্ভ করিয়াছেন। তাহার পর গ্রন্থসূচনায় কৃষ্ণচন্দ্রের কথা পাড়িয়া তাঁহার সভা

বর্ণনা করিতে বসিয়াছেন। সভা বর্ণনার আরম্ভেই শ্লেষ প্রয়োগ। তাহাতে ভারতচন্দ্রের কথার চাতুরী বেশ বুঝা যায়। আকাশের চন্দ্রের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের তুলনা করিয়া তিনি উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখাইয়াছেন। এই তুলনার মধ্যে ভারতের রসিকতা-প্রয়াসও লক্ষিত হয়। রাজসভায় হাস্যরসাবতারণার জন্য তিনি যতটুকু পারিয়াছেন, রঙ্গরস করিয়া লইতে ছাড়েন নাই। ভারতের প্রকৃতিই রঙ্গরস। আমরা সভাবর্ণন হইতে শ্লেষাংশটুকু উঠাইয়া দি, পাঠকেরা তাহার মধ্যে ভারতের কারিগরি দেখিয়া লউন।

"চন্দ্রে সবে ষোল কলা হ্রাস বৃদ্ধি তায়।
কৃষ্ণচন্দ্র পরিপূর্ণ চৌষট্টি কলায়॥
পদ্মিনী মুদয়ে আঁখি চন্দ্রেরে দেখিলে।
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে পদ্মিনী আঁখি মিলে॥
চন্দ্রের হৃদয়ে কালী কলঙ্ক কেবল।
কৃষ্ণচন্দ্রহৃদে কালী সর্ব্বদা উজ্জ্বল॥
দুই পক্ষ চন্দ্রের অসিত সিত হয়।
কৃষ্ণচন্দ্রে দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়॥"

শ্লোকগুলির শ্লেষ কোথায় ব্যাখ্যা করিতে হইবে না, কেবল পাঠকগণের সুবিধার জন্য এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দুই গৃহিণী। তাই তাঁহার দুই পক্ষ সদা জ্যোৎস্নাময়।

সভাবর্ণনের শেষে ভারতচন্দ্র নিজের স্বপ্নবিবরণ কহিয়াছেন—অন্নপূর্ণা মাতৃবেশে ভারতকে অন্নদামঙ্গল রচনা করিতে আদেশ দিলেন। সত্যই যে ভারত এরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। সে কালে গ্রন্থারম্ভে স্বপ্নবিবরণ একটা ফেসান ছিল। দেবানুগ্রহ-প্রসূত শুনিলে সাধারণ লোকে সে গ্রন্থকে সহজেই সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিত, সেই জন্যই বোধ করি কবিরা স্বপ্ন আবশ্যক ঠাহরাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে স্বপ্নাদেশ ফেসান হইয়া দাঁড়ায়। ভারতচন্দ্র তাই নিজে স্বপ্ন দেখিয়াছেন, এবং রায়গুণাকর উপাধির জন্য কৃষ্ণচন্দ্রকেও স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। এত স্বপ্নকাণ্ডের পরে গুণাকরের গীতারম্ভ।

দক্ষ মুনি শিবের শ্বশুর খুব ঘটা করিয়া এক যজ্ঞ করিয়াছেন—নরলোকে দেবলোকে নিমন্ত্রণ করিতে আর কাহাকেও বাকি রাখেন নাই। কিন্তু এই মহাযজ্ঞে স্বীয় জামাতাকে তিনি আহ্বান করিলেন না। জামাতা সুতরাং অনিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে যাইতে পারেন না। এদিকে দক্ষকন্যা সতী পিত্রালয়ে যাইবার জন্য স্বামীকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছেন। মহাদেব সতীকে সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, বিনা নিমন্ত্রণে গিয়া অপমানিত হইবার প্রয়োজন নাই। স্ত্রীবুদ্ধি কিছুতেই বুঝে না। সতী বলেন, কন্যা পিত্রালয়ে যাইবে, তাহার

আবার নিমন্ত্রণ কি ? মহাদেব তথাপি অনুমতি দিলেন না। তখন সতী নানা মূর্ত্তি ধরিয়া মায়াপ্রভাবে মহাদেবকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক কষ্টে মহাদেবের অনুমতি বাহির হইল। সতী পিত্রালয়ে গমন করিলেন। সেখানে দক্ষ শিবনিন্দা করিতেছেন। পতিনিন্দা সহিতে না পারিয়া সতী পিতাকে অভিশাপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ভারতচন্দ্র রায় দক্ষমুখে শিবনিন্দাছলে শিবের স্তুতি করিয়া লইলেন।

সতীর তনুত্যাগে নন্দী মহা ক্রুদ্ধ হইল। কালবিলম্ব না করিয়া কৈলাসে গিয়া কৃত্তিবাসের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিল। মহাদেব—ভূত প্রেত দলবল সহ দক্ষালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দক্ষালয়ে ভয়ানক গোলমাল পড়িয়া গেল—কেবলই ভূতের নৃত্য, পিশাচের কোলাহল, ডাকিনী যোগিনী শাখিনী পেত্নিনীর ভীষণ হুহুঙ্কার, আর "সতী দে সতী দে সতী দে।" ভারতচন্দ্র এই এক লাইনে সে সময়ে মহাদেবের মনের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। সমস্ত ভূত প্রেত পিশাচের কণ্ঠ হইতে কেবল এক "সতী দে সতী দে" ধ্বনি—আর কেহ কিছু চাহে না, আর কেহ কিছু বুঝে না, কেহ কিছু শুনিতে চাহেও না, কেবলই দে সতী, দে সতী। দক্ষের মুখে কথা সরে না, দেবতা ব্রাহ্মণেরা সকলেই অবাক্, কোথায় পুণ্য গম্ভীর যজ্ঞভূমি আর কোথায় পৈশাচিক শ্মশানদৃশ্য! শিবের অনুচরেরা দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া ক্ষান্ত হইল। প্রস্তুতিস্তবে প্রসন্ন হইয়া শিব দক্ষকে বাঁচাইয়া দিলেন, কিন্তু নরমুণ্ডের পরিবর্ত্তে দক্ষের স্কন্ধে ছাগমুণ্ড বসিল। শিব তখন সতীদেহ-স্কন্ধে দেশে দেশে তাঁহার গুণগান করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। চক্রধর বিপদ্ বুঝিয়া চক্রধারে সতীদেহ খান খান কাটিয়া দিলেন। যেখানে যেখানে সে অঙ্গ পড়িল, সেই সেই স্থানেই এক একটি মহাপীঠ।

অনেক পাঠক হয় ত এই সকল অমানুষিক ঘটনা দেখিয়া ভারতচন্দ্রকে কবি-জগৎ হইতে দূর করিয়া দিতে চাহিবেন, কিন্তু এ সকল পৌরাণিক ব্যাপারের জন্য ভারতচন্দ্র দোষী নহেন। [প্রাচীন বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়া ভারতচন্দ্র যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার কবিত্ব কিরূপ খুলিয়াছে, তাহাই আমাদের দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান কালের কবিদিগের মত ভাবের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ভারতের ছিল না। বড় বড় আদর্শ সৃষ্টি করিতেও তিনি অক্ষম। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাঁহার কোন গুণই ছিল না? তাঁহার কাব্যে তিনি সাময়িক সমাজের যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা হইতে সে সময়ের সামাজিক অবস্থা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভারতচন্দ্র সেই সমাজেরই কবি—সাধারণের ভাবের অধিক উর্দ্ধে তিনি উঠেন নাই, তাই সাধারণের নিকট বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন। সে সমাজের উর্দ্ধে উঠিলে সমাদরের জন্য হয় ত কতক দিন অপেক্ষা করিতে হইত। ভারত মুকুন্দরামের মত যাহা দেখিয়াছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কালিদাসের

মত দুই চরণে সমগ্র ভাব ব্যক্ত করা তাঁহার সাধ্যাতীত। কিন্তু এইখানে বলিয়া রাখি, মুকুন্দরামকে যেমন বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়, ভারতকে তেমন হয় না। মুকুন্দরামে মধ্যে মধ্যে কুঁকুড়া জবাই শুনা যায়, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে মুসলমানী পরিচ্ছদে দেখা যায় না। ভারত যেন কতকটা সে কালের বড়লোকের মত—তাঁহার উপরে মুসলমানত্বের ক্ষীণ প্রভাব অনুভব হয়।

এখন একবার শিবের অবস্থা কিরূপ দেখিতে হইবে। শিবের আবার বিবাহ। নারদ ঘটক জুটিয়াছেন, কন্যার অভাব কি? কন্যা নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা। মহামায়া শিবের জন্য হিমালয়ের আলয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নারদ দুই জনকে মিলাইয়া দিবেন। বীণা কাঁধে ফেলিয়া নারদ একদিন হিমালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে উমা সহচরীদিগের সহিত খেলা করিতেছেন—হরগৌরীর বিবাহ। সারি সারি মাটির পুতুল দাঁড়াইয়াছে—খেলার খুব ধুম। নারদ ত এই সকল ব্যাপার দেখিয়া উমাকে এক প্রণাম ঠুকিয়া বসিলেন। উমা বলিলেন, ব্রাহ্মণ হইয়া প্রণাম কেমন ধারা! নারদ গৌরীকে একটু ঠাট্টা করিয়া বুড়া বর জুটাইবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। গৌরী বিবাহের কথায় ছলে লজ্জা পাইয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া পলাইলেন, এবং নারদের নামে নালিস রুজু করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। মেনকা তাড়াতাড়ি আসিয়া মুনির পাদবন্দনা করিয়া বসাইলেন। হিমালয়ও হাজির। বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

ভারতের এইখানকার বর্ণনাগুলি বেশ স্বাভাবিক। হরগৌরীকে অলৌকিক ঘটনাসমূহ দ্বারা ঘিরিয়া রাখিলেও ভারতচন্দ্র তাঁহাদিগকে মানবধর্ম্মের অতীত মনে করেন না। বঙ্গসন্তানের নিকট সে জন্য অন্নদামঙ্গল বোধ করি কতকটা সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র মজা করিতে গিয়া শিবকে নিতান্তই অশিব করিয়া তুলিয়াছেন। শিব ধ্যানে মগ্ন। দেবতারা তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করিবার জন্য ব্যস্ত। যথারীতি অনুষ্ঠানাদির পর শিবের ধ্যান ভঙ্গ হইল। ভারত তখন তাঁহার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা দেখিলে দুঃখ হয়। প্রাচীন কালে দেবদেবীদিগকে পাশব ধর্ম্মে রত করিয়া মাটি করা ফেসান না হইলেও বিরল নহে। ভারত আঁকিয়াছেন, শিব অপ্সরী কিন্নরীবর্গের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান। এমন সময়ে নারদ আসিয়া উপস্থিত, শিবের একটু লজ্জা বোধ হইল। ক্রমে নারদ বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেন। শিবের আর বিলম্ব সহে না—বিবাহের জন্য তিনি ক্ষেপিয়া উঠিলেন। সাজসজ্জা হইল। বলদে চড়িয়া বিয়ে-পাগলা শিব চলিলেন। হুলু-লু-লু-লু!

শিবের রকম দেখিয়া স্ত্রীগণ সকলেই অবাক্। এমনতর বাঘছালপরা ক্ষেপা বর ত কেহ কখনও দেখে নাই। নারদ ইহাকে কোথায় পাইলেন? সুন্দরবন হইতে ধরিয়া

আনেন নাই ত ? এমন কথাও মুখে আনে—রাম বল। স্ত্রীজাতির রসনা নারদের বিপক্ষে ধীরে ধীরে অনেক প্রকার গুজব তুলিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে তারকণ্ঠ সরস বাক্যাবলী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিতেও ত্রুটি করিল না। নারদের বহু পুণ্যফল, তাই গালিগালাজের উপর দিয়াই গিয়াছে। নহিলে সম্মার্জ্জনী যদি গাঝাড়া দিতেন, নারদের অবস্থা কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত নিশ্চিত বলা যায় না।

মহিলাদিগের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শিবনিন্দা এবং কোন্দল আরম্ভ হইল। ভারতচন্দ্র নারদের মুখে কোন্দলের মন্ত্র আওড়াইয়া দিয়াছেন। মন্ত্রটি মন্দ হয় নাই। কোন্দলে চেতনধর্ম্ম আরোপ করিয়া ভারতচন্দ্র বেশ একটু কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকদের দেখিবার জন্য আমরা তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আয় রে কোন্দল তোরে ডাকে সদাশিব।
মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোরে রক্ত দিব॥
বেনা-ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া।
এয়ো সুয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে।
সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাট্ এস চলে॥
এক ঠাঁই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়।
দোহাই চণ্ডীর তোরে আয় আয় আয়॥"

শিবনিন্দা শুনিতে উমার বড় ভাল লাগিল না। শুধু কোন্দল ঝগড়া হইলে তত হানি ছিল না। উমা বিপদ্ বুঝিয়া মেনকাকে দিব্যজ্ঞান দিলেন। বর দেখিয়া তখন মেনকার বড়ই আহ্লাদ। শিবের বিবাহ সম্পন্ন হইল। সিদ্ধিঘোটনের মহা ঘটা পড়িয়া গেল। ভারতচন্দ্র রায় কবিকঙ্কণের মত যাবতীয় মসলার নাম করিয়া গিয়াছেন। মহাদেব সিদ্ধি পান করিয়া বিহ্বল। তাঁহার আঁখি ঢুলু ঢুলু, কথা কেমন জড়াইয়া যায়, নেশা করিলে সাধারণ লোকের যেরূপ অবস্থা হয়, শিবেরও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাহার পর গৌরীর সহিত মহাদেবের কথোপকথন। কথাবার্ত্তাগুলি পড়িতে নিতান্ত মন্দ নয়—তাহাতে সোহাগ আছে, কথা কথাকাটিও আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে শিবের একেবারে চরিত্রহীনতা প্রকাশ পায়। ভারতচন্দ্র রঙ্গরসের অভিপ্রায়ে শিবের সহিত কুচ্‌নীর নামের সংযোগ করিয়া শিবকে তৃণ অপেক্ষা লঘু প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাস্তবিক, ভারতচন্দ্র যে পরিমাণে রঙ্গরসপ্রিয়, তেমন কবি নহেন। তাঁহার কাব্যে যেখানে যেখানে কবিত্ব ফুটিয়াছে, সেখানে প্রায়ই মূলে রঙ্গরসপ্রয়াস। এক শরীরে হরগৌরী রূপ আঁকিতে গিয়া তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িল,

"আধ মুখে ভাঙ্গ ধুতুরাভক্ষণ আধই তাম্বূল পূরি রে।
ভাঙ্গে ঢুলুঢুলু এক লোচন কজ্জলে উজ্জ্বল এক নয়ন।"

রঙ্গরসের সুবিধা পাইলে ভারতের গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য বড় মনে থাকে না। স্বাভাবিক মুখশ্রী, স্বভাব-গাম্ভীর্য্য, এ সকল অপেক্ষা কজ্জল, ভাঙ্গ ধুতুরার দিকে তাঁহার সহজে নজর পড়ে।

ভারতচন্দ্র হরগৌরীর আরও অনেক কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কোন্দল ঝগড়া, ভিক্ষা, উপদেশ, কিছুই ফাঁক যায় নাই। তাঁহার গৌরীটি আনুনাসিক স্বরে চীৎকার করিতে মন্দ পারেন না। কিন্তু এখন সে কথা থাক্। অন্নদামঙ্গলে ভবানন্দ মজুমদারই প্রধান চরিত্র। আমরা ধীরে ধীরে ভবানন্দের বিবরণের দিকে অগ্রসর হই। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে—শিব-ব্যাসে কথোপকথন, অন্নদার জরতীবেশে ছলনা, বসুন্ধরের জন্ম, হরি হোড়ে বরদান, নলকূবরে অভিশাপ ইত্যাদি ইত্যাদি। সে সকলের বিস্তারিত উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিলেই চলিবে যে, নলকূবরই বাঙ্গালীর গৃহে ভবানন্দরূপে অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহার দুই পত্নী—চন্দ্রমুখী এবং পদ্মমুখী। ভবানন্দ তাঁহাদের জন্য দুই দাসী সংগ্রহ করিয়াছেন—সাধী আর মাধী। দাসী না হইলে বঙ্গগৃহ অন্ধকার—সকল শ্রীর মূলে বাঙ্গলার দাসী। স্বয়ং অন্নদাও ভবানন্দের গৃহে আশ্রয় লইলেন। আর ভয় কারে? মজুন্দারের গৃহে লক্ষ্মী অচলা।

এদিকে প্রতাপাদিত্যকে শাসন করিতে মানসিংহ আসিয়াছেন। ভবানন্দের উপর কানগোইভার হইয়াছে। বাঙ্গলার যাহা কিছু সমাচার জানিতে হয়, মানসিংহ ভবানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন। ভবানন্দ কথায় কথায় তাঁহাকে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী বলেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অন্নদামঙ্গলেরই অংশ—ভবানন্দের মুখে বর্ণিত। আমরা আপাততঃ মূল উপাখ্যান শেষ করি। বিদ্যাসুন্দর স্বতন্ত্র আলোচনা করাই সুবিধা। মূল গল্পের সহিত ত ইহার বিশেষ যোগ নাই। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসুন্দর একটি স্বতন্ত্র কাব্য। ভারতচন্দ্র কৌশলক্রমে তাহাকে অন্নদামঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়াছেন মাত্র।

মানসিংহ রায় বৰ্দ্ধমান হইতে যশোহরে চলিলেন—যশোহরই প্রতাপাদিত্যের রাজধানী কি না। পথে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি। বিপুল সেনা লইয়া মানসিংহ ত অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি ভবানন্দকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বিপদে উপায় কি? ভবানন্দ অন্নপূর্ণা-পূজার কথা বলিলেন। পূজা হইল। ঝড় বৃষ্টি থামিল। ভারতচন্দ্র রায়ের কিন্তু এ ঝড় বৃষ্টিতে বড় সুবিধা হইয়াছে। তিনি ঝড় জলের মধ্যে ঘেসেড়ানীর ক্রন্দন উপভোগ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেছেন। রঙ্গরসের অবসর ভারত কি ছাড়িতে পারেন? তিনি আরম্ভ করিলেন,

"ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায় রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥" ইত্যাদি।

যশোহরে গিয়া মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে বহু কষ্টে হারাইয়া দিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া দিল্লীতে লইয়া চলিলেন। পথে অনাহারে মৃত্যু হওয়ায় নিষ্ঠুর মানসিংহ বাঙ্গলার আদিত্যকে ভাজিয়া লইলেন। রাজসভায় প্রতাপাদিত্যের সেই ভর্জ্জিত দেহ প্রদর্শিত হইল। জাহাঙ্গীর বিশেষ আহ্লাদিত। ভবানন্দকে মানসিংহ পাতসাহের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। জাহাঙ্গীর স্ফূর্ত্তির মুখে ভবানন্দের সম্মুখে হিন্দুজাতির ধর্ম্ম কর্ম্ম, আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া অনেক কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। ভবানন্দের অসহ্য হইল। তিনি জাহাঙ্গীরের কথায় প্রতিবাদ করিয়া স্বধর্ম্মের তরফে অনেক কথা বলিলেন, তাহাতে মুসলমানের উপর অল্পবিস্তর আক্রমণও আছে। এইখানেই ভবানন্দের সাহসের পরিচয়। দিল্লীর দরবারে দাঁড়াইয়া সম্রাটের মুখের উপর কথা বলিতে পারে কয় জন? জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হইয়া ভবানন্দকে বন্দী করিতে আদেশ দিলেন। দিল্লীতে ভূতের উপদ্রব আরম্ভ হইল। অবশেষে জাহাঙ্গীর বিনয়পূর্ব্বক ভবানন্দকে ঠাণ্ডা করিলেন। দিল্লীতে অন্নপূর্ণার পূজা হইল। ভূতের অত্যাচার থামিয়া গেল। ভবানন্দ বিশেষ সম্মানিত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া ভবানন্দের মহা ভাবনা, দুই রাণীর কাহার নিকট প্রথম যাইবেন। সাধী মাধী আপন আপন কর্ত্রীকে ভজাইতেছে, প্রথমে যেন ভবানন্দকে নিজ ঘরে লইয়া আসা হয়। এজন্য তাহাদের উপদেশের অন্ত নাই। সাধী বড় রাণীকে বুঝাইলে যে, তুমি পুত্রবতী গুণবতী বটে, কিন্তু তোমার সপত্নী এখন যুবতী, সুতরাং রূপবতী, তাহারই গৃহে রাজধানী হইবে। উদাহরণ সমেত সাধী বলিল,

"রূপবতী লক্ষ্মী গুণবতী বাণী গো।
রূপেতে লক্ষ্মীর বশ চক্রপাণি গো॥
আগে যদি ঠাকুরেরে ডেকে আনি গো।
ছোট পাছে পথে করে টানাটানি গো॥
টেনেটুনে বাঁধ ছাঁদ খোঁপাখানি গো।
শাড়ী পর চিকণ শ্রীরামখানি গো॥
দেহুড়ির কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আন ধরে করে টানাটানি গো॥"

মাধীও ছোটরাণীকে বড়রাণীর নিন্দা করিয়া অনেক বুঝাইল। সে বলিল,

"দরবারে জয় লয়ে, প্রভু আইলা রাজা হয়ে
আগে যদি তার ঘরে যান।
মহারাণী হবে সেই মোর মনে লয় এই
তুমি হবে দাসীর সমান॥
একে তার তিন বেটা তাহারে আঁটিবে কেটা
আরো যদি রাণী হয় সেই।
রাজপাট সব লবে তোমার কি দশা হবে
আমার ভাবনা বড় এই॥
দুয়ারে দাঁড়ায়ে থাক আঁখিঠার দিয়া ডাক
আমি গিয়া ঠাকুরেরে ডাকি।
আগে তাঁরে ঘরে আনি তোমারে ত করি রাণী
তবে সে সতিনী পায় ফাঁকি॥"

ভবানন্দ অন্তঃপুরে আসিলে সপত্নীদিগের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল। ভবানন্দ কথার চাতুরীতে উভয় পক্ষের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া প্রথমে চন্দ্রমুখীর এবং পরে পদ্মমুখীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পর কিছু দিন রাজ্যভোগ করিয়া, পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া, ভবানন্দ চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী সমভিব্যাহারে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। স্বর্গেও সপত্নীদ্বয় তাঁহাকে ছাড়িতে চাহে না। এইখানেই অন্নদামঙ্গল সমাপ্ত।

অন্নদামঙ্গলের শেষ ভাগ দেখিলে মনে হয়, যেন ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অনুকরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের যে মৌলিকতা নাই, এমন কথা আমরা বলি না, কিন্তু তাঁহার চরিত্রচিত্রণে, রন্ধনাদি-বর্ণনে সহজেই কবিকঙ্কণকে মনে পড়ে। কবিকঙ্কণের শ্রীমন্তোপাখ্যান যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, অন্নদামঙ্গলে অল্পবিস্তর অনুচিকীর্ষা উপলব্ধি করা যায় কি না। কবিকঙ্কণের মধ্যে ভারত অপেক্ষা গাম্ভীর্য্য আছে। মুকুন্দরাম উন্নত চরিত্রচিত্রণে ভারত অপেক্ষা সমধিক দক্ষ। কিন্তু ভারত রঙ্গরসের প্রভাবে বঙ্গসন্তানকে সহজেই আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার অনেকগুলি শ্লোক বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রবাদবাক্যের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ভারতচন্দ্র নিজের ভাব বেশ প্রকাশ করিতে পারেন।

অন্নদামঙ্গল শেষ হইল বটে, কিন্তু তাহার মধ্যস্থ বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সম্বন্ধে এখনও কিছু বলা হয় নাই। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রামপ্রসাদ সেনের অপেক্ষা সরস। তাঁহার ভাষা সহজ, ভাব স্পষ্ট, গল্পেরও কারিগরি আছে। তবে গল্পটি আসলে উভয়েরই

এক। বীরসিংহ নরপতির কন্যা বিদুষী বিদ্যা পণ করিয়াছেন যে, বিচারে তাঁহাকে হারাইতে না পারিলে কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সুন্দর কাঞ্চীদেশের রাজপুত্র। বিদ্যার কথা শুনিয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন। হীরা মালিনীর কৌশলে বিদ্যার সহিত সুন্দরের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। তাহার পর উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মায়। সুন্দর সুড়ঙ্গপথ দিয়া গৃহে যান আসেন। ক্রমে ক্রমে সে কথা প্রচার হইল। সুন্দর কোটালের নিকট ধরা পড়েন। অবশেষে বিদ্যাসুন্দরের বিবাহ হয়।

এই গল্প অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাহাতে প্রধান ঘটনা, যাহা উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র স্বীয় গল্পরচনাক্ষমতায় ইহার উপর অনেক সাজসজ্জা দিয়াছেন। আর দেশ বিদেশের বর্ণনা, নারীগণের খেদ, পতিনিন্দা, এ সকল ত আছেই। নহিলে কাব্যের আদর হইবে কেন? ভাটের মুখে বিদ্যার সমাচার শুনিয়া অবধি সুন্দর অধীর। বিদ্যাকে না পাইলে তাঁহার আর কিছুতেই মন স্থির হয় না। এক দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তিনি বর্দ্ধমান উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। সঙ্গে কেহই নাই—কেবল একটি শুকপক্ষী। সপ্তাহ পরে সুন্দর বর্দ্ধমানে পঁহুছিলেন। ভারতচন্দ্র রায় প্রাচীন প্রথানুসারে বর্দ্ধমানের দীর্ঘ বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে পঁহুছিয়া এক বকুলতলে সুন্দর একেলা বসিয়া রহিলেন। বকুলবৃক্ষের নিকটেই সরোবর। বর্দ্ধমানের নাগরীরা কলসীকক্ষে স্নান করিতে আসিতেছেন। কিন্তু সুন্দরকে দেখিয়া নারীসমাজে মহা হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। নিজ গৃহপানে কাহারও বড় পা চলে না। স্নান সারিয়া রামাগণ গৃহে চলিলেন—আঁখি থাকিয়া থাকিয়া ফিরিয়া দেখে। ভারতচন্দ্র যেরূপভাবে এখানে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে কাহারও বোধ করি বিশেষ ভাল অবস্থা মনে আসে না। স্ত্রীজাতিকে তিনি একেবারে রূপেব ক্রীতদাসী করিয়া আঁকিয়াছেন—রূপের নিকটে পাতিব্রত্য নাই, শান্তভাব নাই, রূপ দেখিলেই তাহারা অধীর। সুন্দরকে দেখিয়া বর্দ্ধমানের স্ত্রীবর্গ অকাতরে স্বামী আত্মীয় পরিজনদিগের নিন্দা করিয়া চলিয়াছে। তাহাদের চরিত্রে উন্নত ভাব আদবেই নাই।

হীরা মালিনীর সহিত বকুলতলাতেই সুন্দরের আলাপ পরিচয় হয়। মালিনী সুন্দরকে আপন আলয়ে আশ্রয় দেয়। সুন্দর মালিনী মাসীকে বলিলেন, দাস দাসী ত কেহ নাই, কে তাঁহার হাট বাজার করিবে? মালিনী নিজ অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়া সুন্দরকে আশ্বস্ত করিল। মালিনীর এইখানকার কথাবার্ত্তাতেই তাহার চরিত্র অভিব্যক্ত। মালিনী যে উন্নতচরিত্রের লোক নহে, তাহা বলাই বাহুল্য। বাজার করিয়া আনিয়া মালিনী তাহার এক দীর্ঘ হিসাব দেয়। সে হিসাব না দিলেও চলে—তাহা নিতান্তই অনুগ্রহ। সুন্দর হিসাবের জন্য বড় ব্যস্ত নহেন—তাঁহার কার্য্য উদ্ধার হইলেই হয়। তিনি বিদ্যার

জন্য মালিনীর হস্তে মালা গাঁথিয়া দেন। তাহাতে শ্লোক লেখা। বিদ্যা মালা দেখিয়া অধীর। মালিনীকে অনেক বিনয় করিয়া সুন্দর দর্শনের কথা বলিল। মালিনী কৌশল করিয়া একদিন পরস্পরকে দেখাইয়া দিল। ফল হইল,

"দুঁহার নয়ন ফাঁদে ঠেকিয়া দুজনে।
দুজনে পড়িল বান্ধা দুজনের মনে॥"

ইতিমধ্যে ভারতচন্দ্র একবার বিদ্যার রূপবর্ণনা করিয়া লইয়াছেন। তাহাতে তরঙ্গে তরঙ্গে অনুপ্রাস। কিন্তু অনুপ্রাস হইলেও এ বর্ণনা রামপ্রসাদের মত নির্জীব নহে। ভারত আগাগোড়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সমষ্টিভাবে বর্ণনা করা সে কালের কবিদিগের অজ্ঞাত। ভারতচন্দ্র বিদ্যার বেণীর শোভা হইতে আরম্ভ করিয়া পদনখ পর্য্যন্ত বাদ দেন নাই। আর এই বর্ণনার জন্য যেখান হইতে পারিয়াছেন, উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। বোধ করি, ভবিষ্যৎ কবিদিগের কি দশা হইবে, ভাবিলে ভারতচন্দ্র কিছু রাখিয়া দিতেন।

এখন বিদ্যার সহিত সুন্দরের মিলন হয় কিরূপে? রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে ত আর যে-সে ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। বিদ্যার ইচ্ছা যে, চুপিচাপি বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। মালিনী বিদ্যাকে বুঝাইল যে, গোপনে বিবাহ ন্যায়সঙ্গত নহে, পরে বিপদ্ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু মালিনীর কথা শুনে কে? কালীর অনুগ্রহে সুন্দরের বাসস্থান হইতে বিদ্যার গৃহ অবধি সুড়ঙ্গ প্রস্তুত হইল। এই সুড়ঙ্গপথ দিয়া সুন্দর গোপনে বিদ্যার গৃহে যাতায়াত করেন। সুন্দর আবার সন্ন্যাসিবেশে রাজসভায় গিয়া বিদ্যা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহেন। যাহা হৌক্, গুপ্তপ্রণয় অল্প দিন মধ্যেই প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাণী বিদ্যাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিলেন। তবুও কি বিদ্যা স্বীকার করে? কিন্তু রামপ্রসাদের বিদ্যার মত ভারতের বিদ্যার গলার জোর নাই। সে বিদ্যাপেক্ষা এ বিদ্যার প্রকৃতি কোমল। বীরসিংহ রায় কোটালকে চোর ধরিতে আদেশ দিলেন। স্ত্রীবেশে কোটাল সুন্দরকে বঞ্চনা করিল। সুন্দর ধরা পড়িলেন। নারীগণের পতিনিন্দা আরম্ভ হইল। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কল্যাণে ইহাকেও পাতিব্রত্যের আত্যন্তিকতা না বলিলে নয়। কারণ, বঙ্গদেশের ধমনীতে ধমনীতে তীব্রবেগে আধ্যাত্মিক তড়িৎস্রোত প্রবাহিত। আমরা কিছুই না বলিয়া এক আধটি শ্লোক উঠাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াই। পাঠকেরা ধর্ম্মপ্রধান ইংরাজশাসনের পূর্ব্ব কালের অধ্যাত্মযোগ উপভোগ করিতে থাকুন।

"বিদ্যাকে করিয়া চুরি এ হইল চোরা।
ইহারে যদ্যপি পাই চুরি করি মোরা॥"

শুধু এইখানেই শেষ নয়। ক্রমে ক্রমে পতিবর্গের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহা উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহার আবশ্যক হয়, দেখিয়া লইবেন।

সুন্দর রাজসভায় আনীত হইলেন। ভারতচন্দ্র রাজসভা বর্ণনা করিয়াছেন—আলস্যের আধার। সেখানে তাকিয়া আছে, বালিশ আছে, সুতরাং ছারপোকাও আছে। কিন্তু এ ছারপোকাগুলাও আলস্যের সন্তান সন্ততি। সভামধ্যে রাজা সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। সুন্দর বলেন, তিনি বিদ্যাকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছেন—বিদ্যা তাঁহারই, সভামধ্যে আত্মপরিচয় দিতে তিনি বাধ্য নহেন। সুন্দরকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। ইতিমধ্যে শুকসারীর কথায় গঙ্গা ভাটকে আনাইয়া সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতে রাজা সুন্দরের পরিচয় জানিতে পারিলেন। তখন সুন্দরকে জামাতা বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহার আর কোন আপত্তিই রহিল না। কিছু দিন পরে বিদ্যা সহ সুন্দর স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

রামপ্রসাদের মত ভারতচন্দ্রও সুন্দরের স্বদেশগমনের পূর্ব্বে একবার বারমাস বর্ণনা করিয়া লইয়াছেন। মুকুন্দরাম হইতে বারমাস বর্ণন এক ফেসান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে ফুল্লরার বারমাস বর্ণন আর বিদ্যার বারমাস বর্ণনে তফাৎ বিস্তর। ফুল্লরার বারমাস দুঃখের ; আর বিদ্যার বারমাস বিলাসের। ফুল্লরার উদরচিন্তা, গৃহাভাব ; বিদ্যার কোকিল-মলয়-সম্মিলন। রামপ্রসাদ অপেক্ষা ভারতচন্দ্র কিন্তু ভাল বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের কতকগুলি ছোট ছোট নানাবিষয়িণী কবিতা আছে—নায়ক নায়িকা, বসন্ত বর্ষা, সত্যপীরের কথা ইত্যাদি ইত্যাদি। সেগুলির বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। কিন্তু ভারতের সকল লেখা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার মধ্যে নাট্যরস কতকটা ছিল। প্রহসন লিখিলে ভারত বোধ করি, তাহাতে বেশ সফল হইতেন। তাঁহার হাড়ে হাড়ে যে রঙ্গরস প্রচ্ছন্ন, তাহা প্রহসনে খুব জমিতে পারিত মনে হয়। তবে গম্ভীর রসে নাটক রচনা করিতে গেলে ভারত কত দূর সফল হইতেন সন্দেহ। তাঁহার ভাবের তেমন গভীরতা নাই, সেই জন্য গাম্ভীর্য্যের তাঁহার বিশেষ অভাব আছে।

ভারতচন্দ্রই প্রাচীন বঙ্গের শেষ কবি। বঙ্গসাহিত্যকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া তিনি আজ সরিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু সে জন্য তাঁহার সকল গুণ আমরা বিস্মৃত না হই। কালের অবস্থা বুঝিয়া প্রাচীন কবিদিগের দোষ অনেকটা মার্জ্জনীয়। ভারতচন্দ্রে একালেব মত সৌন্দর্য্যজ্ঞান নাই, অসাধারণ কবিত্বও হয় ত নাই, আমাদের রুচিবিরুদ্ধ—বর্ত্তমান সমাজে অপাঠ্য অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু তথাপি ভারত বঙ্গসাহিত্যের একজন প্রধান লেখক। বঙ্গসাহিত্য তাঁহাকে অনেক দিন বাঁচাইয়া রাখিবে।

['ভারতী ও বালক,' ফাল্গুন ১২৯৬]

ক্ষণিক শূন্যতা

জীবনের এক একটা দীর্ঘ পরিচ্ছেদের উপসংহারে আসিয়া আমরা খানিক ক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে আকাশের পানে তাকাইয়া থাকি—অতীত খুঁজিয়া পাই না, ভবিষ্যৎ প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হয়—হৃদয়ের গভীর অন্তঃপুর হইতে অজ্ঞাত অতৃপ্তির মত একটি দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া মিলাইয়া যায়। কি যেন অনির্দ্দেশ্য রহস্যভাবের মধ্যে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে—তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কেমন অবশ ঔদাস্য আচ্ছন্ন করিয়া থাকে; আমরা কিছুই ঠাহরাইয়া উঠিতে পারি না। ক্রমে সে নিস্তব্ধ শূন্যতা শান্ত হইয়া আসে, ধীরে ধীরে ভবিষ্যতের কুজ্ঝটিকার মধ্যে নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হয়। তখন দূর অতীতের পানে চাহিয়া দেখি, যৌবনের বন্যায় সেখানে নৈরাশ্য নিরুদ্যম মুহূর্ত্তের অধিক টিঁকিতে পারে নাই, প্রবলবেগে কোন্ উত্তুঙ্গ গিরিশিখর হইতে আশার স্রোত বহিয়া আসিয়া জীবনের মরুভূমি প্লাবিত করিয়াছে; সেখানে কেবলই স্বাধীন বিহঙ্গের আনন্দগীতি, কনককান্তি কুসুমের তরঙ্গায়িত সৌরভ, বিকশায়মান জীবনের দুর্দ্দম্য স্ফূর্ত্তি। সে কল্পনাময় ছায়া-দৃশ্য আমাদের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া বসে; সম্মুখে চাহিয়া আমরা তেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারি না। যে সকল পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়া জীবন চলিয়া গিয়াছে, সেইগুলিই চক্ষের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইতে থাকে—ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদে যথেষ্ট আলোকাভাবে বিশেষ কিছুই দেখা যায় না।

কিন্তু জীবনের এই অতীত এবং ভবিষ্যৎ পরিচ্ছেদের সন্ধিস্থলে আমাদের জন্য গোটাকতক শূন্য মুহূর্ত্ত হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে কেন? কয় মুহূর্ত্ত আমরা আপনাকে আপনার মধ্যে অনুভব করি না, জীবনের উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যে ভুলিয়া থাকি। বোধ হয়, সেই কয় মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে সমস্ত অতীত আসিয়া আমাদের নিকট জড় হয়—সমস্ত পরিচ্ছেদের ঘটনাবৈচিত্র্য ছায়ালোকের সামঞ্জস্যে ফুটিয়া উঠে। যতক্ষণ আমরা কোন বিশেষ পরিচ্ছেদে ব্যস্ত থাকি, তাহার মর্ম্ম সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। পরিচ্ছেদ-শেষে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া এক বার তাহার প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গ অনুভব করা আবশ্যক। এই অবস্থায় কয় মুহূর্ত্ত যেন ঘুমঘোরে কাটিয়া যায়। তাই কেমন শূন্য শূন্য ঠেকিতে থাকে।

এই ক্ষণিক শূন্যতা নহিলে কিন্তু চলে না। ইহার মধ্যে জীবনের ধারাবাহিকতা প্রচ্ছন্ন। সমগ্র জীবনের ঘটনার শৃঙ্খলা অনুভব করিতে হইলে কয়েক মুহূর্ত্ত ত অবসর চাই। নহিলে গুছাইয়া লওয়া বড় দুরূহ। আমরা উপসংহারে পঁহুছিয়া পরিচ্ছেদ বুঝিয়া দেখি—আমাদের সকল কল্পনা, আশা, উদ্যম, নৈরাশ্য পরে পরে সাজাইয়া লই। কিন্তু ইহা

এমনি নীরবে সম্পন্ন হয় যে, কয় মুহূর্ত্তের মধ্যে সমগ্র পরিচ্ছেদ বিশ্লেষণ ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। সহস্র ঘটনার মিলন বিরহে আচ্ছন্ন হইয়া খানিক ক্ষণ আমরা অকূল পাথারে ধ্রুবতারাহীনের ন্যায় চারি দিকে চাহিয়া দেখি, ক্রমে সকল ঘটনা থিতাইয়া আসিলে আমাদেরও শূন্যভাব ঘুচে।

মানব-জীবনের মধ্যে মধ্যে এইরূপ ক্ষণিক শূন্যতায় তাহার অতৃপ্তির ভাবের বেশ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের জীবনে তৃপ্তি কোথায়? তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া অতীতের সান্ত্বনা, পদতলে ভবিষ্যতের কি-জানি-কি। পশ্চাতে কেবল একটা দূর—অতিদূর দূর মাত্র; সম্মুখেও তাই—ধূ ধূ কেবলই একটা সীমাহীন মহাদূর। চতুর্দ্দিকের এই অসীম বিস্তৃতির মধ্যে আপনার ক্ষণভঙ্গুরত্ব লইয়া কে পরিতৃপ্ত হইবে? আমরা সমস্ত জগতের সহিত জীবনের প্রবাহ অনুভব করিয়া আকুল হইয়া উঠি, স্তম্ভিত হইয়া থাকি; কখনও আশায়, কখনও নৈরাশ্যে আমাদের অতৃপ্তি।

শূন্যতায় জীবনের দুই পরিচ্ছেদের মধ্যে মিলন সঙ্ঘটিত হয়। শূন্যতা ত আর কিছুই নহে—পরিচ্ছেদান্তে বিরাম মাত্র। সময় সময় পরিচ্ছেদবিশেষের মধ্যে কমা সেমিকোলনে আসিয়াও সব কেমন শূন্য শূন্য ঠেকে। এক একটা পদ সহজে বুঝিয়া উঠা যায় না, কেমন ফাঁকা ফাঁকা বোধ হইতে থাকে, সেই পদগুলি আয়ত্ত হইতে একটু সময় যায়। কমা সেমিকোলনের পর সেই সময়টুকুই শূন্য। এইরূপ শূন্যতায় পদের অথবা পরিচ্ছেদের অর্থবোধ বেশ পরিষ্কার হয়। অনেক সময় আমাদের অন্যমনস্কতার ফলেও শূন্যতার আবির্ভাব। হয় ত পদবিশেষে সম্পূর্ণ মনোযোগ করা হইল না; সে পদটি সুতরাং পূর্ব্বের সহিত পরপদের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিতে পারে না। আমরা পূর্ব্বের সহিত পরের যোগ দেখিতে পাই না। তখন একটু চোখ বুজিয়া ভাবিয়া লইতে হয়। স্থির হইতে না পারায় এই কয় মুহূর্ত্ত শূন্যের মত চলিয়া যায়। কিন্তু এই শূন্যতার মধ্যে ভাব আয়ত্ত হইয়া আসে। সেই জন্যই ত শূন্যতা পূর্ব্বের সহিত পরের যোগ রক্ষা করে।

ভাব আয়ত্ত হইলেই আমাদের শূন্যতা ঘুচিয়া যায়। আয়ত্ত হইবার অবস্থাতেই হৃদয়ের মধ্যে কেমন একটা অন্তর্লীন চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, তাহাতেই শূন্যতা। এই অবস্থায় হৃদয় যেন অবশ হইয়া আসে, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা চেষ্টাভাব আছে। তাহা ঠিক ধরা যায় না। শূন্যতায় তীব্র আকুলতার ভাব।

কিন্তু এই শূন্যতার পশ্চাতে যেরূপ আনন্দ, সম্মুখে সেরূপ নহে কেন? শূন্যতা শান্ত হইয়া আসিলে আমরা অতীতের পানে চাহিয়াই সুখ লাভ করি। কারণ বোধ হয়, সেখানে জীবনের সহস্র বিপ্লবের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাই। সেখানে কত ঘটনা ঘটিয়াছে, কত উদ্যম, কত কাতরতা জাগিয়া আছে, তাহার উপরে কল্পনার বিচরণ করিবার ক্ষেত্র

প্রশস্ত। ক্ষণিক শূন্যতায় সেখানকার ঘটনাগুলি বেশ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। ভবিষ্যতের রাজ্যে সকলই অস্থির—কল্পনার সঙ্গে আশা, নয় নৈরাশ্য। পশ্চাতে কেবলমাত্র স্মৃতির আনন্দ।

ক্ষণিক শূন্যতায় জীবন-কাব্যের মধ্যে উপসংহারের প্রধান ভাব সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক, দীর্ঘজীবনে মধ্যে মধ্যে শূন্যতাই তাহার ভাবের একতা বজায় রাখিয়াছে। শূন্যতার জন্য আমরা জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করিতে সমর্থ হই। নহিলে সমগ্র জীবন হয় ত আমাদের নিকট জড়বৎ অনুপভোগ্য হইয়া থাকিত। অন্ততঃ আমরা এমন ভাবে তাহার সামঞ্জস্যময় বৈচিত্র্য উপলব্ধি করিতাম না। মাঝে মাঝে দাঁড়ি পাইয়া আমাদের অনেক সুবিধা হইয়াছে। শূন্যতায় এক একটা ছেদ। ['ভারতী ও বালক,' ফাল্গুন ১২৯৬]

কেতকা-ক্ষেমানন্দ

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীরচনার কিছু কাল পরেই কেতকাদাস এবং ক্ষেমানন্দ দাস নামে দুই জন কবি এক গ্রন্থ রচনা করেন—মনসার ভাসান। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের মত তাঁহাদের ভাষার জোর নাই, কল্পনাও খেলে না। বর্ণনা বিষয়ে তাঁহারা মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস অপেক্ষা শতগুণে হীন। মুকুন্দরাম, কৃত্তিবাস যে প্রকৃতির অন্তঃপুরে গিয়া তাহার প্রাণ আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তাহা নহে—সে কালের কোন কবিই তাহা করেন নাই—কিন্তু যাহা দেখিয়াছেন, তাহার যতটুকু বস্তুগত, তাহা তাঁহারা কেতকা এবং ক্ষেমানন্দ অপেক্ষা ভালরূপে বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন। মনসার ভাসানরচয়িতারা স্থানে স্থানে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন—শুধু ভাবে নহে, ভাষায় পর্য্যন্ত কবিকঙ্কণের সহিত অনেক ঐক্য দেখা যায়। কবিকঙ্কণের মত লেখার ধরণটা কিন্তু তাঁহাদের পাকা নহে। তাঁহারা যে উপাখ্যান লিখিয়াছেন, তাহাতে কবিত্বরস বা ঘটনাবৈচিত্র্য বড় নাই কেবল দুই চারিটা বাঁধা উপমা এবং অলৌকিক ঘটনায় যত দূর হয়। ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহারা গ্রন্থ লিখিতে বসেন নাই—লিখিতে হইবে বলিয়া দুই জনে ভাগাভাগি কাজ সারিয়াছেন। কেতকাদাস খানিক লিখিয়া বিশ্রাম করিয়াছেন, ক্ষেমানন্দ লেখনী চালাইয়াছেন; আবার ক্ষেমানন্দ থামিতে কেতকা কলম ধরিয়াছেন। উভয় কবিই নিজ নিজ রচনার শেষে ভণিতায় স্বনাম উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তাহাতে আমাদের কতকটা সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের কাল নিরূপণপক্ষে তাহাতে কোন সাহায্য হইবে না। কারণ, সে সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারেই নীরব। ভাষাই তাহার একমাত্র উপায়। ভাষা দেখিয়া তাঁহাদের প্রাচীনত্ব

সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র রায়ের বহুপূর্ব্বে যে তাঁহাদের অভ্যুদয়, তাহা স্থির।

মনসার ভাসানে গ্রাম্য কথার কিছু প্রাচুর্ভাব। অর্থবোধ সে জন্য অনেক স্থলে কষ্টসাধ্য। সকল কথা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়াও দায়। অন্যান্য প্রাচীন কাব্যে সে সকল কথা প্রায় দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় ভাসানের ভাষা বাঙ্গলাদেশের কোনও বিশেষ অঞ্চলঘেঁসা। সে কোন্ অঞ্চল, আমরা বলিতে অক্ষম। তবে গ্রন্থের মধ্যে যে সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকে ভাসানরচয়িতাদের নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় ঠাহরাইয়া থাকেন। আমরাও তাহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ পাই না। সুতরাং মনসার ভাসানের গ্রাম্য কথাগুলি বর্দ্ধমান অঞ্চলেরই বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের কথার উপর কেতকাদাসের একটু তীব্র কটাক্ষ আছে। ঝড়ের সময় বাঙ্গালদিগের চুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিয়াছেন। মনসার ভাসানের গ্রাম্য শব্দগুলি যে পূর্ব্বাঞ্চলের নহে, তাহার প্রমাণ এইখানেই একরূপ হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু এখন সে কথা লইয়া বিশেষ আন্দোলনের আবশ্যক নাই। চম্পকনগরে চাঁদ সওদাগরের সহিত মনসার বাদ ছিল। চাঁদ হেতাল লইয়া মনসাকে মারিবার জন্য ব্যস্ত। মনসাও যে উপায়ে পারিয়াছেন, চাঁদকে জব্দ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি চাঁদের সাতখানি ডিঙ্গা ডুবাইয়া দেন, সাতটি পুত্রের প্রাণ হরণ করেন, চাঁদকে প্রত্যেক কার্য্যে বাধা দিয়া দিয়া জ্বালাতন্ করিয়া মারেন। তবুও কি হয়? চাঁদ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—মনসার মাথা পাইলে হেতাল নিশ্চিন্ত রহিবে না। যেমন করিয়াই হৌক, মাথার সহিত দেহের বিচ্ছেদ ঘটাইবেই। পুত্রবধূ বেহুলা কিন্তু হাতে হাতে মনসা পূজার ফল দেখাইয়া চাঁদকে মনসার দিকে লওয়ায়। বাসরে সর্পদংশনে নখীন্দরের মৃত্যু হইলে বেহুলা মৃতদেহক্রোড়ে ভেলায় করিয়া ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভাসিয়া যায়, এবং নেতা ধোপানীর সাহায্যে সুরপুরে গিয়া নৃত্যগীতাদি দ্বারা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া মনসার কৃপায় স্বামীর প্রাণ ফিরাইয়া পায়। মনসার বরে বেহুলার ভাসুরেরাও বাঁচিয়া উঠেন, চাঁদের সাতখানি ডিঙ্গার স্থলে চৌদ্দখানি ডিঙ্গা লাভ হয়। সুতরাং চাঁদ আর মনসাকে অবজ্ঞা করিতে পারেন না। খুব ধুমধাম করিয়া সাধু দেবীর পূজা করিলেন। কিছু দিন সুখে ঘরকন্না করিয়া নখীন্দর বেহুলা স্বর্গে চলিয়া গেলেন।

কেতকা-ক্ষেমানন্দের মনসা কতকটা কবিকঙ্কণের চণ্ডীর অনুকরণ করিতে ভালবাসেন। চণ্ডী যেরূপ ব্যবহার করিয়া ধনপতির গৃহে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, মনসাও সেইরূপ ব্যবহার করিয়া চাঁদবেণের গৃহে পূজিত হয়েন। ধনপতি চণ্ডীকে কিছুতে সহিতে পারিতেন

না, সেই জন্য চণ্ডী মগরার নিকটে তাঁহার অনেকগুলি নৌকা ডুবাইয়া দেন; মনসাও দুর্ব্বিনীত চাঁদের ডিঙ্গাগুলি ডুবাইয়া দিলেন কালীদহে। চণ্ডী অনেক কষ্ট দিয়া পরিশেষে ধনপতির মঙ্গল করেন; মনসাও নাস্তানাবুদ্ করিয়া চাঁদের প্রতি সদয় হয়েন। তফাতের মধ্যে ধনপতির জীবনের সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদের ছায়া, আর চাঁদের কপালে কাঠুরিয়া, ব্যাধ, ধোপানী। মনসা যেন চণ্ডীর চেলা। চণ্ডী অপেক্ষা তাঁহার সাহস কিছু কম। কিন্তু স্বপূজা প্রচারার্থে উপায় অবলম্বন করিতে কিছু মাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। চাঁদ সদাগরও ধনপতির দ্বিতীয় সংস্করণ—কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য শেষ হইলে বুঝি কেতকা-ক্ষেমানন্দের আহ্বানে মনসার ভাসানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। চণ্ডীর সহিত বিবাদে ধনপতির অস্ত্র শস্ত্র আবশ্যক হয় নাই, কিন্তু মনসার সহিত বাদে চাঁদ হেতাল লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। চণ্ডী ও মনসার আর পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। পাঠকেরা যাঁহার সহিত ইচ্ছা বাদ সাধিতে পারেন। আমরা যথেষ্ট দূরে রহিলাম।

এই দূর হইতে একবার ভাসানরচয়িতাদিগের বর্ণনা-সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক্। চাঁদবেণের পুত্র নখীন্দরের জন্মের কিছু কাল পরেই সায়বেণের গৃহে নখীন্দরের ভাবী অর্দ্ধাঙ্গ বেহুলার জন্ম হইল। কবি সুতরাং লেখনীহস্তে বেহুলাকে দর্শন করিতে বাহির হইলেন। দর্শনানন্তর সাধারণের সম্মুখে তাহার বর্ণনা করিতে বসিলেন,

"চন্দ্রমুখী খঞ্জননয়নী কলাবতী।
অধর অরুণ জিনি বিদ্যুতের দ্যুতি ॥
শ্রবণে কুণ্ডল তার খোঁপায় বকুল।
বেহুলার রূপেতে মোহিত অলিকুল ॥
দশন নিন্দিয়া কুন্দ কোরক সমান।
কোদণ্ড জিনিয়া যেন ভ্রূযুগ সন্ধান ॥" ইত্যাদি।

এখন কথা এই যে, এ বর্ণনা কিরূপ হইয়াছে? চন্দ্রবদন এবং খঞ্জননয়ন প্রাচীন কাল হইতে এদেশে রূপসীর লক্ষণ বটে। কেতকা-ক্ষেমানন্দের বেহুলা 'সুন্দরীর সুতরাং এ দুই সৌন্দর্য্য না থাকিলে চলিবে কেন? কিন্তু এইখানেই শেষ নয়। বেহুলা আবার কলাবতী। সুখের বিষয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এ কথাটা না বলিলে বোধ হয় হইত ভাল। কারণ, খানিক পরেই আবার আমাদের শুনিতে হইবে যে, বেহুলা এখনও বড় হয় নাই—পিতৃগৃহেই নৃত্যগীতবিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। ভাসানরচয়িতা যে তাড়াতাড়ি খোঁপা এবং দন্তপংক্তির বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন, শুনিলে বোধ হয় যেন বেহুলা জন্মাইতে না জন্মাইতেই যুবতী হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা মনে করিয়াছিল যে, বেহুলার দাঁত উঠে নাই শুনিবে, তাহারা বড়ই নিরাশ হইয়া পড়িবে সন্দেহ নাই।

বেহুলা নখীন্দর ত দিনে দিনে বাড়িতেছেন। এদিকে চাঁদ সদাগর নিজের গৃহদ্বারে আসিয়া পদাঘাতে জর্জ্জর। মনসা গণকবেশে সনকার নিকটে গিয়া বলিয়া আসিয়াছেন, তাঁহার গৃহে আজ রাত্রিকালে চুরী হইবে। চাঁদ কলাবনে খুসুর খুসুর নড়িতেছিলেন। সুতরাং চোরের দণ্ড ভোগ তাঁহাকেই করিতে হয়। চাঁদ ত দণ্ড ভোগ করিলেন, কিন্তু মিথ্যাবাদিনী মনসা দেবীর কি কোনও দণ্ড নাই? বাঙ্গলাদেশে মিথ্যা কথার জন্য কেহ দণ্ডিত হয় না। আর মনসা ত স্বয়ং দেবী—তিনি যখন অকারণে অনর্গল মিথ্যা বলিয়া যাইতেছেন, তখন দুর্ব্বল মানব ভক্ত ত মিথ্যাচরণ শিখিবেই। দেবীর দণ্ড নাই দেখিয়া ভক্তেরা আশ্বস্ত। মিথ্যাচরণের এমন দণ্ডহীন সুবিধা আর কোথায়? প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে অপাত্রে অন্ধভক্তি সংস্থাপনের যতটা চেষ্টা করা হইয়াছে, দেবচরিত্র গঠনের দিকে তাহার আংশিক মনোনিবেশ করিলে দেশের অনেক উপকার হইত। মিথ্যা দেবতার ভূষণ হইলে মানবে কি করিবে?

চাঁদ অম্লানবদনে লাথিগুলি হজম করিয়া ত গৃহে প্রবেশ করিলেন। আঃ! ভাবনা চিন্তা অনেক দূর হইল। এইবারে নখীন্দরের বিবাহ। একটি কন্যা মিলিলেই হয়। বেহুলার সন্ধান মিলিল। সব স্থির। বেহুলাকে কেবল পাতিব্রত্যের পরিচয়স্বরূপ লোহার কলাই রন্ধন করিতে হইবে। মনসা সহায়। নিমেষে রন্ধন হইয়া গেল। মনসার ভয়ে সাধু সাতালি পর্ব্বতোপরি এক লৌহের বাসরঘর নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। মনসা এদিকে গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করিয়া সেই লৌহবাসরে একটি ছিদ্র করাইয়া লইয়াছেন। বিবাহের পর নখীন্দর বেহুলা সেই ঘরে শয়ন করিয়া আছেন, দুই তিনটি সর্পের উদ্যম বেহুলার কৌশলে ব্যর্থ হইল, অবশেষে একটি সর্প গিয়া নখীন্দরকে দংশন করিল। নখীন্দর মরিলেন। ক্রন্দনের রোল উঠিল। বেহুলা স্বামীকে বাঁচাইবেই। সে এক কলার মান্দাসে চড়িয়া মৃত স্বামীক্রোড়ে ভাসিয়া চলিল।

পথে বেহুলাকে পরীক্ষা করিতে অনেক প্রলোভন। সে সকল প্রলোভন কাটাইয়া বেহুলা ত নেতা ধোপানীর নিকট উপস্থিত হইল। বেহুলা একদিন ধোপানীর নিকট হইতে চাহিয়া লইয়া একটি কাপড় কাচিয়া দিল। দেবতারা সে কাপড়ের বর্ণ দেখিয়া অবাক্। তখন ধীরে ধীরে নেতা ধোপানীর দ্বারা বেহুলা দেবসভায় পরিচিত হইল। নৃত্যে সে দেবতাদিগকে মুগ্ধ করিল। ক্রমে কথায় কথায় সকল প্রকাশ হইলে দেবতারা বেহুলার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। মনসা আসিলেন। বেহুলা তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কার্য্য উদ্ধার করিল। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া শ্বশুরকে মনসার ক্ষমতা বুঝাইয়া বেহুলা তাঁহাকে মনসার পূজা করাইল। বাঁধা নিয়মানুসারে দম্পতীর যথাসময়ে স্বর্গগমনও হইল।

এইবারে আমরা বেহুলার চরিত্র আলোচনা করিতে পারি। বেহুলা যে রীতিমত পতিব্রতা ছিল, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। পতিব্রতা না হইলে এত কষ্ট করিয়া সেই স্ফীত গলিত শবদেহ লইয়া একাকিনী অসহায় অবস্থায় সে কি আর অমন করিয়া বেড়াইত? বেহুলার ঐকান্তিক পতিভক্তি ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তবে ছিল না কি? লোহার কলাই পর্য্যন্ত যখন সে রন্ধন করিতে পারে, তখন রন্ধনবিদ্যায়ও বেহুলা পারদর্শিনী বলিয়া বোধ হয়। কলাবিদ্যায়ও তাহার নৈপুণ্য। কিন্তু কেবলমাত্র গ্রন্থকারগণের মুখে বেহুলার গুণের ফর্দ্দ শুনিয়া তাহার সমস্ত চরিত্র বুঝা যায় না। তাহার প্রত্যেক কথাবার্ত্তা ভাবভঙ্গী বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে। নহিলে সীতা সাবিত্রীর সহিত তুলনা করা অসম্ভব।

সীতার সহিত বেহুলার তুলনা করিতে যাওয়া নিতান্তই বাড়াবাড়ি। সে কোমল গম্ভীর সমুন্নত মাতৃপ্রকৃতির সহিত বেহুলার কি তুলনা সম্ভব? পাতিব্রত্য এবং অলৌকিক ঘটনার সংযোগ হইলেই যদি সকল চরিত্রকে সীতার পার্শ্বে লইয়া যাইতে হয়, তাহা হইলে সীতার আর মর্য্যাদা থাকে না। মনসার ভাসানের গ্রন্থকারগণ বেহুলার চরিত্রে সেরূপ সমুন্নত গাম্ভীর্য্য আদবেই ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, কেবল পুরাণের অনুকরণ করিয়া একটা অসম্ভব কাহিনী লিখিয়াছেন মাত্র। সে জন্য বেহুলাকে পতিব্রতাদিগের অগ্রগণ্য ঠাহরান যায় না। খুল্লনা তাহা হইলে কি দোষ করিল? সেও ত মৃত স্বামীক্রোড়ে করিয়া কাঁদিতেছিল, চণ্ডী ধনপতিকে বাঁচাইয়া দিলেন। এইরূপ মৃত স্বামীক্রোড়ে ক্রন্দন আর দেবতাবিশেষের সাহায্যে মৃত দেহের পুনর্জীবন লাভ প্রাচীন সাহিত্যে একরূপ দৈনন্দিন ব্যাপার। তাহা দিয়া সীতাকে ঘিরিলে সীতা অদৃশ্য হইয়া যাইবেন।

বেহুলা স্বামীর জন্য যাহা করিয়াছে, সাবিত্রী অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু সাবিত্রী-উপাখ্যানরচয়িতা সেই ভীষণা রজনীর অন্ধকার দিয়া যে কবিত্ব প্রস্ফুটিত করিয়াছেন, কলার মান্দাসের সাহায্যে কেতকা-ক্ষেমানন্দ তাহা পারেন নাই। মহাভারতের চিত্রটি যথোচিত ছায়ালোকে বড়ই গম্ভীর। কেবলই উপাখ্যান হিসাবে তাহা দেখিলে চলিবে না, চিত্র হিসাবে, কাব্য হিসাবে, সৌন্দর্য্য হিসাবে তাহা দ্রষ্টব্য। ভাসানের গ্রন্থকারকের এরূপ সৌন্দর্য্যরসজ্ঞান একেবারেই নাই। প্রাণে কবিত্ব থাকিলে ভাগীরথীবক্ষে ভাসিয়া যাইতে যাইতে কতকগুলি গ্রামের নাম সংগ্রহ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় কে? চক্ষে পড়িয়াছে এত দেশ থাকিতে কেবল গোদ আর গোদা—যাহাতে রঙ্গরসের সুবিধা হয়।

বেহুলা ভিন্ন মনসার ভাসানে আর চরিত্র নাই। নখীন্দরই বল, চাঁদই বল, আর সনকাই বল, একটি চরিত্রও ভালরূপ ফুটে নাই। বেহুলা কেবল যাহা অল্প বিস্তর দেখা

দিয়াছে—তাহাও কেবল এক বিশেষ অবস্থায়। দেবচরিত্রের মধ্যে আছেন মনসা—যথেচ্ছাচারিণী, চাটুতৃপ্তা, সদসদুপায়ে কার্য্য-উদ্ধারদক্ষা।

মনসার ভাসান হইতে সামাজিক কতকগুলি প্রশ্ন উঠিতে পারে। সে কালে ভদ্র-পরিবারমধ্যে নৃত্য গীত শিক্ষা কি প্রচলিত ছিল? বেহুলা ত নৃত্যে খুব নিপুণা। সতীদাহ-প্রথা তখন ছিল কি না? চাঁদ সদাগরের পুত্রবধূদিগের একটিও ত সহমরণে যায় নাই। সে জন্য কোন নিন্দাও ত কৈ শুনা যায় না। ভাসানের কবিরা বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সহমরণকে দূরে রাখিতেও পারেন। কিন্তু বেহুলার নৃত্যনৈপুণ্যে তাঁহারা যেরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে সে সময়ে কুলস্ত্রীর নৃত্যাদিশিক্ষা দোষের বলিয়া গণ্য হইত বোধ হয় না। তবে বেহুলার দেবসভায় নৃত্য অবশ্য দায়ে পড়িয়া। নহিলে, কুলস্ত্রীরা যে সভামধ্যে নৃত্য করিতেন, তাহা কিছুতেই সম্ভব নহে।

ভাসান সম্বন্ধে আমাদের অধিক কিছু বলিবার নাই। প্রাচীন সাহিত্যেও ভাসান বিশেষ উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে। ক্ষেমানন্দ কেতকা মনসার পূজা প্রচার করিতে কত দূর সফল হইয়াছেন, বলিতে পারি না। বেহুলা নখীন্দর সুরপুরে মনের আনন্দে কালযাপন করিতেছেন—দেবলোকে পার্থিব সুখের চূড়ান্ত উপভোগ। মনসাও চম্পকনগরের পূজা পাইয়া অবধি আছেন ভাল। কেবল আমরাই রোষদীপ্ত পাঠকের তীব্র কটাক্ষের সম্মুখে পড়িয়া ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া আছি। ভরসা করি, তাহাতে কাহারও হৃদয় দুঃখে প্লাবিত হইয়া উঠিবে না। ['ভারতী ও বালক,' ফাল্গুন ১২৯৬]

প্রেম : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

১

আমাদের দেশীয় সাহিত্যে সাধারণতঃ যে সকল কাব্যগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশই প্রেমের কথা লইয়া। প্রেমের বৈচিত্র্য, তরঙ্গভঙ্গ এ দেশের কবিরা যেরূপ সুন্দররূপে বুঝিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য কবিরা বোধ করি সেরূপ বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের কাব্যের বিরহ, অভিসার, মানাভিমান ব্যাপার পাশ্চাত্য কাব্যে কোথায়? পাশ্চাত্য দেশে কি প্রণয়-বন্ধনের মধ্যে বিরহ দেখা দেয় না? প্রণয়িনী কি ভুলিয়াও মান করিয়া বসিয়া থাকেন না? তবে সে দেশের কাব্য বিরহ-বিলাপ-ধ্বনিময় নহে কেন? মান-ভঞ্জনের গুরুতর ব্যাপার লইয়া পাশ্চাত্য কবি গীত রচনা করেন নাই কেন? প্রকৃতি, শিক্ষা, স্বাধীনতা, এবং অন্যান্য নানা অবস্থাভেদে পাশ্চাত্য দেশে বোধ হয় বিরহের এরূপ জ্বালাময়ী

দারুণতা নাই। ইংরাজদিগের মধ্যে ভালবাসার অভিনয় খেলা প্রচলিত আছে, তাহাই হয় ত আমাদের মানভঞ্জনের কতকটা অনুরূপ। কিন্তু মানভঞ্জন অনুষ্ঠানের মধ্যে হৃদয়ের যথার্থ অনুরাগ প্রচ্ছন্ন, আর ইংরাজ জাতির flirtation প্রেমের অভিনয় মাত্র—তাহাতে সত্যের সম্পর্ক নাই। সুতরাং মানভঞ্জনে স্বভাবতই কবিতার প্রতিষ্ঠাভূমি হইতে পারে।

ইংরাজী সাহিত্যে বিরহের ভাবপ্রকাশক একটিও কথা শুনা যায় না। বিচ্ছেদের ইংরাজী প্রতিশব্দ খুঁজিয়া মিলে, কিন্তু বিরহের প্রতিশব্দ নাই। বিরহের অভাবে সুতরাং মিলনেরও অবিকল প্রতিশব্দের ইংরাজী ভাষায় অভাব আছে। আমাদের মিলনের হৃদয়ে কতদিনকার বিরহের অশ্রুজল প্রচ্ছন্ন, কত দীর্ঘ নৈরাশ্যের রুদ্ধ নিশ্বাস সমাহিত। পাশ্চাত্য মিলন কেবল মিলন মাত্র—তাহার মধ্যে বিরহের কাব্য রচিত হয় নাই, পথ পানে চাহিয়া কাহার প্রত্যাগমনপ্রতীক্ষা জাগিয়া নাই, আমাদের মিলনের মত সে মিলন অতীতের অগাধ সমুদ্রমথিত নহে। আমাদের বিরহ মিলনে এ দেশের প্রকৃতির প্রভাব অনুভব হয়। অপর দেশে সুতরাং ঠিক সেইরূপ কিছু আশা করা যায় না।

প্রেমবাচক শব্দও আমাদের ভাষায় অধিক মিলে। স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি বিশেষ ভাব-সকল বাদ দিয়াও কত কথা—প্রেম, প্রণয়, অনুরাগ, ভালবাসা, প্রীতি, পিরীতি। ইহারা সব যে সম্পূর্ণ এক ভাবই ব্যক্ত করে, তাহা নহে। কিন্তু ইংরাজীতে একমাত্র প্রতিশব্দ—Love। প্রেম, ঈশ্বর বিষয়ে প্রয়োগ না হইলেও, প্রণয় অপেক্ষা নিষ্কাম। প্রেম ইংরাজী Love শব্দের মত বিস্তৃত এবং সঙ্কীর্ণ, উভয় ভাবেই ব্যবহৃত হয়। প্রণয়ের প্রেমের মত বিস্তৃতি নাই। প্রণয় মানবের ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে না। প্রেমের বিলাইয়াই সুখ; প্রণয় প্রতিদান চাহে। অনুরাগ প্রণয়ের মূলে। প্রণয় অনুরাগাপেক্ষা গাঢ়। প্রীতি হইতে পিরীতির উৎপত্তি বটে, কিন্তু কালক্রমে উভয়ের ভাবে বিস্তর প্রভেদ হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমানে পিরীতির প্রীতির মত গাম্ভীর্য্য নাই। প্রেমের প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভাবগুলি আমাদের ভাষায় সমধিক পরিস্ফুট। ইংরাজী Love শব্দ কোথাও অনুরাগ, কোথাও প্রণয়, এমন স্পষ্ট নহে।

কেহ না মনে করেন যে, পাশ্চাত্য ভাষায় প্রেমের ভাল কবিতা নাই। প্রেমের কবিতা সকল ভাষাতেই আছে। বিশেষতঃ ইংরাজ কবিরা প্রেমিকের হৃদয় বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু প্রেমের কবিতা যথেষ্ট থাকিলেও ইংরাজীতে আমাদের দেশের মত বিচিত্র প্রেমকাব্যের অভাব আছে বোধ হয়। এ দেশের কবিরা প্রেমকে সমগ্রভাবে এক করিয়া এবং স্বতন্ত্রভাবে তাহার প্রত্যেক অঙ্গ ভাগ করিয়া বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্য কবিরা প্রেমের প্রত্যেক অধ্যায় সেরূপ ভাবে দেখেন নাই। আমাদের বৈষ্ণব কবিদিগের সঙ্গীতে প্রেমের অতৃপ্তি, আকুলতা,

আকাঙ্ক্ষার ভাব সুন্দর পরিস্ফুট। শুধু তাহাই নহে, প্রকৃতির সহিত প্রেমের সম্বন্ধ, প্রেমের উপর প্রকৃতির প্রভাব তাঁহারা সুন্দর বুঝিতেন। তাঁহারা প্রেমের সুর ধরিয়াছিলেন; সেরূপ ভাবে কোনও পাশ্চাত্য কবি বোধ করি প্রেমের সুর ধরিতে পারেন নাই। প্রেমকে তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গীন আয়ত্ত করিয়াছেন। সেই জন্যই ত বংশীধ্বনির সহিত প্রেমভাবের নীরব সম্বন্ধ এমন দক্ষতার সহিত গাঁথিয়া দিতে পারিয়াছেন। এ দেশে প্রেমের তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ হইয়াছে। প্রেমেই আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারি।

পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেমের কাহিনীবৈচিত্র্য বিস্তর—নানা ঘটনার সমাবেশে। কিন্তু তাহাতে প্রেমভাবের সাধারণ বৈচিত্র্য তেমন ব্যক্ত হয় নাই। মানবচরিত্রের বিভিন্নতায় প্রেমের প্রগাঢ়তার তারতম্যই তাহাতে ভাল বুঝা যায়। পাশ্চাত্য প্রেমেও অধীরতা, উৎকণ্ঠা দেখা যায়; কিন্তু প্রাচ্য কবির মত সে ভাব পাশ্চাত্য কবি ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয়, অধীরতা উৎকণ্ঠার সহিত বিরহেরই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা। বিরহ বিষয়ে আমাদের কবি অদ্বিতীয়। বিরহবেদনা সকল দেশেই আছে—প্রণয়িবিরহে প্রণয়িনী অধীরা। না থাকিবে কেন? অন্য দেশেও ত এই মানবেরই বাস, তাহাদের হৃদয়ও ত মানবেরই মত। কিন্তু আমাদের কাব্য বিরহাচ্ছন্ন। বিরহকে বিশ্লেষণ করিয়া দেশীয় কবি তাহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা পর্য্যন্ত বাহির করিতে চেষ্টা কবিয়াছেন।

প্রেমের মূলে সৌন্দর্য্য উভয় সাহিত্যেই। আমাদের বৈষ্ণব কবিরা এই সৌন্দর্য্যে তন্ময়। সেই জন্যই ত তাঁহাদের প্রেমসঙ্গীতে তরঙ্গে তরঙ্গে সৌন্দর্য্য। সৌন্দর্য্যের হৃদয়ে ডুবিতে ডুবিতে তাঁহাদের আর আশ মিটে নাই—যত ডুবিয়াছেন, ততই আরও আরও। তাঁহারা কিছুতেই জুড়াইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য কাব্যে সৌন্দর্য্যের গভীর অগাধে এরূপ নিমজ্জন দেখা যায় কি না সন্দেহ। বৈষ্ণব কবির ভাষা কেবলই সৌন্দর্য্যময়ী, আকুলতাময়ী। পাশ্চাত্য কবি সৌন্দর্য্যে আকুল হইয়া গাহিয়াছেন বটে, কিন্তু সে আকুলতা আর এ আকুলতা বিস্তর তফাৎ। সৌন্দর্য্য-প্রেমে বৈষ্ণব কবি তুলনারহিত। সে গভীরতা এবং বিস্তৃতি অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য।

বৈষ্ণব কবির প্রেম জগন্ময়। প্রেমে তাঁহাদের স্থিতি, গতি, জীবন। প্রেম জীবনের দৈনন্দিন খুঁটিনাটি। তাঁহাদের প্রেমচর্চ্চায় প্রেমের সকল রস ধরা দিয়াছে। তাহা কেবলই সুখপ্রধান নহে। বৈষ্ণব কবির সঙ্গীতে প্রেমের সহিত দুঃখ, জ্বালা, সহিষ্ণুতা। প্রাচ্য সাহিত্যের এই প্রেমজ্বালা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিরল। আমাদের কবি প্রেমের সহিত জ্বালার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন। যত তীব্র জ্বালা, তত গভীর প্রেম। প্রেমকে সহিতে হয়। সে সুখ চাহে না, বিনিময় নহিলে মরিয়া যায় না, কেবল ভালবাসে। তাহার আইন আদালত নাই, কুলমর্য্যাদা নাই; যেখানে তাহার আবির্ভাব হয়, অনিবার্য্য বলিয়া—

না হইলে নয় বলিয়া। পাশ্চাত্য কবিও এ ভাব অবশ্য বুঝেন। কিন্তু আমাদের কাব্যে ইহা কি পরিস্ফুট!

পাশ্চাত্য কাব্যে প্রেমের একটা অনির্দ্দেশ্যতা অনুভব করা যায়। এই অনির্দ্দেশ্য অনুভবনীয় ছায়া-ভাব আমাদের সাহিত্যেও বিরল নহে। আমাদের বংশীধ্বনিময়ী আকুলতায় এ ভাব তরঙ্গায়িত। শুধু তাহাই নহে, মিলনের পূর্ণতার মধ্যেও আমাদের কবিরা একটা আকুল অনির্দ্দেশ্য কি-জানি-কি ভাব ধরিতে পারিয়াছেন। প্রাচ্য কবিতায় এ ভাব অনেক স্থলে দেখা যায়। ভারতের কবিই ত প্রথম মিলনের মধ্যে সুখ কি দুঃখ ঠাহরাইয়া উঠিতে না পারিয়া আকুল হৃদয়ে গাহিয়া উঠিয়াছিলেন। সে ভাবের প্রতিধ্বনি বর্ত্তমান শতাব্দীর পাশ্চাত্য সাহিত্যেই খুঁজিলে মিলিতে পারে। অন্যত্র মিলে কি না জানি না।

প্রেমের একটি ভাব আমাদের ভাষায় সুন্দর ব্যক্ত। সে ভাব আধ-আধ চাহনি, আধ হাসি, আধ চরণে আধ চলন। কটাক্ষের তীব্রতা এখানে বিলুপ্ত, হাস্যের ভঙ্গী নাই, গমনে হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়ার ভাব নাই, অথচ ইহার মধ্যে প্রেমের ঢল ঢল সৌন্দর্য্য পূর্ণ অভিব্যক্ত। আড়নয়নের অপেক্ষা আধ চাহনিতে যেন শ্রী আছে, কোমলতা আছে। আভিধানিক সংজ্ঞায় তাহা স্পষ্ট বুঝান যায় না। আধ হাসির হৃদয়ে তীব্র বিদ্যুচ্চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না, তাহাতে কেবলই একটি মাধুরীর সন্নিবেশ। পাশ্চাত্য ভাষায় এই ভাবের অবিকল অনুবাদ মিলে কি না বলা সহজ নহে। তবে প্রেমের চাহনি, প্রেমের হাসি, প্রেমের চলন পাশ্চাত্য সাহিত্যে অনেক আছে। নহিলে অতবড় সাহিত্য টিঁকে?

প্রেমের বাঁশী কিন্তু আমাদের মত আছে কাহার? বাঁশীর প্রেম পাশ্চাত্য কবি আমাদের মত বুঝেন না। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির রাধাময়ী কাতরতা তাঁহারা বুঝিবেন কিরূপে? বৈষ্ণব কবিই সে বাঁশীর মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন—কারণ, তাঁহার হৃদয়ে সে বাঁশী বাজিত। বৈষ্ণব কবি বাঁশীর স্বরে বিষামৃতের একত্রীকরণ অনুভব করিয়াছেন, তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে ভাব ধ্বনিত হয়, তাহার সন্ধান লইয়াছেন, স্বভাবের সহিত তাহার মধুর সামঞ্জস্য বুঝিয়াছেন। প্রকৃতির সুর সম্বন্ধে তাঁহাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল সন্দেহ নাই। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি লতাকুঞ্জের শিরায় শিরায় কেমন একটা কম্পিত অধীরতা বিকশিত করিত, যমুনার ঘন নীল তরঙ্গে তরঙ্গে কি প্রবাহময় চাঞ্চল্য স্পর্শ দিয়া যাইত, বৈষ্ণব কবিই তাহা ধরিয়াছেন। আর রাধার হৃদয়ের উপর সে বাঁশীর প্রভাব? তাহা আর বলিবার আবশ্যক নাই। প্রেমের শব্দ, স্পর্শ, সৌন্দর্য্য, রস, সকলই বৈষ্ণব কবি বুঝেন। প্রেমের অতীন্দ্রিয়তাও তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। বৈষ্ণব কবির কাব্যই প্রেম।

প্রাচ্য সাহিত্যে প্রেমের সহিত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পূর্ব্বেই আভাস দেওয়া হইয়াছে। কোকিল মলয় বসন্ত, মেঘ বৃষ্টি বর্ষা ইত্যাদি উদাহরণ। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও

প্রণয়কাল May। May আমাদের বসন্তের সহিত কতকটা মিলে। আমাদের বর্ষার ব্যাপার পাশ্চাত্য সাহিত্যে না মিলিবারই কথা। এ দেশের কবিরা ঋতুতে ঋতুতে প্রেমের ভাব আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে এত ঋতুভেদ বোধ করি নাই, সুতরাং ভাবেরও প্রতি দিন পরিবর্ত্তন হয় না। কিন্তু যে কয় ঋতু আছে, তাহার প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে প্রেমের ভাবের পরিবর্ত্তন কি সে দেশে এরূপ আলোচিত হইয়াছে ? জানি না ত। এ দেশে বসন্ত বর্ষার বিরহের প্রভেদ অনেক দিন হইতেই আলোচনা হইয়া আসিতেছে। কোন কোন বৈষ্ণব কবি সকল ঋতুরই ভাব লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

কালিদাসের মেঘদূতের অত সৌন্দর্য্য—বাহ্য প্রকৃতির সহিত হৃদয়ের ভাবের সম্মিলনে। অত কথায় কাজ কি, মেঘকে বিরহের দূত না করিলে তাঁহার সকলই ব্যর্থ হইত। কালিদাসের মেঘদূতে মধ্যে মধ্যে বহিঃপ্রকৃতিতে প্রেমের অভিব্যক্তি প্রায়ই দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও এ ভাব অনেক স্থলেই দেখা যায়। শেলীর প্রেমতত্ত্ব ত এই ভাব লইয়া রীতিমত তত্ত্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য কাব্যে আরও উদাহরণ মিলিতে পারে। বাহুল্যভয়ে এইখানেই নিবৃত্ত হইলাম।

প্রেমের স্বাধীন মুক্ত ভাব পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেরূপ মিলে, আমাদেরও কি সেইরূপ ? বৈষ্ণব কবিদিগকে ছাড়িয়া দিলে আমাদের মুক্তভাব অল্পই। সংস্কৃত কবিরাও দাম্পত্য প্রণয়ের সঙ্গে অনেক সময় মুক্তভাব যোগ করিয়া দিয়াছেন। মুক্তভাবে বৈচিত্র্য সুব্যক্ত। ইদানীন্তন বঙ্গসাহিত্যের কবিরা প্রেমকে বদ্ধ করিয়া পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছেন। প্রেমের শিক্ষা হয় নাই, অথচ তৃষ্ণা প্রবলা ; সুতরাং স্বভাবতই উচ্ছৃঙ্খলতার আবির্ভাব। উদাহরণ—বিদ্যাসুন্দর। মুক্ত ভাবে যে সুগভীর সংযত শিক্ষা হয়, প্রাচীরবেষ্টিত বিলাসের মধ্যে তাহা হয় না। বৈষ্ণব সাহিত্যই আমাদিগের মুখ রক্ষা করিয়াছে। নহিলে, কেবল সংস্কৃত সাহিত্যের দুই-চারিখানি প্রেমকাব্য লইয়াই আমাদের নাড়াচাড়া করিতে হইত। কৃষ্ণনগরের রাজসভা-বর্দ্ধিত সাহিত্যের ত আর উল্লেখ করিয়া আমাদের গৌরব করা চলিত না।

প্রাচ্য সাহিত্যে প্রেমের সহিত একটা বিশেষ লজ্জার ভাব জড়িত। পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেম নির্লজ্জ নহে বটে, কিন্তু আমাদের দেশের মত তাহা একেবারে লজ্জা-আচ্ছন্ন কি না জানি না ত। হয় ত উভয় দেশে লজ্জার প্রকৃতি ভিন্ন। সেই জন্য আমাদের প্রেমকে যেরূপ সলজ্জ মনে হয়, পাশ্চাত্য প্রেমকে সেরূপ মনে হয় না। Blush করা কিন্তু উভয় দেশেরই সাধারণ প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়।

পাশ্চাত্য প্রণয়াপেক্ষা আমাদের প্রণয়ে সহচরী-সান্ত্বনার যেন কিছু আধিক্য দেখা যায়। বিরলবাস উভয় সাহিত্যেই। সখীসমাগমে আমাদের সাহিত্যে কণ্ঠধ্বনিটা অনেক

সময় জমে ভাল। সখীরা থাকায় অনুরাগ ব্যক্ত করিবার সুবিধা মন্দ নয়। তাই বলিয়া সকল সময়ে সখীসঙ্গ অসহ্য। আমাদের কবিরা কোন্ অবস্থায় সখীকে রাখিতে হইবে, কোন্ অবস্থায় বা বিদায় দিতে হইবে বুঝেন। মানসিক অবস্থার উপরেই তাহা নির্ভর করে। পাশ্চাত্য সাহিত্য যে একেবারে সখীবির্জ্জিত, তাহা বোধ হয় না, তবে আমাদের সখীসমাগমে কিছু জমাট্ অধিক। পাশ্চাত্য সাহিত্যে এতটা নহে।

প্রাচ্য সাহিত্যের কে-জানে-কাহাকে অভিশাপ ভাব কি পাশ্চাত্য সাহিত্যে আছে? বোধ হয় না। আমাদের রাধার এ অনির্দ্দেশ্য অথচ সুস্পষ্ট অভিশাপ অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে প্রেমের কতকগুলি সূক্ষ্ম শিরার তাড়িত স্পর্শ অনুভব করা যায়। তাহাতে প্রেমের মৃদু অব্যক্ত সৌন্দর্য্য অনেকটা প্রকাশ পায়। তাহা হইতে অবশ্য এমন প্রমাণ হয় না যে, প্রেমের সূক্ষ্ম ভাবগুলি এ দেশের কবিরা আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তবে ভাববিশেষ পাশ্চাত্য সাহিত্যেই সমধিক ব্যক্ত।

যে তরুণ সাহিত্যে এই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রেমবৈচিত্র্যের শুভ সম্মিলন, সে সাগরসঙ্গম সাহিত্যের ভবিষ্যৎ না জানি কি উজ্জ্বল! সে সাহিত্য হইতে যে প্রেমস্রোত প্রবাহিত হইয়া জগতের হৃদয় সিক্ত করিবে, তাহাতে ধরণীর সমস্ত রক্তচিহ্ন মুছিয়া গিয়া এক শান্ত আনন্দের আবির্ভাব হইবে। প্রেমের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন আর নব্য সাহিত্যের অভ্যুদয় সম্ভাবনা নাই। এখন কেবলই সেই প্রেম চাহি—প্রেম আর প্রেম।

২

বৈষ্ণব কবিদিগের কল্যাণে আমাদের প্রেম-সাহিত্য বজায় রহিয়া গেল বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে প্রেমের যেরূপ স্বাধীন চর্চ্চা হইয়াছে, আমাদের সেরূপ কোন কালে হয় নাই। আমাদের সামাজিক রীতিনীতি সকলই স্বাধীন প্রেমচর্চ্চার বিরোধী। প্রেমের সম্যক্ স্ফূর্ত্তির পূর্ব্বেই আমাদের দাম্পত্য-বন্ধন; সুতরাং স্বাধীন প্রেমচর্চ্চার আবশ্যকই থাকে না। প্রাচীন কালে এ দেশে স্বয়ম্বর প্রথা ছিল, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অভিলষিত ব্যক্তির সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হওয়া যাইত; কিন্তু তাহাতে যে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় প্রেমবৃত্তির এ দেশে সম্যক্ অনুশীলন হইয়াছে, তাহা নহে। স্বয়ম্বর প্রথায় রূপ এবং গুণ মাত্র নির্ব্বাচনের সহায়তা করে। পাশ্চাত্য প্রেমেও রূপ এবং গুণ মূল উপাদান। কিন্তু পরস্পরের হৃদয়ে স্ব স্ব প্রেমের সম্পুর্ণ প্রতিষ্ঠা করিতে কত যত্ন এবং অনুষ্ঠান। এই সকল আশা নৈরাশ্য উদ্যম অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রেমচর্চ্চা না হইয়া থাকিবার যো নাই। স্বয়ম্বরে গুণের সহিত, হৃদয়বৃত্তির সহিত সংঘর্ষে আসিতে হয় না, তাহা কেবল শ্রুত মাত্র। পাশ্চাত্য দেশের সমাজ-গঠন স্ত্রী এবং পুরুষের স্বাস্থ্যজনক সম্মিলনের অনুকূল, বিশেষতঃ প্রেমের

উপরেই সেখানে দাম্পত্য-বন্ধন অনেকটা নির্ভর করে, প্রেমের স্বাধীন চর্চ্চা এই কারণে অপরিহার্য্য। আর প্রেমের স্বাধীন চর্চ্চায় বাধা দিতে না পারিলেই হিন্দু সমাজের ভিত্তি ভাঙ্গিয়া যায়। প্রেম ত আর জাতি কুল বিচার করিয়া আসে না। তবে দৃঢ় সমাজবন্ধনে বাঁধিয়াও নাকি মানব-প্রকৃতিকে একেবারে চাপিয়া রাখা যায় না, সেই জন্য শৃঙ্খলজর্জ্জর বদ্ধ সমাজ-হৃদয়ের মধ্য হইতেও প্রেমের মুক্ত ভাবের সঙ্গীত উঠিয়াছে। এই মুক্ত ভাব আমাদের বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায়। প্রেমপ্রধান বৈষ্ণব ধর্ম্ম হিন্দু সমাজের নিগড়বদ্ধ সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে স্বাধীনতাপ্রয়াসী উদার হৃদয়ের প্রবল বিদ্রোহ। যেখানে ব্রাহ্মণ শূদ্রস্পর্শে আপনাকে কলঙ্কিত বোধ করিতেন, সেখানে বৈষ্ণব ধর্ম্ম চিররুদ্ধদ্বার মুসলমানকে পর্য্যন্ত প্রেমালিঙ্গন দিতে কুণ্ঠিত হইল না। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে মুক্ত প্রেমের আধার হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি ? প্রেমানুশীলনেই ত সে হিন্দু সমাজের অন্তরে অন্তরে আঘাত দিয়াছিল। ভাগবতের কবি বোধ করি প্রেমের মুক্ত ভাবের আবশ্যকতা প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিরা তাঁহার কার্য্য অগ্রসর করিয়া দেন, চৈতন্যে আসিয়া সেই মুক্ত ভাবের সম্পূর্ণ বিকাশ হইল—সে ভাব আকার প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার অবসর পাইল। পূর্ব্বে যাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় বীজভাবে লুক্কায়িত ছিল, চৈতন্যে তাহার পূর্ণ প্রকাশ। আমাদের সমাজে বা সাহিত্যে আদিরসের প্রাবল্য সত্ত্বেও প্রেমের বৈষ্ণব অনুশীলন কোথায় ? ইদানীন্তন কবিরা মধ্যে মধ্যে সমাজ-নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়াছেন বটে, কিন্তু মুক্ত ভাবের অনভ্যাসে কেবল একপ্রকার অস্বাস্থ্যকর হীন ভাব রহিয়া গিয়াছে মাত্র। আর বৈষ্ণব প্রেমচর্চ্চাও ত চলিল না। এখানে সেই যন্ত্র-নিয়ম। সুতরাং প্রেমের গঠনকার্য্য এবং শিক্ষা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য জাতির মত অভিজ্ঞতা আমাদের সম্ভব নহে। সে সমাজের গঠনপ্রণালীই প্রেমচর্চ্চার অনুকূল।

কিন্তু তথাপি পাশ্চাত্য সাহিত্যকে আমরা কিছু দিয়া যদি ধরিতে পারি ত সে প্রেম। এমন কি, সময়ে সময়ে মনে হয় যে, বৈষ্ণব কবিদিগের সাহায্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যকে আমরা ছাড়াইয়া উঠিতে পারি বা। ইহা দুরাশা এবং শূন্যগর্ভ কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু এমন দুরাশাও মধ্যে মধ্যে হৃদয়ে জাগে। বোধ করি, এক দিক্ দিয়া দেখিলে আমাদের এ কল্পনাও কতকটা সত্য হইয়া দাঁড়ায়। সে দিক্ প্রেমভাবের সাধারণ বৈচিত্র্য। সাধারণ বৈচিত্র্য কাহাকে বলে বুঝান কিন্তু সুকঠিন। বৈষ্ণব কবির প্রেমচর্চ্চায় স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ব্যতীত প্রেমের সখ্য এবং বাৎসল্য রস আলোচিত হইয়াছে ; এমন কি, পশুজগৎও সে প্রেম হইতে বঞ্চিত হয় নাই। এ হিসাবে অবশ্য প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্য কতকটা বুঝান যায়। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্য কিছু স্বতন্ত্র। . বৈষ্ণব কাব্যে বিশেষ বিশেষ সাধারণ অবস্থার স্বতন্ত্র ভাব লইয়া যে আলোচনা আছে, তাহাতেই

সাধারণ বৈচিত্র্য সমধিক ব্যক্ত বলিয়া বোধ হয়। শুধু অবস্থাভেদ অবশ্য সর্ব্বস্ব নহে, প্রেমের একটা সাধারণ ভাবও ইহার মধ্যে থাকা চাই। প্রেমের এই সাধারণ ভাব—সাধারণ বৈচিত্র্য নহে—পাশ্চাত্য কাব্যে বহুল। বৈষ্ণব কাব্যেও ইহার অভাব নাই। সাধারণ বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও আমরা তাহার উদাহরণ দেখাইতেছি। রাধাকৃষ্ণের প্রেমালোচনায় বিরহ, ভূত-বিরহ, ভাব-বিরহ, মান, অভিসার, এই সকলই প্রেমের সাধারণ বৈচিত্র্যের অন্তর্ভূর্ত। এই গেল প্রেমের এক দিক্। এবং এই দিকে আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমকক্ষতা স্পর্দ্ধা করি। কিন্তু প্রেমের আর এক দিকে আমরা বড় অগ্রসর নহি। মোটামুটি তাহাকে কাহিনী-বৈচিত্র্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কাহিনী-বৈচিত্র্য সে দিকের গভীরতা এবং বিস্তৃতির ভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম। পাশ্চাত্য কবিরা বিবিধ চরিত্রগঠনে প্রেমের নানা দিক্ দেখাইয়াছেন। তাঁহাদের প্রেমের সহিত সংসারের নানাবিধ জটিল সম্পর্ক, মানব-চরিত্রের নিগূঢ় রহস্য। অনেক সময়ে যৌবনের একটা ব্যক্তিবিশেষবদ্ধ নহে, এমন তীব্র আকাঙ্ক্ষা পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষ পরিস্ফুট দেখা যায়। বৈষ্ণব কবিদিগের এরূপ ব্যক্তিসম্পর্ক-শূন্য অথচ মানবপ্রেম বোধ করি নাই। ইহা ভিন্ন প্রেমের আরম্ভের বিবিধ জটিল রহস্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে যেরূপ সুব্যক্ত, আমাদের সেরূপ বোধ হয় না। কিন্তু এ সকল কথার দুই চারি কথায় মীমাংসা অসম্ভব। বর্ত্তমান লেখকের এ বিষয়ে মীমাংসার ক্ষমতা নাই। সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় যে, ব্যুৎপত্তি অভাবে বিষয়টি তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য দেশ সম্বন্ধে পদে পদে ভ্রম সম্ভাবনা।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা দেখাইয়াছি, পাশ্চাত্য দেশে মানবপ্রকৃতিগত বিরহ, অভিমান প্রভৃতি থাকিলেও এ দেশের সাহিত্যের মত পাশ্চাত্য সাহিত্যে এ সকল বিষয় তেমন প্রাধান্য লাভ করে নাই। বিরহ সে দেশেও আছে, এবং অবিকল প্রতিশব্দের অভাব থাকিলেও কাব্যে বিরহভাব পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মত বিরহ-কাব্য পাশ্চাত্য সাহিত্যে দুর্লভ। তাহার কারণ, সামাজিক অবস্থার প্রভেদ। অন্যান্য বিবিধ বিভিন্ন কারণও হয় ত ইহার মূলে অল্পবিস্তর কার্য্য করে; যেমন, প্রকৃতির প্রভাব, জাতির চরিত্রগত বিশেষত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। বিরহজ্বালা কিন্তু মানবপ্রকৃতির স্বভাবসিদ্ধ। প্রিয় জনকে আমরা কাছে কাছে রাখিতে চাই। যখন তাহার দর্শন স্পর্শন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হই, তখন স্বভাবতই কাতর হইয়া পড়ি। প্রাচ্য হৃদয়ের সহিত পাশ্চাত্য হৃদয়ের এখানে প্রভেদ হইতে পারে না। তবে নানা অবস্থাভেদে আমাদের বিরহ পাশ্চাত্য বিরহ হইতে স্বতন্ত্র এবং দারুণ। কেহ কেহ বলেন, পাশ্চাত্য হৃদয় অবিশ্রান্ত উদ্যমে প্রকৃতিকে দমন করিয়া রাখে—সম্পূর্ণ জোর করিতে দেয় না, আর আমরা তাহার প্রভাবে

অনেকটা ভাসিয়া যাই, এই কারণে আমাদের সহিত পশ্চিমের বিরহ বিষয়ে এত প্রভেদ। এ কথা অভ্রান্ত কি না জানি না, কিন্তু নিতান্ত অশ্রাব্য নহে।

মানাভিমানের ব্যাপার আলোচনা করিয়া দেখিলে বিভিন্ন সমাজের প্রভাব আরও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। সামান্য খুঁটিনাটি লইয়া কৃত্রিম অভিমান সকল দেশেই আছে। কিন্তু অভিমানের গুরুতর কারণ, প্রেমের মূল নিয়ম লঙ্ঘন। আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির কোন বিষয়ে হাত নাই। স্বামী ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহ করিতে পারেন, সুতরাং অন্যার প্রতি তিনি অনুরক্ত জানিলেও স্ত্রীর কিছু বলিবার অধিকার নাই। দুই দিন গৃহকোণে নয়নজলে তাহার অভিমান সমাপন করিতে হয়। অধিক দূর গড়াইলে হয় ত দুইটি মিষ্ট বচন এবং স্বামিদর্শনসুখলাভ হইতেও বঞ্চিত হইয়া সধবাবস্থায় বৈধব্যযন্ত্রণা বহন করিতে হইবে। অগত্যা দুই দিনের সাধনাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া আবার পূর্ব্ববৎ ভাব অবলম্বন না করিলে চলে না। অভ্যাসবশতঃ পুরুষের অন্যানুরক্তি স্ত্রীর নিকট তেমন গুরুতর কিছুই নহে। ইংরাজ স্ত্রীর আমাদের স্ত্রী অপেক্ষা স্বাধীনতা এবং ক্ষমতা আছে। তাঁহাদের প্রেমের সহিত বিশেষরূপে সম্মানের ভাব জড়িত। প্রেমের মূল নিয়মে আঘাত এই জন্য ইংরাজ স্ত্রীর অসহ্য। সেখানে আঘাত পড়িলে তাঁহার সমস্ত সম্মানে আঘাত পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে অবরোধপ্রথা ত সম্মান-প্রমাণ নহে, প্রেমের একনিষ্ঠতা পুরুষের পক্ষেও নিতান্ত আবশ্যক। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে দম্পতির দৃঢ় বন্ধনও ছিঁড়িয়া যায়। সুতরাং আমাদের অভিমানে চোখের জলের যেটুকু রস থাকে, পাশ্চাত্য অভিমানে সকল সময়ে তাহা না থাকিতেও পারে। এ দেশে ভাঙ্গা মান দুই চারিটি মিষ্ট কথায় জোড়া লাগে। পাশ্চাত্য দেশে ভাঙ্গিলে গড়া তত সহজ নহে। স্ত্রী পুরুষ কাহার পক্ষে কোন্‌টা কত দূর সুবিধা অসুবিধা স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু ইহা হইতে সামাজিক অবস্থাভেদে প্রেম-ভাবের বিভিন্নতা সহজেই উপলব্ধি হয়। বিভিন্ন সমাজের কাব্যও তাই স্বতন্ত্র ভাবের।

পাশ্চাত্য সমাজের সহিত আমাদের সমাজের খুঁটিনাটি কোথায় কিরূপ প্রভেদ জানি না, কিন্তু প্রধানতঃ মুক্ত ভাবেই বোধ করি এ দেশের সহিত পশ্চিমের অনৈক্য। আমাদের বদ্ধ অবরোধ এবং নিশ্চেষ্ট সুখই জীবনের প্রধান উপভোগ। পাশ্চাত্য দেশে অবিশ্রান্ত স্বাধীন উদ্যম। সুতরাং সহজেই বিলাসের দিকে আমাদের গতি। স্বাধীনতা-প্রিয় পাশ্চাত্য জাতির প্রেমে সুগভীর সম্মানের প্রতিষ্ঠা—প্রেমকে সে জাতি লঘুভাবে দেখিতে পারে না। আমরা প্রেমকে ততটা সম্মান দিই না। তবে বৈষ্ণব কবির নিকট প্রেমের মর্য্যাদা আছে।

তাহা হইলে বৈষ্ণব কবির রাধাকৃষ্ণের প্রেম আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। দাম্পত্য-প্রণয় না হইলেও প্রেমের সম্মানের তারতম্য কতকটা বুঝা যায়। রাধিকা কৃষ্ণের

প্রতি একান্ত অনুরক্তা, কৃষ্ণের জন্য তাঁহাকে কুলে শীলে জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণ ত সেরূপ একনিষ্ঠ নহেন। বার বার প্রেমের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাধার নিকট অপরাধী হইয়াছেন, তবুও রাধা ক্ষণিক অভিমানের পর কথা না কহিয়া থাকিতে পারেন না। রাধার কথাবার্ত্তায় বা ভাবভঙ্গীতে মর্ম্মাহতা পাশ্চাত্য রমণীর তেজভাব বড় নাই। তবে বৈষ্ণব কবির প্রেমে সম্মানের গভীরতা কোথায়? কিন্তু এইখানে একটি কথা আছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বৈষ্ণব কবি কি ভাবে দেখিতেন? বৈষ্ণব কবির কৃষ্ণ এই বিপুল সংসারের পালনকর্ত্তা। রাধা তাঁহার সৃষ্টি। অসীমের প্রেম পরিমিত আত্মার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে পারে না, বিপুল সংসারের সর্ব্বত্রই ত তাঁহাকে প্রেম বিতরণ করিতে হইবে। রাধার কিন্তু কৃষ্ণে সম্পূর্ণ তৃপ্তি। রাধার অভিমান কেবল কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে না পারিয়া। কিন্তু এ আধ্যাত্মিক ভাবে দেখিলে কিছুই বুঝা যায় না। একটু নামাইয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে আবার বৈষ্ণব কবির উদ্দেশ্যের অবমাননা করা হয়। সকল বৈষ্ণব কবিই যে আধ্যাত্মিক ভাবে তন্ময় হইয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নাও হইতে পারে, কিন্তু তাঁহারা হয় ত পূর্ব্বকবিদিগের পদানুসরণ করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু উচ্চ ভাবেও প্রেমের সম্মানভাব কতকটা বুঝা যায়। সসীমের ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অসীমও বাঁধা পড়িয়াছে; ইহা কি সামান্য মর্য্যাদা? তবে প্রেমের ত্রুটি করিয়া কৃষ্ণ সমস্ত জগৎ উপেক্ষা করিয়া রাধার মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে পারেন না। রাধার তাহাতে তৃপ্তি না হইতে পারে, নাচার।

কিন্তু অসীমে না গিয়াও বৈষ্ণব কবির প্রেমের সম্মানভাব দেখা যায়। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে। সম্মানভাব এ সাহিত্যে যদি না থাকিবে, তবে এত প্রেমের গান কেন? আমরা চণ্ডীদাসের একটি গান হইতে বৈষ্ণব প্রেমসম্মান দেখাইতেছি। রজকিনীকে তিনি যখন প্রেম জানাইয়াছেন, তখন বিশেষ করিয়া বুঝাইয়াছেন, কামগন্ধ নাহি তায়। এইখানেই প্রেমের সম্মানভাব পরিস্ফুট। যেখানে আধ্যাত্মিকতা এমন প্রবল, সেখানে একনিষ্ঠতার অভাব হইতেই পারে না। সুতরাং বৈষ্ণব কবি প্রেমের একনিষ্ঠ সম্মান বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহেন। একনিষ্ঠতাই তাঁহার লক্ষ্য।

রাধাকৃষ্ণের কাহিনী সমাজক্ষেত্রে কতকটা হয় ত লাগান যাইতে পারে। রমণীর প্রেমে বদ্ধ হইয়া সংসারের সকল কাজকর্ম্মে পুরুষ উদাসীন হইতে পারে না। বাস্তবিক প্রেমের ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতা নহে। কিন্তু সে কথা অস্বীকার করিতেছে কে? পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সহিত এ কথার যোগই বা কোথায়? একনিষ্ঠতা আবশ্যক। তাহা ত সঙ্কীর্ণতা নহে। প্রেম বিতরণে একনিষ্ঠতার হানি হয় না। প্রেমের ছলনা করিয়া

যথেচ্ছাচারিতা অবলম্বনই একনিষ্ঠতার হানিকর। এইখানেই প্রেমের সম্মান লোপ। আমাদের সামাজিক নিয়মে ইহার বাধা নাই।

কিন্তু সমাজ-নিয়মের বাধা না থাকিলেও প্রাচীন ভারতে পুরুষের একনিষ্ঠতার মহত্ত্ব উজ্জ্বল চিত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঋষি-কবির রামচন্দ্রের চরিত্রই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। রামচন্দ্র দায়ে পড়িয়া সীতাকে বনবাস দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাধ্বী পতিব্রতার অকপট প্রেমের প্রতি ভুলিয়াও অবজ্ঞা প্রকাশ করেন নাই। তিনি যজ্ঞ করিলেন—সুবর্ণের সীতা নির্ম্মাণ করাইয়া। তপোবনের বিজন নীরবতার মধ্যে এই সংবাদ জানকীর নিরাশ হৃদয়ে কি সান্ত্বনা দিয়াছিল! রামায়ণে প্রেমের অন্যান্য দিক্‌ও প্রদর্শিত হইয়াছে; যেমন—স্নেহ, ভক্তি, সৌহার্দ্দ। সে সকল দিক্ আলোচনার আমাদের এখন তেমন আবশ্যক নাই। আমরা কেবল বলিতে চাহি যে, মহৎভাবের প্রতি সম্মান সর্ব্বত্রই। প্রাচ্য বলিয়াই মানব-চরিত্র অধঃপতিত নহে।

স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ভাব হইতেই বোধ করি প্রেমের সম্মানভাবের উৎপত্তি। পাশ্চাত্যদেশে রমণীর প্রতি সম্মান-প্রদর্শন বহুদিন হইতে বিবিধ উপায়ে অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। আমরা স্ত্রীজাতিকে অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া দেখি, পাশ্চাত্যজাতি উত্তমার্দ্ধ বলিয়া গণ্য করেন। মধ্য যুগে Chivalryর প্রসাদে পাশ্চাত্যেরা রমণীকে যে ঊর্দ্ধে উঠাইয়াছেন, শুনিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে পাশ্চাত্যজাতির হৃদয়ের আন্তরিকতা প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্যদেশে সেই অবধি রমণীর সম্মান বাড়িয়া উঠিয়াছে। তবে মধ্যযুগের অনেক বাহ্য অনুষ্ঠান এখন সরিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে অন্ধকূপে অসূর্য্যম্পশ্যা করিয়া রাখার উপরেই রমণীর সম্মান নির্ভর করে। পুরুষজাতির সহিত মুখদেখাদেখি না থাকায় সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের সম্মান বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত। পাশ্চাত্য সমাজে স্ত্রীপুরুষে মিশামিশি আছে, উভয়েরই তাহাতে সংযত হইয়া চলিতে হয়। বলবান্ পুরুষ রমণীকে সমধিক সম্মান করিতে শিখে, স্ত্রীজাতিও পুরুষের সহিত আলাপাদিতে অনেক উন্নত শিক্ষা লাভ করে। স্ত্রীর প্রতি বিশেষ সম্মান পাশ্চাত্য সমাজের শিরায় শিরায় না প্রবেশ করিলে সেখানে প্রেমের সংযত স্বাধীন চর্চ্চা এত দিন চলিত না। আমাদের সমাজে শুভদৃষ্টি পর্য্যন্ত রূপ, গুণ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সকলই ত পরের মুখে। পূর্ব্বরাগমূলক দাম্পত্যবন্ধন যে সমাজের অস্থিমজ্জায়, সে সমাজে স্ত্রীপুরুষের স্বাস্থ্যকর সম্মিলন অপরিহার্য্য। ভাল মন্দের কথা হইতেছে না—ইহা আবশ্যক, না হইলে নয়।

পূর্ব্বরাগ মানব-প্রকৃতির অস্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। বোধ করি, অসূর্য্যম্পশ্যারও প্রেম-বিষয়ে স্বাধীনতা ভাল লাগে। এই প্রাচ্যদেশেও ত কাব্যে পূর্ব্বরাগবাহুল্য দেখা যায়। কিন্তু সামাজিক অবস্থাভেদে পূর্ব্বরাগের ভাবভঙ্গী পাশ্চাত্য হইতে আমাদের

স্বতন্ত্র। স্ত্রীপুরুষের মেলামেশার উপর এ সকল খুঁটিনাটি প্রভেদ অনেকটা নির্ভর করে। বৈষ্ণব কবির কতকগুলি পূর্ব্বরাগের গান আছে—বড়ই সুন্দর, ভাবময়। ইদানীন্ত বঙ্গ-কবিরাও পূর্ব্বরাগ বর্ণন করিয়াছেন। তাহা যেমনই হৌক, মানবপ্রকৃতির পরিচয় প্রদান করে। দাম্পত্য-বন্ধন পূর্ব্বরাগমূলক না হইলেও প্রেম গভীর হইতে পারে দেখাইয়া যাঁহারা পূর্ব্বরাগকে সামাজিক শিক্ষার ফল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, দৃঢ় সমাজবন্ধনের বহিঃক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করিলেই পূর্ব্বরাগের স্বাভাবিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে বাহুল্য প্রমাণের আবশ্যক নাই।

প্রাচ্য সাহিত্যের সম্পূর্ণ নিজ-সৃষ্টি অভিসার। পাশ্চাত্য দেশে অভিসার নাই। সঙ্কেতস্থানে প্রণয়ী প্রণয়িনীর মিলন পাশ্চাত্য সাহিত্যে মিলিতে পারে, কিন্তু আমাদের অভিসার এ শুষ্ক সম্মিলন নহে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, ধরণী অন্ধকার, ক্ষণে ক্ষণে বিজলী হানিতেছে, একাকিনী রাধা বিজন বনের মধ্য দিয়া চঞ্চলচরণে চলিয়াছেন। আমাদের কবির অভিসারে সমস্ত প্রকৃতি ঘনাইয়া আসে; অন্তরের উপর বহিঃপ্রকৃতির ঘন নিবিড় ছায়া পড়ে। এ কবিত্ব প্রস্ফুটিত করিতে প্রাচ্য কবিই পারদর্শী। এ শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বারিধারা, মেঘের উপর মেঘ, অন্ধকারের উপর অন্ধকার, প্রবল বর্ষা অন্য দেশের কবি বুঝিবেন কিরূপে? আমাদের বর্ষায় আকুলতাময় কদম্ব-সৌরভ, সচকিত হরিণ-দৃষ্টি, মধুর কেকাধ্বনি; তাহার আনন্দ আমাদের প্রাচ্য কবিই বুঝেন। এমনটি কি আর অন্য দেশে আছে? সেই জন্যই ত আমাদের বিরহ, আমাদের অভিসার পাশ্চাত্য সাহিত্যে দুর্লভ।

কিন্তু কেবল মাত্র প্রকৃতিই কি আমাদের অভিসারের কারণ? সমাজের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই? এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা সুকঠিন। এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, প্রকৃতির অভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। আমাদের জাতীয় ভাব এবং সামাজিক অবস্থাও হয় ত অভিসার ভাবের কতকটা অনুকূল। নহিলে, শুদ্ধ মাত্র প্রকৃতির প্রভাবে যে এই বিষয় দেশীয় কাব্যে এত প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা বিশ্বাস করিতে একটু সময় লাগে এবং সন্দেহ বোধ হয়। বিরহের মত অভিসার ত সার্ব্বজনীন নহে। জানি না, অভিসারের মধ্যে সমাজ-নিয়মের ব্যতিক্রম-প্রয়াস লক্ষিত হয় কি না। কিন্তু ইহাতে ত স্বাধীন প্রণয় কতকটা মনে হয়। আর অভিসারে রমণীর প্রাধান্য দিয়া কবিত্ব অনেকটা ফুটিয়াছে। বৃষ্টি বজ্র বিদ্যুতের মধ্যে অন্ধকার পথে একাকিনী রমণীর ভীত চকিত ভাব বড়ই সুন্দর। পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থায় এ ভাব কিরূপ খুলে না খুলে বলা সহজ নহে।

এখন সে কথা থাক্। কাব্যে যে দেশের যাহা যত থাকুক না থাকুক, বিরহ অভিমান প্রভৃতি বিবিধ ভাব অল্পবিস্তর আছে সকল দেশেই। প্রেমের এ সকল অবস্থা

আলোচনা কিন্তু পাশ্চাত্য অপেক্ষা প্রাচ্য দেশে ভালরূপ হইয়াছে। পাশ্চাত্য কাব্যে প্রেমের অপর কতকগুলি অবস্থা সমালোচিত হইয়াছে। সে অবস্থাগুলি সাধারণতঃ কাহিনী-বৈচিত্র্যের দিকে। প্রেমের দিক্ দিয়া মানব-চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটনচেষ্টা এ দেশে যে হয় নাই এমন নহে ; সংস্কৃত কাব্য এবং নাটকে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যে কিন্তু তাহার সমধিক বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে ভারতের প্রাচীন কবিরা প্রেমের যে গুটিকত আদর্শ চরিত্র গড়িয়াছেন, তাহা কোনও দেশের কোনও চরিত্র অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু পাশ্চাত্য বিবিধ বৈচিত্র্য আমাদের সাহিত্যে নাই স্বীকার্য্য। কত বিভিন্ন অবস্থায় মানবের মনে কত বিভিন্ন ভাব হইতে প্রেম জন্মায়, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাহা সুচিত্রিত। এই প্রেম সংঘটনের মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রীপ্রকৃতি নীরবে কি ভাবে কার্য্য করে, উভয় জাতির নিজের মধ্যেও কত প্রকৃতিগত শিক্ষাগত বৈষম্য নানা দিক্ হইতে আসিয়া নানা ভাবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার অপর জাতির সহিত সম্মিলিত হয়, এ সকল পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিচিত্র বর্ণে পরিস্ফুট। স্ত্রীপুরুষের শিক্ষাগত এবং স্বাভাবিক মনোবৃত্তি সেখানে তন্ন তন্ন বিশ্লেষিত। আমাদের এ বিশ্লেষণ পাশ্চাত্য অপেক্ষা বিশেষ অসম্পূর্ণ।

পাশ্চাত্য প্রেমচর্চ্চার সহিত আমাদের কোথায় যেন মূল প্রণালীগত প্রভেদ আছে মনে হয়। নিশ্চিত বলিতে পারি না, কিন্তু আমার বোধ হয়, পাশ্চাত্য প্রেমচর্চ্চা অনেকটা ইংরাজীতে যাহাকে Ideal বলে। আমাদের প্রেমচর্চ্চাকে সে হিসাবে কতকটা অনুভূতিমূলক বলা যাইতে পারে বোধ করি। পাশ্চাত্য সাহিত্যেও অনুভূতির অভাব নাই, তবে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য তুলনা করিলে প্রাচ্যকেই বিশেষরূপে অনুভূতিমূলক বলা যায়। এ সম্বন্ধে সকল খুঁটিনাটি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই ; মোটামুটি বাহিরে বাহিরে যাহা মনে হয় বলিয়াছি মাত্র। বৈষ্ণব কবির সহিত তুলনা করিলে আরও দেখা যায়, পাশ্চাত্য প্রেমে এ দেশের মত সাধনার কথা বড় নাই। আমাদের বৈষ্ণব কবির প্রেমের বিশেষ সাধনা আছে, তাহাতে অনেকটা ধর্ম্ম। পাশ্চাত্য প্রেমের কবিতা আর এক ধরণের। তাহা ধর্ম্ম নহে।

কিন্তু পাশ্চাত্য সাহিত্যে আমাদের শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির কাহার সহিত প্রেমের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহা যেরূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিশ্লেষিত হইয়াছে, আমাদের সাহিত্যে তাহা হয় নাই। পাশ্চাত্য সমালোচনপ্রণালীর সূক্ষ্মদর্শিতা বাস্তবিক প্রশংসনীয়। প্রেমের এই বিশ্লেষণ ব্যাপারের মধ্যে বিজ্ঞান দর্শনের কতটুকু কি সংস্রব আছে না আছে জানি না, কিন্তু বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও প্রেমের এ জটিল সম্বন্ধ সাদাসিধা একরূপ বুঝা যায়। প্রেম সম্পূর্ণ একই বৃত্তির সহিত সম্বদ্ধ নহে। তাহা

কতকাংশে অনুভূতিমূলক, কতক বা অন্যান্য মনোবৃত্তির সহিত জড়িত, আধ্যাত্মিক দিক্‌ও একটা আছে। ব্যক্তিবিশেষের প্রেমে আবার প্রকৃতি অনুসারে বিশেষ বিশেষ বৃত্তির সমধিক প্রাধান্য দেখা যায়। কাহারও প্রেম হয় ত অনেকটা ইংরাজীতে যাহাকে emotional বলে, কাহারও বা intellectual। অবিকল ভাবপ্রকাশক বাঙ্গলা প্রতিশব্দ অভাবে ইংরাজী কথাই আমাদিগকে ব্যবহার করিতে হইল।

প্রাচীন ভারতে প্রেমের intellectual অনুশীলন অনেকটা হইয়াছিল বোধ হয়। কিন্তু এ দেশে প্রেমানুশীলন ঈশ্বর সম্বন্ধে। সেই জন্যই বহু পূর্ব্বে অন্যান্য দেশ যখন অরণ্যের স্তব্ধ অন্ধকারমধ্যে বিলীন হইয়া ছিল, তখন ভারতের কবি নিষ্কাম ধর্ম্মের নাম লইয়া অমর সঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যে প্রেমের বিশ্বজনীনতা দেখা যায়, তাহাও ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত বলিয়াই। দেবতাবর্জ্জিত অথচ দেবভাবময় প্রেম পাশ্চাত্য সাহিত্যে সুপরিস্ফুট। পাশ্চাত্য প্রেম মানব-সন্তানকে মনুষ্যত্বে টানিয়া তুলে। ঈশ্বরপ্রেম আমাদিগকে অনন্তের দিকে ত টানেই। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে বলিয়াই আমাদের প্রাচ্য সাহিত্যে এমন প্রেমানুশীলন। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিষয় নহে। সেই জন্য তাহার চর্চ্চা সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে পারি না। আমরা প্রধানতঃ স্ত্রীপুরুষগত প্রেম লইয়াই আলোচনা করিয়া আসিতেছি।

মানবপ্রেমের মধ্যেও স্নেহ ভক্তি প্রভৃতি নানা বিভাগ উপবিভাগ আছে। সে সকল আমরা এ প্রবন্ধে বাদ দিয়াছি। বৈচিত্র্য এবং রহস্য স্ত্রীপুরুষের প্রেমের মধ্যেই সমধিক ব্যক্ত। সেই জন্যই সম্ভবতঃ এ প্রেম সম্বন্ধে যত কাব্য রচিত হইয়াছে, স্নেহ ভক্তি বিষয়ে তত হয় নাই। বাস্তবিক, স্ত্রীপুরুষ-প্রেমের প্রগাঢ়তা, সুখ দুঃখ, জ্বালা, ভয়, ভ্রান্তি, সকলই চূড়ান্ত। মনোবৃত্তির এরূপ অনুশীলন প্রেমের অন্যান্য বিভাগে বোধ করি নাই। এই এক প্রেমাকর্ষণে অতি ক্ষুদ্রভাবের মধ্য হইতে ধীরে ধীরে যেরূপে সুবৃহৎ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ হইয়াছে, দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। সমগ্র মানবজাতির সভ্যতার ইতিহাসের সহিতও ইহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সে সকল বিস্তারিত আলোচনার স্থান অবশ্য এ নহে।

প্রেমের ঐতিহাসিক বিকাশ আলোচনা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য। মানবজাতির বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া প্রেমের আদর্শ ক্রমে ক্রমে কত পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিয়াছে এবং এই ধারাবাহিক পরিবর্ত্তনের মধ্যে অন্তর্নিহিত কি ভাবের ক্রমাভিব্যক্তি দেখা যায়, তাহা প্রাচ্য সাহিত্যে কোথাও পরিস্ফুট নহে। পাশ্চাত্য জগতে ক্ষুদ্রতম কীটাণুর প্রেম পর্য্যন্ত আলোচিত হইয়া মানবপ্রেমের ভাব বিশ্লেষিত হয়। ইহাতে বিজ্ঞানের সংস্পর্শ থাকিতে পারে, কিন্তু ভাব আলোচনার পক্ষে সুবিধা বৈ অসুবিধা হয় না।

সেখানে এখন প্রতি দিন নানা দিক্ হইতে প্রেমভাবের নূতন নূতন বিশ্লেষণ হইতেছে। আমরা হয় ত এক দিক্ দিয়া মাত্র দেখিয়াছি ; আরও কত দিক্ আছে। আমরা ত আর প্রেমকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া বসিয়া নাই। প্রেমের রহস্য নিঃশেষ করা অসম্ভব। পুরাতনের মধ্য হইতে দিন দিন নব নব বৈচিত্র্য বিকশিত হইয়া তাহাকে চিরনবীন করিয়া রাখিয়াছে। বৈজ্ঞানিক এক দিক্ দিয়া তাহার অনুশীলন করিতেছেন, দার্শনিক আর এক পথে, কবির আবার স্বতন্ত্র পথ। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সেরূপ কোন পথই হয় ত অবলম্বিত হয় নাই। কতকটা সমাজ এবং কতকটা সাহিত্য মিলাইয়া প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য প্রেমালোচনার তুলনা এবং চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। নানা কারণে বিস্তর অসম্পূর্ণতা এবং ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ দার্শনিক আলোচনার এ প্রবন্ধে সম্পূর্ণ অভাব। সুধী পাঠকেরা নিজগুণে সম্পূর্ণ করিয়া লইবেন ভরসায় এইখানেই উপসংহার করি।
['ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৬ ও আষাঢ় ১২৯৭]

স্ত্রী ও পুরুষ

স্ত্রী এবং পুরুষের সম্বন্ধ, ক্ষমতা ও অধিকার লইয়া কিছু দিন হইতে নব্য বঙ্গে একটা আন্দোলন উঠিয়াছে। এ আন্দোলনের আরম্ভ আমাদের দেশে নহে ; পাশ্চাত্য দেশেই স্ত্রীপুরুষের ক্ষমতা ও অধিকার লইয়া প্রথম তর্ক উঠে। তাহারই দু'একটি ক্ষীণ তরঙ্গ বঙ্গোপকূলে আসিয়া আঘাত করিয়াছে। এখন এক দল লোক বলিতেছেন যে, স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়েই যখন বিধাতার সৃষ্টি, তখন উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা ও অধিকারভেদ থাকিতে পারে না। কারণ, তাঁহারা বলেন, একজনকে ক্ষমতাশালী এবং অপরকে দুর্ব্বল করিয়া গড়িলে ঈশ্বরের ন্যায়দণ্ডের কলঙ্ক রটে। আর এক দল বলেন, সৃষ্টির সামঞ্জস্য রক্ষার্থে স্ত্রী এবং পুরুষের ক্ষমতা ও অধিকারভেদ আবশ্যক, মঙ্গলময় বিশ্বপিতার ইহাতে পূর্ণ মঙ্গল ভাবই প্রকাশ পায়। শেষ পক্ষের মতে, উভয়ের ক্ষমতা ও অধিকার সম্পূর্ণ এক হইলে ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসারে সুশৃঙ্খলাপেক্ষা বিশৃঙ্খলারই প্রাদুর্ভাব হইত। এক পক্ষ স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণের উল্লেখ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতাপ্রসূত বিশৃঙ্খলার অমূলকত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পান ; অপর পক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বাভাবিক আকর্ষণের পবিত্রতা লোপের আশঙ্কা করেন। সম্প্রতি মহিলারাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, এবং পুরুষ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিস্তর সন্দেহ প্রকাশ করিয়া স্বজাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং জয়গর্ব্ব অনুভব করিতেছেন। পুরুষ জাতির পক্ষেও কোন কোন পাশ্চাত্য মহিলা দুই চারি কথা বলিয়াছেন স্বীকার করি, তেমন অনেক পুরুষ স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ

করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে যুক্তি এবং সত্যের উপর নির্ভর ছাড়িয়া মতবিশেষের পক্ষপাতিতা করিবার কোনও কারণ নাই। আসল কথা, স্ত্রী এবং পুরুষের কতকগুলি অধিকার, কতকগুলি ক্ষমতা যেমন সাধারণ, সেইরূপ কতকগুলি আবার স্বতন্ত্র। পুরুষ অথবা স্ত্রী কেহই একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিত নহে। পুরুষ জাতির অনেক গুণ আছে, যাহা স্ত্রীজাতির মধ্যে সহজে মিলে না; স্ত্রীজাতিরও এমন গুণ আছে, যাহা পুরুষজাতির মধ্যে দুর্লভ। কিন্তু ক্ষমতাবিশেষের মায়ায় পড়িয়া স্ত্রী কন্যাদিগকে অথবা স্বামী পুত্রকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহে কে? শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কি উপায় এই? তর্ক করিয়া বা প্রবন্ধ লিখিয়া কেহ কাহাকেও স্বাভাবিক ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যেখানে যাহার যতটুকু শ্রেষ্ঠত্ব, অল্পদিন মধ্যেই তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কূট তর্কে অবশ্য প্রমাণ করা যায় না যে, কোথায় কাহার কতটুকু শ্রেষ্ঠত্ব; কিন্তু হাতে কলমে এবং অপক্ষপাতী যুক্তির সাহায্যে উভয় জাতিরই গুণাগুণ বুঝা যায়। যদি এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যে বিদ্যা বহুদিন হইতে বহুসংখ্যক স্ত্রী অথবা পুরুষের মধ্যে অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতেও পুরুষ অথবা স্ত্রীলোকেরা সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাহা হইলে কাল, সংখ্যা এবং পারদর্শিতা তুলনা করিয়া উক্ত বিদ্যা-বিষয়ে পুরুষ অথবা স্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হওয়া যাইতে পারে। নহিলে, অভিমান, তার কণ্ঠ অথবা কষ্টলব্ধ দু'একটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ হইতে কিছুই প্রমাণ হয় না। আর মস্তিষ্কের ভার, পায়ের গড়ন, স্বরের গাম্ভীর্য্য অথবা তাহার অভাব কোনও বিশেষ শক্তির প্রমাণ কি না, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে স্থিরীকৃত না হইলে আপাততঃ এই সকল লক্ষণ বিচার করিয়া স্ত্রীপুরুষের কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা অসম্ভব। তবে কোন কোন বিজ্ঞানবিদ্ বিদেশীয় পণ্ডিত বিস্তর পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন বটে যে, সাধারণতঃ স্ত্রী এবং পুরুষের মস্তকের গঠন বিভিন্ন, এবং পুরুষ-প্রকৃতি স্ত্রী বা স্ত্রী-প্রকৃতি পুরুষের মস্তক প্রায় পুরুষ বা স্ত্রীর মত হইয়া থাকে। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত হইতেও যে স্ত্রী-পুরুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে একেবারে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে, এমন বোধ হয় না। সুতরাং ফল দেখিয়া বিচার করাই যুক্তিসঙ্গত। তবে আমরা যে এ বিষয়ে একেবারে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব, এরূপ ভরসা নাই, সত্য এবং যুক্তির অনুসরণ করিয়া যথাসাধ্য স্থির সিদ্ধান্তে আসিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে মাত্র। বিষয়বিশেষে স্ত্রী এবং পুরুষের কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হইলে অপরের ক্ষুব্ধ হইবার কারণ নাই। কারণ, এ সংসারে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ কাহারও কপালে প্রায় ঘটে না।

হৃদয়ের স্নেহ দয়া প্রভৃতি বৃত্তি বিষয়ে স্ত্রীজাতিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। অনেকে বলেন, বহির্জগতের সহিত তেমন সংঘর্ষে আসিতে হয় না বলিয়া স্ত্রী-জাতির মধ্যে এই

গুণগুলি সমধিক পরিস্ফুট, পুরুষের মত বাহিরের সহিত ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইলে স্ত্রীলোকের কোমল বৃত্তিগুলি এত দিনে কঠিন হইয়া আসিত। ধারাবাহিক সংগ্রাম-সংঘাতে কোমল বৃত্তিগুলি যে কঠিনতা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাই বলিয়া যে নারীজাতি স্নেহ দয়া প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ, এমন বিশ্বাস হয় না। প্রকৃতি রমণীর হস্তে গুরুতর সন্তানপালন ভার অর্পণ করিয়াই নারীহৃদয়ে স্নেহের উৎস স্থাপন করিয়াছে। তবে অবশ্য সকল রমণী সমান স্নেহময়ী নহে ; কোমল হৃদয়ের মধ্যেও মধ্যে মধ্যে পাষাণের পরিচয় পাওয়া যায়। পতিঘাতিনী সন্তানত্যাগিনীও সংসারে মিলে ত। কিন্তু সাধারণতঃ রমণী স্নেহময়ী। পুরুষ-হৃদয়ে স্নেহ দয়া, এ সকল আছে বটে, তবে নানা কারণে তাহার হৃদয় রমণীর তুলনায় কঠিন। কিন্তু কঠিন বলিয়া নিষ্ঠুরতাই তাহার প্রাণ নহে। বাহিরের সহিত সংঘাতে পুরুষজাতির সমস্ত মনোবৃত্তির চর্চ্চা হয়, বুদ্ধি বিবেচনাশক্তি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, রমণীর মত গুটিকত কোমল বৃত্তিই বিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে না, সেই জন্য তাহার প্রকৃতি বিশেষরূপে কোমল ঠেকে না। শৈশবের খেলাধূলা হইতেই রমণী-হৃদয়ের স্নেহবৃত্তি বিকশিত হইতে থাকে। যে ভালবাসার ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠা সন্তানে, তাহার সূচনা সামান্য মৃৎপুত্তলিকায়। কেহ কেহ বলেন, ইহা সামাজিক শিক্ষার ফল, বালক বালিকার প্রকৃতি আসলে এক। কিন্তু আমার বোধ হয়, প্রকৃতি এক হইলে যুগযুগান্তর হইতে বালক বালিকার মধ্যে স্বতন্ত্র বৃত্তি-উত্তেজক খেলা চলিয়া আসিতে পারিত না।

বিশেষ যত্নের সহিত পৌরুষিক শিক্ষা দিয়া আসিলে রমণীকে কালে অসম্পূর্ণ পুরুষ করিয়া তোলা যাইতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবই ত প্রকৃতি। শিক্ষার প্রণালী অনুসারে প্রকৃতির উৎকর্ষ অপকর্ষ সাধিত হয় মাত্র। প্রথমেই কিছু আর এইরূপ সমাজ-বন্ধন ছিল না, দেশবিশেষের অবরোধ প্রথাও ছিল না, আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাও ছিল না ; কিন্তু পুরুষপ্রকৃতি হইতে স্ত্রীপ্রকৃতি বোধ করি আসৃষ্টি স্বতন্ত্র। তাহার মূল কারণ স্পষ্টই পড়িয়া আছে—সন্তান গর্ভে ধারণ। সন্তান যেমন রমণীহৃদয়ের স্নেহবৃত্তির পুষ্টিসাধন করে, সেইরূপ আপনার দিকে বিশেষরূপে টানিয়া রাখিয়া সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে রমণীকে পুরুষের প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে দেয় না। শারীরিক দুর্ব্বলতা যেমন রমণীর পুরুষের সমকক্ষ হইবার এক বিঘ্ন, সন্তানপালনও সেইরূপ। সন্তানের জন্য জননীকে বাঁধা পড়িতেই হইয়াছে। তর্ক করিয়া ত আর প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করা যায় না। সমস্ত জীবজগতে প্রকৃতির এই নিয়ম।

কোমল বৃত্তিগুলিই প্রবলা বলিয়া রমণীর স্থান পুরুষের পার্শ্বে। শারীরিক বলে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে ত কাহারও সন্দেহই নাই, মানসিক শক্তিতেও রমণী পুরুষের নিম্নে। মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইলে স্ত্রীজাতি পুরুষের সহধর্ম্মিণী ও অনুবর্ত্তিনী না হইয়া পুরুষই

স্ত্রীর অনুবর্ত্তী হইত। আমার বোধ হয়, শরীরের ন্যায় স্ত্রীজাতির মনও দ্রুত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু পুরুষের মনের মত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। একটা নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত বালক অপেক্ষা বালিকার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখা যায়। খানিক দূর গিয়া কিন্তু রমণীর প্রাখর্য্য প্রশমিত হইয়া আসে, আর ধীর দৃঢ়পদবিক্ষেপে পুরুষ অগ্রসর হইতে থাকে। প্রকৃতির নিয়মই এই যে, দ্রুতগতির সহিত বলক্ষয়ে শ্রান্তি অনিবার্য্য। কদলীবৃক্ষের মত স্ত্রী আগেভাগে বাড়িয়া উঠে, প্রথমে হয় ত পুরুষকে ছাড়াইয়াও যায়, তাই বলিয়া চিরদিন আগে আগে চলিতে পারে না। প্রকৃতিই স্ত্রীকে সে বল হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বা পুরুষের অনুকরণে কোন বিশেষ কার্য্য করিয়া এ স্বাভাবিক শক্তি উপার্জ্জন করা চলে না।

তাই বলিয়া কি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে? বিদ্যাচর্চ্চায় অসম্পূর্ণ স্ত্রী কালে সম্পূর্ণ হইয়া দাঁড়ায়। কেবল মাত্র দুই চারিখানি জ্যামিতি এবং ইংরাজী ভাষার গ্রন্থ পাঠেই অবশ্য বিদ্যাচর্চ্চা হয় না। যাহাতে হৃদয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি হয়, এরূপ শিক্ষা পুরুষের মত স্ত্রীরও আবশ্যক। স্বাভাবিক শক্তির তাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়। মানসিক শক্তিতে স্বভাবতই পুরুষ স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্ত্রীজাতির হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন অনাবশ্যক নহে। বরঞ্চ শিক্ষার সহিত নারীজাতি পুরুষের যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইবার যোগ্যতা লাভ করে। স্ত্রীরও ত পুরুষের মত হৃদয় আছে, মস্তিষ্ক আছে, কেবল মাত্র প্রভেদ কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতায় বৈ ত নয়। সে জন্য একজনকে ক্রমাগত চাপিয়া রাখা কর্ত্তব্য নহে। উভয়ের মধ্যে একেবারে আকাশ পাতাল প্রভেদ জন্মাইলে পরস্পরকে না বুঝিবার জন্য সাংসারিক অসুখ অশান্তি ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আমাদের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এ বিষয়ে অধিক কথা বলা বাহুল্য।

কিন্তু মানসিক শক্তি সম্বন্ধে পুরুষের স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ কি? উদ্ভাবনী শক্তিতেই বোধ করি পুরুষজাতির এ ক্ষমতা বিশেষ প্রকাশ পায়। উদ্ভাবনী শক্তি যে নিতান্তই শিক্ষার উপর নির্ভর করে না, তাহার প্রমাণ সেক্সপীয়র, বার্ন্‌স্‌, কিট্‌স্‌, ফ্যারাডে এবং অন্যান্য আরও অনেক মিলে। তবে পুরুষপরম্পরাগত জাতীয় শিক্ষার ফল বলিলে নাচার। কিন্তু এ যুক্তি দ্বারাও স্ত্রীজাতিকে কত দূর উর্দ্ধে উঠান যায় সন্দেহ। মার্কিন মহিলাই ত দুঃখ করিয়াছেন যে, রমণীগণ কত দিন হইতে পিয়ানো টুংটাং করিয়া আসিতেছেন, সুগায়িকারও অভাব নাই, এত দিনেও ত কৈ একজন মোজার্ট বিটোভেনের আবির্ভাব হইল না। য়ুরোপ আমেরিকায় বহুসংখ্যক রমণী চিত্রবিদ্যা বা ভাস্করবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন; কিন্তু র‍্যাফেল্‌, টিশিয়ান্‌, থরওয়াল্‌ড্‌সেন অথবা বর্ত্তমান কালের সুবিখ্যাত চিত্রকর এবং ভাস্করদিগের ন্যায় রচনা কয় জনের? মার্কিন গ্রন্থকর্ত্রী দেখাইয়াছেন, পাচিকা অপেক্ষা

পাচক রন্ধনবিদ্যায় নিপুণ, প্রথম শ্রেণীর স্ত্রী-দরজী অপে[redacted] সুন্দর করে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ [redacted] “সহকারিণীরূপে স্ত্রীজাতির যতই ক্ষমতা প্রকা[redacted] কেন, হৃদয়ের [redacted] মৌলিকতার যেখানে আবশ্যক, সেখানে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে রমণী অক্ষম।” দু’একটি জর্জ এলিয়ট বা সমর্ভিলের উদাহরণ হইতে স্ত্রীজাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয় না।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, আমরা স্ত্রীজাতিকে বুদ্ধিহীনা প্রতিপন্ন করিতে চাহি। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। রমণীর দ্রুত-ধারণা-শক্তির পরিচয় যাঁহারা পাইয়াছেন, তাঁহারা তাহার বুদ্ধির অভাব স্বীকার করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরুষের সহিত সমকক্ষতা করিয়া রমণী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছে, অন্যান্য অনেক কার্য্যেও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে; কেমন করিয়া বলি—স্ত্রীজাতি বুদ্ধিহীনা? রমণীর বুদ্ধি অস্বীকার করা অসম্ভব, কিন্তু মস্তিষ্কের শক্তি পুরুষের মত নহে। এই শক্তি অভাবেই স্ত্রীপ্রকৃতি পুরুষের তুলনায় লঘু। এই শক্তি অভাবে স্ত্রীজাতির মধ্যে সাধারণতঃ সূক্ষ্ম বিবেচনা, গভীর চিন্তা, উদার কল্পনা, সৌন্দর্য্যের গভীর রহস্যে নিমজ্জনশক্তি দেখা যায় না। স্ত্রীজাতির সাজসজ্জার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ দেখিয়া অনেকে আমাদিগকে এখানে অন্ধ ঠাহরাইতে পারেন, কিন্তু সাজসজ্জার পারিপাট্যের সহিত সৌন্দর্য্য আবিষ্করণ বা উপভোগশক্তির সম্বন্ধ অল্পই। আবিষ্করণ অপেক্ষা তবে যে উপভোগশক্তি রমণীর প্রবলা, তাহাতে সন্দেহ নাই। পুরুষের মত গভীরতায় ডুবিতে রমণী প্রায় পারে না। জ্যোৎস্না, নদী, কুসুম, মলয়, স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই ভাল লাগে, তাই বলিয়া উভয়ে ঠিক সমান উপভোগ করে কি না সন্দেহ। বিশেষতঃ দিগন্তবিস্তৃত সাগরহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত গভীর চাঞ্চল্য, বজ্রবিদ্যুন্ময়ী ঝটিকার উন্মত্ত প্রলয়-গাম্ভীর্য্য, এই আসৃষ্টি জগতের প্রবল চিরসংগ্রাম, এ সকল রুদ্রসৌন্দর্য্য রমণী সম্যক্ উপভোগ করিতে অক্ষম। পুরুষের সৌন্দর্য্যোপভোগে যে একটা গভীরতা এবং বিস্তৃতি লক্ষিত হয়, তাহা রমণীর অভাব।

মহিলারা কেহ কেহ আমাদের কথা অস্বীকার করিয়া বলেন যে, ইহা কেবল কথার কথা মাত্র, এ কথার মূলে সত্য নাই। গায়ের জোরে অবশ্য এ বিষয়ে তেমন প্রমাণ দেওয়া যায় না, কিন্তু আমাদের কথার বিরুদ্ধে কেহ যে বিশেষ উদাহরণ সংগ্রহ করিতে পারেন, এমন ভরসা অল্পই। মহিলারা শুধু আমাদের কথা অস্বীকার করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, স্ত্রীলোকেরা যে শারীরিক এবং সামাজিক নানা অসুবিধার মধ্য হইতেও মাথা তুলিয়া মানবজীবনের সমস্ত কার্য্যে, সংসারের সমস্ত কঠোর পরীক্ষায় পুরুষের সমান হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের সংশয় নাই। দেশবিশেষে কোন মহিলা পুরুষজাতির অনুকরণে কোন বিশেষ কার্য্য করিয়াছেন, এইরূপ দুই চারিটি বিক্ষিপ্ত উদাহরণের উপরেই বোধ করি

এই অকাট্য সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ইহার প্রতিবাদ অনাবশ্যক। রমণীর সমাজগঠন, ধর্ম্মসংস্থাপন ত পূর্ব্বে কখনও শুনি নাই। সহধর্ম্মিণীরূপে, সহকারিণীরূপে স্ত্রীর পুরুষের কার্য্যে সহায়তা স্বীকার্য্য বটে। তবে বলবান্ পুরুষজাতি দুর্ব্বল বলিয়া বহুদিন হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছে। তাহা হইতে বোধ করি পুরুষ জাতির অনুদারতা বা অশ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না।

সত্য বলিতে কি, স্ত্রীজাতিকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে পুরুষই। কিন্তু ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার উপর ত আর পুরুষের হাত নাই। প্রকৃতি রমণীকে যে শক্তি দেয় নাই, যত বড় লোক হৌক্ না, মানবে তাহার করিবে কি? বাস্তবিক, সেই জন্য সম্মানাদি প্রদর্শন দ্বারা উর্দ্ধে উঠাইলেও স্ত্রী পুরুষের আশ্রিত। আশ্রিত বলিতে অবশ্য দাসী বুঝায় না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে পুরুষের রমণীকে আশ্রয়দানবৃত্তি স্বাভাবিক। আশ্রয় দিতে না পারিলে তাহার তৃপ্তি হয় না—আপনাকে অসম্পূর্ণ ঠেকে। স্ত্রীরও পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ স্বাভাবিক। এই আশ্রয়দানগ্রহণের মধ্যে প্রভু দাসী ভাব নাই—কেবল প্রেমের নির্ভরের ভাব। বহির্জগতে ইহার তুলনা এক তরুলতার ভাবে দেখা যায়। খেয়াল, অভিমান, অথবা তৃপ্তিলাভেচ্ছাবশতঃ কোন রমণী যদি পুরুষজাতিকে স্ত্রীজাতির আশ্রয় বলিয়া না মনে করেন, নাচার। প্রেমের অটল নির্ভরের ভাব ত আর মুখে গুঁজিয়া দিয়া বুঝান যায় না। কিন্তু সংসারের রাজপথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপুলশক্তি পুরুষকে আঁটিয়া উঠা কোমলাঙ্গিনীদিগের অসাধ্য। রমণীবিশেষ পুরুষজাতির আশ্রয় অস্বীকার করায় প্রকৃতি ত স্ত্রীজাতিকে পুরুষ অপেক্ষা শক্তিবিশিষ্টা করিবে না। শক্তি—দেহের বল মাত্র নহে—আভ্যন্তরীণ শক্তিই সংসারের কঠিন কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষজাতির পারদর্শিতার কারণ। সে শক্তির প্রকাশ তাহার সৃজনকার্য্যে, উদার সার্ব্বজনীনতায়, পুরুষজাতির স্বভাবসিদ্ধ অতৃপ্তিতে। প্রথম দৃষ্টিতে এ কথাগুলি রহস্য ঠেকিতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। গভীরতা এবং বিস্তৃতির মূলে শক্তি চাহি। এ শক্তি অবশ্য একপ্রকার দ্রুতগ্রহণী মাত্র নহে—ইহার উপরে উদার মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা।

সৃজনকার্য্যে আমরা পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু এই সৃজনকার্য্যের হৃদয়ে বিস্তৃত গভীর প্রেম প্রচ্ছন্ন। পুরুষের প্রেম সহসা তেমন বিশ্বাস করিতে ভাল লাগে না বটে, কিন্তু তাহা সত্য। নহিলে, তাহার মধ্য হইতে বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, চৈতন্যের আবির্ভাব হইবে কেন? বিশ্বজনীনতার এইখানেই ত পরিচয়। প্রেমে রমণী পুরুষ হইতে হীন নহে, কিন্তু রমণীর প্রেমে কি বিশ্বজনীনতা তেমন দেখা যায়? পাশ্চাত্য দেশে আজিকালি অনেক কুমারী রোগীর সেবাশুশ্রূষায় জীবন অতিবাহিত করেন। এখানে প্রেমের বিশ্বজনীন ভাব অস্বীকার করিবার যো নাই। কিন্তু পুরুষের সহিত রমণীর বিশ্বজনীনতাপ্রসূত কার্য্যেও

কেমন একটা প্রভেদ দেখা যায়। পুরুষের বিশ্বজনীনতার মধ্যে একটা বৃহৎ গঠনকার্য্য সম্পন্ন হয়। বুদ্ধ, খ্রীষ্টের বিশ্বজনীনতার গঠনফল পৃথিবীর অর্দ্ধেক লোক আজিও ভোগ করিতেছে। রমণীর বিশ্বজনীন সহানুভূতি এরূপ আধ্যাত্মিক বা সামাজিক বৃহদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু তথাপি বলি, তীব্র রোগযন্ত্রণায় স্নেহময়ী রমণীর মত সেবাশুশ্রূষা করিতে বৃহদনুষ্ঠানরত কোন পুরুষই পারে না। আর সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে রমণীর সহিত পুরুষ কত দূর আঁটিয়া উঠিতে পারে সন্দেহ।

প্রেমের কথাই যদি উঠিল, স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ সম্বন্ধে দুই চারি কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অনেকে পুরুষজাতির প্রেমে গুণের প্রতি অনুরাগের বিশেষ অভাব অনুভব করেন। তাঁহারা বলেন, রমণীর প্রেম গুণমূলক, আর পুরুষের প্রেম রূপমূলক। কিন্তু তাঁহাদের কথার সমূলকত্ব সম্বন্ধে কত দূর নিঃসংশয় প্রমাণ পাওয়া যায়, বলা সহজ নহে। আমার বোধ হয়, উভয়েরই প্রেম রূপ এবং গুণ উভয়মূলক। পুরুষ যে নির্গুণ রূপে অনুরক্ত বা স্ত্রী যে রূপের দিকে চাহেই না, ইহা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। আসল কথা, বাহ্য রূপের মায়ায় আন্তরিক গুণের অভাব অনেক সময়ে বুঝা কঠিন। নহিলে, রূপসী মুখরা কর্কশস্বভাবা হইলে পুরুষ স্বভাবতই রূপের উপরে বিরক্ত হইয়া যায়। গুণের আত্যন্তিক অভাব জানিয়া আকৃষ্ট হয় অল্প লোকেই। তবে রমণী অপেক্ষা পুরুষের পক্ষে নির্গুণ রূপের উপাসক হওয়া সম্ভব বলিয়া বোধ হয় বটে। কিন্তু বাস্তবিক, নির্গুণ রূপের পক্ষপাতী কেহই নহে। এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বৃথা তর্কবিতর্কের কিছুই নাই।

আর শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া স্ত্রীপুরুষের ক্ষুদ্র অভিমান-তৃপ্তিকর বিরোধই বা কেন? উভয়ের ক্ষমতা ও অধিকার ত সম্পূর্ণ এক নহে। কোন পক্ষ অপর পক্ষের দুর্লভ্য অধিকারের প্রতি হস্ত প্রসারণ না করিয়া আপন আপন জাতীয় সম্পূর্ণতা লাভের প্রতি মনোনিবেশ করিলেই সকল গোলযোগ মিটিয়া যায়। কারণ, স্ত্রী কোনও কালে সম্পূর্ণ পুরুষ বা পুরুষ সম্পূর্ণ স্ত্রী হইতেই পারে না। মানবজাতির পূর্ণতা সাধন পক্ষে উভয়েরই আবশ্যক। দুই চারি জন বিদ্রোহী রমণী পুরুষজাতিকে হীন প্রতিপন্ন করিতে চাহিলে বা সঙ্কীর্ণহৃদয় গুটিকতক পুরুষ স্ত্রীজাতিকে নীচ ভাবিলে কিছুই হইবে না। প্রকৃতির নিয়মানুসারে দুই জাতীয় স্বতন্ত্র এবং মিলনোপযোগী ক্ষমতার সম্মিলনে শুভ ফলই উৎপন্ন হয়। ব্যক্তিবিশেষের অশান্ত বিদ্রোহে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন অসম্ভব। অভিমান এবং বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া সমাজের হিতসাধন চেষ্টায় স্ব স্ব ক্ষমতা নিয়োজিত করিলেই যথার্থ ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধিত হয়। অহঙ্কারবশতঃ বৃথা শক্তিক্ষয় করিলে ত আর মহত্ত্ব লাভ হয় না।

স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষোচিত কার্য্য একেবারেই করিতে পারে না বা পুরুষেরা স্ত্রীলোকের কার্য্য করিতে পারে না, এমন নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিশেষ শিক্ষায় স্ত্রীকে অসম্পূর্ণ পুরুষ এবং পুরুষকে অসম্পূর্ণ স্ত্রী গড়িয়া তোলা যাইতে পারে। স্পার্টান রমণী পুরুষের মত ত সমরক্ষেত্রে প্রাণ বলি দিয়াছে। কিন্তু বিখ্যাত স্পার্টান সেনাপতিদিগের ন্যায় অভিজ্ঞতা কয় জন রমণীর? আমেরিকায় মল্লবিদ্যানিপুণা স্ত্রী অনেক মিলে শুনা যায়, তাহা হইতে শারীরিক বলে স্ত্রীজাতির পুরুষের সমকক্ষতা প্রমাণ হয় না। পুরুষ এবং স্ত্রীর ক্ষমতা ও অধিকার যে বিশেষ স্বতন্ত্র, তাহার প্রমাণ পথে হাটে অজস্র। জগতে সংগ্রাম-প্রতিদ্বন্দ্বিতার অভাব নাই; ইহার উপর স্ত্রী এবং পুরুষের ধারাবাহিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শুভ ফল আশা করা নিতান্তই বিকৃত কাল্পনিকতা। উদরের সহিত করদ্বয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মস্তকের সহিত গ্রীবাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি স্বাস্থ্য সম্পাদনের অনুকূল? বাহিরের সংগ্রামের উপর গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হইলে দুর্ব্বল ত টিঁকেই না, বলবানেরও ক্ষতি সহিতে হয়।

কিন্তু স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে দেশ এবং সমাজভেদে যে কতকগুলি সামাজিক নিয়ম গঠিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জাতির অবস্থার সহিত এ সকল নিয়মের পরিবর্ত্তনও হইয়া থাকে। আমাদের অবরোধ প্রথা যেমন। অবরোধবাস কিছু আর নারীজাতির স্বভাব নহে। প্রহরিবেষ্টিত অবরোধে শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি হয় না; সুতরাং দর্শনবিহীন শিক্ষা এবং অস্ফূর্ত্ত হৃদয় লইয়া সুসন্তানগঠন অসম্ভব হইয়া পড়ে। এক কালে দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে এ প্রথা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। এখন যাহারা বহুদিন হইতে অবরোধের রুদ্ধ দ্বারের মধ্যে নির্ব্বিঘ্নে একপ্রকার জড় জীবন বহিয়া আসিতেছে, অনভ্যাসবশতঃ প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইলে তাহারা অসুবিধার কারণ হইয়া উঠে; লোকে অবরোধবাস স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম ঠাহরাইয়া লয়। তাই বলিয়া এ প্রথার সহিত স্ত্রীস্বভাবের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা অবশ্য নাই। শিক্ষার সহিত স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দিলে অশুভ ফল দেখা যায় না। কিন্তু অবরোধ প্রথা থাক্ বা না থাক্, স্বাধীনতা থাক্ বা না থাক্, স্ত্রীজাতির পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র যে ক্ষমতা বা গুণ দেখা যায়, সেইগুলি তাহার স্বভাবসিদ্ধ—স্বাভাবিক ক্ষমতা বা গুণ। তবে কর্ষণাভাবে গুণ ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যায় বটে।

সামাজিক রীতি নীতি নিয়ম অবশ্য সম্পূর্ণ উপেক্ষণীয় নহে, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তন বা সংস্কার চলে। তাহা হইতে সমগ্র মানবজাতির অর্দ্ধাঙ্গের অধিকার স্থির করা যায় না। স্বাভাবিক ক্ষমতা আলোচনা দ্বারাই তাহা বুঝা যায়। দেশভেদে, জলবায়ুভেদে, সামাজিক অবস্থাভেদে খুঁটিনাটি কার্য্যের বিভিন্নতা হইয়াই থাকে—তাহা অনিবার্য্য। তেমন, পরিবার-বিশেষের বিশেষ বিশেষ ভাব এবং লক্ষণ দেখা যায়, ব্যক্তিবিশেষের আবার স্বতন্ত্র দোষ গুণ থাকে। স্ত্রী এবং পুরুষের ক্ষমতা আলোচনা করিয়া আমরা সহজে বুঝিতে পারি যে, বাহিরের

সহিত সংগ্রাম-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুরুষই পারদর্শী। নারীজাতির কার্য্যক্ষেত্র গৃহ। তাই বলিয়া এমন হৃদয়হীন কে আছে, যে বলিবে, গৃহিণী রমণীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য লোপ করা আবশ্যক? কে বলিবে, প্রবলপরাক্রম পুরুষজাতির রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন শোভা পায় না? স্ত্রী এবং পুরুষ পরস্পরকে সম্মান করে—একের অভাব অন্যে পূর্ণ করে বলিয়া। এ সম্মান প্রেমপ্রসূত—ভাবিয়া চিন্তিয়া তর্ক করিয়া মতলব আঁটিয়া ইহার অভ্যুদয় নহে। হৃদয়হীন তর্কের মুখে খাড়া করিয়া সহজ কথাকে জটিল করিয়া তুলিতে অধিক সময় লাগে না, কিন্তু তর্কে সত্য কিছু আর মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায় না। নারীর কার্য্যক্ষেত্র গৃহ শুনিয়া কুটিলহৃদয় পুরুষজাতিকে স্ত্রীবঞ্চনপ্রয়াসী ঠাহরাইতে পারে, তাই বলিয়া কি পুরুষজাতি সত্যই রমণীকে অধিকারভ্রষ্টা করিতে চাহে?

এ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলিবার ছিল না। কিন্তু অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আপন স্বাভাবিক অধিকারে অসন্তুষ্টা দুই চারিটি রমণীরসনা পুরুষজাতির বিরুদ্ধে এইরূপ অভিযোগ উত্থাপন করিতেছে। রমণীরা কেহ কেহ বলেন, ক্ষমতালোপাশঙ্কায় পুরুষজাতি স্ত্রীদিগকে বাহিরের কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে চাহে না। কথাটা মিথ্যা না হইতে পারে, কিন্তু যে কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। ক্ষমতালোপের আশঙ্কা স্ত্রীজাতির ক্ষমতা বা অধিকারের প্রতি কখনও কটাক্ষ করে নাই। সমাজের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্যই স্ত্রী পুরুষের কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র। প্রকৃতির নিয়মানুসারে সন্তানবতী রমণীর গৃহ ছাড়িয়া বাহিরের কার্য্যে পুরুষের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্ভব হয় কিরূপে? প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমকক্ষতালাভের শক্তি থাকিলেও জননীর কর্ত্তব্য ত আর অবহেলা করা যায় না। পুরুষজাতি বাহিরের রণক্ষেত্রে রমণীর হইয়া তাই খাটিয়া মরে। কারণ, পরস্পর পরস্পরের সুবিধা অসুবিধা অনুসারে কার্য্য ভাগ করিয়া না লইলে সংসারযাত্রা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এ প্রবন্ধেও আমরা সংক্ষেপে দুই চারি কথা বলিয়াছি। সত্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া পুরুষজাতির উপর অভিমানবশতঃ দোষারোপ করিলে সে নিরুপায়। অভিমানের ত আর প্রতিবাদ শোভা পায় না। ভ্রম এবং মিথ্যা নিরাকরণ করিয়া যথাসাধ্য স্ত্রী এবং পুরুষের ক্ষমতা ও অধিকার নির্ণয়ই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আমাদিগকে সে জন্য অনেক পুরাতন কথার পুনরুল্লেখ করিতে হইয়াছে। বার বার পুরাতন কথা এবং পুরাতন যুক্তির উত্থাপনে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা। ভরসা করি, তাঁহারা ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য, স্ত্রী অথবা পুরুষের সম্পূর্ণ শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করাই আমাদের উদ্দেশ্য নহে। মানসিক শক্তির প্রভাবে নেতৃত্বভার পুরুষেরই হস্তে পড়িয়াছে বটে, তাই বলিয়া তাহার সহকারিণীর নিকৃষ্ট হীনতা প্রতিপন্ন হয় না। বিষয়বিশেষেই

উভয়ের কাহারও কাহারও শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। সাধারণতঃ সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে রমণীর এবং বিস্তৃত ক্ষেত্রে পুরুষের ক্ষমতা প্রকাশ পায়। পরস্পরকে অতিক্রম করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন ক্ষেত্রের উৎকর্ষ সাধনই প্রকৃত উন্নতি লাভের উপায়। আপাততঃ এইখানে বিদায় গ্রহণ করি। আবশ্যক হইলে অবসরক্রমে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা রহিল। ['ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৭]

কল্লোলিনী

মরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকথা মত,
হৃদয়ের বাঁধন টুটিয়া,
মরমের দিশাহারা গানগুলি ল'য়ে
কল্লোলিনী চলেছে ছুটিয়া।

মরমের পাশে শত তার
জ্বলিতেছে চিতানল ছায়া।
জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান লয়ে
ভস্মসাৎ হইতেছে কায়া।

শুকতারা সুগভীর ফেলিয়া নিশ্বাস
ডুবে যায় আকাশের কোলে।
তটিনীর শ্রান্তকায় শিহরি উঠিছে
ছায়া দেখে আপনার জলে।

স্তব্ধ জগতের মাঝে পরাণের ছায়া
থেকে থেকে উঠিছে চমকি।
মরণের চিরস্থির শুভ্র হাসিখানি
জেগে ওঠে জগৎ আলোকি।

স্থির ছায়া পড়ে তার তটিনীর কোলে
জগৎটা ডুবে যায় ধীরে।
শ্মশানের ছায়াময় উষার আলোকে
কেঁদে কেঁদে গৃহে যায় ফিরে।

বহে যায় কল্লোলিনী মরণেরে ল'য়ে
রজনীর ছুঁইয়া নিশ্বাস।
পরাণের গীতটুকু মাখিয়া হৃদয়ে
ফুলেদের লইয়া সুবাস।

মৃতপ্রায় জগতের কাহিনীর মত
আপনাতে আপনি মিলায়।
জগতের মরমের থেমে যায় গান
ক্ষুদ্র প্রাণ ভেঙ্গে চূরে যায়।

['ভারতী ও বালক,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭]

সূর্য্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়

সান্ধ্য আকাশের বিভাসিত তরল নীলিমা-হৃদয় বাহিয়া জগতের শ্রান্ত রবি পরপারের কনক-লাবণ্যে ডুবিয়া গেল। যেখানে সে অতি ধীরে ধীরে গভীর নীরবে প্রথম অদৃশ্য হয়, দিগন্তরেখায় সেখানে কেবলই একটি ছায়াময় ঘন রক্তিম অস্পষ্টতা—পুঞ্জমান সন্ধ্যার আধ অন্ধকারের মধ্য হইতে ক্ষীণতর প্রতীয়মান। পরস্পরের সমস্ত নিভৃত সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া আকাশ এবং ধরণী অজ্ঞাতসারে সেই সন্ধ্যারাগরক্ত ছায়ালোক-রহস্যক্ষেত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়াছে; বিহ্বল মিলনের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে সম্পূর্ণ আঁকড়িয়া থাকিতে চায়।

আকাশে ঈষৎ দূরে দূরে বিক্ষিপ্ত বিবশ মেঘখণ্ডের তরঙ্গায়িত প্রান্তরেখা ঘিরিয়া অস্তগত ঔজ্জ্বল্যের তরল স্পর্শ বহিয়া গিয়াছে—কোমল, পেলব, দীপ্ত। নিম্নে ছায়াময় দিগন্তের পাদমূল ধৌত করিয়া দিয়া তরঙ্গিণীর ক্ষীণ রজতপ্রবাহ কম্পিত চাঞ্চল্যে কলকল চলিয়াছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটাহত তরঙ্গ দূর্ব্বাদলের সুকুমার শ্যামল শিহরণে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘনাইয়া স্রোতে গড়াইয়া যায়। ঘন নীলিমার মধ্যে মধ্যে বিচিত্র সিন্দূর-তাম্র-নীলাভ বর্ণসমাবেশ—গায়ে গায়ে ঢলিয়া, মিশিয়া, কিন্তু পূর্ণ অভিব্যক্ত। তরঙ্গিণীর অধীর হৃদয়ে তাহার চঞ্চল ছায়া।

সূর্য্য ধীরে ধীরে ডুবিল। দ্রবীভূত গাঢ় রক্তিমা পরপারের চিত্রার্পিত বৃক্ষাবলীর পশ্চাতে উজ্জ্বল শাখা-পল্লবের মধ্য দিয়া নামিয়া গেল। কেমন ধীরে ধীরে সে দৃষ্টি অতিক্রম করে! প্রথমে অত্যুজ্জ্বল কনকদীপ্তি—চাহিতে চক্ষু ঝলসিয়া যায়; গড়াইয়া গড়াইয়া

পশ্চিমের তরঙ্গায়িত তরুশিরে আসিয়া সে অনবরত স্পন্দমান দীপ্তি ক্ষীণ রক্তিম হইয়া আসে। ক্রমে জ্যোতির তীব্রতা মুছিয়া গিয়া দিগন্তের চরণ বাহিয়া ঘন রক্তিম দ্রব-সৌন্দর্য্য অকূলে বিলীন হয়।

সম্মুখে সূর্য্যাস্ত ; পশ্চাতে চন্দ্রোদয়। অপর দিগন্তের দূর আকাশপটে মুদ্রিত ছায়াবৎ তমাল-তালশ্রেণীর প্রচ্ছন্ন নিবিড়তার অলক্ষ্য হইতে অবগুণ্ঠনবতী রমণীর ন্যায় চন্দ্রমা অবসন্ন রক্তিম রবির পানে তাকাইয়া। রবি ডুবিয়াছে—আর দেখা যায় না। পশ্চিমাকাশের বিচিত্র বর্ণ ঔজ্জ্বল্যের উপর দিয়া নীরবে সন্ধ্যা ধূসর আচ্ছাদন টানিয়া দিতেছে। পূর্ব্বসীমায় চন্দ্রমার মাধুরীমথিত স্নিগ্ধোজ্জ্বল লাবণ্য রজতরঞ্জিত শ্যামল পুলকের মধ্য দিয়া অর্দ্ধ পরিস্ফুট। চন্দ্র উঠিতেছে—আরও ধীরে ধীরে, আরও নীরবে।

তরঙ্গিণীর হৃদয় চন্দ্রোদয়ে যেন আরও চঞ্চল। মৃদু সান্ধ্য পবনে আন্দোলিত হইয়া দূর বৃক্ষান্তরাল হইতে দু'একটি শুভ্র নগ্ন রশ্মি তাহার প্রবহমান হৃদয় স্পর্শ করিয়া বুঝি কি মধুময় রজতবারতা দিয়া গেল। এক দিকে লীনপ্রায় অবসান-ঘনীভূত ছায়ারহস্যে আলোক ধীরে ধীরে মিলাইয়া যায় ; অপর দিকে ছায়াময় নিবিড়তা ভেদ করিয়া অল্পে অল্পে প্রশান্ত স্নিগ্ধালোক ফুটিয়া উঠে। এই দুই কনক-রজত-সৌন্দর্য্যসঙ্গমের সুকুমার স্পর্শ লইয়া নদী তরঙ্গভঙ্গে কুলুকুলু বহিয়া যায়।

চন্দ্র যত উঠে, নদী অধীরে বহিয়া যায়। বিমল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত হৃদয় রজততরঙ্গে উথলিয়া উঠিতে থাকে। অস্তাচল-রবি-রক্ত নীলিমার বর্ণ-বৈচিত্র্য আকাশেও যেমন মুছিয়া যায়, নদীগর্ভেও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে একেবারে মিলাইয়া আসে। দিগন্তের ক্ষীণ তটভূমিতে সে সান্ধ্য ছায়া-অস্পষ্টতা আর নাই। ম্লান জ্যোৎস্নাকম্পনে ঈষৎ কম্পিত দিগন্তহৃদয় ছায়া ছায়া—শ্যামলতার উপরে একটা শুভ্র অস্পষ্ট আভা আচ্ছন্ন করিয়া।

বাঙ্গালার নদীতীরে এই সূর্য্যাস্ত হইতে চন্দ্রোদয় দৃশ্য যেমন সুন্দর, এমন আর কোথায় ? চতুর্দ্দিকে সমতল ক্ষেত্র—শস্যশ্যামলার উচ্ছ্বসিত আনন্দমূর্ত্তি—দূর দিগন্তবেলায় মৃদু চুম্বনে আকাশ ধরণীকে স্পর্শ করিয়াছে। ইহারই এক দিকে অস্ত, আর এক দিকে উদয় ; এক দিকে অবসান, অপর দিকে আরম্ভ ; এক দিকে লয়, অন্য দিকে সৃষ্টি। এইখানে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের মধুর সামঞ্জস্য। বিভিন্ন বৈচিত্র্যের সমাগমে সৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ।

['ভারতী ও বালক,' আষাঢ় ১২৯৭]

বিজ্ঞতা

পরাণ আঁধার ক'রে দাঁড়ায়ে কে তুমি ?
স'রে যাও, ক'র না কো শূন্য মরুভূমি।
এখনো ফুটিছে ফুল শুষ্ক হৃদি 'পরে,
এখনো রয়েছে আশা, ছেড়ে দাও মোরে
চাহি না স্বরগ-সুখ বিজ্ঞতা তোমার,
আমার হৃদয় যেন থাকে গো আমার।
রয়েছে দিনের আলো চলে যাই সোজা,
কাজ কি প্রদীপ হাতে মিছে পথ খোঁজা।

['সাহিত্য,' আষাঢ় ১২৯৭]

রাধা

আমাদের দেশের প্রেমচর্চ্চায় যে সকল চরিত্র বিশেষ সহায়তা করিয়াছে, তাহার মধ্যে রাধিকাই বোধ করি প্রধান। সীতা সাবিত্রী কাহিনী এদেশে স্ত্রীজাতির চরিত্র উন্নত আদর্শে গঠন করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্ম্মের সহিত, উৎসবের সহিত একীভূত হইয়া রাধিকার মত সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে কোনও চরিত্রই পারে নাই। সীতা সাবিত্রীও কাব্য হইতে ধর্ম্মের সহিত সংযুক্ত, কিন্তু তাহাতে দেশব্যাপী আন্দোলনও হয় নাই, তেমন সাহিত্যও জন্মে নাই। এ সকল চরিত্র নীরবে দেশের চরিত্রগঠনে আংশিক স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে মাত্র। রাধিকার চরিত্র, চরিত্র হিসাবে সকল দিকেই হীন। পাতিব্রত্যও নাই, সে তেজও নাই, সে শিক্ষা দীক্ষা ভাব কিছুই নাই। কিন্তু এত হীন হইয়াও রাধিকা বঙ্গসাহিত্যের জননী, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার কেন্দ্রস্থল, এবং বোধ করি অনুসন্ধান করিলে আরও অনেক ইত্যাদি ইত্যাদি বাহির হয়। কারণ অবশ্যই আছে। নহিলে, কত শত মহৎ চরিত্রের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া রাধাই সমধিক ফুটিয়া উঠিবে কেন ? রাধা রূপসী বটে, তেমন আরও অনেক আছে। রূপসীর চিত্র আঁকিতে বিশেষরূপে রাধার আবশ্যক করে না। আর গুণের কথা ত পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি—সংস্কৃত সাহিত্যের গুণবতীদিগের পার্শ্বে রাধা দাঁড়াইতে অক্ষম। তবে রাধা শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা বটে। কিন্তু কেবল মাত্র এই কারণে রাধার প্রভাব সম্ভব নহে। প্রেমের গভীরতা সীতার চরিত্রে যেমন, এমন আর কোথায় ? রাধাকে ছাড়িয়া দিলে প্রেমচরিত্রের আমাদের অভাব হয় না।

কিন্তু তথাপি রাধাকে বিদায় দেওয়া চলে না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়-সঙ্গীতেই মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার অনেকটা বিকাশ হইয়াছে। রমণীর প্রেম আমরা মাতৃভাবে, পত্নীভাবে, কন্যাভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কেবল রমণীভাবে বড় দেখি নাই। রাধার চরিত্রে এই ভাব কতকটা ফুটিবার অবসর পাইয়াছে। বড় বড় চরিত্রের আদর্শ প্রেমের সহিত কলঙ্কিনী রাধিকার প্রেমের বিস্তর তফাৎ। সীতা সাবিত্রীর প্রেম দাম্পত্য প্রণয়ের চরম উৎকর্ষ। রাধার প্রণয় সমাজ-নিয়মের ব্যভিচার। রাধা আদর্শ সহধর্ম্মিণী নহে, গৃহিণীও নহে। মাতৃভাব রাধায় বিকশিত হয় নাই। কিন্তু তাহার মধ্যে রমণী হৃদয়ের একটা আকাঙ্ক্ষার ভাব বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় এদেশের সাহিত্যে রাধার এত প্রভাব। আরও এক কথা। অন্যান্য চরিত্র আমাদের ধর্ম্মের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া নীরবে গঠনকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, রাধার চরিত্র ভাঙ্গনের সহায়তা করিতেও ত্রুটি করে নাই। রাধা আসিয়া হিন্দুসমাজে এক বিপ্লব বাধিয়া যায়। ভাঙ্গন কার্য্যে একটা প্রবল মত্ততা আছে। সুতরাং তাহাতেও লোকের সহজে আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে। ইহা ভিন্ন সে সময়ের সামাজিক অবস্থা হয় ত রাধার প্রভাব প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল। বোধ করি, আমাদের সমাজে প্রেমচর্চ্চা তখন অনেকটা রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু মানবহৃদয় কিছু আর সকল সময়ে সমাজ-নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না। রাধার আবির্ভাবে সে আপনার অন্তর-তন্ত্রীতে আঘাত অনুভব করিল। দেখিল, তাহার হৃদয়ের সহজ আকাঙ্ক্ষা রাধাকৃষ্ণের প্রণয়কাহিনীতে ব্যক্ত হইয়াছে। এইরূপ নানা কারণে আমাদের প্রেমচর্চ্চায় রাধার বিশেষ প্রভাব। কিন্তু তাই বলিয়া উন্নত আদর্শ সৃজনে বা চরিত্রগঠনে নহে।

তবে আধ্যাত্মিক ভাবে রাধাকে আদর্শ ভক্ত বলিয়া অনেকে গণ্য করেন। রাধা শ্রীকৃষ্ণের রূপে মুগ্ধা। সে রূপ তাঁহার অন্তরের স্তরে স্তরে বিঁধিয়াছে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বর। এ হিসাবে রাধার প্রেম বড় সামান্য নহে। কিন্তু সাধারণের নিকট, মুখে যে যাহা বলুক, কৃষ্ণ দেবতা হইয়াও মানবসন্তান। কৃষ্ণের কল্পনা, হাসি, বাঁশী, যমুনা, গোপিনীবৃন্দা, এবং প্রণয়িনী রূপসী রাধিকার সহিত অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতায় সম্বদ্ধ। কাব্য পাঠকালে অপার্থিব হিসাবে রূপক ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া বড় কেহ অর্থ করে না। এবং তাহা না করিলেও রাধিকার চরিত্র উচ্চ আদর্শরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। গূঢ়ার্থ যাহা কিছু থাকে, বাদ দিলে রাধিকা কৃষ্ণের দেহে মুগ্ধ, যৌবনে আচ্ছন্ন, ভোগলালসায় অধীর। তবে এ দেহজ অনুরাগের মধ্যে অন্তরের একেবারে অভাব স্বীকার করা যায় না।

এখন কথা হইতেছে, রাধাকে কি ভাবে দেখা যায়? আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে, না কবির সৃষ্টি হিসাবে? আমাদের দেশে কাব্যের সহিত ধর্ম্ম অনেক স্থলে এরূপ মিশিয়া

গিয়াছে যে, পরিণতি দেখিয়া মূল ঠাহরাইয়া উঠা যায় না। উমা এখন ধর্ম্মের সহিত একীভূত, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, কাব্যেই উমার প্রথম আবির্ভাব। কাব্য ধর্ম্মে পরিণত হইয়া আমাদের মধ্যে প্রেমের কতকগুলি ভাব অনুশীলনের সহায়তা করে। উমার কল্পনাতে স্নেহভাবের সুন্দর বিকাশ হইয়াছে। এ প্রেমচর্চ্চা অনেকটা গার্হস্থ্য। যশোদাতেও মাতৃভাবের সুন্দর বিকাশ লক্ষিত হয়। রাধায় প্রেমের একেবারে স্বতন্ত্র অন্য এক দিক্ আলোচিত হইয়াছে। তাহার মূল কাব্য, কি ধর্ম্ম, নিশ্চিত বলা সহজ নহে। তবে কবিদিগের হস্তে কাব্যসৌন্দর্য্য যে রাধার মধ্যে সমধিক প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এবং বোধ করি, সেইটুকু মাত্র আলোচনা করিলেও রাধার শ্রীহানি হইবে না।

প্রথমতঃ রাধার রূপ। রাধা রূপসী—গৌরবর্ণা। এদেশে রূপ বর্ণনায় সাধারণতঃ গৌর অথবা শ্যামবর্ণের প্রাধান্য। গৌরবর্ণ অবশ্য শ্রেষ্ঠ। শ্যামবর্ণও নিতান্ত হেয় নহে। তবে বর্ণের মধ্যে গৌরেরই মর্য্যাদা অধিক। তাহা বহু দূর হইতে নয়ন আকর্ষণ করে। নিয়মের ব্যতিক্রমও দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণা দ্রৌপদীর রূপাকর্ষণে স্বয়ম্বরসভা উথলিয়া উঠিয়াছিল। রাধা গৌরী, তাহাতে অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পূর্ণ। সুতরাং কৃষ্ণ সহজেই রাধার রূপে আকৃষ্ট। বৈষ্ণব কবিদিগের এ বর্ণনার মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব বড় পরিস্ফুট নহে। তাঁহারা সকল সময়ে সম্মুখে একটা আধ্যাত্মিক প্রতিমা খাড়া রাখিয়া রচনা করিতেন কি না বলা যায় না। তবে শ্রীকৃষ্ণত্বে ঈশ্বরত্ব তাঁহারা হয় ত জানিতেন। কবিতা রচনাকালে মানবভাবই সম্ভবতঃ তাঁহাদের অন্তরে আধিপত্য করিত। নহিলে, তাঁহাদের সঙ্গীতে দেহের গঠনসৌন্দর্য্য এমন সুব্যক্ত হইবে কেন? রাধার প্রতি অঙ্গ তাঁহাদের তুলিকাস্পর্শে সু-অভিব্যক্ত। আর গঠনের দিকে তাঁহাদের স্বাভাবিক একটু অনুরাগও দেখা যায়। রাধার দেহে যখন প্রথম যৌবন বিকাশ হইল, বৈষ্ণব কবি সে বয়ঃসন্ধির রূপমাধুরী একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। তাহার পর যখনই অবসর পাইয়াছেন, রাধার যৌবনসম্বদ্ধ অঙ্গসৌন্দর্য্য দেখিয়া লইতে তাঁহারা ত্রুটি করেন নাই। রাধার প্রত্যেক অপাঙ্গদৃষ্টি, লঘু হাস্য, হৃদয়-বিকাশ তাঁহাদের নখদর্পণে। রাধার সহিত তাঁহাদের যখন তখন সাক্ষাৎ—স্নানসময়ে, বনপথে, নিভৃতে কুঞ্জমাঝে, গৃহে সখীসমাগমে। এবং যখন যে ভাবে দেখিয়াছেন, সেই ভাবেই তাঁহারা সুন্দরী রাধিকার চিত্র আঁকিয়াছেন। কখনও কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই।

সেই জন্য বৈষ্ণব কবিদিগের চিত্র হইতে আমরা রাধার রূপ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারি। রাধার অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ণ, গৌর বর্ণ, যৌবন ঢল ঢল। কিন্তু রাধার সমগ্র মুখে কি ভাব পরিব্যাপ্ত, বৈষ্ণব সঙ্গীত হইতে তাহার একেবারে স্পষ্ট পরিচয় সামান্যই পাওয়া

যায়। তবে নানা বর্ণনার মধ্য হইতে বুঝা যায় যে, রাধার মুখে একটি কোমল ভাব আছে। চঞ্চল লোচনের বর্ণনার মধ্য হইতেও মুখের ভাব বুঝিবার কতকটা সুবিধা হয়। রাধার রূপে বিলাসভাবের উদ্রেক করে—শান্ত ভাব অপেক্ষা চাঞ্চল্যেরই তাহাতে প্রাদুর্ভাব। একপ্রকার সৌন্দর্য্য আছে, যাহা আপনার মধ্যে স্থির থাকিয়া জগৎকে টানিয়া আনে। এ সৌন্দর্য্যে অধীরতাও অনেকটা চাপা। রাধার সৌন্দর্য্য এজাতীয় নহে। রমণীসুলভ তেজ ভাবেরও রাধার সৌন্দর্য্যে বিশেষ অভাব। সতীর মুখে কোমলতার সহিত দৃঢ় তেজস্বিতা দেখা যায়; ম্লানভাবেও সীতা তেজস্বিনী। রাধার কোমলতা বিলাসস্ফূর্ত্ত—তেজদীপ্ত নহে।

শকুন্তলা প্রভৃতির রূপের ন্যায় রাধার রূপের সহিত প্রকৃতির সেরূপ ঘনিষ্ঠতা নাই। সে রূপ অনেকটা সহরঘেঁষা। বন, কি উদ্যানলতার সহিত তাহার উপমা খাটে না। রাধার কোমলতা নবনীতের সহিত উপমেয়। রূপেও আঁটাআঁটি কিছু অধিক—তাহাতে অনেকটা হিসাব করা ভাব আছে। নির্ঝরিণীর স্বতঃউচ্ছ্বসিত মুক্ত প্রাচুর্য্য তাহাতে তেমন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু আমরা রাধার রূপের নিন্দা করিতেছি না। রাধা ইহাতেই রূপসী। নাকে মুখে চোখে রাধা পৃথিবীর যাবতীয় রূপসীর সমকক্ষ। তবে চরিত্রগত মহত্ত্বের মুখে যে সৌম্য ছায়া পড়ে, তাহা রাধায় বড় পরিস্ফুট নহে; রাধার রূপ দিল্লীর রাজপ্রাসাদে সাজাইয়া রাখিবারই বিশেষ উপযোগী। সীতার মত অরণ্যে তপোবনে সে রূপ খুলে না। সে গঠন কুঁদিয়া নির্ম্মাণ করাই বটে।

কৃষ্ণ যুবতী রাধিকার এই রূপে মসগুল। তিনি যাহা খুঁজেন, রাধায় তাহা মিলিয়াছে। দেহ উপভোগস্পৃহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম। রাধিকার দৈহিক রূপ যথেষ্ট আছে। অন্তরের সহিত রূপের যেখানে সম্বন্ধ, সেখানে কৃষ্ণের বড় দৃষ্টি নাই। এই কারণে রাধার বদনকমলে এবং খঞ্জননয়নে মানসিক সৌন্দর্য্যের কিরূপ বিকাশ হইয়াছে না হইয়াছে, আমরা শুনিতে পাই না। আমরা যত দূর জানিয়াছি, রাধার ভ্রূভঙ্গে হৃদয় ভাঙ্গে গড়ে, অধরে অধর আকর্ষণ করে, কোমল কপোলে শ্রীকৃষ্ণের চুম্বনভার মাত্র সহে।

নিজ রূপের প্রতি রাধার স্ত্রীজাতিসুলভ অনুরাগও আছে। সুন্দরী আপনাকে রূপসী বলিয়া জানেন। সুতরাং ঘন ঘন দর্পণে মুখ দেখিয়া অরুচি জন্মে না। রূপচর্চ্চাই ত রাধার আজন্ম হইয়া আসিতেছে। আর এই রূপের ফাঁদেই ত শ্যামসুন্দরের মন ধরা পড়িয়াছে। নহিলে, কাণায় কাণায় যাহার প্রণয়িনী, তাহাকে দুই দণ্ড চোখে চোখে রাখা যায়? রূপের কোনও অনুষ্ঠানেরই রাধার ত্রুটি নাই—গন্ধদ্রব্য, অলক্তক, বেশভূষা, দর্পণ, সমজদার সহমর্ম্মী সহচরী, এবং আবশ্যকীয় দুই চারিটা নয়নের কটাক্ষ, গ্রীবার বঙ্কিম ভঙ্গী, মৃণালবাহুর অনাবশ্যক ভ্রমরতাড়ন ইত্যাদি ইত্যাদি। জীবনের অন্যান্য গুরুতর কার্য্যের এই জন্য রাধার অবসর হইয়া উঠে না। রাধার দুই চিন্তা—নিজের রূপ এবং

মাধবের রূপ। নিজের রূপে শ্যামকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে, আর শ্যামের রূপে নিজে বাঁধা। রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধই রূপজ।

শ্রীকৃষ্ণের যে রূপ দেখিয়া রাধা অধীর, সে রূপ অনেকটা রাধারই মতন। রাধার মত কৃষ্ণ অবশ্য গৌরবর্ণ নহেন, সমস্ত দেহের গঠনও তাঁহার অবিকল রাধার অনুরূপ নহে, তবে উভয়ের গঠন কতকটা একজাতীয় বটে। ভ্রমক্রমে বিধাতা বুঝি একজনকে পুরুষ করিয়া গড়িয়াছেন। কৃষ্ণের রূপে উন্নত পুরুষভাব কদাচ দেখা যায়। কৃষ্ণ পুরুষরূপে স্ত্রীরই এক বিশেষ সংস্করণ। তবে রাধা এ রূপে মুগ্ধা। বৈষ্ণব কবিরাও এই রূপেরই বিশেষ পক্ষপাতী; আমাদের তাহাতে আপত্তির কিছুই নাই। কিন্তু পুরুষ হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকে আমাদের তেমন সুপুরুষ বলিয়া মনে হয় না। এবং বোধ করি, মহাদেবের পার্শ্বে কিম্বা রামচন্দ্রের পার্শ্বে দাঁড় করাইয়া উমাকে অথবা সীতাকে একজনের গলদেশে বরমাল্য দিতে বলিলে শ্রীকৃষ্ণকে কেহই তাহা দিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের রূপে গোপীকুলই মুগ্ধ। রাধার মানসিক অবস্থা নিতান্তই তেজহীন, অলস, সেই জন্য চূড়ার ঠাম, ভ্রূর ভঙ্গীতেই সে মন আত্মহারা। স্বভাবতঃ রমণীহৃদয় পুরুষ-সৌন্দর্যো সমুন্নত তেজগাম্ভীর্য্যই ভালবাসে বোধ হয়। তবে ভিন্ন রুচিও ত সংসারে আছে। আমাদের অন্তঃপুরচারিণীগণ কিরূপ সৌন্দর্য্যের পক্ষপাতী বলা যায় না। বাঙ্গালা দেশেই ত বীর সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সৌখিন বাবু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

এ সকল কতকটা অপ্রাসঙ্গিক কথার এইখানেই শেষ হোক্। রূপের সহিত রাধিকার এই অবধি বিশেষ সম্পর্ক। আমরা রাধার রূপ দেখিয়াছি, রাধা যে রূপে মুগ্ধা, সে রূপও দেখিলাম। মোটামুটি, উভয়ের রূপেরই প্রধান উপাদান ভোগবিলাস। গুণের ব্যাপার রাধার চরিত্রে বড় বেশী শুনা যায় না। সুতরাং রাধাকে দেখিবার আমাদের বড় বাকি নাই। এখন কেবল তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় দেখা যাইতে পারে। যেমন, রাধা প্রণয়িনী, রাধা বিরহিণী, রাধা মানিনী, রাধা অভিসারিকা ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাতে রাধার রূপের সহিত ভাবের সাদৃশ্য অনেকটা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। আর রাধার জীবনে ইহা ভিন্ন ত বিশেষ কোন ঘটনাও দেখা যায় না। হাস্য পরিহাস, সাজসজ্জা, বিরহ, অভিসার, মানাভিমান এবং হাবভাবের সমষ্টিই রাধিকা।

প্রথমে দেখা যাক, কৃষ্ণের সহিত রাধিকার প্রণয়ের আরম্ভ কোথায়। বলা বাহুল্য, রূপেই উভয়ের প্রণয় আরম্ভ। রাধিকা কৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মুগ্ধ। কৃষ্ণও রূপ দেখিয়াই রাধিকায় অনুরক্ত। ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। রূপের আকর্ষণ মানবজাতির স্বভাবসিদ্ধ। দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়, রোমিও জুলিয়েটের প্রণয়, এ সকলই রূপমূলক। এবং রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ের মত দর্শনেই ইহাঁদের প্রেমারম্ভ। সুতরাং রূপমূলক প্রেম বলিয়াই

রাধাকৃষ্ণের প্রেম দূষ্য নহে। কিন্তু রূপমূলক প্রেম মোটামুটি দুই প্রকার। এক, চকিতের মধ্যে রূপের মধ্য দিয়া আন্তরিক প্রেম সঞ্চার হয়। আর, রূপেতেই প্রেম গণ্ডীবদ্ধ হইয়া থাকে। এখন দেখিতে হইবে, রাধার প্রেম কোন্ শ্রেণীর। কৃষ্ণের প্রেম শেষোক্ত শ্রেণীর বলিয়াই বোধ হয়। প্রমাণের অভাব নাই—তাঁহার প্রণয়িনীর সংখ্যা গণনা করিলেই অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে। বৈষ্ণব কবিদিগের খণ্ডিতার বর্ণনাগুলি দেখিলেই মনে হয়, কৃষ্ণ নিতান্তই হৃদয়হীন, প্রেমহীন, লজ্জাহীন, চরিত্রহীন চরিত্র। কিন্তু তাহা হইতে রাধার প্রেম বুঝা যায় কিরূপে? কৃষ্ণের এরূপ ব্যবহারেও রাধা তাঁহার প্রতি অনুরক্তা। কৃষ্ণকে দেখিলেই রাধার অর্দ্ধেক মান ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে ত রাধার চরিত্রে ক্ষমাশীলতাই সমধিক প্রকাশ পায়। কিন্তু তাহা নাও হইতে পারে। রাধার চরিত্রে গভীরতার অভাবই হয় ত কৃষ্ণের দুর্ব্ব্যবহার সহনের কারণ। প্রেমের নিয়মভঙ্গ অপরাধ রাধার নিকট অতি লঘু, কিছুই না। প্রেমের ভিত্তিতে যে দৃঢ়তা দেখা যায়, রাধার তাহা নাই। সুগভীর প্রেম অপমান বড়ই অনুভব করে। শারীরিক ভোগলালসা অতিক্রম করিবার শক্তি তাহার আছে। রাধার এ শক্তির অভাব। ভোগলালসা তাঁহার হাড়ে হাড়ে। কিন্তু তথাপি রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট কখনও অবিশ্বাসিনী হয়েন নাই। সুন্দরীর কৃষ্ণের প্রতি বেশ একটু টানও লক্ষিত হয়। ইহাতে মনে হয়, রাধার প্রেম ভোগলালসায় গঠিত হইলেও তাহাতে অন্তরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রেম অপেক্ষা রাধিকার প্রেম গাঢ়। তবে তাহাও অনেকাংশে রূপবদ্ধ। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়ে মন্দিরমত্ততা অধিক বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে যৌবনে যৌবনে যেরূপ সম্মিলন হয়, জীবনে জীবনে সেরূপ একীকরণ হয় না।

এতক্ষণ আমরা যে ভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেম আলোচনা করিলাম, তাহা যে সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক রূপকাদিবর্জ্জিত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এ প্রণয়কাহিনীর মধ্যে আধ্যাত্মিক রূপকের প্রতিষ্ঠা একেবারে অসম্ভব বোধ হয় না। চণ্ডীদাস প্রভৃতি দুই চারি জন বৈষ্ণব কবির রচনা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা এ রূপক বুঝিতেন। তবে রূপক বুঝিলেও কথায় কথায় রূপক মিলাইয়া কবিতা রচনা করিতেন না। তাঁহারা এই বিষয় লইয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। আমরাও আধ্যাত্মিকতা হইতে স্বতন্ত্র পথে রাধাকৃষ্ণের প্রেমের বিবিধ অবস্থা আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব। তাহাতে রূপকভক্তেরা ভরসা করি, দোষ গ্রহণ করিবেন না। আমাদের ত রাধা অথবা কৃষ্ণের সহিত শত্রুতা নাই যে, দোষ বাহির করিয়া তৃপ্ত হইব। তবে গূঢ়ার্থ অপেক্ষা সহজে যাহা চোখে পড়ে, তাহার আলোচনাই সুবিধার বোধ করি।

রাধা বিরহিণী। কৃষ্ণ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গিয়াছেন। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাধার দিন আর ফুরায় না। বাস্তবিক, বিরহে কৃষ্ণের প্রতি রাধার অনুরাগ প্রকাশ পায়।

সকল কবির রাধা অবশ্য সম্পূর্ণ একভাবে ব্যথিত নহেন, তবে মোটামুটি একটা ঐক্য আছে। কৃষ্ণের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়াই রাধার ব্যথা। কোন কোন কবিতায় ফুলশর প্রভৃতিরও উল্লেখবাহুল্য দেখা যায়। রাধার চরিত্রের সহিত অবশ্য অসামঞ্জস্য কিছু ঘটে না। বিরহে রাধার কৃষ্ণের কথাই মনে পড়ে—সেই পুরাতন দিন, হাসি, বাঁশী, নিকুঞ্জ, মানভঞ্জন, এমন অনেক কথা। আবার একটু ভয়ও হয়, পাছে আর কেহ কৃষ্ণকে দখল করিয়া থাকে। সেই আর কেহর উদ্দেশে অনেক প্রকার হিতাকাঙ্ক্ষাজড়িত মধুর সম্ভাষণ এবং আশীর্ব্বাদ প্রয়োগও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। যৌবনটাকে লইয়াও রাধা যে নাড়াচাড়া না করেন, এমন নহে। সহচরীর নিকট দুঃখ করা হয় যে, এই নবযৌবনই যদি বিরহে কাটাইতে হইল, তবে আর প্রিয়ের অনুরাগে ফল কি? এইরূপ বিরহের মধ্যে রাধার অনেক মনের কথা বাহির হইয়া পড়ে। সকল কথা আমরা তুলিতে পারি না; কারণ, সখীদিগের সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হয়, তাহা ত আর সমালোচনার জন্য নহে! গোপনীয় কথার উপর আমরা যেটুকু হস্তক্ষেপ করিয়াছি, তাহাই যথেষ্ট।

রাধার বিরহ প্রধানতঃ দুই ঋতুতে জাগিয়া উঠে—বসন্তে ও বর্ষায়। এ দেশে এই দুই ঋতুই বিরহকাল। বসন্তে যত বিরহিণী বড় বড় দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকেন। সেই উষ্ণ নিশ্বাস টানিয়া লইয়া দীর্ঘ শীতরজনীর পরে বৃক্ষকুল শ্যামল যৌবনে আচ্ছন্ন হইয়া উঠে। রাধা কৃষ্ণ অভাবে বসন্তের সুখভোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকেন। অনেক হা-হুতাশ করেন, সহচরীদিগকে অনেক কথা বলেন। তাহার পর বসন্ত চলিয়া যায়। বসন্তাবসানে কিছু দিন বিরহ একটু চাপা থাকে। আবার আষাঢ়ের নূতন মেঘে বিরহ ঘনাইয়া আসে। কিছু দিন গুমরিয়া গুমরিয়া বর্ষাও ফুরাইয়া যায়। তাহার পর বিরহ অনেক দিন ছাড়া পায়। মধ্যে মধ্যে বারো মাসই একটু আধটু বিরহকান্না শুনা যায়। সকল কবি বোধ করি বারো মাস একঘেয়ে ক্রন্দন সহিতে পারেন না, সেই জন্য বারো মাসের বিরহ অধিক শুনা যায় না। পাঠক এবং লেখক উভয়ের পক্ষেই তাহাতে অনেকটা সুবিধা হইয়াছে বলিতে হইবে।

বিরহের পর মিলন। তখন আর কি নূপুর রুণুঝুনু, বেণী আন্দোলন, যৌবন বন্যা অপেক্ষা প্রবল; বাক্য এবং হাবভাব দুই তরফেই পূর্ণ মাত্রায়। মিলন আলোচনা করিয়া দেখিলে রাধিকার চরিত্রে লজ্জার কত দূর প্রভাব বুঝিবার সুবিধা হয়। লজ্জাই রমণীর শ্রী। সুতরাং রাধিকার অন্তরের শ্রী এইখানে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে। প্রথমে কৃষ্ণের সহিত রাধার প্রথম মিলন আলোচ্য। কারণ, লজ্জা সেইখানেই সমধিক ব্যক্ত। প্রথম মিলনের পূর্ব্বে কৃষ্ণের সহিত রাধার সাক্ষাৎ হইয়াছে, রাধা বাঁশী শুনিয়াছেন। কিন্তু তখন কিছু আর আলাপ হয় নাই। আড়নয়নের উপরেই তখন সকল নির্ভর করিত। তাহার পর

নিকুঞ্জে সম্মিলন। সহজ বুদ্ধিতে যত দূর বুঝা যায়, নিকুঞ্জে রাধিকার ভাব এবং ব্যবহার বড় লজ্জাবৃত নহে। তবে অভ্যস্ত লজ্জাভিনয় কতকটা হইয়াছিল। যেমন, এদেশের রঙ্গমঞ্চে ক্রন্দনের আবশ্যক হইলেই চোখে রুমাল উঠে, প্রেমের কথা উঠিলেই স্বর নাসিকায় আসিয়া আশ্রয় লয়, বীরচরিত্র দেখাইতে হইলেই দেহের মধ্যে উনপঞ্চাশ ছটফটানি এবং কণ্ঠস্বরে উনপঞ্চাশ বায়ু সহসা প্রাবল্য লাভ করে। যথার্থ লজ্জার যে শ্রী, তাহা রাধিকায় দৃষ্ট হয় না। রাধার লজ্জা নিতান্ত কৃত্রিম—নিতান্তই যেন কৃষ্ণকে ধরিবার ফাঁদ পাতা। রাধা বড় লজ্জাবতী নহে। অসংযত চরিত্রে লজ্জা প্রবল হইতে প্রায় পারে না। লজ্জা সংযমের সুশীলা সহচরী।

রাধার মানাভিমানের ব্যাপার মিলনেরই সহিত সম্বদ্ধ। কৃষ্ণ রাধার প্রেমের অপমান করিয়াছেন, রাধা তাই মান করিয়া বসিয়া আছেন। কৃষ্ণ যত সাধ্য সাধনা করিতেছেন, সুন্দরী নীরব—মুখে কথাটি নাই। কিন্তু কৃষ্ণ ত ছাড়িবার পাত্র নহেন, রাধার মন বুঝিয়া তিনি অনেক কথা বলিলেন। রাধা শুনিয়াও শুনেন না, অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছেন। অনেক কষ্টে মান ভাঙ্গিল। তখন আবার পূর্ব্ববৎ। মানভঞ্জনের পরিচ্ছেদ এইখানেই সমাপ্ত।

রাধা প্রণয়িনী, রাধা বিরহিণী, রাধা মানিনীকে আমরা দেখিলাম। এখন অভিসারিকা রাধাকে দেখিলেই আমাদের রাধার চিত্র একরূপ সম্পূর্ণ হয়। অন্যান্য খুঁটিনাটি না দেখিলেও চলে। কারণ, এই কয় ভাবেই রাধা অনেকটা ফুটিয়াছেন।

মেঘের উপর মেঘ করিয়া বহু দিন পরে আবার সেই পুরাতন বর্ষা ফিরিয়া আসিয়াছে। পুরাতন গগনতলে তেমনি করিয়া ধরণী সিক্ত যৌবনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিরহকাতরা রাধিকাসুন্দরী কাতর দৃষ্টিতে সম্মুখের রজনীবিদ্ধ সূচিভেদ্য অন্ধকার পানে চাহিয়া রুদ্ধশ্বাসে শূন্য মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া—বর্ষার অন্ধকার আকাশ ঝরঝর ঝরিয়া যায়, চঞ্চল তড়িল্লতা-বিদীর্ণ হৃদয়ে শ্যাম বিষাদছায়া ঘনাইয়া আসে, দীর্ঘ মেঘগর্জ্জনে দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত মেদিনীর অন্তর শিহরিয়া উঠে—এ দুর্দ্দিনে এ দীর্ঘ বনপথ বাহিয়া একাকিনী রমণী তৃষিত প্রিয়সন্দর্শনে যায় কিরূপে? কিন্তু না যাইলে নয়। সেখানে প্রিয়জন আশাপথ চাহিয়া বসিয়া যে। পথ চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার হৃদয় জরজর। রাধাও গৃহে থাকিতে পারেন না—তাঁহার মন সেখানে। কিন্তু দুর্য্যোগ যে থামে না। বিজন অন্ধকারের মধ্য হইতে দূরে দূরে মকমক ভেককণ্ঠধ্বনি উত্থিত হইতেছে, আর ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ অবিশ্রান্ত ধারাপতনশব্দ।

এই দুর্য্যোগে রাধা ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। পিচ্ছিল পথে পুঞ্জীকৃত অন্ধকার জমিয়া। ঘন বনশ্রেণীর মধ্য দিয়া পথ—কোথাও ঈষৎ স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। পথের কষ্ট প্রিয়াভিমুখগামিনী মনের আবেগে বড় অনুভব করিতে পারিলেন না। এই দুর্গম পথ

অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সম্মিলন। সে সুখের জন্য সকল কষ্টই সহ্য করা যায়।

অভিসার যে কেবলই মেঘাচ্ছন্ন বর্ষার রাত্রে, তাহা নহে। সকল ঋতুতেই অভিসার আছে। তবে বর্ষার অভিসারই রীতিমত গুরুতর ব্যাপার। আমাদের মনে অভিসারের সহিত সাধারণতঃ বর্ষাই ঘনাইয়া আসে। নহিলে, হিমক্লিষ্ট পৌষরজনীতেও অভিসারিকা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের রাধাই এরূপ সময়ে কত বার অভিসারে বাহির হইয়াছেন। চিত্র হিসাবে তাহার সৌন্দর্য্য ন্যূন নহে।

এই গেল অভিসারের কথা। এখন আমরা রাধার চিত্র সম্পূর্ণ দেখিলাম বলিতে পারি। সুতরাং রাধার চরিত্র আলোচনা করিবার সুবিধা হইল। রাধিকা গীতিকাব্যে স্থান পাইবারই বিশেষ উপযুক্ত। কারণ, তাঁহার চরিত্রে চিত্রসৌন্দর্য্য যেরূপ ব্যক্ত, ঘটনা-সৌন্দর্য্য সেরূপ প্রস্ফুটিত নহে। রাধিকা যে ভাবেই চিত্রিত হইয়াছেন, তাঁহার রূপই সমধিক ফুটিয়াছে। ঘটনাবৈচিত্র্যে জীবনের মহত্ত্ব বিকাশ হয় নাই। অবস্থার সহিত গুরুতর দ্বন্দ্ব রাধার কখনও উপস্থিত হইয়াছে শুনা যায় না। গীতিকাব্যে এক একটি ভাবই সম্পূর্ণ হয়। রাধার জীবনের ঘটনাগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র—একেকটি আপনার মধ্যে সম্পূর্ণ। বিরহের সহিত অভিসার অনিবার্য্য নহে, রাধার জীবনে প্রেমের বিবিধ অবস্থা ধারাবাহিক উপন্যাসে বিন্যস্ত নহে। ধারাবাহিকতা উপন্যাসে বিশেষ আবশ্যক। অর্থাৎ ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে সেখানে মানবজীবন গঠিত হয়। রাধার সেই বৃন্দাবন, সেই বাঁশীর স্বর, সেই অভিমান, সেই যমুনার জল, সে বিরহবিলাপ এবং সেই নিকুঞ্জমিলন। ইহাতে ঔপন্যাসিক উপাদান কোথায়? আর নাট্যরস এই অবস্থার মধ্যেই যতটুকু। মেঘদূতের যক্ষে রাধার চরিত্র অপেক্ষা নাট্যরস স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে বোধ হয়। তবে সমাজনিয়মের ব্যতিক্রমে কতকটা যদি নাট্যরস থাকে বলিতে পারি না। ['ভারতী ও বালক,' শ্রাবণ ১২৯৭]

দুষ্মন্ত

কালিদাসের শকুন্তলা দুই কারণে বিখ্যাত।

১ম। এরূপ নাটক সচরাচর দেখা যায় না। এদেশে ত নহেই, পাশ্চাত্য দেশেও বিরল।

২য়। নাটক হিসাবে না দেখিলেও কাব্য হিসাবে ইহার সৌন্দর্য্য ন্যূন নহে। শকুন্তলার কাব্যও অতুলনীয়।

নাটকীয় সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের চরিত্র চিত্রণে এবং ঘটনার বৈচিত্র্য সম্পাদনে প্রকাশ পায়। উপাখ্যানভাগ মহাভারত হইতে গৃহীত হইলেও বৈচিত্র্যে কালিদাসের শকুন্তলা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। কালিদাসের চরিত্রগুলিও অবিকল মহাভারতের অনুরূপ নহে। তাহারা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিত ও শিক্ষাসম্পন্ন। তাহাদের মধ্যে সৌন্দর্য্যের সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয়। সেগুলি যথোচিত ফুটিয়াছে। চরিত্রগত সামঞ্জস্য নাটকের প্রধান উপাদান। কালিদাসে তাহা যথেষ্ট। তাঁহার দুষ্মন্ত রাজ-চরিত্র। কালিদাস সর্ব্বত্রই রাজার রাজভাব বজায় রাখিয়াছেন। কিন্তু রাজা হইলেও দুষ্মন্ত মানুষ ত বটে। সুতরাং কেবল রাজরূপে দেখাইলে দুষ্মন্তের চরিত্র চিত্রণে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটে। কালিদাস সেই জন্য রাজভাবের সহিত মানবভাব এমনি গাঁথিয়া দিয়াছেন যে, তাহাতে দুষ্মন্ত-চরিত্র কিছু মাত্র অসংলগ্ন ঠেকে না। শকুন্তলাও এক দিকে তপোবনপালিতা ঋষিকন্যা, অন্য দিকে রমণী মাত্র। এই উভয় ভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন যে-সে কবির কাজ নহে। কালিদাস শকুন্তলায় দুই ভাব এক করিয়া মিলাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু কোনও ভাবটিই চাপা পড়ে নাই।

কাব্য-সৌন্দর্য্য অভিজ্ঞানশকুন্তলের বর্ণনাগুলিতে বিশেষ পরিস্ফুট। শকুন্তলার রূপ-বর্ণনায়, প্রকৃতির চিত্র অঙ্কনে, হৃদয়ের সৌন্দর্য্য বিকাশনে কালিদাসের অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। প্রকৃতির সহিত মানবহৃদয়ের ভাবগত একীকরণ অল্পসংখ্যক কবিই তাঁহার মত অনুভব করিতে পারেন। তাঁহার ভাব যেমন গভীর, ব্যক্ত করিবার ধরণও তেমনি সুন্দর। রূপ বর্ণনায় অন্যান্য অনেক কবির মত কালিদাস নখশোভায় চন্দ্রকে ম্লান করিয়া, নয়নে খঞ্জনকে গঞ্জনা দিয়া, প্রত্যঙ্গ অপ্রত্যঙ্গ সর্ব্বাঙ্গের নিকট চরাচরের যাবতীয় সুন্দর পদার্থকে হার মানাইয়া কার্য্য আরম্ভ করেন না। কালিদাস সুনিপুণ চিত্রকর। যেমন করিয়া ফুটাইলে শকুন্তলার রূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে ফুটে, তিনি সেইরূপ করিয়া ফুটাইয়াছেন। স্বভাবেও দূর নিকট তাঁহার বর্ণনায় সুব্যক্ত। দূর অস্পষ্ট, সূক্ষ্ম, রেখাবৎ; নিকট স্পষ্ট, স্থূল, যেমন-তেমনি। অসঙ্গতিদোষ কালিদাসে কোথাও দৃষ্ট হয় না। নাটকীয় চরিত্র চিত্রণে যেরূপ, কাব্যসৌন্দর্য্য প্রস্ফুটনেও কালিদাস সেইরূপ সুসামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। এই কারণে নাট্যাংশে না ধরিলেও কাব্যাংশেও শকুন্তলা অসাধারণ রচনা। অভিজ্ঞানশকুন্তলে নাট্য এবং কাব্য, দুই সৌন্দর্য্য মিশিয়াছে।

দুষ্মন্ত এই সৌন্দর্য্যময় কাব্য নাটকের প্রধান চরিত্র—নায়ক। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে, দুষ্মন্ত এ নাটকের উপযুক্ত চরিত্র কি না এবং তাঁহার যোগ্যতা অথবা অযোগ্যতা কোথায়। দুষ্মন্ত ভারতের অধিপতি, সৎকুলোদ্ভব, শীলবান্। তিনি রাজার মত রাজা—প্রজাবৎসল, দুষ্টের দমন, শিষ্টপ্রতিপালক, বিদ্বৎসেবী। এ সকল গুণই

নাটকের নায়কোপযোগী ; এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলের নায়কের বিশেষ আবশ্যক। সুতরাং দুষ্মন্তকে শকুন্তলা নাটকের নায়ক-অযোগ্য বলা যায় না। তবে কেবলমাত্র এই কয় গুণই শকুন্তলানায়কের পক্ষে যথেষ্ট কি না সন্দেহ। শকুন্তলা শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটক। সংস্কৃত অলঙ্কারের নিয়মানুসারে নাটকে শৃঙ্গার অথবা বীররসের প্রাধান্য, অন্যান্য রস কেবল সহায় স্বরূপে। এখন শৃঙ্গাররসপ্রধান নাটকে কেবল মাত্র প্রখ্যাতবংশীয় প্রতাপশালী নায়ক হইলে চলিবে কিরূপে ? স্ত্রীপুরুষের প্রণয় ব্যাপার লইয়াই শৃঙ্গার রসের কারবার। সুতরাং শৃঙ্গারপ্রধান নাটকের নায়ক তদুপযোগী হওয়া চাই। দুষ্মন্ত এবিষয়েও হীন নহেন। প্রণয়-ব্যাপারেই ত শকুন্তলা নাটকে তিনি ফুটিয়াছেন।

দুষ্মন্তের চরিত্র সর্ব্বথা নায়কোপযোগী—বিশেষতঃ অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের। সাহিত্যদর্পণে ধীরোদাত্ত নায়কের যে সকল গুণের উল্লেখ দেখা যায়, তাহা দুষ্মন্তে অনেকটা মিলে বোধ করি। আত্মশ্লাঘা তাঁহার অভ্যাস নহে, হর্ষ বা শোকে তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন না, বিনয়ে তাঁহার গর্ব্ব প্রচ্ছন্ন, অঙ্গীকার প্রতিপালন তাঁহার ধর্ম্ম। ধীরোদাত্ত নায়কের প্রধান উদাহরণ—রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির। দুষ্মন্ত অবশ্য ঐ দুই চরিত্রের সম্পূর্ণ সমকক্ষ নহেন, কিন্তু উহাঁদের কতকগুলি প্রধান গুণ তাহাতে লক্ষিত হয়। দুষ্মন্ত ধর্ম্মপরায়ণ রাজা। তবে সংযম বিষয়ে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার তুলনা হয় না। একপত্নীনিষ্ঠ রামচন্দ্র স্বভাবতই সংযমী। রূপ তাঁহাকে টলাইতে পারে না। দুষ্মন্ত কিছু অধিক মাত্রায় রূপসীপ্রিয়। রূপের মায়া কাটান তাঁহার পক্ষে তত সহজ নহে। দুষ্মন্তের সংযম্ অনেকটা অবস্থা এবং শিক্ষাগত। রূপসী লইয়া এই জন্য তাঁহার স্বভাবের সহিত অবস্থা এবং শিক্ষার মধ্যে মধ্যে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। শকুন্তলাকে লইয়াও হইয়াছিল। তাই প্রবল রূপতৃষ্ণার মধ্যেও শকুন্তলার বর্ণ এবং গোত্র জানিবার ঔৎসুক্য। এটুকু না থাকিলে তাঁহার রাজসম্মান দুই দিনে ভাঙ্গিয়া যাইত।

এখন দেখা গেল, দুষ্মন্ত নায়কোচিত গুণযুক্ত। এবং দুষ্মন্তকে শকুন্তলার নায়কপদে বরণ করিয়া কালিদাস' অবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। তবে দুষ্মন্ত সম্পূর্ণ চরিত্র নহেন বটে। কিন্তু মানবজীবন লাভ করিয়া অসম্পূর্ণতা কাহার না নাই ? আর নাটকে মানব-প্রকৃতিই চিত্রিত হয়। সুতরাং নাটককার সম্পূর্ণ চরিত্র ভিন্ন আঁকিবেন না, এমন কিছু নিয়ম নাই। অসম্পূর্ণতা রামচন্দ্রেরও আছে, যুধিষ্ঠিরেরও আছে, সেক্সপীয়রের চরিত্রগুলিরও আছে, কালিদাসের চরিত্রেরও আছে। তবে অসংলগ্নতা নাটকে বিশেষ দোষ। অর্থাৎ রাজা রাজার মত না হইলে, দুষ্মন্ত দুষ্মন্তের মত না হইলে চরিত্র চরিত্রোপযোগী না হইলে নাটক ব্যর্থ। দুষ্মন্তকে রাজার মুকুট পরাইয়া কণ্বাশ্রমে নীবারধান্যাপহরণে নিযুক্ত করিলে এ দোষ ঘটিত। কিন্তু মানবজাতির উপর চরিত্র-ব্যভিচারের প্রভাব নাটককারের সীমা-

বহির্ভূত নহে। এক দিকে নাটককার যেমন বিবিধ অবস্থার মধ্যে মানবচরিত্রের অটলতা দেখাইবেন, অন্য দিকে সেইরূপ চরিত্রের উপরে অবস্থার গুরুতর প্রভাবও দেখাইতে ত্রুটি করিবেন না। এই অবস্থার প্রভাবেই চরিত্র অনেক সময়ে পরিবর্ত্তিত হয়। ইহাই চরিত্র-ব্যভিচার।

দুষ্মন্তে বড় গুরুতর চরিত্র-ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। তিনি এক জায়গায় বেশ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার নড়ন চড়ন অনেকটা নির্দ্দিষ্ট স্থানবদ্ধ। এইবারে দেখা যাক, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে তিনি ফুটিয়াছেন কিরূপে। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের প্রণয়-ব্যাপারই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের মূল উপাদান। দুষ্মন্ত রাজা, দুষ্মন্ত ধর্ম্মপরায়ণ, কিন্তু প্রণয় বিনা দুষ্মন্ত শকুন্তলার কেহ নহেন। কালিদাস দেখাইয়াছেন, এই ধর্ম্মপরায়ণ রাজহৃদয়ে ধীরে ধীরে কিরূপে তাপসবালার রূপ অধিকার বিস্তার করিল, কিরূপে সুশীল শিক্ষাসংযত দুষ্মন্ত পূর্ণ অন্তঃপুরে পরিতৃপ্ত না হইয়া রূপসীর রূপমোহে আপনাকে ধরা দিলেন। ইহা অস্বাভাবিক অথবা অনন্যপূর্ব্ব নহে। ভোগবিলাসের মধ্যে গঠিত হৃদয় স্বভাবতই রূপসীপ্রিয় একটু অধিক হয়। বিশেষতঃ সে কালে রাজপরিবারে বহুদারপরিগ্রহ প্রচলিত ছিল। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে ধর্ম্মপত্নীরূপেই অঙ্গীকার করেন। রূপসীপ্রিয় বলিয়া তিনি রমণীহৃদয় লইয়া যথেচ্ছা ব্যবহার করিতেন না। হাজার হৌক্, দুষ্মন্ত হিন্দু রাজা। তাঁহার হৃদয় মুসলমান বাদশাহের ন্যায় নির্ম্মম পাষাণ নহে।

শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের যে প্রণয়, তাহা কতকটা দৈবঘটিত। রাজা মৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলেন—শকুন্তলার কথা তিনি আদৌ জানিতেন না—ঋষিদিগের অনুরোধে মৃগবধ হইতে বিরত হইয়া কণ্বাশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কণ্ব সোমতীর্থে গিয়াছেন। অতিথিসৎকারের ভার শকুন্তলার উপরে। দুষ্মন্ত শকুন্তলার শুদ্ধান্তদুর্লভ যৌবনবিকশিত অতুলনীয় রূপমাধুরী দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। রাজা বলিয়া তিনি ত মানবধর্ম্মের অতীত নহেন। শকুন্তলাও দুষ্মন্তমুগ্ধা। উভয়েই পরস্পরের রূপে মজিয়াছেন। শকুন্তলা লতা—রমণী-সুন্দরী। দুষ্মন্ত সুবৃহৎ শালতরু—পুরুষশ্রেষ্ঠ। লতা স্বভাবতই তরুস্নেহে আশ্রয় চায়, তরুও লতাকে আশ্রয় দিয়া পরিতৃপ্ত হয়। সুতরাং দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয় যথোপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু শকুন্তলাকে রাজা কিরূপে লাভ করিবেন? জাতি কুল না জানিয়া ত আর বিবাহ হয় না। শকুন্তলা কণ্বপালিতা—সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণকন্যা। দুষ্মন্তের পক্ষে তাহা হইলে শকুন্তলালাভ অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু মন যখন টানিয়াছে, তখন সহসা ব্রাহ্মণকন্যা স্থির করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। দেখা যাক্, ভাগ্যে কি উঠে।

দুষ্মন্ত কৌশলপূর্ব্বক সখীদিগের নিকট হইতে শকুন্তলার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইলেন। কণ্ব মুনি যে শকুন্তলাকে উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক, তাহা জানিতেও তাঁহার বাকি

রহিল না। আশার কথা বটে। নহিলে, এই অতুল সৌন্দর্য্য হইতে রাজধানীতে তিনি কেবল জ্বালাটুকু মাত্র লইয়া যাইতেন। আশায় আশায় রাজধানীতে যাইতে তাঁহার বিলম্ব পড়িয়া গেল ; কিন্তু যখন ফিরিলেন, তখন শকুন্তলা তাঁহার। আশ্রম হইতে গিয়া মাধব্যের সহিত সে দিবস তাঁহার অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কি ছলে পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইবেন, তাহারও পরামর্শ হইতেছিল। এমন সময় কয়েকজন তপস্বী গিয়া উপস্থিত হইলেন—দুর্বৃত্ত রাক্ষসগণের অত্যাচার হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। দুষ্মন্তের সুবিধাই হইল। কর্ত্তব্য সম্পাদনের সহিত স্বকার্য্য উদ্ধারের অবসর পাইলেন। শকুন্তলার সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইল। এবার একটু ঘনিষ্ঠতাও জন্মিয়াছে। কণ্বের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করা দুষ্মন্তের পোষাইল না। শকুন্তলাকে বুঝাইয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহে সম্মত করিলেন। অবশেষে বিবাহের নিদর্শনস্বরূপ স্বনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন। রাজধানী হইতে শীঘ্রই শকুন্তলাকে লইতে লোকজন পাঠাইবেন।

দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ের ইহাই প্রথম পরিচ্ছেদ। রূপমূলক অনুরাগে দুই জনে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হইলেন। তাহার পর শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান। দুর্ব্বাসার শাপে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়া গিয়াছেন—রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া অবধি আর খোঁজখবর লয়েন নাই। কণ্ব মুনি ইতিমধ্যে সোমতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। দুষ্মন্তের সহিত শকুন্তলার পরিণয়ে তিনি বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। এবং বিবাহের পর দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস অকর্ত্তব্য বলিয়া সসত্ত্বা শকুন্তলাকে বিশ্বস্ত শিষ্যসঙ্গে স্বামীর আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যটি বড় চমৎকার। কালিদাসের স্বভাবানুরাগ এইখানে বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু আপাততঃ বাহুল্যভয়ে তাহার আলোচনা হইতে আমরা নিবৃত্ত হইলাম। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শকুন্তলার স্মৃতি তাঁহার হৃদয় হইতে মুছিয়া গিয়াছে। শকুন্তলাও নিদর্শন-অঙ্গুরীয়কটি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। সুতরাং দুষ্মন্ত তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। কিছু কাল পরে আবার উভয়ের মিলন হইল।

কিন্তু এ ত গেল দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয়ের মোটামুটি কথা। ইহাতে দুষ্মন্তের চরিত্র বুঝা যায় কিরূপে ? সুতরাং আর একটু খুঁটিনাটি আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমতঃ দেখা যাক্, রূপ হইতে কিরূপে ধীরে ধীরে দুষ্মন্তের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চারিত হইল। বিনীতবেশে দুষ্মন্ত তপোবনে প্রবেশ করিয়াছেন। অলঙ্কার, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি রাজসজ্জা সারথির নিকটে। তপোবনে এ সকল শোভা পায় না। কালিদাসের নায়কের সামঞ্জস্য-জ্ঞান বেশ আছে। তপোবনে প্রবেশ করিয়া দুষ্মন্তের দক্ষিণ বাহু স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দক্ষিণ বাহু স্পন্দন পরিণয়সূচক। দুষ্মন্ত ভাবিলেন, এই শান্তিনিকেতনে তাঁহার বাহুস্পন্দন হয় কেন? আবার মনকে প্রবোধ দিলেন, ভবিতব্য অনিবার্য্য—যাহা হইবার হইবেই। সংস্কারের সহিত লোকের মনে যে ভাব আন্দোলিত হয়, দুষ্মন্তেরও তাহাই হইয়াছিল। দুষ্মন্তের মন প্রচলিত সংস্কারের অতীত নহে। স্ত্রীলাভসূচক বাহুস্পন্দনে তাঁহার আনন্দ হইয়াছে। কিন্তু তপোবনে স্ত্রীলাভের তাদৃশ সম্ভাবনা না থাকায় ভবিতব্যতার উপরেই তাঁহাকে নির্ভর করিতে হইল। এ নির্ভরও কিন্তু সন্দেহজড়িত।

এমন সময়ে নেপথ্যে রমণীকণ্ঠ শুনা গেল—"ইদো ইদো সহীও।" দুষ্মন্ত দেখিলেন, ঋষিকন্যারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘট হস্তে বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতেছেন। এ দৃশ্য দুষ্মন্তের বড়ই ভাল লাগিল। স্বভাবতই তাঁহার মনে হইল,

"অহো মধুরমাসাং দর্শনম্।
শুদ্ধান্তদুর্লভমিদং বপুরাশ্রমবাসিনো যদি জনস্য।
দূরীকৃতা খলু গুণৈরুদ্যানলতা বনলতাভিঃ॥"

এবারে উদ্যানলতা বনলতার নিকট হার মানিয়াছে। আশ্রমবাসিনীর এমন রূপ! রাজ-অন্তঃপুরেও যে এ রূপমাধুরী দুর্লভ। দুষ্মন্ত বিস্ময়মুগ্ধ।

এই প্রথম শকুন্তলার রূপ দুষ্মন্তের হৃদয়ে আঘাত করিল। কিন্তু এ আঘাত তেমন কিছু নহে। রূপ মানবহৃদয়ে অল্পবিস্তর আঘাত করেই। তাহার কারণ, আমাদের সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা। সুন্দর পদার্থ সহজেই নয়ন আকর্ষণ করে, মন মুগ্ধ করে। সৌন্দর্য্যের ধর্ম্মই এই। দুষ্মন্তও শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এ অবস্থা প্রেম নহে। তবে ইহা হইতেই প্রেম অনেক সময়ে জন্মে বটে। দুষ্মন্তের এখন বিস্ময়ের ভাব। ক্রমে ক্রমে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার একটু দয়ার উদ্রেক হইল। শকুন্তলা জলসেচন করিতে করিতে সখীদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। দুষ্মন্ত ঠাহরাইলেন, শকুন্তলাকে আশ্রমধর্ম্মে নিযুক্ত করা কণ্বের অসাধুদর্শিতা। এ স্বভাবসুন্দর অতুল রূপরাশি তপঃসাধনে ক্ষয় করিবার চেষ্টা নীলোৎপলপত্রধারে শমীবৃক্ষ ছেদনের ন্যায়। কিন্তু কি করিবেন? এ বিষয়ে তাঁহার ত হাত নাই। অগত্যা গাছের আড়ালেই চুপ করিয়া থাকিতে হইল। সেখান হইতে তিনি শকুন্তলার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছেন। বল্কলেও তন্বী মনোহারিণী। স্বভাবসুন্দরীর অলঙ্কারে প্রয়োজন কি? মলিন কলঙ্কেও চন্দ্রের সৌন্দর্য্য। রাজা শকুন্তলার এই অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট। এ সৌন্দর্য্যের তুলনা কোথা?

এতক্ষণ দুষ্মন্ত মোটামুটি শকুন্তলার রূপ দেখিলেন। শকুন্তলার সৌন্দর্য্যে ভাবের প্রাধান্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এ ভাবপ্রধান সৌন্দর্য্যে কে না মুগ্ধ হয়? অলঙ্কারে নয়ন আকর্ষণ করিতে পারে মাত্র। অতুল ঐশ্বর্য্য রাজার হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না।

তাঁহার নয়নও সে দিকে ফিরিয়া দেখে না। রূপসীপ্রিয় রূপ খুঁজেন। সুতরাং দুষ্মন্তের পক্ষে স্বভাবসুন্দরীর রূপে মুগ্ধ হওয়া অস্বাভাবিক অথবা দুষ্মন্তের চরিত্রগত অসাধারণ বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে। সেলিম নুরজাহানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তখন নুরজাহান দরিদ্রের কন্যা। স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যই তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল বোধ করি। কালিদাসের হাতে পড়িলে তিনিও বলিতেন, সৌন্দর্য্য স্বভাবতই সুন্দর—অলঙ্কারে তাহার আর কি হইবে। ইহা হইতে চরিত্রগত বিশেষত্ব কিছুই প্রমাণ হয় না। তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, দুষ্মন্তের রুচি বিকৃত নহে। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে মোটামুটি দেখিয়াছেন; এইবারে একটু খুঁটিনাটি। শকুন্তলার অধর কিরূপ? বাহু কেমন সুন্দর? ইত্যাদি। ভাবিয়া চিন্তিয়া মোটামুটি হইতে দুষ্মন্ত খুঁটিনাটিতে নামেন নাই। যেমন চোখে পড়ে তিনি দেখিয়াছেন। এ সকল না দেখিয়া থাকিবার যো নাই। শকুন্তলার

"অধরঃ কিসলয়রাগঃ কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ।
কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধং॥"

কিন্তু এমন সুন্দরীকে পাওয়া যায় কিরূপে? দুষ্মন্ত যতই দেখিতেছেন, শকুন্তলা-লাভস্পৃহা তাঁহার ততই বলবতী হইয়া উঠিতেছে। শকুন্তলা যদি কণ্বের অসবর্ণক্ষেত্র-সম্ভবা হয়। হইতেও পারে। "সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ"। সন্দেহস্থলে অন্তঃকরণের প্রবৃত্তিই প্রমাণ। কিন্তু তাহা বলিয়া ত আর শকুন্তলা লাভ হয় না। শকুন্তলার বৃত্তান্ত যথার্থ জানিতে হইবে। ব্রাহ্মণকন্যা হইলে ত আর বিবাহ হইবে না। দুষ্মন্ত বড় সমস্যায় পড়িয়াছেন। এইখানেই তাঁহার সংযম যাহা কিছু প্রকাশ পায়। তেমন অসংযত-চরিত্র হইলে তিনি জাতি বিচার করিতে বসিতেন না। দুষ্মন্তের সংযমের পরিচয় প্রথম—বিবাহের বাসনায়, দ্বিতীয়—শকুন্তলার জাতি বিচারে। আত্মসুখের দুয়ারে শকুন্তলাকে তিনি বলি দিতে চাহেন না। ইহাতেই তাঁহার প্রেম বুঝা যায়। এবং এই অবধিই দুষ্মন্তের সংযম। আর অসংযম তাঁহার ভোগ-অধীরতায়। পূর্ণ অন্তঃপুরেও অপরিতৃপ্তিই তাহার প্রমাণ। রূপসী দেখিলে দুষ্মন্তের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি সহজে প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন না।

এখন দেখিতে হইবে, দুষ্মন্তের সংযম কত দূর স্বাভাবিক এবং কিরূপ প্রবল। আমরা দেখিলাম, রূপের বশ হইয়াও তিনি শকুন্তলার জাতি বিচার করিতেছেন। কিন্তু এইখানে কথা আছে। দুষ্মন্ত ভারতের রাজা। প্রজাদিগের নিকট তাঁহার যথেষ্ট সম্মান আছে। প্রতাপশালী হইয়াও এই সম্মানটুকু রাখিবার জন্য তাঁহাকে সাবধানে চলিতে হয়। যথেচ্ছা ব্যবহার করিলে প্রজা অসন্তুষ্ট হইবে, সম্মান ত থাকিবেই না। এই কারণেই দুষ্মন্ত অনেকটা সংযত। রাজা না হইলে বোধ করি, তাঁহার এতটা সম্মান চাহিয়া থাকিতে হইত না।

সুতরাং সংযমও থাকিত না। রাজ-সম্মানই তাঁহার ইন্দ্রিয়শাসক। তবে স্মৃতিভ্রষ্ট হইয়া পরিণীতা শকুন্তলাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন কেন? ঋষিদের কথায় পর্য্যন্ত তিনি শকুন্তলাকে গ্রহণ করেন নাই। তেমন রূপসীপ্রিয় হইলে এ অবসর কি ছাড়িতেন? শকুন্তলাকে তখন গ্রহণ না করিবার দুই কারণ। এক, শকুন্তলা সসত্ত্বা। কাহার পুত্রকে দুষ্মন্ত আপনার বলিয়া গ্রহণ করিবেন? দ্বিতীয়, রাজ-সম্মানের সহিত শকুন্তলা-গ্রহণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহার সম্মান বজায় রহিল।

সুতরাং দেখা গেল, দুষ্মন্তের সংযম অবস্থা এবং শিক্ষাগত। শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহে সম্মত করাইবার সময়ে বুঝা যায়, স্বভাবতঃ তিনি বড় সংযতচরিত্র নহেন। শকুন্তলার সখীরা দূরে গিয়াছেন। শকুন্তলা তাঁহাদের নিকটে যাইতে চাহেন। দুষ্মন্ত ছাড়িতে চাহেন না। শিক্ষা এবং অবস্থার সহিত তাঁহার স্বভাবের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। স্বভাবের জয়। তবে একটা কথা। ইহা হইতে দুষ্মন্তকে কেহ নিতান্তই ইন্দ্রিয়ের ভক্ত সেবক না ঠাহরাইয়া বসেন। ইন্দ্রিয়জয়ে তিনি যত্নশীল এবং কতকটা সক্ষমও। তথাপি রূপ তাঁহাকে কিছু অস্থির করে। দুষ্মন্ত রামচন্দ্র নহেন বলিয়াই কিন্তু তাঁহার নিন্দা করা চলে না। প্রবল রূপাকর্ষণের মধ্যেও যে তাঁহার জ্ঞান কার্য্য করিতে থাকে। ইহাই যথেষ্ট। দুষ্মন্ত যাহাই হউন, অসম্পূর্ণ মানবসন্তান। ত্রুটি একটু আধটু মার্জ্জনা করিতে হইবে। তবে রোমিওর সহিত তুলনা করিয়া আমরা তাঁহাকে বাড়াইতে চাহি না। কারণ, দুষ্মন্ত একজন গণ্যমান্য বিজ্ঞ রাজা, আর রোমিও বড় ঘরের ছেলে মাত্র। উভয়ের তুলনা নিতান্তই অসঙ্গত হয়।

আমরা দুষ্মন্তকে সন্দেহের অবস্থায় ছাড়িয়া আসিয়াছি। তিনি ভাবিতেছেন, শকুন্তলা ব্রাহ্মণী কি না। এদিকে শকুন্তলাকে একটা ভ্রমর বড় বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি সখীদিগকে সেই দুর্ব্বিনীত মধুকর হইতে তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে বলিতেছেন। সখীরা বলিলেন, তাঁহারা কে? তপোবনরক্ষা রাজার কার্য্য—শকুন্তলা দুষ্মন্তকে আহ্বান করুন। দুষ্মন্ত এইবার অবসর বুঝিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইয়া বলিলেন, দুষ্মন্ত রাজা থাকিতে তাপস-বালার প্রতি অবিনয় আচরণ করে কে? তাহার পর যথারীতি তপোবনের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। অনসূয়া শকুন্তলাকে পর্ণশালা হইতে পাদোদক প্রভৃতি আনিতে বলিলেন। দুষ্মন্ত কহিলেন, তাঁহাদের মধুর বাক্যেই আতিথ্য করা হইয়াছে। দুষ্মন্ত বাক্যালাপে বিলক্ষণ পটু। মধুরালাপচ্ছলে অল্পক্ষণমধ্যেই শকুন্তলার বৃত্তান্ত জানিতে তাঁহার বাকি রহিল না। যতই জানিতেছেন—শকুন্তলা দুষ্প্রাপ্য নহে, শকুন্তলাকে পাইবার ইচ্ছা ততই প্রবল হইতেছে। এমন কি, শকুন্তলা যখন উঠিয়া যান, দুষ্মন্তের হৃদয় তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও অগ্রসর হইয়াছিল। কেবল "বিনয়েন বারিতপ্রসরঃ।"

দুষ্মন্ত শকুন্তলায় মজিয়াছেন। শকুন্তলার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি। শকুন্তলার প্রত্যেক ভাবভঙ্গী তিনি বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন। সুন্দরী দুষ্মন্তে অনুরক্তা। কিন্তু সে অনুরাগ ত মুখে প্রকাশ পায় না। সে অনুরাগের প্রমাণ,

"বাচং ন মিশ্রয়তি যদ্যপি মদ্বচোভিঃ
কর্ণং দদাত্যবহিতা ময়ি ভাষমাণে।
কামং ন তিষ্ঠতি মদাননসম্মুখীনা
ভূয়িষ্ঠমন্যবিষয়া ন তু দৃষ্টিরস্যাঃ॥"

শকুন্তলা দুষ্মন্তের কথায় যদিও কিছু বলেন না, দুষ্মন্ত কথা কহিলে কাণ খাড়া করিয়া থাকেন। দুষ্মন্তের পানে তিনি যথেষ্ট চাহিয়া থাকেন না, কিন্তু অন্য দিকেও বড় দৃষ্টি নাই। দুষ্মন্তের শকুন্তলা-হৃদয় বুঝিতে বাকি নাই। তাঁহার পূর্ণ অন্তঃপুর—সরলা আশ্রমবাসিনীর ভাব বুঝিতে কত ক্ষণ লাগে।

বহু ক্ষণ মধুরালাপানন্তর আশ্রমবাসিনীরা পর্ণশালায় প্রত্যাগমন করিলেন। দুষ্মন্তও বিদায় লইলেন। বিদায়কালে দুষ্মন্তকে সখীরা বেশ গুছাইয়া বলিলেন যে, তাঁহারা অতিথির যথাযোগ্য সৎকার করিতে পারিলেন না বলিয়া বড় লজ্জিত আছেন, কোন্ মুখে আর তাঁহাকে পুনরায় আসিতে বলেন, ইত্যাদি। দুষ্মন্তও আপ্যায়িত করিতে কম নহেন। তিনি বিনয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তাঁহাদের দর্শনেই তিনি পুরস্কৃত। শকুন্তলা বল্কল কুরবকশাখালগ্ন হইয়াছে ছল করিয়া যত ক্ষণ পারেন, রাজাকে দেখিয়া লইলেন। দুষ্মন্ত ধীরে ধীরে চলিয়াছেন। নগরগমনে তাঁহার বড় ইচ্ছা নাই। শকুন্তলা হইতে তিনি মনকে ফিরাইতে অক্ষম। তপোবনের অনতিদূরেই তাই আপাততঃ থাকিবেন স্থির করিলেন। অভিজ্ঞানশকুন্তলের প্রথম অঙ্ক এইখানেই সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্কে বিদূষক মাধব্যের সহিত দুষ্মন্তের কথাবার্ত্তা। সে সকল কথাবার্ত্তার বিশেষ বিবরণ এখানে অনাবশ্যক। তবে শকুন্তলা সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইয়াছিল বটে। বিদূষকের সহিতই সে কালে রাজাদের মন-খোলাখুলি। যে সকল কথা অপরকে বলা যায় না, বিদূষক তাহা জানিতে পারেন। দুষ্মন্ত ব্রাহ্মণকে শকুন্তলার রূপ নানারূপে বুঝাইয়াছেন। রূপবর্ণনাগুলি কালিদাসেরই যোগ্য। তাহার আর সমালোচনা কি করিব! দুষ্মন্তই ত বলিয়াছেন, সে রূপ যে দেখে নাই, তাহার নয়ন বৃথা। বিধাতা তাহাকে সৌন্দর্য্য মন্থন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সে দেহ স্রষ্টার সামর্থ্যের চূড়ান্ত পরিচয়।

সুতরাং এ রূপ দেখিয়া অবধি দুষ্মন্তের আর তৃপ্তি নাই। দুষ্মন্ত শকুন্তলার দর্শনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। কি ছলে পুনর্ব্বার আশ্রমে যাইবেন, মাধব্যের সহিত তাহাই পরামর্শ করিতেছেন। এই সময়ে রাক্ষসপীড়িত ঋষিগণের আগমনে তাঁহার সুবিধাই হইল।

অত্যাচার প্রতীকারের ছলে তিনি সহজেই তপোবনে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবেন। কিন্তু এক বিঘ্ন উপস্থিত। রাজমাতা ব্রত করিবেন। দুষ্মন্তকে রাজধানীতে যাইতে হইবে। দুষ্মন্ত বড় সমস্যায় পড়িলেন। দুই দিক্ রক্ষা করা সহজ নহে। অগত্যা স্থির করিলেন যে, মাধব্যকে রাজমাতা সন্নিধানে পাঠাইয়া নিজে ঋষিদিগের কার্য্যে তপোবনে যাইবেন। মাধব্যকে রাজমাতা পুত্রের মত স্নেহ করেন। সুতরাং তাহাকে পাইলে তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইবেন। আর নিজে তপোবন রক্ষা দ্বারা ঋষিদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন। অধিকন্তু তপোবনে শকুন্তলাদর্শনলাভ সম্ভাবনা। কিন্তু মাধব্য যদি রাজ-অন্তঃপুরে শকুন্তলার কথা বলিয়া বসেন! সেই জন্য দুষ্মন্ত মাধব্যকে বুঝাইয়া দিলেন যে, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার অনুরাগ সত্য নহে—এত ক্ষণ পরিহাস করিতেছিলেন মাত্র। ঋষিদিগের অনুরোধেই তাঁহাকে তপোবনে যাইতে হইতেছে। ইচ্ছা তেমন নয়।

এইরূপ বুঝাইয়া মাধব্যকে রাজা রাজধানীতে পাঠাইলেন। নিজে তপোবনে চলিলেন। দুষ্মন্ত বুঝেন, শকুন্তলা পরাধীনা, কণ্বের অনুজ্ঞা ভিন্ন তাঁহার সহিত শকুন্তলার বিবাহ হইতে পারে না। কিন্তু বুঝিলে কি হয়? মন যে বুঝিয়াও বুঝে না। মানব দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে না দেখিয়া থাকিতে পারেন না। মালিনীতীরে শকুন্তলা সখীদিগের সহিত বিশ্রাম করিতেছিলেন। রাজা সেখানে গিয়া উপস্থিত। দুষ্মন্ত এবারেও বৃক্ষান্তরালে। শকুন্তলা কৃশ হইয়া পড়িয়াছেন, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। দুষ্মন্ত কারণ নির্দ্দেশ করিলেন আতপতাপ। আবার ভাবিলেন, হয় ত শকুন্তলারও মনের অবস্থা তাঁহারই মত। সখীরাও তাহাই ঠাহরাইয়াছেন। কিন্তু শকুন্তলার মুখ হইতে একবার না শুনিলে তাঁহাদের হৃদয় তৃপ্তি মানে না। সখীরা নানা উপায়ে শকুন্তলার মনের কথা জানিতে চেষ্টা করিতেছেন। শকুন্তলা মুখ ফুটিয়া বড় কিছু বলেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বলিয়াও ফেলিলেন। দুষ্মন্ত গাছের আড়াল হইতে সকল শুনিতেছেন। তিনি শকুন্তলার ভাব বুঝিলেন। শকুন্তলা রাজার জন্যই ব্যাকুল। রাজা বিহনে তাঁহার প্রাণ সংশয়। দুষ্মন্তের একটু আনন্দ হইল। ভালবাসার প্রতিদানে যথার্থই আনন্দ হয়। দুষ্মন্তও শকুন্তলা-সম্মিলনের জন্য অধীর। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া দুষ্মন্ত বৃক্ষান্তরাল হইতে বাহির হইলেন। প্রেমালাপ আরম্ভ হইল। দুষ্মন্তই অনেক কথা বলেন। পাশ্চাত্য রমণীর মত শকুন্তলা প্রেমালাপে দক্ষা নহেন। লজ্জা-নীরবতাই তাঁহার প্রেমভাষা। সখীরাই এ প্রেমের ঘটক। বলিতে কি, তাঁহারই অর্দ্ধেক ভাষা।

অনসূয়া কথায় কথায় বলিলেন—শুনা যায়, রাজারা বহু দার পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, শকুন্তলার অবস্থা যাহাতে শোচনীয় না হয়, দুষ্মন্তকে এরূপ করিতে হইবে। দুষ্মন্ত উত্তর দিলেন, রাজাদের পত্নীসংখ্যা কিঞ্চিৎ অধিক বটে, কিন্তু সকলগুলি ত আর সমান নয়,

"পরিগ্রহবহুত্বেহপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্রবসনা চোর্ব্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্ ॥"

প্রিয়সখী শকুন্তলার বিষয় ভাবিতে হইবে না। শকুন্তলা প্রধানা মহিষী হইবেন।

সখীরা এত ক্ষণে নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিয়া গেলেন। দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে পাইয়া বসিলেন। শকুন্তলা উঠিয়া যাইতে চাহেন। দুষ্মন্ত বলপূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত করেন। শকুন্তলা তখন বলিলেন, "পোরব রক্খ অবিণঅং মঅণসন্তত্তা বি ণহু অত্তণো পভবামি।" পৌরব! অবিনয় আচরণ করিও না। মদনসন্তপ্তা হইলেও আমার নিজের উপর আমার ক্ষমতা নাই। শকুন্তলা এ অবস্থায়ও একেবারে জ্ঞানহারা হয়েন নাই। লজ্জাশীলার কর্ত্তব্যজ্ঞান এখনও প্রবল। কিন্তু দুষ্মন্ত সংযম হারাইয়াছেন। শকুন্তলা পরাধীনা জানিয়াও তিনি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। দুষ্মন্ত গান্ধর্ব্ব বিবাহের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিতে চাহেন। শকুন্তলা তথাপি বুঝেন না। দুষ্মন্ত তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে অস্বীকার করিলেন। তিনি কখন্ ছাড়িয়া দিবেন ? না—যখন শকুন্তলার অধর পানে তাঁহার পিপাসা নিবৃত্ত হইবে।

"অপরিক্ষতকোমলস্য যাবৎ
কুসুমস্যেব নবস্য ষট্পদেন।
অধরস্য পিপাসতা ময়া তে
সদয়ং সুন্দরি গৃহ্যতে রসোঽস্য ॥"

এই কারণেই আমরা বলি, দুষ্মন্তের চরিত্র সংযমপ্রধান নহে। রূপমোহের প্রথমাবস্থায় জ্ঞানক্রিয়া অল্পবিস্তর সকলেরই প্রবল থাকে। ক্রমে ক্রমেই লোকে জ্ঞানহারা হয়। দুষ্মন্তও তাহাই হইয়াছেন। ভোগাবসর তিনি ছাড়িতে চাহেন না। তবে পদমর্য্যাদা তাঁহাকে সমাজ-নিয়মের গুরুতর অবমাননা হইতে রক্ষা করে। দুষ্মন্ত রূপমুগ্ধ হইয়াও দেখেন যে, সমাজের প্রচলিত নিয়মানুসারে এরূপ মিলন অসঙ্গত হইবে কি না। সমাজ-নিয়ম উল্লঙ্ঘন তাঁহার স্বভাব নহে। তবে রিপু তাঁহার কিছু প্রবল। চেষ্টা করিয়াও সকল সময়ে তিনি তাহাকে দমন রাখিতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য নানা গুণে তাঁহার এ দোষ অনেকটা ঢাকিয়া গিয়াছে।

দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে গান্ধর্ব্ব বিধানানুসারেই বিবাহ করিলেন। শকুন্তলা দুষ্মন্তের ইচ্ছা অতিক্রম করিতে অক্ষম। বিবাহানন্তর রাজা রাজধানীতে ফিরিয়া চলিলেন। শকুন্তলাকে স্বনামাঙ্কিত একটি নিদর্শন-অঙ্গুরীয়ক দিয়া গেলেন। শকুন্তলা আশাপথ চাহিয়া বসিয়া আছেন—তাঁহাকে লইতে কবে লোক আসে।

ইতিমধ্যে এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি আসিয়া উপস্থিত। শকুন্তলা একমনে দুষ্মন্তকে চিন্তা করিতেছেন। দুর্ব্বাসা আসিয়া দূর হইতেই বলিলেন,—"অয়মহং ভোঃ।" অন্যমনস্ক

থাকায় শকুন্তলা শুনিতে পাইলেন না। দুষ্মন্তই তখন তাঁহার হৃদয় জুড়িয়া। দুর্ব্বাসা শাপ দিলেন, শকুন্তলা যাঁহার ধ্যানে মগ্ন, তিনি শকুন্তলাকে বিস্মৃত হইবেন। সখীরা অভিশাপ শুনিতে পাইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঋষিবরের চরণে পতিত হইলেন। অনেক কষ্টে দুর্ব্বাসার ক্রোধের উপশম হইল। তখন তিনি কহিলেন, শাপ ত ব্যর্থ হইবার নহে, তবে অভিজ্ঞানাভরণ দর্শনে দুষ্মন্তের স্মৃতি ফিরিয়া আসিবে। এই দুর্ব্বাসার শাপ অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটকের মেরুদণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; এখন হইতে অভিজ্ঞানশকুন্তলের যাহা কিছু ঘটনা, এই শাপপ্রভাবে।

এই শাপপ্রভাবে দুষ্মন্ত রাজধানীতে গিয়া শকুন্তলার কথা ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং শকুন্তলাকে লইতে লোকজন কেহই আসিল না। কণ্ব মুনি সোমতীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের পরিণয়ে আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। শিষ্যসঙ্গে তিনি শকুন্তলাকে স্বামীর আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। কারণ, বিবাহের পর স্ত্রীলোকের দীর্ঘকাল পিতৃগৃহে বাস বাঞ্ছনীয় নহে। শকুন্তলার বিদায়-দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেম এইখানে বিশেষ প্রকাশ পায়। প্রকৃতির সহিত শকুন্তলা এক। শকুন্তলা প্রকৃতিরই কন্যা। বিদায়কালে প্রত্যেক তরুলতার জন্য শকুন্তলার মন ব্যাকুল। এ সকল কি আর কখনও দেখা ভাগ্যে ঘটিবে। কণ্ব যথাসাধ্য শকুন্তলাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। কণ্বের কথাগুলি শুনিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। শকুন্তলাকে তিনি আশীর্ব্বাদের সহিত যে উপদেশ দিলেন, তাহাপেক্ষা অল্প কথায় ঐরূপ সুন্দর উপদেশ বোধ করি, কেহই দিতে পারেন না। তিনি কহিলেন,

"সা ত্বমিতঃ পতিকুলং প্রাপ্য
শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরু প্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্ত্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভাগ্যেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ॥"

তুমি এখান হইতে পতিকুলে গিয়া গুরুজনদিগের শুশ্রূষা করিবে, সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় আচরণ করিবে, অপমানিতা হইলেও ক্রোধবশে স্বামীর প্রতিকূলচারিণী হইবে না, সৌভাগ্যে অগর্ব্বিতা থাকিবে, পরিজনে অনুকূলা হইবে। যুবতীরা এইরূপেই গৃহিণীপদ প্রাপ্ত হয়েন। বিপরীতচারিণীরা কুলের যাতনাস্বরূপ।

শকুন্তলা এ উপদেশ কখনও বিস্মৃত হয়েন নাই।

শকুন্তলা রাজধানীতে চলিলেন। সঙ্গে গৌতমী, শার্ঙ্গরব, শারদ্বত। দুষ্মন্তের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু রাজা শকুন্তলাকে চিনিতে পারিলেন না। শকুন্তলার রূপ

কেবল তাঁহার চক্ষু আকর্ষণ করিল। শকুন্তলাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, পাণ্ডুপত্রমধ্যে কিসলয়ের ন্যায় তপোধনদিগের মধ্যে নাতিস্ফুটশরীরলাবণ্যা অবগুণ্ঠনবতী ঐ রমণী কে? প্রতিহারী বলিল, ইহাঁর আকৃতি দর্শনীয় বটে। রাজা বলিলেন, কিন্তু পরস্ত্রী দর্শনার্হা নহে। শকুন্তলার হৃৎকম্প হইতেছে। এ অবস্থায় কাহার না হয়? শার্ঙ্গরব ধীরে ধীরে শকুন্তলার কথা বলিলেন। দুষ্মন্ত কিছুই বুঝিতে পারেন না। তিনি আবার তপোবনে বিবাহ করিয়া আসিলেন কবে? গৌতমীও শকুন্তলা-পরিণয়ের বৃত্তান্ত বলিলেন। দুষ্মন্ত অবাক্। এখন গৌতমী শকুন্তলার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া দিলেন। দুষ্মন্ত তাহাতেও চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু সেই রূপরাশি দেখিয়া তিনি কি ভাবিলেন? তিনি যাহা ভাবিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্র ব্যক্ত।

"ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্টকান্তি
প্রথমপরিগৃহীতং স্যান্নবেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং
ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥"

এই অম্লানশোভা রূপরাশি এখানে আসিয়া উপস্থিত। পূর্ব্বে ইহাকে বরণ করিয়াছি কি না, কে জানে। ভ্রমর যেমন প্রভাতে হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমকে ভোগ করিতেও পারে না, ছাড়িতেও পারে না, আমিও সেইরূপ এই রূপরাশি ভোগ করিতেও পারিতেছি না, ছাড়িতেও পারিতেছি না।

ক্রমে ক্রমে শকুন্তলাকেও মুখ খুলিতে হইল। তিনি অনেক প্রমাণ প্রয়োগ করিলেন। কিন্তু স্মৃতিভ্রষ্ট রাজার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল না। তখন শকুন্তলা অভিজ্ঞানের উল্লেখ করিলেন। দুষ্মন্ত বলিলেন, বেশ কথা, অভিজ্ঞান দেখিলে সকল সংশয় ঘুচিবে। শকুন্তলা অঙ্গুলীতে হাত দিয়া দেখেন—অঙ্গুরীয়ক নাই। বুঝিলেন, নিতান্তই তাঁহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। শকুন্তলা আপনাকে দুষ্মন্তপত্নী বলিয়া কিছুতেই প্রমাণ করিতে পারিলেন না। ক্রোধে অপমানে লজ্জায় এবং তদুপরি বন্ধুজনের কঠোর বচনে শকুন্তলা মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভঅবই বসুহে দেহি মে বিঅরং।" 'বসুধা স্থান দিলেন না। শকুন্তলা কাঁদিতে কাঁদিতে বাহির হইয়া গেলেন। "স্ত্রীসংস্থানং জ্যোতিঃ" আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। দুষ্মন্ত পুরোহিতের মুখে এ ঘটনা শুনিলেন। তাঁহার হৃদয় বড়ই কাতর। শকুন্তলার বিবাহের কথাও মনে পড়িতেছে না, হৃদয়ও শান্ত হইতেছে না। এমন সংশয়ে দুষ্মন্ত কখনও পড়েন নাই।

কিছু দিন পরে সেই অঙ্গুরীয়ক পাওয়া গেল। এক ধীবর মৎস্যের উদর হইতে অঙ্গুরীয়ক পায়। রাজকর্ম্মচারীরা ধীবরকে সন্দেহ করিয়া ধরিয়া আনে। দুষ্মন্ত অঙ্গুরীয়ক

দেখিয়াই সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। ধীবর পুরস্কার পাইল। রাজা শকুন্তলার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু নিরুপায়। হাতের লক্ষ্মী তিনি পায়ে ঠেলিয়াছেন। এখন আর দুঃখ করিয়া ফল কি? শকুন্তলা কি আর মিলিবে? দুষ্মন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া শুকাইয়া যাইতেছেন। সে দুষ্মন্ত আর নাই। রাজা এখন স্ফূর্ত্তিহীন, কোন প্রকারে জীবনভার বহন করিতেছেন মাত্র।

কিন্তু শকুন্তলা মিলিল। দেবকার্য্যে রাজা দ্যুলোকে গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিরিবার সময়ে শকুন্তলার সহিত সাক্ষাৎ। শকুন্তলার পুত্র সর্ব্বদমনকে দেখিয়া রাজা একটু বিস্মিত হয়েন। শকুন্তলার পুত্র বলিয়া এ বিস্ময় নহে—রাজা তাহা জানিতেন না—এই তপস্বিপরিবৃত স্থানে চক্রবর্ত্তিলক্ষণাক্রান্ত বালক দেখিয়াই তাঁহার বিস্ময়। তাহার পর সর্ব্বদমনের পরিচয় শুনিয়া এবং তাহার মাতাকে দেখিয়া দুষ্মন্তের আনন্দের সীমা রহিল না। শকুন্তলা প্রথমে অনুতাপে জীর্ণ শীর্ণ রাজাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে যখন পরস্পর পরস্পরকে জানিলেন, তখন বহুদিনের শোক তাপ ঘুচিয়া গেল। দুষ্মন্ত পুত্র সহ শকুন্তলাকে স্বালয়ে লইয়া আসিলেন। সকল দুঃখ অবসান হইল।

এত ক্ষণে আমরা প্রণয়ী দুষ্মন্তের চিত্র সম্পূর্ণ করিলাম। দুষ্মন্তের প্রণয়ব্যাপার জানিতে আমাদের আর বাকি নাই। এখন এক বার এত ক্ষণ দুষ্মন্তের চরিত্র আলোচনা করিয়া যাহা দেখিলাম, এইখানেই সংক্ষেপে পুনরুল্লেখ করি।

১। দুষ্মন্ত কিছু অধিকমাত্রায় রূপসীপ্রিয়। রূপ দেখিলেই তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। শকুন্তলাকে তিনি যখন যেখানে দেখিয়াছেন, তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। এমন কি, শকুন্তলাকে পরের স্ত্রী মনে করিয়াও দুষ্মন্ত তাঁহার রূপে ঈষৎ কটাক্ষপাত করিতে ছাড়েন নাই।

২। কিন্তু রূপসীপ্রিয় বলিয়া দুষ্মন্ত দুরাচার নহেন। অর্থাৎ রূপসীর রূপরাশি কলঙ্কিত করিয়া তিনি মজা দেখেন না। রূপসীকে তিনি ধর্ম্মপত্নীরূপে বরণ করিয়া আনিয়া স্বীয় অন্তঃপুরের শোভা বর্দ্ধন করিতে চাহেন। কিন্তু বলপূর্ব্বক নহে।

৩। স্বভাবতঃ দুষ্মন্তের সংযমশক্তি বিশেষ প্রবল বলা যায় না। অধিক রূপসীপ্রিয়তা সংযমের বিপক্ষেই প্রমাণ দেয়। কিন্তু অবস্থা এবং শিক্ষাগুণে তিনি কতকটা সংযত। রাজসম্মান তাঁহাকে অনেক সময়ে বাঁচাইয়া দেয়। সামাজিক নিয়ম উলজ্ঘন না করিয়া এবং প্রজাদিগের বিরাগভাজন না হইয়া রূপ 'উপভোগের অবসর তিনি সহজে পরিত্যাগ করেন না। অন্তঃপুরের অভিমান তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন না।

৪। রাজসম্মানই যে সকল সময়ে দুষ্মন্তের সংযমের কারণ, তাহা নহে। ধর্ম্মও অনেক সময়ে। রূপের প্রলোভনে তাঁহার যাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে হয়, এরূপ কার্য্য বোধ করি তিনি করেন না। যেমন, বলপ্রকাশ। তবে রূপসীর বিবাহে অসম্মতি তাঁহার ভাল না লাগিতে পারে। দুষ্মন্ত নিষ্ঠুর নহেন।

৫। প্রেমের সম্মানভাব দুষ্মন্ত বুঝেন। সেই জন্যই অনসূয়ার কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলা বহু পত্নীর মধ্যে প্রধানা হইবেন। তবে সম্মানভাব বুঝিলেও রক্ষা করিবার সামর্থ্য তাঁহার কত দূর বলা যায় না। কারণ, রূপসীপ্রিয়তা এবং ভোগতৃষ্ণার প্রাবল্য নূতন পাইলে কি করে বলা দায়।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে রূপসীপ্রিয়তাই দুষ্মন্তের চরিত্রের লক্ষণ। অন্যান্য অনেক গুণ ইহারই ফল মাত্র।

প্রণয়ী দুষ্মন্তের বিষয় আলোচনা করিবার আর বড় আবশ্যক নাই। এইবারে দুষ্মন্তকে অন্যান্য ভাবে দেখা যাক্। প্রথমতঃ দুষ্মন্ত রাজা। আসমুদ্র ভারতবর্ষ তাঁহার প্রতাপে থরহরিকম্প। না হইবে কেন? দুষ্মন্ত পরিশ্রমকাতর নহেন। রাজকার্য্য সকলই তিনি নিজে দেখেন। রাজা বলিয়া তিনি বাবু নহেন। তাঁহার শারীরিক পরিশ্রম যথেষ্ট আছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের প্রথমেই তাহার পরিচয়। মৃগয়া দুষ্মন্তের প্রিয় ব্যায়াম। ধনুর্ব্বাণে তিনি সিদ্ধহস্ত। শারীরিক বলে তিনি কাহাপেক্ষা হীন নহেন। শারীরিক বলে যেমন, মানসিক শক্তিতেও দুষ্মন্ত সেইরূপ। নহিলে, এই বিস্তৃত সাম্রাজ্য সুশৃঙ্খলার সহিত শাসন করিতে পারেন? তাঁহার প্রহরী আছে, কোতোয়াল আছে, সেনাপতি আছে, অমাত্য আছে; সকলেই তাঁহার প্রবল রাজশক্তি অনুভব করিয়া থাকে। তিনি সকলকে চালাইয়া বেড়ান। কিন্তু কেহ তাঁহাকে সম্পূর্ণ বশ করিতে পারে নাই। এই কারণেই তাঁহার শাসনের সুশৃঙ্খলা। তাঁহার প্রবল প্রতাপ দেবলোকেও মধ্যে মধ্যে আবশ্যক হয়।

কিন্তু এই প্রবলপ্রতাপ নরপতি গর্ব্বিত নহেন—তাঁহার স্বভাব বিনয়নম্র। তিনি সকলকেই যথাযোগ্য সম্মান প্রদান দ্বারা সৎকৃত করেন। জ্ঞানী ধর্ম্মপরায়ণ ঋষিদিগকে তিনি দেবতার মত দেখেন, সাধারণ প্রজাকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, যাহার যাহা অভাব, যথাসাধ্য মোচন করিয়া ধন্য হয়েন। বিচারকার্য্যেও তিনি সুপণ্ডিত। মৃত বণিকের বিষয়ব্যবস্থায় তাহা স্পষ্টই দেখা যায়। প্রজার ধন অপহরণ করিয়া তিনি ধনী হইতে চাহেন না। বৈতালিক তাঁহাকে যথার্থ ই বলিয়াছে,

"স্বসুখনিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ
প্রতিদিনমথবা তে বৃত্তিরেবংবিধৈব।

অনুভবতি হি মূর্দ্ধা পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া সংশ্রিতানাম্॥
নিয়ময়সি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ
প্রশময়সি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায়।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম
ত্বয়ি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্॥"

বাস্তবিকই দুষ্মন্ত রাজার মত রাজা—প্রজারঞ্জক। দুষ্মন্ত আত্মসুখসর্ব্বস্ব নহেন।

এহেন সংযত রাজচরিত্র রূপমোহ অতিক্রম করিতে পারেন না কেন? তাহার কারণ, রাজচরিত্রও মানব। দুষ্মন্ত আর সকল বিষয়েই সংযত। রূপসীই কেবল তাঁহাকে বশ করিতে পারেন। এইখানেই দুষ্মন্ত-চরিত্রের দুই ভাব। কিন্তু ইহার কোথাও অসংলগ্নতা দৃষ্ট হয় না। বহিঃশাসনে দুষ্মন্তের প্রতাপ দুর্দ্দম্য। অন্তঃশাসনক্ষমতা তাঁহার তাদৃশ প্রবল নহে। বোধ করি, অন্তর অপেক্ষা বাহিরের দ্বারা দুষ্মন্তও শাসিত হয়েন। রাজারও ত শাসন আছে। দুষ্মন্ত সভ্য ভব্য ভদ্র বিনয়ী। প্রচলিত সমাজ-নিয়মের দ্বারাই তিনি চালিত হয়েন। স্বাধীন চিন্তা তাঁহার প্রকৃতি নহে। রাজা-রাজড়ারা স্বাধীন চিন্তাশীল অল্পই। স্বাধীন চিন্তা ব্রাহ্মণের স্বভাব। দুষ্মন্ত ক্ষত্রিয় রাজা। ব্রাহ্মণের বিধানই তাঁহার কার্য্যের মেরুদণ্ড। শুধু তাঁহার বলিয়া নহে, প্রাচীন সমাজ ব্রাহ্মণের বেদবাক্য অবলম্বন করিয়াই উন্নতিশিখরে উঠিয়াছিল। দুষ্মন্ত এই বিধানানুসারেই রূপসীপ্রিয়তা চরিতার্থ করিতে পারিয়াছিলেন। এবং এই বিধানের গুণেই তাঁহার যতটুকু সংযম। সে বিধান আর কিছু নহে—বহুবিবাহ এবং ব্রাহ্মণকন্যাবিবাহ-নিষেধ।

অভিজ্ঞানশকুন্তলে রাজা দুষ্মন্ত মানব দুষ্মন্তের সহিত মিশিয়া সম্পূর্ণ। কালিদাস এক প্রণয়-কাহিনীর মধ্যে দুষ্মন্ত-চরিত্রের সকল দিক্ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দুষ্মন্ত-চরিত্র তিন ভাবে ফুটিয়াছে। দুষ্মন্ত রাজা, দুষ্মন্ত সমাজের এক জন ব্যক্তি মাত্র, দুষ্মন্ত প্রণয়ী। আরও এক ভাবে দুষ্মন্তকে দেখা যাইতে পারে। দুষ্মন্ত পুরুষ। শকুন্তলায় দুষ্মন্ত-চরিত্রে পুরুষ-জাতির ভাব বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। দুষ্মন্ত শারীরিক বলে বলীয়ান্ বলিয়া নহে, তাঁহার মানসিক গঠন আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাব অনেকটা পরিস্ফুট হয়। শকুন্তলার সহিত তাঁহার ভাব মিলাইয়া দেখিলে এ বিষয়ে আর কোনও সংশয় থাকে না। শকুন্তলাও দুষ্মন্তের প্রেমে পড়িয়াছেন, দুষ্মন্তও শকুন্তলায় মুগ্ধ; কিন্তু স্ত্রী এবং পুরুষের স্বাভাবিক ভাব অনুসারে উভয়ের প্রেম কত বিভিন্ন। শকুন্তলা দুষ্মন্তকে ভালবাসিয়া অবধি তাঁহাতেই তন্ময়। অতিথি দ্বারে আসিয়া ফিরিয়া যায়, শকুন্তলা তাহা জানেনও না; অভিশাপ উচ্চৈঃস্বরে শকুন্তলার সর্ব্বনাশ সাধন করে, শকুন্তলা

তাহা শুনিতে পান না। ভালবাসার পাত্রের সহিত মিশিয়া শকুন্তলা আপনার অস্তিত্ব হারাইয়াছেন। শকুন্তলাপ্রেমে দুষ্মন্তের অস্তিত্ব আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। বহির্জগতের সহিত তাঁহার সহস্র কর্ত্তব্য-সম্বন্ধ এই প্রেমের মধ্য দিয়া সুপরিস্ফুট। বাস্তবিক, রমণী-হৃদয় একজনের প্রেমে যেরূপ অগাধ পরিতৃপ্তি অনুভব করে, পুরুষ-হৃদয় কিছুতেই তাহা পারে না। এই গভীর পরিতৃপ্তিতেই রমণীর অস্তিত্ব অনেকটা মিশাইয়া যায়। পুরুষের স্বভাবই অতৃপ্তি। এই জন্যই তাহার অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বে মিশিয়া এক হইয়া যায় না। অপরের অস্তিত্বই তাহাতে মিশিয়া থাকে।

দুষ্মন্ত রীতিমত পুরুষ-চরিত্র। তাঁহার হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। হৃদয় তাঁহার বুদ্ধির হাত ধরিয়া চলে। রমণীর হৃদয় অনেকটা স্বতন্ত্র। মস্তকের সহিত তাহার বড় সম্বন্ধ নাই। এই কারণেই রমণীর চরিত্রে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতার প্রাবল্য। আমরা রমণীর এই সঙ্কীর্ণতাটুকুর জন্য বড় দুঃখিতও নহি। রমণীর অর্দ্ধেক শ্রীই এইখানে। কিন্তু বিস্তৃতিপ্রধান পুরুষচরিত্রে উদারতা বিশেষ আবশ্যক। দুষ্মন্তের এ উদারতা না থাকিলে তাঁহার বিচারের প্রশংসা বোধ করি শুনা যাইত না। এই গুণেই তিনি রাজা। দুষ্মন্ত-চরিত্রের পুরুষভাব তাঁহার রাজভাবের মধ্য দিয়া বরাবর প্রবাহিত। কালিদাস স্ত্রী এবং পুরুষের ভাবের স্বাতন্ত্র্য বেশ বুঝিতেন। সেই জন্য তাঁহার নাটকের কোনও চরিত্রে এই ভাবের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দুষ্মন্ত এই ভাবেই রাজা এবং এই ভাবেই শকুন্তলার সহিত তাঁহার প্রণয় সম্বন্ধ। দুষ্মন্তকে পুরুষ করিয়াই কালিদাস তাঁহার চরিত্রগত সংলগ্নতা বজায় রাখিয়াছেন। ['ভারতী ও বালক,' আশ্বিন ১২৯৭]

যশোদা

বৈষ্ণব সাহিত্যের আর একটি প্রেমের চরিত্র যশোদা। রাধার সহিত যশোদার প্রেম অবশ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন—একজনের প্রেম স্ত্রীপুরুষঘটিত যৌবনের প্রণয়, অপরের সুগভীর সন্তানস্নেহ—কিন্তু আমাদের প্রেমানুশীলনে যশোদার প্রভাব নিতান্ত সামান্য নহে। যশোদা গোপকন্যা, গোপপত্নী, কৃষ্ণকে জন্মাবধি আপন পুত্র জানিয়া লালন পালন করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং স্বভাবতই কৃষ্ণের উপরে তাঁহার মায়া পড়িয়াছে—তিনিই কৃষ্ণের জননী। যশোদার প্রেম এই ভাবেই আলোচিত হইয়া আসিতেছে। যশোদা কন্যাও বটে, সহধর্ম্মিণীও বটে, কিন্তু ফুটিয়াছেন মাতৃরূপে। স্নেহবৃত্তিই তাঁহার সমধিক বলবতী। কৃষ্ণকে দুই দণ্ড না দেখিলে তিনি অধীর হইয়া পড়েন। কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণাধিক। কৃষ্ণ

সখাগণ সঙ্গে ধেনু চরাইতে যান, যশোদা প্রহর গণিতে থাকেন; কৃষ্ণ খেলিতে খেলিতে প্রাঙ্গণের বাহির হইলে যশোদা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া দেখিতে আসেন; কৃষ্ণের পাছে কোনও কষ্ট হয়, এই ভয়ে নন্দরাণী সর্ব্বদাই ব্যাকুল। যশোদার এই স্নেহভাবে এমন একটি সরল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দেখা যায়, তাহা অন্যত্র দুষ্প্রাপ্য। আমাদের চক্ষের সম্মুখে সেই আভীরপল্লীর ছায়াসুপ্ত গ্রাম্য ছবি ফুটিয়া উঠে। সেখানে গিয়া হৃদয় যেন মাতৃস্নেহ অনুভব করিয়া আসে। যশোদার স্নেহ বড়ই মধুর। সে স্নেহ পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয় হইতে নিঃসৃত।

যশোদায় আধ্যাত্মিকতার বড় গোলযোগ নাই। এই কারণে যশোদার চরিত্র আলোচনার কতকটা সুবিধা হইয়াছে। রূপক হিসাবে না দেখিলেও সে সৌন্দর্য্য অক্ষুণ্ণ। রাধার চরিত্রের মত যশোদাচরিত্র জটিল নহে। রাধার এক দিকে প্রবল আধ্যাত্মিকতা, আর এক দিকে সুশৃঙ্খল সমাজ-নিয়মের গুরুতর ব্যভিচার। কৃষ্ণের সহিত রাধিকার সম্বন্ধ বিশেষ জটিল। একে ত দাম্পত্য সম্বন্ধই সহজে রহস্যময়, তাহাতে আবার রাধাকৃষ্ণের সম্বন্ধ সম্পর্ক এবং নীতিবিরুদ্ধ। এই কারণেই আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যারও রাধাকৃষ্ণের প্রয়োজন অধিক। কারণ, রাধাকৃষ্ণের সাধারণ্যে যেরূপ প্রতিষ্ঠা, তাহাতে এরূপভাবে রূপক বলিয়া ব্যাখ্যা না করিলে দেশের নৈতিক অবস্থার শোচনীয় পরিণাম সম্ভাবনা। রাধাকৃষ্ণভক্ত কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনই নৈতিক বন্ধন যথেষ্ট শ্লথ। এই দেবলীলাকে অনেকে অনেক ভাবে দেখেন। সম্প্রদায়বিশেষে ইহা পার্থিব জীবনের অনুকরণীয় আদর্শ মাত্র। সুতরাং এই সকল সম্প্রদায়ে নীতিবিগর্হিত অনুষ্ঠান কিরূপে প্রশ্রয় পায় বলা বাহুল্য। যশোদার প্রেম মাতৃহৃদয়ের অগাধ স্নেহ। ইহাতে যৌবন নাই, পূর্ব্বরাগ নাই, জ্বালা নাই, জঞ্জাল নাই। আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কর বা না কর, যশোদা যেমন তেমনি—তাঁহার অবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় না। সে শুভ্র সরল প্রকৃতি স্নেহময় সৌন্দর্য্যে সর্ব্বদাই সুপরিস্ফুট। তাহা বুঝিবার জন্য অসাধারণ পাণ্ডিত্য বা প্রতিভার আবশ্যক করে না।

কিন্তু এইখানে আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে দু'একটা কথা সারিয়া যাওয়া ভাল। যশোদারও রূপকে ব্যাখ্যা হয় কি না। তবে জটিলতা-অভাবে রাধার মত ব্যাখ্যাবাহুল্য কাহারও বোধ করি নাই। প্রথমতঃ দেখা যাক্, যশোদার অভ্যুত্থান কিসের মধ্য হইতে? রূপক-ধর্ম্ম, না লোক-কথা? এ বিষয়ে রীতিমত প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে যত দূর বুঝা যায়, যশোদা রাধার পন্থানুসারিণী। অর্থাৎ রাধা যেরূপে ধীরে ধীরে বিবিধ অবস্থার মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছেন, যশোদারও সেইরূপ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া বর্ত্তমান পরিণতি। সম্ভবতঃ সাধারণের মধ্যে প্রাচীন কালে পিতৃপিতামহাগত কতকগুলি সরস কাহিনী প্রচলিত ছিল। রাধা এবং যশোদা, উভয়েই এই সকল গ্রাম্য কাহিনীর অন্তঃপুরচারিণী ছিলেন। ক্রমে কবি এবং সংস্কারকদিগের হস্তে পড়িয়া হয় কাব্য হইতে

আধ্যাত্মিক রূপকে, নয় আধ্যাত্মিক রূপক হইতে কাব্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। শুধু রাধা এবং যশোদা বলিয়া নহে, শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি অনেকেরই বোধ করি, সে কালের বিবিধ প্রচলিত গল্পের মধ্য হইতে আবির্ভাব। কৃষ্ণ এই সকল গল্পের কেন্দ্রস্থল। বন্ধুরূপে, প্রণয়িনীরূপে, জননীরূপে তাঁহার চারি পার্শ্বে বিবিধ চরিত্র জড় হইয়া একটা সুশৃঙ্খল বৃহৎ আধ্যাত্মিক রূপক রচিত হইয়াছে। রূপক-ব্যাখ্যা প্রথমে কে করেন জানি না, কিন্তু ইহা অতি প্রাচীন—বঙ্গসাহিত্যের বীজ বপনেরও বহু পূর্ব্বে। এবং এই আধ্যাত্মিক রূপকই বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিত্তি।

এখন আধ্যাত্মিকতা অস্বীকার না করিলেও এই সকল চরিত্রের মধ্যে কাব্য যেরূপ পরিপুষ্ট হইয়াছে, তাহাতে কাব্যসৌন্দর্য্য হিসাবে সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাদিগের সৌন্দর্য্যহানি অথবা আধ্যাত্মিকতার প্রতি অবিচার করা বোধ করি হয় না। কাব্যে আমরা যে সৌন্দর্য্যটুকু দেখিতে পাই, তাহার আলোচনায় দোষ কি? কাব্যসৌন্দর্য্য প্রস্ফুটনে বঙ্গসাহিত্যের বৈষ্ণব কবিরাই প্রধান। তাঁহারা যে আধ্যাত্মিক রূপক সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু কবিস্বভাববশতঃ কাব্যই সমধিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই—এরূপ হইয়াই থাকে। তবে এক কথা, আধ্যাত্মিকতাকে সর্ব্বত্র বর্জ্জন করা যুক্তিসঙ্গত না হইতে পারে। তাই বলিয়া সর্ব্বত্র তাহাকে খাড়া করিয়া রাখাও যুক্তিসঙ্গত নহে। যেখানে মূল উদ্দেশ্য লইয়া টানাটানি, সেখানেই আধ্যাত্মিকতা বিচার্য্য। কাব্যসৌন্দর্য্য-অভিব্যক্ত চরিত্রগত রসভাব আলোচনাকালে কথায় কথায় আধ্যাত্মিক রূপক-চাতুর্য্যের উল্লেখ-বাহুল্য কেবল মাত্র অনাবশ্যক নহে, অনেক সময়ে সৌন্দর্য্য উপভোগের বিশেষ ব্যাঘাতক। বলা বাহুল্য, ধৈর্য্যচ্যুত পাঠকেরা এখানেই তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাইতেছেন। আর অধিক দূর গড়াইলে যশোদা তাঁহাদের মন হইতে অনেকটা মুছিয়া আসিবার সম্ভাবনা। এইবারে দেখা যাক্, বৈষ্ণব কবির যশোদার অবস্থা কিরূপ।

যশোদা আমাদের দেশের স্নেহময়ী জননীর চিত্র। বৈষ্ণব সাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে—যশোদায় বাৎসল্য রসের অনুশীলন। বৈষ্ণব কাব্যে উমার স্থান তিনি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। কিন্তু উমার সহিত যশোদার প্রভেদ বিস্তর। নগেন্দ্রনন্দিনী শক্তিরূপিণী—শক্তির পরিচয়স্থল। যশোদা শক্তির বড় ধার ধারেন না। তিনি বৈষ্ণব ভক্তের স্নেহময়ী জননী মাত্র। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গেই কোমলতা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম কোমল ভাবে পূর্ণ। এই জন্যই বোধ করি, সমতল ক্ষেত্রে তাহার সমধিক প্রাদুর্ভাব। নগেন্দ্রনন্দিনীর চরিত্র পাষাণের তুষারস্নেহে গঠিত। কোমলতার মধ্যেও তাহাতে একটা দৃঢ় বল প্রকাশ পায়। পার্ব্বতী তেজস্বিনী। শিবের সহধর্ম্মিণী এরূপ হইবারই কথা। যশোদা গোপবধূ, গোপগৃহিণী—ত্রিশূলও নাই, নন্দীও নাই, ভৃঙ্গীও নাই, নাই সুরাসুর-

সম্পর্ক, নাই কোনও গণ্ডগোল—আভীরপল্লীর শ্যামল সৌন্দর্য্যে কৃষ্ণের মুখখানি দেখিয়া পরিতৃপ্ত। অহিংসার ধর্ম্ম শক্তি লইয়া কি করিবে? বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রেম চাহে। এই জন্য বৈষ্ণব সাহিত্যে ভাষা, ভাব, গঠন, বৃত্তি, সকলই কোমল। এমন কি, অনেক স্থলে কঠিন ভাবকেও কোমল ভাষায় গলিয়া যাইতে দেখা যায়। কঠিনতা বুঝি বৈষ্ণবের মর্ম্মে আঘাত করে। তাই হিরণ্যকশিপুবধও তরল ভাষায়, ললিত ছন্দে, কুসুম উপমায় সভ্রূভঙ্গ নদীর মত বিলাসে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়াছে। বৈষ্ণব হৃদয় কোমল রসে ভরপূর।

এই কোমল বৈষ্ণব হৃদয়ের কোমলাঙ্গিনী সৃষ্টি—যশোদা। উপরে আমরা বলিয়াছি, যশোদায় বাৎসল্যের স্ফুর্ত্তি। আরও বলি, যশোদায় কেবলমাত্র বাৎসল্য—অন্যান্য রসের বিকাশ হয় নাই। নগেন্দ্রনন্দিনী বিবিধ অবস্থায় বিভিন্ন ভাবে সুন্দরী। তিনি কন্যারূপে, সহধর্ম্মিণীরূপে, মাতৃরূপে ফুটিয়াছেন। যশোদা বরাবর এক। সেই কৃষ্ণগতপ্রাণা নন্দগৃহিণী। বৈষ্ণব সাহিত্যে এক একটি বিভিন্ন চরিত্রে প্রেমের এক একটি বিশেষ ভাব আলোচিত হইয়াছে। একই চরিত্রে বিভিন্ন ভাবের সমাবেশ বড় দেখা যায় না। আমার বোধ হয়, বৈষ্ণব সাহিত্যের গীতিকাব্যে শ্রেষ্ঠতার কারণই এই। বৈষ্ণব চরিত্রগুলি বিশেষরূপে গীতিকাব্যোপযোগী। তাহারা যেন তরল ভাববিশেষকে জমাইয়া গঠিত। এবং সে ভাবগুলি কেবলই কোমল প্রেমজ। কোমল প্রকৃতি, কোমল হৃদয়, কোমল সৌন্দর্য্যে বৈষ্ণব কাব্য রচনা। বৈষ্ণব ধর্ম্মই প্রেম এবং কোমলতা। তাহাতে কেমন একটা বিশেষ তরল lyrical ভাব। এ ভাব তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত। বাঙ্গালার প্রকৃতিও ইহার অনুকূল।

প্রকৃতির সহিত মানব-ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বৈষ্ণব কবিদিগের রচনায় পরিস্ফুট। তাঁহাদের চরিত্রগুলি অনুকূল প্রকৃতির মধ্যে গঠিত। যমুনা, নিকুঞ্জ, পল্লবিত শ্যামলতায় কাঠিন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। এ সৌন্দর্য্যে বরং কেমন যেন ঢলঢল আলস ভাব। বৈষ্ণব কাব্যেও এই তরল আলস। রাধার রূপবর্ণনা দেখ, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর স্বর শুন, যশোদার পুলক-স্নেহ অনুভব কর, এ ভাবের ব্যতিক্রম কদাচ দৃষ্ট হইবে। অলস মধ্যাহ্ন, দূর বনপ্রান্তে বৃক্ষচ্ছায়ায় দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিতেছেন। সে উদাস বাঁশীর স্বরে মন যেন কেমন করে। রাধিকার হৃদয় আকুল—ঢলঢল যৌবন যেন বাহিরিতে চায়। শুধু ইহাই নহে, কৃষ্ণের দাঁড়াইবার ভঙ্গীতেও এই আলস ভাব—কৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কৃষ্ণের বাঁশী যে হৃদয়ে বাজিয়াছে, সেখানেও এই ভাবানুকূলতা। রাধা প্রাচ্য সুন্দরী। প্রাচ্য রূপসীর গঠনে বর্ণে ভাবে তরলতা। তাহার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তরল ভাবে ঢলঢল। গজেন্দ্রগমনে, আধ চাহনিতে তাহা অভিব্যক্ত। এই সুগোল গঠন, তরল সৌন্দর্য্য বাঁশীর উদাস স্বরে শিথিল। সমস্ত ভাবের মধ্যে কেমন সামঞ্জস্য।

যশোদাও বৈষ্ণব হৃদয়ের এই কোমল ভাবে গঠিত। তাঁহার ভাবের সহিত প্রকৃতির মিলন না হইবে কেন? তিনিও ত এই প্রাচ্য রূপসী। তবে প্রেয়সীরূপে তিনি ফুটেন নাই বলিয়া রাধার মত তাঁহার রূপ লইয়া এত নাড়াচাড়া হয় নাই। যশোদার সমস্ত সৌন্দর্য্য তাঁহার স্নেহভাবে ঢলিয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই যশোদাকে বেশ বুঝা যায়। অন্ততঃ বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। আভীরপল্লীর সহিত যশোদার কল্পনা অবিচ্ছেদ্য—দুগ্ধ ঘৃত নবনীতের সহিত তাঁহার বুঝি কি যোগ আছে। কিন্তু যশোদায় শিথিল আলস-ভাব কোথায়? বৈষ্ণব কাব্যে তাঁহার স্নেহের মধ্যেই এ ভাব সুপরিস্ফুট। বৈষ্ণব ধর্ম্মের সহিত বুঝি এ ভাব জড়িত। তাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম যেখান দিয়া বহিয়া গিয়াছে, সেখানে সমাজবন্ধন অপেক্ষাকৃত শিথিল, বৈষ্ণব সাহিত্য যে জাতির হৃদয় ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, সে জাতির বসন-ভূষণেও আঁটাসাঁটা ভাবের অভাব। এমন বলি না যে, ধুতি চাদরের দোধুয়মান শোভা বৈষ্ণব ধর্ম্মের ফল, কিন্তু ইহা যে বাঙ্গালী জাতির বৈষ্ণব ভাবের ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ বড় নাই। বাস্তবিক, আমাদের বসনেও একটা আলস ভাব, একটা বিশেষ lyrical কিছু আছে। আমরা বৈষ্ণবই বটে।

আমার বোধ হয়, বৈষ্ণব কল্পনা শাক্তের মত জমকালো সৌন্দর্য্যপ্রিয় নহে। সরল সৌন্দর্য্যই বৈষ্ণবের বিশেষ প্রিয়। শাক্ত কল্পনা দুর্গার জন্য বাহন সিংহ আনিল, একই সঙ্গে দশটি বাহু যোজনা করিল, চারি পার্শ্বে অসম্ভব অমানুষিক অনেক ব্যাপার না জুড়িয়া পরিতৃপ্ত হইল না। বৈষ্ণব হৃদয় বাহন সিংহ ছাড়িয়া ধেনু চরাইয়া পরিতৃপ্ত, সিংহাসন ছাড়িয়া গোপগৃহে আশ্রয় খুঁজে। যশোদার সৌন্দর্য্যে একটি কেমন সরল দীনভাব আছে। সে ভাব জননীতেই সম্ভবে, শক্তিতে সম্ভবে না। তাঁহার স্নেহে বিশেষ সুকুমারতা। বৈষ্ণবেরাই এ সৌকুমার্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। নগেন্দ্রনন্দিনীর সৌন্দর্য্যে তাই বলিয়া সরল স্নেহের অভাব প্রমাণ হয় না। কিন্তু তিনি যেমন কখনও অন্নপূর্ণা, কখনও বা পাষাণী, যশোদা সেরূপ নহেন। পাষাণ তাঁহার মধ্যে আদবে নাই! যশোদার বোধ করি, গুমরিয়া থাকার ভাবের বিশেষ অভাব। তাঁহার অশ্রু মর্ম্মের মধ্যে সহজে জমাট বাঁধে না। কৃষ্ণকে সাজাইয়া দিয়া তাঁহার সুখ, কৃষ্ণকে দুধটুকু ক্ষীরটুকু খাওয়াইতে পারিলেই পরিতৃপ্তি। যশোদার জীবনে আর কোনও সাধ আহ্লাদ নাই।

যশোদার স্নেহে সর্ব্বদাই যেন কি হারাই হারাই ভয়। হইবারই কথা—কত কষ্টে কৃষ্ণ বাঁচিয়াছেন। তাঁহার পাঁচটি সন্তান নাই—সবে ধন নীলমণি। যশোদার সমস্ত হৃদয় কৃষ্ণে কেন্দ্রীভূত। হয় ত এই জন্যই সহধর্ম্মিণী এবং কন্যারূপে তিনি ফুটিতে পারেন নাই। যশোদা জননী এবং স্নেহময়ী। কিন্তু শুধু এইটুকু বলিলে বিশেষ কিছু বলা হয় না। যশোদার স্নেহের প্রকৃতি আলোচ্য। মাতা স্নেহময়ী কে নহেন? আপন সন্তানের প্রতি

পরিপূর্ণ স্নেহ থাকিলেও ব্যক্তিবিশেষের মানসিক অবস্থানুসারে স্নেহের বিকাশ স্বতন্ত্রভাবে। স্নেহে ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ছায়া পড়ে। যশোদার চরিত্র হইতেই আমরা তাহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব। যশোদার সহিত অপর কতকগুলি মাতৃহৃদয়ের তুলনা করিয়া দেখিলেই আমাদের কথা সপ্রমাণ হইবে।

প্রথমতঃ কৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত নহেন। তাঁহার জননী দেবকী। কিন্তু আশৈশব যশোদার স্নেহেই কৃষ্ণ লালিত পালিত হইয়াছেন। সুতরাং যশোদাই তাঁহার মাতৃস্থান অধিকার করিয়াছেন। এখন যশোদাকেই কৃষ্ণের জননী বলা যায়। জনয়িত্রী নহেন বলিয়া যশোদার স্নেহ মাতৃস্নেহ অপেক্ষা এক তিল ন্যূন নহে। বাস্তবিক, তিনি কৃষ্ণকে যেরূপ অগাধ স্নেহে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন, সেরূপ স্নেহ পরিপূর্ণ মাতৃহৃদয় ব্যতীত কোথাও মিলে না। যশোদার নিকট কৃষ্ণ ত আর পরের পুত্র নহেন। যশোদার কৃষ্ণস্নেহে তাঁহার প্রকৃতিগত সন্তানস্নেহ প্রকাশ পায়। আপন সন্তানকে প্রাণাধিক ভাল বাসিলেও সকল রমণীর প্রকৃতি এরূপ স্নেহগঠিত নহে। মহিলারা মার্জ্জনা করিবেন, আমার বোধ হয়, স্বাভাবিক সঙ্কীর্ণতাবশতঃ রমণীহৃদয় অনেক সময়ে পরের সন্তানের প্রতি অল্পবিস্তর ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া থাকে। আপন সন্তানকে ভালবাসা এবং সন্তানমাত্রকে ভালবাসা স্বতন্ত্র বৃত্তি। রমণী স্নেহময়ী হইলেও তাই বুঝি তাহার হিংসার তীব্রতা।

যশোদার স্নেহে হিংসা কোথাও নাই। তাঁহার চারি পার্শ্বে শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি কৃষ্ণের সখাগণ। আভীরপল্লীর বালকেরা বোধ করি যশোদাকে বিশেষ ভালবাসিত। ইহাতেই তাঁহার কোমল স্নেহ পরিস্ফুট। বিরক্তি শিশুহৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না। হাসি হাসি মুখ, মৃদু মধুর সম্ভাষণ, স্নেহপ্রফুল্ল চিত্ত সরল শৈশবের চুম্বক। যশোদার এ সকল ছিল। স্নেহগঠিত হৃদয় এইরূপই হইয়া থাকে। সন্তানস্নেহ তাঁহার বিশেষ প্রবল। তাই তাঁহার চারি দিকে এতগুলি বাল-চরিত্র। যশোদা সকলগুলিকেই স্নেহ করেন। তাই বলিয়া কি কৃষ্ণের মত? তাহা অবশ্য নয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রাণাধিক। কৃষ্ণের মত অপরকে ভালবাসিবেন কি করিয়া? তাহা যে নিতান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে ধেনু চরাইতে বাহির হইলে যশোদা সকলকে বলিয়া দেন যে, কৃষ্ণকে লইয়া সকাল সকাল যেন তাহারা ফিরিয়া আসে। তিনি কি সহজে কৃষ্ণকে ছাড়িতে চাহেন? বলরামকে এমন কত বার বুঝাইয়াছেন, কৃষ্ণ দুধের ছেলে, মায়ের বসন ধরিয়া ফিরে, দণ্ডে দণ্ডে খায়, তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিয়া জননীহৃদয় কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? বলরাম অনেক আশ্বাস দিয়া বলেন, তাহা বলিলে কি হয়, গোপকুলে থাকিয়া গোচারণ না শিখিলে নিরুপায়। যশোদা দায়ে পড়িয়া কৃষ্ণকে সাজাইতে বসেন। কিন্তু হাত সরে না। কেবলই

"স্তনক্ষীরে আঁখিনীরে বসন ভিজিয়া পড়ে, বেশ বানাইতে কাঁপে কর।
কান্দি গদগদ কহে, আজি রাখি যাহ সবে শূন্য না করিয়ে মোর ঘর॥"

কৃষ্ণের বেশভূষা আর শেষ হয় না। যশোদা চুম্বনে চুম্বনে গোপালকে ছাইয়া ফেলিলেন। অবশেষে বলাই চূড়া বাঁধিয়া দেয়, শ্রীদাম ললাটে তিলক। যশোদা তখন রক্ষামন্ত্র পড়িয়া কৃষ্ণকে সাবধান করিয়া দিলেন যে,

"আমার শপতি লাগে, না ধাইহ ধেনুর আগে, পরাণের পরাণ নীলমণি।
নিকটে রাখিহ ধেনু, পুরিহ মোহন বেণু, ঘরে বসি আমি যেন শুনি॥
বলাই ধাইবে আগে, আর শিশু বামভাগে, শ্রীদাম সুদাম সব পাছে।
তুমি তার মাঝে ধাইও, সঙ্গছাড়া না হইও, মাঠে যাছু নানা ভয় আছে॥
ক্ষুধা হৈলে চাহিয়া খাইও, পথ পানে চাহিয়া যাইও, অতিশয় তৃণাঙ্কুর পথে।
কারু বোলে বড় ধেনু, ফিরাইতে না যাইহ কানু, হাত তুলি দেহ মোর মাথে॥
থাকিহ তরুর ছায়ে, মিনতি করিছে মায়, রবি যেন না লাগয়ে গায়ে।"

ক্রোড়ে থাকিতেই যশোদা কৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল, থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠেন, চোখের আড়াল হইলে ত ভাবিবারই কথা। "এ বয়সে গোষ্ঠে গেলে প্রাণ কি ধরিতে পারে মায়?"

যশোদার স্নেহের প্রকৃতি ইহাতে অনেকটা বুঝা গেল। গর্ভধারিণী না হইলেও কৃষ্ণজননী বলিয়াই তিনি গণ্য। যশোদার কখনও এমন মনে হইত না যে, তাঁহার গর্ভে নন্দের একটি পুত্র জন্মিলে ইহাপেক্ষা কত সুখ হইত। এরূপ মনে হইবার কারণও ছিল না। তিনি কৃষ্ণকে তাঁহার গর্ভজাত নন্দনন্দন বলিয়াই জানিতেন। দেবকীতনয় জানিলেও কৃষ্ণের উপর রাগ করিয়া তিনি কখনও ক্ষণিকের জন্য কৃষ্ণকে পরের ছেলে ভাবিতে পারিতেন না। তাঁহার স্নেহ অগাধ এবং অকপট। অকপট এই জন্য যে, এ স্নেহে কোথাও আত্মপ্রবঞ্চনা নাই। অর্থাৎ কল্পনায় তিনি আপনার স্নেহকে বাড়াইয়া দেখিতেন না। কৃষ্ণকে ভালবাসা তাঁহার প্রকৃতি—ভাল না বাসিয়া থাকিবার যো নাই। তাই বলিয়া কৃষ্ণকে স্নেহ জানাইতে তিনি ব্যস্ত নহেন। অথবা কৃষ্ণ তাঁহার স্নেহের মর্য্যাদা কত দূর বুঝেন না বুঝেন, হিসাব করিয়া দেখেন না। যশোদার স্নেহ-উৎস চির-উৎসারিত। কৃষ্ণকে ভালবাসিতেন বলিয়াই আমরা যশোদার স্নেহভাবের সম্পূর্ণ পরিচয় পাই না। তাঁহার কথাবার্ত্তায়, ধরণধারণে, পরের সন্তানের প্রতি সরল দৃষ্টিতে এ ভাব ধরা দেয়। কৈকেয়ীপ্রকৃতির সহিত তাঁহার ভালবাসার বিস্তর তফাৎ। রাজঅন্তঃপুরের প্রাচীররক্ষিত জটিলতা যশোদাচরিত্রে দেখা যায় না। যশোদার স্নেহ মধুর। তিনি কাহাকেও ব্যথা দিতে পারেন না। সন্তানটিকে বুকে করিয়া রাখিয়াই তাঁহার চূড়ান্ত শান্তি। এবং এই

অবস্থাতেই তিনি পরিতুষ্ট। পরের সন্তানে তাঁহার দৃষ্টি কখনও তীব্র নহে। যশোদার অন্তর নির্ব্বিবাদী, অসূয়াশূন্য, স্নেহগঠিত। কোমলতা তাঁহার প্রকৃতি, স্নেহ তাঁহার প্রাণ।

যশোদার শাসন হইতেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে পড়ে, কৃষ্ণ যে দিন নবনী চুরি করিয়া খাইয়াছিলেন, যশোদা তাঁহাকে ধরিতে যান। কৃষ্ণ এ-ঘর ও-ঘর দিয়া ছুটিয়া পলাইলেন। যশোদা তখন গোপালকে না দেখিয়া ব্যাকুল। শাসন ঘুরিয়া গেল—কৃষ্ণ আসিলে হয়। যশোদা কাঁদিতে বসিয়াছেন। বর্ত্তমান কালে আমরা শিক্ষিতা জননীর মধ্যে সন্তানের চরিত্রগঠনসমর্থ যে সকল গুণ দেখিতে চাহি, তাহা যশোদায় বোধ করি মিলে না। কিরূপেই বা মিলিবে? গোপগৃহিণীতে তাহা আশা করাই অন্যায়। শিক্ষা ত যশোদার চরিত্রে কোথাও অভিব্যক্ত নহে। যশোদার যাহা কিছু সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। গোপগৃহিণীর আত্মবিস্মৃত পরিপূর্ণ স্নেহ মাতৃস্নেহের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া যশোদাকে জননীর সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ আদর্শ বলিতে পারি না। অর্থাৎ সন্তানগঠনের জন্য স্নেহময়ী জননীর চরিত্রে যে সংযত দৃঢ়তা আবশ্যক, যশোদার তাহা অভাব আছে বোধ হয়। বলা বাহুল্য, সংযত দৃঢ়তার সহিত লগুড় তাড়নার কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রেম লগুড়ের একান্ত বিরোধী। এক দিনের একটু মুখভারই তাহার প্রবল শাসন। যশোদার স্নেহ কৃষ্ণের শিক্ষার জন্যও কাঠিন্য অবলম্বন করিয়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। শাসন করিতে গিয়া তিনি চুম্বন করিয়া বসেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৈষ্ণব হৃদয় কঠিনতা সহিতে পারে না। কাঠিন্যে বৈষ্ণবেরা কোমলতা মিশাইয়া দেয়।

বৈষ্ণবের সহিত শাক্ত হৃদয়ের প্রভেদই এইখানে। বৈষ্ণবেরা কাঠিন্যকে কোমল রসে গলাইয়া ফেলিতে চায়; শাক্ত কোমলতার অন্তরে কঠিনতার প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য কোমলাঙ্গিনী রমণীর অন্তরেই শক্তি। উমাও গৃহিণী, যশোদাও গৃহিণী; উমাও জননী স্নেহময়ী, যশোদাও স্নেহময়ী মাতা; এক শক্তিতে উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ ঘটিয়াছে। যশোদা গৃহিণী। গৃহকার্য্যে নিপুণতাই তাঁহার গৃহিণী নামের একমাত্র কারণ। উমাও সুনিপুণা গৃহিণী। কিন্তু উমা শক্তিমতী। স্বামীর উপরে তাঁহার যেরূপ প্রভাব, যশোদার তাদৃশ নহে। অন্ততঃ এ সম্বন্ধে কাহারও বড় কিছু জানা নাই। উমা অন্নপূর্ণা। এখানেও সেই শক্তির পরিচয়। উমার সহিত যশোদার প্রভেদ হইবারই কথা। অবস্থাভেদই তাহার প্রধান কারণ। উমা কৈলাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবী; যশোদা গোয়ালিনী অবলা। বৈষ্ণব কল্পনা সৌন্দর্য্যের মধুরতাতেই তৃপ্ত। মধুরতাই তাহার উপভোগ্য। এই কারণেই গোপবধূ যশোদা চণ্ডীও নহেন, মহিষীও নহেন; যশোদার কোন জাঁকজমক নাই—তিনি নিছক কোমল রসে কোমলহৃদয় বৈষ্ণবের স্নেহময়ী জননী।

বৈষ্ণব সাহিত্যে শক্তির যে নাম গন্ধ নাই, এমন বলা চলে না। মথুরাপতি কৃষ্ণে শক্তিভাব আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সে অতি সামান্য। বৈষ্ণব হৃদয় প্রেমে বিগলিত। শক্তি সেও অনুভব করে। কিন্তু প্রেমেই সে ডুবিবার স্থান পায়। তাই বৈষ্ণব কবি কৃষ্ণকে মথুরাপতিরূপে অধিক ক্ষণ দেখিতে পারেন না। মথুরার কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহারা যশোদার কৃষ্ণকে দেখিতে চাহেন, যশোদার কৃষ্ণ অপেক্ষা রাধার কৃষ্ণকে প্রাণের মধ্যে উপভোগ করেন। মধুর রসেই বৈষ্ণব প্রেমের চূড়ান্ত অনুশীলন। মথুরাপতি ক্ষমতাশালী—তাঁহার যান আছে, বাহন আছে, সেনা আছে, সেনাপতি আছে। রাধিকারঞ্জনের মধুর নিকুঞ্জ, মধুর বংশীধ্বনি, মধুর জ্যোৎস্না, আর এই মধুরতার মধ্যে সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত মধুর মিলন। বৈষ্ণব হৃদয় এই মধুর মিলনে ভোর হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের দণ্ডধর প্রচণ্ড রাজভাব এই মধুরতায় বিলুপ্ত। কায়ক্লেশে তিনি কেবল রাজা। নহিলে তাঁহার সর্ব্বত্রই কোমল রস। অত কথায় কাজ কি, শ্রীকৃষ্ণের দেহবর্ণনায়ও কঠিন পুরুষভাবের অভাব মনে হয়। তবে মধ্যে মধ্যে দৈবাৎ এক আধ বার শুনা যায় বটে যে, শ্রীকৃষ্ণের প্রশস্ত বক্ষ, তমাল-দেহ। দায়ে পড়িয়া যেন এ কথার উল্লেখ করিতে হইয়াছে, পাছে লোকে কৃষ্ণকে পুরুষ অথবা স্ত্রী ঠাহরাইয়া উঠিতে না পারে।

কৃষ্ণ যখন রাজরূপে বিরাজ করিতেছেন, তখন মধ্যে মধ্যে যশোদা তাঁহাকে দেখিতে যান শুনিতে পাই। দ্বারী যশোদাকে চিনে না; সুতরাং সহজে দ্বার খুলে না। যশোদা বাপু বাছা করিয়া দ্বারীকে বুঝাইতে থাকেন। দ্বারীর সহিত কথাবার্ত্তায়ও যশোদার সেই সরল স্নেহভাব অভিব্যক্ত। শিবগৃহিণী হইলে দ্বারী তাঁহার প্রভাব অনুভব করিত। বৈষ্ণব-জননী যশোদার ত শক্তি নাই। তাঁহার স্নেহে কেমন দীনভাব। তাই বলিয়া পাষাণতনয়া কি স্নেহময়ী নহেন? স্নেহবিষয়ে উমা যশোদাপেক্ষা হীন অথবা যশোদা উমাপেক্ষা হীন, এরূপ বলা যায় না। দুই জনের স্নেহের প্রকৃতি কেবল কতকটা বিভিন্ন। স্নেহ সেইই। প্রভেদ কেবল অবস্থা এবং চরিত্রগত বিশেষত্ব লইয়া। দ্বারীর সহিত কথাবার্ত্তায় স্নেহের তারতম্য তেমন বুঝা যায় না। তবে এখানে কোমলতার তারতম্যে এইটুকু বুঝা যাইতে পারে যে, চরিত্র স্নেহগঠিত কি না এবং তাহাতে কি ভাবের প্রাধান্য। যশোদার কথাবার্ত্তায় বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয় দুঃখসিক্ত এবং সহজে ক্রোধোদ্রেক হয় না। শিবগৃহিণী যশোদার মত নীরবে সহিবার পাত্রী নহেন। বৈষ্ণব প্রেম সহিতেই আসিয়াছে।

উমার সহিত যশোদার স্নেহ তুলনা করিলে বোধ হয়, উমায় উষার কনকভাবের আভাস পাওয়া যায়। যশোদার মত তাঁহার স্নেহে সর্ব্বদাই হারাই হারাই ভয় প্রবল নহে। যশোদার স্নেহে ভয়, উমার স্নেহে সাহস। নগেন্দ্রনন্দিনীর ক্রোড় হইতে তাঁহার

শিশুকে লইতে আসিয়া বোধ করি, কেহ সহজে ফিরিতে পারে না। সম্ভবতঃ এ অবস্থায় তিনি উন্মাদিনী হইয়া উঠেন। এবং বোধ করি, নিকটে শিবের ত্রিশূল থাকিলে তাহার ত্রিজিহ্বা শোণিততৃষা মিটাইতে কুণ্ঠিত হয়েন না। যশোদা হইলে শিশুকে বুকের মধ্যে করিয়া হিম হইয়া যান। মিনতিই তাঁহার স্বভাব। তবে স্নেহে যে বল আসে, সে কেবলমাত্র বুকের মধ্যে সবলে ধরিয়া রাখিবার। বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে গেলে হয় ত যশোদার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যায়। উমার স্নেহে বালিকা-ভাবে বল আছে। যশোদার স্নেহ শীতল। ভূমিই তাহার প্রধান কারণ। যশোদার বাস সমতলক্ষেত্র। নগেন্দ্রনন্দিনী পার্ব্বতীয়া। তাই বোধ করি, বর্ষার দিনে যশোদার স্নেহই আমার মনে পড়ে। উমার স্নেহ বর্ষাপেক্ষা বসন্তে ফুটে। আমাদের দেশে বসন্ত ত অধিকক্ষণ থাকে না।

এখন যশোদা-চরিত্র আলোচনার একরূপ শেষ হইল বলা যাইতে পারে। কারণ, স্নেহ ব্যতীত যশোদায় আলোচনার আর বড় কিছু নাই। স্নেহেই তিনি ফুটিয়াছেন। তাঁহার প্রণয়ে বিশেষ কিছু দেখা যায় না। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, যশোদা সতী সাধ্বী পতিব্রতা। নন্দ ঘোষের সহিত তাঁহার বনিত ভাল। পতি-পত্নীর মধ্যে অনৈক্য, অবিশ্বাস, বিবাদ কলহ শুনা যায় না। নন্দ ঘোষের পরিবার প্রেমপূর্ণ। ইহা ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বড় কিছু জানিতে পারি না। জননীর সহিত তাঁহার যেখানে যতটুকু সম্বন্ধ, বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে তাহাই পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, যশোদা কন্যাও বটে, সহধর্ম্মিণীও বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্রবিকাশ মাতৃরূপে। নাই ভ্রূভঙ্গ, নাই মর্ম্মবেধী দারুণ চাহনি, নাই অধরের যৌবনতৃষা, নাই হৃদয়হরণী মুচকি হাসি। সুতরাং বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার রূপের তরঙ্গ উঠে নাই, বিরহ ধ্বনিত হয় নাই। মান এবং ভঞ্জন লইয়া টানাটানি পড়ে নাই।

কিন্তু তথাপি যশোদার রূপ সম্বন্ধে আমরা দুই চারি কথা বলিতে পারি। তাঁহার নয়ন খঞ্জনের সহিত উপমেয় অথবা মৃগাক্ষির সহিত জানি না, কিন্তু ভাবে দৃষ্টি খুব স্নিগ্ধ বলিয়া বোধ হয়। এবং সম্ভবতঃ হরিণনয়নে প্রশান্ত স্নিগ্ধভাব অধিক। খঞ্জনলোচন চাঞ্চল্যেরই পরিচায়ক। খঞ্জনের গতির সহিত নয়নের সাদৃশ্য কি না। আর হরিণ-আঁখির সহিতই নয়নের তুলনা হয়। বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যে রাধার নয়ন-বর্ণনায় খঞ্জন এবং মৃগনয়ন উভয়ের সহিতই উপমা দেখা যায়। দুইই সৌন্দর্য্যের লক্ষণ বটে। কিন্তু রাধার বোধ করি খঞ্জননয়নই ঠিক। যত দূর মনে পড়ে, বৈষ্ণব কবিদিগের রাধার রূপবর্ণনায় খঞ্জননয়নেরই উল্লেখ অধিক। যশোদার নয়ন খঞ্জনগতি জিনিয়া নহে। উপমাপ্রিয় পাঠকেরা অলঙ্কারশাস্ত্র খুঁজিয়া উপমা গড়িয়া লইবেন। আমরা যথাসাধ্য ভাবটুকু ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

যশোদার অধরও সুরঙ্গ। বর্ণও বোধ করি গৌর। তবে রাধার সহিত তুলনায় তাঁহার বর্ণ হয় ত ঈষৎ ম্লান। যশোদা সুন্দরী—তাঁহার গঠন-পারিপাট্য বেশ আছে। উমার সহিত মিলাইয়া দেখিলেও তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিন্দা করা চলে না। তবে উমা যশোদাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি বলিয়া বোধ হয়। যশোদা কিন্তু খর্ব্বকায়া নহেন। যশোদার গঠন সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলা চলে না। কারণ, তাঁহার রূপ লইয়া বড় আন্দোলন কখনও হয় নাই। আমরা সকল খুঁটিনাটি জানিব কোথা হইতে? মনে হয়, তাঁহার সৌন্দর্য্যে সন্ধ্যার ঈষৎ আভা আছে। কিন্তু তথাপি সে সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ সান্ধ্য নহে। আমরা গুণ হইতে টানিয়া টানিয়া যশোদার সৌন্দর্য্য যত দূর পারিয়াছি, ফুটাইতে ত্রুটি করি নাই। এখন কবি পাঠকেরা আমাদের চিত্রের দোষ বর্জ্জন এবং অসম্পূর্ণতা পূরণ করিয়া লউন। ['ভারতী ও বালক,' অগ্রহায়ণ, ১২৯৭]

কৈফিয়ৎ

['ভারতী ও বালক' পত্রে বলেন্দ্রনাথের 'রাধা' (শ্রাবণ ১২৯৭, পৃ. ২১৬-২৪) ও 'যশোদা' (অগ্রহায়ণ ১২৯৭, পৃ. ৪২১-৩১) উভয় প্রবন্ধ সম্বন্ধেই সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী কিছু বিরুদ্ধ মন্তব্য করেন। তাহারই জবাবস্বরূপ নিম্ন-মুদ্রিত 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধ উক্ত পত্রের ১২৯৭ অগ্রহায়ণ-সংখ্যার ৪৩১-৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়।]

বৈষ্ণব কবির রচনা যে আধ্যাত্মিক ভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে, আমরা তাহা কোথাও অস্বীকার করি নাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক ভাবে দেখা যায় বলিয়া সাহিত্যের হিসাবে বৈষ্ণব কাব্য আলোচনা করিলে যে কোনও দোষ ঘটে, আমাদের এরূপ বিশ্বাস নহে। ভারতীতে কিছু দিন হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশেষ ঝোঁক দেওয়া হইতেছে, এবং বৈষ্ণব কাব্যের চরিত্র সমালোচনায় আমরা আধ্যাত্মিকতাকে বর্জ্জন করিয়াছি বলিয়া আমাদের প্রতি দোষারোপও শুনা যাইতেছে। দোষ ক্ষালনার্থে আমরা সম্পাদকীয় নোটের উপর দুই চারি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম।

১। বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণের সম্পূর্ণ মানব-রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের প্রতি অঙ্গের যৌবনসন্নদ্ধ সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। এ রূপবর্ণনা কোথাও আধ্যাত্মিক নহে—কেবলই দেহজ ভাবভঙ্গী এবং গঠনের পারিপাট্য লইয়া। টানিয়া বুনিয়া ইহার মধ্য হইতে যে আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা না যায় এমন নহে, কিন্তু কাব্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সহজে বোধ করি কেহ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া দিতে পারেন না। ইহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, বৈষ্ণব কবি কবিতারচনা-কালে সর্ব্বদা প্রবল আধ্যাত্মিকতায়

পরিচালিত হয়েন নাই। হয় ত মূলে আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য, কিন্তু লিখিবার সময়ে মানব-ভাবে ভোর হইয়াই লিখিয়াছেন। সুতরাং কাব্যে মানবভাবই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। এখন কবির হৃদয় ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উদ্দেশ্যগত আধ্যাত্মিকতাকে টানিয়া আনিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইবার প্রয়োজন কি? সাহিত্যে ইহা নিষ্ফল। আমরা তাহাই বলি। যেখানে উদ্দেশ্য লইয়া টানাটানি, সেখানেই আধ্যাত্মিকতা বিচার্য্য। নহিলে, কথায় কথায় আধ্যাত্মিক খোঁচা দিয়া কাব্যকে অস্থির করিয়া তুলিবার কোনও আবশ্যক নাই। আমরা কেবল আধ্যাত্মিক সমালোচনা না করিয়া কাব্যের সমালোচনা করিয়াছি মাত্র, ইহাতে দোষ কি বুঝা গেল না।

২। কাব্যের সমালোচনা কি করা চলে না? তাহা হইলে বিদ্যাপতির রাধিকার সহিত চণ্ডীদাসের রাধার তুলনা হয় কিরূপে? আধ্যাত্মিক হিসাবে দুই জনেই সমান ভক্ত। দুই জনেই প্রেমে তন্ময়—সুতরাং ছোট বড় করা যায় না। কিন্তু দুই বিভিন্ন কবির হস্তে পড়িয়া দুই জনের মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক প্রভেদ দাঁড়াইয়াছে; তাহা দেখিতে হইলে সাহিত্যের দিক্ দিয়া কাব্য হিসাবেই দেখিতে হয়। সুতরাং আধ্যাত্মিকতাকে খাড়া করিয়া পাঠককে অন্যমনস্ক করা চলে না। আমরা বরাবরই তাই বলিতেছি যে, আধ্যাত্মিকতার বিশেষ স্থান আছে। যখন তখন তাহাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিলে সেও অধিক দিন সসম্মানে টিঁকিবে না, কাব্যও সঙ্কোচে বড় একটা স্ফূর্ত্তি পাইবে না—সর্ব্বদাই ভয়, কখন্ আধ্যাত্মিকতার সহিত ধাক্কা লাগে।

৩। পূজনীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া বলেন, কাব্য রচনার পূর্ব্বে আধ্যাত্মিক রূপক রচিত হইয়াছে। বেশ কথা। কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণব কাব্যের সাহিত্য হিসাবে আলোচনায় বাধা কি? আমরা রূপকের উল্লেখ করিয়াছি, সমালোচনা করি নাই। কারণ, আমাদের তাহা আবশ্যক হয় নাই। কিন্তু সে জন্য যে সমালোচনার অঙ্গহীনতা হইয়াছে, তাহার কোনও পরিচয় পাই না। লেখকের অক্ষমতার জন্য ত্রুটি হইতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেকেই হোমরের ইলিয়াদ্ নামক কাব্যকে রূপকে আলোক এবং অন্ধকারের যুদ্ধ বর্ণনা বলিয়া থাকেন। তাহা সত্য কি না জানি না। কিন্তু যদি হোমরের এই ভাব সত্য হয়, তাই বলিয়া একিলিসের চরিত্র-বিশ্লেষণ বন্ধ করিতে হইবে, হেলেনের রূপবর্ণনা আলোচনা করা যাইবে না, গ্রীস এবং ট্রয়ের যুদ্ধবর্ণনায় রণসজ্জা প্রভৃতি রূপক বলিয়া বাদ দিতে হইবে, এরূপ কোনও কথা নাই। কবি আমাদের সম্মুখে যে চিত্র ধরিয়াছেন, তাহাকে নগণ্য করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। তিনি মূলে যাহাই ঠাহরাইয়া থাকুন, যেরূপ ভাবে চিত্রটিকে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, সেরূপ ভাবে আমরা দেখিতে পারি। প্যারাডাইজ লষ্টের সয়তানকে যে তাহার

স্বাধীনতা-প্রিয়তার জন্য আমাদের অনেক স্থলে ভাল লাগে। তখন কিছু আর আমরা তাহাকে পাপের রূপক-প্রতিমা বলিয়া ধরি না। আমরা তাহার নরক-যন্ত্রণার মধ্যেও অসাধারণ দৃঢ়তা দেখিয়া মুগ্ধ হই। এ ভাব ব্যক্ত করিলে যে কোনও হানি হয়, তাহা বোধ হয় না। তবে সয়তানকে নাকি কবি নিতান্তই পাপমতি দেখাইয়াছেন, তাই তাহার জন্য অনেক স্থলে অনুকম্পা উপস্থিত হইলেও তাহাকে পাপী বলিতে হয়। তথাপি রূপক হিসাবে তাহার সয়তানী যত অধিক, কাব্যের চরিত্র হিসাবে তত নহে। এবং শেষোক্ত হিসাবে ধরিয়া তাহার সমালোচনা করিলে স্থানে স্থানে প্রশংসা করিতে হয় বলিয়া সমালোচনার দোষ দেওয়া চলে না। বোধ করি, এ স্থলে সয়তানের এক আধটু প্রশংসা করার জন্য পাপের প্রশংসা গাহাও হয় না। ধর্ম্মের সহিত সাহিত্যের যোগ থাকিলেই যে সাহিত্য-সমালোচনা বন্ধ করিতে হইবে, এমন কোনও নিয়ম নাই।

৪। দুগ্ধকে আমরা কোথাও জল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহি নাই। সম্পাদিকা মহাশয়া আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। আমরা জলেরই বিশ্লেষণ করিয়াছি। সে জল কেবল মন্ত্রপূত। আমরা তাহা অস্বীকার না করিয়া জলজান এবং অম্লজান নামক রাসায়নিক পদার্থের নাম উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। ইহাতে মন্ত্রের অবমাননা করা হইয়াছে অথবা জল বিশ্লেষণে দোষ ঘটিয়াছে বলা যায় না।

শরৎ ও বসন্ত

যাহাদের হৃদয় স্বভাবতই স্নেহসিক্ত. তাহাদের মুখে কেমন একটি করুণ স্নিগ্ধ ছায়া পড়ে। বিশেষতঃ সে হৃদয় যদি দুঃখগঠিত হয়, এই স্নেহময় ভাবে তাহার প্রশান্ত শ্রী সমধিক বিকশিয়া উঠে। এ কোমল সান্ধ্য শ্রীতে কোথাও বিহ্বল মদির-বিলাস নাই, রবিকিরণের প্রখর তীব্রতা নাই, বাহির হইবার দুর্দ্দম্য প্রবল উদ্যম নাই ; এ সৌন্দর্য্য যেন নীরবে আপনার দারুণ হৃদয়বেদনা বহিয়া চিরদিন সহিতে প্রস্তুত। শরৎ এই বেদনাময় অর্দ্ধস্ফুট সৌকুমার্য্যে সুন্দরী। অর্দ্ধোন্মুক্ত অবগুণ্ঠনমধ্য হইতে পাণ্ডুশ্রীবিভাসিত যৌবনের স্নিগ্ধ লাবণ্য ফুটিয়া পড়িয়াছে। নয়ন নীরব, দৃষ্টি স্থির, মুখশ্রীতে কোথাও চাঞ্চল্যের পরিচয় নাই। সমস্ত সৌন্দর্য্যে কেমন কোমল নীরব সংযত ভাব। নয়নের কোণে, অধর-প্রান্তে যে করুণ কাতরতা প্রকাশ পায়, তাহাতে অধৈর্য্যও ধীর। শরৎ বিলাপ গাহিতে জানে না, চিরদিন নিভৃতে আপন গভীর অন্তরের মাঝে দারুণ রুদ্ধ বেদনা সহিয়া আসে। বর্ষার মত সে অন্তর-জ্বালায় গুমরিয়া মরে না, বসন্তের মত সুখতৃষ্ণ বিলাপে

যৌবনজ্বালা ঢালিয়া দিয়া তৃপ্তি অনুভব করে না। শরৎ দুঃখিনী—দুঃখিনীর মতই তাহার ভাব। বিলাস তাহার স্বভাব নহে।

আর বসন্ত? বসন্ত-সুন্দরী আপন কনক-রূপযৌবনে গরবিনী। চঞ্চল দৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে নয়নকোণ অনুসরণ করে, চারু অধর মৃদু হাসিতে তরল চুম্বনলালসা ফুটাইয়া তুলে, তৃষিত যৌবন আপন বিবশ অধীরতায় হেলিয়া দুলিয়া ঢলিয়া পড়ে। শরতের মত সংযত সলজ্জ ভাব বসন্তের নহে। বসন্ত প্রবল যৌবন-বন্যায় ভাসিয়া চলিয়াছে—পথে যে পড়ে, তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সে আপনাকে আপনি ধরিয়া রাখিতে পারে না—দুর্দ্দম্য বেগে আপনার মধ্য হইতে অধীরে বাহির হইয়া পড়ে। বসন্তের সুখের প্রাণ; সে সুখ চাহে, সুতরাং তাহাকে বাহির হইতেই হয়। তাহার প্রণয় যৌবনের বাধা মানে না, বিঘ্ন মানে না, ঠেলিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া যায়। শরৎ প্রণয়ে ভাসিয়া যায় না, ডুবিয়া যায় বটে। তাহার প্রেম জীবনের, উল্লসিত চঞ্চল যৌবনের নহে। এই জন্যই শরৎ জগৎকে আপনাতে টানিয়া আনে, বসন্ত আপনাকে জগতে বাহির করে। বসন্ত ত দুঃখ সহিতে পারে না; বিলাস-হৃদয় সুখভরা ধরণীতে লঘু আপনাকে ছড়াইয়া দেয়, ফুলের গন্ধে, মলয়-হিল্লোলে, কোকিল-কূজনে বিভক্ত হইয়া মনবেদনা মুছিয়া ফেলে।

বসন্ত ও শরৎ উভয়ের শ্রীতেই একটা কোমল মাধুরী আছে। কিন্তু কোমলতার মধ্যেও উভয়ের পার্থক্য যথেষ্ট। বসন্তের কনক-মাধুরী, ঢলঢল বিলাসভাব শরৎ অপেক্ষা যেন ঈষৎ তীব্রতা দেখা যায়। নবীন বাসনায় চারি দিকে প্রকৃতির ধনে ধান্যে পত্রপুষ্পে উৎফুল্ল যৌবন-বিকাশ। শরতের মাধুরী রজত-জ্যোৎস্নাময়ী। স্বভাবের বিস্তৃত সৌন্দর্য্যের উপর শরতের সন্ধ্যাময় প্রভাব ঘনাইয়া পড়িয়াছে। সমস্ত প্রকৃতিতে একটা অব্যক্ত অস্ফুট অবগুণ্ঠনবতী নীরব লাজমাধুরী। প্রকৃতি প্রশান্ত। আঁধারে আলোকে মিশামিশি, আকাশে ধরণীতে বিবাহ, প্রকৃতির এক নব শ্রী। নদীর চঞ্চল আলোক-হৃদয়ের উপর দিয়া ম্লান ছায়ার মত এই নীরব সন্ধ্যা-শ্রী অতি মৃদু কম্পনে বহিয়া যায়। সে কম্পন অতি মৃদু—অতি মৃদু। যেমন মৃদু শিহরণে রূপসীর তরল লাবণ্য বাহিয়া বিষণ্ণ ক্ষীণ পাণ্ডুচ্ছায়া বহিয়া যায়, জ্যোৎস্নানিশির বিমল রজত-ঔজ্জ্বল্য স্পর্শ করিয়া ম্লান বিরহ-চাঞ্চল্য ভাসিয়া যায়।

শরতের মাধুরী ম্লানভাবে। শরৎকালের সূর্য্যালোকও ম্লান। এবং হয় ত এই জন্যই তাহা মধুর। বাসন্তী সূর্য্যালোক পূর্ণ উজ্জ্বল—তাহাতে ছায়াময়ী পাণ্ডু-অস্পষ্টতা নাই, ক্ষীণ কুজ্ঝটি-অবগুণ্ঠন নাই। তাই বলিয়া তাহা কি মধুর নহে? বসন্তের রবিকর প্রকৃতির শ্যামল যৌবন-স্পর্শে কোমল, মলয়-সেবনে মধুর। সুতরাং তাহার ঢলঢল কনক-বিলাসে মদির-বিহ্বলতা অনুভব হয়। শরতের সৌন্দর্য্য প্রশান্ত, গভীর। বোধ করি,

ম্লান ভাবে কেমন একটু বিশেষ গভীরতা আছে। এই জন্যই উষাপেক্ষা সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য, মিলন অপেক্ষা বিরহ গভীর। এ গাম্ভীর্য্য কিন্তু রুদ্র নহে। ইহাতে করুণ কোমল ভাব বিশেষ প্রবল। বসন্তের মাধুরী মিলন-মথিত। মিলন কল্লোলময়—তাহার চুম্বন আছে, হাসি আছে, বাঁশী আছে, কাহিনী আছে। নীরবতা তাহার ধর্ম্ম নহে। অভাব বোধ হইলে সে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিলাপ করিতে থাকে, কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়। বিরহ বিজনে বসিয়া আপনার মনে নীরবে প্রেম-কাব্য রচনা করে। সহমর্ম্মিতায় জগৎ তাহার অন্তঃপুরে সরিয়া আসে। বিলাপে তাহার হৃদয়ভার লঘু হয় না।

বসন্ত কিছুতেই বিজন বিরহ সহিতে পারে না। তাহার চরিত্র মিলন-গঠিত—হৃদয় সুখপ্রধান। বসন্তকালে যে বিরহযন্ত্রণা থাকে না এমন নহে—নহিলে, বাসন্তী বিরহ লইয়া এত কাব্য রচনা হইবে কেন?—কিন্তু বসন্তের হৃদয় বিরহরচিত নহে। বাসন্তী বিরহ মিলন-হৃদয়ের। এই জন্যই তাহা লঘু এবং বাহির হইয়া পড়ে। বিরহে বসন্ত আপনাকে কিছুতেই ভুলিতে পারে না—আপনাকেই সারা ক্ষণ চক্ষের সম্মুখে দেখে, আপনারই প্রতিমা খাড়া করিয়া রাখে, আপনারই অবস্থা তাহার মনে পড়ে, বাকি যেটুকু মিলিলে হৃদয় পূর্ণ হয়, সেটুকু কেবল আপন সুখতৃষা মিটাইবার জন্য না চাহিলে নয়। আপনার মধ্যে চাপা থাকিতে না পারিয়া বসন্ত আপনাকে ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু আপনার কথা বিস্মৃত হয় না। শরৎ আপনাকে অনেকটা ভুলিয়া যায়। আপন হৃদয়ের মধ্যে সে পরের দুঃখ কষ্ট বেদনা অনুভব করে। কিন্তু বসন্তের মত সে আপনার মধ্য হইতে বাহির হইয়া পড়ে না—শরতে জগৎ গুটাইয়া আসে। এইখানেই তাহার সন্ধ্যার সহিত সাদৃশ্য।

বসন্তের সহিত বোধ করি উষার সাদৃশ্য থাকিতে পারে। উষা ঘন অন্ধকারের হৃদয়ে আলোকের প্রথম আবির্ভাব; বসন্তও তাহাই—দীর্ঘ হিমরজনী অবসানে বসন্তেই প্রথম অরুণ-উৎসব। নবীন কিরণ পানে জগৎ জাগিয়া উঠিয়াছে—তাই সহসা বহুদিনের নিবিড় স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া প্রভাত-বিহঙ্গ গাহিয়া উঠে, হৃদয় টুটিয়া প্রথম রবিকিরণে কনককুসুম ফুটিয়া পড়ে, পুলক-অধীর মলয়-সমীর ফুলে ফুলে চুম্বন রাখিয়া বহিয়া যায়। উষা জগতে বাহির হইয়া পড়ে, বসন্তও বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু উভয়ের গতি ঠিক এক নহে। উষা বালিকা; বসন্ত সুন্দরী তরল-যৌবনা। যৌবনের হেলিয়া দুলিয়া আধ চলন—বসন্তের চলন ঢলঢল। ভাবেও এইখানেই বিশেষ অনৈক্য। যৌবনের আকাঙ্ক্ষা আছে, প্রণয় আছে, মদির-মত্ততা আছে; বালিকা সরলা—এ সকল ভাব তাহার হৃদয়ে জাগে নাই। প্রথম যৌবনে বসন্তের হৃদয়ে তরঙ্গ উঠিয়াছে—দুর্দ্দম্য আবেগ, প্রবল কল্লোল, উচ্ছ্বসিত অধীরতা। উষার চাঞ্চল্য বালিকাসুলভ। তাহাতে অন্তরের অধীর আবেগ নাই, যৌবনের মদির চাঞ্চল্য নাই।

বসন্তে প্রকৃতি খুব স্পষ্ট। শরতের মত ছায়াময় ভাব নাই। আকাশ, ধরণী আপন পূর্ণ গৌরবে অভিব্যক্ত। প্রত্যেক বর্ণের স্বতন্ত্র বিকাশ। গায়ে গায়ে মিশিয়াছে, কিন্তু স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ। শরতের পাণ্ডু স্নেহে সমস্ত প্রকৃতি যেন কেমন মিশিয়া যায়। আকাশ, ধরণী, বিভিন্ন বর্ণ এক জায়গায় গুটাইয়া আসে। সন্ধ্যায়ও এইরূপ। উষায় বসন্তের মত সকলই ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু বসন্তকে তবে মিলনের কাল বলে কেন? মিলনেই একীকরণের ভাব; সুতরাং হিসাবমত বসন্তেই জগতের গুটাইয়া আসা সঙ্গত। কিন্তু তাহা নহে। বসন্তে হৃদয় মিলিতে চাহে বলিয়াই বাহির হয়—মিলনের জন্য কাহাকে খুঁজিয়া বেড়ায়। তাহার দেখা না পাইলে পাঁচ জনকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করে, মিলন হইলে উৎসবে আনন্দ প্রকাশ করে। বসন্তের মিলনে ঘটা আছে, সহচরী আছে, হুলুধ্বনি আছে। শরতের নীরব মিলন—কেবল দুইটি হৃদয়ের একীকরণ। বাসন্তী মিলনের অধরে কনকহাসি সুখ বিলাইতেছে। সুখ ছড়াইতেছে—দুইটি হৃদয়ই আপনার সুখ জানাইতে চাহে। শরতের মিলন সুখ জানে না—মিলনে দুইটি হৃদয় ভোর।

বসন্তের আকাশ হাসিয়া দেখাইয়া দেয়—তাহার পার্শ্বে ঐ শ্যামল-যৌবনা ধরণী। আপনার হৃদয়ে রূপসীকে পাইয়া সে একটু গর্ব্ব অনুভব করে। সুতরাং দশ জনের নয়ন আকর্ষণ না করিলে তাহার তেমন পরিতৃপ্তি জন্মে না। বসন্তের মিলন বিলাসে ঢল ঢল। শরতের মিলন কেবল নয়নে নয়নে, অধরে অধরে, হৃদয়ে হৃদয়ে। শরতের আকাশ যেন ধরণী-হৃদয়ে খানিকটা নামিয়া আসে, ধরণী আকাশ-হৃদয়ে হারাইয়া যায়। বসন্তে দুই জনে বরাবর পাশাপাশি। শরতে পরস্পরের পূর্ণ আলিঙ্গনে মরিয়া সুখ। মরিলে দুই জনেই মরিবে—এত ঘনাঘনি, এমনি একীকরণ। সন্ধ্যায়ও কতকটা এইরূপ মিলন। এইরূপেই দুইটি হৃদয় এক হইয়া যায়, এইরূপেই পরস্পরকে পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ উপভোগ করে, সহচরী থাকে না, হুলুধ্বনি থাকে না, শান্ত নীরবতা। সন্ধ্যার সহিত শরতের হৃদয়গত অনেকটা ঐক্য আছে। উভয় উভয়কে বুঝিতে পারে। কিন্তু উষা বসন্তকে সেরূপ বুঝিতে পারে না। উষার সহিত বসন্তের সাদৃশ্য হৃদয়গত নহে, কেবল বাহিরের। যৌবনাবির্ভাবে বসন্তের হৃদয় বালিকাহৃদয় হইতে বিস্তর তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার সুখ দুঃখ স্বতন্ত্র। সুতরাং উষা বসন্তের সহমর্ম্মী হইবে কিরূপে?

সন্ধ্যা বরঞ্চ বসন্তের ভাব বুঝিতে পারে। কিন্তু বয়সের তারতম্য হেতু উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সখীভাব নাই। সন্ধ্যা বসন্ত অপেক্ষা প্রবীণা—তাহাতে মাতৃভাব সমধিক বিকশিত। বসন্তের মত তাহার যৌবন-অধীরতা নাই। যসন্তের প্রথম যৌবন, স্বভাবও কিছু অধীর। শরতের সহিত তাহার প্রকৃতিগত ভিন্নতা। তাহার উপর বয়সের প্রভেদ। এ প্রভেদ কিন্তু তত গুরুতর নহে। মানসিক গঠনেই উভয়ের প্রধান অনৈক্য। এমন কি, সুখ

দুঃখ, স্মৃতি স্বপ্ন, কল্পনা কবিতায়ও উভয়ের বড় মিল দেখা যায় না। অনুরাগ বিরাগের কথা বাহুল্য মাত্র।

কিন্তু সেই কথাটাই প্রথম আলোচ্য। আমরা যেরূপ ভাবে শরৎ এবং বসন্তের তুলনা করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে উভয়ের প্রেমের প্রকৃতি বোধ করি অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। অন্ততঃ এত দূর চরিত্রগত বিশেষত্ব দেখিয়া উভয়ের প্রেম সম্বন্ধে আমরা দুই চারি কথা বলিতে পারি। বসন্তের অধীর প্রণয়—চিরদিন নিভৃতে নীরবে সে সহিয়া আসিতে পারে না। তাহার লঘু হৃদয়, সুখের প্রেম, শরতের মত তাহা ভাবগত নহে, অনেকাংশে বস্তুগত। শরৎ দূরে দূরে ভালবাসিতে পারে। কারণ, সে প্রেম হইতে সুখটুকু ছাঁকিয়া লইতে চাহে না। শরতের প্রেম প্রেমের জন্যই। আপনার মধ্যে প্রেম উপভোগ করিয়া সে প্রেমে মজিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বসন্তের যে ভালবাসা নাই, এমন নহে। কেবল শরতের হৃদয়ের মত তাহার হৃদয় গভীর নহে বলিয়াই প্রেমে সে তেমন মগ্ন হইয়া প্রেম উপভোগ করিতে পারে নাই। বসন্ত প্রণয়ের নৈরাশ্যে আত্মহত্যা করিতে পারে—যদিও এ বিষয়ে তেমন কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না—কিন্তু জ্বালাবিদ্ধ দুর্ব্বহ জীবনভার সে বোধ করি প্রশান্ত ভাবে বহিতে পারে না।

শরতের চরিত্রে প্রশান্ত ভাব। আত্মহত্যা তাহার পক্ষে অসম্ভব। ঘৃণা তাহার স্বভাব নহে—আপনাকে অথবা পরকে শরৎ কখনও ঘৃণা করিতে পারে না। তাহার স্বভাবে উদ্দাম বৃত্তির সম্পূর্ণ অভাব। সুতরাং এমন কোনও কার্য্য, যাহাতে তীব্র উৎকটতার আবশ্যক, শরতের দ্বারা সাধিত হইবার সম্ভাবনা বিরল। প্রেমেও শরতের এই চরিত্রগত প্রশান্ত গভীরতা টলে নাই। তাহার প্রেম নীরবে রচিত হইয়াছে, নীরবেই ফুটিয়াছে, নীরবে অন্তিম দিবসে তাহার সহিত ঝরিয়া যাইবে। বসন্তের প্রণয়ে কত বঙ্কিম চাহনি, মৃদু কনক-হাসি, কত রূপ, কত যৌবন, কত ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস, কত সাধাইবার ছলছল মান; শরতের সেই সরল নীরব মাধুরী, সেই অশ্রুসিক্ত বিমল স্নেহসৌন্দর্য্য, সেই চিরমধুময় ভাব। বেশভূষার বাহুল্য নাই। সন্ধ্যাভ শুভ্র অঞ্চলপ্রান্ত বাহিয়া একটি অতি ক্ষীণ মৃদু ধান্য-ঔজ্জ্বল্য তরঙ্গভঙ্গে বহিয়া গিয়াছে—অঞ্চলের সান্ধ্য ভাঁজে ভাঁজে কোথাও ঈষৎ কনক-চাঞ্চল্য, কোথাও বা সমধিক ছায়া।

শরৎ আপনার প্রেম জানাইতে ব্যস্ত নহে। এই জন্য তাহার পূর্ব্বরাগেও নীরবতা, বিরহেও নীরবতা, প্রেমেও নীরবতা। বসন্তের মত তাহার প্রণয়ে সহচরীবাহুল্য নাই। ব্যাখ্যা করিয়া, বিলাপ গাহিয়া, নাকে কাঁদিয়া ত তাহাকে প্রেম ব্যক্ত করিতে হয় না। বসন্ত যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে আপনার অধীন করিতে চায়। সুতরাং তাহার জন্য আয়োজন করিতে হয়। বসন্তের সাজসজ্জা আবশ্যক—পরের হৃদয়ে আপনাকে লইয়া

যাইতে হইবে। শরতের এ সব কিছুই চাহি না। শরতের ভালবাসা আত্মাময়। সে কেবল ভালবাসিয়া যায়—ভালবাসার পাত্রকে আপনার দ্বারা আড়াল করিয়া রাখে না। বসন্তের প্রণয়ে ভয় আছে, পাছে আর কেহ তাহাকে বঞ্চিত করে। সে একেলা ভালবাসিতে চায়—তাহার প্রণয়ীকে পাঁচ জনে তেমন করিয়া ভালবাসিলে সে মনে মনে একটু যেন বিরক্ত হয়। এই জন্যই বাসন্তী প্রণয়ে অনেক সময়ে উদ্দেশে অভিশাপ শুনা যায়। বসন্তের মত শরতের হিংসাভাব প্রবল নহে। বসন্তের প্রণয় সুখ-তৃষ্ণ এবং কতকটা দেহবদ্ধ—সন্দেহ ভয়ও তাই অধিক। বসন্ত-সুন্দরীর স্বভাবে সর্ব্বত্রই চাঞ্চল্য।

শরতের কেমন একটি নববধূ-ভাব। তাহার প্রণয়ে গার্হস্থ্য সৌকুমার্য্য আছে। বসন্তের প্রণয়ে বিলাস-ঔদাস্ত—কোথাও দাঁড়াইবার স্থান নাই। শরতের সহিত বসন্তের এইখানে বিশেষ তফাৎ। শরৎ প্রণয়ের দুয়ারে আপনাকে বলি দিয়া অমর। সে আর কিছু চাহে না। শরতের প্রণয়ে স্বাধীনতা—কাহাকেও আপনার অধীন করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। সেই জন্যই বোধ করি তাহার কোকিল নাই, মলয় নাই, কুসুমশর নাই। এ সকল তাহার তেমন আবশ্যক হয় না। সে বেদনায় আছে ভাল। তাহার সুখে কাজ নাই।

এই বেদনা দিয়াই শরতের কল্পনা এবং কবিতারচনা। বসন্তের মত শরতেরও গীতি-কবিতা। কিন্তু তাহাতে একটি বিশেষ ম্লান বেদনাময় ভাব। শরতের হৃদয়ের মত তাহা গভীর এবং প্রশান্ত। বসন্তের কবিতা উচ্ছ্বাসময়ী—তরঙ্গে তরঙ্গে বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে বিকশিত যৌবন, নবীন আবেগ, ফুল্ল প্রকৃতি, পূর্ণ কল্লোল। সে কবিতা মলয়-সমীরণের মত হু হু বহিয়া যায়, বাসন্তী জ্যোৎস্নার মত স্মৃতিতে ছাইয়া ফেলে, প্রবল বন্যার মত হৃদয় প্লাবিত করিয়া দেয়। শরতের কবিতা হৃদয়কে প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণে, বিহঙ্গকল্লোলে, নব যৌবনে বাহির করিয়া লইয়া যায় না। শরৎ জগৎকে অন্তরে আনিয়া দেখে। এই জন্য তাহার কবিতায় অনেক সময়ে চিন্তার গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। শরতের ভাব কেন্দ্রীভূত। এক একটি ভাব যেন মনের মধ্যে ঘনাইয়া ঘনাইয়া বাহির হইয়াছে। শরতের কবিতা বোধ করি অনেকটা সনেট ধরণের। বসন্তের কবিতায় কল্পনার অধীর প্রবাহ, বর্ণনার সুকুমার সৌন্দর্য্য। কচি কিসলয়ের বিকাশমান প্রথম শ্যামল আনন্দে, কুসুমকোরকের মলয়-চুম্বিত মৃদু কনকশিহরণে, জ্যোৎস্না-নিশির বিরহবিদ্ধ কাতর কোকিল-কূজনে বসন্তের কবিতা। শরতের কবিতায় ঝরা ভাব, এত যৌবনকল্লোল নাই।

শরৎ প্রকৃতির ভাব হইতে এক একটি ভাব ফুটাইয়া তুলে। বসন্ত প্রকৃতির উপর দিয়া বহিয়া যায়—কোথাও হৃদয় টুটিয়া, কোথাও সৌরভ লুটিয়া। এই জন্য বসন্তের ছন্দ দ্রুত এবং অনেক স্থলে তরঙ্গায়িত—মলয়-হিল্লোলে উঠিয়া নামিয়া চলিয়াছে। শরতের

ছন্দ বসন্ত অপেক্ষা ধীর এবং নিয়মিত। ক্রমাগত উঠা নামা নাই—কতকটা এক ভাবে গড়াইয়া গিয়াছে। বসন্তের মত তাহার অনুপ্রাস জমে না, তরল ললিত শব্দও তত অধিক নহে। বসন্তে কত শব্দ, কত বর্ণ ; বর্ণে বর্ণে, শব্দে শব্দে অনুপ্রাস। শরতের কবিতায় কঠিনতা বড় দেখা যায় না। তবে, কোমল হইলেও ঢলঢল তরলতা শরতের কবিতায় অল্প। শরতের ভাব বিশুদ্ধ, কোমল, শান্ত। শরৎ-কবিতার তুলনা এক শরতের জ্যোৎস্নায়—শুভ্র বিমল রজত-অমৃতনিস্যন্দী। বসন্তের কবিতা সভ্রূভঙ্গ, কনকদীপ্ত, যৌবন-ঢলঢল। অন্তর আপন যৌবন-উল্লাসে বাহির হইয়া প্রকৃতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য বসন্তের কবিতায় দীর্ঘ ক্রন্দন-বিলাপ শুনা যায় ; শরতের নীরব রুদ্ধ নিশ্বাস। শরতের ভাষা নীরবে বেদনাময়ী। শরৎ যত না বলে, তত বেদনা ব্যক্ত করে। তাই বুঝি তাহার কাব্যে কেমন একটু অস্পষ্ট ছায়া-ছায়া ভাব।

শরতের স্মৃতিও অস্পষ্ট। তাহার স্মৃতিতে একটা আবছায়া, যেন কবে কোথায় কি ঘটিয়াছে। বসন্তের স্মৃতি বেশ স্পষ্ট—সেই কোন্ মদিরমিলনময়ী রজনীর অগাধ বিলাস-সুখ। বসন্ত সুখে ভোর। তাহার স্মৃতি অতীতের সুখ মন্থন করিয়া। শরৎ অতীতের দুঃখের মধ্যে আনন্দ উপভোগ করে, সুখে সুখে তাহার মন বিচরণ করিতে পারে না। শরতের স্মৃতিতে একটা অস্পষ্ট দুঃখের ছায়া-সুখ ; কোন্ বিরহ-রজনীতে এমনিতর ম্লান জ্যোৎস্না ফুটিয়াছিল, এমনিতর নিঃশব্দে ক্ষীণ সৌরভে বাতাস মৃদু বহিয়াছিল, আকাশের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শুভ্র মেঘখণ্ড পানে চাহিয়া শরৎ সারা নিশি বাতায়নে বসিয়া। বিস্মৃত স্বপ্নের মত সেই কুজ্ঝটি-অবগুণ্ঠিত নিশি ম্লান জ্যোৎস্নালোকে শরতের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে মৃদু ছায়াকম্পনে ঈষৎ জাগিয়া উঠে। তাহাতে এই বর্ত্তমানে যেন সেই অতীতের আভাস। বসন্তের স্মৃতিতে কেবলই বিলাপ—সেই অতীতের মত সব হইল না কেন ? বর্ত্তমানে অতীতের ছায়া অনুভব করিয়া বসন্ত সুখ পায় না, অতীতের মদির সুখ পানে চাহিয়া সে বিহ্বল।

কাব্যে এই স্মৃতি লইয়া বসন্ত ও শরতের ভাবের অনেক তফাৎ। বসন্তের কবিতায় পুরাতন দিনের যখন উল্লেখ দেখা যায়, তখন সেই সুখবিলাপ। কোথা সেই অধরমিলিত চুম্বন-বিহ্বলতা, কোথা সেই সহচরীবেষ্টিত নিকুঞ্জমিলন ? বর্ত্তমানে সে সুখ সম্পূর্ণ মিলিতেছে না কেন ? শরতের কাব্যে পুরাতন দিনের উল্লেখ স্বতন্ত্র ভাবে। তাহাতে কি অতীতের সুখ-রজনীর কথা নাই ? আছে, কিন্তু এতটা নয়। সে সুখও যেন দুঃখসিক্ত। যেন কবে বিদায়ের পূর্ব্বে দু'জনে কোথায় মিলিয়াছিল, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সঙ্গী কেহ নাই, দুটি ফোঁটা অশ্রুজলে দু'জনের নীরব প্রেমালাপ। এ মিলনে যেন কি অবসান-ভাব। শরতের কাব্যেও কেমন একটি ম্লান মধুর ভাব। তাহাতে সকল সময়ে যে বিস্তর দুঃখের কথা

আছে, তাহা বলা যায় না, কিন্তু সমস্ত ভাবে সেই বিষণ্ণ ম্লান পাণ্ডু স্নেহ অভিব্যক্ত। শরতের কাব্যের মর্ম্মস্থলে বেদনা। এ বেদনায় সুখের তীব্র মদির অধীরতা নাই, এ বেদনা বসন্তের বিরহবিদ্ধ বিলাপ-সুকণ্ঠ বিহঙ্গের নহে। শরতের শুকতারাই এ বেদনার নীরব প্রতিমা।

শরতের কাব্যে প্রেমের সুখ নাই, জ্বালা আছে। কিন্তু এ জ্বালায় জগতের প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ পায় না। তৃপ্তি তাহার নাই—কোথা হইতে থাকিবে? সে জীবনে যাহা চাহিয়াছে, তাহা পায় নাই—কিন্তু অতৃপ্ত বাসনার মধ্যেও এমন প্রশান্ত সহিষ্ণুতা। সহৃদয়তা শরতের কাব্যে বিশেষ প্রবল। এই জন্য বিজন বেদনায় শরতের কবিতা পাঠে মন অনেক সময়ে প্রশান্ত হইয়া আসে। যেন কোথায় কে আমার বিজন সহমর্ম্মী কাতর করুণকণ্ঠে আমারি হৃদয়ব্যথা রজতস্বরে গাহিয়াছে, অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে কে যেন দূরে দূরে বহু স্বপ্নময়ী রজনী অতিবাহিত করিয়া তাহার নীরব সহানুভূতিতে আমাকে আহ্বান করিয়াছে। তাহার বেদনা আপন গভীর অন্তরের মাঝে অনুভব করিয়া হৃদয় ধীর। শরতের কাব্যে দুঃখ আছে, জ্বালা আছে, অতৃপ্তি এখানেও, কিন্তু খুঁৎখুঁৎ বড় নাই। শরৎ সহিতেই আসিয়াছে। দুঃখ আসে, সে সহিয়া যায়; সুখ আসে, সে সহিতে থাকে। এই জন্য শরতের কাব্যে সুখের প্রচণ্ড উল্লাস নাই, দুঃখের অনুনাসিক বিলাপ নাই।

বসন্তের কাব্যে প্রেমজ্বালা প্রশান্ত নহে। তাহাতে অবিশ্রান্ত ছট্‌ফটানি। বসন্ত ক্রমাগত খুঁৎখুঁৎ করিতে থাকে—তাহার কিছুতেই মন উঠে না, জগতের পরে একটু রাগও হয়। পরের শ্রী দেখিয়া বসন্ত অন্ধকারে থাকিতে পারে না। এই জন্য বসন্তে রূপচর্চ্চা খুব প্রবল। বসন্তের কাব্যে রূপের তরঙ্গ উঠিয়াছে। উপমারও প্রাদুর্ভাব। বসন্তের কবিতায় তুলনা করিয়া রূপ ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। নয়ন খঞ্জন জিনিয়া, অধর বিম্বফলকে লজ্জা দেয়, বাহুর সহিত মৃণালের তুলনা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া। বসন্তে রূপ রস গন্ধ কূলে কূলে; কাব্যেও তাহাই।

এইবারে কাব্যালোচনা ছাড়িয়া শরৎ ও বসন্তের তুলনা শেষ করা যাক্। উভয়ের প্রেম এবং কাব্য আমরা তুলনা করিয়া দেখিলাম। তাহাতে স্বভাবও অনেকটা বুঝা গেল। শরৎসুন্দরী স্নেহময়ী গৃহিণী—প্রিয়জনের দর্শন বিরহেও নীরবে ম্লানমুখে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া চলিয়াছে। তাহার রাগ নাই, ধীর স্বভাব, স্নেহগঠিত হৃদয়। বসন্তসুন্দরী কিছু উতলাপ্রকৃতি। নবীন যৌবন এইরূপ হইয়াই থাকে। কিন্তু উভয়েরই প্রকৃতি কুটিল নহে। তবে দুঃখে ও সুখে দুই জনের চরিত্র স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাহা যথেষ্ট দেখাইয়াছি। বাকিটুকু পাঠকবর্গের উপরে নির্ভর করিয়া রাখিয়া দিতে পারি—তাঁহারা গড়িয়া লইবেন।

এখন প্রিয়-বারতা লইয়া বসন্ত বিরহি-হৃদয়ে ঘনাইয়া আসুক, শরৎ ধীরে ধীরে নিভৃতে নীরবে আপন বেদনা লইয়া ঝরিয়া যাক্। ['ভারতী ও বালক,' পৌষ ১২৯৭]

বোল্‌তা

আমি বোল্‌তা—আপনার ক্ষুদ্র বিজন চাকটির মধ্যে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ সমাহিত করিয়া নিরিবিলি কাল যাপন করি। আমার চাকের বাহিরে তোমাদের বিপুল সংসার—জীবনসংগ্রাম, প্রবল উদ্যম, বৃহৎ অনুষ্ঠান। আমার এ সকল তেমন পোষায় না, সুতরাং চাকের মধ্যে বসিয়া বিরলে এই কনক-লাবণ্যের নশ্বরতায় কোনও প্রকারে ডুবিয়া থাকি। তোমাদের কাজকর্ম্ম আছে, তোমরা হাস খেল, আপন বিবশ আনন্দে অধীর হইয়া উঠ, নিভৃত চাকপ্রান্ত হইতে এক বার উঁকি মারিয়াই আমি সরিয়া যাই। আমার এ জীবনে ত আর সংসারের কোনও উপকার নাই। কিন্তু জীবনসংগ্রাম আমাকেও ছাড়ে না—আমাকেও চাক ছাড়িয়া এক একবার বাহির হইতে হয়। তোমাদের সাসীবদ্ধ হাস্যালাপের বাহিরে তৃণভূমি হইতে আমি রস সংগ্রহ করিতে আসি, এক এক বার সাসীর নিকটে আসিয়া হৃদয়ের বিজন বেদনা জানাইয়া তোমাদের ঐ চির-আনন্দের মধ্যে এইটুকু স্থান প্রার্থনা করি, কিন্তু আমার বেদনা কেহ বুঝে না, আমাব কথা কেহ শুনে না, আমি আবার যেমন তেমনি ম্লানমুখে আপনার চাকে ফিরিয়া যাই। তোমরা কেবল আমার বাহিরের কনককান্তি দেখিয়া মুগ্ধ হও, অন্তরের গভীর জ্বালা বুঝ না। তাই আপনার দারুণ অন্তরজ্বালা লইয়া একা একা চাকের মধ্যেই আমি থাকি ভাল। এ সজন সংসার আমার জন্য নহে।

এ সংসারে আমি কেবল উপমা খাটাইতেই আসিয়াছি। ক্ষীণমধ্যার তনুসৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতে হইলে আমার গঠন লইয়া টানাটানি পড়ে, গৌরাঙ্গী আমার বর্ণের আভা লইয়া আপনার রূপ বিস্তার করেন, আর আমার হুলের সহিত কোন্ রমণীরসনার না উপমা খাটে? কিন্তু ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নাই। এত করিয়াও মহিলাসমাজে আমার প্রতিপত্তির মধ্যে অঞ্চলতাড়না। এক বুঝিতাম, ভ্রমরের মত বসন্তের কাব্যকুঞ্জে আমারও একটু স্থান হইবে, তাহা হইলে না হয় মরমের অশ্রু মরমে রুধিয়া নীরবে এ বেদনা সহিয়া যাইতাম। আমাকে নহিলে চলিবে না, তাই আমার প্রতি বুঝি এই ব্যবহার। এবার অবধি তবে রূপসীরা ভ্রমরের সহিত তাঁহাদের রূপের উপমা দিবেন। আমি চাকের মধ্যে নিরুপদ্রবে বাস করিব, আর বড় বাহির হইবার সাধ নাই।

এ পোড়া অদৃষ্টে বাহির হইলে লাঞ্ছনা বৈ আর ত কিছু মিলে না। তোমাদের মধ্যে আমার হুলের দংশনজ্বালার কথাই শুনিতে পাই—যেন দংশন ভিন্ন ধরণীতে হুলের আর কাজ নাই—কিন্তু এই হুলের দংশনজ্বালায় অন্তরের কি দারুণ জ্বালা ব্যক্ত হয় জান

কি ? যখন এই বিজন মরুজীবনে কাহারও স্নেহ অনুভব করিতে পারি না, একা একা বড়ই শূন্য মনে হয়, তোমাদের সজন হৃদয়ের আনন্দস্পর্শের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠি। তখন এই উন্মাদাবস্থায় এক এক বার আর থাকিতে না পারিয়া কোমল হৃদয়ে কঠিন হুল বিঁধাইয়া দি—হুল বিঁধাইয়া আমার প্রেম জানাই, তোমাদের প্রেম চাহি। কিন্তু আমার হুলের দংশন বোধ করি এ সংসারে সকলে বড় মধুর অনুভব করে না। তাই তোমাদের নিকটে যাইলে তোমরা সরিয়া যাও, নয় তাড়াইয়া দাও। ভ্রমরের সুখদংশনেই তোমাদের বড় আনন্দ। সে গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া ভুলাইয়া রাখিতে পারে কি না। তাই তাহার কালো রূপে, হে কবি, তুমিও মজিয়াছ। কিন্তু ক্ষুদ্র বোল্‌তার এই কথাটি মনে রাখিও, ঐ কালো হুল যে দিন তোমার হৃদয়ে বিঁধিবে, সে দিন হইতে ওখানে আর কাব্যরস উথলিবে না।

আমার এত সৌন্দর্য্য কি তবে ব্যর্থ ? কালো রূপ লইয়া ভ্রমর জগতে অমর হইয়া থাকিবে, আর আমি আপনার জ্বালায় অন্তরে অন্তরে চিরদিন জ্বলিয়া মরিব ? সেই ভাল—তাহাই হৌক্। বিধাতা যাহাকে কালো রূপ দিয়াও মনোমোহন করিয়া গড়িয়াছেন, সে কেন না আমার সৌন্দর্য্যকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইবে ? আমি জগতে বাহির হইয়া এ লজ্জায়-রাঙ্গা মুখ আর দেখাইব না। ভ্রমর পদ্মে পদ্মে বিচরণ করে, ফুলে ফুলে মধু লুটিয়া বেড়ায়, মলয় তাহার প্রিয়বারতা বহিয়া আনে, তাহাকে তাড়াইতে হইলেও লীলাকমল চাহি, তাহার কথা স্বতন্ত্র। আমার ত এত আয়োজন নাই, প্রয়োজনও নাই, কেবল এক নীরব কনকরূপেই আমার যথাসর্ব্বস্ব। সে সৌন্দর্য্য যে বুঝে, সেই বুঝে, যে না বুঝে, নাই বা বুঝিল।

আমি চাকের জীব—চাকেই থাকিব। বিজন হৃদয়েই আমার সুখ—চিরদিন ত এই হৃদয়ে আপনার মনে গান গাহিয়াই আসিয়াছি। এখন তোমাদের নিকট কিসের সহানুভূতি পাইব বল ? যাচিয়া অনুগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাপেক্ষা আজীবন নিগ্রহ ভাল। তোমরা আমার প্রতি বড় একটা নজর না রাখিলেই যথেষ্ট। কেবল আমার চাকটি ভাঙ্গিয়া দিও না—এই নিবেদন। দুর্দ্দিনে বিপদে ইহাই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল। এই আশ্রয়ের মধ্যে আমি যেন কাহার প্রিয় সঙ্গ লাভ করি—তাহার জন্যই বুঝি এত দিন ধরিয়া নীরবে চাক বাঁধিয়া আসিতেছি।

কিন্তু সারা দিন চাকের মধ্যে বসিয়া করিব কি ? কর্ম্মস্রোতে গা ঢালিয়া না দিলেও মন তৃপ্তি মানে না। অভিমানভরে যাহাই বলি না কেন, বিজন সুখে হৃদয়ের সাধ কিছুতেই মিটে না মিটে না। কিন্তু কি লইয়া এ প্রবল কর্ম্মস্রোতে ভাসিয়া চলিব ? কাজ করিবার মত গুণ আমার নাই, আমি গান গাহিতে জানি না, প্রেম বিলাইতেও পারি না, শুধু এক রূপের কনকগৌরব লইয়া অকূল সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে সাহস হয় না। সৌন্দর্য্যেও

কাজ হয় বৈ কি। নহিলে, প্রজাপতির দশা কি হইত ? সেও ত মুখ খুলে না, গান গাহে না। কিন্তু সে যে আপনার সৌন্দর্য্যে নীরবে প্রাণ দেয়—প্রাণ দিয়া তোমাদের সাধ মিটায়। আমি হুল লইয়া জন্মিয়াছি, আমি ত তোমাদের এ নিষ্ঠুর ভালবাসা এমন নীরবে সহিতে পারি না। প্রজাপতির সৌন্দর্য্য প্রেমে মধুর। আমার সৌন্দর্য্য তীব্র—আমার হুলেরই মত তাহা মর্ম্মবেধী। আমার প্রেম জ্বালাময়—শুধু জ্বলিতে এবং জ্বালাইতে আসিয়াছে।

আমারও হৃদয় কিন্তু ভালবাসা চাহে, ভালবাসিয়া সুখী হয়। কিন্তু এ হুলবিদ্ধ দারুণ প্রেম সহিবে কে ? ইহাতে মধু নাই, অমৃত নাই, আছে শুধু এক তীব্র জ্বালা আর তাহারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন কঠিন হৃদয়ের নিষ্ঠুর অনুরাগ। বিধাতা আমাকে এত সৌন্দর্য্য দিলে, কেবল এক হুল দিয়াই এ সৌন্দর্য্য অৰ্দ্ধেক ব্যর্থ। হুল না বিঁধিয়া ত আমি ভালবাসিতে পারি না। নহিলে, আমার প্রেম কাহাপেক্ষাও হীন নহে। ভ্রমর লঘুহৃদয়, তাই গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া মন রাখে। আমার প্রেম বাহিরে নিস্তরঙ্গ, কিন্তু অন্তরে গভীর। তাই আমি যাহাকে ভালবাসি, তাহার অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন হুল বিঁধাই। আমাকে হুল দিয়া হইয়াছে ভাল—হুলেই আমার সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ।

কিন্তু আপনার সৌন্দর্য্যে যে মন উঠে না। আপনাকে ত আর তেমন করিয়া উপভোগ করিতে পারি না। নহিলে, এই তপ্তকাঞ্চন রূপে যদি মজিয়া থাকিতে পারিতাম, এই সুন্দর গঠন, এই উজ্জ্বল বর্ণের মধ্যে গাঢ় ঘনীভূত হইয়া আপনাতে আপনি ভোর হইয়া রহিতাম, তাহা হইলে কি আর বাহির হইতে হইত ? ক্ষীণকম্পিত সরসী-হৃদয়ের উপর দিয়া যখন বায়ুহিল্লোলে বহিয়া যাই, আপনার গঠন দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইয়া থাকি। সাধ হয়, ঐ চঞ্চল ছায়ার সহিত আজীবন কনকবন্ধনে আবদ্ধ হই। এত রূপ নহিলে কি আমার রূপে রূপসীর রূপ বুঝান হয় ? তাহা হইলে ভ্রমরের জ্বালায় বোল্‌তা এ জগতে তিষ্ঠিতে পারিত না। ইহাতেই রক্ষা নাই।

আর এই দারুণ হুল—ইহাকে লইয়া আপন অন্তরে কি কেহ নিশিদিন রুদ্ধ থাকিতে পারে ? শূন্য হৃদয়ে হুল বিঁধাইয়া আশ মিটিবে কেন ? তবুও আপনার অন্তরে হুল বিঁধাইয়া পড়িয়া থাকি—হৃদয়ে যতই জ্বালা ধরে, আপনাকে আপন গাঢ় আলিঙ্গনে অনুভব করিয়া সহিয়া যাই। কিন্তু আমাকে বাহির হইতে হয়। আমার চাকের বাহির দিয়া যখন চিরচঞ্চল সৌন্দর্য্যস্রোত বহিয়া যায়, মন আপনার মধ্যেই চঞ্চল হইয়া উঠে। সৌন্দর্য্য ছাড়িয়া আমি স্থির থাকিতে পারি না—এই অগাধ সৌন্দর্য্যে তীব্র হুল ফুটাইয়া ইহাকে ধরিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু যেখানেই হুল বিঁধি, জ্বালা সংগ্রহ করি, সৌন্দর্য্যকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। তাই নশ্বর জগতের পরে এক এক বার অভিমান করিয়া চাকের

মধ্যে মুখ ফিরাইয়া বসি। তাহাও অধিক ক্ষণ নয়, দুই দণ্ড পরেই আবার সৌন্দর্য্যের জন্য মন পাগল হইয়া উঠে।

বাহিরে বসন্ত আসে, আমি চাক হইতে প্রকৃতির মুক্ত ক্ষেত্রে বাহির হইয়া ধরণীর ফুল্ল ফুলযৌবন উপভোগ করি। রবিকিরণপ্লাবিত প্রকৃতির আনন্দে মগ্ন হইয়া আপনাকে ভুলিতে চাহি, এ কনকজ্বালার অবসান কামনা করি। কিন্তু বাসনা পূরে না। অবশেষে বাহির হইতে কেবল জ্বালা লইয়া চাকে ফিরি। অন্তরে চিরদিন জ্বলিব না কেন?

আমি অন্তরে জ্বলিতেছি, তাই তোমাদিগকে জ্বালাইয়া সুখ পাই। মানবের হৃদয় ভিন্ন আমার হৃদয় আর কে বুঝিবে? কিন্তু আমার হুলের জ্বালায় তোমরা এত কাতর এবং বিরক্ত কেন? শুনিয়াছি, কোকিলের কুহু স্বরে অন্তরের স্তরে স্তরে তোমরা জ্বালা অনুভব কর, কোকিলের প্রতি কাহারও ত কৈ তেমন বিরক্তি দেখি না। বরং জ্বালার জন্যই তাহার প্রতি তোমাদের সমধিক অনুরাগ। ভ্রমরের দংশনের কথা দূরে থাক্, গুঞ্জনেও নাকি অন্তরে জ্বালা ধরে। তবে আমার হুল কি দোষ করিল? আমার হুলের জ্বালা কি ইহাদের অপেক্ষা কম? এক বলিতে পার, কোকিল ভ্রমর বসন্তের সঙ্গে আসে। আমিও কি বসন্তের সঙ্গেই আসি না? জানি না, ইহারা তোমাদের কি হৃদয়ের কথা জানে। কিন্তু যদি বলিয়া দাও, আমিও এবার অবধি সেই কথা গাহিতে পারি। সুকণ্ঠ আমি নহি বটে, কিন্তু ইহারা কণ্ঠে যাহা করে, আমি হুলে তাহাই করিব। শুধু তোমাদের হৃদয়ের কথা আমাকে একবার বলিয়া দাও।

থাক্। আমি বোল্‌তা—চাক বাঁধি, উপমা খাটাই, হুল বিঁধাই। তোমাদের হৃদয় জানিয়া কি করিব? আমি নীরবে আমার কাজ করিয়া যাই। কোকিল গান গাহে, ভ্রমর গুঞ্জরে, আমি সৌন্দর্য্য ফুটাই। সৌন্দর্য্যেই আমার আনন্দ। আমার মত সুন্দর চাক বাঁধিতে কেহ পারে? আমার চাকের মর্য্যাদা কেবল সৌন্দর্য্যে। অল্পের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আমি সব গুছাইয়া বসিয়াছি—এই চাকের মধ্যে আমার যাহা কিছু আবশ্যক সকলই আছে। আমার চাকটি যথার্থই পরম উপভোগ্য। তোমাদের পক্ষে ইহা উপভোগ্য কি না জানি না; কিন্তু তোমরাও বল, আমার চাকরচনায় নৈপুণ্য আছে। এই চাকেই আমার প্রতিষ্ঠা।

তবুও জীবনসংগ্রামে এক এক বার বাহির হইতে হয়। তখনই তোমাদের সংস্পর্শে আমাকে আসিতেই হয়। কিন্তু আসিলেও নিস্তার নাই। এই হুল লইয়া যে কত বিভ্রাট ঘটে কিরূপে বলিব? হয় ত আপন ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে অসংযত মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে কাহাকেও হুল বিঁধাইয়া বসি, পরে অনুতাপ করিতে হয়। তোমরা ত আর তাহা জানিতে পাও না, কেবলি আমার হুলময় কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া মনে কর, বোল্‌তা

হুল বিঁধাইয়া বড় সুখে আছে। কিন্তু বোল্‌তা গাহে শুধু বিলাপ। এই তপ্তকাঞ্চন বাহিরের ঔজ্জ্বল্যে বেদনা কল্পনা করিতে পার না; তাই মনে কর, আমি যেন সর্ব্বদাই হাস্যপ্রফুল্ল; আমার অন্তরে হয় ত তখন দারুণ মর্ম্মদহন হইতেছে। তোমাদের অশ্রু ঝরিয়া হৃদয়ভার লঘু হয়, আমার হৃদয় ঝরে না, নীরবে অন্তরে অন্তরে শুকাইয়া আসে। তাই বাহিরে আমি হাসি—প্রবল অন্তর্দ্দাহে না হাসিয়া থাকিতে পারি না, অন্তরে চিরদিন জ্বলিয়া জ্বলিয়া কাঁদি।

কিন্তু কাঁদি কেন? তাই যদি জানিব, তবে বৃথা এ ক্ষীণ ক্রন্দনধ্বনি তুলিব কেন? কে জানে, আমি আপনাকে আপনি বুঝিতে পারি না। সেই জন্যই ত ধরণীর এই বিজন প্রান্তে চাক বাঁধিয়া নিরিবিলি থাকিতে চাহি যে, আমার কথা কেহ না জিজ্ঞাসা করে, আমাকে কেহ কিছু না বলে। কিন্তু তাহা ত থাকিবার যো নাই। জীবন-সংগ্রাম আমাকেও যে ছাড়ে না। আর বাহিরে অগাধ সৌন্দর্য্য—একবার এ সৌন্দর্য্যে বাহির হইলে চাকের মধ্যে হৃদয় পরিতৃপ্তি মানে কাহার? এই নশ্বর জীবনে সৌন্দর্য্যরহস্যে হুল ফুটাইয়া যেরূপ আনন্দ, এমন ত আর কিছুতে নয়। তাই এক এক বার মনে হয়, এত যদি দিলে, হে বিধি, আমার মধ্যে সমস্ত সৌন্দর্য্য কেন্দ্রীভূত করিলে না কেন? এই ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর মধ্যে তুমি মনে করিলে কি জগতের সৌন্দর্য্য বাঁধিয়া রাখিতে পারিতে না? আমাকে যেমন করিয়া জগতের সৌন্দর্য্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছ, তেমনি করিয়া যদি জগৎকে আমার সৌন্দর্য্যে বাঁধিতে! না হয় ক্ষুদ্রই হইলাম, সুন্দর ত বটে। সৌন্দর্য্য যে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ অপেক্ষা মহত্ত্ব প্রদান করে।

কিন্তু আর না। এ বয়সে আর চাহিতে পারি না। আমার চাহিবার প্রয়োজনও নাই। তুমি আমাকে যতই দাও, আমার ভাগ্যে সেই হুলাপবাদ, সেই অঞ্চলতাড়না। তাই ঠাহরাইয়াছি, আর বাহির হইব না। আমাকে বাদ দিয়াও ত বেশ চলিতে পারে। আমার চাকে মধু নাই, প্রেমে গুঞ্জন নাই, হুলে তোমরা যাহা চাও, তাহা নাই; তোমাদের ভ্রমর আছে, এ আছে, সে আছে, রূপের উপমা অনেক মিলিবে; আমার অভাবে তোমাদের দুঃখ কিসের? আমাকে লইয়া কাব্য রচিত হয় না, সুতরাং কবিকে আমার জন্য বিলাপ গাহিতে হইবে না; বিজ্ঞেরা সৌন্দর্য্যে নারাজ, আমি সরিয়া গেলে তাঁহারা সুখী বৈ দুঃখিত হইবেন না; আমার জন্য কাহারও অশ্রু ঝরিবে না। তবে আমি ধীরে ধীরে সরিয়া যাই। হে ভ্রমর, কালো রূপ লইয়া তুমি জগতে চিরদিন অমর হইয়া থাক। ['ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৭]

সখ্য

সখ্যরসে আমাদের বৈষ্ণব প্রেমচরিত্রের আলোচনা সম্পূর্ণ। বৈষ্ণব সাহিত্যে বাৎসল্যের নীচেই সখ্যের স্থান। সখ্যের সহিত বাৎসল্যের সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ। অন্য কারণে বলিতেছি না, কৃষ্ণের সখাগণকে নানা অবস্থায় অল্পবিস্তর যশোদার সংস্পর্শে আসিতেই হয়, তিনিও তাহাদিগকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, সুতরাং কৃষ্ণের সহিত যেমন, যশোদার সহিতও সেইরূপ সখাগণের একরূপ সম্পর্ক দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এই সম্পর্কেই সখ্য বাৎসল্যে ঘনিষ্ঠতা। মধুর রসে রাধার প্রেমে যখন বৈষ্ণব কবি ভোর, তখন ত আর বড় যশোদারও নাম শুনা যায় না, সখাগণের কথাও কেহ বলে না। তখন মধ্যে মধ্যে কেবল অনামিকা এবং সনামিকা সহচরী, বৃন্দা দূতী, বাহিরে সহস্র গোপিনী, আর গৃহে মুখরা ননদিনী, এই বৈ ত নয়। রাধার প্রণয়-ব্যাপারের সহিত জননীর স্নেহ অথবা বন্ধুর প্রীতির সম্বন্ধ থাকিবে কেন? বয়স হিসাবে বিচার করিলেও প্রণয়—সখ্য বাৎসল্য হইতে দূরে পড়ে। প্রণয়ের আরম্ভ যৌবনে, সখ্য বাল্যেই, আর বাৎসল্যের ত কথাই নাই—সন্তান জন্মিতে না জন্মিতে জননীহৃদয়ে স্নেহ। বৈষ্ণব সাহিত্যেও তাহাই। শ্রীকৃষ্ণ জন্মাবধি যশোদার স্নেহে লালিত পালিত, বয়োবৃদ্ধির সহিত শ্রীদাম সুদাম প্রভৃতি সখাগণের আবির্ভাব, পরে যৌবনসঞ্চারে রাধার সহিত প্রণয় এবং গোপিনীদের হৃদয়হরণ। এখন মাতৃস্নেহে শৈশবের সে সরল নির্ভর আর নাই, আপনার মধ্যে আশ্রয়দানের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইয়াছে, স্বভাবতই একটু স্বাতন্ত্র্য আসিয়া পড়ে। আর রূপসীর প্রেমে মজিয়া সখার জন্য কাহার মন উদ্বিগ্ন হয়? সুতরাং মধুর রস, বাৎসল্য এবং সখ্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে অবস্থিতি না করিয়াও নিশ্চিন্তে থাকে। সখ্যের বাৎসল্যের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা। এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে অনেক সময়ে এ আত্মীয়তা অনিবার্য্য।

বৈষ্ণব কাব্যে এই জন্য অনেক স্থলে একই কবিতায় সখ্য এবং বাৎসল্যরসের বিকাশ অনুভব হয়। সখারা আসিয়া কৃষ্ণকে মাঠে লইয়া যাইতে চাহে, নন্দরাণী অনেক মাথার দিব্য দিয়া তবে ছাড়িয়া দেন, তিনি কৃষ্ণকে সাজাইতে বসিলে সখারা আসিয়া সহায়তা করে; কৃষ্ণকে না দেখিলে নন্দরাণীও ব্যাকুল, সখারাও অধীর, সকলে মিলিয়া চারি দিকে খুঁজিতে বাহির হয়। এইরূপে সখ্যরস বাৎসল্যের সহিত মিলিয়া মিশিয়া স্ফূর্ত্তিও পায়। বোধ করি, স্বাতন্ত্র্যাবলম্বনে ইহার এমন সুন্দর বিকাশ হইত না। বাৎসল্যের মধ্যে একটি আশ্রয়ের ভাব আছে—শৈশবে জননীর স্নেহে সন্তানের কি একান্ত নির্ভর। এই জন্যই রমণীর পূর্ণতা মাতৃরূপে। এবং এই ভাবেই কেবল রমণীর স্থান দেবতার উর্দ্ধে। এই পরিপূর্ণ মাতৃস্নেহের প্রশান্ত অন্তরে বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই বৈষ্ণব সাহিত্যে সখ্যের

যেরূপ মধুরতা, এমন আর অন্যত্র দেখা যায় না। সবশুদ্ধ, বৈষ্ণব সখ্যে এমন একটি পারিবারিক ভাব, সুকুমার সরল অনুরাগ ব্যক্ত হয়। এ প্রেমের মূলে কোথাও কোনও প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য নাই—বৈষ্ণব প্রেম চিরদিনই উদ্দেশ্যের অপেক্ষা রাখে না। অনিবার্য্য বলিয়াই তাহার আবির্ভাব। সখারা কৃষ্ণকে সরলহৃদয়ে ভালবাসে, যশোদার স্নেহে তাহারা কৃষ্ণের সহিত এক পরিবারভুক্ত। এইখানেই সখ্যের চরম উৎকর্ষ। উদ্দেশ্যগত ঐক্যনিবন্ধন সখ্য এরূপ সরল সুন্দর নির্ব্ব্যবধান হৃদয়মিলন নহে। বিশেষত্ব বাদ দিলে মাধুর্য্যের সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে। তবে সখ্যে অবশ্য আশ্রয়-ভাব তেমন নাই। মধুর রসে রমণীকে আশ্রয় দিয়া পুরুষহৃদয় পরিতৃপ্ত। এই জন্য পুরুষের পূর্ণতা প্রেমে। সখ্যে মানবজীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা লাভের দিকে সেরূপ বিকাশ অনুভব হয় না। আমার বোধ হয়, যে সম্বন্ধেই হৌক্, স্ত্রী এবং পুরুষপ্রকৃতির সম্মিলনে মানসিক পূর্ণতার যেরূপ সহায়তা করে, কেবলমাত্র একজাতীয় প্রকৃতির বহুসংখ্যক একত্র সন্নিবেশে তাদৃশ সম্ভব নয়।

কিন্তু সখ্যরস যে আমাদের হৃদয়বিকাশে সহায়তা না করে, এমন নহে। তাহা না হইলে সখ্যের জন্য হৃদয় ব্যাকুল কেন ? আমরা জননীর স্নেহ চাহি, রমণীর প্রেম চাহি, তথাপি হৃদয়ের সম্যক্ পরিতৃপ্তি জন্মে না—সখার প্রেম নহিলে আমাদের হৃদয়ের এক অংশ শূন্য রহিয়া যায়। তবে, যে ভাবমূলক অনুরাগের উপরে সখ্যের প্রতিষ্ঠা, পারিবারিক বিবিধ বন্ধনে তাহার অল্পবিস্তর পরিতৃপ্তি আছে। এই কারণে এ অভাব বোধ করি সকল সময়ে তাদৃশ গুরুতর নহে। তথাপি জীবনের সহমর্ম্মী সহচর লোকে যাচিয়া পায় না। শ্রীকৃষ্ণের কপালে কিন্তু সখাগুলি মিলিয়াছে ভাল। পরস্পরের প্রতি এমন গাঢ় অনুরাগ—দেখিলে হৃদয় জুড়াইয়া যায়। কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে বনে বনে ধেনু চরাইয়া বেড়ান, ছুটাছুটি খেলা করেন, যশোদাকে ঘিরিয়া আনন্দে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। বৈষ্ণব কাব্যে শৈশবের এই সরল ভালবাসা সুন্দর সরল বর্ণনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, বাঙ্গালার কবি ভিন্ন প্রেমের সৌন্দর্য্য কি অপরে এমন করিয়া অনুভব করিতে পারে ? সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি না, এই প্রখর পাশ্চাত্য প্রভাবের দিনে এ কথা বলিয়া হয় ত উপহাসাস্পদ হইব, কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মত ভালবাসায় গঠিত পৃথিবীতে আর কোনও জাতি আছে বিশ্বাস হয় না। এই কোমলা প্রকৃতির শ্যামল স্নেহে বর্দ্ধিত না হইলে এমন করিয়া ভালবাসিবে কিরূপে ? কেবল ভালবাসি বলিয়াই সকলে মিলিয়া এক জায়গায় জড়সড় হইয়া আমরা কোনও প্রকারে টিঁকিয়া আছি—কেহ কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে চাহি না, পাছে আর ফিরিয়া না আসে, পাছে আর দেখা নাহি হয়।

আমাদের প্রেমে হারাইবার ভয় বিশেষ প্রবল। প্রেমের ধর্ম্মই বুঝি এই। তাই ভায়ের কপালে ফোঁটা দিয়া প্রাণাধিকা ভগিনী যমের দুয়ারে কাঁটা অর্পণ করেন। উদ্দেশ্য

কত দূর সাধিত হয় স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু হৃদয়ের ভাব ত প্রকাশ পায়। কৃষ্ণের সখাগণ সম্পূর্ণ বাঙ্গালী। মৃদু কোমল প্রকৃতি, ঔদ্ধত্য আদবেই নাই, কেবল সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিতে পারে আর ভালবাসা পাইলে সুখী হয়। তাহাদের প্রেমেও এই ভয়ের ভাব দেখা যায়। বোধ করি, এ দেশের প্রকৃতির সহিত ইহার বিশেষ যোগ আছে। সেই জন্যই হয় ত আমাদের কাব্যে এত বিরহকাতরতা, বিচ্ছেদে এত ভয়। সখ্য-সম্বন্ধে মধুর রসের সে দারুণ বিরহ না থাক্, কিন্তু সখাগণ কৃষ্ণের বিরহ যেরূপ অনুভব করে, তাহাও বড় কম নয়। কৃষ্ণকে ছাড়িয়া তাহাদের খেলাধূলা বন্ধ। ভয় হয়, কৃষ্ণ যদি আর না আসে, যদি তাহার কোনও অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। বৈষ্ণব কবি সখ্যরসে ঋতুর প্রভাব দেখান আবশ্যক বোধ করেন নাই, নহিলে সখাগণকেও হয় ত আমরা বর্ষার দিনে রুদ্ধ গৃহে উৎকণ্ঠিতহৃদয় দেখিতাম। সখার জন্য শৈশবের এত ব্যাকুলতা আর কোথায় দেখা যায়? প্রেমের উপরেই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং বৈষ্ণব কবির রাখাল বালকেরা স্বভাবতই প্রেমে গঠিত। তাহাদের বালসুলভ ক্রীড়াশীলতার মধ্যে এমন একটি মধুর ভাব। হইবারই কথা। অনুকূল প্রকৃতি এবং অবস্থার মধ্যে অল্প বয়স হইতেই তাহাদের প্রেমবৃত্তির অনুশীলন আরম্ভ হইয়াছে। তরুচ্ছায়ে, গোচারণে, বংশীধ্বনিতে মনের কোমল বৃত্তিগুলির স্ফূর্ত্তির বোধ করি বিশেষ সহায়তা করে। নহিলে, অন্যান্য দেশেও ত সখ্যরসের আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু এমনটি হয় না কেন?

খ্রীষ্টীয় সাহিত্যে আর্থরের নাইট্‌দলের কাহিনীতে এই সখ্যভাবেরই আলোচনা। আর্থর রাজা—তাঁহার অধীনে নাইটেরা একসূত্রে বদ্ধ। কিন্তু বৈষ্ণব সখাদলের মত ইহাঁরা বাস্তবিক প্রেমসূত্রে তেমন একীকৃত নহেন। সম্মুখে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, এই প্রবল উদ্দেশ্যমত্ততায় য়ুরোপের অশ্রান্ত উদ্যম বাইবেলের প্রেম অবলম্বনে একবার এক জায়গায় জড় হইয়া গাঝাড়া দিল মাত্র। আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতি উদ্দেশ্যের ধার ধারে না—শৈশবের সরল ভালবাসায় সখ্যের পরিবার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পরিতৃপ্তি। সেই জন্য য়ুরোপীয় সখ্যে বলের আবশ্যক—বৃহৎ উদ্দেশ্য লইয়া কারবার, বল নহিলে চলিবে কেন? আমাদের সখ্যে ত আর বিস্তৃত উদ্দেশ্য নাই, ভাল না বাসিয়া আমরা থাকিতে পারি না বলিয়াই ভালবাসি। আমাদের স্বভাবতই প্রেম—উদ্দেশ্যের আবশ্যক করে না। য়ুরোপে উদ্দেশ্য মুখ্য, প্রেম গৌণ। সুতরাং আবশ্যক বলিয়া ভালবাসিতে হয়। রাজা আর্থর দুর্জ্জয় বাহুবলে প্রবলপরাক্রম—প্রেমের উপরে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে বলিয়া সশস্ত্র নাইট্‌দলে সর্ব্বদা পরিবৃত। আমাদের সখারা রাখালবালক। কৃষ্ণ এই সখাদলের রাজা। বৈষ্ণব কবির বর্ণনা হইতে যত দূর বুঝা যায়, দৈহিক পশুবলে কৃষ্ণকে সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। তবে বালকেরা সকলেই কৃষ্ণকে ভালবাসে। আর বোধ করি, কৃষ্ণের

কতকটা কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতাও আছে। তাঁহার মৃদু মোহন ভাবে সকল বালকই মুগ্ধ। তাহারা প্রেমে কৃষ্ণকে রাজা করে, প্রেমে কৃষ্ণকে ঘিরিয়া রাখে, প্রেম বিনা বৈষ্ণব জগতে আর কিছুই নাই। বৈষ্ণব কাব্যে বলের জয় কবে? বল কেবলমাত্র রাজদণ্ড ধারণ করে, প্রেম জয় করে, পালন করে, শাসন করে, অভয় দেয়। আর প্রেমের মত বল কোথায়? প্রেম যে অসঙ্কোচে নিঃশব্দে চিরদিন সহিয়া যায়।

বৈষ্ণব কবির সখ্য বাল্যে। এই ত সখ্যের সময়। বিবিধ বন্ধনে মন এখনও বিভক্ত হইয়া পড়ে নাই। সরল হৃদয়ে রাখালবালকেরা পরস্পরকে ভালবাসে মাত্র। বৈষ্ণব কবি একটুকু দূরে দাঁড়াইয়া আপন অন্তরে সেই সরল অকপট অনুরাগ অনুভব করেন। যশোদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া বালকেরা দল বাঁধিয়া ধেনু চরাইতে বাহির হইল। ধবলি সাঙলি পিউলি আগে আগে ধূলি উড়াইয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে রাখালবালকেরা বিবিধ বেশভূষায় ভূষিত—কাহারও গলে বনমালা, কাহারও পায়ে মঞ্জীর রুণুঝুণু রুণুঝুণু। শ্যামকে যশোদা সাজাইয়া দিয়াছেন—মাথায় মোহনচূড়া, করে স্বর্ণবলয়, অঙ্গে আভরণ, চরণে নূপুর। এইরূপ সাজসজ্জা করিয়া ব্রজবালকেরা মাঠে যায়। সেখানে যমুনাতীরে তরুতলে তাহাদের খেলিবার স্থান। গোধন ছাড়িয়া দিয়া সখারা খেলায় মত্ত হয়। কত রকম খেলা—কখনও দুই দলে কপাটি, কখনও এ উহার কাঁধে চড়ে, সে তাহাকে তুলিয়া লইয়া ছুটে; বালসুলভ চপলতার কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। বৈষ্ণব কবি বৃক্ষান্তরাল হইতে খেলা দেখিতে থাকেন। বোধ করি, তাঁহারও এক এক বার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। অন্ততঃ তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া আমাদেরও এক এক বার এমন ইচ্ছা হয় যে, শ্যামসুন্দরের সখার দলে গিয়া ভিড়ি। প্রখর মধ্যাহ্নতাপে সখাদের অঙ্গ বাহিয়া শ্রমজলধারা ঝরিতেছে। শ্যামচন্দ্র আর চলিতে পারেন না। তরুতলে ছায়ায় বসিয়া সখারা বিশ্রাম লাভ করে। সঙ্গে "ভোজন সম্ভার ছিল ভারে ভার।" বনপাত পাড়িয়া সখারা মণ্ডল করিয়া বসিল। পাতে পাতে ভাত, সিঙ্গা বেণু ভরিয়া জল। আহারটা বেশ তৃপ্তির সহিতই হয়।

আহারান্তে শিথিল তনু ছড়াইয়া দিয়া কৃষ্ণ শ্রীদামের কোলে শুইয়া পড়িলেন, সুবলের কোলে মাথা রাখিয়া বলরামের চক্ষু আলসে অর্দ্ধনিমীলিত। আর আর সখারা কেহ শুইয়া, কেহ বসিয়া, নানা ভাবে বিশ্রামসুখে মগ্ন। বৈষ্ণব কবি এই সখ্যরসেই মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াছেন। রাখালবালকেরা ছায়ায় বসিয়া বাঁশী বাজায়, বৈষ্ণব কবির হৃদয়ে বাঁশীর স্বরে অলস মধ্যাহ্ন বহিয়া যায়। রাখালবালক হৃদয়ের অবেগে আকুলকণ্ঠে গাহিয়া উঠে, বৈষ্ণব কবির অঙ্গ শিথিল হইয়া আসে, চরণ চলে না, হৃদয় উদাস। রাধার নামে কখনও কখনও মধ্যাহ্নে বাঁশী বাজিয়াছে বটে, কিন্তু সখ্যরসে বৈষ্ণব কাব্যে মধ্যাহ্নের যেরূপ বিকাশ হইয়াছে, মধুর রসে তেমন হয় নাই। সখাগণের খেলাধূলা

সকলই মধ্যাহ্নে। যশোদা বেলা থাকিতে ঘরে ফিরিতে বলিয়া দিয়াছেন। গোধূলির পরে সখারা আর মাঠে থাকে না।

কিন্তু আজ ধেনু সব কোথায়? বেলা পড়িয়া আসিল, খেলায় ভুলিয়া বালকেরা গৃহে ফিরিতে পারে নাই। ধেনু লইয়া গৃহে ফিরিতে সন্ধ্যা হয় বুঝি বা। রাখালেরা ভাবিয়া আকুল, যশোদা কি বলিবেন। কৃষ্ণ বাঁশী বাজাইয়া ধেনুদিগকে আহ্বান করিলেন।

"সব ধেনু নাম কৈয়া, অধরে মুরলী লৈয়া, ডাকিয়া পূরিল উচ্চস্বরে।
শুনিয়া বেণুর রব, ধায় ধেনু বৎস সব, পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥
ধেনু সব সারি সারি, হাম্বা হাম্বা রব করি, দাঁড়াইলা কৃষ্ণের নিকটে।
দুগ্ধ স্রবি পড়ে বাঁটে, প্রেমের তরঙ্গ উঠে, স্নেহে গাভী শ্যামঅঙ্গ চাটে॥
দেখি সব সখাগণ, আবা আবা ঘন ঘন, কানুরে করিল আলিঙ্গন।"

সখারা কৃষ্ণকে মধ্যে লইয়া গৃহাভিমুখে ফিরিল। গোক্ষুররেণুতে আকাশ আচ্ছন্ন।

এ দিকে যশোদা ভাবিয়া সারা। তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,

"সকালে আসিহ গোপাল ধেনুগণ লৈয়া।
অভাগিনী রৈল তোমার চাঁদমুখ চাঞা॥"

গোপাল ত এখনও ফিরিল না। ধেনুর পাছে পাছে সে যদি কোনও দুর্গম বনে প্রবেশ করিয়া থাকে। যশোদা ঘর আর বাহির করিতেছেন—যত বেলা যায়, ততই মন ব্যাকুল হয়। পদশব্দ শুনিলে তিনি চমকিয়া উঠেন, কৃষ্ণ আসিতেছে বুঝি। বাতাসে দীপশিখা কাঁপিলে তাঁহার মনে হয়, গোপাল এখান দিয়া ছুটিয়া গেল বা। কিন্তু গোপাল কোথায়? গোপাল এখনও আসে নাই! যশোদার ভয় ক্রমেই গাঢ় হইতেছে।

এমন সময়ে সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ আসিয়া উপস্থিত। যশোদার "গদগদ কণ্ঠ না নিকসয়ে বাণী।" তিনি কৃষ্ণের মুখ মুছিয়া দিলেন। সে বদনকমলে শত লক্ষ চুম্বন করিয়াও তাঁহার হৃদয়ে আশ কিছুতেই মিটে না। জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কোন্ বনে গিয়াছিলে ওরে রাম কানু।
আজি কেন চান্দমুখের শুনি নাই বেণু॥
ক্ষীর সর ননী দিলাম আঁচলে বান্ধিয়া।
বুঝি কিছু খাও নাই শুকাঞাছে হিয়া॥"

কৃষ্ণকে ক্ষীর সর ননী দিয়া যশোদা ঘুম পাড়াইলেন। সখারাও আপন আপন ক্ষীর সরের ভাগ লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

পাশ্চাত্য সখ্যে প্রেমের এরূপ কোমলতা কোথায় মিলিবে? পাশ্চাত্য প্রকৃতি স্বভাবতই কিছু কঠিন—মনের কোমলা বৃত্তির অনুশীলন তাহার ধর্ম্ম নহে। তবে খ্রীষ্ট

ধর্ম্মের প্রাচ্য সংস্পর্শে বাহিরে যাহা কিছু কোমলতা আসিয়াছে। তথাপি, য়ুরোপীয় রমণীর প্রকৃতিও আমাদের চক্ষে সময় সময় কেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য সখ্য, আমার বোধ হয়, মুষ্টিযোগের উপর যেমন নির্ব্বিবাদে এবং স্বচ্ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, কোমলতার উপরে তেমন নিশ্চিন্তে নির্ভর করিতে পারে না। তাই বলিয়া সেখানে যে বন্ধু বন্ধুকে ভালবাসে না, মানবের হৃদয় কেবলমাত্র পাষাণ জড়, তাহা অবশ্য নহে। তবে আমাদের সহিত পাশ্চাত্য ভালবাসার প্রকৃতি যেন কিছু স্বতন্ত্র।

কিন্তু শুনিতে পাই, বাঙ্গালী হৃদয়প্রধান জাতি নহে। বাঙ্গালা দেশে ন্যায়শাস্ত্রের চর্চ্চা—এক প্রকার শাণিত তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির জন্যই আমাদের যাহা কিছু গৌরব। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা বলা যায় না। বাঙ্গালার পণ্ডিতেরা নৈয়ায়িক বলিয়াই ভারতবর্ষে সমাদৃত এবং বাঙ্গালী উকীলেরা তনু দেহযষ্টি অবলম্বনে এখনও এজাতীয় মর্য্যাদা কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে সমর্থ। তবে আর আমাদের হৃদয়ের প্রাধান্য কোথায়? কিন্তু এই ন্যায়শাস্ত্রের কেন্দ্রস্থল হইতেই ত প্রেমের চৈতন্যের আবির্ভাব। এবং এই প্রেমের ধর্ম্মেই ত তিনি সমগ্র বঙ্গদেশকে একাকার করিয়া তুলিয়াছিলেন। অন্তরের কথা না বলিলে সহজে কেহ গলে না। ভালবাসা আমাদের প্রকৃতি না হইলে প্রেমের ধর্ম্মে হৃদয় উথলিয়া উঠিত না। নৈয়ায়িকী বুদ্ধি আমাদের থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে না। আমরা ভালবাসা চাহি—প্রেমের অভাব আমাদের নিকট যেমন দারুণ, এমন আর কিছুই নয়।

বৈষ্ণব সাহিত্যে আমাদের এই প্রেমবৃত্তির সম্যক্ বিকাশ হইয়াছে। এবং বোধ করি, আমাদের নৈয়ায়িকী বিশ্লেষণ-বুদ্ধিরও এখানে অল্পবিস্তর পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু যেমন করিয়াই হৌক্, কাব্যের প্রাধান্যে বৈষ্ণব সাহিত্যে হৃদয়েরই বিশেষ বিকাশ স্বীকার করিতে হয়। আর সখ্যরসে আমাদের হৃদয়ের বিস্তৃতির পরিচয়। পশুজগতে অবধি আমাদের প্রেম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতিও এইখানেই সম্পূর্ণ ব্যক্ত। সখ্যে সামাজিকতার বিকাশ—সামাজিকতার মধ্যেও আমাদের গার্হস্থ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাশ্চাত্য সখ্যে গার্হস্থ্য বড় প্রবল নহে। সেই জন্যই বোধ করি আমাদের সখ্য কোমলতর। আমরা পরিবারপরায়ণ জাতি—আমাদের মজ্জায় মজ্জায় পরিবারপরায়ণতা। য়ুরোপ আমাদের তুলনায় সমাজপরায়ণ। সুতরাং কোমলতা এবং মধুরতা অপেক্ষা কঠিন বল তাহার আবশ্যক।

পরিবারপরায়ণ বলিয়াই আমাদের প্রকৃতি তাদৃশ জাঁকজমকপ্রিয় নহে। বাঙ্গালা দেশে বসনভূষণ আদবকায়দার তেমন বাহুল্য নাই। পরিবারপরায়ণতার ত আর এ সকল বড় আবশ্যক করে না। পৃথিবীর বিস্তৃত সমাজে বাহির হইলে এই জন্য অনেক সময়

আমাদিগকে একটু সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু আমাদের বসনভূষণে আদবকায়দায় জমকালো ভাব বড় না থাকিলেও শোভন সৌন্দর্য্যের অভাব স্বীকার করা যায় না। সৌন্দর্য্যজ্ঞান আমাদের মর্ম্মস্থলে প্রচ্ছন্ন, তবে কর্ষণাভাবে তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। সখ্যরসে আমাদের এই জাতীয় বিশেষত্ব অনেকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সখ্য জমকালো ব্যাপার—কায়দাকরণ, আইনকানুন, অনুষ্ঠানের ত্রুটি নাই। আমাদের সখ্য সরল এবং সুন্দর। য়ুরোপীয় প্রেমচর্চ্চায় দেখাইবার ইচ্ছা বোধ করি বিশেষ বলবতী। সেই জন্য তাহার মধ্যে তেমন শান্তি অনুভব করা যায় না। আমাদের প্রেম প্রশান্তভাবে উপভোগ করিবার।

বৈষ্ণব কাব্যে কোন কোন স্থলে সখ্যের সহিত দাস্যরসও যুক্ত হইয়াছে। আমার বিবেচনায় তাহাকে ঠিক দাস্য বলা যায় না। কারণ, তাহার মধ্যে খেলার ভাবই প্রবল—যথার্থ দাস্য নাই বলিলেই চলে। কিন্তু বৈষ্ণব কবি সখ্যদাস্যরস বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। যমুনাপুলিনে সখারা মিলিয়া কৃষ্ণকে রাজা করিল। কদম্বতরুতলে ফুলের সিংহাসন, সিংহাসনে আসীন রাজা কৃষ্ণ। গলে ফুলের মালা, শিরে ফুলের মুকুট, করে পদ্ম-রাজদণ্ড। মদনের ফুলশরে তবু একটু তীব্রতা আছে। সখারা কৃষ্ণের পাত্র মিত্র সভাসদ্। যেমন রাজদণ্ড, তেমনি রাজশাসন। কঠোরতা কিছুমাত্র নাই। প্রেমে কৃষ্ণ এই সখা প্রজাদলের হৃদয় এবং নয়নরঞ্জন। খেলা বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশ হইলে খেলার মধ্যে যে রাজার প্রবল প্রতাপ জাহির হইত না, সাহসপূর্ব্বক এ কথা বলা যায় না। প্রবল ক্ষমতাই পাশ্চাত্য রাজগুণ; আমাদের রাজা রঞ্জনে। সেই জন্যই ত সখারা কৃষ্ণকে রাজা করে।

কিন্তু কৃষ্ণের কি কোনও ক্ষমতা নাই? কেবলই একটুকু রমণীয় কোমলতা? তাহা নহে। সখারা শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছে। কিন্তু ক্ষমতা কেবল মাত্র পাষাণ বলে নহে। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতার বিকাশ প্রেমভাবের মধ্য দিয়া। সেই জন্যই বৈষ্ণব সাহিত্যে দাস্য সখ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় না। প্রেমের রাজ্যে বিরোধ স্থান পাইবে কিরূপে? কৃষ্ণও ত বৈষ্ণব কাব্যেরই চরিত্র। স্বভাবতই উদ্ধত ভাব তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সখারা কৃষ্ণকে যেমন ভালবাসে, কৃষ্ণও সখাদলের প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত। প্রেমই প্রেম আকর্ষণ করে। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যে কোমলতার আশ্রয়ে দুর্ব্বল বল পাইয়াছে, সভয় নির্ভয় হইয়াছে, উচ্ছৃঙ্খলা অশান্তি মধুর সখ্যে শাসিত।

এই কোমল বৈষ্ণব সখ্য আমাদের মধ্যে চিরদিন জয়যুক্ত হোক্। আমরা পরস্পরকে ভালবাসিয়া ভয় হইতে, রোগ হইতে, শোক হইতে মুক্ত হই। ['ভারতী ও বালক,' চৈত্র ১২৯৭]

বোল্‌তা ও মধ্যাহ্ন

আমি সন্ধ্যারও নহি, উষারও নহি, আমি মধ্যাহ্নের জীব। বৈশাখের প্রখর রবিকিরণে আমার জন্ম—জন্মাবধি রবিকিরণ পান করিয়া এ দেহ গঠিত। সারা হিমরজনী অন্ধ জীবনভার বহন করিয়া চাকের মধ্যে জড় হইয়া থাকি, ভীতিবিহ্বল বিবশ দেহে ক্ষীণ প্রাণ কোন প্রকারে লাগিয়া থাকে মাত্র, প্রভাতে রবিকিরণ আসিয়া প্রথম আমাকে জাগাইয়া তুলে—আমার দেহে প্রাণ সঞ্চার করে, নয়নে দৃষ্টি দেয়। আমি মধ্যাহ্নের প্রখর তাপে জন্মিয়াছি, তাই রবিকরে আমার এত আনন্দ। রবিরই মত আমার কনকবর্ণ, মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য্য তীব্র। সন্ধ্যা ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আসে, উষা ছায়ার হৃদয়ে একটুকু মৃদু তরুণ অরুণ-আভা, মধ্যাহ্নের মত এত আলো কোথায়? এত রূপ কাহার? মধ্যাহ্ন আর আমি, দুই জনেই কেবল মাত্র আলোক, কেবল মাত্র ঔজ্জ্বল্য, ছায়া নাই, অন্ধকার নাই, ম্লান পাণ্ডু মধুরতা নাই। এ রূপ কেবলই তপ্ত তীব্র দহনজ্যোতি। তাই ত তোমাদের কবিরা মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য কদাচ গাহেন, বোল্‌তার সৌন্দর্য্যও গাহেন না। এ সৌন্দর্য্যে তাঁহাদের হৃদয় জ্বলিয়া যায়, এ রূপ মর্ম্মে মর্ম্মে তীক্ষ্ণাগ্র সূচের মত বিঁধিতে থাকে, দারুণ দহনে কবিতা উথলে না। সন্ধ্যা উষা তরল কোমল ভাবে হৃদয় প্লাবিত করে, প্রখর জ্বলন নাই, তরঙ্গভঙ্গে মধুর ছন্দে কবিহৃদয় সে সৌন্দর্য্যে বহিয়া যায়। মধুকাতর হৃদয়ে মৃদু গুঞ্জনে পদ্মিনীর সহিত ভ্রমর মধুরালাপ করে, কবিহৃদয় মধুকাহিনীমুগ্ধ। কিন্তু মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্যও ন্যূন নহে, ভ্রমরও সৌন্দর্য্যে বোল্‌তার নিকটে ঘেঁসিতে পারে না। সৌন্দর্য্যই ত প্রখর। আলোক ঝলসিবে না ত কি অন্ধকার ঝলসিবে?

আমি মধ্যাহ্নের—তা কাব্যে স্থান পাই বা না পাই। মধ্যাহ্নকে আমি আপনার অন্তরে অনুভব করি—এমনি আমার মত হৃদয়, এমনি নীরব নৈরাশ্য, নিশিদিন অন্তরে অন্তরে এমনি দারুণ দহন। এই চাকে বসিয়া দেখিতেছি, আমার চাকের সম্মুখে বহুদূরবিস্তৃত প্রান্তরের প্রান্তদেশ ব্যাপিয়া অনল-মধ্যাহ্ন বহিয়া গিয়াছে—কম্পিত তীব্র লাবণ্যে ধরণী দিশাহারা। এই ত সৌন্দর্য্য। এমন প্রখর তেজ! এমন সুতীব্র স্নেহ! যেখানে দিয়া বহিয়া যায় সব শুকাইয়া, যেখানে হৃদয় খুলে হৃদয় জ্বালাইয়া। জ্বালা নহিলে ত সৌন্দর্য্য মৃদু। আমারও সৌন্দর্য্য তাই এমনি জ্বালাময়—যেখানে বিঁধে, তীব্র মদিরার মত প্রতি শিরায় শিরায় জ্বালা ধরাইয়া। তোমরা ত এ জ্বালা সহিতে পার না, সৌন্দর্য্য কিরূপে অনুভব করিবে? আমি হুল বিঁধাইয়া আপন অন্তরে মধ্যাহ্নের তীব্রতা উপভোগ

করিতেছি। এক এক বার ইচ্ছা হয়, ঐ কবি-হৃদয়ে এই হুল ফুটাইয়া সে তীব্রতা বিঁধিয়া দিই। কিন্তু তোমাদের কবি কি এ সৌন্দর্য্য সহিতে পারিবেন ?

তোমাদের কাব্যে ত কোথাও দারুণ তীব্রতা অনুভব করা যায় না। কেবলই ঢল ঢল কোমলতা, শিথিল মৃদু আলস, মধুর প্রেমে অর্দ্ধ নিমীলন। এত মধুরতার মধ্যে তোমরা নিমগ্ন হইয়া থাক কিরূপে ? আমি কেমন মধ্যাহ্নের প্রখর হৃদয়ে জ্বালাবিদ্ধ জীবন লইয়া চিরদিন এই রবিকিরণের জ্বলন্ত আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি। মধ্যাহ্ন আমাকে জানে, আমি মধ্যাহ্নকে জানি। সন্ধ্যার মত এ কেবলই প্রশান্ত মধুরতা নহে। তাই ত এত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়াও একেবারে গলিয়া যাই না, আশ মিটে না। সন্ধ্যায় দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে, হৃদয় অবসন্ন, একরত্তি জীবনের পরে বৃহৎ সংসার যেন ঝুঁকিয়া পড়ে, সৌন্দর্য্য তখন কোথায় ? অন্ধকার ঘনাইয়া ত সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটন করে না। তোমাদের কবিরা বোধ করি আধ ঘুমঘোরে স্বপ্নে সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য বর্ণনা করেন। মধুরতা বৈ তাহা আর কিছুই নয়। মধ্যাহ্ন সুস্পষ্ট এবং সুতীব্র। পূর্ণালোকে স্বপ্ন রচিত হয় না, কোমলতাও তাদৃশ নাই। কোনও কোনও কবি মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য দেখিয়াছেন বটে, কিন্তু সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া। এই জন্য মধ্যাহ্নের তরল অলস ভাবেই তাঁহারা মুগ্ধ! কিন্তু এ মৃদুতায় আমার মন উঠে না। আমার মত এমনি হুল বিঁধিয়া সে তীব্রতায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া মধ্যাহ্নকে একবার অন্তরে অনুভব না করিলে সকলই ব্যর্থ। তোমরা তীব্র প্রখর জ্বালা উপভোগ করিতে পার না, হুল নাই, মধুরতায় গলিয়া যাও। আমি চিরদিন এই প্রখর জ্বালায় জ্বলিতে থাকি।

এই জ্বালায় মধ্যাহ্নের প্রেম ব্যক্ত হয়। মধ্যাহ্নের প্রেম মর্ম্মবেধী—আমারই মত বিঁধিয়া বিঁধিয়া। বেধন প্রেমের ধর্ম্ম—জ্বালা প্রেমে অনিবার্য্য। তোমরা এত করুণহৃদয়, প্রিয়জনের অন্তরে ব্যথা দিয়া সুখ অনুভব কর না ? প্রিয়জনকে ভিন্ন পৃথিবীতে কে কাহাকে ব্যথা দিয়া থাকে ? এই জন্যই এ দারুণ নিষ্ঠুরতার মধ্যে এমন একটু সুতীব্র কোমলতা, এ কঠোর জ্বালায় এমন করুণ আনন্দ। প্রেম জ্বালাইয়া জ্বলে এবং এই জ্বলনেই তাহার জীবন। মধ্যাহ্ন মধুর ধার ধারে না, কোমলতায় হৃদয় হরণ করে না, অন্তরের অন্তরতম নিভৃতে দারুণ জ্বালা বিদ্ধ করিয়া কেবলি দহিতে থাকে। গুঞ্জনে এবং মধুরতায় যে যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইতে চাহে, আমি ত তাহার প্রেম বুঝি না। তাই প্রেমে মধ্যাহ্ন আর আমি। মধুরতায় সন্ধ্যা আছে, উষা আছে, ভ্রমরও আছে বৈ কি।

ইহাদের প্রেমে কি জ্বালা নাই ? কিন্তু সে জ্বালা বড়ই মধুর। এত মধুর যে, তাহাতে প্রেম জ্বলে না। সন্ধ্যার প্রেমে নিরবচ্ছিন্ন প্রশান্ত ভাব, উষার ত জ্বালা নাই বলিলেই চলে, আর ভ্রমরের মধুতেই পরিতৃপ্তি। ভালবাসিয়া আশ মিটে না শুধু আমার আর মধ্যাহ্নের।

যতই বিঁধি, ততই বিঁধিতে চাহি—যতই জ্বলি, ততই আরও জ্বলিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এ ভালবাসা ত কেহ অনুভব করে না। মধুবিহ্বল মদির মোহই এখানে প্রেম বলিয়া চলিয়া যায়। প্রেম যেন নিতান্তই ছায়ায় ছায়ায়, একটুকু আলোক সহে না, উত্তাপ সহে না, কেবলি অতি মৃদু ললিত গলিত কোমলতা—কৃষ্ণ অন্ধকার এবং ছায়ালীন অনাতপ মাত্র অবলম্বন।

কৈ, আলোকে ত তোমাদের প্রেম ফুটে না। বিধাতা, কালোর প্রতি তুমি বুঝি কিছু সদয়। তাই এই মর্ত্ত্য মানবেরাও দেখি, সারা ক্ষণ কোকিল ভ্রমর আর সন্ধ্যা লইয়াই রহিয়াছে। ঐ কৃষ্ণবর্ণের সহিত কোমলতা যেন অবিচ্ছেদ্য। কেবল, গৌরাঙ্গে যে তোমাদের প্রেম প্রতিষ্ঠিত হয় কি করিয়া বুঝিতে পারি না। আর এই পূর্ণিমা নিশীথে বিমল জ্যোৎস্নালোকে এত প্রেমের গানই বা উঠে কোথা হইতে? এ কি বিদ্রূপ। না ছলনা! জানি না, জ্যোৎস্নালোক অস্পষ্ট এবং ছায়াময় বলিয়া যদি তাহার মধ্যে প্রেমের রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আমার নিকট প্রেমে তীব্রতার মত আর দারুণ রহস্য নাই।

এই জন্যই মধ্যাহ্নের প্রেম সর্ব্বাপেক্ষা রহস্যময়। দিগন্ত হইতে দিগন্ত তপ্ত স্বর্ণপ্লাবন! যেমন তীব্রতা, তেমনি প্রেম! প্রেম নহিলে এত সৌন্দর্য্য টিঁকিয়া রহিবে কিসে? কিন্তু কাব্যে ত এ সৌন্দর্য্য স্থান পায় না। নাই বা পাইল। আমি তোমাদের অন্তরে এই সৌন্দর্য্য চিরদিনের তরে বিঁধিয়া দিতে চাহি। বিধি হে, কবিকে যদি আমার মত এমনি হুল দিতে। মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য হুল বিঁধিয়া অনুভব করিবার—জ্বলিতে হইবে কি না। মধুরতাই যদি চাও, ইহাতে কি নাই? প্রখর যৌবনে কি আর কোমলতা অনুভব করা যায় না? কিন্তু তাহা এই তীব্রতার মধ্যেই। হুল ফুটাইয়া যে এই তপ্ত তীব্রতা না অনুভব করিল, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য তাহার নিকটে অসম্পূর্ণ। তবু ছায়ায় দাঁড়াইয়াও হে কবি, মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য তুমি যে গাহিয়াছ, ইহাতেই তোমার কাব্যরস পানে আনন্দ পাই। তাই আরও ইচ্ছা হয়, তোমার ঐ উদার হৃদয়ে হুল বিঁধাইয়া দিই—তুমি আমাকে অনুভব কর, আমি তোমাকে অনুভব করি।

অতৃপ্ত হৃদয়ে কবিকে অনেক কথা বলি—কবিকে নহিলে আর কাহাকে বলিব?—কিন্তু সহসা এক এক বার মনে হয় যে, তোমাদের কবিও যেন কোথায় কবে মধ্যাহ্নের তীব্রতা অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু অনুভব করিলে কি হইবে,—সে কেবল ক্ষণিকের চকিত অনুভব—আমার মত এমন নীরবে সে অনলজ্বালা সহিতে পারেন নাই, জ্বালা ধরিতে না ধরিতে ছায়ায় গিয়া হৃদয় জুড়াইয়াছেন। 'তাই প্রখর মধ্যাহ্নে মালিনী নদীতীরে কম্পিত তরুতলে শকুন্তলা। শকুন্তলা ছায়া। বৃক্ষান্তরাল হইতে মুগ্ধ দুষ্মন্ত উঁকি মারিতেছেন। দুষ্মন্ত প্রখরতেজ মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন ছায়ার প্রেমে মুগ্ধ। কবিহৃদয়ও ছায়ায় আশ্রয়

লাভ করে। দুষ্মন্তের প্রখর জ্যোতি কবি নীরবে সহিতে পারেন না। শকুন্তলায় তাঁহার হৃদয় শান্তি পায়। এই শকুন্তলার হৃদয়ে বসিয়াই তিনি দুষ্মন্তের সৌন্দর্য্য পান করিতেছেন। শকুন্তলা হইতে দূরে পরিপূর্ণ-হৃদয়ে দুষ্মন্তে ঝাপাইয়া পড়িতে পারে কে? তবু জগতের প্রাচীন কবি তুমি মধ্যাহ্নকে অনুভব করিয়াছ। শকুন্তলার হৃদয়ে দুষ্মন্তের প্রেম বিঁধিয়া অবধি শকুন্তলা জ্বলিয়াছে। মধ্যাহ্নের প্রেম না জ্বলিয়া ত অনুভব করিবার যো নাই। মধ্যাহ্ন ত চিরদিন জ্বলিয়া সারা।

কিন্তু এই সুন্দর মধ্যাহ্ন-তীব্রতায় একটা কাল ভ্রমর আসিয়া দেখা দিল কেন? কবি, তুমি ঐ কাল রূপে বড়ই মুগ্ধ। ভ্রমরকে ছায়ায় রাখিয়া তবু কবিত্বের পরিচয় দিয়াছ বটে—সে ত আর প্রখর মধ্যাহ্ন সহিতে পারিবে না। কিন্তু যে ছায়া মধ্যাহ্নকে চায়, ভ্রমরের গুঞ্জন তাহার ভাল লাগিবে কেন? শকুন্তলা ঐ বাচাল ভ্রমরটার প্রতি বড়ই বিরক্ত—বার বার সখীদিগকে উহাকে তাড়াইয়া দিতে বলিতেছেন। ভ্রমরের ভাগ্যে অঞ্চলতাড়না! শুধু আমার কপালে নয়? হোক্ হোক্, মানব-সমাজে বিচার আছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুনিতে পাই, শকুন্তলাও না কি মনে মনে ভ্রমরের উপর সদয়। তাই ত মিলন না হইতে হইতে শকুন্তলার কপালে দারুণ বিচ্ছেদ। ভ্রমর মধু-গুঞ্জনে যত বিঘ্ন ঘটায় বৈ ত নয়। কবি, আমাকে ত ডাকিবে না। ভ্রমর তোমার প্রিয় পাত্র। কিন্তু আমার হুল বিঁধিলে তোমার হৃদয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইয়া উঠে। এইটুকু সহিতে এত কাতর? আমি যে তোমার হৃদয়ে চিরদিন মধ্যাহ্নকে জ্বালাইয়া রাখিতে পারি। আমার মত তুমিও এমনি জ্বলিবে—এ জ্বলনের অবসান নাই—চিরদিন মগ্ন হইয়া সৌন্দর্য্য অনুভব কর।

যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবে, তখন না হয় ভ্রমরকে ডাকিও। তাহার গুঞ্জনে ঘুমঘোরে সন্ধ্যা আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে। ঐ কাল রূপ দিয়া ত মধ্যাহ্নের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিবে না। ভ্রমর গুণ্ গুণ্ করিয়া তোমাদেরই মত সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য গাহেও বটে। গাহিবে না কেন? সন্ধ্যারই মত অন্ধকার রূপ কি না। আমার ত তাহা নয়। মধ্যাহ্নের মত আমার সৌন্দর্য্য তীব্র, প্রেম তীব্র, হুল তীব্র। বিধাতা, ভ্রমরকে বৃথা হুল দিয়াছ। হুলই যদি দিলে, তবে অমন কাল রূপ করিলে কেন? কাল রূপে বড়ই যেন কেমন সুখের ভাব; হুলে এত সুখ সহে না। আর ভ্রমর সৌন্দর্য্যেরই বা কি ধার ধারে? বিস্তৃতি সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম। কৃষ্ণ অন্ধকার ত কেবলই গুটাইয়া আসে। কিন্তু এখানে বোধ করি, লোকে অন্ধ হইয়া সৌন্দর্য্য দেখে। তাই অন্ধকারের প্রভাবে আমি আর মধ্যাহ্ন বাদ পড়িয়া যাই। তা হৌক্। এ সৌন্দর্য্য ত আর অস্বীকার করিবার যো নাই। কাব্যে স্থান দিয়া সূর্য্যের গৌরব কেহ বৃদ্ধি করিতে পারে? না, চোখ বুজিয়া সে সৌন্দর্য্য হ্রাস করা যায়?

তোমাদের কাব্যে আমার হুলের জ্বালা না বিঁধিলে আর মধ্যাহ্নকে সুতীব্ররূপে উপভোগ করিতে পারিতেছ না। এখন দূর হইতে কেবল রাখালবালকের বংশীধ্বনির উদাস কোমলতায় তোমরা মুগ্ধ। বোধ করি, যাহা কিছু বিঁধে, তাহাই তোমাদের নিকট কোমল—কেবল আমার এই দারুণ হুলই বাদ পড়িয়াছে। কিন্তু বংশীধ্বনিতে তীব্রতা কতকটা যেন কমিয়া আসে বটে। রাখালেরা ছায়ায় বসিয়া বাজায় কি না, তোমরাও ছায়ায় বসিয়া শুন। আর তাহারা ছায়ার প্রেম যেমন অনুভব করে, মধ্যাহ্নের দারুণ ভালবাসা ত তেমন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তবু কৃষ্ণ যখন বাঁশী বাজাইতেন, রাধিকার হৃদয় কি জ্বলিত না? মধ্যাহ্ন-বংশীধ্বনিতে তীব্রতার রন্ধ্রে উদাস নৈরাশ্য ফুঁ দিয়া কোমলতা বাহির করে। এই জন্য এ কোমলতা ঔদাস্যে, মধুরতায় নহে।

মধুরতা যেমন সন্ধ্যায়! ম্লানমুখে রবি ধীরে অস্ত যায়, চন্দ্র উঠে—তাহাও মধুর। আলোক কোথাও ফুটিতে পায় না। নীল আকাশ, অস্ফুট ছায়া, প্রশান্ত নীরবতা মিলিয়া কেবলি বিমল মাধুরী রচনা করে। মাধুরী গার্হস্থ্যে। তাই সন্ধ্যার কেমন সুকুমার গৃহস্থ ভাব। ইহার মধ্যে আমরা যেটুকু ঔদাস্য অনুভব করি, তাহা শান্তিপ্রধান। কিন্তু এত মধুরতা আমার পোষায় না। মধ্যাহ্নে আমি যেন ছুটিয়া জগতের কর্ম্মক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়ি; সন্ধ্যায় জগৎ নিতান্ত মধুভাবে হৃদয় প্লাবিত করে। আমি জ্বলিতে চাহি—মধু লইয়া কি করিব? জ্বালা নহিলে সৌন্দর্য্য আমার নিকট ব্যর্থ।

আর সন্ধ্যাকে ত তেমন করিয়া দেখিতে পাই না। স্বল্পালোকে সুস্পষ্ট দেখা যায় না। তাই আজও কেহ সন্ধ্যার রঙ্ ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিল না। তোমাদের কাব্যে তাম্রবর্ণের কথাও শুনি, ধূসর বর্ণের উল্লেখও দেখি, কেহ কেহ সন্ধ্যাকে কৃষ্ণবর্ণা বলিয়া সারিতে পারিলেও ছাড়েন না। বোধ করি, দূর হইতে যাহার যেরূপ বোধ হইয়াছে, আন্দাজে বর্ণনা করিয়া সারিয়াছ। এখন তাই কোনও বর্ণনা অপর বর্ণনার সহিত ঠিক মিল খাইতেছে না। আমি ত স্বল্পালোকে তেমন দেখিতে পাই না, তবে অন্তরে তাহার প্রভাব কতকটা অনুভব করি বটে। আর ঐ আকাশের গায়ে রবির রাঙ্গা আলোটুকু যত ক্ষণ থাকে, তত ক্ষণ একরূপ দেখিও। কিন্তু এত অল্প দেখিয়া কি কাব্যে বর্ণনা করা চলে? তবু কিন্তু তোমাদের কবিদের বর্ণনা মর্ম্ম স্পর্শ করে।

কিন্তু সন্ধ্যা তোমাদের এত প্রিয় কিসে? বোধ করি, ভ্রমরগুঞ্জনেই সন্ধ্যার প্রতি তোমাদের অনুরাগ। নহিলে সন্ধ্যাকে ত আর কেহ বড় দেখ নাই। ভ্রমর পদ্মিনীর চারি ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া গুণ্ গুণ্ করিতে থাকে, তোমরা প্রেম অনুভব কর। কিন্তু পদ্ম ত রবিকিরণপানে বিহ্বল—ভ্রমরের প্রতি ফিরিয়াও তাকায় না। দূর হইতে তাহা ত আর তোমরা জানিতে পাও না। তবে মধু দেয় কেন? মধু কি আর সাধ করিয়া দেয়? কত

সাধ্য সাধনা, কত গুঞ্জন, অবসরমত ছোঁ মারিতেও ত্রুটি নাই। আর যে গুঞ্জনে তোমরা ভুল, ক্ষুদ্রা পদ্মিনী যে ভুলিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? গুণে নয়, ঐ গুঞ্জনেই ভ্রমরের ছলনা।

প্রেমে যাহারা কেবলি সুখ চাহ, ভ্রমরের গুঞ্জন শুন, ভ্রমরের পদানুসরণ কর। তোমাদের নিকটেই ত ভ্রমরের পদমর্য্যাদা—আদর করিয়া ষট্‌পদ নাম দিয়াছ। জ্বালা সহিতে পার না, কাঁটার ঘায়ে কাতর, ভ্রমরই তোমাদের আদর্শ। গুণ্‌গুণ্‌ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, ফুলের মধু লুটিয়া প্রেম ব্যক্ত কর, জ্বলিতে ত হইবে না।

কবি, তুমিই কিন্তু ভ্রমরকে বাড়াইয়া দিয়াছ। না জানি, কোন্ সন্ধ্যার স্বপনে কোন্ ফুলবনে কি শুভ ক্ষণেই তাহাকে প্রথম দেখিয়াছিলে! সন্ধ্যার অন্ধকারে বোধ করি, ঐ কাল রূপ আর ঐ আরও কাল হৃদয় সুস্পষ্ট দেখিতে পাও নাই। উষার মৃদু আলোকেও ত তুমি বাহির হও, একবার সে রূপ ভাল করিয়া দেখিয়া এ দারুণ ভুল সংশোধন করিয়া লইলে না কেন? ভ্রমরকে দেখিতে হয় মধ্যাহ্নে—ভ্রমর আর আমি পাশাপাশি। কেবলি স্বপ্নের কাব্যরচনা! একটুকু মধ্যাহ্নের আলো সহে না, হুলের জ্বালা সহে না! এ ছায়ালীন স্বপ্নরাজ্যে আমি স্থান চাহি না। যে দিন তোমার হৃদয়ে এই দারুণ হুলজ্বালা বিদ্ধ করিতে পারিব, তোমার নশ্বর কাব্যকে অমর করিয়া দিয়া মরিব। সে দিন হইতে তোমার কাব্যে মধ্যাহ্ন জ্বলিতে থাকিবে—সেই জ্বলন্ত মধ্যাহ্নে মগ্ন হইয়া কেবলি জ্বলিয়া রহিব। আপনাকে ভুলিব, জগৎকে ভুলিব, আর তাহার পূর্ব্বেই জগতের হৃদয় হইতে ভ্রমরের স্থান ঘুচাইব। এখন কবি, তুমি হৃদয় লইয়া এস—আমি সেখানে এই হুল ফুটাইয়া দি। বোঁ-বোঁ-বোঁ-বোঁ। ['ভারতী ও বালক,' বৈশাখ ১২৯৮]

শিব

কিন্তু শক্তি চাহি—হৃদয়ে গভীর প্রেম এবং বাহুতে দুর্জ্জয় বল। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের রমণীয় কোমলতা মাত্র সুপরিস্ফুট হইয়াছে, বলের সহিত তাহার সম্বন্ধ অল্পই। কিন্তু প্রেমে এবং বলে একীকৃত না হইলে মানব-চরিত্র সম্পূর্ণতা লাভ করে না। প্রেম বল দেয়, বল প্রেমকে দৃঢ় করে। এবং এইরূপে পরস্পরের নিত্য সহায়তায় মানব-জীবন সংসারের জটিল সমস্যার মধ্য দিয়া প্রতি দিন আপনাকে নিঃশব্দে বিকশিত করিয়া তুলে। বল হইতে বিচ্ছিন্ন প্রেম নিরুদ্যম বেগ এবং অলস রমণীয়তা লইয়া উত্তরোত্তর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে, প্রেম হইতে বিচ্ছিন্ন বল অন্তরে আশ্রয় না পাইয়া প্রচণ্ড কাপুরুষ দাপটে পর্য্যবসিত হয়। প্রেমের আশ্রয়ে বৈষ্ণব সাহিত্যে বলের কথঞ্চিৎ বিকাশ

দেখা যায় বটে, কিন্তু সে বল এত মৃদু যে, তাহার উদর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে না। বৈষ্ণব সাহিত্য রমণীর কোমলতা দিয়া গঠিত। মধুর তরল ভাব বৈ বৈষ্ণব হৃদয়ে ত স্থান পায় না। কোমল প্রেমে কঠিন বল সেখানে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। এই কারণে বৈষ্ণব কাব্যে সমুন্নত দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের অনেক স্থলে কেমন অভাব বোধ হয়। বল বৈষ্ণব কাব্যে স্ফূর্ত্তি বড় পায় না।

কংসবধ ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের বলের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, এবং এই ব্যাপার বৈষ্ণব সাহিত্যেরই অন্তর্গত, কিন্তু বাঙ্গালার বৈষ্ণব কাব্যে কংসবধে ত আর কৃষ্ণের চরিত্র বিকাশ হয় নাই। বৈষ্ণব কবিগণের রচনায় দায়ে পড়িয়া উক্ত ঘটনার মধ্যে মধ্যে কদাচ উল্লেখ দেখা যায় মাত্র। কিন্তু রাধিকারঞ্জনের কুসুম-সুকুমার ললিত বর্ণনা পড়িয়া ত বীরভাব কাহারও মনে আসে না। মোহন চূড়া, কমল নয়ন, ভ্রমর ভাবে স্বভাবতই স্তম্ভিত না হইয়া মন কিছু আলগা হইয়া পড়ে। গাম্ভীর্য্যে বলের প্রতিষ্ঠা। সৌন্দর্য্য এবং শক্তি এখানে যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া কোনও উদ্দেশ্যে আপনাকে সম্পূর্ণ প্রয়োগ করিতে পারে বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব শ্রীকৃষ্ণের এ গাম্ভীর্য্য নাই। নানা কারণে, ইচ্ছায় হৌক্ অনিচ্ছায় হৌক্, তিনি কতকটা রমণীকৃত হইয়াছেন। বৈষ্ণব কাব্যে রমণীতেই প্রেমের আলোচনা। অন্ততঃ রমণীর ভাব সেখানে যেরূপ ফুটিয়াছে, পুরুষের ভাব তেমন ফুটে নাই—হয় ত ফুটাইবার আবশ্যকও হয় নাই। বৈষ্ণব স্ত্রী-চরিত্রগুলি যেমনই হৌক্, যতখানি স্ত্রী, পুরুষ-চরিত্রগুলি কিছুতেই সেই পরিমাণে পুরুষ নহে। প্রেমে পুরুষ-হৃদয়ে আশ্রয় লাভ করিয়া রমণী পরিতৃপ্ত, কিন্তু আশ্রয়-দানে পুরুষ-হৃদয়ের চরিতার্থতার ভাব বৈষ্ণব কাব্যে বিরল। বলিতে গেলে, পুরুষ-চরিত্র বৈষ্ণব কাব্যে অসম্পূর্ণ।

কিন্তু আদর্শ সম্পূর্ণ চরিত্রগঠন বৈষ্ণব কবির কোথাও উদ্দেশ্যও নহে। আর বাঙ্গালার বৈষ্ণব কবির নিকট ইহা আশা করাও তেমন যায় না। অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের পুরুষেরা কোমলাঙ্গীরই একটুকু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ মাত্র। সুতরাং পৌরুষের অভাবে বলে বীর্য্যে সম্পূর্ণ পুরুষ-চরিত্র গঠন বৈষ্ণব কবির পক্ষে একরূপ অসম্ভব। কিন্তু কোমলতা আমাদের যথেষ্ট আছে। এই জন্য এ দেশের রমণী যত দূর রমণী হইবার হয়। কোমলতায় স্নেহে প্রেমে আমাদের গৃহিণীদের পার্শ্বে কেহই স্থান পায় না। আর ইহার মধ্যে কোথাও ভাণ নাই। ইংরাজ রূপসী ফুলের ঘায়ে কাতর হইয়া পড়েন, কেতাবের আইনানুযায়ী যথাসময়ে মূর্চ্ছা অবলম্বন করেন, শীকারে স্বামীর সুনিপুণা সহধর্ম্মিণী হইয়া লোকসমাজে শোণিতের উল্লেখ মাত্রে সঘনে শিহরিয়া উঠেন, অর্থাৎ অবসর এবং সুবিধা পাইলেই রমণীজনোচিত আত্যন্তিক কোমলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করেন না। আমাদের সুন্দরীদের কোমল ভাবে সলজ্জ সহিষ্ণুতা। দেখাইবার চেষ্টা কোথাও নাই।

এই স্বাভাবিক কোমলতায় আমাদের কাব্যে কোমল ভাবের এত প্রাধান্য। এবং এই কোমল ভালবাসায় আমাদের উত্তমার্দ্ধের যাহা কিছু বল।

অপরার্দ্ধও আমাদের কোমলহৃদয়। কেবলমাত্র কোমলহৃদয় নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কোমলাঙ্গও বটে। সেই জন্য অঙ্গে আঘাত পড়িলে হৃদয় আমাদের অনেকটা দমিয়া যায়। এবং নিতান্ত পূর্ব্বজন্মের দায়ে না ঠেকিলে অন্তরাত্মা এ ক্ষণভঙ্গুর কারাদেহ হইতে নির্ব্বিবাদে মুক্তিলাভ করতঃ অবিলম্বে লোকান্তরের অবস্থা-স্বচ্ছলতা সম্পাদনার্থে যত্নবান্ হয়। বৈষ্ণব কাব্যে তাই দেহ নিরাপদ্—বলের সংস্পর্শ যথাসাধ্য দূরীকৃত। বাঙ্গালার বাহিরে তবু বল প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু এখানে মুগ্ধা গোপিনীকুলরঞ্জনে বলের বড় আবশ্যক হয় নাই। সমতল বৈষ্ণব রাজ্যে কোমলতায় যথেষ্ট ফল হয়। বাধা নাই, বিঘ্ন নাই, তোড়ও সুতরাং নাই। অবাধে হৃদয় প্লাবিত করিয়া দিয়া কোমল প্রেম-স্রোত বহিয়া গিয়াছে। চারি দিকে ফলে ফুলে ধনে ধান্যে হৃদয় উর্ব্বরা হইয়া উঠে।

কিন্তু বলের অন্তঃপুরে কোমলতা যেরূপ সুরক্ষিতা, আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সে তেমন নিরাপদ্ নয়। রসের সহিত কোমলতার উপমা খাটে। সরসতায় তরুহৃদয় সবল এবং বলে তাহার সরসতা। শুষ্ক কাঠিন্যে অস্ত্র ভেদ করে না বটে, কিন্তু এ জড়তা বলের পরিচয় নহে। জীর্ণ দেহেও রস শুকাইয়া আসে, দুর্ব্বল বার্দ্ধক্য কোমল নহে। বাঙ্গালী জাতির হৃদয়ে কোমলতা বলে পরিপুষ্ট হয় নাই। এই জন্য আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদনে এত বিলম্ব। বল নহিলে কোমলতা প্রয়োগ করিবে কে? আমাদের প্রেম যতই গভীর হৌক্, বলের অভাবে অলস এবং নিস্তেজ। নহিলে, হৃদয়ই ত বাহুতে বল দেয়। বাঙ্গালার চৈতন্যই ত হৃদয়ের বলে দশ দিক্ জয় করিয়াছিলেন। আশ্রয়দানে প্রেমের বল প্রকাশ পায়। রমণীর কোমলতায় নির্ভরের ভাব স্বাভাবিক। এবং রমণীর এই নির্ভর-ভাবই পুরুষের প্রেমে আশ্রয়-বল প্রদান করে। কিন্তু নারীর রমণীয় কোমলতা পুরুষের প্রেমে অশোভন। পুরুষের প্রেমে হৃদয়ে বল চাহি এবং বাহুতে তাহার বিকাশ।

রমণীর কোমলতায় কি বল নাই? কিন্তু সে বল স্বতন্ত্র। যে বলে লতা দীর্ঘ ছায়া-তরুকে জড়াইয়া উঠে, যে বলে নারী রৌদ্রতপ্ত অবসন্নকে আপন স্নিগ্ধ হৃদয়ে শান্তি দান করেন। পুরুষের বল বাহিরের ঝটিকা হইতে রক্ষা করিয়া রমণীকে এই ছায়াময় নিভৃত শান্তিকুঞ্জ রচনার অবসর দেয়। বৈষ্ণব কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ এ বল হইতে বঞ্চিত। নিরবচ্ছিন্ন সুখবিলাসে তাঁহার সমস্ত চরিত্রে একটা অশোভন দুর্ব্বল কোমলতার ছায়া পড়িয়াছে। বাহুতে বল থাকিলেও হৃদয়ের অসংযত লঘুতায় তাহা ব্যর্থ। সক্ষম ক্ষমা এবং সংযত মনুষ্যত্বে বলের পরিচয়। পৌরুষ ত কেবল মাত্র মুষ্টিযোগে নয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রচণ্ড

মুক্তি অনুভব করিতে পারিলেও আমরা ধন্য হইতাম। বৈষ্ণব কাব্যে বিলাস-কোমলতায় দ্রবীভূত হইয়া কৃষ্ণের চরিত্র নামিয়া গিয়াছে।

আদর্শ পুরুষচরিত্র শিব। প্রেমে বলে, ক্ষমা ক্ষমতায়, গার্হস্থ্যে বৈরাগ্যে তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণ। সমস্ত ভাবে তাঁহার প্রেম এবং বল প্রকাশ পাইয়াছে। প্রেমে বলে কোথাও বিযুক্ত হয় নাই। তাই শিবের চরিত্রে সৃষ্টি প্রলয়ের সহিত চিরবন্ধনে বদ্ধ। প্রেম হলাহল পান করিয়া প্রলয়কে কণ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছে, বল বিষে জর্জ্জরিত হইয়াও মৃত্যুকে দমনে রাখিয়াছে। শৈব সাহিত্যে প্রেমে এবং বলে মহত্ত্বের অনুশীলন। বৈষ্ণব সাহিত্যের শিথিলতা এখানে নাই। শৈব দেবমন্দিরের সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্যে ভয়ে বিস্ময়ে স্তিমিত অন্তররুদ্ধ আনন্দে হৃদয় নত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব হৃদয় নদীতীরে, তরুতলে, প্রকৃতির ছায়াসুপ্ত বিজন শ্যামলতায়, মাতৃস্নেহে, বন্ধুর প্রীতিতে, সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত মধুর মিলনে নীরবে বর্দ্ধিত হয়। শৈব হৃদয় যক্ষ-রক্ষ-কিন্নর-গন্ধর্ব্ব-বেষ্টিত পর্ব্বতের কঠিন সৌন্দর্য্যে, পিতার রুদ্রস্নেহে, ত্রিশূলের প্রবল আশ্রয়ে দুর্জ্জয় বল সঞ্চয় করে। এই জন্য সমাজ সংগঠনে শৈবের প্রভাব। বৈষ্ণব ধর্ম্ম সামাজিক অপেক্ষা পারিবারিক।

তাই বাঙ্গালা দেশে শিব অপেক্ষা কৃষ্ণের প্রভাব অধিক। শিথিলতার মধ্যেই আমরা থাকি ভাল। পরিবারে ত আর সঙ্কোচ নাই—হাত পা ছড়াইয়া বেশ নির্ভাবনায় থাকা যায়। শুধু এই কারণে নহে, শিবের প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য আমাদের লঘু হৃদয়ে হয় ত গুরুভার বলিয়া বোধ হয়, আমরা এ সুদৃঢ় গাম্ভীর্য্য ছাড়িয়া কৃষ্ণের তরল কোমলতায় ঢলিয়া পড়ি। আমাদের জাতীয় চরিত্র শৈব ভাবের বড় অনুকূল নহে। বরঞ্চ পাশ্চাত্য চরিত্রে শৈব ভাব ঈষৎ লক্ষিত হয়। কিন্তু দানব-অধৈর্য্যে প্রশান্ত সবলতা পাশ্চাত্য চরিত্রে স্থান পায় না। শিবে বল আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ সংযত। উদ্ধত দাপট গর্ব্বগঞ্জন ভোলানাথের অন্তরে থাকিবে কিরূপে? ঔদ্ধত্য ত প্রেমের সহিত নিত্য অবস্থান করিতে পারে না। শিবের বল মুহূর্ত্তেক প্রেমহীন নহে।

শৈব ভাবের অনুশীলন আমাদের চরিত্র গঠনে এখন বোধ করি বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। কারণ, ইহাতে নূতন ভাবের সংস্পর্শে আমাদের অনেকগুলি প্রসুপ্ত মনোবৃত্তি নাড়াচাড়া পাইয়া জাগিয়া উঠিবার সম্ভাবনা। বৈষ্ণব প্রেমে শৈব বল মিশিতে পারিলে সর্ব্বাঙ্গে প্রাণ সঞ্চারিত হয়। নহিলে, এ কোমলতা চিরদিন নব বল দিয়া আমাদিগকে সজীব রাখিতে অক্ষম। যশোদার স্নেহে, রাধিকার প্রণয়ে, সুবল সুদামের সখ্যে হৃদয় যতই কেন প্রতিষ্ঠা লাভ করুক না, আপন অন্তরের মধ্যে আপন দুর্জ্জয় বলে একবার প্রতিষ্ঠা অনুভব না করিলে সকলই নিষ্ফল। কেবলই পাষাণ পশুবলের কথা

বলিতেছি না, কিন্তু যে বল পশুবলকে পরাজিত করিয়া দুর্জ্জয়, যে বল বাহুতে বল সঞ্চার করিয়া প্রবল, যে বল মৃত্যুভয় অতিক্রম করিয়া অমর।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের অধঃপতনের সঙ্গে বলের চর্চ্চা এ দেশে একবার আসিয়াছিল। এরূপ প্রতিক্রিয়া হইয়াই থাকে। কিন্তু পৌরুষিক গাম্ভীর্য্য এবং রমণীর কোমলতা উভয়বর্জ্জিত হইয়া এ বল অনেকাংশে নিষ্ফল। কোমলতায় তখন আর বাঙ্গালীর মন উঠে না, অবস্থায় পড়িয়া শক্তির জন্য তাহাকে দেবতার দুয়ারে উপস্থিত হইতে হইল। প্রবলের পাশব অত্যাচার কোমলতার উপরেই সমধিক বল প্রয়োগ করে। সুতরাং বহু দিন নীরবে সহিয়া নিতান্ত যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, কোমলহৃদয় বঙ্গসন্তানও প্রেম ছাড়িয়া অস্ত্রধারণে উদ্যত হইল। বলিতে গেলে, মুসলমান অত্যাচারের বিরুদ্ধেই শাক্ত ধর্ম্মের অভ্যুত্থান। কিন্তু হইলে কি হইবে? বৈষ্ণব কোমলতা আমাদের হাড়ে হাড়ে এমনি বিঁধিয়াছে যে, শক্তি আমাদিগকে সহজে গড়িয়া তুলিতে পারে না। বৈষ্ণব ধর্ম্মে কোমলতার মধ্যেই একরূপ বল ছিল। প্রেমের বলে আমরা বিশ্বসংসারকে অন্তরে আশ্রয় দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। কিন্তু নানা কারণে সে প্রেম যখন শিথিল হইয়া আসিল, অক্ষম হিংসা এবং দারুণ তৃষা লইয়া অন্তরে আমরা প্রথম দুর্ব্বলতা অনুভব করিলাম। দুর্ব্বল সন্তান স্বভাবতই মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইতে ছুটে। কিন্তু প্রেমে আর আমাদের তেমন নির্ভর নাই, জননীর স্নেহে আর আমরা হৃদয়ে বল অনুভব করি না, তাড়াতাড়ি মায়ের হস্তে গোটাকতক প্রাচীন পুথিরক্ষিত ধাতব অস্ত্র গুঁজিয়া দিয়া সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইলাম। জননীর শারীরিক বলেই আমাদের যাহা কিছু আশা ভরসা। কাপুরুষ হৃদয় জননীর স্নেহে সাহস পাইল না, কোমলাঙ্গিনী রমণীর মৃণালভুজে অস্ত্র দিয়া অঞ্চলের আড়াল অবলম্বন করিয়া রহিল।

ইহাই শক্তিপূজা। এবং এই জন্যই শক্তির প্রভাবে আমাদের চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় নাই। নির্ম্মম রক্তদৃশ্যে হৃদয়ের কোমলতা হানি হয় মাত্র; জীববলিতে, ঢাকের বাদ্যে, উন্মত্ত প্রচণ্ড তাণ্ডবে অর্থাৎ যথাসম্ভব আসুরিক ব্যবহারে সবল চরিত্র গঠন হয় না। রমণী লক্ষ্মীরূপিণী অন্নপূর্ণা জননী। এই ভাবেই তাঁহার বল। প্রেম বিতরণ করিয়া, শান্তি বিতরণ করিয়া, অন্ন বিতরণ করিয়া তিনি শক্তিমতী। অস্ত্র ধারণ করিয়া নহে, শোণিত পান করিয়া নহে, রণরঙ্গে সংহারিণী প্রলয়মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নহে। বলে অসুরজয় রমণীর পক্ষে কেমন অস্বাভাবিক এবং অনাবশ্যক ঠেকে। বিশেষতঃ শিব বর্ত্তমানে পার্ব্বতীকে দিয়া এ কার্য্য সাধনের প্রয়োজন কি? কিন্তু বাঙ্গালা দেশ ইহার জন্য দায়ী নহে। সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই চণ্ডীর অবতারণা। চণ্ডী যদি কোথাও দুষ্প্রাপ্যা হয়েন ত এই বঙ্গদেশে।

তাই বোধ করি, শক্তি এখানে জমিল না। যেটুকু বা জমিয়াছে, তাহাতে বীররসের প্রাবল্য, কি অন্য কোনও বিদ্রূপাত্মক রসের প্রাধান্য, নিঃসংশয়ে বলা যায় না। বৈষ্ণব প্রেমে

আমাদের জন্ম, রমণীর কোমল করকমলে তৃষিত তরবারি সহিবে কেন? কিন্তু সামঞ্জস্য করিতে না পারায় আমাদের অদৃষ্টে তাহাই ঘটে। শাক্ত ভাবের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিসদৃশ অসামঞ্জস্য অনুভব করা যায়। তীক্ষ্ণ যুক্তি প্রয়োগপূর্ব্বক তাহা বুঝান দুঃসাধ্য। কিন্তু সবশুদ্ধ প্রকৃতি অপেক্ষা বিকৃতিরই সেখানে যেন কিছু প্রভাব। শিবের চরিত্রে এই বিকৃতি অভাবে সামঞ্জস্য সম্পূর্ণ। শক্তি আছে, কঠোরতা আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং একান্ত আবশ্যক। মত্ততা শিবে নাই। তাঁহার চরিত্র বিশ্বের রহস্য মন্থন করিয়া নিঃশব্দে গঠিত হইয়াছে—পর্ব্বতের মত অটল, সমুদ্রের ন্যায় গভীর।

কিন্তু শিব ত আমাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই : কেবল, কুমারীরা গৌরীর অনুকরণে পতিপ্রার্থনায় শিবপূজা করিয়া থাকেন মাত্র। তাহাতে এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, শিবের উদার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে আমরা সম্পূর্ণ অক্ষম নহি। এবং আমাদের রমণীদের মধ্যে স্বামীর আদর্শ এখনও সহৃদয় সবল পুরুষ—নিতান্ত সঙ্কীর্ণহৃদয় পুরুষবেশী নারীচরিত্র নহে। কিন্তু ইহা হইতে শিবের প্রভাব সামান্যই প্রতিপন্ন হয়। আমাদের জাতিগঠনে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ভিন্ন আর কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না। সেই জন্য বাঙ্গালার একমাত্র গৌরবের সাহিত্য বৈষ্ণব কাব্য। শৈব সাহিত্য আমাদের আদবেই নাই। এবং শাক্ত সাহিত্য যাহা আছে, তেমন উচ্চ অঙ্গের নহে।

কিন্তু শক্তিপূজা আমাদের মধ্যে বহু কাল হইতে প্রচলিত। তখনও বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় নাই। এবং বোধ করি, বাঙ্গালী জাতিগঠনও তখন বিশেষ অসম্পূর্ণ। চতুর্দ্দিকে অন্ধকার কারাগৃহ রচনা করিয়া হিংসার পদতলে দাঁড়াইয়া তন্ত্র তখন করালবদনে শত ব্যাখ্যানে আপনার নিদারুণ তিমির-মহিমা প্রচার করিতেছে—পৈশাচিক সন্দেহ অবিশ্বাস এবং নির্ম্মমতায় বঙ্গগৃহের প্রতিষ্ঠা প্রতি দিন টলমল। এমন সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আসিয়া স্নেহে প্রেমে সখ্যে আমাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিল। এই প্রথম আমাদের জাতিগঠন। প্রেমে এবং কোমলতায় আমরা পরস্পরকে অন্তরে অনুভব করিলাম। বৈষ্ণব ধর্ম্মে আমাদের অন্তর বাহিরে স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। সুতরাং সাহিত্য জন্মাইবার এই প্রশস্ত অবসর। শক্তি আমাদের অন্তরে স্থান পায় নাই। তাই অজ্ঞান এবং অন্ধকারের মধ্যে তাহা নিষ্ফল।

তাই বলিয়া একেবারে ব্যর্থ নহে। সেই জন্যই বৈষ্ণব যুগের পরে তাহার পুনরুত্থান। এবং সাহিত্যেও অল্পবিস্তর প্রভাব। মুকুন্দরাম চণ্ডীকাব্য রচনা করিলেন, রামপ্রসাদ সঙ্গীতে এবং কাব্যে শক্তির গান গাহিলেন, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও শক্তির প্রভাব বড় সামান্য নহে। কিন্তু এ সাহিত্য আমাদের গভীর হৃদয়ে পরিপুষ্ট হয় নাই—বাহিরের পৌরাণিক উত্তাপে ইহার জন্ম। তথাপি ক্রমে ক্রমে শাক্ত সাহিত্যেও বৈষ্ণব প্রভাব পড়িয়াছে। আগমনী সঙ্গীত প্রভৃতিতে কোমল প্রেমচর্চ্চা বাদ যায় নাই।

কোমলতা আমাদের প্রকৃতি। শক্তিপূজারই ভাণ করি আর যাহাই বলি, কোমল ভাব নহিলে আমরা থাকিতে পারি না। কোমলতায় ভিন্ন আমাদের গৃহস্থ প্রকৃতি চরিতার্থতা লাভ করে না।

বাঙ্গালার শাক্ত কাব্যে শক্তির মহিমা প্রচারিত হইলেও যথার্থ বীররসের সম্বন্ধ অল্পই। কোমল বর্ণনাগুলি আমাদের আসে ভাল। সুতরাং শক্তির মধ্যেও কোমল রসেই আমাদের হৃদয় স্ফূর্ত্তি পাইয়াছে। এমন কি, অনেক স্থলে এই জন্য রসের যথাযথ বিকাশ অভাবে কাব্যের হানিও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই কোমল রসের কল্যাণেই বাঙ্গালা সাহিত্যে শিবের নাম উল্লেখ দেখা যায়। পার্ব্বতীর সহিত সম্বন্ধে তিনি আমাদের নিকট পরিচিত। গৌরীর কথা বলিতে গেলে শিবের উল্লেখ না করিয়া ত থাকিবার যো নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্র শিবের চরিত্র যেরূপ ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে যে পরিমাণে লঘুতা প্রকাশ পাইয়াছে, গাম্ভীর্য্য তাহার ধার দিয়াও যায় না। ভারতচন্দ্রের শিব আধুনিক ভণ্ড সন্ন্যাসীদলের একজন প্রতাপশালী দলপতি। কোনও প্রকারে যেন কতকগুলি অমানুষিক শক্তি আয়ত্ত করিয়াছেন মাত্র। দেবভাব ত দূরের কথা, সমুন্নত মনুষ্যত্ব দেখিলেও পরিতৃপ্ত হইতাম।

বাস্তবিক, দেবত্ব অপেক্ষা মনুষ্যত্বে আমাদের সমানানুভূতি অধিক। একেবারে সুখদুঃখবিবর্জ্জিত নিষ্কলঙ্ক দেবচরিত্রে হৃদয় টানে না। আমরা অসম্পূর্ণতার মধ্যে সম্পূর্ণতার নীরব বিকাশ অনুভব করিতে চাহি। চেষ্টায় আমাদের অর্দ্ধেক আনন্দ। অক্ষম মানব প্রাণপণ চেষ্টায় শত বার স্খলিতপদ হইয়া দেবত্বের পথে যতটুকু অগ্রসর হয়, আমরা হৃদয়ে সেই পরিমাণে আনন্দ অনুভব করি। মানব নহিলে সকল হৃদয়ে আমরা যেন তাহাকে ভাল বাসিতে পারি না। সেই জন্যই আমাদের রামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার হইয়াও অজ্ঞান। মানবের মত তাঁহার সুখ আছে, দুঃখ আছে, ভয় আছে, ভ্রান্তি আছে, তিনি বিপদে পড়েন এবং দুর্ব্বল মানবেরই মত বহু কষ্টে বন্ধুবর্গের সহায়তায় নানা কৌশলে বিপদ্ হইতে মুক্তি লাভ করেন। সীতা রামচন্দ্রের লক্ষ্মী—দেবী। কিন্তু তাঁহার চরিত্র একেবারে সম্পূর্ণ নহে। রমণীজনসুলভ সকল সুখ দুঃখই তাঁহার আছে। ব্যথা পাইলে তিনি কাঁদেন, স্বজনবিরহে অধীর হইয়া পড়েন, গন্ধদ্রব্যে আনন্দ উপভোগ করেন, সেবায় সুখী হয়েন, এমন কি, দেবর লক্ষ্মণ ভাল ভাবিয়া তাঁহার আদেশ পালনে এতটুকু ইতস্ততঃ করিলে সময় সময় মনের আবেগে রূঢ় ভাষাও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। অসম্ভব নির্ব্বিকার মহত্ত্ব সীতাকে আমাদিগের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। সীতায় আমরা এই মর্ত্ত্য ভাবের মধ্যে মহত্ত্ব, প্রেম, নিষ্ঠা দেখিয়াই মুগ্ধ। কেবলই রাম সীতা বলিয়া নহে, সর্ব্বত্রই অসম্পূর্ণতার মধ্যে, পদস্খলনের মধ্যে, সহস্র ত্রুটি এবং অক্ষমতার মধ্যে মহত্ত্বের সংযমচেষ্টা অনুভব করিয়াই আমরা তৃপ্ত হই।

শিবকেও আমরা মানবভাবে দেখিয়াই মহত্ত্ব উপভোগ করি। মানবভাবে না দেখিলে কাব্যে তাঁহার প্রতিপত্তি হইত না, কেবলই স্তবে, বন্দনায় এবং ধ্যানমন্ত্রের বিশেষ রকম কাব্যের মধ্যে শিব দেবাধিদেব হইয়া বিরাজ করিতেন। কাব্যে শিব নিরাকারও নহেন, নির্ব্বিকারও নহেন, তিনি কখনও যোগী, কখনও গৃহস্থ, কখনও বা গৃহী বৈরাগী। তবে কাব্যেও তাঁহার ঐশ্বরিক শক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে শক্তি যেন ঈশ্বরের প্রসাদ মাত্র, শিবকে সে শক্তিতে ঈশ্বর বোধ হয় না। শিব যাহাই হৌন্, কাব্যে মানবীকৃত হইয়াছেন। মানবীয় অসম্পূর্ণতা তাঁহার চরিত্রেও লক্ষিত হয়। এবং ইহাতেই শিবের চরিত্র যত দূর সম্পূর্ণ। আমাদেরও শিবের প্রতি অনুরাগের কারণ এইখানে। যখন দেখি যে, তাঁহার উপরেও মদনের প্রভাব, তাঁহারও চিত্ত চঞ্চল হয়, যোগ ভঙ্গ হয়, ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠে, প্রতিহিংসা শত্রু দমন করে, তপস্যা বিনা সহজে চিত্ত সংযত হয় না, উন্নতির জন্য, শান্তির জন্য আপনাকে আয়ত্ত করিতে প্রয়াস পাইতে হয়, তখনই আমরা অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে আপনা হইতেই শিবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ি। নহিলে, সুখদুঃখহীন নিৰ্হৃদয় দেবচরিত্রের নির্ব্বিকার মহত্ত্বে আমাদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আশা করা যায় কিরূপে ?

সতী হিমালয়ের গৃহে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—পূর্ব্বজন্মে দক্ষকন্যারূপে শিবের অর্দ্ধাঙ্গ ছিলেন, এ বারেও শিবের সহধর্ম্মিণী হইবার জন্যই তাঁহার জন্মগ্রহণ। শিব সর্ব্বদা যোগাসনে আসীন—সতীর দেহত্যাগ অবধি গৃহধর্ম্মে তাঁহার আর বড় মন নাই। সুতরাং তাঁহাকে সংসারী করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। দেবতাদেরও স্বকার্য্য উদ্ধারার্থে শিবকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যক। শিবের সন্তান নহিলে তাঁহাদের শত্রুদমন হয় না। দেবতারা নগেন্দ্রনন্দিনীকে শিবের হৃদয়হরণে তাই সহায়তা করিবেন স্থির করিয়াছেন। মধুসখা কন্দর্প ফুলধনু লইয়া নিকটে প্রচ্ছন্ন থাকিবেন, পার্ব্বতী নিয়মিত শিবপূজা করিতে আসিলে পুষ্পশরে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিবেন। পার্ব্বতী এ ব্যাপার কিছুই জানেন না। প্রতি দিন যথাসময়ে আসিয়া পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া শিবের সেবা করেন, যথাসময়ে চলিয়া যান। শিবের যোগ ভাঙ্গে না।

কিন্তু যোগ না ভাঙ্গিলে নয়। মন না টলিলে ত এত রূপ, এত সেবা, এ সকলই ব্যর্থ। রতিপতি সময় বুঝিয়া বসন্তের সহিত একদিন শিবের আবাসস্থানে নামিয়া আসিলেন। অসময়ে চতুর্দ্দিকে সহসা বসন্তের আবির্ভাব হইল—গাছে পালায়, মেঘে রৌদ্রে, জলে স্থলে বসন্তের কনক-বিকাশ। মানবহৃদয়েও বসন্ত যথারীতি প্রভাব বিস্তার করিতে ক্রটি করিল না—বিশেষতঃ শিবের হৃদয়ে। সম্মুখে অর্দ্ধোন্মুক্তযৌবনা গৌরী শিবের চরণে পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিতেছেন। ত্রিলোচন যেমন সেই পুষ্পাঞ্জলি প্রতিগ্রহণ করিতে যাইবেন, কন্দর্পের নিদারুণ সম্মোহন বাণে ব্যথিত হইলেন। চন্দ্রোদয়ে সাগরহৃদয়ের মত শিবের সেই

অগাধ স্তম্ভিত হৃদয়ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। উমামুখে তাঁহার সমস্ত দৃষ্টি নিপতিত হইল। কিন্তু চঞ্চল মন শিবকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিতে পারিল না। অটল দৃঢ়তার সহিত সংযমী আপনাকে দমন করিয়া রাখিলেন। মদনের চাতুরী বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ক্রোধে ভোলানাথের নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল। তীব্র দৃষ্টিতে তিনি মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। আপনিও আর এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইলেন না, পাছে চিত্তসংযমে অক্ষম হয়েন, এই ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ পার্ব্বতীর সন্নিকর্ষ পরিত্যাগ করিলেন। কালিদাস সংযমে শিবের চরিত্র বজায় রাখিলেন।

ভারতচন্দ্রের শিব কিন্তু এ প্রকৃতির নহেন। সিদ্ধি এবং গঞ্জিকায় তাঁহার অর্দ্ধেক শিবত্ব। সুতরাং চরিত্রও তদনুরূপ। বাণবিদ্ধ হইয়া তিনি মদনকে ভস্ম করিলেন বটে, কিন্তু আপনাকে সংযত করিলেন না। অপ্সরী কিন্নরীদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া বঙ্গীয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিলেন। এবং এই অশিব ব্যবহারে অতিরসজ্ঞ বঙ্গীয় পাঠককুলের তাম্বুলরক্ত চর্ব্বণ-যন্ত্রে হাস্যসঞ্চারে খিটিমিটি খিটিমিটি দ্রুত শব্দের একপ্রকার গতিবিধিও অনুভব হইতে লাগিল।

কুমারসম্ভবে শিবের শিবত্ব অক্ষুণ্ণ। কালিদাস মহান্ সৌন্দর্য্যের কবি, গভীর ভাবের কবি, সরস মধুরতার কবি। শিবের কোমল-কঠোর চরিত্রসৌন্দর্য্য তিনিই ধরিতে পারেন। তাই তাঁহার কাব্যে কোথাও চরিত্রব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। তাঁহার শিবের চরিত্র সংলগ্ন এবং সঙ্গত। প্রেমে সতীদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মাদের মত সমস্ত পৃথিবী যিনি ভ্রমণ করিতে পারেন, সতীর সহিত গার্হস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপস্যায় দীর্ঘ যৌবন যাপন করেন, মদনের প্রভাব একেবারে অতিক্রম করিতে না পারিলেও মুহূর্ত্তে আত্মহারা হইবার মত চরিত্র তাঁহার নহে। কালিদাসের শিব টলমল মনকে সংযত করিয়া সামলাইয়া লয়েন।

কিন্তু পার্ব্বতীতে শিবের মন টানিয়াছে। যতই সংযমচেষ্টা করুন আর যাহাই করুন, নগেন্দ্রনন্দিনীর রূপ তাঁহার হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে সন্দেহ নাই। তবে এখনও চাই কি শিব যোগে ফিরিতে পারেন। পার্ব্বতী অহরহ কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহার লক্ষ্য ধ্রুব, সঙ্কল্প স্থির, চিত্ত একাগ্র। শিবের সহধর্ম্মিণী না হইলে তাঁহার জীবনে আর কোনও সুখ নাই। তিনি সহধর্ম্মিণীরূপে চিরদিন শিবের সেবা করিবার অধিকার চাহেন। তাই এই কঠোর সাধনা।

শিবের মন গলিল। ব্রাহ্মণবেশে তিনি একদিন তপস্বিনীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উমাকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। শিবের যে একটু আধটু নিন্দা না করিলেন, এমন বলা যায় না। ব্রাহ্মণ বলিলেন, শিব শ্মশানচারী, ভস্ম মাখিয়া থাকে, খেয়াল অনুসারে চলে, এমন রূপসীর পাণিগ্রহণের যোগ্য নহে। গৌরীর এ কথাগুলি

তেমন ভাল লাগিল না। একটু তীব্র ভাষায় বেশ গুছাইয়া দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। কালিদাস উমার মুখ দিয়া শিবের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে শিব-চরিত্রের কৈফিয়ৎ অনেকটা দেওয়া হইয়াছে। আর ঐশ্বরিক ভাবের সহিত মানবভাবের সম্মিশ্রণে শিব ফুটিয়াছেনও ভাল। উমা বলিলেন,

"বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং
 নিষেব্যতে ভূমি সমুৎস্মুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ
 কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥
অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং
 ত্রিলোকনাথঃ পিতৃসদ্মগোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
 ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥
বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
 গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং
 ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ॥
তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে
 ধ্রুবং চিতাভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং
 বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্॥
অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ
 প্রভিন্নদিগ্বারণবাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা
 বিনিদ্রমন্দাররজোহরুণাঙ্গুলী॥"

শিবের এ সকল আবশ্যক কি? তিনি সকল অবস্থাতেই শিব। শ্মশানবাসী দরিদ্র হইয়াও তিনি ত্রিলোকনাথ, ভীমরূপ হইয়াও সৌম্যমূর্ত্তি, সাজসজ্জা করুন বা না করুন, তাঁহার শিবত্বের এক তিল ব্যতিক্রম ঘটে না। দেবতারা তাঁহার অঙ্গচ্যুত চিতাভস্ম স্পর্শে সম্মানিত জ্ঞান করেন, ইন্দ্রও দূর হইতে বৃষারূঢ়কে দেখিলে ঐরাবত হইতে অবতরণ করিয়া চরণে শিরস্পর্শ করিয়া কৃতার্থ হয়েন।

উমার মুখে শিবের এইরূপ বর্ণনা শুনিয়া শিব সবিশেষ প্রীত হইলেন। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন। কালিদাস এই অবস্থায় সলজ্জ সম্ভ্রমে উমার কোমলতা ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতি কোথাও ঝাঁঝাল নহে।

ইহার পর শিবের বিবাহ। গান্ধর্ব্ব বিধি অনুসারে নহে; যথারীতি হিমালয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন, দেব ঋষি প্রভৃতি মহাত্মাগণ সভায় উপস্থিত, অনুষ্ঠানের কিছু ত্রুটি নাই। শিবের বেশভূষা শিবেরই মত—চিতাভস্ম, বাঘছাল, ফনাজাল, সকলই আছে। কিন্তু কালিদাস ভারতচন্দ্রের মত শিবকে অসংযতবসন অতিরিক্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য করিয়া হাস্যরসাবতরণচেষ্টায় মাটি করেন নাই। গাম্ভীর্য্যে শিবচরিত্র অটল অচল। শ্লীলতা ভঙ্গ করিয়া শিবের বর্ণনায় লঘু হাস্য আকর্ষণ চেষ্টা নিতান্তই কবি-অযোগ্য।

বিবাহেই কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য সমাপ্ত—এ গ্রন্থ তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং শিবচরিত্র কালিদাসের রচনা হইতে সম্পূর্ণ বুঝা যায় না। কিন্তু তাহার তেমন আবশ্যকও নাই। পুরাণাদি হইতে শিব সম্বন্ধে আমাদের যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তবে অন্নদামঙ্গলে ভারতচন্দ্র তাঁহাকে যেখানে মারিয়াছেন, কালিদাস সেইখানেই কিরূপে মহত্ত্বে গাম্ভীর্য্যে সংযমে শিবের সমুন্নত আদর্শ বজায় রাখিয়াছেন, ইহা দেখাইবার জন্যই কুমারসম্ভবের শিবের উল্লেখ আবশ্যক। আর মানবভাবে শিবের প্রতি সহানুভূতিও আমাদের অধিক এইখানে।

এখন হরগৌরীর মিলনে আমাদের গার্হস্থ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেম আছে, স্নেহ আছে, সখ্য আছে, কিন্তু কিসের অভাবে গার্হস্থ্য এমন দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পারিবারিকতার মধ্যেও সেখানে কেমন শিথিল ঔদাস্য অনুভব হয়। শৈব সাহিত্যে বৈরাগ্যের অন্তরে গার্হস্থ্যের প্রতিষ্ঠা, বৈষ্ণব সাহিত্যে বোধ করি গার্হস্থ্যের মধ্যেও শিথিলতা। তাই হয় ত দাম্পত্য-বন্ধন সেখানে নাই, অথচ প্রেমের সম্বন্ধ গাঢ় এবং ঘনিষ্ঠ। শিব-সহধর্ম্মিণী শিবের গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। কন্যা হইতে মাতৃভাবে বিকশিত হইয়া তাঁহার মধ্যে গার্হস্থ্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে হৃদয়ের বিকাশ এরূপ ভাবে দেখান হয় নাই। স্বতন্ত্র চরিত্রে স্বতন্ত্র ভাবমাধুরীটুকু যথাসাধ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই কারণে বৈষ্ণব সাহিত্য গীতিকাব্যপ্রধান। শৈব ভাবে গীতিকাব্য অপেক্ষা মহাকাব্য রচনার যেন সুবিধা অধিক।

বৈষ্ণব গার্হস্থ্যে কেবলই মাধুরী কি না। মাধুরী লইয়াই বৈষ্ণব কাব্য। কিন্তু গার্হস্থ্যের একদিকে ক্ষমতারও আভাস পাওয়া যায়। শৈব গার্হস্থ্যে ইহা কতকটা থাকিলেও থাকিতে পারে। শিবেরই ত অন্নপূর্ণা। বৈষ্ণব ভাব কিছু তরল। শৈব ভাবে বন্ধন দৃঢ়। ইহাতে সমাজ-সংস্রব আছে। কিন্তু শক্তিকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে এ সমাজ-

সংস্রব টিঁকে না। শক্তির সহিত শিবের সম্বন্ধ সকল অবস্থায় না হইলেও অনেক অবস্থায় এমনি জড়িত যে, উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা চলে না। তথাপি শাক্ত এবং শৈব ভাবে অনেক প্রভেদও আছে। কিন্তু তাহার উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

এখন বৈষ্ণব স্বাধীনতায় শৈব সংযম, বৈষ্ণব প্রেমে শৈব বল, বৈষ্ণব মাধুরীতে শৈব গাম্ভীর্য্য মিশিতে পারিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়। ['ভারতী ও বালক,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮]

কবি ও সেণ্টিমেণ্ট্যাল্

একদল লোক কবিতা রচনা করেন, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে ডুবিয়া ভাষায় তাহার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলেন, মানবের অগাধ হৃদয়ে বসিয়া সেখান হইতে সঙ্গীতে ছন্দে মধুরতায় প্রেমে তাহার গভীর বিচিত্র রহস্য ব্যক্ত করিয়া দেন, অন্তর বাহিরে আসিয়া ফুটে, বাহির অন্তরে আশ্রয় লাভ করে। আর একদল লোক আকাশে তারা দেখিলেই অর্দ্ধনিমীলিত অনিমেষনেত্রে পরম গাম্ভীর্য্যসহকারে সেই দিকে চাহিয়া নিস্পন্দবৎ নীরবে বসিয়া থাকেন, দিগন্তে চন্দ্র উঠিলেই—বোধ করি অন্তরে দারুণ বিরহ অনুভব করিয়া—করতলে কপোল-ভার ন্যস্ত করিয়া দেন, আলুথালু শিথিল দেহযষ্টি ছড়াইয়া দিয়া চন্দ্রকরে হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করেন, যথারীতি সঘনে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া জ্বালা জুড়ান। ইহাঁরা জামার বোতাম আঁটেন না, কেশবিন্যাসে যথেষ্ট যত্নপূর্ব্বক সমধিক ঔদাস্য ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পান; সংসার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার গর্ব্ব করেন, এবং অহরহ করকমলে হালফেসানের কাব্যগ্রন্থ লইয়া ফিরেন, তৎসম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, টীকা করেন, অন্ততঃ সমালোচনা না করিয়া ছাড়েন না। কবিতা রচনাও যে না করেন এমনও নহে, তাহাতে জ্যোৎস্না থাকে, মলয় থাকে, অনেক শব্দময় কি-যেন-কি এবং বিবিধ অবোধ্য রহস্য অর্থাৎ সুললিত পদবিন্যস্ত অ-ভাবও থাকে এবং এ সকল সত্ত্বেও মতভেদ ঘুচে না—কেহ বলেন শ্লোক, কেহ বলেন ছড়া, কেহ বলেন দুয়ের বাহির এবং কেহ কেহ এমনও বলেন যে, ভাব অতি গভীর বলিয়াই ভাষা একেবারে অর্থহীন দুরায়ত্ত।

এই ফেসানানুসারী রহস্য-দলই বর্ত্তমান বাঙ্গালায় সেন্টিমেণ্ট্যাল্ পদবাচ্য। কবির অভিনয়ই সেন্টিমেণ্ট্যালের প্রধান লক্ষণ। সকলে কিছু আর কবির প্রতিভা লইয়া জন্মে নাই, অথচ কবি হইবার সাধ অনেকেরই আছে; সুতরাং আর কিছুতে হউক না হউক, কবির ভাবভঙ্গীর এক প্রকার অসঙ্গত অনুকরণ করিয়াই তাঁহাদিগের সাধ মিটাইতে হয়। মৃদু চাহনিতে, অধরের ঈষৎ চাপা হাসিতে, কথাবার্ত্তার ভাবে, দাঁড়াইবার কেতায়, বসিবার

ধরণে, আলস্যে, ঔদাস্যে, যথাসাধ্য কবিয়ানা করা চাহি—সর্ব্বদাই ভয়, পাছে লোকে নীরস অকবি ঠাহরাইয়া বসে, পাছে কেহ বলে, লোকটা যথেষ্ট কবি নয়, পৃথিবীর সাধারণ মানবের মত কাজের লোক, ঘর সংসারের বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে, বেশ কাজকর্ম্ম বুঝে। যেন সাংসারিক কাজকর্ম্ম বুঝিলেই বুদ্ধির হ্রাস হইয়া আসে, হৃদয় সহৃদয়তা হারায়, মানব দানব হইয়া দাঁড়ায়। কবি হইতে গেলে যেন আইন প্রণয়নপূর্ব্বক সাধারণ বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সাধারণ বাহ্যজ্ঞান পরিহার করিতে হইবে, সাধারণ সুখ দুঃখ—বিশেষতঃ সুখ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে, আহারে, বিহারে, আচার ব্যবহারে, ধরণধারণে সৃষ্টিছাড়া না হইলে চলিবে না। এই ভাবিয়া সেন্টিমেণ্ট্যালেরা কবির সহিত না মিলাইয়া এক পদ অগ্রসর হয়েন না—জানি কি, কোথায় পদস্খলন হয়, লোকের কাছে প্রতিভা অপ্রতিভ হইবে।

কিন্তু ফলে, এই চালচলনেই অল্পদিন মধ্যে বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ক্ষমতা লইয়াই ত কবির সহিত সেন্টিমেণ্ট্যালের প্রধান প্রভেদ। একজন সক্ষম এবং প্রবল—আপন দুর্দ্দম্য ক্ষমতায় বিশ্বরহস্য মন্থন করিয়া মানবের হৃদয়ে আনন্দ বিতরণ করেন; আর একজন অক্ষম এবং অলস—কেবল সখটুকু মাত্র আছে, না আছে কুবেরভাণ্ডার, না আছে বিপুল সহিষ্ণুতা, শফরীবৎ আচরণমাত্র অবলম্বন। প্রতিভা সকলের নাই এবং আবশ্যকও নাই, কিন্তু ভাণ কেন? দোকানদার যদি কেবলমাত্র বসনভূষণের পারিপাট্যে আপনাকে সম্ভ্রান্ত বনিয়াদীবংশের বলিয়া চালাইতে চাহে, জনকতক নিরক্ষর মুটে মজুর অজ্ঞানতাবশতঃ দৈবক্রমে ভুলিলেও ভুলিতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া ভদ্রলোকের চক্ষে কি ধূলা দেওয়া যায়? সেন্টিমেণ্ট্যালেরা কতকটা বোধ করি কবির মোসাহেবের মত। কিন্তু আপন অবস্থা সম্বন্ধে অজ্ঞ। ইহাঁরা মনে করেন, সর্ব্বদা কবির মত ঘাড় নাড়িলে বা আকাশ পানে চাহিলেই কাজ হাসিল হয়। কিন্তু এ পৃথিবীতে ফাঁকিতে বড় কিছু হয় না। যদি বা হয় ত থাকে না। জানিয়া বা না জানিয়া কেহ যদি আপনাকে বিদ্রূপাত্মক করিয়া তুলে, পৃথিবী বিদ্রূপ করিতে ছাড়িবে না। তোমার তাহা মনঃপূত না হইতে পারে, নাচার। পৃথিবীর কিন্তু এই ধারা।

কবি ভাবের রাজা—ভাব এবং ভাষা উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। আকাশে চাহিয়া তাঁহার কবিত্ব নহে, জামার বোতাম না আঁটিয়া তাঁহার কবিত্ব নহে, কবিত্ব—ভাষায় ভাবের বিকাশে। সুতরাং বাহ্য অনুষ্ঠানে অবিকল অনুকরণ করিলেও কবি-পদ লাভ করা যায় না। কবিদের সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে কতকগুলি ভুল বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সেই জন্যই তৎপদলাভার্থে সেন্টিমেণ্ট্যালেরা অনেক অদ্ভুত কার্য্য করিয়া বসেন এবং যথেষ্ট হাস্যাস্পদও হয়েন। কবিতাপাঠে অনেকের মন বিকৃত হইয়া পড়ে। প্রেমে না পড়িলে আর চলে না,

অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ কল্পনার পঞ্চমে চড়িয়া থাকিতে হয় ; বিরহ চাহি, নৈরাশ্য চাহি, ছলছল বিদায় চাহি—নহিলে হৃদয়ের বিকাশ হইবে কেন ? কবিরা যে অহরহ প্রেম করিয়া বেড়ান, ফোঁপাইতে থাকেন, ইত্যাদি ইত্যাদি করেন, তাহা নহে—ইহা লইয়া থাকিতে গেলে কবিতা রচনার বোধ করি বড় অবসর হয় না—কিন্তু বাহির হইতে কাব্যে প্রেমের বাহুল্য দেখিয়া লোকে কল্পনা কলুষিত করিয়া কবিয়ানা করে। কবি আসলে প্রতিভাবলে অনেক বিষয় আয়ত্ত করেন। সৌখীন সেন্টিমেণ্ট্যালেরা না বুঝিয়া বিপদে পড়েন। কবির অথবা কাব্যের সে জন্য দোষ দেওয়া চলে না। এরূপ লঘুপ্রকৃতি লঘুচরিত্র লঘুতা প্রকাশ করিবেই—তা কবিয়ানা করিয়াই হৌক্ বা অন্য উপায়েই হৌক্। অসংযমই সেন্টিমেণ্ট্যালের প্রধান দোষ।

কবিতা লেখার সহিত সেন্টিমেণ্ট্যালের প্রধান সম্বন্ধ নহে। ভাবে ভঙ্গীতেই সেন্টিমেণ্ট্যালেরা ধরা দেন। এমন অবশ্য অনেক আছেন, যাঁহারা ভাল কবিতা রচনা করিতে না পারিলেও প্রকৃত কাব্য উপভোগ করিতে অক্ষম নহেন। ইহাঁদিগকে সেন্টিমেণ্ট্যাল বলা চলে না। সেন্টিমেণ্ট্যালের মধ্যে একটু ভাণ আছে, কৃত্রিমতা আছে, অন্ততঃ ছট্‌ফটানির কিছু আধিক্য। অনেক সময় নিষ্কর্ম্মা বেকার অবস্থায় থাকিয়া লোকে সেন্টিমেণ্ট্যাল হইয়া উঠে। সেন্টিমেণ্ট্যাল ধাতের পক্ষে এই জন্য কাজের অত্যন্ত আবশ্যক। সংসারের ঘানিতে জুড়িলে এ রোগ অল্প দিনেই উপশম হয়।

কবিকে কাজ করিতে হয়—প্রভু হইয়া তিনি সেন্টিমেণ্টের উপর আধিপত্য করেন। সেন্টিমেণ্ট্যালেরা প্রভু না হইয়া দাস হইয়া দাঁড়ায়। বৃহৎ ভাব বা মহৎ উদ্দেশ্যে অটল নিষ্ঠা দেখিলে আমরা এরূপ বলিতাম না। ডন্ কুইক্‌সোট্ নাইট্‌দিগের অনুকরণে আপনাকে হাস্যাস্পদ করিলেও তাঁহার ভাবে এমন নিষ্ঠা আছে যে, আমরা তাহাতেও মুগ্ধ হই। কিন্তু বাঙ্গালার এই অলস সেন্টিমেণ্ট্যাল দলের না আছে নিষ্ঠা, না আছে উদ্যম, না আছে আদর্শে উপনীত হইবার চেষ্টা। কেবল ফাঁকি দিয়া যো সো করিয়া লোকের নিকটে আপনাকে সমধিক উন্নত ও প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছা।

সত্যের সহিত সেন্টিমেণ্ট্যালদিগের সম্বন্ধ অল্পই। কবি সত্য সত্য অনুভব করিয়া বলেন, এই জন্য তাঁহার কথার এত গুরুত্ব। সেন্টিমেণ্ট্যালদিগের ভাব অনুভবও অনেকটা কাল্পনিক। এই জন্য তাহা নির্জ্জীব অনর্থপ্রসূ মাত্র। কল্পনা সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কবিতা বাহির হয় না। কল্পনাও যখন কাল্পনিক হইয়া দাঁড়ায়, তখন রোগের উৎপত্তি সন্দেহ নাই। সেন্টিমেণ্ট্যালের অবস্থা রোগের—স্বভাবের নহে ; বিকারের। কবি প্রকৃতির, সেন্টিমেণ্ট্যাল বিকৃতির ; কবি স্বাধীনতার, সেন্টিমেণ্ট্যাল উচ্ছৃঙ্খলতার ; কবি সরল প্রেমের, সেন্টিমেণ্ট্যাল রুগ্ন প্রেমাভিনয়ের।

সংক্ষেপে কবির সহিত সেন্টিমেণ্ট্যালের এই প্রভেদ। সেন্টিমেণ্ট্যালের আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ আছে। কিন্তু উপহাস বা বিদ্রূপ আমাদের উদ্দেশ্য নহে, সেই জন্য অনাবশ্যক বোধে এখানে তাহার উল্লেখ করা গেল না। আবশ্যক বোধ হইলে ভবিষ্যতে সে সম্বন্ধে আরও দুই চারি কথা বলা যাইতে পারে। এক্ষণে বিজ্ঞ সেন্টিমেণ্ট্যালগণ রোগ বুঝিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিলেই আমাদিগের শ্রম সফল জ্ঞান করিব। ['সাহিত্য,' জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮]

প্র্যাক্‌টিক্যাল্

ইহাঁরা প্রাকৃটিক্যাল্, অর্থাৎ পরম সাবধানী এক একটি বিজ্ঞ বক, ঝোপ না বুঝিয়া কোপ মারেন না, এবং কোপ দেখিলেই ঝোপে লুকান। সর্ব্বদাই সতর্ক এবং সন্দিহান, ছাতা ঘাড়ে, খাতা হাতে, মাথায় গোল-টুপি, পকেটে ছুরি কাঁচি, দড়াদড়ি, কাগজপত্র, এবং একখণ্ড নামের আদ্যক্ষরযুক্ত রুমাল মুখ বাড়াইয়া। দলের কেহ কেহ এখন চোখে চশমাও দেন এবং চশমার উপর দিয়া ভিন্ন দেখেন না। লোকের নাকের উপর যখন খাতা ধরেন, তখন অবিচলনপক্ষে চশমায় অনেকটা সহায়তা করে। একে ত স্বভাবতই চক্ষুলজ্জা ইহাঁদের কম, তাহার উপরে কাচের চশমা, সোনায় সোহাগা!

সাধারণের নিকট প্র্যাক্‌টিক্যাল্ বলিয়াই ইহাঁরা আপনাদের পরিচয় দেন, সুতরাং আমরাও তাহাই দিলাম। মা বীণাপাণির সহিত বিমাতৃসম্বন্ধ জ্ঞাপনার্থেই নাকি ইহাঁরা এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। কেহ এমন দুর্নাম না রটনা করে যে, ইহাঁদিগকে নিংড়াইয়া এক বিন্দু রস বাহির করা যাইতে পারে। কবিতা পড়েন না, কাব্যালাপ করেন না, আকাশে চাঁদ উঠিলে এবং উঠানে ঘাস গজাইলে, বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকেন, প্রেয়সীর প্রেমে মজেন না, উদরের বাহিরে বুঝেন না,—অন্ততঃ বুঝিবার কিছু আছে স্বীকার করেন না, এবং আপনার বাহিরে বুঝদার বলিয়া কাহাকেও মানেন না। প্র্যাকৃটিক্যালের এই সকল লক্ষণ। তবে গোপনে প্রেয়সীকে কে কি পত্র লেখেন, এবং তাহাতে কখন্ কি রস থাকে না থাকে, সে বিষয়ে আমরা কিছু বলিতে অক্ষম। এ পর্য্যন্ত ত কোনও প্রেয়সী আমাদের প্রতি কৃপাপরবশা হইয়া, তাঁহার প্র্যাকৃটিক্যাল্ প্রেয়ানের চিঠিপত্র দেখিতে পাঠান নাই। বোধ করি, পৃথিবীতে এরূপ সাধারণ-হিতৈষিণী প্রেয়সী নিতান্ত বিরলা। কিন্তু যেরূপ দিনকাল পড়িতেছে, এরূপ গুণসম্পন্না প্রেয়সীর ঐকান্তিক আবশ্যকসম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না।

কবির প্রতি প্র্যাকৃটিক্যাল্‌দিগের পিঠ-থাব্‌ড়ান ভাব। যেন কবিত্ব ছেলেমানুষী বৈ আর কিছুই নয়, কবি কেবল নির্ব্বোধের নামান্তর মাত্র। সুতরাং বিজ্ঞ প্র্যাকৃটিক্যালগণ কি করেন? তাঁহারা উপেক্ষাভরে একটু মুচ্‌কিয়া হাসেন, পিঠ থাব্‌ড়াইয়া বিজ্ঞতাসহকারে উপদেশ দেন, যথাসাধ্য পৃথিবীর হিতেচ্ছায় জ্যোৎস্না, ফুল, পাখী, বাতাসকে বিদায় দিতে অনুরোধ করেন। ছন্দে যদি একান্তই লিখিতে বাসনা থাকে, ম্যাঞ্চেষ্টারের দুরভিসন্ধি, বিলাতী পার্লামেণ্টে বাঙ্গালী প্রতিনিধি, রেলের গাড়ীতে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদের দুর্দ্দশা, কত ধানে কত চাল, কত প্র্যাকৃটিক্যাল বুদ্ধিতে কি পরিমাণে টপ করিয়া কার্য্যসিদ্ধি, এবং জ্যোৎস্না মলয় ইত্যাদি সৃজনে বিধাতা অতিবুদ্ধি প্র্যাকৃটিক্যালগণের কার্য্যসিদ্ধি-পথে কত দুস্তর বাধা-বিঘ্ন অর্পণ করিয়াছেন, এবং কাজের লোক প্র্যাকৃটিক্যালেরা এই সকল বিধাতৃবিহিত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কিরূপে অসাধ্যসাধন করেন, এই সকল হৃদয়োত্তেজক হিতকর বিষয়ের অবতারণা করুন।

অকূল সংসারে বাধাবিঘ্নের এইরূপ দারুণ প্রতিপত্তি হওয়ায় প্র্যাকৃটিক্যালদিগের সময়ের বড় টানাটানি, এমন কি, লোক দেখিলে নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পর্য্যন্ত থাকে না। হাতে কাজ কত! ঘড়ি খুলিতে বন্ধ করিতেই দিনে এমন কত সময় যায়! ইহার উপর আবার পকেটসাৎ করিতে সময় লাগে। আলস্য নাকি ইহাঁদের স্বভাবের নিতান্ত বিরুদ্ধ, তাই রক্ষা। এক দণ্ড ইহাঁরা স্থির হইয়া থাকেন না, নাকে মুখে চোখে কাজের হিসাব ফেনাইয়া উঠে। অবোধ লোকে ঠাহরায়, ইহাঁরা আপনার কথায় পাঁচ কাহন। কিন্তু অহঙ্কার ইহাঁদের এমনি অস্বাভাবিক যে, আত্মগোপন না করিয়া থাকিতে পারেন না, কেবল গোপন কার্য্যে তাদৃশী ব্যুৎপত্তি না থাকায়, আপনাকেই বার বার বাহির করিয়া বসেন। কিন্তু পাঠকেরা মনে রাখিবেন, সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছাপূর্ব্বক আদবেই নহে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্র্যাকৃটিক্যাল শব্দে আমরা বিষয়বুদ্ধির প্রতি আক্রমণ করিতেছি। কিন্তু এরূপ অভিসন্ধি আমাদের কুত্রাপি নাই। সকল প্রকার ভাণ এবং অতির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি। কবিত্বের সহিত সেন্টিমেণ্ট্যালের যেরূপ সম্বন্ধ, বিষয়-বুদ্ধির সহিত প্র্যাকৃটিক্যালেরও প্রায় সেই সম্বন্ধ। প্র্যাকৃটিক্যাল হওয়া একদল লোকের ফেসান। হাঁক, ডাক, দৌড়াদৌড়ি করিয়া কাজের ভাণে আপনাকে এবং অন্যকে প্রবঞ্চিত করাই ইহাদের কাজ। কাজ যে কখনও কিছু হয় না এমন নয়, কিন্তু গর্জ্জনই প্রবল। অতি সহজসাধ্য কাজও খুব গুরুতর করিয়া না করিলে চলে না। সেন্টিমেণ্ট্যালের মত ইহাদেরও একরূপ অস্বাভাবিক ছট্‌ফটানি দেখা যায়। প্রভেদের মধ্যে একদল কবিয়ানা করে, অপর দল কাজীয়ানা। ['সাহিত্য,' ভাদ্র ১২৯৮]

লণ্ডনে কংগ্রেস

ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধানতঃ দুই উদ্দেশ্য।

১। ভারতের জাতিগঠন।

২। ভারত শাসনকার্য্যে ভারতবাসীর অধিকার বিস্তার।

দুইটি উদ্দেশ্য পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ। জাতিগঠন না হইলে রাজকার্য্যে আমরা যতই অধিকার লাভ করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচে না। এবং স্বহস্তে দেশের কার্য্য করিবার অধিকার যদি প্রাপ্ত না হই, তবে জাতিগঠনের অবসর পাইব কি করিয়া?

গত ছয় বৎসরে কংগ্রেসের একটা কাজ হইয়াছে। ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি এক হইবার চেষ্টা করিতেছে। যে সূত্রে ভারতে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান জৈন পারসী সকলকেই বাঁধা যাইতে পারে, সেই ঐক্য-সূত্রটা যেন ধরিতে পারা গিয়াছে, এইরূপ সকলে অনুভব করিতেছেন। ইহাকেই বলা যাইতে পারে জাতিগঠনের প্রথম সূত্রপাত।

কিন্তু ভারতবর্ষের কংগ্রেস আপাততঃ ইহার অধিক যে কিছু করিতে পারিবে, আমাদের এরূপ বিশ্বাস নহে। ফলের প্রতি দৃষ্টি করিতে গেলে ভারতের কংগ্রেস প্রধানতঃ আমাদের স্বজাতীয়দিগকে শিক্ষিত ও জাগ্রত করিবার জন্য। এইখানে বলা আবশ্যক, জাতিনির্ব্বিশেষে সমস্ত ভারতবর্ষীয়ই কংগ্রেসের স্বজাতীয়।

কংগ্রেসের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, ভারত শাসনকার্য্যে উত্তরোত্তর কর্ত্তৃত্ব লাভ, এ উদ্দেশ্য এ দেশে থাকিয়া যে সিদ্ধ হইতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না।

সুতরাং লণ্ডনে কংগ্রেসের অধিবেশন আবশ্যক। নহিলে, ইংরাজ জাতির হৃদয়ে কংগ্রেসের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা সম্ভবে না। এবং তাহা না হইলেও ভারত-শাসনকার্য্যে আমাদের সহায়তা করিবার অধিকার দুর্লভ। উদারহৃদয় স্বাধীন জাতি আমাদের দুরবস্থা একবার সম্যক্ অনুভব করিলে এ অভাব মোচন প্রায় নিশ্চিত। স্বদেশ এবং বিদেশে যথাযোগ্য স্বাধীনতার পথ অবলম্বন করিয়াই ইংলণ্ডের গৌরব।

কিন্তু এইখানে কথা উঠিতে পারে যে, এ ভিক্ষালব্ধ অধিকারে ফল কি? কিন্তু ভিক্ষুকের পক্ষ হইতেও বলিবার কথা আছে। ভিক্ষায় চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় না সত্য, কিন্তু সাধ করিয়া ত কেহ ভিক্ষা করে না। আমরা এখন নিরুপায়। নিরুপায় বলিয়াই ভিক্ষা মাগিয়া উপায় করিতে হইতেছে। ইংরাজের অনুগ্রহ ভিন্ন আমাদের পথ বন্ধ।

উদাহরণ দিয়া বুঝাই। অস্ত্র আইনে আমাদের অস্ত্র ধারণ বন্ধ করিয়াছে। এখন আমরা যদি অভিমানপূর্ব্বক বলি যে, "হে ইংরাজ, এ আইন রহিত করিও না, আমরা অস্ত্রের ব্যবহার সম্যক্ শিখিয়া অস্ত্র ধরিব, তোমার অনুগ্রহ চাহি না," তাহা হইলে মনকে প্রবোধ দেওয়া হয় বটে। কিন্তু অস্ত্রধারণের অবসর বোধ করি কোনও কালে আসে না। সেইরূপ যদি বলি, "হে বৃটিশকেশরি, তোমার নিকট হইতে যাচ্ঞা করিয়া কোনও অধিকার লাভ করিব না এবং তোমার নিকট কোনও শিক্ষা লাভ না করিয়া একবারে চাণক্য হইয়া তোমার বিদ্যা মারিয়া লইব," তাহা হইলেও কোনও অধিকার লাভের সম্ভাবনা অনেকটা হ্রাস হইয়া আসে।

সুতরাং ভিক্ষাই যদি চাহিতে হয়, ইংলণ্ডে গিয়া মহতের দুয়ারে প্রার্থনাই শ্রেয়। সেখানে সফল হইবার সম্ভাবনা আছে। আর নিষ্ফল হইলেও "যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা।"

এংলো-ইণ্ডিয়ানেরা বহুকাল হইতে অপ্রতিহত প্রভাবে আমাদের উপর একাধিপত্য খাটাইয়া আসিতেছেন। এক সময়ে এই আধিপত্য আমাদের পক্ষে হয় ত আবশ্যক ছিল। কিন্তু তাঁহাদেরই প্রসাদে শিক্ষার সহিত আমাদের অবস্থার উত্তরোত্তর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অথচ আমাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে নানা কারণে তাঁহারা এখন ক্ষীণদৃষ্টি। সুতরাং আমরা যখন শিক্ষানুসারে অধিকার লাভ করিতে চাহি, এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভুগণ বহুকালপ্রচলিত সনাতন প্রথানুসারে নিদ্রালসনয়নে সকরুণ অবিশ্বাসের সহিত আমাদের প্রতি ঘন ঘন অনুগ্রহ-কটাক্ষপাত করিতে থাকেন। আমরা কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি।

বিদ্বেষবশতই যে এংলো-ইণ্ডিয়ান দল আমাদিগকে কোনও বিষয়ে অধিকার প্রদান করিতে চাহেন না, তাহা নাও হইতে পারে। যেমন কোন কোন অতিসাবধানী পিতা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকে সংসারের বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অপ্রাপ্তবয়স্কের মত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে শাসন করিয়া থাকেন, হয় ত এংলো-ইণ্ডিয়ান দলও সেইরূপ আমাদেরই হিত সাধনের জন্য সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আমাদিগকে নিরাপদ্ করিতে চাহেন।

আর অপ্রতিহত আধিপত্যও লোকে সহজে ছাড়িতে চাহে না। এংলো-ইণ্ডিয়ান প্রকৃতিও ত সাধারণ মানব-প্রকৃতির বহির্ভূত নহে। সেই জন্য আমাদের প্রার্থনার অনুকূলতা পক্ষে এখানে আশা বড় নাই।

অগত্যা বিলাতে আন্দোলন অনিবার্য্য। একাধিপত্যের প্রভাবে বিলাতবাসীর চরিত্র কলুষিত হয় নাই। তাঁহারা অপক্ষপাতিতার সহিত আমাদের যোগ্যতা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। সুতরাং যোগ্যতানুসারে সেখান হইতে কোনও অধিকার লাভের সম্ভাবনা তাদৃশ সুদূরপরাহত নহে।

আর যত দিন এ অধিকার লাভ না করি, তত দিন আমরাও ছাড়িব না। তোমরা না চাহিতে আমাদিগকে যে শিক্ষা দিয়াছ, এখন সে শিক্ষার অনিবার্য্য ফল হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবে, এ কেমন কথা? তোমাদেরই যত্নে পরিপুষ্ট হইয়া আমরা এখন হামাগুড়ি ছাড়িয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছি। এখন অহর্নিশি আত্যন্তিক স্নেহবশতঃ আমাদিগকে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ান দেখিতে তোমরা এত উৎসুক কেন? দুর্ল্লভ চরণযুগল লাভ করিয়া পঙ্গুর ন্যায় কি কেহ বসিয়া থাকিতে পারে? আমরা বার বার তোমাদের নিকট আবেদন করিব। ফল শীঘ্র হয় ভাল, না হয় আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না, দুই দিন পরেও অন্ততঃ আমরা ফল লাভ করিব।

এখানেও ত আন্দোলন আবেদনের ত্রুটি নাই। কিন্তু ছয় বৎসরের অহর্নিশি ক্রন্দনে যে ফল হয় নাই, মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন বক্তার বিলাতে এ বিষয় উত্থাপনে তাহাপেক্ষা ফল লাভ হইয়াছে। ইহা হইতে সহজেই বোধ হয়, নির্দ্দিষ্টসংখ্যক উপযুক্ত ডেলিগেট লইয়া বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে আমরা একেবারে নিষ্ফল হইব না।

আর আপাততঃ নিষ্ফল হইলেও বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে কোনও উপকার নাই এমন নহে। আর কিছু হউক না হউক, সে চিরনবীন উদ্যম এবং উৎসাহের মধ্যে আমাদের শিক্ষার বিষয় যথেষ্ট আছে। কংগ্রেসের যে এক শত জন ডেলিগেট বিলাতে আন্দোলন করিতে যাইবেন, তাঁহারা যে বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, সে বিষয়ে বড় সন্দেহ নাই। সেই জন্য তাঁহাদের মধ্য দিয়া সেই পাশ্চাত্য প্রবল উদ্যম এ দেশে খানিকটা আসিবার সম্ভাবনা। অন্ততঃ এই উদ্যম সংস্পর্শে কংগ্রেসের জীবনীশক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইহাও আমাদের পক্ষে সামান্য লাভ নহে।

কিন্তু ডেলিগেট যাইবে কে? এক শত জন ডেলিগেটের মধ্যে যে আচারনিষ্ঠ হিন্দু মিলিবে না, এমন বলা যায় না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে জাতিনাশের ভয় আছে। ইংলণ্ডে গিয়া জাতি হারাইতে লোকে সম্মত হইবে কেন? তথাপি বিগত কংগ্রেসরিপোর্ট পাঠে বোধ হয়, দেশের জন্য সামাজিক নির্যাতন সহিতে প্রস্তুত, এরূপ আচারনিষ্ঠ প্রকৃত হিন্দু এখনও অনেক আছেন।

আর বিলাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে এ অশাস্ত্রীয় নির্যাতনবিধিরও বোধ করি সংস্কার হইতে পারে। এই ত সে দিন সম্মতি আইনের গোলযোগের সময় দুর্দ্দিনের দোহাই দিয়া বিলাত গমনে জাতিরক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত হইতেছিল।

অতএব বৃথা অভিমান এবং মিছা তর্ক পরিহারপূর্ব্বক স্বদেশের হিতার্থে বিলাতে কংগ্রেস করিয়া ইংরাজ জাতির নিকট আমাদের যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। শিক্ষার সহিত আমাদের অধিকারের দারুণ অসামঞ্জস্য ইংরাজের হৃদয়ঙ্গম করাইতে না

পারিলে উত্তরোত্তর অসন্তোষ এবং অবিশ্বাস বৃদ্ধি পাইয়া উভয়েরই পক্ষে অমঙ্গলের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। তাই উঠ, জাগো এবং বিনা আড়ম্বরে নিরভিমানে কাজ করিয়া যাও। শক্তির যথাযোগ্য ব্যবহার কখনও ব্যর্থ হয় না। ['ভারতী ও বালক,' ভাদ্র ১২৯৮]

ঋতুসংহার

ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম রচনা—প্রথম রচনারই মত দোষে গুণে জড়িত; কাঁচা লেখায় এবং সরস বর্ণনায় তাহার পরিচয়। রচনায় এখনও সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ হয় নাই, সবে মাত্র অল্পদিন লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সকল সময়ে ছায়া আলোকের মৃদু স্পর্শে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চিত্র ফুটাইতে পারেন না; কিন্তু কবির প্রতিভা আছে, সৌন্দর্য্য তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া যায় না, ছায়ালোকসন্নিবেশে আভাসে সমস্ত ব্যক্ত না করিলেও যথাযথ সূক্ষ্ম বর্ণনায় সুনিপুণভাবে তিনি চিত্রটিকে খাড়া করিয়া তুলেন। মৃদুস্পর্শ আভাস ইঙ্গিতও যে না থাকে, এমনও নহে, যতই অল্প হৌক, শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় ইহা থাকিবেই। ঋতুসংহারেও আছে। প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া তিনি ঋতুর পর ঋতু বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—যথাসম্ভব স্পষ্ট, সরল এবং অনেক স্থলে কেবলমাত্র যাহা সহজে চোখে পড়ে, এইরূপ বাহিরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা। কিন্তু ইহারও মধ্যে প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের সুসম্বন্ধ ঐক্য বিশ্লেষণে তুলিকার অবহেল মৃদু স্পর্শে স্পষ্ট চোখে আঙ্গুল দিয়া না দেখাইয়াও আমাদের মনে বিবিধ সুসঙ্গত ভাবের উদ্রেক করিয়া দেন।

ইহাতেই কালিদাসের কবিত্ব। শুধু কালিদাসের বলিয়া নহে, সকল শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় ভাবপরম্পরায় পাঠকের মনে একটি সুশৃঙ্খল কাব্য রচিত হয়। কেবলি যথাদৃষ্ট বর্ণনা কবিতা নহে। ভাবে ভাবের উদ্রেক করে। কালিদাস যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আসাধারণ কিছুই নহে—এই গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্য্য, পরুষ পবনবেগ, বরাহ মহিষ প্রভৃতি বিবিধ বন্য জীবজন্তুর ক্লান্তিভাব, দাবানল, আর আদিরসে প্রবাসী, বিরহী বা স-সখীর মনানল; বর্ষায় বজ্র বিদ্যুৎ মেঘ, বিরহিণীর বিজন বিলাপ, দুই চারিটা কেতকী কদম্বের নীরব কাহিনী; না হয় বসন্তে মলয়পবন, কোকিলকূজন, বড় জোর নবযৌবনা প্রিয়তমার সুখের কথা এবং কুসুমশরের উল্লেখে গোটাকতক ফুলের নাম;—কিন্তু সাধারণ কথা হইলেও প্রত্যেক ঋতুর অন্তরের ভাব ফুটিয়াছে, কেবলি তাপে, বৃষ্টিতে বা নবকুসুমিত সহকারে বর্ণনা অবসিত হয় নাই। কালিদাস সহজ ভাবকে যথাযোগ্য সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

কিন্তু তথাপি ঋতুসংহারের লেখা কাঁচা—কুমারসম্ভবে বা মেঘদূতে ভাষার যেরূপ পরিপাটি বাঁধুনি, সেরূপ নহে। তবে এ লেখাও কালিদাসেরই পক্ষে কাঁচা। এবং সেই জন্যই বোধ করি, কাঁচা হইলেও ইহাতে যে কাব্যরস আছে, অন্যত্র তাহা দুর্ল্লভ। অন্যান্য অনেক কবির মত অলঙ্কারপ্রাচুর্য্যে, কৌশলময় শ্লেষে, এবং পুনঃ পুনঃ পুনরুক্তিতে পাঠকের মনে বলপূর্ব্বক ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা নাই। তাই নবীন অবস্থাতেই কালিদাসের বর্ণনা এমন সরস এবং সত্য। এবং গভীরতায় পরে রচিত গ্রন্থগুলির সমকক্ষ না হইলেও ঋতুসংহারেই উদীয়মান কবির অসাধারণ প্রতিভার প্রথম পরিচয়।

তবে বর্ণনার মধ্যে মধ্যে এমন কথাও অবশ্য আছে, যাহা না বলিলেও হয় ত চলিত। অর্থাৎ সে সকল কথার উল্লেখ না করিলে ঋতুবর্ণনার যে বিশেষ ত্রুটি হইত, এমন বলা যায় না। কিন্তু অতি সংক্ষেপে যাহা না বলিলে নয়, তাহাই বলিয়া এক একটি ঋতুর চিত্র খাড়া করিয়া তোলা কালিদাসের উদ্দেশ্য নহে। শকুন্তলায় ইহাই কর্ত্তব্য বটে; কারণ, বর্ণনা সেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আনুষঙ্গিক মাত্র। কিন্তু ঋতুসংহারের মত বর্ণনাকাব্যে দুই ছত্র অধিক বর্ণনা অসঙ্গত বলা সাজে না। আর প্রথম রচনায় বর্ণনার দিকে লোকের একটু ঝোঁক থাকেও।

কালিদাসের সকল কাব্যেই অল্পবিস্তর বর্ণনা আছে। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব প্রভৃতি গ্রন্থেও বর্ণনার কিছুমাত্র ত্রুটি লক্ষিত হয় না। কিন্তু ঋতুসংহারের সহিত তাহার একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। ঋতুসংহারে কালিদাস মধুপের মত ছয় ঋতুর অন্তরে বসিয়া কেবলি আদিরসে মধুপান করিয়াছেন। বাহিরের জনকোলাহল, জীবন মরণ, সুখ দুঃখ তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই। জগৎ তিনি যতটুকু দেখিয়াছেন, এই ফুলের উপর বসিয়াই। আর মহাকাব্যের বর্ণনা স্বতন্ত্র। ভ্রমর চাক ছাড়িয়া আকাশে বাহির হইয়াছে; নিম্নে ধরণীর যৌবনবিস্তার, জনকোলাহল, জন্ম মৃত্যু। দূর হইতে ভ্রমর এই সকল দেখিয়া শুনিয়া যে গান গাহে, তাহাতেই মহাকাব্য রচিত হয়।

কিন্তু মেঘদূতের সহিত ঋতুসংহারের তাহা হইলে প্রভেদ কোথায়? মেঘদূতও ত আদিরসপ্রধান খণ্ডকাব্য। আর সমস্তটাই বর্ণনাও বটে। কিন্তু প্রভেদ আছে। মেঘদূতে মানবহৃদয়েরই প্রাধান্য। কালিদাস বিরহীর হৃদয়ে বসিয়া বর্ষার প্রভাব অনুভব করিয়াছেন। ঋতুসংহারে বাহ্য জগতেরই প্রাধান্য। বহিঃপ্রকৃতির অন্তরে বসিয়া কালিদাস মানবহৃদয় অনুভব করিয়াছেন। এই জন্য হৃদয়ও এখানে বর্ণিত হইয়াছে মাত্র। মেঘদূতে মৃদু স্পর্শে অনেকটা ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়। বর্ণনা সেখানে বিরহের অধীন। গীতিকাব্যের সহিত বর্ণনা-কাব্যের এই প্রভেদ।

ঋতুসংহার আদিরসে ছয় ঋতুর ছয়টি নাতিসংক্ষিপ্ত বর্ণনা। আদিরস বৈ অন্য রস এখানে ফুটিবার কথাও নয়। বীর, করুণ বা অন্য রস ঘটনাবৈচিত্র্য অবলম্বন না করিয়া বড় স্ফূর্ত্তি পায় না। বর্ণনা কতকটা প্রকৃতির, কতকটা মানবের, কতকটা সমস্ত জীবজগতের। প্রকৃতিকে কালিদাস দুই ভাবে দেখিয়াছেন—কোথাও অনেকটা জড়ভাবে, অন্যত্র চেতনধর্ম্ম আরোপ করিয়া স্ত্রীরূপে। প্রকৃতির প্রতি তাঁহার অগাধ প্রেম। শকুন্তলায় পাঠকেরা তাহার পূর্ণ পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু পাশ্চাত্য কবিদিগের মত আমাদের কবিরা জানিয়া শুনিয়া প্রকৃতিকে ভালবাসেন না। সেই জন্য প্রকৃতিকে ভালবাসি, এমন কথা তাঁহাদের মুখে শুনা যায় না, কাব্যের প্রতি ছত্রে ভালবাসা ব্যক্ত হয়। এবং এই অজানা অনুরাগেই আমাদের কাব্যে প্রকৃতির অন্তরে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা।

ঋতুসংহারেও তাহাই। তাই মানবহৃদয়ের উপর এই প্রকৃতির প্রভাব। কালিদাস প্রতি ঋতুতে আমাদের ভাবের পরিবর্ত্তন দেখাইয়াছেন। আর তাঁহার বর্ণনা বিলাসে ভরপূর। তাহাতে সে সমাজের বিলাসিতার ছায়া পড়িয়াছে। পাঠকেরা ঋতুসংহারের বর্ণনায় সর্ব্বত্রই তাহার পরিচয় পাইবেন। চাই কি, পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তুলনা করিয়া দেখিতে পারেন।

ঋতুসংহারের সর্ব্বপ্রথমে গ্রীষ্মবর্ণনা। প্রচণ্ডসূর্য্য স্পৃহণীয়চন্দ্রমা দিনান্তরম্য নিদাঘকাল আসিয়াছে, তাই কবি প্রিয়জনকে সম্বোধন করিয়া তাহারই কথা বলিতেছেন। এ দারুণ গ্রীষ্মে আর কিছুই ভাল লাগে না ; কেবলই সুশীতল জল, সুবাসিত মনোরম হর্ম্ম্যতল, আর প্রিয়জনের মুখচন্দ্র ত আছেই—কারণ, জল এবং হর্ম্ম্যতল অপেক্ষা তাহা শতগুণে স্নিগ্ধ ও মধুর। প্রিয়জনেরাও এ দারুণ গ্রীষ্ম মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেন—গরমে মোটা কাপড় গায়ে রাখিতে পারেন না, যথোচিত সূক্ষ্ম বস্ত্র ব্যবহার করেন, এবং ইহাতে অলঙ্কারের শোভা বিস্তারেরও অনেকটা সহায়তা করে। অলঙ্কার এমন কিছু নয়, নূপুরটি মেখলাটি, দুইগাছি বলয়-কঙ্কণ, আর এটি সেটি ; সে কালের যেমন ফেসান ছিল, ইহার উপর একছড়া করিয়া হার, বড় জোর বেল বকুলের মালা—মালিনীর যখন যেরূপ অনুগ্রহ হয়। কালিদাসের হাতে বলিয়া আমরা তবু অনেক অলঙ্কারের নাম হইতে বঞ্চিত হইয়াছি—তিনি তাদৃশ অলঙ্কারবাহুল্যপ্রিয় নহেন—নহিলে হয় ত এই গ্রীষ্মবর্ণনা মন্থন করিয়া প্রাচীন কালের বিবিধ গুরুভার অলঙ্কাব সম্বন্ধে আমাদের বিস্তর সগর্ব্ব জ্ঞান লাভ হইত। কালিদাস অলঙ্কারকুলের মধ্যে হারযষ্টিকেই একটু প্রাধান্য দিয়াছেন। আর তাঁহার নজর ছিল, কোমলাঙ্গিনীদের অলক্তকরঞ্জিত দুইখানি বিকশিত শ্রীচরণকমলে। চন্দনের সৌরভেও তাঁহার কিছু টান দেখা যায়।

এই গেল সাজসজ্জার উপকরণ। রূপও বড় কম নয়। চন্দ্রমা সারা নিশি সুন্দরীদের সুখসুপ্ত মুখগুলি দেখিয়া নিশাক্ষয়ে লজ্জায় পাণ্ডুতা প্রাপ্ত হয়েন। ঋতুসংহারের সুন্দরীদের এই প্রধান সৌন্দর্য্যবর্ণনা। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য প্রধানতঃ আদিরসোদ্দীপক—অন্ততঃ সে রূপ আদিরসের নায়িকাদিগেরই উপযোগী। কালিদাস দুইরূপ রমণীর বর্ণনা করিয়াছেন—কামিনী এবং বিরহিণী। প্রথমোক্ত সুন্দরীদেরই বেশভূষার পারিপাট্য। শেষোক্তেরা কৃশা মলিনা, অন্তরেও সুখ নাই, বাহিরেও বেশবাহুল্য নাই। কোনও প্রকারে পথ চাহিয়া দিন কাটান মাত্র। গ্রীষ্ম তবু ভাল, বর্ষা আসিলে ইহাঁদের অবস্থা নিতান্তই শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়।

রূপসীদের ত এই অবস্থা। কিন্তু রূপসী ভিন্ন আরও অনেক সৃষ্ট পদার্থের উপর গ্রীষ্মের প্রখর প্রভাব দেখা যায়। ফণী ময়ূরের পদতলে পড়িয়া থাকে, ময়ূর কিছু বলে না; ভেকেরা ফণাতপত্রের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, নাগিনী দংশন করে না; বরাহেরা উত্তাপে ম্রিয়মাণ, গর্ত্ত খনন করিয়া কর্দ্দমের উপরে বসিয়া থাকে; সকলেই শ্রান্ত ক্লান্ত—উদ্যম আর নাই। পরুষ পবনবেগে চারি দিকে ধূলি আর শুষ্ক পত্র উড়িতেছে। বনে দাবানল, দেহে ক্লান্তি, মনে চাঞ্চল্য। এত কষ্টেও তবু একটু সুখ আছে—নিদাঘের সন্ধ্যা মলয় জ্যোৎস্না। তাই কবি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, হর্ম্ম্যপৃষ্ঠে সুললিত সঙ্গীতে সুন্দরী প্রেয়সীর সহিত সুখে তোমরা নিশি যাপন কর।

কিন্তু চিরদিন এইরূপ ভাবে কাটিবে না। দেখিতে দেখিতে বর্ষা আসিয়া উপস্থিত। কালিদাস বর্ষার খুব গম্ভীর বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ষা রাজার মত—সৈন্য সামন্ত, হয় হস্তী, বিদ্যুৎ অশনি লইয়া খুব ঘটা করিয়া আসে। ধরণী বর্ষাগমে শুক্লেতররত্নভূষিতা হইয়া বরাঙ্গনার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। বিরহের ভাব এই সময়ে বড় প্রবল। তাই নদী পূর্ণযৌবনে প্রবলবেগে সিন্ধু পানে ছুটিয়াছে; অভিসারিকা বজ্রবিদ্যুতের মধ্য দিয়া একাকিনী প্রিয়সন্দর্শনে চলিয়াছেন;—প্রাণের টানে বিপদ্‌ভয় আর কে মানে? কেবলি বিরহিণীর অন্তরে একেবারে নৈরাশ্য। অহর্নিশি ঝম্‌ঝম্ ঝম্‌ঝম্ যতই বৃষ্টি পড়িতে থাকে, সেই প্রবাসক্লিষ্টের জন্য বিরহিণীর মন উদ্বিগ্ন হয়।

কিন্তু বিরহের কথা এখানে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। কালিদাসের মত বিরহের কবি পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। মেঘদূতেই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। ঋতুসংহারেও তিনি বিরহের যেখানেই উল্লেখ করিয়াছেন, কবিত্ব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বর্ষা কালিদাসের বিশেষ প্রিয়।" বর্ষার কবি তাঁহার সমকক্ষ পৃথিবীতে নাই। কেবলই যে বিরহের জন্য, এমন বলা যায় না। কিন্তু যে জন্যই হৌক্, তাঁহার বর্ষাবর্ণনা বড় সুন্দর। ঋতুসংহারের বর্ষাবর্ণনাতেই কালিদাসকে সর্ব্বাপেক্ষা ধরা যায়। ময়ূর

ময়ূরীর নৃত্যে, ভেককুলের অবিরাম কণ্ঠধ্বনিতে, কদম্বসৌরভে, মেঘাচ্ছন্ন গগনতলে গম্ভীর গর্জ্জনে তাঁহার বর্ষা ফুটিয়াছে। অন্তরে বাহিরে, মানবহৃদয়ে প্রকৃতিতে তাহার প্রভাব। শেষ আশীর্ব্বাদশ্লোকে তাহা সুস্পষ্ট অভিব্যক্ত।

"বহুগুণরমণীয়ো যোষিতাং চিত্তহারী
তরুবিটপলতানাং বান্ধবো নির্ব্বিকারঃ।
জলদসময় এষ প্রাণিনাং প্রাণহেতু-
র্দ্দিশতু তব হিতানি প্রায়সো বাঞ্ছিতানি ॥"

পাঠকেরা এ বর্ষার সহিত মেঘদূতের বর্ষা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

বর্ষার পরে শরৎ, এবং তাহার পর হেমন্ত, শীত এবং বসন্ত বর্ণনা। বর্ষার মত জমাট ঋতুও নাই, এরূপ জমাট বর্ণনাও হয় না। কিন্তু শরতে হেমন্তে শিশিরে বসন্তেও কালিদাসের কবিত্বের ত্রুটি হয় নাই, এবং আগাগোড়া সমস্তই আদিরসে সমান চলিয়াছে। শরতের বর্ণনার প্রথমেই কালিদাসের সূক্ষ্ম বর্ণজ্ঞান প্রকাশ পাইয়াছে। শুধু বর্ণজ্ঞান নহে, ভাব হৃদয়ঙ্গমে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা। শরৎকে দেখিয়াই তাহার নববধূভাবে কালিদাস মুগ্ধ। দুইটি মাত্র কথায় তিনি শরতের যথাসম্ভব সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন—"কাশাংশুকাবিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা" আর "আপক্বশালিললিতাতনুগাত্রযষ্টিঃ"। ক্রমে অনেক বর্ণনাও আছে—শরতের নির্ম্মল আকাশ, সুধাবর্ষী চন্দ্র, স্নিগ্ধ বায়ু, অঙ্গনাগণের মনোভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। কালিদাস যে দেখিয়া লিখিয়াছেন, পরের মুখে শুনিয়া লিখেন নাই, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। স্ত্রীরূপে যেখানে যেখানে তিনি শরতের বর্ণনা করিয়াছেন, খুঁজিয়া দেখিলেই পাঠকেরা তাহার বিস্তর পরিচয় পাইবেন। আমরা শরৎ-রজনীর বর্ণনা হইতে অমনি দুই চরণ উঠাইয়া দিই, পাঠকেরা কালিদাসের বর্ণনারও পরিচয় গ্রহণ করুন।

"জ্যোৎস্নাদুকূলমমলং রজনী দধানা
বৃদ্ধিং প্রয়াত্যনুদিনং প্রমদেব বালা ॥"

এ বর্ণনা আপাততঃ আমাদের নিকট তেমন আশ্চর্য্য ঠেকে না, কিন্তু ইহারই মধ্যে কবির নিখুঁৎ হিসাব দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। অন্য কবি হইলে শেষ চরণটি তাঁহার মাথায় আসিত কি না সন্দেহ। কিন্তু কালিদাসের এই এক প্রধান গুণ যে, প্রতি সামান্য খুঁটিনাটিও তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না।

হেমন্ত এবং শিশিরবর্ণনা কালিদাস কিছু সংক্ষেপে সারিয়াছেন। সংক্ষেপ বটে, কিন্তু নিতান্ত একেবারে দুই কথায় নয়। সর্ব্বশুদ্ধ তবুও গুটি পঁয়ত্রিশ শ্লোক হইবে। কালিদাসের এ সময়ের বর্ণনা আমাদের বাঙ্গালা দেশে বড় খাটে না। কারণ, আমাদের ত

আর তুষারের সম্পর্ক নাই। শিশির-বর্ণনায় মদ্যপানেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আর যেরূপ সব বর্ণনা, তাহাতে সে কালের বিলাসিতার চূড়ান্ত পরিচয়। কালিদাস সহরের লোক, চিরদিন রাজসভায় তাঁহার দিন কাটে, এ সকল বিলাসিতা ত তাঁহার চক্ষে অষ্টপ্রহরই পড়িয়া থাকে। সুতরাং কাব্যেও স্থান না পাইয়া যায় না। উপযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের হাতে পড়িলে এই বর্ণনা মন্থন করিয়া সে সময়ের গৃহ, সাজসজ্জা, জাতির অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্যও বাহির হইতে পারে। আমরা কেবলি দেখিতেছি, কালিদাসের কবিত্ব, প্রকৃতির প্রতি তাঁহার নিত্য অনুরাগ, এ ঋতু সে ঋতু নাই, সকল ঋতুতেই তিনি সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া মুগ্ধ। আমাদেরও তাঁহার বর্ণনা পড়িয়া সেই অবস্থা। ক্রমাগত উদ্ধৃত করিতে সাহস হয় না, নহিলে অর্দ্ধেক বর্ণনা উঠাইয়া দিয়া পাঠকদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইতাম।

বসন্তবর্ণনাই কালিদাসের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। বর্ণনার অনেক বিষয় পাইয়াছেন—জ্যোৎস্না, মলয়, কুসুম, কোকিল, মদন, ভ্রমর, যৌবন। বর্ণনাও তেমনি, বসন্তের তরঙ্গভঙ্গে, সৌরভে, রসে, মলয়ে, জ্যোৎস্নায় বাসন্তী ছন্দে বহিয়া গিয়াছে। জয়দেবের বাসন্তী ছন্দের মত ললিত অনুপ্রাসে কালিদাসের ছন্দ ভরিয়া উঠে না। তাঁহার ছন্দ, তাল লয় রক্ষা করিয়া সমধিক মধুর। কেবলি টানাটানা দীর্ঘচ্ছন্দ ললিত হইলেও এমন মধুর নহে। অথচ বসন্তের ছন্দ বর্ষার সহিত তুলনায় লঘু। কালিদাসের ছন্দে ভাবে কথায় এমন আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য অনুভব হয়। পরস্পরের মধ্যে কোথাও তিল মাত্র বিরোধ নাই। বসন্তের ছন্দ বসন্তের ভাবের মত লঘু এবং চারু। তাই প্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া "সর্ব্বং চারুতরং বসন্তে"। এই চারু ভাবের মধ্যে কেবলি সুখ। বর্ষায় যেমন সুখী জনের অন্তরেও পূর্ণ সুখ উদয় হয় না, যতই সুখসম্ভোগ কর না কেন, তাহার মধ্যে দুঃখ কষ্ট থাকিবেই, বসন্তেও সেইরূপ দুঃখের মধ্যেও সুখের ভাব বিদ্যমান। সুখই বসন্তের সর্ব্বস্ব। তাই বসন্তে তোমাদিগের সুখকামনা করিয়া কবি ঋতুসংহারের উপসংহার করিয়াছেন। কবির কামনা সফল হোক্ :—

"ভবতু তব বসন্তঃ শ্রেষ্ঠকালঃ সুখায়।"

['সাধনা,' অগ্রহায়ণ ১২৯৮]

জানালার ধারে

বাগানের উপরেই আমার ঘর।

ছোট খাট ঘর, অল্পেতেই মনের মত করিয়া গুছাইয়া লওয়া যায়, বিশেষতঃ ঘরটি বাড়ীর এক কোণে, সহজেই মন বসে। আমি নিজের মনোমত এটি সেটি দিয়া ঘর সাজাইয়াছি, আস্‌বাব যৎসামান্য, পাঁচ জন ভদ্রলোককে হয় ত সসম্মানপূর্ব্বক এ ঘরে আহ্বান করা যায় না, কিন্তু আমি ইহাতেই বেশ সন্তুষ্ট।

ঘরের এক কোণে একটি কাচের আল্‌মারি, কতকগুলি বই সাজান, অপর পার্শ্বে একখানি পালঙ্ক, বিশেষ ক্লান্তি বোধ হইলে বই হাতে অর্দ্ধশয়ানভাবে শিথিল তনু তাহারই উপর ছড়াইয়া দিই, আর এক কোণে একটি ছোট্ট ডেস্ক, সম্মুখে কেদারায় বসিয়া আমি লিখি।

জানালা খোলা থাকে, প্রভাতের আলো আসে, মধ্যাহ্নের উত্তাপ আসে। সন্ধ্যাবেলা কোন কাজ করি না, এক এক দিন চুপিচাপি একেলাটি কেদারা হেলান দিয়া বসিয়া থাকি, আমার কোলের উপর অস্পষ্ট চন্দ্রালোক আসিয়া পড়ে।

কিন্তু আমার ঘরটি তত নিরিবিলি নয়। পথের ধারে না হইলেও জনকোলাহল এখানে যথেষ্ট আসে। আর নীচে বাগানের পথ দিয়া লোকজন সারা ক্ষণই আনাগোনা করে, হাসি, গল্প, কথাবার্ত্তা, রসিকতা, অনেকরকম শুনা যায়। লেখায় যখন সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করিতে না পারি, সাসী অর্দ্ধেক বন্ধ করিয়া দিয়া আমি এই কথাবার্ত্তা শুনি।

আমার জানালার সম্মুখেই অনতিদূরে একটি দালিমগাছ, লাল লাল ফুলে আপনার গোপন যৌবন ব্যক্ত করিয়াছে, তাহারই তলদেশে বাড়ীর চাকরেরা এক এক দিন বৈকালে জটলা করে।

আমার তাহাতে দুঃখ নাই। দিবসের শেষ ভাগে এরূপ লোকসমাগমে দৃশ্যের একটুকু বৈচিত্র্য সাধিত হয়। গাছপালা যতই দেখি, মানবের স্নেহপ্রেমের সহিত, সুখ দুঃখের সহিত জড়িত না হইলে তাহার অর্দ্ধেক শ্রী ব্যর্থ।

গাছপালাও ত কত! এই দালিমগাছের সহিত চিরসখ্যে আবদ্ধ বাহুতে বাহু বেষ্টন করিয়া একটি পেয়ারাগাছ, আর এক প্রান্তে একটি নাতিদীর্ঘ বিল্বতরু—ফলভারে অবনত। সহরের মধ্যে এক রত্তি ফাঁকা জমি আর একটুকু সবুজ রঙের সংস্পর্শ থাকিলেই লোকে বড় করিয়া বাগান বলে, আমিও তাই বলি। সকলের মতের বিরুদ্ধে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।

সন্ধ্যাবেলায় বাগানে কেহই থাকে না। গলির ওপাশে প্রাচীন জীর্ণ অট্টালিকার নিভৃত কক্ষে মিটিমিটি একটি প্রদীপ জ্বলে। কম্পিত দীপালোকে ছায়ার মত কেবলি নিঃশব্দ আনাগোনা অনুভব হয়, কিন্তু জানালার ধারে বসিয়া কাহাকে ত দেখিতে পাই না।

যে দিন জ্যোৎস্না হয়, প্রস্ফুটিত দালিমপুষ্পের পেলব যৌবনের উপর দিয়া তরল রজতধারা পিছলিয়া যায়, কচি কিসলয়ে শুভ্র কিরণস্পর্শ শিশিরবিন্দুর মত ঝিকিমিকি করে, আর মলয়হিল্লোলে এই রজতবর্ণা তরল প্রেমধারা আমার জানালার কাছে আসিয়া, আমার কোলের উপর, মুখের উপর পড়িয়া এই বিমল নিশীথ-উৎসবের কথা বলে।

আমি কেবলি জানালার ধারে বসিয়া বসিয়া দেখি, আর অনুভব করি। রজতপ্লাবিত নীল আকাশ, জ্যোৎস্নাবগুণ্ঠিতা নীল নিশীথিনী, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ব্যাপিয়া এক অনন্ত জ্যোৎস্নালোক, আমার এই ঘরে শুধু চঞ্চল আলোকবিস্তারের পার্শ্বে সুখসুপ্ত নিভৃত ছায়া।

সীমাহীন ছায়াহীন বাহিরের অগাধ রূপরাশি আমাকে বাহিরে টানে, গৃহ হইতে জগতে লইয়া যাইতে চায়, আমার গৃহকোণে এই নিভৃত মলিন ছায়া ম্লান নীরব কাতরতায় আমাকে বাঁধিয়া রাখে। আমি সংসারের সুখের মাঝে বাহির হই না, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানবহৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি।

['সাধনা,' অগ্রহায়ণ ১২৯৮]

বুদ্ধদেব*

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে রীতিমত ইতিহাস ছিল না, সেই জন্য আমাদের প্রাচীন মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু জানিবার বড় অসুবিধা। অনেক সময় যে সকল কথার উপর নির্ভর করিয়া আমরা তাঁহাদের মতামত নির্ণয় করিতে বসি, সে সকল কথা কল্পনার অতিরঞ্জন বা অন্ধতার ভ্রান্ত সংস্কার মাত্র। রামদাস বাবু তাই অতি সাবধানে এই সকল কথার প্রামাণিকতা বিচার করিয়া বুদ্ধদেবের একখানি সুন্দর জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন। রামদাস বাবুর রচনার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে কোথাও গায়ের জোরে কথা বলা নাই, পাঠকের সম্মুখে তিনি যাবতীয় ঘটনা এবং বিবিধ কাহিনী উপস্থিত করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার অবসর দিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের কালনিরূপণ লইয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে অল্পবিস্তর মতভেদ আছে, কিন্তু মোটামুটি তাঁহারা সকলেই প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধের কাল

* বুদ্ধদেব। ৺ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত।

নির্দ্দেশ করেন। রামদাস বাবু রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রচলিত কল্যব্দ অবলম্বন করিয়া দেখাইয়াছেন যে, য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের গণনায় যে কাল নির্দ্দিষ্ট হয়, বুদ্ধদেবের জন্ম তাহার পূর্ব্বে। কিন্তু তথাপি বুদ্ধের জন্মকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। কারণ, প্রমাণগুলি অগ্রাহ্য না হইলেও সম্পূর্ণ নিঃসংশয় নহে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে বুদ্ধের আবির্ভাব, এবং ইহার পূর্ব্বে নহে।

বুদ্ধদেব ভারতের সম্ভ্রান্ত শাক্যরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন—তাঁহার পিতা শুদ্ধোদন কপিলবস্তুর প্রবলপ্রতাপ অধীশ্বর, জননী মায়াদেবী রাজর্ষিকুলোদ্ভবা। বৌদ্ধগ্রন্থে শাক্যবংশ প্রাচীন সূর্য্যবংশেরই শাখা এবং সুজাত রাজার নির্ব্বাসিত পুত্রগণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বুদ্ধ ভূমিষ্ঠ হইবার সাত দিনের মধ্যে মায়াদেবীর মৃত্যু হইল। বৌদ্ধগণের বিশ্বাস, বোধিসত্ত্বের জননীর মৃত্যু অনিবার্য্য, পূর্ণেন্দ্রিয় পূর্ণজ্ঞান সন্তান প্রসূত হইলে প্রসূতির হৃদয় স্ফুটিত হয়। বুদ্ধ লুম্বিনী উদ্যান হইতে রাজভবনে আনীত হইয়া মাতৃষ্বসার স্নেহে দিনে দিনে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। যথাসময়ে বিদ্যাশিক্ষার্থে গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন, যথাকালে শিক্ষা সমাপ্ত হইল, এবং শ্রীমতী গোপার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি গৃহধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে এ পর্য্যন্ত অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। প্রথমেই ত বুদ্ধদেব ভূমিষ্ঠ হইতেই দ্যুলোক এবং অন্তরীক্ষ হইতে দেব গন্ধর্ব্ব অপ্সরী কিন্নরী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধাত্রীর কার্য্য অপ্সরাগণের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইল। এবং জন্মজ্ঞানী বুদ্ধদেব চতুর্দ্দিকে এক এক বার সপ্তপদ পরিচালন করিয়া অবিলম্বে উপদেশ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাহার পর যে দিন বুদ্ধকে লুম্বিনীবন হইতে রাজভবনে আনয়ন করা হয়, অন্তরীক্ষে দেবগণ কেবলি বিবেক এবং বুদ্ধ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন, ধরণীতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল, আর অলৌকিক মঙ্গলাচরণ কিছুরই ত্রুটি হয় নাই। বালক বুদ্ধের এমনি প্রভাব যে, দেবদর্শনার্থে তাঁহাকে যখন মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়, দেবপ্রতিমাসকল চরণে আসিয়া প্রণাম করে।

এইরূপ বিস্তর অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ দেব ব্রাহ্মণের উপর বুদ্ধের প্রাধান্য স্থাপিত করেন। কিন্তু অলৌকিকতা-বাহুল্যেই বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমে বিস্তর রূপান্তর ঘটিয়াছে। এবং বর্ত্তমানে জ্ঞানালোচনা রুদ্ধ হইয়া মূর্ত্তিপূজাদির প্রাধান্যেরও ইহাই প্রধান কারণ।

বঙ্গীয় পাঠকেরা বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী মোটামুটি সকলেই একরূপ জানেন। এখানে তাহার বিস্তারিত পুনরুল্লেখ বাহুল্য মাত্র। কিন্তু শিষ্যদিগের গোঁড়ামি এবং

অতিনিষ্ঠা হইতে বুদ্ধ সম্বন্ধে সাধারণ্যে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত হইয়াছে। যেন বেদ এবং ব্রাহ্মণবিদ্বেষই তাঁহার উপদেশের সার, অহিংসা পরম ধর্ম্ম কেবল মাংসাহার নিষেধার্থে, জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষ বিপ্লবের ইচ্ছায়। কিন্তু বুদ্ধদেবচরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বুদ্ধ সম্বন্ধে আমাদের এইরূপ ছোট বড় অনেক ভ্রম ঘুচিয়া যায়।

সংস্কারকে বিদ্বেষমূলক জ্ঞান করিয়া আমরা অনেক সময় ভ্রমে পতিত হই। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে এ ভ্রম তাঁহার শিষ্যদল এবং বিরোধী পক্ষ, উভয়েরই দৃষ্ট হয়। বুদ্ধদেব জাতিবর্ণভেদ মানিতেন না এবং বেদকে ব্রহ্মবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতি অসম্মান এবং বেদের প্রতি অবজ্ঞা তাঁহার বাক্যে অথবা কার্য্যে কখনও প্রকাশ পায় নাই। বরঞ্চ বৌদ্ধগ্রন্থে মধ্যে মধ্যে তদ্বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যায়। শুদ্ধোদন যখন পুত্রের বিবাহদানে উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন যে, কিরূপ কন্যা তাঁহার মনোনীত, বুদ্ধদেব একটি গাথা রচনা করিয়া উত্তর দিলেন। সেই গাথায় তিনি মনোমত সহধর্ম্মিণীর রূপ ও গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতে পত্নীর নানা আবশ্যকীয় গুণের মধ্যে শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দাক্ষিণ্যও বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। জাতি বর্ণে যে তাঁহার কোনও আপত্তি নাই, তাহাও বলিয়াছেন।

বুদ্ধদেব তদানীন্তন সমাজের সংস্কারক ছিলেন—আপনাকে বড় করিয়া তোলা ত তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। আর সে কালে সমাজসংস্কার নাম কিনিবার উপায় ছিল না। সুতরাং নূতন একটা ব্যাপার করিয়া তুলিবার ভাণ তাঁহাকে করিতে হয় নাই। প্রাচীন ঋষিদিগের পদানুসরণ করিয়াই তিনি দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং পাতঞ্জলসূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে কিছুমাত্র হীনতা অনুভব করেন নাই। রামদাস বাবু বিস্তারিত আলোচনাপূর্ব্বক স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধের সাধনপ্রণালী ও তত্ত্বজ্ঞানের সহিত ঋষিদিগের সাধনা ও তত্ত্বজ্ঞানের বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। তবে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধের নাকি কোনও উপদেশ পাওয়া যায় না; তাই বোধ হয়, কেবলমাত্র আত্মতত্ত্ব ও জগত্তত্ত্বই তাঁহার সমাধির আলম্বন ছিল। পতঞ্জলি যোগীদিগের দ্বিবিধ ভাব্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ঈশ্বর এবং জড়াজড়তত্ত্ব। বুদ্ধদেব এই শেষোক্ত ভাব্যই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহা হইতে এমন প্রমাণ হয় না যে, বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যগণের কূট তর্কের উপর নির্ভর করিয়া ত বুদ্ধের মতামত বুঝিবার সুবিধা নাই। শিষ্যগণ চিরদিনই একটু বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। বেদকে অজ্ঞ মানবের প্রলাপবাক্য এবং বুদ্ধকে বেদবিদ্বেষী প্রতিপন্ন করিতেই শিষ্যগণের কিছু চেষ্টা অধিক। স্বরচিত গ্রন্থাদি না থাকায় বুদ্ধদেবের মতামত সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা দূর হইবার সম্ভাবনা বিরল। বৌদ্ধদের এখন মন্ত্র আছে, স্বর্গ আছে, নরক আছে, নাস্তিকতার পক্ষে এবং

বিরুদ্ধে মন্তব্য আছে; কতটুকু বুদ্ধের অনুমোদিত, কে বলিতে পারে? বুদ্ধের নামে পরবর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্যদিগের অনেক কথা এমন ধরাও পড়িয়াছে। রামদাস বাবুর গ্রন্থেই তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

মোটামুটি বোধ হয় বৈরাগ্যই বুদ্ধের ধর্ম্ম। শুধু বুদ্ধ নহে, ভারতীয় সংস্কারকদিগের অনেকেই বৈরাগ্যের সেবক। বুদ্ধের উপদেশে বৈরাগ্যের বিশেষ প্রাবল্য। তাই বলিয়া যে গৃহধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনা করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, তাহা নহে। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রমই তাঁহার প্রিয়তর। তাই নিজে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন, বহু বর্ষ পরে পুত্রকে সন্ন্যাসী করিয়াছিলেন, এবং প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে সন্ন্যাসিনী দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন। ভোগবিলাসের তিনি নিতান্ত বিরোধী। সন্ন্যাসাবলম্বী ভিক্ষুদিগের প্রতি তাঁহার বিশেষ উপদেশ :—দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইলে আহার করিবে। নাট্য, ক্রীড়া, সঙ্গীতাদি, এবং অলঙ্কার ও সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার হইতে বিরত থাকিবে। কোমল শয্যায় শয়ন এবং মণিমাণিক্য স্বর্ণরৌপ্যাদি গ্রহণ পরিত্যাগ করিবে। সঙ্গীতের প্রতি বিরাগ কোন কোন গ্রীক দার্শনিকেরও ছিল।

সাধারণের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ :—জীবহিংসা, পরদ্রব্যাপহরণ, পরদারকামনা, মিথ্যাচরণ এবং মাদকসেবন করিবে না। সকল ধর্ম্মেরই প্রায় এই উপদেশ। বুদ্ধের নীতি-উপদেশগুলি সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগেরই শ্রাব্য। আর এই সকল উপদেশ তিনি জীবনেই দেখাইয়াছেন। উপদেশ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে অসামঞ্জস্য বুদ্ধচরিত্রে কোথাও দৃষ্ট হয় না।

গল্প আছে, সাধনাবস্থায় কামের সহিত বুদ্ধদেবের অনেক বার গুরুতর সংগ্রাম হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে তিনি কিরূপে দুরাচার কামকে পরাজিত করিয়াছিলেন, বৌদ্ধগ্রন্থে তাহার বিস্তর বর্ণনা আছে। বুদ্ধের সঙ্কল্প কুঠারের ন্যায়, প্রস্তরের ন্যায়, শক্তির ন্যায়, বজ্রের ন্যায় দৃঢ়। গৃহ পরিত্যাগকালে ছন্দকের সহিত কথাবার্ত্তায় বুদ্ধ নিজেই এইরূপ বলিয়াছেন। বলিতেই বা হইবে কেন? এরূপ দৃঢ়তা না থাকিলে সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

মানসিক বলের ন্যায় শারীরিক বলেও বুদ্ধ হীন ছিলেন না। গোপার সহিত বিবাহের পূর্ব্বে তদীয় পিতা দণ্ডপাণির নিকট বুদ্ধকে শারীরিক বলের পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল। নন্দ, আনন্দ, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্যকুমারগণ এক দিকে, বুদ্ধ একেলা। কিন্তু তথাপি বাহুযুদ্ধে তাঁহারা বুদ্ধের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। ধনুর্ব্বাণেও বুদ্ধ সিদ্ধহস্ত। শাক্যকুমারগণ যে ধনুতে জ্যা যোজনা করিতে পারিলেন না, সেই ধনুতে জ্যা যোজনা করিয়া বুদ্ধ দশ ক্রোশ দূরে বাণ নিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু বলচর্চ্চা বুদ্ধের জীবনের লক্ষ্য নহে। বাল্যকাল হইতেই তিনি একা একা চিন্তা করিতে ভালবাসিতেন। এই জন্য অনেক সময় উদ্যানে তরুতলে ছায়ায় বসিয়া

তাঁহার দিন কাটিত। গোপার সহিত যখন বিবাহের কথা হয়, তাঁহার মনে কত চিন্তাই উঠিত। একবার ভাবিতেন—বিবাহ না করাই শ্রেয়, কেন আর ইচ্ছাপূর্ব্বক মায়াপাশে বদ্ধ হওয়া, ভোগসুখ ত আমার জীবনের উদ্দেশ্য নহে। আবার ভাবিতেন, ভোগের মধ্যে অনাসক্ত ভাবে থাকাই মানবজীবনের উচ্চতর কর্ত্তব্য, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাদিগের পদানুসরণ করিয়া লোকশিক্ষা দিব। বৈরাগ্যই কিন্তু বুদ্ধের প্রকৃতি। তাই বিবাহ করিয়াও সন্তান হইতেই তিনি গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। গৃহধর্ম্মে কিছুতেই মন বাঁধিতে পারিলেন না। এ জীবনের নশ্বরতা যাহার মনে অহোরাত্র জাগিতেছে, সে কি গৃহে থাকিতে পারে?

গৃহ পরিত্যাগের জন্য বুদ্ধকে কেহ কেহ নিন্দা করেন। তাঁহার এ দৃষ্টান্ত বাস্তবিকই কত দূর অনুকরণীয়, বিশেষ সন্দেহ আছে। কিন্তু ইহা হইতে তাঁহার নির্ম্মমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বুদ্ধ যে সর্ব্বত্যাগী হইয়াছিলেন, তাহা কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য নহে। গোপাকে তিনি প্রাণাধিক ভালবাসিতেন, বিজন অরণ্যে কঠোর তপঃসাধনের সময়েও বোধ করি, গোপা তাঁহার হৃদয় হইতে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, গৃহে থাকিয়া গোপার সহিত সুখস্বাচ্ছন্দ্যে জীবন অতিবাহিত করিলে তাঁহার উচ্চতর কর্ত্তব্য সাধনের বিঘ্ন ঘটে এবং গোপাও পার্থিব সুখে মজিয়া অপার্থিব অনাসক্তিসুখ হইতে বঞ্চিত হয়, তখন জগতের হিতের নিমিত্ত আপনার এবং গোপার সামান্য সুখ বিসর্জ্জন দেওয়াই তাঁহার কর্ত্তব্য বোধ হইল। পরে যখন উদ্দেশ্য সাধনের পথে বুদ্ধদেবের আর কোনও বিঘ্ন রহিল না, তখন গোপা এক দিন সন্ন্যাসিনীদলের নেত্রীপদে বরিত হইয়া স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন।

ললিতবিস্তর গ্রন্থে শাক্যসিংহের বহু ভার্য্যা ছিল উল্লিখিত হইয়াছে। হয় ত বৌদ্ধ গ্রন্থকার বহুভার্য্যত্ব এবং এককালীন তাহার মায়াচ্ছেদনসামর্থ্যে বুদ্ধদেবের বিশেষ গৌরব মনে করেন, সেই জন্য অভ্যাসমত অত্যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিম্বা এমনও হইতে পারে যে, তদানীন্তন প্রচলিত প্রথানুসারে বুদ্ধ গোপার সহিত গোপার সখীদিগেরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামদাস বাবু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও ললিতবিস্তরের অনুকূল প্রমাণ সংগ্রহে যখন অক্ষমতা স্বীকার করিয়াছেন, তখন সে কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করাই শ্রেয়। তবে বুদ্ধদেবকে সংসারী করিবার জন্য কলাকুশলা স্ত্রীদিগের দ্বারা তাঁহার মনোহরণের অনেক নিষ্ফল চেষ্টা হইয়াছিল বটে।

রামদাস বাবু ঘটনার পর ঘটনা এবং গল্পের পর গল্প সাজাইয়া বুদ্ধচরিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। গোঁড়ামি না থাকায় বুদ্ধের বাক্য এবং কার্য্যের মধ্য হইতে টানিয়া টানিয়া আপনার মনোমত মত খাড়া করিয়া তুলিতে চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে আপনা হইতেই

আমাদের সহিত বুদ্ধের নিকট সম্বন্ধ অনেকটা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। এবং বিদ্বেষের ফল নহে জানিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আমাদের সঙ্কীর্ণ অবিশ্বাসের হ্রাস হইবে আশা করা যায়। বৌদ্ধগণও এই গ্রন্থ হইতে বুদ্ধের প্রকৃত মতামত নির্ণয়প্রণালী সম্বন্ধে আভাস পাইতে পারেন। এবং এইরূপে ধীরে ধীরে বিবেচনার সহিত ধর্ম্মকে বিদ্বেষশূন্য দোষশূন্য অজ্ঞানশূন্য করিয়া সেই মহাপুরুষের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে অধিকতর সক্ষম হইতে পারেন।
['সাধনা,' পৌষ ১২৯৮]

রত্নাবলী

রচয়িতার নাম নিশ্চিত জানি না, গ্রন্থের নাম রত্নাবলী—সংস্কৃত ভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট নাটিকা, চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। একে ভাষা সংস্কৃত, তাহাতে নায়িকার নামে গ্রন্থের নাম, কোন্ রসের প্রাধান্য—পাঠকেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। আদিরসই মধ্যযুগের সংস্কৃত কবিদিগের প্রিয় অধিক। নাটকে, কাব্যে, সর্ব্বত্রই অন্যান্য রসের অপ্রাধান্য না হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যে এই রসের সমধিক আদর। রত্নাবলীতেও তাহাই। মদন-মহোৎসবে ইহার আরম্ভ, এবং প্রণয়ব্যাপারই ইহার আদ্যন্ত। নায়ক কৌশাম্বীর অধিপতি বৎসরাজ, নায়িকা সিংহলেশ্বরের দুহিতা রত্নাবলী, প্রথম দর্শনেই পরস্পরের অনুরাগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এই প্রণয়কাহিনী রত্নাবলী নাটিকার মেরুদণ্ড। ইহারই চারি পার্শ্বে ঘটনা এবং বিবিধ নূতন চরিত্র সংযোজনে আখ্যায়িকার বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়াছে। শুনা যায়, সোমদেবপ্রণীত বৃহৎকথা নামক গ্রন্থ হইতে এই রত্নাবলী উপাখ্যান সংগৃহীত। এবং কাশ্মীরের রাজা সুপণ্ডিত শ্রীহর্ষদেবই রত্নাবলীর রচয়িতা।

কিন্তু এইখানেই যত গোলযোগ এবং মতভেদ। শ্রীহর্ষদেবকে অনেকে নাকি রত্নাবলীর গ্রন্থকার বলিয়া স্বীকার করেন না। মম্মট ভট্টের নির্দ্দেশানুসারে তাঁহারা ধাবক নামক কবিকে উক্ত গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতা ঠাহরাইয়া থাকেন। বলেন—অর্থ দিয়া শ্রীহর্ষ গ্রন্থকারের নাম ক্রয় করিয়াছেন মাত্র, যশ অপযশের যথার্থ অধিকারী তিনি নহেন। বিরোধী পক্ষ রাজতরঙ্গিণীপ্রণেতা কহ্লণ পণ্ডিতের কথা উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রতিবাদ করেন। কহ্লণ পণ্ডিত নাকি তাঁহার গ্রন্থে শ্রীহর্ষকে সুপণ্ডিত এবং সৎকবি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীহর্ষের পক্ষে রত্নাবলীরচনা একেবারে আশ্চর্য্য কিছুই নহে। রাজা হইলে যে কবি হইতে পারে না, এমন ত কোনও নিয়ম নাই। তবে অর্থদানে গ্রন্থকার নাম ক্রয় করাও সে কালে শুনা যায় বটে। শুধু সে কালেই বা কেন, এখনও ত সংস্কৃত

ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি না থাকিলেও অনেকে কেবলমাত্র অর্থবলে নির্ভুল সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করিয়া থাকেন। শ্রীহর্ষদেব তবু গুণী এবং গুণগ্রাহী বলিয়া পরিচিত।

কিন্তু এ সমস্যা মীমাংসায় আমাদের আবশ্যক নাই। আমরা শ্রীহর্ষকে রত্নাবলীর গ্রন্থকার জানিয়াই পরিতৃপ্ত। আপাততঃ গ্রন্থ লইয়াই কথা, গ্রন্থকারের নাম ধাম কুল শীল সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ব মন্থন করিয়া অমৃত অথবা বিবাদের বিষ উদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য এবং সাধ্যবহির্ভূত। আমরা জানি, যাঁহারই রচনা হৌক্, রত্নাবলী একখানি সংস্কৃত অলঙ্কার-সম্মত নাটিকা—চারিটির অধিক অঙ্ক নাই, স্ত্রীচরিত্রের কিছু বাহুল্য, নায়কটি ধীরললিত, নায়িকা নবানুরাগা নৃপবংশজা। নায়ক অপেক্ষা মহিষীর কিছু যেন প্রতাপও অধিক—রাজা মহিষীর ভয়ে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। সংস্কৃত সাহিত্যে নাটিকার প্রধান লক্ষণ এই। রত্নাবলীতে এ সকল লক্ষণের কোথাও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। নায়ক বৎসরাজের উপর মহিষী বাসবদত্তার যথেষ্ট আধিপত্য, বাসবদত্তাও রাজকন্যা, সম্ভ্রান্তবংশীয়া, মহিষী হইবারই যোগ্যা, রত্নাবলীর সহিত আবার তাঁহার সম্পর্ক আছে, তবে অনেক দিন তিনি তাহা জানিতেন না বটে। তবে জানিলেও যে রত্নাবলীর তাহাতে বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইত, এমন বলাও যায় না।

রত্নাবলী নাটকের আখ্যায়িকাংশ বিশেষ জটিল নহে। সিংহলেশ্বর বৎসরাজপ্রেরিত মন্ত্রীর সহিত রত্নাবলীকে কৌশাম্বীতে প্রেরণ করেন—বৎসরাজের সহিত রত্নাবলীর বিবাহই তাঁহার উদ্দেশ্য। পথিমধ্যে সমুদ্রে যানভঙ্গ হয়, কিন্তু তাহাতে কাহারও প্রাণ নষ্ট হয় নাই। অমাত্য যৌগন্ধরায়ণ রত্নাবলীকে রাজধানীতে লইয়া আসেন এবং মহিষী বাসবদত্তার হস্তে সমর্পণ করিয়া দেন। রত্নাবলীর যথার্থ পরিচয় বাসবদত্তা জানেন না, তিনি তাহাকে অন্তঃপুরে স্বীয় পরিচারিকাদিগের মধ্যে রাখিয়াছেন—সহজেই একটু বিশেষ সাবধানেও রাখিয়াছেন যে, রাজার সুদৃষ্টিতে সে যেন না পড়ে। কিন্তু মহিষীর এত সতর্কতা বিফল হইল। রত্নাবলীর সহিত বৎসরাজের সাক্ষাৎও ঘটিল, পরস্পরের প্রতি অনুরাগও জন্মিল। মহিষী এ সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন, রত্নাবলীকে গোপনে অবরুদ্ধ করিয়া রাজার চোখের আড়াল করিলেন। কিন্তু ঐন্দ্রজালিকের কৌশলবিদ্যায় সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িল। উজ্জয়িনী হইতে একজন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে। যৌগন্ধরায়ণ রত্নাবলী কোথায় আছেন জানিবার জন্য ঐন্দ্রজালিককে সমস্ত অন্তঃপুর কাল্পনিক অগ্নিতে প্রজ্বলিত করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে ঐন্দ্রজালিক সমস্ত অন্তঃপুর অগ্নিময় করিয়া ফেলে। তখন রত্নাবলী অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া মরিবে আশঙ্কা করিয়া বাসবদত্তা তাড়াতাড়ি তাহাকে বাহির করিয়া দিলেন। রাজসভায় সিংহলের মন্ত্রী বসুভূতি উপস্থিত ছিলেন, রত্নাবলীকে চিনিয়া ফেলিলেন। যৌগন্ধরায়ণও রত্নাবলীর যথার্থ পরিচয় প্রদান করিলেন।

তখন বাসবদত্তাও শুনিলেন, রত্নাবলী তাঁহারই মাতুলকন্যা। এবং রত্নাবলীর সহিত স্বীয় স্বামীর বিবাহ দিয়া দিলেন।

কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। রত্নাবলীকে রাজা ত বিবাহ করিবেনই। অন্তঃপুরের শোভাবর্দ্ধনে বিলাসী রাজকুলের কি কখনও ত্রুটি লক্ষিত হয়? কিন্তু বৎসরাজ যে মহিষীকে ভাল না বাসিতেন এমনও নহে। তবে বর্ত্তমানে আমরা ভালবাসার মধ্যে যে গভীর একনিষ্ঠতা আশা করি, সে কালের রাজপরিবারে তাহা দেখা যায় না। বিশেষতঃ রত্নাবলী যে সময়ে রচিত, ভারতবর্ষের রাজকুলে বিলাসস্রোত তখন এমন প্রবলবেগে চলিয়াছে যে, চরিত্রের দৃঢ়তা ইহাতে রক্ষিত হয় না। আজ এ উৎসব, কাল সে উৎসব, প্রতি দিন নূতন নূতন বলহারী বিলাসের সহস্র উপায় উদ্ভাবন। প্রাচীন ভারতে অযোধ্যা ও হস্তিনাপুরের রাজসভায় জাঁকজমক খুব আছে, কিন্তু বিলাস এমন প্রবল নহে। প্রমাণে কি দাঁড়ায় জানি না, কিন্তু কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনীর রাজসভায় যে বিলাসের কথা শুনা যায়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন বলের চর্চ্চাও যথেষ্ট ছিল, পৌরুষিকতারও আদর ছিল। রত্নাবলী যে সময়ের গ্রন্থ, তখন মদনোৎসব বৈ আর বড় উৎসব নাই, নৃত্যগীতাদি বৈ অন্য আমোদের তেমন প্রাধান্য দেখা যায় না, কর্ম্মিষ্ঠতার স্থলে অলস বিলাসিতারই তখন একাধিপত্য। এই শ্রীহর্ষেরই সভা তাহার এক প্রধান আদর্শ। বিলাসিতার জন্য দেবমন্দিরের বহুমূল্য দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি হস্তপ্রসারণ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। এবং শুনা যায়, এই কারণে নাকি তাঁহার প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এবং সেই বিদ্রোহেই তাঁহার ইহলীলা শেষ হয়।

কিন্তু কেবলমাত্র কবিবিশেষের রচনা হইতে কিম্বা ইংরাজ লেখকের প্রবন্ধবিশেষের উপর নির্ভর করিয়া কিছু বলা চলে না। কালিদাসের সময়ের সহিত রত্নাবলীর সময়ের কিরূপ প্রভেদ হইয়াছে না হইয়াছে, আমরা তাহা নিশ্চিত বলিতে পারি না।

তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আমাদের প্রাচীন অবস্থার যে একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ বড় নাই। কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া অনেকে বলেন, অন্যান্য দেশের সভ্য বিলাসী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আসিয়াই প্রাচীন সমাজের কঠোর গাম্ভীর্য্যের স্থলে লঘু শৈথিল্যের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। নহিলে, পৃথিবীর বিলাসে আমাদের মতি কবে? ইহা যে না হইতে পারে, এমন অবশ্য নহে—বাস্তবিকই বিলাস আমাদের তেমন স্বাভাবিক নয়—কিন্তু তাই বলিয়া পার্থিব বিষয়ে আমাদের একেবারে অনাসক্তি স্বীকার করা যায় না। দীর্ঘকাল নিশ্চিন্ত অবসর পাইলে ব্যক্তিই কি, আর জাতিই কি, ক্রমে লঘুপ্রকৃতি, অলস এবং বিলাসী হইয়া উঠে। ভাবিয়া দেখিতে গেলে আমাদের বৈরাগ্য অনেক সময় এই নিশ্চেষ্ট আলস্যেরই রূপান্তর। বৈরাগ্যের মধ্যে একটি

কঠোর দৃঢ়তা আছে, তাহা পুরুষজনোচিত—যে বৈরাগ্যে ভীষ্ম আপনার সকল সুখকামনা বিসর্জ্জন দিয়া, পরের জন্য চিরজীবন কাজ করিয়াছেন, যে বৈরাগ্যে মহর্ষি জনক নির্লিপ্তভাবে গুরুতর রাজকর্ত্তব্যভার বহন করিয়া গৃহী জনের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু এ সবল বৈরাগ্য অতি বিরল। সকল প্রকার উদ্যম এবং চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া নিস্পন্দ জড়-জীবন বহন করা অনেক সময় আমাদের বৈরাগ্যের অর্থ। সেই জন্য এ বৈরাগ্যফলও অবস্থাবিশেষে বিলাসিতায় পরিণত হইতে সময় লাগে না।

এমনও হইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের দারুণ কঠোরতার প্রতিক্রিয়ায় এ দেশে বিলাস এক সময় সহসা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বহুদিন বৈরাগ্যের প্রভাবে আমাদের অন্তরের অনেকগুলি বৃত্তি কেবলমাত্র চাপা থাকিয়া থাকিয়া অবশেষে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দ্বিগুণ বেগে সহস্র বিলাসে প্রমোদে ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল। এমন ত হইয়াই থাকে। পিউরিটান রাজত্বকালে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রকার আমোদ প্রমোদ একপ্রকার বলপূর্ব্বক রহিত করা হইয়াছিল। ফলে, দ্বিতীয় চার্ল্‌সের রাজত্বে বিলাস উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, দুরাচার ভদ্রতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপনাকে সম্ভ্রান্ত পদবীতে উত্তীর্ণ করিল, গৃহে পরিবারে, অন্তরে বাহিরে দুর্নীতি এত দূর প্রশ্রয় পাইল যে, কুল রহিল না, শীল রহিল না, প্রেম বিনষ্ট হইল, পরিবার ভাঙ্গিতে লাগিল, এবং অবশেষে একদিন লণ্ডনের কুয়াসাচ্ছন্ন প্রভাতে প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে অভিশাপ এবং হাহাকার উঠিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিল।

রত্নাবলী যখন রচিত হইয়াছিল, সভ্যতা তখন কূলে কূলে। কলাবিদ্যার বিশেষ অনুশীলন হইয়াছিল। স্ত্রীকন্যাদিগকে এ সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইত। রত্নাবলীতে দেখা যায়, স্ত্রীলোকেরা চিত্রবিদ্যায় বেশ পারদর্শিনী। রত্নাবলী মদন-রূপে বৎসরাজের একখানি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছিলেন। এবং প্রিয়সখী সুসঙ্গতা তাহারই পার্শ্বে রতিরূপে রত্নাবলীর চিত্র আঁকিয়া দেন। তখনকার অবস্থার সহিত বর্ত্তমান য়ুরোপের কতকটা সাদৃশ্য অনুভব হয়। তবে ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্যে এ সকল বিদ্যার কত দূর কি অনুশীলন হইয়াছিল বলা যায় না। রাজকুলের সহিত সাধারণের অনেক প্রভেদ। কিন্তু প্রভাব কিছু না কিছু পড়েই।

রত্নাবলী নাটকে সাধারণতঃ যে সকল স্ত্রীচরিত্র দেখা যায়, সকলগুলিকেই বেশ সুচতুরা এবং কলাবতী বলিয়া বোধ হয়। সবশুদ্ধ বোধ করি আট নয়টির অধিক স্ত্রীচরিত্র হইবে না—মদনিকা, চূতমালিকা, কাঞ্চনমালা, সুসঙ্গতা, নিপুণিকা, সাগরিকা প্রভৃতি বাসবদত্তার পরিচারিকাগণ, আর এদিক্ ওদিক্ দু একটি যদি হয়। সাগরিকাই রত্নাবলী—সাগর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছিল বলিয়া এই নাম।

পুরুষচরিত্রও বড় অধিক হইবে না—রাজা এবং বিদূষকই প্রধান, ইহা ভিন্ন যৌগন্ধরায়ণ, বিজয়বর্ম্মা, বসুভূতি প্রভৃতি আনুষঙ্গিক পাঁচ জন। পাঁচ জনকে বড় একটা দেখাও যায় না।

প্রথম অঙ্কের সর্ব্বপ্রথমেই যৌগন্ধরায়ণ একবার এক মুহূর্ত্ত দেখা দিয়াছেন। তাহার পর বসন্তোৎসববেশে রাজা এবং সঙ্গে বিদূষক। রাজা বেশ নিশ্চিন্ত আছেন—রাজ্য নির্জ্জিতশত্রু, যোগ্য সচিবে সকল ভার ন্যস্ত, প্রজাদের কোনও উপদ্রব নাই ; মদনোৎসবে তিনি অখণ্ড হৃদয়ে যোগ দিতে পারিয়াছেন। কৌশাম্বী রাজধানীতে আজ মহা আনন্দ—ধারাযন্ত্র হইতে জল পড়িতেছে, প্রাঙ্গণে পথে নরনারী বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া আমোদ প্রমোদে মত্ত, ইহার উপরে মধুমাসে মধুসখার প্রবল প্রতাপ, দক্ষিণ-পবনে, বকুল-সৌরভে যুবতীজনের বহু যত্নে পোষিত মান শিথিলীকৃত। মহিষী বাসবদত্তা প্রাসাদের প্রমোদ-উদ্যানে রাজাকে আসিবার জন্য বলিয়া পাঠাইয়াছেন। সেখানে রক্তাশোকতরুমূলে মহিষী কুসুমায়ুধের পূজায় নিযুক্তা। সাগরিকা, কাঞ্চনমালা প্রভৃতি পরিচারিকা দু একজন নিকটে উপস্থিত—মহিষী কখন্ কি আদেশ করেন। রাজা এখনই আসিবেন—অধিক বিলম্ব নাই।

মহিষীর সহসা মনে পড়িল যে, সাগরিকাকে আনিয়া তিনি ভাল করেন নাই, রাজার নয়নগোচর না হইলেই ভাল হয়। স্ত্রীবুদ্ধি এ বিষয়ে বড় সতর্ক। অমনি একটা কাজের ছুতা করিয়া বাসবদত্তা সাগরিকাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। সাগরিকা সরিয়া গেল, কিন্তু অন্তঃপুরে নয়, অনতিদূরে বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দেখিতে লাগিল যে, তাহার পিত্রালয়ে যেরূপ ভাবে সমস্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হইত, এখানেও ঠিক সেইরূপ হয় কি না। রাজা আসিলেন। আসিয়াই প্রিয়াকে যথোচিত সম্ভাষণ করিলেন। প্রিয়াও যথাযোগ্য সম্ভাষণে রাজাকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন। কাঞ্চনমালা পূজোপকরণ সমস্ত লইয়া আসিল। মহিষী কুসুমায়ুধকে পুষ্প চন্দন দান করিলেন। বৎসরাজ প্রিয়তমার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন—প্রথমে লতার সহিত তুলনায় গঠনের, সেই সঙ্গে বিকশিত কান্তিরও, তাহার পর সেই অতি মৃদু কোমলতার, যে কোমলতার বারেক স্পর্শের জন্য অনঙ্গ আপনার অঙ্গহীনতায় অতিমাত্র কাতর।

মহিষীর আর আহ্লাদ ধরে না। রূপের প্রশংসায় কোন্ রমণীর অন্তর না উথলিয়া উঠে?—বিশেষতঃ প্রিয়জন যখন সেই রূপেই বাঁধা। তাই রূপের প্রশংসা শুনিয়া মহিষী বেশ হৃষ্টচিত্তে কুসুম এবং বিলেপন দিয়া স্বামীর পূজা করিলেন।

সাগরিকা অন্তরাল হইতে সকলই দেখিল। সে ত রাজাকে প্রথমে মূর্ত্তিমান্ অনঙ্গদেব ঠাহরাইয়া বসিয়াছিল। তাই দূর হইতেই যথারীত প্রণামাদি করে। তাহার পরে যখন রাজা বলিয়া বুঝিল, তখন—

"কহং অঅং সো রাআ উঅঅণো ণাম জস্ম অহং তাদেণ দিণ্ণা; তা পরপ্পেসণতূসিদং বি মে সরীরং এদস্ম দংসণেণ দাণিং বহুমদং সংবুত্তং।"

এই সেই রাজা উদয়ন, যাঁহার করে তাত আমাকে সম্প্রদান করিয়াছেন। ইহাঁর দর্শনে আজ জীবন সার্থক।

বলা বাহুল্য, বৎসরাজেরই এক নাম উদয়ন। এবং ইহাঁর সহিত বিবাহের জন্যই সিংহলেশ্বর কন্যাকে কৌশাম্বীতে প্রেরণ করেন।

এ দিকে সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। নেপথ্যে বৈতালিক সন্ধ্যার বর্ণনা পাঠ আরম্ভ করিল। উদয়ন মহিষীর রূপের সহিত চন্দ্রের তুলনা করিয়া চন্দ্রকে ম্লান দেখিলেন। নির্ব্বিঘ্নে সকলের নিষ্ক্রামণে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অঙ্কে সাগরিকা রাজা উদয়নের একখানি চিত্র আঁকিতেছেন। সারিকাপিঞ্জরহস্তা সুসঙ্গতা আসিয়া দেখিয়া ফেলিল। সুসঙ্গতা জিজ্ঞাসা করিল, কাহার চিত্র? সাগরিকা উত্তর দিল, ভগবান্ অনঙ্গদেবের। কিন্তু সুসঙ্গতা দেখিল যে, এ অনঙ্গ বৎসরাজ বৈ আর কেহ নহে। তখন ধীরে ধীরে সাগরিকার হস্ত হইতে তুলিকা গ্রহণ করিয়া মদনের পার্শ্বে রতির চিত্র আঁকিয়া দিল। এ রতিও সাগরিকা বৈ আর কেহ নহে। তাহার পর দুই সখীতে অনেক কথাবার্ত্তা। ইতিমধ্যে অশ্বশালা হইতে এক বানর বাহির হইয়া সারিকার পিঞ্জর খুলিয়া দেয়। সারিকা উড়িয়া গেল। দূরে বিদূষকের সহিত রাজা আসিতেছেন। সারিকা বকুলবৃক্ষের শাখায় বসিয়া সখীদ্বয়ের কথাবার্ত্তা যেরূপ শুনিয়াছিল আবৃত্তি করিতেছে। রাজা শুনিয়া অবাক্। ক্রমে কদলীগৃহে আসিতে সে চিত্রও তাঁহার হস্তগত হইল। সাগরিকার সহিত সাক্ষাৎও হইল। এমন সময়ে মহিষী আসিয়া উপস্থিত। বিদূষকের হস্তে চিত্রটি ছিল, তাড়াতাড়িতে তাহার হাত হইতে পড়িয়া গেল। মহিষী ব্যাপার বুঝিলেন। অসুস্থতার ভাণ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজার স্ফূর্ত্তি অনেকটা নির্ব্বাপিত।

দ্বিতীয় অঙ্কের ঘটনা এই। এবং ইহাতেই রাজার চরিত্র, সাগরিকার ভাব, সখীগণের অবস্থা, মহিষীর অধিকার, বিদূষকের বিদ্যাবুদ্ধি অনেকটা প্রকাশ পাইয়াছে। রত্নাবলী নাটকের মদনোৎসব এবং কদলীগৃহ, এই দুই অঙ্ক আলোচনা করিয়া দেখিলে সে সময়ের অবস্থাও যে কতক কতক বুঝা না যায়, এমনও নহে। প্রথমতঃ সে কালের রাজ-চরিত্র। বৎসরাজকে আমরা অন্তঃপুর লইয়াই অধিক ব্যাপৃত দেখিতেছি। রাজ্যের ভার মন্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া তিনি বেশ নিশ্চিন্তমনে সুখে আছেন। অবশ্য, রাজ্য তাঁহার মন হইতে একেবারে দূর হয় নাই, কিন্তু রাজকর্ত্তব্য পালন অপেক্ষা অন্তঃপুরের কর্ত্তব্য পালনে তাঁহার মন টানে। রামচন্দ্রের মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সবল পুরুষচরিত্র ত কৈ, ইদানীন্তন

রাজকুলে বড় একটা দেখা যায় না। রত্নাবলীর উদয়নের সহিত তুলনা করিলে দুষ্মন্তকে অনেক উচ্চ আসন দিতে হয়। তাঁহার চরিত্রের এক দিকে এমন তেজ বল ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে যে, কোমল প্রণয়ব্যাপারে রাজভাব কিছুমাত্র খর্ব্ব হয় নাই। রত্নাবলীতে বৎস-রাজের ক্ষমতার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নাই।

মহিষীর এখানে প্রবল প্রতাপ না হইয়া যায় না। রাজা গোপনে গোপনে অপরার সহিত প্রেমালাপ করেন, কাজেই মহিষীকে একটু বিশেষ ভয় করিয়া চলিতে হয়। তৃতীয় অঙ্কে নানা ঘটনায় মহিষীর সমুন্নত তেজস্বিতা বেশ ফুটিয়াছে। রাজা সাগরিকার সহিত গোপনে দেখাশুনার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। প্রমোদ-উদ্যানে প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন—কখন্ রত্নাবলী আসিবে। কথা আছে, বিদূষক বসন্তকের সহিত বাসবদত্তাবেশে রত্নাবলী এবং কাঞ্চনমালাবেশে সুসঙ্গতা রাজার নিকটে আসিবেন। কিন্তু মহিষী পূর্ব্ব হইতেই সমুদায় বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া যথাসময়ে কাঞ্চনমালা সমভিব্যাহারে বিদূষকের সহিত প্রিয়সঙ্কেতস্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বিদূষক এবং রাজা উভয়েই বাসবদত্তাকে বাসবদত্তাবেশে রত্নাবলী ঠাহরাইয়াছেন। তাই মহিষীর সমক্ষেই বসন্তক মহিষীর নিন্দাবাদ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। পরিশেষে মহিষী যখন আত্মপ্রকাশ করিলেন, বৎস এবং বসন্তক পরস্পরের মুখ চাহাচাহি করিয়া অবাক্। তেজস্বিনী বাসবদত্তা মধুর ভাষায় বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মহিষী বলিলেন, প্রথম সাগরিকামিলনে বাধা দিয়া তিনিই অপরাধিনী। রাজা মহিষীর চরণে নিপতিত হইলেন। মহিষী নিবারণ করিয়া কহিলেন,

"অজ্জউত্ত উট্ঠেহি উট্ঠেহি ; নিল্লজ্জো কৃখু সো জণো জো অজ্জউত্তস্ম ঈদিসং হিঅঅং জাণিঅ পুণোবি কুপ্যদি, তা সুহং চিট্ঠদু অজ্জউত্তো, অহং গমিস্মং।"

আর্য্যপুত্র! উঠ উঠ ; যে তোমার এইরূপ হৃদয় জানিয়াও পুনর্ব্বার কুপিত হয়, সে অতি নির্লজ্জ, তুমি সুখে থাক, আমি যাইতেছি।

মহিষীর প্রত্যেক কথায় তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ পাইয়াছে। পতিব্রতা সকল অত্যাচার অবমাননা সহিতে পারেন, কিন্তু প্রেমের অপমানে তিনি ব্যথিত হয়েন। মহিষী রাজার অনুগ্রহভিখারিণী নহে, ক্রীড়ার সামগ্রী নহে, তিনি জানেন, বৎসরাজের তিনি অর্দ্ধাঙ্গ, ধর্ম্মপত্নী, সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহভোগিনী। তাই আজ আপন প্রেমের অবমাননায় রাজারই অপমান জ্ঞানে বাসবদত্তা মর্ম্মে মর্ম্মে পীড়িত। রত্নাবলী নাটকে বাসবদত্তার চরিত্রেই তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে। পতিব্রতা ধর্ম্মপত্নী নহিলে এরূপ তেজ কোথায় মিলিবে? যখন পুনর্ব্বার সাগরিকার সহিত প্রেমালাপকালে রাজা মহিষীর নিকট ধরা পড়িলেন, কি তেজস্বিতার সহিতই বাসবদত্তা ব্যবহার করিয়াছেন! আর কেহ

হইলে রাজার সম্মুখে তাঁহার নবপ্রণয়িনীকে বাঁধিয়া লইয়া যাইতে পারিত না। বাসবদত্তার উক্তিগুলি বাদসাদ না দিয়া এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু প্রবন্ধ অতিরিক্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িলে পাঠকগণের ধৈর্য্যচ্যুতি আশঙ্কায় আমাদিগকে নিবৃত্ত হইতে হইল।

রাজার চরিত্রে তৃতীয় অঙ্কে যত দূর অসংযম প্রকাশ পাইবার পাইয়াছে। প্রিয়তমা পত্নীতে তাঁহার মন উঠে না, নিত্য নূতন প্রণয়িনীসঙ্গই যেন তাঁহার অধিক প্রিয়। ঠিক এমনটি না বলিলেও তাঁহার ভাবে ইহাই প্রকাশ পায়। সাগরিকার নিকট এবং বাসবদত্তার নিকট তিনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, মিলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায়।

রাজচরিত্রের আর এক দিক্ চতুর্থ অঙ্কে ব্যক্ত হইয়াছে। এখন তিনি প্রণয়ী নহেন, অসংযতও নহেন, রাজরূপে কৌশাম্বীর সিংহাসনে বসিয়া অমাত্য সেনাপতি প্রভৃতির সহিত রাজকার্য্য আলোচনায় প্রবৃত্ত। তাঁহার সেনাপতি কোশলরাজ্য জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, রাজা তাহারই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেছেন। কিন্তু এখানেও আমরা তাঁহার কার্য্যদক্ষতার তেমন কিছু পরিচয় পাই না। কালিদাস বিবিধ ক্ষুদ্র ঘটনায় দুষ্মন্তের রাজকার্য্যে অসাধারণ পটুতার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীহর্ষ সেরূপ কিছু করেন নাই। কেবল এই পর্য্যন্ত দেখাইয়াছেন যে, এই ধীরললিত রাজারও রাজ্য আছে, অমাত্য আছে, সেনাপতি আছে, এবং এই অমাত্য এবং সেনাপতি কার্য্যকুশল, সক্ষম। মোটের উপর, রাজরূপে আমরা রাজার পরিচয় পাই নাই বলিলেই চলে। সিংহলদেশ হইতে মন্ত্রী বসুভূতি আসিয়াছেন, রাজা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। উজ্জয়িনী হইতে যে ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছে, সে রাজসভায় অনেক অনেক আশ্চর্য্য ঘটনায় আপন বিদ্যার পরিচয় দিয়া অবশেষে অন্তঃপুরে কাল্পনিক অগ্নির উদ্ভাবনপূর্ব্বক রত্নাবলীকে বাহির করাইয়া দিল। মহিষী সাগরিকার যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দিলেন। এখন হইতে রত্নাবলীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার বেশ সকরুণ। রাজাও উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "বিক্রমবাহু সিংহলেশ্বর সমান ঘরে কন্যা দিয়া বহুমানিত; সসাগরা ধরিত্রীর প্রাপ্তির একমাত্র কারণ এই অবলারত্ন রত্নাবলীকে প্রাপ্ত হইলাম; কোশলরাজ্য অধিকৃত হইল; ভগিনীলাভে দেবী বাসবদত্তা প্রসন্না হইলেন; এ পৃথিবীতে স্পৃহণীয় আর কি আছে?"

রত্নাবলী নাটকের উপসংহার এই। এখন ইহাকে ট্র্যাজেডি বলিতে হয় বল, কমেডি বলিতে হয় বল, দুয়ের বাহির বলিলেও আমাদের তর্ক করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। রত্নাবলীর প্রণয়ব্যাপার আলোচনা করিলে জুলিয়েটের সহিত তাহার ভাবের কতকটা সাদৃশ্য অনুভব হয়। গলায় লতা বাঁধিয়া রত্নাবলী একবার মরিতেও গিয়াছিল

বটে। তবে সংস্কৃত নাটক নাকি মিলনান্ত না হইলেই নয়, তাই এ দুর্ঘটনা আর ঘটিবার সুবিধা হইল না। কিন্তু সে জন্য যে রত্নাবলী ট্রাজেডি নয়, এমন বলা চলে না। পরিচারিকা-বৎসলা বাসবদত্তা স্বামীর মঙ্গলোদ্দেশে রত্নাবলীকে যখন তাঁহার উত্তমার্দ্ধ করিয়া দিলেন, তখনই রত্নাবলীর ট্র্যাজেডি অভিনীত হইল। কিন্তু তাহা বাহিরে নয়, সাধ্বী পতিব্রতা বাসবদত্তার সহিষ্ণু হৃদয়ে। সুতরাং বাহিরের লোকেরা মহিষীর বাহিরে হাসিমুখ দেখিয়া তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিল না। কবি শান্তিবাচন করিলেন,

"উর্ব্বীমুদ্দামশয্যাং জনয়তু বিসৃজন্ বাসবো বৃষ্টিমিষ্টাম্
ইষ্টৈস্ত্রৈবিষ্টপানাং বিদধতু বিধিবৎ প্রীণনং বিপ্রমুখ্যাঃ।
সাকল্পান্তঞ্চ ভূয়াৎ সমুপচিতসুখঃ সঙ্গমঃ সজ্জনানাম্
নিঃশেষং যান্তু শান্তিং পিশুনজনগিরো দুর্জ্জয়া বজ্রলেপাঃ॥"

['সাধনা,' পৌষ ১২৯৮]

দেয়ালের ছবি

দেয়াল ঢাকিয়া ছবি মারিয়াছি, বিচিত্র দৃশ্য গঠন ভাব গায়ে গায়ে পরস্পরের ছায়া আলোকে সম্যক্ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সরসীতীরে শ্যাম তরুচ্ছায়ে তৃণশয্যোপরি সুখসুপ্তা রমণী, শাখাপল্লবের মধ্য দিয়া নগ্ন বক্ষ এবং বাহুর উপরে শ্রান্ত জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। আলুথালু বসনপ্রান্তে অর্দ্ধ-অনাবৃত চারু যৌবন চারু চন্দ্রালোকে মৃদু চঞ্চল। কোমল পদতল রজতধৌত শ্যাম শিলাখণ্ডের উপরে রক্ষিত।

দূরে জ্যোৎস্নাসিক্ত একখানি গ্রাম—অস্পষ্ট ধোঁয়া-ধোঁয়া গোলাঘর, কুটীর, বেড়া, প্রাঙ্গণে দীর্ঘ ছায়া-তরু, দেয়াল বাহিয়া লতা।

ইহারই পার্শ্বে তিনটি ভগিনীর চিত্র—তিনটি পাশ্চাত্য রূপসী। গ্রীসীয় প্রস্তরমূর্ত্তির মত গঠন, কুঁদিয়া নির্ম্মাণ করা, নাসিকা সূক্ষ্ম সরল, অধর পরিপূর্ণ। নীল নয়নে উজ্জ্বল চাঞ্চল্য এবং সরলতা।

আর এক পার্শ্বে অর্দ্ধ-আলসে তরল রূপ বিস্তার করিয়া একাকিনী প্রাচ্য রূপসী। ঘন কৃষ্ণ কেশপাশ, চূর্ণ কুন্তল মুখের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, ভ্রূযুগ ধনুর মত—তুলিকার মৃদু কোমল স্পর্শে অঙ্কিত। স্নিগ্ধ গভীর মৃগনয়ন স্নিগ্ধ রূপে নীরবে জগৎকে আহ্বান করিতেছে। এ গঠন বনলতার মত—আঁটসাট পারিপাট্য নাই, কিন্তু চিত্তহারী।

মধ্যে কতকগুলি অন্য ছবি।

তুষারের উপর পড়িয়া রাখাল বালক, পার্শ্বে হিমক্লিষ্টমুখে বালিকা সহচরী বসিয়া— একাকিনী কোনও উপায় করিতে পারিতেছে না। বহু দূরে পর্ব্বতের উচ্চ শিখরদেশে এক এক বার আলোক দেখা যাইতেছে, বালিকা সেই দিকে চাহিয়া।

কোথাও বিজন প্রান্তরে শ্রান্ত শিকারী, নিকটে প্রভুভক্ত কুকুর সমস্ত দিনের বিফল পরিশ্রমের পর থাবা পাতিয়া বসিয়াছে। চারি দিকে আর কেহ নাই।

অন্যত্র বিচিত্র গার্হস্থ্য দৃশ্য। নবীন যৌবন নব প্রণয়িনীর সহিত গোপনে প্রেমালাপে রত। সন্ধ্যাবেলায় গৃহকোণে গল্প শুনিবার জন্য ছেলেরা প্রবীণাকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। বৃদ্ধ দাদামহাশয় রুমালে চোখ বাঁধিয়া লুকাচুরি খেলিতেছেন, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আসিয়া তাঁহার কাপড় ধরিয়া টানিয়া পলাইতেছে।

দেয়ালের এক প্রান্তে একটি জাপানী ছবি—জাপানী চিত্রকরের অঙ্কিত জাপানী রমণী। অন্যান্য ছবিগুলির সহিত ইহার আঁকিবার ধরণে একটু বিশেষ প্রভেদ আছে। ছায়া আলোকের খেলা তেমন নাই। সূক্ষ্ম রেখায় দুটি কৃষ্ণ ভ্রূ। একটি ভ্রূপ্রান্ত হইতে রেখা নামিয়া আসিয়া নাসিকা। সূক্ষ্ম কৃষ্ণ একটি রেখার নীচে লাল ফোঁটা দিয়া অধর। খোপায় খানিকটা কালো রঙ মাখান। রঙ্গিন কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে কালো রেখা টানিয়া দেওয়া।

এদিক্ ওদিক্ অনেকগুলি ফরাসী ছবি—আবক্ষ সুন্দরী, বিবসনা যুবতী, নগ্ন যৌবন। গঠন এবং বিলাসই অধিকাংশ স্থলে ব্যক্ত হইয়াছে। যৌবন আপনাকে কোথাও সঙ্কুচিত করে নাই, প্রতি অঙ্গ যেমন করিয়া বিস্তার করিলে সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হয়, তেমনি করিয়া আপনাকে বিস্তার করিয়াছে।

নগ্নতাই যে সর্ব্বত্র বিলাসের কারণ, তাহা নহে। এক একটি নগ্ন প্রতিমূর্ত্তি হাবভাবচেষ্টাহীন সরল সম্ভ্রমে অটল দাঁড়াইয়া। পার্শ্বে হয় ত সর্ব্বাঙ্গ বিচিত্র বসনে ঢাকিয়া নয়নের কোণে অধরপ্রান্তে বিলাস মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অদূরে শিথিলবসনা সুন্দরী পূর্ণবিকশিত তনু ঢাকিবার ছলে যৌবনসন্নদ্ধ সুগোল গঠন ব্যক্ত করিতেছেন।

দেয়ালের ছবির মধ্যে গঠনপারিপাট্যের মত মুখশ্রী কিন্তু অল্পই দেখা যায়। বাহু, বক্ষ এবং সর্বাঙ্গ নানারূপে বিভিন্ন দিক্ হইতে বিচিত্র সৌন্দর্য্যে অঙ্কিত হইয়াছে। পুরুষের দেহও দু একটি মধ্যে মধ্যে আছে—সবল, দৃঢ় এবং তরঙ্গায়িত। পেশীর সৌন্দর্য্যই তাহাতে সমধিক ফুটিয়াছে।

আর একটি করুণ চিত্র—ক্রুসবিদ্ধ স্বামীর নিকটে প্রিয়তমা প্রেয়সী শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছেন। গাধার মুখ ধরিয়া বালক দাঁড়াইয়া। গাধার উপরে উঠিয়া রমণী স্বামীর শেষ চুম্বন গ্রহণ করিতেছেন। অধরে অধর দৃঢ়সম্বদ্ধ।

এই ছবিগুলি দিয়া আমার মনের মধ্যে জগতের মায়াময়ী ছায়াপুরী রচনা করিয়াছি। বসিয়া বসিয়া দেখি, আর আমার মনের মধ্যে ইহারা জীবন্ত হইয়া উঠে, ছায়ার মত আসে যায়, বিচরণ করে। আমি ইহাদের সুখ দুঃখ বেদনার মধ্যে আপনাকে বিস্মৃত হই। ['সাধনা,' পৌষ ১২৯৮]

মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আমাদের মধ্যে যেমন আজকাল অনেকে স্বদেশীয় ধর্ম্ম এবং আচার ব্যবহারের সহিত বর্ত্তমান শিক্ষার সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করেন—এবং তদুপলক্ষে প্রাচীন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিতে গিয়া আবিষ্কার করেন যে, ধর্ম্ম এবং সমাজনীতি যখন সরল নবীন এবং বিশুদ্ধ ছিল এবং প্রাচীন মহাপুরুষদিগের উন্নত হৃদয়শিখর হইতে সদ্য উৎসারিত হইয়াছিল, তখন তাহার মধ্যে বর্ত্তমান উচ্চ আদর্শের অনুরূপ নির্ম্মলতা ছিল—অবশেষে বহুবর্ষের মলিনতায় আবিল এবং কৃত্রিম নিয়মজালে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ক্ষণিক উপযোগী প্রথা-জঞ্জাল হইতে উদ্ধারপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে তবেই তাহার আদিম বিশুদ্ধতা দৃষ্টিগোচর হয় ; আমরা দেখিতেছি, নব্যশিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যেও এইরূপ পরীক্ষা প্রচলিত হইতেছে—তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন শাস্ত্রের সহিত নূতন শিক্ষার যোগ অনুসন্ধান করিতেছেন। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থখানি তাহারই দৃষ্টান্তস্থল।

সকলেই জানেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি বর্ত্তমান যুগের প্রধান অভিযোগ, তাঁহাদের পরধর্ম্মবিদ্বেষ সম্বন্ধে। মতের ও ধর্ম্মের স্বাধীনতা বর্ত্তমান কালের একটি প্রধান ভাব। অতএব যে মুসলমান বর্ত্তমান কালের সহিত অন্তরের যোগ রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কতকটা জবাবদিহিতে পড়িতে হয়। আমাদের হায়দ্রাবাদের মৌলবী চিরাঘ আলি সাহেব তাই পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ হইতে আপন শাস্ত্রকে যথাসাধ্য রক্ষা করিয়াছেন। কোরাণ এবং অন্যান্য নানা গ্রন্থ হইতে বিবিধ বচন উদ্ধৃত করিয়া বহুল প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, গোঁড়ামি এবং বিদ্বেষ বিশুদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গ নহে, নির্ব্বোধ দাম্ভিকদিগের প্রভুত্বে শাস্ত্র লঙ্ঘিত হইয়া এই সকল ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কোরাণে নাকি পরধর্ম্মবিদ্বেষ বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, এবং কাফেররক্তে স্নান কোথাও পুণ্য বলিয়া উল্লিখিত হয় নাই।

মৌলবী সাহেব মহম্মদের উপদেশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহাতে বার বার বিশেষ করিয়া বলা আছে, ধর্ম্মবিষয়ে বলপ্রয়োগ করিবে না, অজ্ঞান দেবদেবীর উপাসকদিগকেও আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হইবে না, সকলকেই ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিতে পরামর্শ দিবে। যদি

তাহারা সনাতন মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করে, তাহারা সুপথে চালিত হইল; যদি তোমাদের কথায় কর্ণপাত না করে, তোমাদের কর্ত্তব্য কেবল ধর্ম্মোপদেশ দান। শাসন তোমাদের হস্তে নহে, তোমরা শুধু সাধু উপদেশ দ্বারা ঈশ্বরের ন্যায়ধর্ম্ম প্রচার কর। সত্য ঈশ্বরের নিকট হইতে আসে; যাহার ইচ্ছা বিশ্বাস কর, যাহার ইচ্ছা অবিশ্বাসীই থাক।

কেবলমাত্র উপদেশে নহে, দৃষ্টান্ত দ্বারাও মহম্মদ সকল ধর্ম্মের প্রতি এই উদার ব্যবহার শিক্ষা দিয়াছেন। হিজরী নবমাব্দে খ্রীষ্টানদিগের সহিত মহম্মদের এক সন্ধি স্থাপিত হয়। সন্ধিপত্রে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া তাঁহাদের প্রতি মুসলমানেরা অত্যাচার না করেন, তাঁহাদের সাংসারিক কিম্বা ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিপদ্ আপদে সাহায্য করা মুসলমানদিগের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করা হয় না, ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবকে সহায়তা করিয়া ঈশ্বরেরই প্রিয়কার্য্য সাধন করা হয়। এমন কি, মুসলমান স্বামীর যদি খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী স্ত্রী থাকেন, তাঁহারও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে মহম্মদ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। বলপ্রয়োগের পক্ষপাতী তিনি কখনই নহেন।

কিন্তু তবে তিনি অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন কেন? যীশু খ্রীষ্টের পথ অবলম্বন করিলেই ত পারিতেন। চিরাঘ আলি সাহেব ইহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি বলেন, চতুর্দ্দিকের বর্ব্বর জাতির উপদ্রব হইতে আত্মরক্ষার্থেই মহম্মদকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল, ধর্ম্মপ্রচার বা দিগ্বিজয় তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। যুদ্ধই যদি ধর্ম্মের প্রাণ হইত, তাহা হইলে কোরাণে এ সম্বন্ধে উপদেশের অভাব থাকিত না। ভ্রান্ত ধর্ম্মান্ধ রক্তপিপাসুগণ কোরাণের দোহাই দিয়া আপন আপন দারুণ রক্ততৃষা মিটাইয়াছে; লোকে মনে করে, মুসলমান ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা শাস্ত্রের উপরে নহে, শস্ত্রের প্রতাপে এবং শোণিতের প্রবাহে।

লোকের এরূপ মনে করিবার কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার আছে। যখন দেখে, শস্ত্রবলেই তোমরা চিরদিন অপরের শাস্ত্রকে জয় করিয়া আসিয়াছ, শোণিত দিয়া দেবমন্দিরের শুভ্র স্মৃতি মুছিয়া দিয়াছ, তখন এরূপ মনে করা কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে। লোকাচার ক্রমে শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্র ছিদ্রহীন সিন্দুকের গোপন অবরোধে অন্ধকারে সম্ভ্রমে একেলা বিরাজ করিতে থাকে। শুধু মুসলমান শাস্ত্রের নহে, সকল শাস্ত্রেরই এই দশা। তাই নরবলি এবং সতীদাহ আমাদের সমাজে একদিন অলঙ্ঘনীয় শাস্ত্রাদেশ ছিল। এবং তাহার জন্য নিন্দাভাজন আমাদের ধর্ম্ম।

মুসলমান মৌলবী তাঁহার গ্রন্থে ইহাই দেখাইয়াছেন। দেখাইয়াছেন, শাস্ত্র যাহা বলে, অন্ধ ভক্তেরা তাহারই অন্যথাচরণ করিয়া শাস্ত্রে ভক্তি প্রদর্শন করেন; নিন্দা হয় ধর্ম্মের। কোরাণ-বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কোরাণের নামে চলিয়া যায়, কোরাণ-বিরুদ্ধ কার্য্য কোরাণের প্রতি দোষারোপ করে। মৌলবী সাহেব বলেন, কোরাণ ধর্ম্মগ্রন্থমাত্র, ঈশ্বরের মহিমাপ্রচার এবং

দুর্নীতির উচ্ছেদই তাহার উদ্দেশ্য। মহম্মদ এই কারণেই তৎকালীন আরব সমাজের নীতিবিগর্হিত আচার এবং অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোরাণে অনেক উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এইখানেই তাঁহার সংস্কারকার্য্য শেষ হয় নাই। তাঁহার অনুসরণ করিয়া ধর্ম্মপরায়ণ মুসলমানগণ যাহাতে দেশ কাল অনুসারে সমাজের পঙ্ক উদ্ধার করেন, ইহাই মহম্মদের আন্তরিক কামনা। তাই তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা এবং বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে পরামর্শ দেন।

মহম্মদের সময়ে আরব সমাজের অবস্থা এতই শোচনীয় ছিল যে, শিশুহত্যা, অনিয়মিত বিবাহ এবং শিথিল দাম্পত্য ব্যতীত পিতৃপুরুষের বিধবা এবং ভগিনীর পাণিগ্রহণও গৌরবের বলিয়া বিবেচিত হইত। রমণীর প্রতি অত্যাচার এবং সাধ্বীর কলঙ্করটনায় দুরাচার আরবগণ পরম আনন্দ উপভোগ করিত। নিষ্ঠুরতাই তাহাদের ব্রত ছিল, এবং সাধ্বী অবলাগণ বলি। মহম্মদ দেখিলেন, এক দিনে এই দুর্বৃত্ত আরবদিগের মতিগতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করা দুঃসাধ্য, ক্রমে ক্রমে নানা উপায়ে যথাসাধ্য এই সকল দুরাচারের গতি রোধ করিলেন। শিশুহত্যা বন্ধ হইল, যথেচ্ছ দাম্পত্য-উল্লঙ্ঘন অনেক পরিমাণে শাসিত হইল, রমণীর অঙ্গাবরণ এবং আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হইয়া সম্মান কতকটা বৃদ্ধি পাইল। এ সকল সংস্কার সেই উচ্ছৃঙ্খল সমাজে বড় সহজ নহে।

কিন্তু এ অসাধ্যসাধনও মহম্মদ করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার মনের মত সকল হয় নাই। তাহার কারণ, সে সমাজের অবস্থা বিবেচনা করিয়া তিনি যতটুকু সংস্কার করিয়াছিলেন, তাহার পর আর বড় কেহ মুসলমান সমাজের সংস্কারকার্য্যে সক্ষম হয়েন নাই। সুতরাং সামাজিক উন্নতি অনেকটা বন্ধই রহিয়াছে। বহুদারপরিগ্রহ, ভোগ্যা দাসী রক্ষণ, ক্রীতদাসপ্রথা এবং আরও কতকগুলি নীতিবিরুদ্ধ আরবীয় আচার-ব্যবহারের তিনি নাকি বিশেষ বিরোধী ছিলেন। কিন্তু আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, মুসলমান জগতে আজিও এ সকল প্রথা অল্পবিস্তর প্রচলিত। এবং শুনিতে পাই, এ সকল বিষয়ে মহম্মদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের মধ্যে দারুণ অসামঞ্জস্যই ইহার কারণ।

চিরাঘ আলি সাহেব কিন্তু এ অসামঞ্জস্য সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ভোগলালসা অথবা পার্থিব সুখস্বাচ্ছন্দ্য মহম্মদের একাধিক দারপরিগ্রহের কারণ নহে। পঞ্চাশ বৎসরের অধিক মহম্মদ একপত্নীক ছিলেন, এবং বৃদ্ধ বয়সে যাহাদিগের পাণিগ্রহণ করেন, সকলেই দরিদ্র বিধবা এবং নিতান্ত অসহায়া। বিবাহ ভিন্ন অন্য উপায়ে এই সকল অনাথাদিগকে সহায়তা করিবার বড় সুবিধা ছিল না। সুতরাং কতকটা অবস্থায় পড়িয়া মহম্মদকে এই কার্য্য করিতে হয়। তাঁহার প্রথমা পত্নীই চিরদিন তাঁহার হৃদয় অধিকার

করিয়া ছিলেন। চিরাঘ আলি মহম্মদের সম্বন্ধে কতকগুলি ছোট ছোট গল্প বলিয়া তাঁহার সংযমের পরিচয় দিয়াছেন।

যাহাই হৌক্, কোরাণে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ বলা যাইতে পারে। মহম্মদের উপদেশ—চতুরধিক দারপরিগ্রহ করিবে না, এবং তাহাও চারি জনকে যদি যথার্থই সমভাবে দেখিতে পার; কিন্তু তোমরা যাহাই মনে কর না কেন, সামান্য মানব হইয়া কিছুতেই তাহা পার না। উচ্ছৃঙ্খল আরব প্রকৃতিকে তাহার বহুদিনের অভ্যাস এবং সংস্কার হইতে মুক্ত করিতে হইলে ইহাপেক্ষা অধিক কিছু বলা যায় না। আর বলিতে বাকীই বা কি আছে? মহম্মদের উপদেশ স্পষ্ট যথেষ্ট।

দাসীরক্ষণ এবং দাসপ্রথার উচ্ছেদ সম্বন্ধেও মহম্মদ সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয়েন নাই, অপেক্ষাকৃত নিবারণ করিয়াছেন মাত্র। আরব সমাজে তখন ইহা নহিলে চলিত না। সুতরাং একদিনে ইহার উচ্ছেদ অসম্ভব। বদ্ধমূল প্রথা উৎপাটন করিতে গেলে উপযোগী শিক্ষার আবশ্যক। অশিক্ষিত আরব সমাজে মহম্মদের সময়ে এ শিক্ষা গ্রহণ করিবার মত লোক কোথায়?

এইরূপ বিস্তর কোরাণের কথা এবং মুসলমান সমাজে তাহার নিয়মিত ব্যতিক্রমের উল্লেখ করিয়া মৌলবী সাহেব সমাজসংস্কারের প্রস্তাব করেন। তুরস্কের সুলতানের উপরেই তাঁহার অনেক আশাভরসা। মুসলমান জগতে সুলতানের অদ্বিতীয় প্রভাব। চিরাঘ আলির বিশ্বাস, সুলতান যদি শাস্ত্রানুগত সংস্কারকার্য্যে মনোযোগ করেন, অবিলম্বেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। লোকে বুঝিবে যে, বিদ্বেষ মুসলমান শাস্ত্রের আদেশ নহে এবং মুসলমান সমাজ কালোপযোগী পরিবর্ত্তনের বাহির নহে। কোরাণে ত দেশ কাল লঙ্ঘন করিয়া প্রাচীন জীর্ণ প্রথাটুকু মাত্রকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে কোথাও পরামর্শ দেয় না।

মৌলবী সাহেব বলেন, পরিবর্ত্তন আবশ্যক কেবল ইদানীন্তন কতকগুলি দাম্ভিক আইনের। ইদানীংই ত ভোগবিলাসের প্রাধান্যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘিত হইয়াছে। পূর্ব্বে যখন খলিফেরা প্রজাদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইতেন, তখন সুশৃঙ্খলা এবং সুশাসন তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। ক্রমে ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত তাঁহারা যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠিলেন। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সভাসদ্ পণ্ডিতদিগের দ্বারা ভোগবিলাস এবং যথেচ্ছাচারিতার অনুকূল আইন প্রণয়ন হইতে লাগিল। তখন হইতেই মুসলমান সমাজের অধঃপতন আরম্ভ।

শুনা যায়, মুসলমান ধর্ম্মে ভোগবিলাসের উপাদান কোরাণের কালের বহু পরে বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে। কোরাণে ভোগবিলাসের উপাদান কতকটা অবশ্য থাকিবারই কথা—নহিলে, নিদারুণ আরব সমাজের সহিত তাহার যোগরক্ষা হয় কিরূপে?—কিন্তু

পরবর্ত্তী অন্ধ গোঁড়ামি অতিরিক্ত নিষ্ঠাবাহুল্যে ধর্ম্মকে অধিকতর ভোগাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে। এবং সেই সঙ্গে অনেক সামান্য দেশাচার এবং লোকাচার নিঃশব্দে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া ক্রমে ধর্ম্মকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে।

চিরাঘ আলি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ না করিলেই মুসলমান সম্প্রদায়ের বর্ত্তমান যুগের সহিত সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। মুসলমান রমণীর অন্ধকার অবরোধের উল্লেখ করিয়া ইংরাজ লেখকেরা উক্ত সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বিশেষ হতাশ হইয়া পড়েন। চিরাঘ আলি তাহারও মীমাংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কোরাণে রমণীর অবরোধপক্ষে কোনও কথা নাই, নারীজাতিকে মহম্মদ বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, সেই জন্য তিনি তাঁহাদের অঙ্গাবরণের উন্নতি সাধন করিয়াছেন মাত্র, আর চালচলন সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছেন, যাহাতে পথে বাহির হইলে আপন সম্ভ্রমে তাঁহারা সুরক্ষিতা হয়েন।

কিন্তু শাস্ত্রবচন সম্ভ্রান্ত হইলেও অভ্যস্ত প্রথার বিরুদ্ধে পালিত হয় কদাচ। অনেক সময় বরঞ্চ প্রচলিত কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা শাস্ত্রের উন্নত আদেশ পালন করিয়া চলেন, তাঁহারাই শাস্ত্রহীন এবং ধর্ম্মহীন বলিয়া নিন্দিত হয়েন। আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যেই ত দেখা যায়, যে শাস্ত্রকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য করা হয় এবং তর্কস্থলে যাহার গৌরবে আমরা সবেগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্য্যপদ লাভ করিয়া বসি, তুচ্ছতম লোকাচারের বিরুদ্ধে সেই শাস্ত্রবিধি পালন করিয়া চলিলে রসনাবশিষ্ট সমাজে নিন্দা আর ধরে না। সেই জন্য সন্দেহ হয় যে, সুশিক্ষিত মৌলবী সাহেবের উদার ভাব গোঁড়া মুসলমানদিগের নিকট কিরূপ সমাদৃত হইবে। মৌখিক সমাদর ত এখানে প্রার্থনীয় নহে, শাস্ত্র পালনই শাস্ত্রে নিষ্ঠার পরিচয়।

কিন্তু এ সকল কথা যখন এক বার উঠিয়াছে, তখন ফল নিশ্চিত। বর্ত্তমান শিক্ষা মুসলমান সমাজেও ব্যর্থ হইবে না। কিছু দিন পরে অতিরক্ষণশীল পক্ষ হইতেই এই সকল কথা হয় ত নূতন বেশে বাহির হইতে থাকিবে। সংস্কারক সম্প্রদায় তত দিনে হাতে কলমে অনেকটা অগ্রসর হইবেন। সকল সমাজেই এইরূপ ঘটিয়া থাকে।

চিরাঘ আলি প্রসঙ্গক্রমে স্পেনদেশে আরবশাসন এবং তুরস্কের ন্যায়শাসনপ্রণালীর উল্লেখ করিয়া মুসলমান উদারতা সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিয়াছেন। ইংরাজ লেখকদিগের কথা খণ্ডন করিতে তাঁহাকে সে সকল কথা বলিতে হইয়াছে। বিস্তারিত উল্লেখ বাহুল্য বলিয়া এ প্রবন্ধে আমরা তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। মুসলমান সমাজে বর্ত্তমান শিক্ষার প্রভাব দেখানই আমাদের উদ্দেশ্য। পাঠকেরা তাহার কতকটা আভাস পাইয়াছেন। আমাদিগের সহিত অবস্থাসাদৃশ্যে বাকিটুকু একরূপ অনুমান করিতে

পারেন। ইংরাজী ভাষাভিজ্ঞ পাঠকদিগকে মৌলবী সাহেবের গ্রন্থখানি এক বার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ['সাধনা,' মাঘ ১২৯৮]

মালবিকাগ্নিমিত্র

পাঁচ অঙ্কের নাটক বটে, কিন্তু নাটিকা রত্নাবলীর সহিত মালবিকাগ্নিমিত্রের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার সম্পূর্ণ ঐক্য না হইলেও মূল আখ্যায়িকা এবং চরিত্রাংশে উভয় গ্রন্থের মধ্যে ঐক্যস্থল এত অধিক যে, সত্য হৌক্ বা না হৌক্, একের অনুকরণে অপরের স্ফূর্ত্তি বিশ্বাস করিতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হয় না। বৎসরাজের মত অগ্নিমিত্রও ধীরললিত নায়ক, মালবিকার প্রেমে পাগল, মহিষীর ভয়ে কেবল প্রকাশ্যে দেখাশুনার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। প্রমোদ-উদ্যানে গোপনে দু এক বার দেখাসাক্ষাৎ ঘটিল যদি বা, মহিষীর কর্ণগোচর হইতেই তিনি মালবিকাকে অবরুদ্ধ করিলেন। বলা বাহুল্য, ছলে কৌশলে মালবিকা অবরোধ হইতে মুক্ত হইল, এবং সাগরিকার মত মহিষী কর্ত্তৃক একদিন রাজার বাম পার্শ্বে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিল।

যে প্রণয়ব্যাপার রত্নাবলী নাটিকার মূল ঘটনা, মালবিকাগ্নিমিত্রেরও তাহাই। মহিষীর বৃথা সতর্কতা, নায়ক নায়িকার অবস্থা, গোপনমিলন এবং তাহার ফলাফল, রাজার ভাবভঙ্গী, বিদূষকের কার্য্যাকার্য্য, শেষ অঙ্কে দুই চারিটা যুদ্ধজয়সংবাদ, রাজকর্ম্মচারিসমাগম এবং বাঞ্ছিতমিলনে উপসংহার উভয় গ্রন্থেই এক। তবে দু একটি চরিত্র হয় ত এ গ্রন্থে আছে, ও গ্রন্থে নাই বা বিভিন্ন কবির হস্তে ঘটনার ঈষৎ পরিবর্ত্তনে একটু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গল্পেরও পরিবর্ত্তন এইরূপ। রত্নাবলীর পিতা বৎসরাজের সহিত বিবাহের জন্যই কন্যাকে কৌশাম্বীতে প্রেরণ করেন, পথিমধ্যে যানভঙ্গ হইয়া রত্নাবলীকে অনেক কষ্ট সহিতে হয়, পরিশেষে কৌশাম্বীতে আসিয়া রাজ্ঞী বাসবদত্তার পরিচারিকাপদলাভ। মালবিকার ভ্রাতা মাধবসেন ভগিনীকে অগ্নিমিত্রের করে সমর্পণ করিতে বিদিশায় আসিতেছেন, পথিমধ্যে পিতৃব্যপুত্র যজ্ঞসেন কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হয়েন; সচিব সুমতি গোপনে মালবিকাকে অবরোধমুক্ত করিয়া স্বীয় ভগিনী কৌশিকী সমভিব্যাহারে এক সার্থবাহের সহিত বিদিশাভিমুখে চলিলেন। অরণ্যপথে রাত্রি হইল, সুমতি দস্যুহস্তে নিহত হইলেন, ধন রত্ন আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়া মালবিকাকে দস্যুগণ তৎপ্রদেশের দুর্গপাল বীরসেনের নিকট উপঢৌকন পাঠাইল, মূর্চ্ছাপন্না কৌশিকীকে মৃতা ঠাহরাইয়া পরিত্যাগ করিয়া গেল। বীরসেন শিল্পনিপুণা দেখিয়া মালবিকাকে ভগিনী

বিদিশারাজমহিষী ধারিণীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন, মালবিকা ধারিণীর পরিচারিকা হইয়া থাকে।

এখানে ঘটনার প্রভেদের মধ্যে সমুদ্রে যানভঙ্গ, আর মানবহস্তে অন্যরূপ বিপদ্। পরেও তাহাই। রাজ-অন্তঃপুরে রত্নাবলীরও যে দশা, মালবিকারও সেইরূপ। তবে ধারিণী আপন চিত্রশালার জন্য মালবিকার একখানি চিত্র প্রস্তুত করাইয়াছেন, বাসবদত্তার এরূপ কোনও অনুষ্ঠান শুনা যায় না। কিন্তু এই চিত্রই মহিষীর কাল হইল। চিত্রশালায় রাজ্ঞীর পরিচারিকাগণমধ্যে মালবিকার চিত্র দেখিয়া রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কাহার চিত্র? দেবী কথাটা চাপা দিতে চেষ্টা করেন। বালস্বভাববশতঃ কুমারী বসুলক্ষ্মী নাম বলিয়া ফেলিল—মালবিকা। সেই অবধি মালবিকাকে দেখিবার জন্য রাজা অধীর।

কিন্তু উপায় কি? বিদূষকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। বিদূষকই এ সকল বিষয়ে রাজাদিগের প্রধান সহায়। বিদূষক ব্রাহ্মণের সন্তান, কিন্তু ব্রহ্মণ্যহীন, চাটুবৃত্তি অবলম্বনে বিপুল উদরপূরণেই পটু। ভাঁড়ামি করিতে পারে, অন্তঃপুরে প্রবেশাধিকার আছে, পরিচারিকাদিগের সহিত হাসিয়া রসিকতা করে, মন রক্ষাই তাহার ব্যবসায়। ব্রাহ্মণের সে পূর্ব্বগৌরব আর নাই, সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত শ্রমসাধ্য অধ্যয়ন অধ্যাপনা ছাড়িয়া অনেকেই অপেক্ষাকৃত সহজ এবং অলস অনেক কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছেন। সে কালের রাজকুলে এমন এক একটি নখদন্তহীন অক্ষম জীব পোষণ একটা ফেসান ছিল। ইহারা জাতিগুণে রাজার সখা, এবং নিজগুণে চাটুকার মোসাহেব। সম্মানও জাতি এবং গুণে মিশ্রিত—কতকটা ব্রাহ্মণের মত, কতকটা চাটুকারোপযোগী।

মালবিকার চিত্র দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হইয়াছেন, সুতরাং বিদূষককে মালবিকাকে রাজার নেত্রপথে উপস্থিত করিতে হইবে। কিছু দিন হইল অন্তঃপুরে কৌশিকীনাম্নী একজন পরিব্রাজিকা আসিয়া জুটিয়াছেন, তিনি এখন রাণীর খুব প্রিয়পাত্রী, বিদূষক তাঁহারই সহিত পরামর্শ আঁটিয়া এক উপায় অবলম্বন করিল। গণদাস এবং হরদত্ত নামে রাজপরিবারের আশ্রয়ে দুই জন নাট্যাচার্য্য ছিলেন। মালবিকা রাজ্ঞীর আদেশানুসারে গণদাসের নিকট অভিনয়াদি শিক্ষা করে। বিদূষক নাট্যাচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দিয়া মীমাংসার্থে উভয়কে রাজসমীপে লইয়া আসিল। সেখানে দেবীর সমক্ষে কৌশিকীর পরামর্শে স্থির হইল যে, উভয়েই আপন আপন শিষ্যের প্রয়োগপ্রদর্শনে নৈপুণ্যের পরিচয় দিবেন। গণদাস মালবিকাকে লইয়া আসিলেন। মালবিকার রূপে এবং অভিনয়নৈপুণ্যে রাজা মুগ্ধ। বেলা অধিক হইয়াছে বলিয়া হরদত্তের গুণপনার পরিচয় সে দিন আর লওয়া হইল না। তাহার আর প্রয়োজনও নাই। এখন মালবিকাকে কোন প্রকারে পাইলে হয়।

বিদূষকের সাহায্যে প্রমোদ উদ্যানে দেখাশুনারও সুবিধা ঘটিল। কিন্তু রত্নাবলীতে যেরূপ অনুকূল ঘটনায় আখ্যায়িকা জটিল এবং বিস্তৃত না করিয়া কবি চতুর্দ্দিক্ হইতেই অনুরাগ প্রস্ফুটিত করিয়া তুলিয়াছেন, মালবিকাগ্নিমিত্রে তাহা তেমন দক্ষতার সহিত সম্পন্ন হয় নাই। বিদূষক মালবিকার সখী বকুলাবলিকাকে হস্তগত করিয়াছে। অদৃষ্টগুণে একটা সুবিধাও জুটিয়া গেল। অন্তঃপুরের প্রমোদ উদ্যানে একটি অশোকতরু আছে, বহুদিন তাহাতে ফুল ফুটে নাই, সুতরাং প্রাচীন প্রথানুসারে সেই অশোকবৃক্ষে সুন্দরীর সনূপুর পাদতাড়ন আবশ্যক। দেবী নিজের শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন মালবিকার উপর এই কার্য্যভার ন্যস্ত করিলেন। মালবিকা সখী বকুলাবলিকার সহিত উদ্যানে গিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইল। বকুলাবলিকা এইখানে নির্জনে তাহাকে রাজার প্রার্থনা জানাইল। রাজাও এই সময়ে উদ্যানেই উপস্থিত ছিলেন। সখীদ্বয়ের কথাবার্ত্তায় ভরসা পাইয়া নিজেই আসিয়া মালবিকার নিকট অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। রত্নাবলীতে সাগরিকার গোপনে মদনরূপে রাজার চিত্র অঙ্কনে এবং সুসঙ্গতাকর্ত্তৃক তাহারই পার্শ্বে সাগরিকার রতিমূর্ত্তি অঙ্কনে কাজটা অনেক সহজে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সারিকা-ব্যাপারে সাগরিকার প্রণয়-ব্যক্তি এবং তাড়াতাড়িতে চিত্রটি ফেলিয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। এবং পরে কদলীগৃহে রাজার সহিত নয়নে নয়নে মিলনে, নীরব লজ্জায়, সহসা মহিষীর আবির্ভাবে এবং বিদূষকের হস্ত হইতে চিত্রপতনে সমস্ত ব্যাপার খুব স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আর দৃশ্যকাব্যের দৃশ্যও এখানে চূড়ান্ত। আখ্যায়িকাপারিপাট্যেই কি, আর দৃশ্য হিসাবেই কি, রত্নাবলীর স্থান মালবিকাগ্নিমিত্রের ঊর্দ্ধে।

রত্নাবলীতে সকল চরিত্রগুলিতেই সজীবতা এবং চতুরতা বিশেষ পরিস্ফুট। মালবিকাগ্নিমিত্র নির্জ্জীব নহে, কিন্তু রত্নাবলীর চরিত্রে যেরূপ আবেগ এবং উদ্যম দৃষ্ট হয়, মালবিকাগ্নিমিত্রে তেমন নয়। অনুরাগে, বিরাগে, অভিমানে, প্রেমালাপে, সর্ব্বত্রই রত্নাবলীতে একটা তীব্রতা আছে। তাহার প্রতি ঘটনায় দ্রুত গতি অনুভব হয়। বিদূষকের হস্ত হইতে চিত্রটি পড়িয়া যাইতে মহিষী ব্যাপার বুঝিয়া অবিলম্বে যে অসুস্থতার ভাণ করিয়া চলিয়া গেলেন, তাহাতে যে মর্ম্মান্তিক তীব্রতা প্রকাশ পাইয়াছে, মালবিকাগ্নিমিত্রে তাহা কোথায়? তাহার পরে আর এক স্থলে কেমন বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া মহিষীর অভিমান ব্যক্ত হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রে প্রমোদ উদ্যানে মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের যখন কথাবার্ত্তা হয়, নিকটেই বৃক্ষান্তরালে অপরা রাজভার্য্যা ইরাবতী লুকাইয়া ছিলেন। ব্যাপার দেখিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, এবং শঠ সম্ভাষণে রাজাকে যথেচ্ছা কড়া কড়া দুই কথা শুনাইয়া দিলেন। মহিষীকে সকল কথা বলিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়াও গেলেন। কিন্তু বাসবদত্তার সাভিমান কথাবার্ত্তায় যেমন রস এবং বাঁধুনি

আছে, ইরাবতীর ভর্ৎসনায় সেরূপ কিছুই নাই। কড়া মেজাজে কেবলই "সঠ। অবিস্সসণীওসি।" তাহার পর রাজাকে কাঞ্চী লইয়া তাড়না। রাজা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে চাহেন। ভামিনী রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেলেন। রাজা তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে চলিলেন। সে কালের রাজকুল নারীর হৃদয়রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইতে নিতান্ত নারাজ। যে কয়টিকে দখলে রাখিতে পারেন, ততই সুখ।

অসংযত রাজচরিত্রের পক্ষে রূপসীর রূপমোহ অনিবার্য্য। এবং এই দারুণ রূপমোহই অধিকাংশ সময়ে প্রেম বলিয়া চলিয়া যায়। রাজাদিগের প্রেম বোধ হয় আসলে মহিষীর প্রতি। প্রথম বয়সে যে অনুরাগ জন্মে, তাহার উপর কতকটা বিশ্বাস স্থাপন করা যায়। আর মহিষীর সন্তানই নাকি পরে পিতৃসিংহাসনের অধিকারী হয়। এই কারণে মহিষীর প্রতি অন্তরে অন্তরে একটু টান থাকিয়া যাইবার সম্ভাবনা; এবং এই অনুরাগটুকুর জন্যই মহিষীর যাহা কিছু প্রভাব।

তাই মালবিকার সহিত অগ্নিমিত্রের গোপন প্রণয়ব্যাপার মহিষীর কর্ণগোচর হইতেই তিনি সখী বকুলাবলিকার সহিত মালবিকাকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। রাজা কিছু বলিতে পারেন না। প্রাচীন কালে আমাদের মহিষীদের এই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল বলিয়াই তবু রক্ষা। নহিলে এই উচ্ছৃঙ্খল রাজকুলকে দমনে রাখা কি সহজ? রাজা মালবিকাবিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। দেবীপ্রদত্ত অভিজ্ঞান-অঙ্গুরীয়ক বিনা প্রহরী মালবিকাকে বাহির হইতে দিবে না। বিদূষক উপায় ঠাহরাইল। একদিন রাজা, রাণী, পরিব্রাজিকা কৌশিকী অন্তঃপুরে বসিয়া আছেন, বিদূষক কণ্টকবিদ্ধ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে দৃঢ়রূপে উপবীত বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। কি হইয়াছে? বিদূষককে সর্পে দংশন করিয়াছে, হয় ত এ যাত্রা আর রক্ষা হইল না। ধ্রুবসিদ্ধির নিকট লোক পাঠান হইল। বিদূষক বাহিরে আসিল। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতীহারী রাণীর নিকটে আসিয়া বলিল, বিষপাথর নহিলে ব্রাহ্মণ এ যাত্রা রক্ষা পায় কি না পায়। করুণহৃদয়া ধারিণী আপন অঙ্গুরীয়ক খুলিয়া দিলেন—অঙ্গুরীয়কে বিষাপহার মণি ছিল। বিদূষক অঙ্গুরীয়কের সাহায্যে মালবিকাকে মুক্ত করিল। রাণী শুনিলেন, ব্রাহ্মণের দেহ হইতে বিষ নামিয়া গিয়াছে।

রত্নাবলীতে ঐন্দ্রজালিকের কাল্পনিক অগ্নিতে অন্তঃপুর প্রজ্বলিত করায় দৃশ্যকাণ্ড জমকালো হইয়াছে। সে কালে রঙ্গমঞ্চে এখনকার মত দৃশ্যপট ব্যবহার ছিল না, হয় ত নেপথ্যে একটা খুব আগুন জ্বালাইয়া লোকের মনে এই ভাব মুদ্রিত করিয়া দিতে হইয়াছিল। রত্নাবলীর গ্রন্থকার তাঁহার নাটকে দৃশ্যকাণ্ডের সমারোহে খুব জমাট করিয়াছেন। আরম্ভে মদনোৎসব হইতেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। ধারাযন্ত্র,

লোকজন, বসন ভূষণের বিচিত্র সৌন্দর্য্য, সমস্ত মিলিয়া লোকের মনে একটা গম্ভীর জমকালো ভাব আনিয়া দেয়। অনেক কথা না বলিয়া ইহাতে অনেকটা কাজ হয়। দৃশ্যকাব্যে দৃশ্যকাণ্ডের সরঞ্জাম বড় কম নয়। অনেক দোষ ঢাকিয়া যায়, এবং অনেক গুণ সমধিক ফুটিয়া উঠে।

মালবিকাগ্নিমিত্রে অনেক স্থলে কবিহৃদয়ের বিকাশ হইলেও এ সকল বিষয়ে রত্নাবলীতে অনেক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে স্বীকার করিতে হয়। রত্নাবলীর সুনিপুণ রচয়িতা দৃশ্যবৈচিত্র্যে এবং সমারোহে মালবিকাগ্নিমিত্রের আখ্যায়িকাকে যেন দৃশ্যোপযোগী করিয়া রঙ্গমঞ্চের আরও উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন। বিবিধ দৃশ্যপরিবর্ত্তনে দর্শকবৃন্দের মন সমধিক স্ফূর্ত্তিতে থাকে। নয়নরঞ্জনে মনোরঞ্জনের বিশেষ সহায়তা করে কি না। মালবিকাগ্নিমিত্রে দৃশ্যের আয়োজন এত নহে। তবে দৃশ্যপরিবর্ত্তন অবশ্য যথেষ্ট আছে, এবং এত জাঁকজমক না থাকিলেও দৃশ্যগুলি সুন্দর এবং কবির নাট্যরস ও নাট্যসরঞ্জাম জ্ঞানের পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

আর কেবলমাত্র দৃশ্যকাণ্ডই ত নাটকের সর্ব্বস্ব নহে। মালবিকাগ্নিমিত্রে গ্রন্থকারের হাত কাঁচা বটে, প্রথমেই লেখক তাহা কতকটা স্বীকারও করিয়াছেন। রত্নাবলী ইহাপেক্ষা পাকা নাটককারের রচনা। কিন্তু মালবিকাগ্নিমিত্রের মধ্যে মধ্যে যাহা দেখা যায়, তাহাতে ইহার লেখককে রত্নাবলীর লেখক অপেক্ষা সুকবি বলিয়া মনে হয়—কেবল এখনও হাত পাকে নাই। প্রথম রচনায় বাঁধুনির পারিপাট্যের অভাব একটু থাকেই। মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা অভিজ্ঞানশকুন্তলে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন ত। কিন্তু উভয় নাটক একই কবির রচনা কি না, এই বিষয় লইয়া বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে মতভেদ। আখ্যায়িকাংশ শেষ করিয়া এ বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

অবরোধ হইতে বাহির হইয়া মালবিকার রাজার সহিত গোপনে আবার দেখাশুনা হয়। কিন্তু ইরাবতীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হইতে রাজা কিছুতেই মুক্তি লাভ করিতে পারিলেন না। দৈবানুগ্রহে এক বানর রাজার সহায় হইল। বসুলক্ষ্মীকে বানরে তাড়া করায় চতুর্থ অঙ্ক গোলেমালে সমাপ্ত হইল—ইরাবতীর কাঞ্চীতাড়নার হস্ত হইতে রাজা নিষ্কৃতি পাইলেন।

পঞ্চম অঙ্কে অগ্নিমিত্রের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। উদ্যানপালিকার নিকট হইতে অশোকতরুর পুষ্পোদ্গমবার্ত্তা শ্রবণে মহিষী আহ্লাদিত হইয়াছেন। যজ্ঞসেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন। অশ্বমেধের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত অগ্নিমিত্রের পুত্র বসুমিত্র যবনদিগকে রণে পরাজিত করিয়াছেন। মহিষীর আহ্লাদ ধরে না। অন্তঃপুরে তিনি বিবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার বিতরণ করিলেন। আর অগ্নিমিত্রের করকমলে বাঞ্ছিত মালবিকাকে সমর্পণ করিয়া দিলেন। পরিব্রাজিকা কৌশিকী মালবিকার সমস্ত বৃত্তান্ত

বলিলেন। তিনি দস্যুদিগের কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া যখন চেতনা লাভ করিলেন, চতুর্দ্দিকের অবস্থা বুঝিয়া পরিব্রাজিকাবেশে বিদিশায় আসিলেন। তাহার পর ঘটনাচক্রে মহিষীর সহিত পরিচয় ইত্যাদি ইত্যাদি। মালবিকালাভে রাজার মনস্কামনা পূর্ণ হইল।

এইখানেই গ্রন্থসমাপন। তাহার পর এখন গ্রন্থের প্রধান অপ্রধান চরিত্র, রচনাপ্রণালী, ভাষা, ভাব, দোষ গুণ লইয়া কথা। আরও এক কথা, এ গ্রন্থ অভিজ্ঞান-শকুন্তলরচয়িতা কালিদাসের রচনা কি না। চরিত্র সম্বন্ধে আমরা আখ্যায়িকা বর্ণনার মধ্যে মধ্যে আভাসে ইঙ্গিতে যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি। আর রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়াই ত রচয়িতাকে বাহির করিতে হইবে। সুতরাং মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা কে—কালিদাস বা অপর কেহ—ইহাই আমাদের এখন আলোচ্য।

গ্রন্থারম্ভে স্নিগ্ধগম্ভীর নান্দীবাচন এবং কৈফিয়ৎযুক্ত প্রস্তাবনা হইতেই মালবিকাগ্নি-মিত্রকে কালিদাসের রচনা বলিয়া মনে হয়। অভিজ্ঞানশকুন্তল-পাঠকেরা অনেকেই বিশেষ মনোযোগ সহকারে বার বার পাঠ করিয়া থাকিবেন, তাহার নান্দীবাচনের সহিত মালবিকাগ্নিমিত্রের নান্দীবাচন তুলনা করিয়া দেখিলে দুইটিই যে একই কবির রচনা, তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। রত্নাবলীর নান্দীবাচন দেখ, গাম্ভীর্য্যে এবং ঔদার্য্যে মালবিকাগ্নি-মিত্রের পার্শ্বে কিছুতেই স্থান পায় না। কালিদাস দেবতার দেবত্ব বুঝিতেন, দেহ দিয়া ঘিরিলেও তাহার মধ্য হইতে অনন্ত মুক্ত ভাব ফুটাইয়া তুলেন। সীমা ছাড়াইয়া, দেহ ছাড়াইয়া তাঁহার মত ভাবময় অসীমে বিচরণ করিতে পারেন কোন্ কবি? ইহাতেই কালিদাসের নান্দীবাচন দেখিলেই বুঝা যায়। এবং এই নান্দীবাচনেই মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা ধরা দেন।

তাহার পর প্রস্তাবনায় ধাবক সৌমিল্লাদির কথা পাড়িয়া নিজের নূতন রচনার যেখানে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন যে,

"পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যম্।
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পরপ্রত্যয়নেয়বুদ্ধিঃ॥"

সেইখানেই বুঝা যায় যে, মালবিকাগ্নিমিত্র নাট্য-সাহিত্যে কালিদাসের প্রথম উদ্যম। কালিদাস নিজের ক্ষমতা বুঝেন; তাই একটু জোর করিয়া বলিয়াছেন,—পরীক্ষা করিয়া দেখ, নাম শুনিয়া বিচার করিতে বসিও না, পুরাতন হইলেই যে সকল জিনিস ভাল হয় আর নূতন হইলেই মন্দ, তাহা নহে, মূঢ়েরাই এইরূপ পরের মুখে ঝাল খাইয়া থাকে, সজ্জন পণ্ডিতেরা বিচার করিয়া দেখেন। এরূপ সগর্ব্ব বিনয় কালিদাস ভিন্ন অন্যে দেখা যায় না।

আভ্যন্তরীণ প্রমাণ অর্থাৎ রচনা দেখিয়া আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, তাহাতে কালিদাসকেই মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। কালিদাসের রচনার অনেকগুলি গুণই মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখা যায়; যথা, সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরের অভাব, বলিবার সহজ ধরণ, মধ্যে মধ্যে সুবিধা পাইলেই কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমও ব্যক্ত হইয়াছে। তবে মালবিকাগ্নিমিত্রের গঠন তেমন পরিপাটি নহে বটে। সেই জন্যই আমরা কালিদাসের কাঁচা হাত বলিয়াছি। আর একটু গঠনপারিপাট্য হইলে মালবিকাগ্নিমিত্রের রচয়িতা সম্বন্ধে সকল সংশয় দূর হইত। মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে বাস্তবিকই সন্দেহের উদয় হয় যে, বুঝি কালিদাস এ গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। কিন্তু চতুর্দ্দিক্ মিলাইয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে সন্দেহ অনেকটা ঘুচে।

কিন্তু বিরোধী পক্ষ ধাবক, শ্রীহর্ষ এবং কালিদাসের কাল নিরূপণ করিয়া, এবং মালবিকাগ্নিমিত্রে ধাবকের নাম উল্লেখ দেখিয়া মালবিকাগ্নিমিত্রকে কালিদাসের সময়ের বহু পরে রচিত প্রমাণ করিতে চাহেন। কিন্তু সংস্কৃত গ্রন্থে লিপিকরপ্রমাদে যেরূপ পাঠান্তর হয়—মালবিকাগ্নিমিত্রেরও কোনো কোনো পুথিতে ধাবক স্থানে ভাসক নাম দেখা যায়—তাহাতে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ ছাড়িয়া এ সকল প্রমাণের উপর তেমন নির্ভর করা যায় না। ব্যুৎপন্ন পুরাতত্ত্বপণ্ডিতগণ এ বিষয়ে সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বাধিত করিবেন। সংস্কৃত সাহিত্যে আমার তাদৃশী ব্যুৎপত্তি নাই যে, অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগপূর্ব্বক নিঃসংশয়ে কিছু প্রতিপন্ন করিয়া দিই। কাব্যপাঠকালে রচনাপ্রণালী দৃষ্টে সাধারণ পাঠকের মনে যে সকল কথার উদয় হয়, তাহাই বলিয়াছি মাত্র। ['সাধনা,' মাঘ ১২৯৮]

পুরাতন চিঠি

হাতে কাজ নাই; ডেস্কের মধ্যে কতকগুলি পুরাতন চিঠি ছিল, বাহির করিলাম।

শাদা কাগজের উপরে সারি সারি কালির অক্ষর—আমার পুরাতন বন্ধুর পুরাতন পরিচিত হাতের লেখা। দূর দেশে থাকিতে বন্ধু বন্ধুকে চিঠি লিখিয়াছে।

এই চিঠিটুকুর জন্য তখন কি অধীর ভাবে পথ চাহিয়া থাকিতাম! কখন্ গলির মোড়ে ডাকহরকরার শ্যামমূর্ত্তি দেখা দেয়! কখন্ আমার একখানি চিঠি আসে।

এখন বন্ধু আমার হাতের কাছে—এই এবাড়ী ওবাড়ী। যখন তখন দেখা হয়। দুই ছত্র চিঠিতে সকল মনের কথা অসম্পূর্ণ নিঃশেষ করিতে হয় না।

কোণের ঘরে বসিয়া নিরিবিলি বন্ধুর চিঠি পড়িতেছি—বহু দিনের পুরাতন চিঠি, উজ্জ্বল কালির অক্ষর ঈষৎ ম্লান হইয়া গিয়াছে। এই ম্লানোজ্জ্বল বর্ণে আমার বহু পুরাতন দিনের

প্রথম স্নেহ-সখ্যের সম্বন্ধ মনে পড়ে। প্রথম সেই যখন চিঠি লিখিতে শিখি, আর প্রথম সেই যে চিঠি পাই।

এই পুরাতন চিঠিগুলি আমার সেই প্রথম বয়সের বিজন স্মৃতিমন্দির। তখনকার সকল কথা ভাল মনে পড়ে না, অনেক কথা এত দিনে ভুলিয়া গিয়াছি, চিঠিগুলি পড়িয়া কতক কতক মনে করি।

তাই অবসর পাইলেই আমি ডেস্ক ঝাড়িয়া চিঠি গুছাইতে বসি। সময়ের হয় ত একটু আধটু অপব্যয় হয়, কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগে। পুরাতন চিঠির কি এক সরল মোহ আছে।

এই মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আমি বেশ সুখে থাকি। এ পুরাতনের মোহ অতিক্রম করিতে চাহে কে? উন্মাদনা নাই, তীব্রতা নাই, কেবলি বেদনার আনন্দ এবং সুখের শান্তিটুকু।

পরে পরে চিঠিগুলি পড়িয়া শেষ করিলাম। তারিখ অনুসারে আমি সাজাইয়াছি। অনেক চিঠি জমিয়াছে—অনেক দিনের লেখা। বন্ধু যেখানে গিয়াছে, চিঠি লিখিতে ভুলে নাই। আমিও যেখানে থাকি, আগেই তাহাকে লিখি।

অনেক চিঠির খামগুলিও রাখিয়া দিয়াছি। খামের উপরে মৃদু হস্তে আমার নাম লেখা। দুএকখানিতে আমার নামের পার্শ্বে কীটে ছিদ্র করিয়াছে। এ সনাতন কীটবৃত্তির হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ বহু জন্মের বহু পুণ্যফল নহিলে ঘটে না।

আমি ঝাড়িয়া মুছিয়া চিঠিগুলি খামে পুরিলাম এবং যেমন ছিল, একে একে রাখিয়া দিলাম। ডেস্কের মধ্যে খোপ খোপ করা। একটি খোপে আমার চিঠি থাকে। পুরাতন বন্ধুর চিঠি বৈ আমার আর চিঠি নাই।

বন্ধু কত কি লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া ত আর লেখে নাই। নিজের অবস্থা, চারি দিকের লোকজনের ভাবগতিক, দৃশ্যবৈচিত্র্য, সামাজিক রীত নীতি, অনেক কথা—এমন অনেক হাস্যপরিহাস, গল্পগুজব।

সে সকল কথা অপরের ভাল লাগিবে না। তোমরা ত্রুটি ধরিবে, নয় সমালোচনা করিবে। আমি বন্ধুকে জানি, আমার নিকট তাহার আদর। তোমাদের কাছে ত আর তাহা নয়।

তোমরা আবশ্যকের হিসাবে দেখ, আমার পুরাতন চিঠিতে, পুরাতন স্মৃতিতে তোমাদের যায় আসে কি? কিন্তু আমি এই চিঠি পড়িয়া বন্ধুকে হৃদয়ে অনুভব করি। মনে হয়, বন্ধুর সহিত বিজনে বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছি—পুরাতন শৈশবের কথা, পুরাতন সুখদুঃখের কথা।

আমার ঘরের দেয়ালে বহুদিনের একটি অসম্পূর্ণ মুখ অঙ্কিত আছে। প্রথম ছবি আঁকিতে শিখিয়া বন্ধু এই মুখটি আঁকিয়াছিল। তাই আমি আজও ছবিটি মুছি নাই। চিঠি পড়িয়া একবার সেইটি দেখি—ধূলায় ধূলায় প্রতি দিন অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এখনও বুঝা যায়। যে পেন্সিলে বন্ধু আঁকিয়াছিল, সে পেন্সিলটি আমার কাছে আছে। পুরাতন চিঠির সঙ্গেই থাকে।

ছোট্ট ডেস্কের মধ্যে আমার ছোটখাট জীবনের ছোটখাট অতীত চাবিবন্ধ। আমার পুরাতন জীবন ইহারই নিভৃত খোপে নিরিবিলি বাস করে। কিন্তু এখানেও নিরুপদ্রব নহে। অদৃষ্টকীট নিঃশব্দে তাহাকে কাটিতে থাকে।

আমি বর্ত্তমানশ্রান্ত পথিক, মধ্যে মধ্যে এই পুরাতনের স্নেহে শান্তি লাভ করিতে আসি। চুপিচাপি আমার শৈবালাচ্ছন্ন অতীতের সমাধিমন্দিরে গিয়া একা একা বসিয়া থাকি। একটি পেন্সিলের দাগে, দুইটি পুরাতন পরিচিত হাতের অক্ষরে আমার সমস্ত পুরাতন—আমার সমস্ত অতীত। ['সাধনা,' ফাল্গুন ১২৯৮]

নীতিগ্রন্থ

বাঙ্গলায় আজকাল অনেকে নীতিগ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য মহৎ; কিন্তু যে উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে সে উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা অল্প।

তাঁহারা কি করিতেছেন? ছেলেদিগকে নীতিকথা শুনাইতেছেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, নীতিকথা জানে না কে? যে ছেলে বই পড়িতে শিখিয়াছে এবং নীতিগুরুমহাশয়ের রচিত বড় বড় সংস্কৃত কথা পরিপাক করিতে পারে, সে যদি জ্ঞানেও না জানে যে, পিতা মাতা ভক্তির পাত্র, তবে তাহার কানে নীতিমন্ত্র দেওয়া যা, আর সোলার পাখীকে হরিনাম পড়ানও তাই। আর যে ছেলে জানে, তাহাকে পুনর্ব্বার শত বার করিয়া জানাইতে গেলে হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা।

নীতি যদি বৈজ্ঞানিক সত্যের মত কেবলমাত্র জ্ঞানের বিষয় হইত, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু নীতি যতক্ষণ কাজে পরিণত হইবার উপযোগী না হয়, ততক্ষণ তাহার কোন মূল্য থাকে না।

কেবলমাত্র জ্ঞান আমাদিগকে কোন কাজে প্রবৃত্ত করাইতে পারে না, ভাবের আবশ্যক। সেটা কোথায় পাওয়া যায়?

নীতির মধ্যে এই যে দুটা অংশ আছে—জ্ঞান ও ভাব, তাহার মধ্যে জ্ঞানটা সর্ব্বপরিচিত ও পুরাতন, ভাবটা কাহারো আছে, কাহারো নাই, কাহারো বেশী, কাহারো কম এবং ভাব কখনও পুরাতন হয় না। পুরাতন জ্ঞানের কথাকে যত বার পুনরুক্ত করিবে, ততই সে পুরাতনতর জীর্ণতর হইয়া উঠিবে—কিন্তু ভাবকে যতই অনুভব করাইবে, ততই সে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে। আমাদের নীতিলেখকেরা বার বার নীতিকথা আওড়াইয়া নীতির অতি পরিচিত পুরাতন অংশকেই সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতেছেন। যদি কোন ছেলেদের নীতির অভাব থাকে, নীতির প্রতি বিরাগ থাকে, তবে তাহার সেই বিতৃষ্ণা দৃঢ় বদ্ধমূল করিবার এমন সহজ উপায় আর নাই।

কিন্তু লেখার দ্বারা ভাবোদ্রেক করিতে গেলে সাহিত্যের আবশ্যক। জনসাধারণের দুর্ভাগ্যক্রমে নীতিকথা যে সে বলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য তেমন সহজ জিনিস নহে। এই জন্য নীতি-উপদেশ এতই সুলভ, এবং এই জন্যই নীতি-উপদেশের গন্ধ পাইলেই অধিকাংশ লোক পালাইতে চাহে। কিন্তু হতভাগ্য বালকেরা ইচ্ছা করিলেও পাঠশালা ছাড়িয়া পালাইতে পারে না, এই জন্য জুলুমটা তাহাদেরই উপরে হয় বেশী। ছেলেগুলো অভ্যস্ত কথা কেবল মুখস্থ বলিতে শেখে এবং অনেক বড় বয়স পর্য্যন্ত নৈতিক জ্যাঠামি কিছুতে ছাড়িতে পারে না।

কর্ত্তব্যের মধ্যে কঠোরতা এবং মাধুর্য্য দুই আছে। তাহার এক অংশ আমাদিগকে পীড়ন করে, আর এক অংশ আমাদিগকে আকর্ষণ করে। তাহার এক ভাগে আমরা অধীন, আর এক ভাগে আমরা স্বাধীন। নীতিগুরুদিগকে এইটে মনে রাখা আবশ্যক যে, আমরা কর্ত্তব্য পালনের যন্ত্র নহি; আমরা স্বাধীন প্রীতির সহিত সৎকার্য্য করিবার অধিকারী। সেই প্রীতির মূল্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। সেই প্রীতির অভাবেই মানুষ কাঁদিতেছে। "পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ তস্য তুচ্ছং সকলং।" জানি সকলি, কিন্তু প্রেম নাই বলিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারি না। হে নীতিবিৎ বৃদ্ধ, তুমি কি নীতিকথার চটি বই বাহির করিয়া আমাকে প্রেম দিতে পারিবে! শত বার কথিত কথাতে সহস্র বার ব্যাখ্যা করিয়া তুমি আমার স্বভাবতই বিদ্রোহী হৃদয়কে দ্বিগুণ উত্যক্ত করিয়া তুলিতেছ। উহাতে আমার নূতন জ্ঞান কিছুই শিক্ষা হইতেছে না, কেবল যে প্রেমের অঙ্কুরটুকু ছিল, তাহা ভারাক্রান্ত হইয়া নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে। অতএব হে গুরো, ঐ চটি বইগুলো সম্বরণ কর।

নীতিশিক্ষার প্রধান স্থান গৃহ। সহস্র প্রেমের সম্বন্ধ আমাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে। আমরা যে, পিতা মাতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার উপদেশ অবহেলা করি না, সে শুধু শাসনের ভয়ে নহে, ভালবাসি বলিয়া। প্রেম আমাদের হৃদয়কে তাঁহাদের নিকট উন্মুক্ত রাখে।

ঘরের মধ্যে আমরা আপনাকে সম্পূর্ণভাবে ধরা দিই। আমাদের কোন অংশ ঢাকা থাকে না। যে উপদেশ, যে আলোক, প্রেমের যে শিশিরবিন্দুটুকু পাই, তাহা সমগ্র প্রকৃতি দিয়া গ্রহণ করি এবং একত্রে সমগ্র প্রকৃতি পরিস্ফুট হইতে থাকে। গৃহের মধ্যে যদি সেই মুক্ত ভাব না থাকে, তবে আমাদের মনুষ্যত্বের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির ব্যাঘাত হয়। বড় গাছের আওতায় যেমন চারাগাছ বাড়িতে পারে না, চারি দিকে বাধা পাইলে উদ্ভিদ্ যেমন বাঁকিয়া চুরিয়া খর্ব্বাকৃতি হইয়া দাঁড়ায়, আমাদেরও সেই দশা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নীতিশিক্ষকেরা পরিবারের যে আদর্শ খাড়া করিয়া তুলিতে চাহেন, তাহাতে এই প্রীতির, এই মুক্ত ভাবের সম্পূর্ণ অভাব। পিতাকে যম, দাদাকে পিতা, বৌঠাকুরাণীকে জননী এবং জ্যেষ্ঠ মাত্রকেই পিতৃমাতৃত্বে টানিয়া তুলিয়া সমস্ত পরিবারকে ইহাঁরা কেবলি একটি গুরুপরম্পরার লৌহ-শৃঙ্খলরূপে গড়িয়া নিশ্চিন্ত হন। প্রীত্যংশটুকু বাদ দিয়া পরিবারের পরস্পরের মধ্যে এক কঠিন কৃত্রিম ভক্তির ব্যবধান স্থাপিত হয়। পিতাপুত্রে দেখাশুনা প্রায় হয় না—যদি বা হয়, স্নেহাস্পদ পুত্র নির্ব্বাক্ নতনেত্রে ভক্তির পরিচয় দিলে সকলে তাহার নম্রতার প্রশংসা করে এবং ভক্তিভাজন পিতৃদেব যথাসম্ভব সংক্ষেপে পুত্রকে অব্যাহতি দিয়া তাহাকে হাঁফ ছাড়িতে অবসর দেন। জ্যেষ্ঠের সহিতও এইরূপ পিতৃবৎ আচরণ ব্যবস্থা—সুতরাং কনিষ্ঠের পক্ষে তিনি অত্যন্ত দুর্গম দুর্দ্ধর্ষ। এমন কি, অনেক সময় মধ্যে তৃতীয় পক্ষ গুরুমহাশয় কিম্বা পাড়াপ্রতিবেশীকে খাড়া না করিয়া কথা চলে না। মা ত মা আছেনই, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াকেও মা করিয়া তুলিতে হইবে, নীতিগুরুর এইরূপ বিধান—এইরূপ কৃত্রিম মা এবং কৃত্রিম বাপের ভীড়ে ঘরের মধ্যে ছেলেদের কোথাও পা ফেলিবার জায়গা নাই। ভাসুরকে দেখিলে ভাদ্রবউ ধরণীকে দ্বিধা হইতে বলে, শ্বশুরকে দেখিলে পুত্রবধু বিলুপ্ত হইতে চেষ্টা করে, জামাইকে দেখিলে শাশুড়ী ঘোমটা টানিয়া বসে, শাশুড়ীকে দেখিলে বধূ কোথায় লুকাইবে স্থান খুঁজিয়া পায় না! স্বামী স্ত্রীতে গোপনে চোরের মত দেখাসাক্ষাৎ, যেন দাম্পত্য সম্বন্ধটা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং সমাজের অননুমোদিত। ঘরের মধ্যেই যত লুকাচুরি বাঁধাবাঁধি, ঘরের মধ্যেও বিশুদ্ধ প্রীতিপূর্ণ উদার আনন্দময় স্বাধীনতা নাই, পরস্পরের মাঝখানে প্রেমের সহজ প্রবাহ স্বাভাবিক আদান প্রদান নাই। এমন জায়গায় কি সহজ নীতিশিক্ষা সম্ভব? কাজেই শাস্ত্রশাসন, গুরুমন্ত্র এবং চটি বইয়ের আমদানী হয়।

এই সকল কারণে বঙ্গবালকের বন্ধুত্বের মধ্যেও কতকটা বিকৃতি লক্ষিত হয়। তাহারা কিছু অসহ্য সেন্টিমেন্ট্যাল্ হইয়া উঠে। গৃহে স্বাধীনতা অনুভব করি না, বাহিরের শাসনহীন বন্ধুত্বে রুদ্ধ উৎস উচ্ছৃঙ্খল বেগে উছলিয়া উঠে। তাই বন্ধুত্বের মধ্যে আমাদের অনেকটা লুকাচুরি ভাব আছে—দাদা আসিলে সখ্যালাপ বন্ধ হইয়া যায়, বাবার সাড়া

পাইলে ভালমানুষ ছেলেটি জড়সড় হইয়া বসে এবং কড়িকাঠ গণিতে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকে; যেন বন্ধুত্ব একটা অপরাধ, যেন এত ক্ষণ একটা দুষ্কর্ম চলিতেছিল। দাম্পত্যের মত ইহাতেও দিবালোকের প্রবেশ নিষেধ।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠের মধ্যে পিতাপুত্র-সম্বন্ধ খাড়া করিয়া তোলা হয় ত কতকটা আবশ্যক হইয়া পড়ে। পিতার অবর্ত্তমানে জ্যেষ্ঠের উপরই পিতৃত্ব ন্যস্ত হয়। এবং ক্রমে জ্যেষ্ঠের পর জ্যেষ্ঠ ধারাবাহিকরূপে এই পদের উত্তরাধিকারী। সুতরাং গোড়া হইতেই কতকগুলি কর্ত্তা প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। কর্ত্তারাই একান্নবর্ত্তী পরিবারের উচ্চনীচক্রমে স্তরবিন্যস্ত মেরুদণ্ড।

সকলই স্বীকার করি, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথা মনে হয়, মনুষ্যত্ব একটি জীবন্ত এবং মহৎ জিনিষ, যন্ত্রের দ্বারা সে তৈরি হয় না, প্রীতি এবং সংযত স্বাধীনতার দ্বারা সে বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু আমাদের পরিবার একটা জাঁতার মত; উপরে একখানা পাথর, নীচে একখানা পাথর; উপরে গুরুজন এবং নীচে কনিষ্ঠবর্গ—মাঝখান হইতে সামাজিক শান্তি শুভ্র ময়দার মত বাহির হইতেছে, সেই সঙ্গে মনুষ্যত্ব এবং মহত্ত্ব তাহার সমস্ত আকার আয়তন এবং স্বাতন্ত্র্য পরিহার করিয়া পিষিয়া যাইতেছে। বৃহৎ মানবসমাজে উন্মুক্ত সংসারক্ষেত্রে কেহ যে সবলে সতেজে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, কেহ যে সুমহৎ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া অশ্রান্ত অধ্যবসায়ের সহিত অসাধ্য বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিবে, এতটুকু তেজ শরীরে অবশিষ্ট থাকে না। আমরা সকলে ধীর নম্র নিরীহ, আমরা কেবলমাত্র বাপের বাধ্য ছেলে, ভ্রাতার বশীভূত ভাই, গুরুর ভক্তিমান্ শিষ্য, আর কিছু নহি; আমরা কেবলমাত্র একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্নসেবী, বড় জোর আমরা আমাদের গ্রামটুকুর খুড়া জ্যাঠা দাদা ভাই—তাহার বাহিরে যে এক মহামানবমণ্ডলী আছে, সেখানে আমরা লজ্জিত নতশির, সেখানে আমরা ভীত অপমানিত; সেখানে আমরা প্রভুর কাছে খোসামোদ, অধীনের প্রতি পীড়ন, মুখে দম্ভ এবং কাজে গোঁজামিলন করিয়া চলি।

এখনকার দিনে এমন করিয়া আর চলে না। বাহিরের মানবসংস্পর্শে আসিয়া নূতন শিক্ষা লাভ করিয়া আমাদের অপমানটা একান্ত অনুভব করিতেছি। পূর্ব্বে গৃহই আমাদের প্রধান আশ্রয় ছিল—এখন বাহিরের টানে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছি—ইতিহাস বিজ্ঞান লোকনীতি সম্বন্ধে নব নব জ্ঞান লাভ করিয়া আমাদের হৃদয় গৃহপ্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া বাহিরে ব্যাপ্ত হইতে চাহিতেছে; এখনি কতকগুলি নূতন উপায় উদ্ভাবন না করিলে নীতি রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িবে। এখন আমাদের পুরাতন গৃহের মধ্যে নূতন দরজা জানলা কাটিয়া তাহার অন্তরে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা এবং বাহিরের সহিত যোগ সাধন করিতে হইবে। কতকগুলি পারিবারিক পুত্তলি প্রস্তুত না করিয়া স্বাধীন

এবং জীবনপূর্ণ মানুষ গড়িতে হইবে। তাহাতে আমাদের এই নির্জ্জীব সমাজের মৃত্যুশান্তি যদি নষ্ট হয়, যদি একটা জীবনের কলরব জাগ্রত হইয়া উঠে, তবে সে আনন্দেরই বিষয়। ['সাধনা,' ফাল্গুন ১২৯৮]

সাময়িক সারসংগ্রহ

খ্রীষ্টীয় নরক

মানুষ দ্বিপদ পতঙ্গ, ইচ্ছা করিয়া আপনাকে জ্বালাইতে ভালবাসে। এমন কি, সে ইহলোকের সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা স্তূপাকার করিয়া তাহাতে ফুঁ দিয়া দিয়া মৃত্যুর পরকালের জন্য কল্পনায় এক প্রকাণ্ড নরকাগ্নি জ্বালাইয়া তুলিয়াছে; সেখানে যে মানুষ কত রূপে কত যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারে, তাহা কল্পনা করিতে গিয়া তাহার অদ্ভুত নৈপুণ্য ও অধ্যবসায় প্রকাশ পাইয়াছে।

নবেম্বর মাসের "নাইণ্টীন্থ সেঞ্চুরি" পত্রিকায় জেম্‌স্ মিউ খ্রীষ্টীয় নরক সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তিনি বলেন, পুরাতন গ্রীক নরকের সহস্র বৎসর দহনে যখন কল্পনার তৃপ্তি হইল না, তখন খ্রীষ্টধর্ম্ম সহস্রকে অনন্ত দিয়া গ্রাস করিল। প্লেটো হাজার বৎসর ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রি বলিলেন, নরকাগ্নিতে পড়া নিতান্তই সহজ, কিন্তু উঠিবার কোন উপায় নাই। একেবারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।

বাহ্য আকারে উভয় নরকের সাদৃশ্য মন্দ নহে। যে সীমাহীন গহ্বর এবং জ্বলন্ত অগ্নিহ্রদ গ্রীক সয়তান এবং রাক্ষস পিশাচদিগের আবাসভূমি ছিল, খ্রীষ্টান নরক নিঃশব্দে আসিয়া তাহা অধিকার করিয়াছে এবং এই সুযোগে অনেক গ্রীক নারকী জীব সুবিধামত নাম ভাঁড়াইয়া এই নূতন নরকে নব নব পদ প্রাপ্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে।

কিন্তু শুধু এই নয়। পাদ্রিগণ স্ব স্ব ক্ষমতা অনুসারে নরকের ক্রমশই উন্নতি সাধন করিয়া আসিয়াছেন।

একজন প্রাচীন খ্রীষ্টীয় মোহান্ত বসিয়া বসিয়া মানবের জন্য চৌদ্দটি দুঃখ ঠাহর করিয়াছেন—সাতটি দৈহিক এবং সাতটি আধ্যাত্মিক। এবং মর্ত্ত্য অধিবাসীদিগের প্রতি এককালীন এই উভয়বিধ দণ্ডের ব্যবস্থা—অর্থাৎ সয়তানদের অপেক্ষা কিছু বেশি। কারণ, দৈহিক যন্ত্রণা তাহাদের সম্ভবে না।

নরকের বর্ণনায় কান্নাকাটি, দাঁত কচকচি, ঝগড়া বিবাদ, নৈরাশ্য, ভয়, পিশাচসঙ্গ, কীটের উপদ্রব এবং চির-অগ্নিদাহ প্রায় সাধারণ। জিরমি, টার্টুলিয়ন প্রভৃতি বড় বড় খ্রীষ্টানগণ অনেকে এই অগ্নির বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া নরকে গন্ধক এবং দ্রব আলকাতরাকুণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন। সেখানে যে উত্তাপ খুব বেশি, নরকভূতত্ত্ববিৎ সকলেই তাহা একবাক্যে বলিয়া থাকেন। সুতরাং কথাটা প্রামাণিক বলিয়া মানিতেই হয়। কিন্তু এত আগুন জ্বালিলেও সেখানে কিছুতেই আলো হয় না—ম্লান সবুজ বর্ণে অন্ধকার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে মাত্র।

মধ্যযুগের নরকগুলি আরও ভয়ানক। রসাতল ভেদ করিয়া এক সুবৃহৎ অন্ধকার গহ্বর নামিয়াছে—শৃঙ্খলাবদ্ধ পাপাত্মাগণ সেই অন্ধকারের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ হইতেছে—ইহার উপরে সর্ব্বাঙ্গে কীটের দংশন এবং উদরের দারুণ জ্বালা। সে যন্ত্রণার তুলনায় পৃথিবীর চূড়ান্ত কষ্টও সুখ, সে ক্রন্দনধ্বনির তুলনায় এখনকার অসহ্য ক্রন্দনও স্বর্গের সঙ্গীতপ্রবাহ, এবং উদরের এমনি জ্বালা যে, প্রস্তরখণ্ড জুটিলেও তাহা পরম ভোগ্য সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হয়। একজন সুদক্ষ যাজক গণনা করিয়া দেখিয়াছেন, এক বর্গ জর্ম্মন মাইল স্থানে ১০০,০০০,০০০,০০০ দশ সহস্র কোটি গলিত পচিত দেহ ঠেসাঠেসি করিয়া অবস্থিত। এবং প্রত্যেক দেহ হইতে যে গন্ধ বাহির হইতেছে, লক্ষ কুকুরের মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইলে সে গন্ধের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় মাত্র।

এই ত অবস্থা। ইহার উপর প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশীর অহি নকুল সম্বন্ধ। কেহ কাহাকেও সুবিধামত পাইলে ছাড়ে না। নরকে ত প্রেম নাই। আপনাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু হাত পা বন্ধ। কেবলি নিদ্রাহীন চিররাত্রি অনন্ত হাহাকার লইয়া অন্ধকারে পক্ষপুটে নরক আচ্ছন্ন করিয়া বসিয়া আছে।

একজন আইরিশ লেখকের মতে নরকে পাপীদিগকে সিদ্ধ করিয়া কাপড়ের মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া ফেলা হয়।

প্রাচীন লেখক ম্যাথিউ প্যারিস্ ষ্টিফেনের রাজত্বকালের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন, শুনিলে অতিবড় অবিশ্বাসীও নরকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয়। ওয়েন বলিয়া একজন সৈনিক কর্ম্মচারী এক বার পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্থানীয় বিশপের অনুমতি লইয়া সশরীরে নরক দর্শন করিয়া আসে। নরকের প্রথম প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেই পিশাচেরা আসিয়া ওয়েনকে আক্রমণ করিল, কিন্তু পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সে বাঁচিয়া যায়। দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে নর নারী বাল বৃদ্ধ সকলেরই নগ্নাবস্থা—এবং উদরের মধ্য দিয়া গুপ্ত লৌহশলাকা চালিত। আর পিশাচেরা ক্রমাগত কশাঘাত করিতেছে। তৃতীয় প্রাঙ্গণে হিংস্রগণ আহারার্থে নরদেহের অন্ত্র টানিয়া বাহির করিতেছে। এবং চতুর্থে হতভাগ্যদিগকে জ্বলন্ত

গন্ধকচুল্লীর উপরে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে; হস্ত পদ, নাসা কর্ণ এবং নাভিদেশে বড় বড় গজাল আঁটা।

জেসুইট্ পিনামন্টি ইতালীয় ভাষায় যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে নরকের দৈনন্দিন দণ্ডের ব্যবস্থা আনুপূর্ব্বিক চিত্রিত হইয়াছে। রবিবারের চিত্রটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল। পাপী একটি পিঞ্জরের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ—দাউ দাউ আগুন জ্বলিতেছে। এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে বর্ষা বিঁধিতেছে। ইহাতেও নিস্তার নাই, দুই দিক্ হইতে দুইটি দৈত্য তাহাকে আঁচড়াইয়া কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিতে নিযুক্ত। দৈত্য দুইটির রূপের বর্ণনা পাঠকদের নিকট কিছু অদ্ভুত ঠেকিতে পারে—বাঘের মত মাথা, সাপের মত দেহ, গ্রিফিন নামক পৈশাচিক জন্তুর মত ডানা। জেসুইট্ যাজক আবার ভরসা দিয়াছেন যে, এ বর্ণনা কোথাও অতিরঞ্জিত নহে—বরঞ্চ বিস্তর কম করিয়া বলা হইয়াছে।

পিনামন্টির সমসাময়িক আর একটি পণ্ডিত অনেক বুদ্ধি চালনাপূর্ব্বক নরক মন্থন করিয়া পৃথিবীর আবর্ত্তনের কারণ ঠাহরাইয়াছেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে যে চুল্লী জ্বলিতেছে, পাপাত্মারা অনবরত তাহা হইতে পলাইতে চেষ্টা করে। এবং এই চেষ্টায় যতই তাহারা নরকের ভিত্তি বাহিয়া উঠে, পৃথিবী গড়াইয়া যায়। যাঁহারা খাঁচার মধ্যে শাদা ইঁদুরের খেলা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত সহজেই ধারণা হইবে। কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলেই যে নরক, সে বিষয়ে কাহার কাহার সন্দেহ আছে। টোবিয়াস্ সুইণ্ডেন নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাধিধারী সূর্য্যকেই নরক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এবং সূর্য্যে যে সকল কালো দাগ দেখা যায়, সেগুলি যে দলে দলে পাপাত্মার সমাবেশ, এ বিষয়ে তাঁহার সন্দেহ নাই।

নরক যেখানেই হৌক্, দহন ত কোথাও কম নয়, সুতরাং স্থানভেদে কোন সান্ত্বনার কারণ দেখা যায় না।

ইংলণ্ডে রাণী মেরীর আমলে ইহলোকেই এই দাহনকার্য্য সমাধা হইত। মেরীর যুক্তি এই যে, ভগবান্ যখন অবিশ্বাসীকে পুড়াইয়া মারিতে কৃতসঙ্কল্প, তখন এখানে তাঁহার অনুকরণ অপেক্ষা সাধু কার্য্য আর কি হইতে পারে! অবিশ্বাসীরা যাহাতে অনুতাপের যথেষ্ট অবসর পায়, সে জন্য কাঁচা কাঠে আগুন ধরাইয়া তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা হইত। নারকী দয়া ইহাকে বলা যাইতে পারে।

যাহা হৌক্, যাজকদিগকে ধন্য বলিতে হয়, তাঁহারা সমাজের নরক অন্বেষণে কত গবেষণা, কত পরিশ্রমই করিয়াছেন। মানবের হিতার্থে পিশাচ ডেভিলের সংখ্যা নির্ণয়ে পর্য্যন্ত তাঁহাদের যত্নের ত্রুটি নাই। গ্যুলায়েল্মাস্ পারিসায়েন্সিস্ গণনা করিয়া দেখেন, পিশাচের সংখ্যা ৪,৪৪,৩৫,৫৫৬ চার কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচ শত ছাপ্পান্নের

অধিক নহে। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে, এ গণনায় অনেকগুলিকে ধরা হয় নাই। জন্ ওয়ার ৭২ বায়াত্তর জন রাজ-পিশাচের অধীনে ৭৪,০৫,৯২৬ চুয়াত্তর লক্ষ পাঁচ হাজার নয় শত ছাব্বিশ জন প্রজা দেখিয়াছেন।

ডেভিলকে চিনিবার সহজ উপায় তাহার চেহারায়। সাধারণতঃ ছাগলের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য—কেবল সম্মুখে এবং পশ্চাতে দুই জোড়া শিং থাকে। ডেভিল নানা মূর্ত্তি ধরিতে পারে, কেবল ঘুঘু কিম্বা মেষশাবকের পবিত্র রূপ সে কিছুতেই ধারণ করিতে পারে না। আর একটি লক্ষণ এই যে, তাহার রঙ্ কালো। কেবল আফ্রিকাবাসীরা ইহার বিপরীত বলিয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত ডেভিল তাহাদের নিকট শ্বেত চর্ম্ম ধারণ করিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। বোধ করি ত্রিবিধ আকারে। প্রথম মিশনারি, তাহার পর বণিক্, তাহার পর সৈনিকমূর্ত্তিতে।

কৃত্রিম দাম্পত্য নির্ব্বাচন

যেমন অন্যান্য সকল বিষয়েই, তেমনি দাম্পত্য নির্ব্বাচন সম্বন্ধেও পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রায় মাঝে মাঝে দুটো একটা নূতন কথা উঠিয়া থাকে। য়ুরোপে পূর্ব্বরাগই বিবাহের প্রধান ঘটক, কিন্তু আজকাল অনেকে বলিতেছেন—সুসন্তান লাভই যখন বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন কেবলমাত্র অন্ধ প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া ভবিষ্যদ্বংশের কল্যাণ কামনা করিয়া বিশেষ বিবেচনা সহকারে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই সঙ্গত। সমাজের নিম্ন স্তরে প্রবৃত্তির প্রাধান্য—যাহাদের এত শত ভাবিবার শক্তি নাই, তাহাদের প্রতি প্রকৃতির সহজ বিধান—"যার যেথা মজে মন।" কিন্তু ইহাতে মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না, অসংযত বংশবৃদ্ধির সহিত মানবসমাজে রোগ শোক দুর্ভিক্ষ বৃদ্ধি পায় মাত্র। অতএব সমাজের হিতার্থে স্বাভাবিক নির্ব্বাচন সংযত করিয়া কৃত্রিম নির্ব্বাচন-প্রণালীর প্রচলন আবশ্যক।

অক্টোবর মাসের "মনিষ্ট" পত্রিকায় এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। লেখক হাইরাম ষ্ট্যান্‌লি কৃত্রিম নির্ব্বাচনের একজন প্রধান পোষক। তিনি প্রমাণ করিতে চাহেন যে, ইহা মানবসমাজের উন্নতির পক্ষে অপরিহার্য্য এবং ইহা সভ্যতার পরিণাম ফল।

লেখক বলেন, বিবাহের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্বাভাবিক নির্ব্বাচন ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। কেবল মানবহৃদয়ের স্থিতিশীলতা এবং প্রবলা রাগবৃত্তি কৃত্রিম নির্ব্বাচন সম্পূর্ণ প্রচলিত হইতে দেয় নাই। কিন্তু সুসভ্য সমাজে কৃত্রিম নির্ব্বাচনের অনুকূলতাও দেখা যায়। ধনের অভাব এবং অন্যান্য কারণে সমাজ যাহাদিগকে দাম্পত্য বন্ধনের অনুপযোগী বিবেচনা করে, তাহাদের বিবাহ নিবারণের প্রতি সমাজের দৃষ্টি

দেখা যায়। গবর্ণমেন্টও বয়সের বাঁধাবাঁধি করিয়া বিবাহ সম্বন্ধে সংযমের পক্ষপাত প্রকাশ করিয়াছেন। কৃত্রিম নির্ব্বাচন ত স্বভাববিরুদ্ধ নহে; সভ্যতার উন্নতির সহিত মানবের চোখ ফুটে—প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া সে কুল শীল সৌন্দর্য্য স্বাস্থ্য এবং কৌলিক প্রভাবের প্রতি নজর রাখিয়া চলে।

ষ্ট্যান্‌লি সাহেবের অভিমত এই যে, উপযুক্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখাইতে না পারিলে বিবাহের অধিকার জন্মিবে না। জীবনলীলার পক্ষে যাহারা অযোগ্য, তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ, এই মর্ম্মে আইন প্রচলিত হইলে তাঁহার মতে অচিরে মানবসমাজ পরম শান্তি এবং পরিণতি লাভ করিয়া খাড়া হইয়া উঠিবে। আপাততঃ সমিতি স্থাপনা দ্বারা কৌলিক নিয়মের পদ্ধতি অনুসারে দাম্পত্য নির্ব্বাচন প্রচলিত হইয়া যাহাতে একটি উচ্চশ্রেণী কুলীন সম্প্রদায় গঠিত হয়, তাহার চেষ্টা করা যাইতে পারে। এই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত নরনারীগণ কৌলিক নিয়ম সম্বন্ধে রীতিমত শিক্ষা লাভ করিয়া দাম্পত্য জীবনে তাহা প্রয়োগ করিবেন এবং চিরজীবন যুক্তি এবং বিজ্ঞানের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া চলিবেন।

হাইরাম ষ্ট্যান্‌লি নিশ্চয় স্থির করিয়াছেন যে, কিছু দিন এই ভাবে চলিলে সমাজে একজন কেন, এমন এক ডজন শেক্সপিয়র ফর্‌মাসে গড়া যাইতে পারিবে। যেমন মানুষের বিশেষ যত্নে কলম করিয়া ভাল আম, ভাল লিচু প্রস্তুত করা যায়, তেমনি কলমে শেক্সপীয়র তৈরি হইবে। আমাদের বিবেচনায় প্রতিভার এত বাহুল্য হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে সমাজে বাস করা অসাধ্য হইয়া উঠিবে। একটা সূর্য্যেই আমাদের বেশ কাজ চলিয়া যায়, এমন কি, সময়ে সময়ে তাহাই অসহ্য বোধ হয়। তাহার উপরে আবার ফর্‌মাসে গড়া দ্বাদশ আদিত্য উদয় হইলে পৃথিবীর প্রলয়কাল ঘনাইয়া আসিবে। ['সাধনা,' ফাল্গুন ১২৯৮]

"ক্রিমিনাল্" মানবতত্ত্ব

অধ্যাপক সিজার লম্ব্রজো ক্রিমিনাল্ মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে মনে অনেকগুলি নূতন কথার উদয় হয়। য়ুরোপে আজকাল এই বিষয় লইয়া অনেক আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে এবং পণ্ডিতেরা যে সকল দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে "ক্রাইম্" অনেক পরিমাণে দৈহিক গঠন ও ঐন্দ্রিয়িক বিকারের ফল বলিয়া প্রমাণ হয়। সুতরাং ক্রিমিনাল্‌দিগের নৈতিক দায়িত্ব কতকটা ঘুচিয়া যায় এবং তাহাদের প্রতি সমাজের কর্ত্তব্যও একটু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়ায়।

"অপরাধ" এবং "অপরাধী" "ক্রাইম্" এবং "ক্রিমিনাল্" শব্দের ঠিক তর্জ্জমা নহে। অপরাধ বলিতে ছোট বড় সকল প্রকার দোষই বোঝায়, কিন্তু "ক্রাইমে"র অর্থ কেবল

বেআইনি অপরাধ। এই ইংরাজী শব্দের যদি সহজবোধ্য কোন বাঙ্গলা প্রতিশব্দ পাঠকদিগের মনে উদয় হয়, তবে আমাদের জানাইলে বাধিত হইব।

আধুনিক কোন কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত এই সকল ক্রিমিনাল্‌দিগকে রোগীর হিসাবে দেখিয়াছেন—যেমন উন্মাদ একরকম রোগ, ক্রাইমও কতকটা সেইরূপ। ডাক্তার অটলেঙ্ঘির পরীক্ষায় জানা যায়, ক্রিমিনাল্‌দিগের গন্ধবোধ এবং স্বাদজ্ঞান সাধারণ লোকের অপেক্ষা প্রায় কিছু কম, চলনের ধরণ একটু স্বতন্ত্র এবং অঙ্গভঙ্গী বিচিত্র। সহজ লোকের দক্ষিণ পদক্ষেপ বাম অপেক্ষা কিছু দীর্ঘ হয়, ক্রিমিনাল্‌দিগের তদ্বিপরীত।

তেঞ্চিনি সাহেব কতকগুলি ক্রিমিনাল্ শবদেহ লইয়া পরীক্ষা করেন। তাহাতে কনুইয়ের হাড়ে অনেকগুলিরই ছিদ্র দেখা যায়। ইহা ভিন্ন তাহাদের দেহের গঠনে আরও অনেক ছোটখাট অনিয়ম লক্ষিত হয়। সেগুলি এত সাধারণ নহে বলিয়া এখানে উল্লেখ করা গেল না।

স্যালোয়াল্‌টোর পরীক্ষায় প্রতিপন্ন হয় যে, স্ত্রী-ক্রিমিনাল্‌দিগের গঠনেও অনেক রকম বিকৃতি দেখা যায়। কিন্তু পুরুষের সহিত তুলনায় তাহা সব সময়ে তত পরিস্ফুট নহে। ক্রাইমের বিভিন্নতা ইহার কারণ কিম্বা জাতিগত পার্থক্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

ডাক্তার অটলেঙ্ঘি আমাদের লেখকের সহিত কিছু দিন ধরিয়া ক্রিমিনাল্‌দিগের বলিরেখা আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সেই ক্রিমিনাল্‌দের কপালে এবং কপোলদেশে বিস্তর রেখা পড়ে। আর কপোলের মধ্যস্থলে রেখা ক্রিমিনাল্‌দিগের সাধারণ লক্ষণ। ইহা ভিন্ন, পুরুষ-ক্রিমিনাল্‌দের টাক বেশি পড়ে, চুল পাকে কম, স্ত্রী-ক্রিমিনাল্‌দিগের চুল শীঘ্র পাকে, টাক বড় পড়ে না।

রসি সাহেব এক শত জন ক্রিমিনালের দেহ পরীক্ষা করিয়া যে ফল পাইয়াছেন, এখানে উল্লেখযোগ্য। ৮৮ জন ক্রিমিনালের দৈর্ঘ্য, দুই বাহু সম্পূর্ণ বিস্তার করিয়া যত দীর্ঘ হয়, তাহাপেক্ষা কম এবং ১১ জনের বেশি। ৩০ জনের দক্ষিণ চরণ বড় এবং ৫৮ জনের বাম চরণ। ১২ জনের দুই চরণ সমান। শতকরা ৪৩ জনের দক্ষিণ বাহু বাম বাহু অপেক্ষা দীর্ঘ এবং ৫৪ জনের বিপরীত।

এইরূপ ক্রিমিনাল্‌দের সম্বন্ধে য়ুরোপে কিছু দিন হইতে বিস্তর অনুসন্ধান চলিতেছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে যথেষ্ট বোধ হয় না।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রিমিনাল্-তত্ত্বের প্রয়োগ

আর একটি প্রবন্ধে অধ্যাপক লম্ব্রজো এনার্কিষ্ট্ সম্প্রদায়ের চেহারা আলোচনা করিয়া তাঁহার ক্রিমিনাল্ মানবতত্ত্ব দ্বারা রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়াছেন।

য়ুরোপের এনার্কিষ্ট্ সম্প্রদায় প্রলয়বাদী। তাঁহারা রাজা রাজ্য সমাজশৃঙ্খলা সমস্ত উন্মূলিত করিতে চাহেন।

লম্ব্রজো সাহেব দেখাইতে চাহেন যে, এই এনার্কিষ্ট্ সম্প্রদায়ের অনেকের চেহারা ক্রিমিনাল্দিগের হইতে বড় তফাৎ নয়। মাটসীনি, গারিবাল্ডি প্রভৃতি বিখ্যাত বিপ্লবনেতৃগণের আকৃতি উন্নত ছাঁচের, ইহাদের সহিত তাহার সম্পূর্ণ অনৈক্য। এনার্কিষ্ট্দিগের আকারপ্রকারে ফরাসী বিপ্লবের নিরপিশাচগণের সহিত বড় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য।—রীতিমত ক্রিমিনাল্ ছাঁচ যাহাকে বলে।

এইখানে বলা আবশ্যক, লম্ব্রজো সাহেবের মতে ক্রিমিনাল্, পাগল এবং প্রতিভা-সম্পন্ন মানুষ অনেক সময় এক পরিবারের মধ্যে পাওয়া যায়। তিন জনেই সাধারণ নিয়মবহির্ভূত। কেবল প্রভেদের মধ্যে প্রতিভার তেমন অসঙ্গত ক্ষেপামি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় না। বোধ করি হীরক এবং কয়লার মধ্যে যেরূপ মূলগত ঐক্য, প্রতিভা এবং পাগল ও ক্রিমিনালের মধ্যেও কতকটা সেইরূপ। শেক্সপিয়র প্রেমিক, পাগল এবং কবিকে এক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন, আধুনিক পণ্ডিতেরা তাহার সঙ্গে চোর ডাকাত খুনীকে জুড়িয়া দিতেছেন।

যাহা হউক, কথাটা উঠিয়াছে বলিয়াই অমনি তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিয়া বসিবার আবশ্যক দেখি না। এখনো বিস্তর সময় আছে। আগে ভাল করিয়া প্রমাণ হউক।
['সাধনা,' চৈত্র ১২৯৮]

তখনকার কথা

প্রথম যখন কাব্য পড়িতে আরম্ভ করি, আমার বয়স খুব বেশি নয়, একটি ছোট আল্মারী ছিল, দুই চারিখানি বই, একলাটি এক ঘরে বসিয়া পড়িতাম; স্পষ্ট মনে নাই—চোখের সম্মুখে আব্ছায়ার মত তখনকার কতকগুলি চিত্র উদয় হয়।

বাঙ্গালীর ঘরের লাজুক ছেলে—স্বভাবতই একটু চুপচাপ; অপরিচিত মুখ দেখিলে দূর হইতে দৌড়িয়া পালাই, না হয় নতনেত্রে তাড়াতাড়ি পাশ কাটাইয়া যাই; কেহ কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে কেমন যেন জড়সড় হইয়া পড়ি, উত্তর দিতে বিলম্ব হয়, মুখ

লাল হইয়া উঠে। বিশেষতঃ পড়াশুনা সম্বন্ধে কেহ প্রশ্ন করিলে নাড়ী প্রায় ছাড়িয়া আসে।

তখন এই রকম অবস্থা। কাব্য পড়িতে সবে সুরু করিয়াছি। কি বই প্রথম পড়ি, ভাল মনে পড়ে না। পুরাতন দিনের পুরাতন সূর্য্যকিরণের মত গায়ে গায়ে মিশিয়া কেবল কতকগুলি ভাব এবং ছায়া মাত্র আছে—ধরিবার ছুঁইবার কিছু নাই।

দুই মাস গ্রীষ্মাবকাশ; দীর্ঘ দিন—দীর্ঘ অবসর। দুই চারিখানি গ্রন্থ সমাপন কবিতার বালক-রসগ্রাহীর পক্ষেও অসম্ভব নয়। একে একে অনেকগুলি বিদেশী চরিত্রের সহিত পরিচয় হইল। তাহাদের সুখ দুঃখ কতকটা নিজের বলিয়া মনে হয়, তাহাদের বেদনায় আমারও হৃদয়ে ব্যথা লাগে। বিপ্লবের কবি বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া বর্ত্তমান ভাঙ্গিয়া নূতন গঠন করিতে চাহেন; দুর্ব্বল বাঙ্গালীহৃদয় তাঁহার সহিত সমবেদনা অনুভব করে এবং নিজের অক্ষম দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া সেই বিপ্লবের বেদনাটুকু গোপনে হৃদয়ে পোষণ করে মাত্র।

কেবলি কল্পনার সুখ—তখনও চিন্তা করিবার বয়স হয় নাই। নূতন ভাব সহজেই হৃদয়ে স্থান পায়, নূতন স্বাধীনতায় অবিশ্বাস জন্মে না। অথচ অতীতের বহু দিনের বিস্মৃত শৈবাল-কুটীরে প্রাচীন বেদগান ও হোমধূমের মধ্যে নিরালায় বাস করিবার মনে মনে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা। সেটা বোধ করি, ভারতবর্ষের মাটিতে জন্মগ্রহণ করিবার ফল।

নূতন নূতন কবির রচনায় আমার মনের মধ্যে একটি নূতন জগৎ উদ্ভাসিত হইল। সেখানে এই পুরাতন সৃষ্টি বিচিত্র বর্ণে বিচিত্র ছায়া-আলোকে নূতন সৌন্দর্য্যে ফুটিয়াছে। এই সন্ধ্যা, এই উষা, এই স্নেহ প্রেম বেদনা জ্বালা, কিন্তু ঠিক এমনিতর নহে; সে জগতে এখানকার অনেক জিনিস নাই, অনেক যাহা আছে, এখানে তাহা স্বপ্ন বৈ নয়।

নবোন্মেষিত হৃদয় নবীন কল্পনায় এই নূতন জগৎ মনের মত করিয়া ভাঙ্গে গড়ে। কোনো বাধা নাই, কাহাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না; আপনার মায়াপুরীতে আপনি একেলা বাস করি—কল্পনাই সুখে দুঃখে একমাত্র সহচরী!

ঘরের বাহির বড় একটা হইতাম না—পথের ধারেই ঘর, খুব যে নিরিবিলি, তাহা নয়—তবুও চুপিচাপি একলাটি ঘরে বসিয়া অনেকটা বিজনতা অনুভব করিতাম। একটিমাত্র দ্বার খোলা রহিত, আর সব বন্ধ। সেই প্রায়-বন্ধ ঘরে বহু দিনের একটি জীর্ণ কেদারা হেলান দিয়া আমার প্রথম বয়সের যত সুখ দুঃখ কল্পনা কবিতা।

বাহিরে ফাঁকা আকাশ। মেঘের উপর মেঘ, রঙের উপর রঙ্ বিচিত্র স্তরবিন্যস্ত। এক মেঘরাজ্যে আমার মন বিচরণ করিত। এবং মনের মধ্যে ইহারই একটি ছায়াচিত্র লইয়া ঘরে বসিয়া থাকিতাম। কি ভাবিতাম কে জানে!

কিন্তু এইখানেই যেন বাহিরের সহিত আমার ক্ষুদ্র কাব্যজগতের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। এই মেঘলোক যেন কবিরই সৃষ্টি—কাব্যের বিচিত্র সৌন্দর্য্য দিয়া রচিত। বুঝি কত দিনের কত দীর্ঘশ্বাস জমিয়া ক্ষুদ্র মেঘখণ্ডের হৃদয়তলে লঘু আবরণ দিয়াছে—সে হৃদয় আর কিছুই নহে, কেবলি অভিমানিনীর অশ্রুসিক্ত বিজন বেদনা।

এখন আর সে দিন নাই। বায়ুভরে কল্পনায় তেমন করিয়া আকাশে উড়িয়া যাই না, পদতলে মাধ্যাকর্ষণ অনুভব করি। কল্পনা লতিকার মত পৃথিবীকে দৃঢ় বেষ্টনে জড়াইয়া উঠে। যে কাব্যজগতে তখন বাস করিতাম, তাহা হইতে এ জগৎ স্বতন্ত্র।

নূতন আল্‌মারী, নূতন ডেস্ক, নূতন কেদারা লইয়া এখন আমি আর এক ঘরে বসি। এখনও কাব্য পাঠ করি, সুখও পাই—কিন্তু সে বিজ্ঞের মত; তাহাতে ছেলেবেলাকার সরল অপরিস্ফুট কল্পনা নাই, সে মৃদু ছায়ামোহ নাই। তখন না বুঝিয়াও কি বুঝিতাম—পরিতৃপ্ত হই না হই, এখন ত মনে করিতে সুখ হয়।

তাই এক এক দিন তখনকার কথা ভাবি। সেটা যেন আমাদের কাল। বর্ত্তমানে কেবলি তাড়াতাড়ি একটা ভবিষ্যৎ গঠন করিয়া চলিয়াছি। ভবিষ্যৎ গড়িতে না হইলে আমার যেন কোনো কাজই নাই। কিন্তু তখন তখনকার জন্যই ছিলাম। ['সাধনা,' চৈত্র ১২৯৮]

অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ

ইংরাজী এভল্যুশন্ শব্দের অনেকগুলি বাঙ্গালা প্রতিশব্দ শুনা যায়—বিবর্ত্তন, ক্রমবিকাশ, অভিব্যক্তি এবং কখন কখন ক্রমাভিব্যক্তি। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অভিব্যক্তি বলিয়াই ইহার অনুবাদ করেন। আমরা এই অনুবাদই গ্রহণ করিলাম।

অভিব্যক্তির পাঁচটি প্রধান অঙ্গ। এবং এই পঞ্চাঙ্গই সর্ব্বজনবিদিত। (১) চতুর্দ্দিকের অবস্থার পরিবর্ত্তনে শারীরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং শারীরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক গঠনেরও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই সকল পরিবর্ত্তন সন্তানসন্ততিতে সংক্রামিত হইয়া বংশানুক্রমে চলিতে থাকে। (২) যে অঙ্গ যত পরিচালিত হয়, সেই পরিমাণে তাহা পরিপুষ্টি লাভ করে এবং পরিচালনা অভাবেও অঙ্গ ক্ষীণ হইতে থাকে। এইরূপে কোন অঙ্গের পরিপুষ্টি এবং অপরের ক্ষয় হইতে গঠন এবং আকারেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। এবং এই সকল পরিবর্ত্তন পুরুষানুক্রমে উত্তরবংশে সঞ্চারিত হয়।

অভিব্যক্তিবাদের এই দুইটি নিয়ম ফরাসিস্ বৈজ্ঞানিক লামার্কের দ্বারা আবিষ্কৃত। (৩) এই পরিবর্ত্তনশীল জীবদিগের মধ্যে যাহারা কোন সুযোগবশতঃ চতুর্দ্দিকের অবস্থার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগিতা লাভ করিয়াছে, তাহারাই টিঁকিয়া গিয়া বংশবিস্তারের অবসর পায় এবং অযোগ্যেরা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহাই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। (৪) স্ত্রীরা পুরুষের বল কিম্বা মনোহারিতায় মুগ্ধ হয় এবং তদনুসারে পতি নির্ব্বাচন করে। স্তন্যপায়ীদিগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বলবান্ পুরুষেরাই স্ত্রীলাভে সমধিক সক্ষম এবং পক্ষীদিগের মধ্যে সুকণ্ঠ এবং বর্ণবৈচিত্র্যের প্রবল আকর্ষণ। সুতরাং এইরূপ মিলনে বংশানুক্রমে বলিষ্ঠতম এবং সুন্দরতমেরাই টিঁকিয়া যায়। ইহারই নাম যৌন নির্ব্বাচন। এই তৃতীয় ও চতুর্থ নিয়মটি বিখ্যাত ইংরাজ পণ্ডিত ডারুয়িনের। (৫) রোমানিস্ এবং গ্যুলিক একটি নূতন নিয়মের উল্লেখ করেন। যখন কোন জীবশ্রেণীর মধ্যে গুটিকতকের শারীরিক প্রকৃতিতে কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন সেই পরিবর্ত্তনপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের* পরস্পরের মধ্যে মিলন ব্যতীত তাহারা সন্তান উৎপাদনে সমর্থ হয় না। এমন কি, মূল বংশের সহিত দাম্পত্যও প্রায় নিষ্ফল হইতে দেখা যায়। এই নিয়মানুসারে অনুরূপ পরিবর্ত্তনপ্রাপ্ত জীবের পরস্পর মিলনে নবার্জ্জিত পরিবর্ত্তনসমূহ বংশপরম্পরায় রক্ষিত হয়। ইহাকে বলে শারীরতান্ত্রিক নির্ব্বাচন।

সম্প্রতি ফরাসিস্ পণ্ডিত লে কঁৎ সাহেব জৈবিক অভিব্যক্তির এই পঞ্চাঙ্গের উপর মানব অভিব্যক্তির আর একটি নূতন নিয়ম সংযোগ করিতে চাহেন। মানুষ বুদ্ধিপূর্ব্বক অভিব্যক্তির পাঁচটি অঙ্গকে নিয়মিত করিয়া আপন উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম এবং জানিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছানুসারে সে এই অভিব্যক্তিকার্য্যে সহায়তা করে। এই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত সজ্ঞান কার্য্যকে পণ্ডিত জোসেফ লে কঁৎ অভিব্যক্তির ষষ্ঠাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আইডিয়াল্ গঠন এবং আইডিয়ালের অনুধাবনই ইহার প্রধান কাজ।

জীবনের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অভিব্যক্তির এই ছয় অঙ্গের কোন কোনটির বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। নিম্নতম স্তরে কেবল লামার্কের প্রথম দুইটি নিয়ম খাটে—অর্থাৎ বাহিরের প্রভাববশতঃ এবং অঙ্গবিশেষের পরিচালনার ন্যূনাধিক্যে গঠনের পরিবর্ত্তন।

প্রটোজোয়ার মধ্যে স্ত্রীপুরুষ ভেদ হয় নাই। উক্ত আদিম জীব কালক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া অবশেষে দুই খণ্ডে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, এই দুই অর্দ্ধখণ্ড পূর্ব্ববৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার বিচ্ছিন্ন হয়। এইরূপে বিভক্ত হইতে হইতে তাহার বংশবৃদ্ধি হয়। বিচ্ছিন্ন

---

* আমরা এখানে ব্যক্তি শব্দ ইন্‌ডিভিডুয়াল্ অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। বাঙ্গলায় ব্যক্তি শব্দ কেবল মনুষ্যের স্থলেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইন্‌ডিভিডুয়ালের অনুরূপ অন্য কোন প্রতিশব্দের অভাবে আমরা এই শব্দই ব্যবহার করিলাম।

জীবটি মূল জীবেরই স্বতন্ত্র বিস্তার মাত্র। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে দেখা যায়, জননশক্তি অঙ্গের স্থলবিশেষে কেন্দ্রীভূত হইয়া পুষ্পিত হইয়া উঠে। সেই অঙ্গকোরক ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া খসিয়া পড়ে। এইরূপে যে জীবোৎপত্তি হয়, পূর্ব্বোক্ত ছিন্নাঙ্গজ জীবের অপেক্ষা তাহাদের স্বাতন্ত্র্য অধিকতর পরিস্ফুট বলিতে হইবে।

এই কোরকবিকাশ হইতেই ক্রমে স্ত্রীপুরুষভেদের অভিব্যক্তি। প্রথমে অঙ্গের কোন এক স্থানে জননশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া ফুটিয়া উঠিত—ক্রমে স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া আবশ্যকমত একটি নূতন ইন্দ্রিয় গঠিত হইল। এই নূতন ইন্দ্রিয় দেহাভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কতকটা ডিম্বকোষের মত আকার ধারণ করে। এবং পরে ইহাই ডিম্বকোষে পরিণত হয়।

প্রথম অবস্থায় একই কোষে স্ত্রী এবং পুংশক্তি নিহিত ছিল। এবং এই দুই শক্তির সম্মিশ্রণে সন্তান উৎপন্ন হইত। এখান হইতেই রীতিমত সন্তান উৎপাদন আরম্ভ—অর্থাৎ নূতন ব্যক্তির সৃষ্টি, পূর্ব্বতন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন অংশ মাত্র নহে। কালক্রমে বীজকোষ এবং ডিম্বকোষ দুইটি স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয় গঠিত হইল। এই দুই ইন্দ্রিয় বিভিন্ন দেহে সংস্থিত হইয়া স্ত্রীপুরুষ সৃষ্ট হয়। এবং এই পুংস্ত্রী বিভাগই প্রথম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের ক্ষেত্র। স্ত্রীপুরুষভেদ ব্যতীত সন্তানের মধ্যে তেমন বৈচিত্র্য সম্ভাবনা নাই—এবং বৈচিত্র্য নহিলে নির্ব্বাচনের সম্ভাবনা থাকে না।

এই স্ত্রীপুরুষ ভেদের পর হইতে লামার্কের নিয়মের ততটা প্রবলতা দেখা যায় না। বাহিরের অবস্থাপরিবর্ত্তন কঠিন ডিম্বের আবরণ ভেদ করিয়া কিম্বা গর্ভের অভ্যন্তরে তেমন সহজে আপনার প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া অভিব্যক্তির প্রথম দুইটি অঙ্গ যে এখানে একেবারেই নিষ্ফল হয়, তাহা বলা যায় না—যতই সামান্য হৌক্, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার যো নাই।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পরেই রোমানিস্ সাহেবের শারীরতান্ত্রিক নির্ব্বাচন। কিন্তু ইহা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ। কোন বিশেষ কারণে কোন জীবশ্রেণীর গুটিকতকের শারীরিক প্রকৃতিতে কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে তাহাদের নিজের মধ্যে ব্যতীত দাম্পত্য সফল হয় না। এইরূপে তাহাদের নবার্জ্জিত বিশেষত্ব বজায় থাকে। নহিলে, পুরাতন শ্রেণীর সহিত সম্মিশ্রণে বিশেষত্ব ক্রমে সংশোধিত হইয়া জাতিবৈচিত্র্য অভিব্যক্তির আর কোন সম্ভাবনা থাকিত না।

যৌন নির্ব্বাচনে জৈবিক অভিব্যক্তির শেষ। বল কিম্বা সৌন্দর্য্য কিম্বা কোন বিশেষ গুণের দ্বারা মনোহরণ করিতে পারিলে তবেই স্ত্রীলাভ ঘটে। এ অবস্থায় মানসিক প্রকৃতির অনেকটা উন্নতি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে ইহা দেখা যায় না।

মনুষ্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অভিব্যক্তির একটি সম্পূর্ণ নূতন অঙ্গ দেখা দিল। এত দিন প্রকৃতিই তাহাকে সম্পূর্ণ নিয়মিত করিত, এখন বিবেচনা ও বুদ্ধিপূর্ব্বক মানুষ এই কার্য্যে প্রকৃতির সহায়তা করিতে অগ্রসর হইল। আদিম অবস্থায় মনুষ্যও অন্যান্য জীবেরই মত বর্দ্ধিত হইয়াছে—সভ্যতা বৃদ্ধির সহিত যখন সে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে নিয়োগ করিতে শিখিল, তখন হইতেই এই নূতন অঙ্গের প্রাদুর্ভাব। জৈবিক অভিব্যক্তির সহিত ইহার কতকগুলি প্রভেদ সহজেই চোখে পড়ে।

(১) জৈবিক অভিব্যক্তিতে যাহারা চতুর্দ্দিকের অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে, তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য এবং তাহারাই টিঁকিয়া যায়। মানব অভিব্যক্তিতে যাহারা আইডিয়ালের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া চলে, তাহারাই যোগ্যতম। কেবল, অনেক সময়—বিশেষতঃ আদিম অবস্থায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের যখন প্রাবল্য—মানসী আইডিয়ালের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া চতুর্দ্দিকের সামাজিক অবস্থার উপযোগী না হওয়ায় অনেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

(২) জৈবিক অভিব্যক্তিতে দুর্ব্বল, অসহায় এবং কোন রকমে যাহারা অযোগ্য, তাহারা বিনাশ পায়। বলসাধনের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। মানব অভিব্যক্তিতে দুর্ব্বল, নিঃসম্বল এবং শারীরিক অনুপযোগীদিগকে রক্ষা করা হয় এবং ইহাই সঙ্গত—কারণ, এইরূপে দয়া মায়া ভালবাসায় আমাদের নৈতিক উন্নতি সাধিত হইয়া চরিত্র সবল হয়। কিন্তু শরীরের উপরে মনের উন্নতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, শারীরিক উন্নতিসাধনও শিক্ষার অঙ্গ।

(৩) জৈবিক অভিব্যক্তিতে বাহিরের অবস্থাপরিবর্ত্তনের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে আকারের পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য। মানব অভিব্যক্তিতে আকারের এরূপ পরিবর্ত্তন বড় হয় না—বাহিরের অবস্থাকে মানুষ আপনার অনুকূল করিয়া আনে। পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হয় ভাবের।

(৪) জৈবিক অভিব্যক্তিতে উচ্চতর নিয়মের প্রাদুর্ভাবে নিম্নতর নিয়মগুলি ক্ষীণ হইয়া আসে—যেমন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের আবির্ভাবে লামার্কের নিয়ম খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু মানবের বেলায় অভিব্যক্তির অন্য সকল নিয়মের অপেক্ষা বুদ্ধির যে কেবল প্রাবল্য দেখা যায় তাহা নয়, তাহার কর্ত্তৃত্ব দেখা যায়। বুদ্ধি অন্য সকল নিয়মকে নিজের সুবিধার মত করিয়া লয়। লামার্কের নিয়ম এই যে, চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক অবস্থা শরীরের পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া থাকে ; এই নিয়মটিকে মানুষ বুদ্ধিপূর্ব্বক নিজের অনুকূল করিয়া লয় এবং তাহাকেই বলে স্বাস্থ্যতত্ত্ব। লামার্কের আর একটি নিয়ম এই যে,

পরিচালনার চর্চ্চা অথবা অভাব অনুসারে অঙ্গবিশেষ পুষ্টি অথবা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মানুষ বুদ্ধিপূর্ব্বক সেই নিয়মকে চালনা করিয়া নিজের শরীর মনের উন্নতি সাধন করে। ইহাকেই বলে শিক্ষা। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ক্রমে বুদ্ধিসঙ্গত নির্ব্বাচন হইয়া দাঁড়ায়। এবং এইরূপে অভিব্যক্তির কয় অঙ্গই আয়ত্ত হইয়া আসে।

(৫) প্রটোজোয়া হইতে মনুষ্য এবং আদিম মানব হইতে আইডিয়াল্ মানব অবধি অভিব্যক্তির পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ জৈবিক অভিব্যক্তিতে এই পথ এত অপ্রশস্ত যে, একবার একটু এদিক্ ওদিক্ হইলে সে পথে ফিরিয়া আসিবার কোন উপায় নাই। যে পথ অবলম্বন করিয়া নিকৃষ্ট জীব হইতে প্রথম মনুষ্য অভিব্যক্ত হয়, এখন কোন প্রাণীর পক্ষে ঠিক সেই পথটি অবলম্বন করা দুঃসাধ্য। সেই রেখা হইতে ঈষৎ মাত্র ভ্রষ্ট হইলেই অন্য পথে গিয়া পড়িতে হয়। মানবসমাজেও এই নিয়ম কতকটা খাটে, কিন্তু একটু প্রভেদ আছে। আইডিয়ালের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলে সে পথে ফিরিয়া আসা কঠিন বটে, কিন্তু মানবের পক্ষে একেবারে অসম্ভব নয়। মানুষ নিজের ত্রুটি সংশোধন করিতে পারে এবং ধীরে ধীরে পুনরায় মূল পথ অবলম্বন করিয়া আইডিয়ালের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে। মানবের নিজের চেষ্টা মানব অভিব্যক্তির একটি প্রধান অঙ্গ। ['সাধনা,' চৈত্র ১২৯৮]

অভিব্যক্তি সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর

অভিব্যক্তির নূতন অঙ্গ নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 'সাধনা'র কোন চিন্তাশীল পাঠক আমাদিগকে যে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাহার উত্তর প্রকাশিত হইল।

পাঠক মহাশয়ের প্রশ্ন এই যে, বাইস্‌মান প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতেরা যখন লামার্ককে একেবারে উড়াইয়া দিয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনকেই অভিব্যক্তির একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন এবং বাহিরের প্রভাব কিম্বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনাজনিত পরিবর্ত্তন উত্তর বংশে সংক্রামিত হয় বলিয়া স্বীকার করেন না, তখন লামার্কের নিয়ম দুইটিকে অভিব্যক্তির অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করা যায় কিরূপে?"

অর্থাৎ মনে কর, একটা জন্তুর পাঁচটা বাচ্ছার মধ্যে দুটা বাচ্ছার এমন একটু শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিল যে, তজ্জন্য আহার সংগ্রহ আত্মরক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে অন্য তিনটি বাচ্ছার অপেক্ষা তাহাদের বিশেষ একটু সুবিধা হইল, তবে তাহারা এবং অনুরূপ পরিবর্ত্তনপ্রাপ্ত তাহাদের বংশীয়েরাই টিঁকিয়া যাইবে, এবং অপরেরা আহারাভাবে এবং নানা উপদ্রবে ক্রমশঃ মারা যাইবে। প্রকৃতি এই উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার উপযোগী যোগ্যতম জন্তুদিগকেই বাছিয়া রাখেন, সেই জন্য এই প্রণালীকে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন বলে।

বাইস্‌মান প্রভৃতি পণ্ডিতদিগের মতে প্রধানতঃ এই নির্ব্বাচনের সাহায্যেই জীবদের ক্রমশঃ পরিবর্ত্তন এবং বৈচিত্র্য সাধিত হইয়াছে। কিন্তু লামার্ক বলেন, ভিন্ন অবস্থায় জীবদের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের পরিচালনার আবশ্যক হয়, এবং তজ্জন্য পরিচালিত অঙ্গের বিশেষ পরিণতি এবং অব্যবহৃত অঙ্গের অবনতি এবং ক্রমে অন্তর্দ্ধান ঘটে—এইরূপে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহা বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইতে থাকে। তাঁহার মতে এই উপায়েই জীবরাজ্যে বৈচিত্র্য এবং পরিবর্ত্তন চলিতে থাকে।

বাইস্‌মান প্রভৃতি কতকগুলি নব্য পণ্ডিত প্রকৃতিতে লামার্কের এই নিয়মের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। বাইস্‌মান বলেন—জন্তুদেহ দুই জাতীয় কোষের দ্বারা নির্ম্মিত। তন্মধ্যে একজাতীয় কোষের ক্রমাগতই হ্রাস বৃদ্ধি হরণ পূরণ চলিতেছে, যেমন আমাদের ত্বক্‌কোষ, রক্তকোষ প্রভৃতি। এই জাতীয় কোষকে বৈকারিক কোষ নাম দেওয়া যাইতে পারে। কারণ, বাহিরের প্রভাবের দ্বারা ইহাদের পরিবর্ত্তন ও বিকার ঘটিয়া থাকে। এই সকল কোষের স্থিতি গতির উপর আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের নির্ভর। অন্য জাতীয় কোষকে বীজকোষ বলা যায়। তাহারা এরূপ পরিবর্ত্তনশীল নহে—বাহিরের প্রভাব তাহাদের উপরে কার্য্য করিতে পারে না। এই নির্ব্বিকার বীজকোষের দ্বারাই বংশ রক্ষা হয়। এই বীজকোষের মধ্য দিয়াই পূর্ব্বপুরুষের গুণসকল উত্তর পুরুষে প্রবাহিত হইতে থাকে—কিন্তু যেহেতুক বাহিরের পরিবর্ত্তনে কেবল বৈকারিক কোষেরই পরিবর্ত্তন হয়, বীজকোষের পরিবর্ত্তন হয় না, সেই জন্য বাহিরের প্রভাবজনিত পরিবর্ত্তন উত্তর বংশে সংক্রামিত হয় না। অর্থাৎ কোন জন্তু পড়িয়া গিয়া খোঁড়া হইয়াছে বলিয়া তাহার সন্তানও খোঁড়া হয় না। বাইস্‌মান জন্তুদের অঙ্গচ্ছেদপূর্ব্বক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, কৃত্রিম উপায়ে বিকলাঙ্গ জীবের সন্তানেরা অঙ্গহীন হয় না।

এখন বাইস্‌মানের সিদ্ধান্ত লইয়া কথা।

(১) যদি আমাদের প্রবন্ধে প্রকাশিত অভিব্যক্তিপ্রণালী সত্য হয় এবং জীবসকল যদি সামান্য প্রাণপঙ্ক হইতে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে লামার্কের নিয়মের অস্তিত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। স্ত্রী-পুরুষ ভেদের পূর্ব্বে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কোন কথাই উঠিতে পারে না। কারণ, স্ত্রী এবং পুরুষের মিলনেই সন্তানদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের কারণ ঘটে। নতুবা একই জীব দুই অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া নূতন পরিবর্ত্তন পাইতে পারে না। সুতরাং জীব সৃষ্টির আদিম অবস্থায় লামার্কের নিয়মই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল, ইহাতে আর সংশয় নাই। এবং যদি কেহ বলেন, এখন তাহার কার্য্যকারিতা স্থগিত হইয়াছে, তথাপি অভিব্যক্তির কাল আরম্ভ করিয়া দিবার জন্য পূর্ব্বে তাহার বিশেষ প্রবলতা ছিল, এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না।

(২) কিন্তু এক সময়ে যদি লামার্কের নিয়ম দুইটির কাজ ছিল এমন হয়, তাহা হইলে এখন তাহার বিলোপ অসম্ভব। উচ্চ অঙ্গের আবির্ভাবে নিম্ন অঙ্গের বিনাশ সাধিত হয় না, প্রভাব খর্ব্ব হয় মাত্র। তাই দেখা যায়, উচ্চ শ্রেণীর জীবের মধ্যে লামার্কের নিয়মের প্রভাব ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু লোপ পায় নাই। অভিব্যক্তির প্রথম অবস্থায় যখন দেহতন্ত্রের জটিলতা ছিল না, তখন বীজকোষ এবং বৈকারিক কোষ একই ছিল; উভয়ের স্বাতন্ত্র্য ছিল না। সুতরাং তখন বাহিরের প্রভাব এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালনাজনিত পরিবর্ত্তনই বংশানুক্রমে সংক্রামিত হইতে পারিয়াছে। তাহার পর এক দিনেই কিছু বীজকোষের সহিত বৈকারিক কোষের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে নাই, ধীরে ধীরে অল্পে অল্পে উভয়ে স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বৈকারিক কোষের মধ্য দিয়া বীজকোষের উপর বাহিরের প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিলেও একেবারে বন্ধ হইতে পারে না। উচ্চশ্রেণীর জীবের মধ্যে এখন বীজকোষ এবং বৈকারিক কোষ এতটা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে যে, বৈকারিক কোষের পরিবর্ত্তন হয় ত বীজকোষকে সহজে স্পর্শ করে না। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের গতি যদি বহু দিন ধরিয়া এক দিকে হয়, তাহা হইলে উক্ত পরিবর্ত্তন বীজকোষের মধ্য দিয়া উত্তর পুরুষে সংক্রামিত হইতে পারে। অর্থাৎ যদি বংশানুক্রমে কিছু কাল ক্রমাগত কোন জন্তুর কোনরূপ শারীরিক বিকার ঘটান যায় এবং তদ্দ্বারা তাহার প্রাণরক্ষার কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তবে সেই অঙ্গবিকার ক্রমে সন্তানদের মধ্যে সহজে প্রচলিত হইতে পারে।

যদি বাইস্‌মান প্রভৃতি পণ্ডিতের কথা যথার্থ সত্য হয়—অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন জৈবিক অভিব্যক্তির একমাত্র অঙ্গ হয়, তাহা হইলে মানব জাতির উন্নতির আশা ভরসা এইখানেই অনেকটা শেষ হইয়া আসে। সকলই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনেই হইতে থাকুক—স্বাস্থ্যসাধনই বা কেন, শরীরের উৎকর্ষবিধান চেষ্টাই বা কেন! স্বাস্থ্যসাধনাদি চেষ্টাসকল যে কেবলি বর্ত্তমান বংশের উন্নতির জন্য, উত্তর পুরুষে ইহার সুফল বর্ত্তিবার আশা নাই, তাহা ত নয়। ব্যক্তির উন্নতি বংশানুক্রমে প্রবাহিত হইয়া জাতিরই উন্নতি সাধন করে। আমাদের যাহা কিছু শিক্ষা দীক্ষা ব্যক্তির উন্নতি উদ্দেশ্যে হইলেও ঘটনাগতিকে তাহা জাতিতে গিয়াই পৌঁছে। তবে এ কথা স্বীকার করিতে হয় বটে যে, কেবলমাত্র উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে পূর্ব্বপুরুষের সমস্ত গুণ কেহ পায় না। আর দুএক পুরুষেই যে, অধঃপতিত জাতি চরম পরিণতি লাভ করিয়া উন্নত জাতির সমান হইয়া দাঁড়ায়, তাহাও নহে। ব্যক্তিগত উন্নতিটুকু ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে পুরুষানুক্রমে পরিচালনানুসারে জাতির মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। যদি এমন হয় যে, বুদ্ধিই মানব অভিব্যক্তির গতি নির্দ্দেশ করে এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনই ইহার একমাত্র উপায়, তবে জাতির উন্নতি সাধন করিতে হইলে

দুর্ব্বল ও অসহায়দিগকে বিনষ্ট করাই শ্রেয়। কিন্তু এইরূপ আচরণের বিরুদ্ধে সমস্ত মনুষ্যত্ব বিদ্রোহ উপস্থিত করে। লামার্কের নিয়মের পরিচালনায় এরূপ কোন বিদ্রোহী ভাব উপস্থিত হয় না। আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসাধনবিধি, এ সকলই ত লামার্কীয় নিয়মের বুদ্ধিপূর্ব্বক পরিচালনা। লামার্কের নিয়মানুসারে বাহিরের অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া আমরা জীবন রক্ষা করিতে পারি। অতএব লামার্কের নিয়মের বর্ত্তমানে কার্য্যকারিতার উপরেই জাতির উন্নতি সাধনাশা বিশেষরূপে নির্ভর করে সন্দেহ নাই। ['সাধনা,' বৈশাখ ১২৯৯]

সাময়িক সারসংগ্রহ

প্রেমে পড়া

য়ুরোপে সম্প্রতি কেহ কেহ পূর্ব্বরাগমূলক দাম্পত্যের পরিবর্ত্তে বর কন্যার যোগ্যতা বিচার করিয়া জুড়ি মিলাইয়া কৃত্রিম নির্ব্বাচন প্রচলনের ধুয়া ধরিয়াছেন। সাধনার পাঠকেরা এ সম্বন্ধে হাইরাম ষ্ট্যান্‌লির মত পূর্ব্বেই শুনিয়াছেন—সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেলও এই দলভুক্ত। তিনি বলেন—সৌন্দর্য্যে ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া বিবাহ করা অপেক্ষা বিবেচনাপূর্ব্বক বিবাহ করা ভাবী বংশের কল্যাণজনক।

"গ্র্যাণ্ট্ অ্যালেন্" ছদ্মনামধারী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ক্যাম্বেল সাহেবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। তিনি বলেন, জাতিরক্ষার পক্ষে সৌন্দর্য্য নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। হার্ব্বার্ট্ স্পেন্সর বলেন, যাঁহারা বংশের কল্যাণ কামনা করেন, সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা তাঁহাদের এক প্রধান কর্ত্তব্য। সর্ব্বাবয়বসম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গীন স্বাস্থ্যেরই পরিচায়ক এবং আমরা যেখানে সৌন্দর্য্যের অভাব দেখি, সেখানে স্বাস্থ্যেরও অনেক ত্রুটি লক্ষিত হয়। পাণ্ডুবর্ণ প্রায় পরিপাকশক্তির হীনতা এবং রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার ক্ষীণতার ফল; অনুন্নত বক্ষস্থল অপরিপুষ্ট মাতৃত্বের পরিচয়; খর্ব্বাকৃতি ক্ষীণ পৌরুষ জ্ঞাপন করে।

কেবলি শারীরিক অবস্থা নহে, মানসিক প্রকৃতিও সৌন্দর্য্যে অনেকটা ধরা দেয়। সেই জন্যই ত ভাবের অভাবে গঠনপারিপাট্য নিষ্ফল। হাসি হাসি মুখ, প্রশান্ত ভাব, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বুদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। ননী দিয়া গঠিত জড়ভরত চেহারাও সুন্দর মনে হয় না।

মানবপ্রকৃতি যেরূপ জটিল, তাহাতে কোন্ দুই অর্দ্ধাঙ্গ পরস্পরের প্রতিপূরক, কোন পদ্ধতি অনুসারেই তাহা নির্ণয় করা যায় না এবং কোন্ দাম্পত্যের কিরূপ ফল, পূর্ব্বাহ্ণে দেবতারাও বলিতে পারেন না। সর্ উইলিয়ম হর্শেলের পিতা একজন সামান্য বাজন্দার

ছিলেন এবং জননী এই বাজন্দারেরই উপযুক্ত গৃহিণী—কে জানিত, এই দাম্পত্যফলে সর্ উইলিয়ম্ হর্শেল উৎপন্ন হইবেন ? শেক্সপীয়রের জন্মগ্রহণের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামাতার দাম্পত্যফল কে নির্ণয় করিতে পারিত ? অনেক বড়লোকের মা বাপের তেমন অসাধারণ ক্ষমতা কিছুই প্রকাশ পায় নাই। সর্ জর্জ্জ ক্যাম্বেল কিম্বা অন্য কোন বিচক্ষণ লোক সে সকল পিতামাতাকে কি দেখিয়া বিবাহবন্ধনে একত্র করিতেন ?

যাঁহারা ঘোড়া গরুর নজীর দেখাইয়া প্রমাণ করিতে চাহেন যে, বিজ্ঞানবলে মানুষ গড়িয়া তোলা নিতান্ত অসম্ভব নহে, তাঁহাদের লক্ষ্য করিয়া গ্র্যাণ্ট্ অ্যালেন বলিয়াছেন—মানুষের তৈরি ঘোড়া গরু মানুষের অনেক সখ মিটায় বটে, কিন্তু ঘোড়া হিসাবে গরু হিসাবে তাহাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া কেবল কিয়ৎকালের জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দুই ক্রোশ পথ অন্য ঘোড়াকে অতিক্রম করিয়া ছুটে মাত্র, বস—পরদিন হইতেই তাহার বিশ্রাম আরম্ভ। গৃহপালিত জীব বন্য জীবের অপেক্ষা দুর্ব্বল এবং জীবনীশক্তিবিহীন হয়। মনুষ্যের যত্ন ব্যতীত তাহারা স্বাধীনভাবে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইতে পারে না। এমন কি, মনুষ্যযত্নজাত দ্রাক্ষা মুখরোচক হইলেও বন্য আঙ্গুরের মত সবল সতেজ হয় না। তাহাদের মধ্যে নানারকম সাংঘাতিক রোগ দেখা যায়।

তবে নির্ভর কিসের উপর ? বৈজ্ঞানিক গ্র্যাণ্ট্ অ্যালেন জবাব দিয়াছেন—প্রেমের উপর। আমরা যতই বুদ্ধিমান্ জীব হই না কেন, এ কথা মানিতে হয় যে, প্রকৃতির সর্ব্বত্র আমাদের মাথা গলে না—এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে বুদ্ধি অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরে, হৃদয় আপন আলোকে পথ দেখিতে পায়। তাই প্রকৃতি আমাদের অন্তরে নির্ব্বাচনী একটি বৃত্তি দিয়াছেন—সেই বৃত্তি দিয়া আমরা পরস্পরের পূরকতা অনুভব করি এবং ঘনিষ্ঠ মিলনে আবদ্ধ হই। ইহাকে প্রেমই বল, আর প্রকৃতির আদেশবাণীই বল বা যে কোন নামই দাও না কেন, ইহাই আমাদের নির্ব্বাচনের প্রধান সহায়।

অবশ্য এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, মোটের উপর আমরা সুস্থ সবল রূপযৌবন-সম্পন্ন সুন্দর সুশীলেরই প্রেমে পড়িয়া থাকি এবং বাছিয়া বাছিয়া রুগ্ন ভগ্ন জীর্ণের প্রেমে পড়ি না। বরঞ্চ দেখা যায়, পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচনকালে পিতামাতারা নিরাসক্ত ভাবে কুল মান ধন প্রভৃতি সামাজিক যোগ্যতার প্রতিই অধিক দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু রূপ গুণ ক্ষমতা স্বভাবের কমনীয়তা প্রভৃতি ব্যক্তিগত যোগ্যতাই স্বভাবতঃ ও সাধারণতঃ প্রেম আকর্ষণ করিয়া থাকে। এবং সেই প্রেমের মিলনেই সন্তান সন্ততিতে এই সকল গুণ সঞ্চারিত হইয়া ভবিষ্যদ্বংশের উন্নতি সাধিত হয়।

আর ব্যক্তি হিসাবে আমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রকৃতির অনুকূল—(কিন্তু সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে) স্বাতন্ত্র্যের প্রেমে পড়ি। একই রকম দুই জনের মধ্যে উৎকৃষ্ট মিলন প্রায়

ঘটে না—দুই জনে এতটা তফাৎ হওয়া চাই, যাহাতে পরস্পরকে অনেকটা পূরণ করিতে পারে, কিন্তু এমন তফাৎ আবার না হয় যে, দুই জনে কিছুতেই মিল খায় না। এই প্রতিপূরক সম্বন্ধ অনুভব করিবার একমাত্র উপায় প্রেম। বুদ্ধি এবং বিবেচনা এখানে কোন বাঁধা পথ দেখিতে পায় না। তাই বলিয়া প্রেমের নির্ব্বাচনে যে ভুলচুক একেবারে ঘটে না, এমন বলা যায় না। প্রবৃত্তি ত আর অভ্রান্ত নয়। মনে রাখিতে হইবে, মানুষ অসম্পূর্ণ জীব। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, পুথিগত কৃত্রিম নির্ব্বাচনে ভুলের সম্ভাবনা আরও বেশি।

অকারণে বিধাতা যে আমাদিগকে এই স্বাধীন প্রবৃত্তি দিয়াছেন, তাহা কখনই সম্ভব নহে। তুচ্ছতম প্রবৃত্তির মূলে যখন এক নিগূঢ় গভীর উদ্দেশ্য দেখা যায়, তখন যে প্রবৃত্তির উপরে মানবসমাজের সমস্ত শুভাশুভ নির্ভর করিতেছে এবং সমগ্র মানবসমাজ যে প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত, তাহা যে উদ্দেশ্যহীন নিষ্ফল, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? বিশেষতঃ এই নির্ব্বাচনী বৃত্তিতে যখন সমস্ত জীবজগতের সহিত মানবপ্রকৃতির এক সুশৃঙ্খল যোগ দেখা যায়, তখন গায়ের জোরে ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যে নির্ব্বাচন সমস্ত জীবজগতে কার্য্য করিতেছে, মানবে তাহার পরিণতিই সম্ভব—সহসা যে মাঝখান হইতে খপ্ করিয়া একেবারে সৃষ্টিছাড়া বিধান আসিয়া প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিয়া চলিবে, ইহা তেমন সম্ভবপর নহে।

আর গ্যাল্‌টন্ ত দেখাইয়াছেন যে, যে সকল অতিবিজ্ঞ ব্যক্তি চারি দিক্ তৌল করিয়া বিবাহ করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা সামান্য প্রেমেপড়ার দাম্পত্য কত সফল হয়। এবং এইরূপ দাম্পত্যফলেই সমাজে সুন্দর সবল এবং বুদ্ধিমান্ সন্তান সন্ততির প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

গ্র্যাণ্ট্ অ্যালেন তাই বলেন, সমাজের এবং সভ্যতার উন্নতির সহিত বিবাহের নৈতিক দায়িত্ব লোকে যত অনুভব করিবে, প্রেমমূলক দাম্পত্যের সুফল ততই হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং ধন দেখিয়া, মান দেখিয়া, কুল দেখিয়া সামাজিক সুবিধা বিচার করিয়া বিবাহ লোকে ততই অন্যায় জ্ঞান করিতে থাকিবে। ['সাধনা,' বৈশাখ ১২৯৯]

ধর্ম্মজঙ্গল

নব্য হিন্দুর এক প্রধান সমস্যা ধর্ম্ম। এক দিকে পুরাতন শাস্ত্রবিধি—নানা মুনির নানা মত, নানা গুরুর নানান টীকা, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের নানা সময়ের স্তূপাকার বিধি এবং বিধানের দুর্ভেদ্য রহস্য; এক দিকে প্রচলিত লোকাচার—হিঁদুয়ানির সহস্র নির্দ্দিষ্ট এবং

অনির্দ্দিষ্ট অনুষ্ঠান, খাওয়া পরা, শোওয়া বসা, ওঠা নামা, হাঁচি কাশির বিবিধ উপদ্রব ; আর এক দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার নূতন জ্ঞানালোকে নূতন ভাব, নূতন বিশ্বাস এবং নূতন কর্ত্তব্যের উত্তেজনা। এই তিনের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন সামঞ্জস্য রক্ষা করা মহা দায়। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পরামর্শ দেয়, লোকাচার আবার স্বতন্ত্র বিধান জারি করে, এবং ইংরাজী শিক্ষা যে পথ নির্দ্দেশ করে, তাহা অনেক সময়েই লোকাচারের বিশেষ বিরোধী এবং শাস্ত্রকেও যে সর্ব্বত্র সম্যক্ রক্ষা করিয়া চলে, এমন বলা যায় না। সুতরাং নব্য হিন্দুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। শিক্ষাগুণে তিনি পাশ্চাত্য ভাবে দীক্ষিত, সমাজের ভয়ে লোকাচার পালন করেন এবং তর্কস্থলে কেবল আর্য্যমর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য জানাশুনা বচন পাইলে তাহা লইয়া সঘনে মুখনাড়া দেন। কতটুকু কি মানিলে এবং কতটুকু কি করিলে হিন্দুধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ পালন করা হয়, এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানকাণ্ড বিধর্ম্মীরই মত।

সে জন্য কিন্তু নব্য হিন্দুকে দোষ দেওয়া চলে না। কি করিলে না করিলে হিন্দুধর্ম্ম পালন কিম্বা লঙ্ঘন করা হয়, বলা বাস্তবিকই বড় শক্ত। মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টধর্ম্ম যেরূপ জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে কতকগুলি মূল বীজে বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে এবং আনুষঙ্গিক কতকগুলি অনুষ্ঠানের সহিত জড়িত, হিন্দুধর্ম্ম সেরূপ নহে। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং মহম্মদকে ঈশ্বরের প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করাই মুসলমান ধর্ম্মের বীজমন্ত্র ; যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র ও মানবের পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করার উপরেই খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ; হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাসের এরূপ কোনও নির্দ্দিষ্ট ভিত্তি নাই। নানাবিধ সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিরোধী মত ও বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান, কাব্য দর্শন, বিজ্ঞান জ্যোতিষ, মন্ত্র তন্ত্র ইন্দ্রজাল যাহা কিছু কোন কালে এদেশে উদ্ভূত হইয়াছে, কিম্বা বিদেশ হইতে আসিয়া কালক্রমে এদেশী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাই নিঃশব্দে হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহার কতটা বিশেষ কোন ধর্ম্মমতে বিশ্বাস, কতটা লোকাচার, কতটা শাস্ত্রপালন, কতটা জাতিভেদ, আহার বিহার সম্বন্ধে সমাজের নিয়মরক্ষা, আর কতটাই বা ব্যক্তির স্বাধীনতা, এ পর্য্যন্ত তাহা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

হিন্দুধর্ম্মের যদি কোন বিশেষত্ব চোখে পড়ে ত তাহা কেবল কোন প্রকার শৃঙ্খলা, প্রণালী এবং গঠনের সম্পূর্ণ অভাব। জ্ঞানে অজ্ঞানে, সত্য মিথ্যায়, ব্রহ্মে মৃৎপিণ্ডে, দেবতা পিশাচে, প্রেমে হিংসায় এরূপ নির্ব্বিবাদ একান্নবর্ত্তিতা আর কোথাও দেখা যায় না। আস্তিক্য এবং নিরীশ্বরবাদ, বিশ্বাস এবং সন্দেহ, কর্ম্ম এবং আলস্যের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান নাই। চার্ব্বাকের শিষ্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক ঈশ্বর ও পরকাল হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া যে ব্যক্তি সমস্ত ধর্ম্মনীতিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখে, সেও যেমন হিন্দু, আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের নাম না লইয়া জলগ্রহণ করে না, সেও সেইরূপ হিন্দু। ব্রহ্ম যাহার আরাধ্য দেবতা এবং

তেত্রিশ কোটি উপ ও অপদেবতা যাহার সম্বল, দুই জনেই হিন্দুধর্ম্মের সমান সেবক। বিধানও তেমনি ;—এক দিকে অহিংসার পর ধর্ম্ম নাই, আর এক দিকে বলি নহিলে দেবপূজা হয় না—বলি ছাগ হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষ অবধি। সুতরাং কি যে হিন্দুধর্ম্মের অনুমোদিত এবং কি নয়, তাহা ঠাহরান দায়। ভয়ে ভয়ে কথা কহিতে হয়, কাহাকে হিন্দু নয় বলিলে লাইবেল এবং কাহাকে হিন্দু বলিলে লাইবেল হইয়া দাঁড়ায়।

অধিকারিভেদের ব্যবস্থা এখানে খাটে না। অর্থাৎ এ কথা বলা চলে না যে, হিন্দুধর্ম্মের একটি মূল মত ও বিশ্বাস আছে—তবে সর্ব্বসাধারণে সে উচ্চ ভাব সম্যক্ ধারণা করিতে পারে না বলিয়া নানা দিক্ দিয়া সেই আদর্শে লইয়া যাওয়া হয়। দুই সম্পূর্ণ বিরোধী মতের গতি বিপরীত দিকেই হইয়া থাকে। নিরীশ্বরবাদের মধ্য দিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের পথ নহে এবং দেবোদ্দেশে ক্রমাগত জীবহিংসা করিয়া অহিংসা সাধন হয় না। অতএব স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, হিন্দুধর্ম্মের কোনও নির্দ্দিষ্ট মূল মত বা বিশ্বাস নাই। ঋষিরা নিজে নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতেন—তাঁহারা সেই সকল চিন্তা রাখিয়া গিয়াছেন, বলপূর্ব্বক সব ঋষিকে এক গণ্ডীর মধ্যে আনা যায় না। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণেরাও তখনকার সুবিধামত যে সকল বিধিব্যবস্থা করিয়াছেন, যাবতীয় প্রাচীন ঋষিবাক্যের সহিত তাহার ঐক্য হইবার কথা নয়। তখন হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া কোনো কিছু ছিল না—এবং পরে পরে পাঁচ জনে সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের ব্যাখ্যাও করেন নাই।

কেবলি যে কোনও মূল ধর্ম্মমত কিম্বা বিশ্বাসের কোনরূপ আঁটাআঁটি নাই তাহা নয়, আমাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও ভিন্ন ভিন্ন জাতি বর্ণ শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অনৈক্য। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ মাংসাশী, পশ্চিমী ব্রাহ্মণের আমিষ সংস্পর্শ নিষিদ্ধ এবং এ নিষেধ অবহেলা করিলে অবিলম্বে জাতিচ্যুত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। দাক্ষিণাত্যে অনেক ব্রাহ্মণ পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকেন এবং বাঙ্গলার শক্তি-উপাসকদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণের পানদোষ-দৃষ্টান্তও বিরল নহে, কিন্তু পলাণ্ডুভক্ষণ কিম্বা মদ্য পানে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের সদ্য জাতিনাশ হয়। বঙ্গদেশ ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রদেশে ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দাম্পত্য ছিন্ন করিয়া পত্যন্তর গ্রহণও বিরল নহে। ইহা ভিন্ন নানা বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি সম্প্রদায়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান—কোনটির সহিত কোনটির বড় মিল নাই। এ সকল আচারভেদকে নিতান্ত সামান্য বলিয়া গণ্য করা যায় না ; কারণ, এই আচারভেদ হইতেই পরস্পরের মধ্যে আহার ব্যবহার, আদান প্রদান সম্বন্ধে যত বাধা এবং সকল প্রকার আত্মীয়তার পথ একেবারে বন্ধ।

কিন্তু আদান প্রদানের পথ বন্ধ কেবলি কি আচারভেদনিবন্ধন ? না, জ্ঞাতিবৈরী, গ্রাম্য দলাদলি এবং অন্যান্য আরও অনেক কারণ আছে ? রাঢ়ী বারেন্দ্র, কুলীন বংশজ,

ফুল মেল, হেন-তেন, এ সকলেও ত আমাদিগকে পরস্পর হইতে যথেষ্ট বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। ইহা এ দেশের মাটির গুণ বলিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্ম একদিকে যেমন ঢিলেঢালা আল্‌গা—মত ও বিশ্বাসের বাঁধাবাঁধি নাই, বিরোধী অনুশাসন এবং আইনকানুনের মধ্যে ভেদাভেদ নাই, কেবলি শাস্ত্রে অশাস্ত্রে লোকাচারের অনাচারে গোঁজামিল; আর একদিকে তেমনি বজ্রআঁটুনি, স্তরে স্তরে নানারকমের জাতিভেদ—ব্রাহ্মণ শূদ্রে, শূদ্রে শূদ্রে, ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, জাতিতে জাতিতে, বর্ণে বর্ণে, কুলে কুলে, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে এবং ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে। মুসলমান অথবা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম যেমন বিচ্ছিন্ন মানবজাতিকে এক বৃহৎ মণ্ডলীর মধ্যে আনিয়া এক করিয়া ফেলিতে চায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি সেরূপ নহে। মণ্ডলীগঠন হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং ভেদবুদ্ধি ইহার স্বাভাবিক।

প্রচার ত হিন্দুধর্ম্মের ভাব নয়, সুতরাং মণ্ডলীগঠনের আমাদের আবশ্যও হয় নাই। আর দেশব্যাপী সুবৃহৎ এক ধর্ম্মমণ্ডলী সংস্থাপনের পক্ষে আমাদের কতকগুলি বাধাও ছিল। ভারতবর্ষ চিরদিনই সহস্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য উপরাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগ অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী। নিত্য ঝগড়া বিবাদ, যুদ্ধ হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। এ অবস্থায় একটা রীতিমত ধর্ম্মগঠন অসম্ভব। তবে এখন যে আমরা প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মের নাম লইয়া পড়িয়াছি, সে অনেকটা আমাদের মনগড়া—ইংরাজ শাসন ও ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে সকল বিষয়ে যে একটি প্রণালীবদ্ধ বৃহৎ সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে, প্রাচীন কালের সমাজ ও ধর্ম্মে এই ভাব আরোপ করিয়া একটি মানসী প্রতিমূর্ত্তি খাড়া করিয়া তুলিতেছি মাত্র। এবং নব্য হিন্দুধর্ম্মকে এই মানসী প্রাচীনেরই বংশধর ঠাহরাইয়া সান্ত্বনা লাভ করিতেছি, যেন সমস্ত ভারতবর্ষ একধর্ম্ম, একমত, একবিশ্বাস—এবং এই বিপুল জনসমাজ যে ধর্ম্মবন্ধনে পরিচালিত, তাহাকেই হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত আমাদের যাহা কিছু ঐক্য, ঐ যাবনিক হিন্দু নামটায়। হিন্দু বলিলে আমরা প্রথমতঃ ভারতবাসী বলিয়া বুঝি, দ্বিতীয়তঃ মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বী নয় বলিয়া জানি, তৃতীয়তঃ পিতা মাতা যে হিন্দু, তাহার পরিচয় পাই। মনের এক কোণে জাতিভেদের একটু ছায়াও আসিয়া পড়ে। এবং ব্রাহ্মণের সহস্র বিরোধী বিধানের মধ্যে যে-কোন গুটিকতকের প্রভাব অনুমান করি। কিন্তু জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণ্যের বিরুদ্ধে প্রাচীন কালে মধ্যে মধ্যে যে সকল ধর্ম্মান্দোলন গিয়াছে, তাহাও এখন হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং চৈতন্য প্রভৃতি সংস্কারকেরা অবতারের মত সম্মানিত হয়েন। এমন কি, যে বুদ্ধদেবের প্রভাবে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ব্রহ্মণ্য একেবারে নির্ব্বিষ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সমস্ত জাত্যভিমান ও মিথ্যা দম্ভ চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, সে বুদ্ধদেবও আমাদের একজন অবতারমধ্যে গণ্য। শুধু তাই নয়।

জগন্নাথক্ষেত্রে ব্রাহ্মণে চণ্ডালে উচ্চ নীচে ভেদ নাই—যে ব্রাহ্মণ শূদ্রের ছায়া মাড়াইয়া স্নান না করিলে আপনাকে পতিত বলিয়া ঠিক দিয়া রাখেন, শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিয়াও সেখানে তাঁহার ব্রহ্মণ্য ক্ষুন্ন হয় না।

এ সকল ছিদ্র থাকিলেও কিন্তু জাতিভেদ যে আমাদের মজ্জায় মজ্জায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। একজন মহৎ লোকের আবির্ভাবে চারি দিকে যখন একটু উৎসাহ উত্তমের সঞ্চার হয়, তখনই দিনকতক এখানে জাতি ভাঙ্গে, সেখানে শ্রেণী ভাঙ্গে, একটা হৈচৈ বাধে, তাহার পর আবার যে-কে-সেই। বুদ্ধই আসুন আর চৈতন্যই আসুন, চোখের আড়াল হইলেই আমাদের প্রাণের আড়াল। আমাদের যাহা কিছু সম্পর্ক—শরীরী মানুষটির সহিত, আমরা ভাবের ধার ধারি না। তাই মহত্ত্বকে কেবল অবতার হিসাবে ফুলচন্দন দিয়া পূজা করি এবং কার্য্যতঃ যথাসাধ্য তাঁহার প্রতিকূলাচরণ করিতে ত্রুটি করি না। চৈতন্যের শিষ্যেরা তাঁহার অনুসরণ করে তাঁহাকে মারিয়া—তিনি যে সার্ব্বজনীন উদার প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই প্রেম সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ করিয়া, তিনি যে মধুর রসে জগতের হৃদয় সিক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন, সেই বিমল রসে বিষ মিশাইয়া। বুদ্ধ অবতারীকৃত—কিন্তু যে মহদ্ভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, সে ভাবকে আমরা দেশান্তরিত করিয়া নিশ্চিন্ত। এবং আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অবতার বলিয়া গণ্য করিলেও বুদ্ধকে আমরা নাস্তিক বলিয়া গালি দিতে ছাড়ি না। এরূপ দেবে দানবে—অবতারে নিরীশ্বরে অপূর্ব্ব সম্মিলন একমাত্র আমাদের দেশেই সম্ভব।

আসল কথা, ভেদসংঘটন আমাদের জাতীয় চরিত্রের একটি বিশেষ লক্ষণ। এবং সেই জন্যই জাতিভেদ আমাদের ধর্ম্মের সহিত এমন জড়িত হইয়া গিয়াছে। সমাজের সর্ব্বাঙ্গের মধ্যে রক্তচলাচল বন্ধ। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইবাব দিকে আমাদের যত ঝোঁক। দেবতা তেত্রিশ কোটি এবং ইহার উপরে প্রতি দিন দুদশটি করিয়া বাড়িতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার সেবকদিগের মধ্যে দলাদলি। শৈব—বৈষ্ণব দেবতার নামে ছড়া বাঁধিয়া গালি দেয়, বৈষ্ণব খুঁজিয়া খুঁজিয়া শিবের যত অপকর্ম্ম বাহির করে, আবার শাক্ত শৈবের মধ্যেও বনিবনাও হয় না। যাঁহারা কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিয়াছেন, স্ত্রী-দেবতার প্রতি ধনপতি সওদাগরের বিরাগের কথা তাঁহাদের অবিদিত নাই। আবার ছোটখাট অনেক অজ্ঞাতকুলশীল দেবতা আছেন, ভক্তেরা স্তুতি রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে জাগ্রত করিয়া তুলে। এবং এরূপ অনেক প্রমাণ প্রয়োগ দেখা যায় যে, মনস্কামনা সিদ্ধিপক্ষে সত্যপীর, ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং মনসা দেবী অনায়াসে মহেশ্বরকে লঙ্ঘন করিয়া যাহাকে তাহাকে কালিন্দীসহোদরসদনে চালান দিতে পারেন। ইহা ভিন্ন, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ভিন্ন ভিন্ন জাগ্রত দেবতার পরিচয় শুনা যায়। গ্রামের লোকেরা অনেক

বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহাঁদিগকে সন্ধান করিয়া বাহির করে। ও-পাড়ায় মনু বুড়ী এত দিন বাঁচিয়া বাঁচিয়া একানব্বই বৎসর বয়সে যেই ইহলীলা সাঙ্গ করিল, বৎসর না যাইতে এ-পাড়ার নবীন ঘোষের গৃহিণী পুত্রশোকের মর্ম্মঘাতী বেদনা অনুভব করিলেন; লোকে সন্ধান পাইল—মনু বুড়ী নিতান্ত যে-সে নয়, নবীন ঘোষের বাড়ীর ঈশান কোণে আমড়াতলায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমড়াবনের পাশে পুকুরপাড়ে ওলাদেবীর বাস, মনু ওলাদেবীর কেহ হয়। অতএব ওলাদেবীর মত মনু বুড়ীরও সেবার বিধানাদি করিয়া দিয়া তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। এইরূপে মনুঠাকুরাণী ওলা মনসার দল বৃদ্ধি করিলেন। জেনেরাল নিকলসন সিপাহীদের বড় প্রিয় পাত্র ছিলেন—তাহারা তাঁহাকে দেবতা করিয়া তুলিল। আর সন্ন্যাসী ফকির মানুষের দেবত্বপ্রাপ্তি ত নিত্য ঘটনা। এইরূপে পুরাতন ও নূতন দেবদেবীতে আর স্থান সংকুলান হয় না। দেবতাদিগের মধ্যেও নানা জাতি এবং বর্ণ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গোয়ালা, এমন কি, কদাচ কখনো মুসলমান এবং খ্রীষ্টান পর্য্যন্ত। এইখানে বলা ভাল, বিড়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুরূপী দেবতারও মধ্যে মধ্যে নাম শুনা যায়। এবং অনেক সময় ভূত প্রেত হইতে এই সকল দেবতার অভিব্যক্তি।

ব্রাহ্মণেরা যে সকল সময় এই সকল দেবতাকে খোঁজ করিয়া বাহির করেন তাহা নয়—দেবতার আবির্ভাব কখন্ কোথায় হয় বলা ত যায় না—তিনি যাহার প্রতি প্রসন্ন হন, তা ভূতো বাগ্‌দীই কে জানে আর হারু চণ্ডালই বা কে জানে। তবে ঘণ্টা নাড়িবার বেলায় একটা ব্রাহ্মণ চাই বটে। কারণ, শূদ্রসংস্পর্শে দেবতার দেবত্বনাশ হইতে আটক নাই। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ জুটিতে বিলম্ব হয় না। এবং ঘণ্টানাড়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন শাস্ত্রীয় পণ্ডিতেরাও এই অনার্য্য দেবতার চরণে ফুলচন্দন ও একটি করিয়া প্রণাম পাঠাইয়া ধন্য হয়েন।

অনার্য্য দেবতা বলিলাম বলিয়া এখানে হয় ত কৈফিয়ৎ দেওয়া আবশ্যক। কারণ, হিন্দুধর্ম্মকে অনেকে সম্পূর্ণ আর্য্য বলিয়া মনে করেন এবং ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত ইহাকে এক ঠাহরান। কিন্তু হিন্দু এবং আর্য্যে অনেক তফাৎ। আর্য্য বলিতে কেবল সমাজের উচ্চশ্রেণীকেই বুঝায়—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য; হিন্দু—আর্য্যে অনার্য্যে, উচ্চ নীচে, নানা বিরোধী জিনিসের সম্মিশ্রণের ফল। হিন্দু কেবলি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ে আবদ্ধ নয়, হাড়ি বাগ্‌দী, ডোম চামার, ভারতের অধিবাসী যে-কেহ স্পষ্টতঃ মুসলমান কিম্বা খ্রীষ্টান নয়, সেই হিন্দু। এবং ইহাদের সকলেরই ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য হইলেও হিন্দুধর্ম্মগঠনে এই সকল নানাবিধ নিরক্ষর লোকদিগের কল্পনার কম প্রভাব নহে। এবং সে প্রভাব উন্নত ব্রাহ্মণদিগকেও স্পর্শ করিয়াছে। মাঝিমাল্লারা বিপদ্ নিবারণের জন্য বিশালাক্ষীর দহে পয়সা ফেলিয়া দেয়। দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও নৌকা করিয়া যাইবার সময় উক্ত স্থানে বিশালাক্ষী দেবীর উদ্দেশে তাম্রমুদ্রা নিক্ষেপ করিতে শিখিয়াছেন

এবং শূন্যে প্রণাম ঠুকিয়া মনে মনে বলেন, হে মা বিশালাক্ষি, এ যাত্রা রক্ষা কর, যেন বাড়ী গিয়া গৃহিণীর মুখচন্দ্র দেখিতে পাই ; আবার যখন এখান দিয়া যাইব, তোমার জন্য আবার এমনি করিয়া পয়সা ফেলিয়া দিব। মুসলমানের দেখাদেখি অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণেরা সিন্নি দিয়া পীরকে সন্তুষ্ট রাখেন। এ সকল দেবতা উপদেবতা যে ব্রাহ্মণধর্ম্মপ্রসূত নহে, তাহা ত আর চোখে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইতে হইবে না। এবং ইহা হইতেই হিন্দুধর্ম্মগঠনে নিম্নশ্রেণীর প্রভাবের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাচীন ব্রাহ্মণেরা সমগ্র ভারতবর্ষকে এক সংহত ধর্ম্মগঠনে এক করিতে চেষ্টা করেন নাই—তাঁহারা আপন মনে ধ্যান ধারণা করিতেন এবং আপন উন্নত আদর্শে আপনাকে গঠিত করিতেন। ভারতবর্ষের জনসাধারণ সে আদর্শে কখনও পৌঁছে নাই, এবং সাধারণের পক্ষে সে আদর্শ দুর্গম বুঝিয়া ব্রাহ্মণেরা সাধারণকে সে বিষয়ে উপদেশও দিতেন না। জ্ঞানধর্ম্মে অগ্রসর বলিয়া সমাজে তাঁহাদের প্রাধান্য সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ব্রাহ্মণের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং ব্রহ্মণ্য জ্ঞানের সহিত সর্ব্বত্র যোগ রক্ষা করিতে পারিল না, তখন সহস্র প্রচলিত ধর্ম্মকর্ম্মের সহিত জড়িত হইয়া বংশগুণে ব্রাহ্মণই সেই সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানের কর্ত্তৃত্ব লাভ করিলেন। এই পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের প্রভাব। নহিলে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম সাধারণ্যে কখনও প্রচলিত হয় নাই—এবং ব্রাহ্মণের প্রভাব ঠিক খ্রীষ্টান পাদ্রীর মত নহে। বংশগৌরবে দেবত্বের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা এবং ইহা হইতেই তাঁহার অমর প্রভাব।

কিন্তু এ কথা মানিতে হয় যে, আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মভাব প্রচারের মূল ব্রাহ্মণ। এবং সাধারণের প্রভাব যেমন ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়াছে, ব্রাহ্মণের প্রভাব তেমনি সাধারণের ধর্ম্মকে অনেক পরিমাণে গঠন দিয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণধর্ম্মের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যোগ ঠিক কোন্‌খানটায় এবং বিচ্ছেদই বা কোথায়, এখন নির্ণয় করা কঠিন। কালসহকারে ব্রাহ্মণের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সহিত ধর্ম্মও ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে নিঃশব্দে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসে এবং প্রচলিত সহস্র সংস্কার আত্মসাৎ ও পরিপুষ্ট করে। সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মহীনতা আশঙ্কায় ব্রাহ্মণেরা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের উচ্চ লক্ষ্য হইতে নামিয়া আসিয়া সাধারণের উপযোগী অনেক ব্যবস্থাও করিয়াছেন। এবং সে সকল বিধি ব্যবস্থা তাঁহাদের নিজের উপরেও ফলিয়াছে। বলা বাহুল্য, ইহা হিন্দুধর্ম্মেরই অঙ্গ। হিন্দুধর্ম্ম সকলই ;—ব্রাহ্মণেতর নানাবিধ উপধর্ম্মের সহিত ব্রাহ্মণধর্ম্মের সম্মিশ্রণ হিন্দুধর্ম্ম ; অমিশ্র বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণধর্ম্মও হিন্দুধর্ম্ম ; এবং যে সকল অপধর্ম্ম ব্রাহ্মণধর্ম্মের ছায়াও মাড়ায় নাই, তাহাও হিন্দুধর্ম্ম। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্ম্ম এবং হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে রেখা টানা চলে না।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃতি কি, তাহা এত ক্ষণে বোধ করি কতকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। এবং কোনপ্রকার শৃঙ্খলার যে এখানে কিরূপ অভাব, তাহা বুঝিতেও কাহারো বড় বাকি নাই। হিন্দু দেবচরিত্র আলোচনা করিলে এ অভাব আরও সুস্পষ্ট চোখে পড়ে। তেত্রিশ কোটির অধিক দেবতা হইলেও একই দেবচরিত্রের এরূপ অসঙ্গত বিরোধী বর্ণনা দেখা যায় যে, তাহার মধ্যে সামঞ্জস্য বাহির করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এবং একই দেবতার নানা বিরোধী উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে কোনপ্রকার নৈতিক একতা পর্য্যন্ত দেখা যায় না। এক কৃষ্ণকে কত জনে কত ভাবে দেখে—কেহ রূপক হিসাবে, কেহ অবতার হিসাবে, কেহ পূর্ণব্রহ্ম হিসাবে, কেহ আদর্শ মনুষ্য হিসাবে ; এবং এই হিসাবানুসারে ভিন্ন ভিন্ন লোকের উপর তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। কৃষ্ণলীলা যাহারা কেবলমাত্র রূপক হিসাবে গ্রহণ করে এবং যাহারা ইহার পার্থিব অনুকরণকেই মুক্তির পরম পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তাহাদের উভয়ের মধ্যে নীতিবিষয়ে ঐক্য হইবার কথাও নয়। কৃষ্ণের নামের চারি দিকে নানা রসের গল্প জুটিয়াছে—এই সকল গল্পের নায়করূপে তিনি ভিন্ন ভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের নীতি গঠন করেন। মহাদেবও এক দিকে অসাধারণ সংযমী যোগী পুরুষ—ভোগসুখের মূর্ত্তিমান্ প্রতিবাদ ; অন্যত্র নেশাখোর লক্ষ্মীছাড়া এবং কুচনীপাড়ার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং এক মহাদেবের দুই রূপ সম্পূর্ণ বিপরীত নৈতিক প্রভাব। আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব উভয় ভাবে এই সকল দেবচরিত্রের কিরূপ প্রভাব যাঁহারা জানিতে ইচ্ছা করেন, বাবু অক্ষয়-কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় নামক গ্রন্থ পাঠ করিলেই সবিশেষ বিবরণ অবগত হইবেন। আর মিথ্যাচরণে কাপট্যাবলম্বনে এবং যথেচ্ছাচারিতায় আমাদের দেবগণ কিরূপ পটু, তাহার প্রমাণ আবশ্যক হইলে সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা কবিকঙ্কণ চণ্ডী, মনসার ভাসান এবং অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত রাশীকৃত গ্রন্থের উপর নিশ্চিন্ত মনে বরাত দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে ত দেবচরিত্র চরিত্রহীনতার আদর্শ। এবং নবাবী যথেচ্ছাচারিতাই দেবতাদিগের ক্ষমতার একমাত্র পরিচয়। সুতরাং শাস্ত্রবিধি যতই সংযম সাধনের উপদেশ দিয়া মরুক না কেন, এই সকল প্রবল আদর্শ আমাদিগকে সংযমসাধনের পথ হইতে নিরাপদ্ দূরে রাখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

ধর্ম্মের এইরূপ বহুরূপী বিশৃঙ্খলা বোধ করি অনেকাংশে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অনৈক্যের সহিত জড়িত। এক বৃহৎ সংহত শাসনতন্ত্রের অধীনে সমস্ত দেশ যখন দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন শান্তিসুখ ভোগ করিবার অবসর পায়, তখনই প্রায় ধর্ম্ম লইয়া জাতির হৃদয়ে একটা অন্দোলন উঠে এবং সুবৃহৎ সংহত ধর্ম্ম গঠনের এই সময়। নহিলে চতুর্দ্দিকে অশান্তি উপদ্রবে লোকের মন যখন নিতান্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, তখন সুশৃঙ্খলে গঠনকার্য্য সুসম্পন্ন হওয়া কঠিন। রাজনৈতিক অবস্থার সহিত জাতীয় ধর্ম্মসংগঠনের এরূপ ঘনিষ্ঠ যোগ প্রথম দৃষ্টিতে

কেমন অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার অনুকূলে যখন রীতিমত ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন আর এ যোগ সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। খ্রীষ্টধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে রাজনৈতিক অশান্তির সহিত রোমের ধর্ম্মনৈতিক অবস্থাও বিশৃঙ্খল ছিল—আমাদেরই মত নানা দেবতা উপদেবতা, কোনটির সহিত কোনটির বড় ঐক্য নাই, রোমানেরা মনের নানা প্রবৃত্তিকে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিত, ভাল মন্দ বিচার ছিল না, স্বর্গ নরক গায়ে গায়ে, মুড়ি মিছরি একদর। রাজনৈতিক শান্তি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগঠন প্রায় একসঙ্গেই আসে। আমাদের দেশেও সম্প্রতি ইংরাজ-শাসনের শান্তিতে জাতীয় ধর্ম্মগঠনের ভাবের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিয়াছে। এবং প্রাচীন কালেও আমাদের অদৃষ্টে একবার এই শুভ অবসর জুটিয়াছিল। অশোক তখন ভারতবর্ষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত—তাঁহার প্রবল প্রতাপে সমস্ত ভারত একছত্র। রাজনৈতিক অবস্থা শান্তিময় এবং জাতীয় ধর্ম্মগঠনের অনুকূল। তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ধর্ম্ম এবং অশোক একজন পরম বৌদ্ধ। অল্পদিন মধ্যে হু হু করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম দেশময় ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভাল করিয়া আমাদের মজ্জার মধ্যে বসে নাই—বসিবার অবসর পায় নাই। ভারতবর্ষ বহুদিন একছত্র রহিল না এবং বৌদ্ধধর্ম্ম দেশান্তরিত হইয়া গেল। শিথিল ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি বৌদ্ধ আন্দোলনের বৃহৎ সংহত সুশৃঙ্খলা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আবার ছোটখাট রাজ্য উপরাজ্য এবং অনির্দ্দিষ্ট সহস্র বিশ্বাস উপবিশ্বাসের অরাজকতায় সান্ত্বনা লাভ করিল।

এই অরাজক অবসরে চারি দিক্ হইতে যে নূতন বহুরূপী ধর্ম্মের অবির্ভাব হইল, তাহাই এই নব্য হিন্দুধর্ম্মের জননী। এবং সেই অবধি হিন্দুধর্ম্ম একটা প্রকাণ্ড নিবিড় জঙ্গল—যেখানে যেমন সুবিধা পাইয়াছে, নানা রকমের গাছপালা এবং আগাছা সমভাবে গজাইয়া উঠিয়াছে। গাছে আগাছায় বন ঢাকা—কোথাও পথ দেখা যায় না—এবং এত দিন পথের সন্ধানও কেহ করে নাই। সূর্য্যালোক নাই—দিক্‌নির্ণয়শলাকা নাই—ঘন বনের মধ্য দিয়া অন্ধকারে হাতড়াইয়া আর কত পথ বাহির হইবে? এখন ইংরাজী শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মনে যে নূতন স্বাধীনতা ও সংহত ঐক্যের ভাব আসিয়াছে, ইহা দ্বারাই যদি কালে এই বিপুল ধর্ম্মজঙ্গল পরিষ্কার হয়—এবং এই ঘন নিবিড় বন্নানীর মধ্য দিয়া কোন নূতন পথ বাহির হয়—সেই একমাত্র ভরসা। ['সাধনা,' আষাঢ় ১২৯৯]

সাময়িক সারসংগ্রহ

জাপানী সভ্যতা

এপ্রিল মাসের ফর্টনাইট্‌লি রিবিউ পত্রিকায় জাপানী ব্যবহার সম্বন্ধে পিগট্‌ সাহেবের একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে লেখক মহাশয় জাপানীদের যথার্থ আর্টিষ্টিক সৌন্দর্য্যবোধের বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন এবং পৃথিবীর এই অতি দূরপ্রান্তবর্ত্তী "অসভ্য" দেশের নিকট হইতে বলদৃপ্ত সভ্যতাভিমানী য়ুরোপের শিখিবার এখনও কত কি আছে, তাহাই দেখাইয়াছেন।

জাপানী আর্টের প্রশংসা এই প্রথম নহে। ইতিপূর্ব্বেও দুএকজন আর্ট-সমালোচক এমন কথা বলিয়াছেন—এবং য়ুরোপের উপরে ইহার প্রভাব যে সভ্যতাবর্দ্ধক ও উন্নতিকর, এ কথা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই।

তাই বলিয়া সকল আর্টেই যে জাপান য়ুরোপকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহা অবশ্য নয়। চিত্রবিদ্যার য়ুরোপে যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, জাপানে তত দূর হয় নাই। জাপানী চিত্রকরের রচনায় ছায়া আলোকের সেরূপ পরিপাটি সন্নিবেশ দেখা যায় না। কিন্তু দুই চারিটি সূক্ষ্ম রেখাপাতে আর্টিষ্টিকতার যথেষ্ট পরিচয়। সুন্দর জিনিসকে সুন্দররূপে কেমন করিয়া ফুটাইতে হয়, জাপানীরা তাহা বেশ বুঝে।

জাপানী আর্টের গৌরবই এই। কোথায় একটুখানি কি করিলে সর্ব্বাপেক্ষা দেখায় ভাল—একটি রেখা টানিলে অনেকখানি ব্যক্ত করা হয়—একটু কারুকার্য্য করিলে চরম খোলতাই হয়, জাপানীরা ঠিক ধরিতে পারে। জাপানী দোকানের একখানা সামান্য পাখায়, একটা চার গণ্ডা পয়সার কাগজ-চাপায়, একটা যে-কোন-কিছুতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

জাপানীদের মত দৈনন্দিন সামান্য ব্যবহার্য্য জিনিসেও সৌন্দর্য্য রক্ষা করার দিকে আমাদের কোন মনোযোগ নাই—কাজ চলিয়া গেলেই আমরা সন্তুষ্ট, মোটা তালপাতার পাখাই হোক্‌, গোলপাতার ছাতাই হোক্‌—দেখিতে ভালমন্দে আমাদের বড় যায় আসে না।

কিন্তু জাপানীরা সকল জিনিসকেই একটু সুন্দর করিয়া তুলিতে পারে। এবং এ বিষয়ে তাহাদের যত্নের ত্রুটি নাই। একটু কাঠকাঠরা তাহারা পড়িতে দেয় না—একটা না একটা সাজানগোছানর কাজে লাগাইয়া লয়। এবং এই সাজানগোছানতেই জাপানীদের বিশেষ নৈপুণ্য।

ইংরাজ লেখক জাপানীদের এই গুণেই বিশেষ মুগ্ধ। তিনি সর্ব্বত্রই তাহাদের সুশোভন বিন্যাসপটুতার কথাই বলিয়াছেন। তাহারা ফুলদানিতে কত রকমে ফুল সাজায়—এবং এই ফুল সাজাইবার জন্য কত রকমের ফুলদানি! সুরের বিচিত্র সমাবেশে পাশ্চাত্য সঙ্গীত যেমন উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—ফুলের বিচিত্র সমাবেশে জাপানী বিন্যাসপটুতা তেমনি পরিণতি লাভ করিয়াছে।

কণ্ডর সাহেবের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে বিস্তর উপদেশ লাভ করা যায়। কিসের পর কি রঙ খাপ খায়, কোন্ ঋতুতে কিরূপ ফুলবিন্যাস শোভা পায়, কোন্ ফুল দেবতাকে দিতে হইবে, কোন্ ফুল বিবাহোৎসবের উপযোগী ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে। দুইটি তীব্র রঙের মধ্যে কোমল রঙের ব্যবধান থাকা আবশ্যক। যে যে রঙে মিশ খায় না, মধ্যে সবুজ পাতা কিম্বা শুভ্র ফুল দিয়া তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে হইবে। ভিন্ন ঋতুর সঙ্গে ভিন্ন ফুলের যেন ভাবগত ঐক্য থাকে। বাসন্তী ফুলবিন্যাসে নবীন যৌবনের শ্যামলতা, গ্রীষ্মকালে পরিপূর্ণ বিস্তারের ভাব, শরতে কার্শ্য এবং শীতে শুষ্ক নীরস জীর্ণতা।

ফুলদানি নানা রকমের—এবং নানারকম করিয়া ফুল সাজাইতে হয়। কণ্ডর সাহেব এক খাড়া বাঁশের নির্ম্মিত বিয়াল্লিশ রকম ফুলদানির উল্লেখ করিয়াছেন—কোনটির নাম সিংহমুখ, কোনটি বা হংসদ্বার, কোনটি বানরদেহ, কোনটি বংশী ইত্যাদি ইত্যাদি। বাঁশের গোড়া হইতে কাটিয়া নৌকাকারের নানা প্রকার ঝোলনা ফুলদানি প্রস্তুত হইয়া থাকে—তাহাতে এমন করিয়া ফুল সাজান হয় যে, দেখিয়া বোধ হয়, যেন এক একখানি ফুলের নৌকা—ফুলের দাঁড়, ফুলের হাল, ফুলের মাস্তুল। নৌকা কোনটি বিদেশাভিমুখে চলিয়াছে, কোনটি বা বন্দরে আসিয়া লাগিতেছে, এইরূপ নানা ভাবের।

শেষ কথা, জাপানের সামাজিকতা—ভদ্রতার রীতিনীতি, মেলামেশার নিয়ম, কথাবার্ত্তার ধরণধারণ। সমাজকে সুসভ্য সুন্দর করিতে হইলে কতকগুলি শিষ্টাচারের নিয়ম বিশেষ আবশ্যক। ভাষা সুশোভন এবং ব্যবহার সুন্দররূপে সুসংযত হওয়া উচিত। কেবল আমাদের বাঙ্গালী সমাজেই ইহার অভাব দেখা যায়। ইতর বর্ব্বরতা আমাদের দেশে যে কিরূপ অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, তাহা আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে প্রচলিত খবরের কাগজগুলি পড়িলেই বুঝা যায়—তাহা ছাড়া সম্ভাষণ অভিবাদনের ত কোন নিয়মই নাই। জাপানীদের ইহার বিপরীত। কথাবার্ত্তার মধ্যেও সৌন্দর্য্য যাহাতে রক্ষিত হয়, সে দিকে তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। যদি গলা থাকে, গান গাহিতে বলিলে গান না গাহা, যদি বাজাইতে জানি, দু শ ওজর আপত্তি করিয়া তবে সুর বাঁধিতে বসা, এইরূপ অসামাজিকতা জাপানী-চরিত্রে বিরল। জাপানীদের কোটো বলিয়া একপ্রকার যন্ত্র আছে—নিমন্ত্রিত অভ্যাগতদের মধ্যে কেহ তাহা বাজাইতে জানিলে গৃহকর্ত্তা প্রায়ই তাঁহাকে বাজাইতে

অনুরোধ করেন; এবং তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করিলে অভদ্রতা করা হয়। বিনাইয়া বিনাইয়া ভড়ং করা জাপানে ভদ্রলোকের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না। আরও এইরূপ সামাজিক ব্যবহারের তাহাদের অনেক নিয়মাদি আছে—এখানে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা অসম্ভব।

সম্প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে জাপানের অবস্থার একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে। জাপানী যুবকদিগের অনেকেরই মধ্যে ইংরাজী ধরণধারণ প্রবেশ লাভ করিতেছে। কিন্তু জাপানের বড় বড় লোক সকলেরই বিশ্বাস যে, এ বিদেশীয়ানা অধিক দিন স্থায়ী হইবে না—তবে জাপানী সভ্যতা ইহার দ্বারা সমধিক পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ক্রমে আরও দৃঢ় হইয়া উঠিতে পারে। ['সাধনা,' আষাঢ় ১২৯৯]

বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা

জাতির অবস্থার সহিত ধর্ম্মের যোগ অনুভব করিতে হইলে একবার বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক—বিশেষতঃ বাঙ্গলার মঙ্গলকাব্যগুলি এবং যে সমস্ত গ্রন্থে দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণন কিম্বা পূজাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আছে।

বঙ্গসাহিত্যের জন্ম অল্পদিন মাত্র। মুসলমান শাসন তখন আমাদের হাড়ে হাড়ে অনেকটা বসিয়াছে—এবং খামখেয়ালী নবাবীর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ যথেচ্ছাচারপরায়ণতাই ক্ষমতার একমাত্র পরিচয় ও চরম আদর্শ বলিয়া গণ্য হয়। রাজপুরুষেরা কেবলমাত্র প্রচণ্ড শাসক—তাড়না করেন, লাঞ্ছনা করেন, গঞ্জনা দেন, অকথ্য বলেন এবং খেয়াল অনুসারে কুত্তা লেলাইয়া দিয়া তামাসা দেখেন। আমরা লাঞ্ছনা সহি, গঞ্জনা সহি, গালি খাই এবং কুত্তাকে বিষম ভয় করি। রাজাপ্রজার মধ্যে সম্বন্ধ কেবল ভয়ের। প্রজা রাজাকে ভয়ে ভয়ে মানিয়া চলে—নহিলে বিপদ্ ঘটিতে আটক নাই, রাজা প্রজাকে তাঁবে দাবাইয়া রাখেন—তোষামোদ করিলে অনুগ্রহ করেন, নহিলে নিগ্রহের একশেষ। ন্যায়ান্যায়বোধ রাজদণ্ডের পরিচালক নহে—মর্জ্জিই একমাত্র হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।

যেমন রাজ্য শাসন, দেবশাসনও তেমনি। এই পার্থিব শাসনতন্ত্রেরই আদর্শে প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবল আপনার দেবতাগুলি দিয়া একটি নূতন শাসনতন্ত্র গঠন করিয়াছেন মাত্র। অপরিণতবুদ্ধি একটা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাবশাবকের পরিবর্ত্তে সেখানে একজন অব্যবস্থিত চিত্ত দুর্দ্ধর্ষ দেবতা বসিয়া রাজত্ব করেন; সর্ব্বনাশভয়ে দুর্ব্বল ভক্তবৃন্দ চৌত্রিশ অক্ষরে দুর্ব্বোধ ছড়া বাঁধিয়া তাঁহার স্তুতি পাঠ করে, ষোড়শোপচারে সেবার বিধান করিয়া দিয়া মেজাজ ঠাণ্ডা রাখে।

দেবতা বলিয়া তাঁহাদের চরিত্র রাগদ্বেষভয়হিংসা-বিবর্জ্জিত নহে। দেবত্ব যাহা কিছু অপরিমিত অত্যাচার ও যথেচ্ছ অনুগ্রহ করিবার ক্ষমতায়। এবং সুবিধা পাইলেই এই দারুণ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতেও দেবকুলের কখনও ত্রুটি দেখা যায় না। নবাব এবং বাদ্‌শাদেরই মত খামখেয়ালি মেজাজ—ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট—কখন্ এবং কেন যে কাহার প্রতি সদয় নির্দ্দয় বুঝা ভার। খেয়ালবশতঃ সহসা যাহার প্রতি অনুগ্রহ হয়, তাহাকে ধন দেন, রত্ন দেন, নবাবী প্রথানুসারে জায়গীরও দিয়া থাকেন এবং পরের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া উক্ত ভূখণ্ডে প্রজাপত্তনের সুবিধা করিয়া দিতেও ত্রুটি করেন না। যে হতভাগ্য সকারণে অথবা অকারণে একবার ইঁহাদের কাহারও বিষদৃষ্টিতে পতিত হয়, তাহার প্রতি তেমনি তুর্জ্জয় কোপ—ছলে বলে কৌশলে যেমন করিয়া হোক, তাহাকে উচ্ছেদ করিতে হইবে। অনুগ্রহ নিগ্রহের কারণ প্রায়ই এত সামান্য যে, তাহাকে আমল দেওয়া চলে না। এবং সেটুকু কারণও অনেক সময় চঞ্চলমতি দেবতারা বলপূর্ব্বক ঘটাইয়া থাকেন। হয় ত পুরাতন ভক্তে অরুচি জন্মিয়াছে, নূতন নহিলে মন উঠে না—অথচ চক্ষুলজ্জার খাতিরে পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; কি করেন?—ভক্তের প্রতি এক দুঃসাধ্য হুকুম জারি করিলেন। ভক্ত বেচারি প্রাণপণ যত্নে যথাসাধ্য আদেশ পালন করিয়া মরিল; কিন্তু দেবতার মায়া ত আর সে সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তিনি তাহার মধ্যে গোপনে একটু ত্রুটি রাখিয়া দিয়াছেন। সেই ত্রুটিটুকু অবলম্বন করিয়া এক প্রচণ্ড অভিশাপ বাহির হইয়া আসিল—দুর্ব্বল ভক্ত সন্তানের এত দিনের কায়মন ভক্তির চরম পুরস্কার!

এইরূপ খামখেয়ালি আচরণ বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবচরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ। কেবলি মানবের প্রতি নহে, ছোট দেবতার প্রতি বড় দেবতার ব্যবহারও এইরূপ। চণ্ডীর একবার সখ হইল, ইন্দ্রকুমার নীলাম্বরের দ্বারা মর্ত্ত্যে আপন পূজা প্রচার করিবেন। উপায় ঠাহরাইলেন—একটা কোন ছুতায় অভিশাপ দিয়া তাহাকে স্বর্গচ্যুত করিতে হইবে। ভগবতী শিবকে ধরিয়া বসিলেন। শিব মহাসঙ্কটে পড়িলেন্। ইন্দ্র তাঁহার একজন একান্ত অনুগত সেবক, নীলাম্বর তাঁহারই উপযুক্ত পুত্র, শিবপূজার জন্য স্বহস্তে ফুল তুলিয়া আনেন—বিশেষতঃ নীলাম্বরের শরীরে তিলমাত্র পাপ নাই; কোন্ ছুতায় শিব তাহাকে অভিশাপ দিবেন? ভগবতী পরামর্শ দিলেন—তাহার আর ভাবনা কি,

যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার।
তবে অভিশাপ দিবা কি দোষ তোমার॥

শিব অবিলম্বে সম্মত হইলেন। এখন কেবল নীলাম্বরের মহী ইচ্ছা করার অপেক্ষা।

ভগবতী মায়াপ্রভাবে একদিন নন্দনের সমস্ত ফুল হরণ করিয়া রাখিয়াছেন। নীলাম্বর স্বর্গলোকে ফুল না পাইয়া পৃথিবীতে ফুলের সন্ধানে বাহির হইলেন। ব্যাধ ধর্ম্মকেতু এক রূপসী হরিণের পশ্চাতে তাড়া করিয়াছে—হরিণ আর কেহ নহে, স্বয়ং ভগবতী স্বকার্য্য উদ্ধারের নিমিত্ত এই রূপ ধারণ করিয়াছেন। নীলাম্বরের মন এই দৃশ্যে মুহূর্ত্তের জন্য ফুল হইতে বিচলিত হইল এবং তিনি মনে মনে বলিলেন যে, মালাকারের মত সাজি হাতে ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা ব্যাধের জীবন ঢের ভাল। ব্যাধজন্মের পথ অনেকটা পরিষ্কার হইল। যেটুকু বাকি ছিল, তাড়াতাড়িতে ফুলের সহিত একটি কণ্টক সংগ্রহ করিয়া আনায়, এবং দেবী চণ্ডীর কৃপায়, তাহাও অসম্পূর্ণ রহিল না।

কুসুম ভিতরে চণ্ডী পাতিলেন মায়া।
পলাশে রহিলা দেবী পিপীলিকা হৈয়া॥

নীলাম্বর বা ইন্দ্র কেহই তাহা জানেন না। সুতরাং যখন

কুসুম অঞ্জলি ইন্দ্র দিল হরশিরে।
কণ্টক ভুঁকিল দুঃখ পাইল অন্তরে॥
দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে।
মরমে দংশিল হর হইলা আকুলে॥

মহাদেবের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। নিষ্ঠুর ভীমমুখে তিনি ইন্দ্রকে যথেচ্ছা ভর্ৎসনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—ফুল আমি তুলি নাই, নীলাম্বর তুলিয়াছে। নীলাম্বরের কৈফিয়ৎ তলব হইল, কিন্তু সে কৈফিয়তে কোন ফল হইল না। চণ্ডীর পরামর্শ মহাদেব ভুলেন নাই। অভিশাপ বাহির হইল—

মোর সেবা ছাড়ি ইচ্ছা কর হৈতে ব্যাধ।
ত্বরিতে চলহ মহী দিনু অভিশাপ॥

নীলাম্বরের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কিন্তু মহাদেব টলিলেন না।

আর এক বার চণ্ডীর সখ হইল, স্ত্রীলোকের পূজা লইতে হইবে। পদ্মাবতীর সহিত যুক্তি করিয়া তিনি ঠাহরাইলেন, ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালাকে দিয়া কার্য্য উদ্ধার করিবেন। রত্নমালার প্রতি হুকুম জারি হইল—হরের সভায় আসিয়া নৃত্য করিবে। রত্নমালা নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল। সভা পরিপূর্ণ। দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া গান ধরিয়াছেন, রত্নমালা তালে তালে নাচিতেছে। দেবতারা সকলেই নৃত্যে মুগ্ধ। কিন্তু চণ্ডীর ত নৃত্য দেখা উদ্দেশ্য নয়—রত্নমালাকে মর্ত্ত্যে পাঠাইতে হইবে, একটা কোন ছুতা অবলম্বন করিয়া তাহাকে অভিশাপ দেওয়া চাহি। মদনকে দেবী টিপিয়া

দিলেন, রত্নমালার প্রতি একটা বাণ হান। মদন সম্মোহন শর ছাড়িলেন। রত্নমালার অঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল এবং তালভঙ্গ হইল। চণ্ডী শাপ দিয়া বাঁচিলেন।

বিচার এবং বিবেচনা বঙ্গসাহিত্যের দেবতাদের নিকট কখনও প্রত্যাশা করা যায় না। কেবলি এক দল খেয়ালপরিচালিত কর্তৃপক্ষ—যাহার প্রতি অনুকূল হয়েন, তাহার সাত খুন মাফ এবং বিমুখ হইলে বিনা দোষেও উৎপীড়নপরাঙ্মুখ নহেন। কালকেতুর নগর বসাইতে হইবে—সেই জন্য চণ্ডী বিনা দোষে কলিঙ্গদেশ ধ্বংস করিবার চেষ্টায় ফিরিতেছেন। প্রথমে ত কলিঙ্গনগরে গিয়া ঘরে ঘরে স্বপ্ন দিয়া আসিলেন যে, বীর কালকেতু যে নগর বসাইতেছেন, তোমরা সেইখানে গিয়া বাস কর, অনেক ধনদৌলত মিলিবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। কিন্তু স্বপ্ন সকলে শুনিল না। সুতরাং চণ্ডীকে উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইল। তিনি গঙ্গাসন্নিধানে চলিলেন।

সাধিতে আপন কাম আইলাম তোমার স্থান
সহিবে আমার কিছু ভার।
প্রাণের বহিনী গঙ্গে চলিবে আমার সঙ্গে
হাজাব রাজ্য কলিঙ্গ রাজার॥
গঙ্গা সন্তাপ করহ দূর।
হইয়া উন্মত্ত বেশ হাজাবে কলিঙ্গ দেশ
তবে বৈসে গুজরাটপুর॥

গঙ্গা সম্মত হইলেন না। স্পষ্টই বলিলেন,

হইয়া বিষ্ণুর অংশ। কারো না করি যে হিংসা
কেন রাজ্য হাজাব রাজার॥
মোরে পরপীড়া দেখি লাগে ভয়।
পরের দেখিয়া দুখ হই আমি অশ্রুমুখ
তারে আমি সদয় হৃদয়॥

চণ্ডী গালি পাড়িলেন। বলিলেন, ভারি বৈষ্ণবী হইয়াছ দেখিতেছি, যত মকর কুম্ভীর পোষা হয়, আর কাজের সময় সাধ্বী সাজিয়া বসেন, একবার রকম দেখ গা। গঙ্গাও পাল্টা গালি দিতে ছাড়িলেন না। দুই পক্ষে ছড়া কাটাকাটি বেশ জমিয়া গেল। তখন পদ্মাবতী চণ্ডীকে সমুদ্রের নিকট যাইতে পরামর্শ দিলেন। ভগবতী, সমুদ্র ও ইন্দ্রের নিকটে গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। অবিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি হইল। ঝড় বৃষ্টিতে কলিঙ্গ হাজিয়া গেল। কলিঙ্গের প্রজা লইয়া কালকেতু স্বনগরে পত্তন করিলেন। বেচারা কলিঙ্গরাজের যে কি অপরাধ, কেহ বুঝিতে পারিল না।

চণ্ডীর মহিমা সম্বন্ধে লোকের আর সন্দেহ রহিল না। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, জাগ্রত দেবতা এই বটে। নিত্য নূতন খেয়াল উঠে এবং অবিলম্বে খেয়াল চরিতার্থ করিবার উপায় অবলম্বিত হয়। এরূপ জবরদস্ত নহিলে দেবতা কিসের? কোন্দল করিতে হইবে—আচ্ছা তাই সহি; নৌকাডুবি করিতে হইবে—তথাস্তু; কাহাকেও কারারুদ্ধ করাইতে কপটাচরণ করিতে হইবে—বেশ কথা; দেবী কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহেন। সারাদিন বসিয়া বসিয়া পদ্মাবতীর সহিত কেবল ফন্দি আঁটিতেছেন—কাহার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, কাহার পূজা লইতে হইবে। মধ্যে মধ্যে বিপন্ন কিম্বা লুব্ধ ভক্তের সুদীর্ঘ চৌতিশা স্তবে এক এক বার দেবীর মন বিচলিত হয়; পদ্মাবতীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করেন, কে ডাকে? পদ্মাবতী গণনা করিয়া দেখেন—দেবী গতি করিয়া দেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডীর যেমন পদ্মাবতী, ভারতচন্দ্রের অন্নদার সেইরূপ জয়া। জয়ার সহিত পরামর্শ না আঁটিয়া অন্নদা কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। এবং জয়াকে তাঁহার অষ্টপ্রহরই আবশ্যক হয়। অন্নদা চণ্ডীরই বিভিন্ন সংস্করণ। খেয়ালের রকমসকমও চণ্ডীরই অনুরূপ। সখ হইয়াছে, পৃথিবীতে পূজা প্রচার করিতে হইবে; জয়ার পরামর্শানুসারে একটা ছল ধরিয়া কুবেরানুচর বসুন্ধরকে অভিশাপ দিলেন—মর্ত্ত্যে গিয়া মানবের গৃহে জন্মগ্রহণ কর। বসুন্ধর দেবীর পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটি করিল। দেবী শুনিলেন না। বিষ্ণুহোড়ের গৃহে তাহার জন্ম হইল—নাম হইল হরিহোড়। দুঃখীর ছেলে হরিহোড় অল্পদিনেই বাড়িয়া উঠিল। বনে মাঠে ঘুরিয়া ঘুঁটে কুড়াইয়া বেড়ায় এবং তাহাতেই কায়ক্লেশে পিতামাতার ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করে।

অন্নদা একদিন বুড়ী সাজিয়া সব ঘুঁটেগুলি একটি ঝুড়ী ভরিয়া রাখিলেন। হরিহোড় ঘুঁটে খুঁজিয়া পায় না। দেখিল, সব ঘুঁটে বুড়ী সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছে। হরিহোড় ভাবিত হইয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বুড়ীর অনুগ্রহ হইল। সে হরিহোড়কে ডাকিয়া বলিল, আমি বুড়ী হইয়াছি, এত ভার বহিতে পারি না, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া বহিয়া দাও, আমি অর্দ্ধেক ভাগ দিতে পারি। হরিহোড় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু হরিহোড়ের কুটীর অবধি আসিয়া বুড়ী আর চলিতে পারে না—সেইখানেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। হরিহোড় বলিল, আমরা আপনার অন্নসংস্থান করিতে পারি না, অতিথিসৎকার করিব কি দিয়া? তখন বুড়ী বলিল, সে জন্য ভাবনা নাই, অন্নপূর্ণার নাম লইয়া হাঁড়ী পাড় দেখি,

হাঁড়ীভরা অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।
কোন কালে খাও নাই এমন খাইবে॥

তাহাই ঘটিল। হরিহোড় তখন বুড়ীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। অন্নদা পরিচয় দিবার পূর্ব্বে হরিহোড়ের হস্তে একখানি ঘুঁটে দিলেন। ঘুঁটেখানি হেমঘুঁটে হইল।

হরিহোড় অবাক্। দেবী তখন আপন পরিচয় প্রদান করিয়া হরিহোড়কে বর চাহিতে আজ্ঞা করিলেন।

হরিহোড় কহে মা গো কর অবধান।
চঞ্চলা তোমার কৃপা চঞ্চলাসমান ॥
অনুগ্রহ করিতে বিস্তর ক্ষণ নহে।
নিগ্রহ করিতে পুনঃ বিলম্ব না সহে ॥
তবে লব ধন আগে এই দেহ বর।
বিদায় না দিলে না ছাড়িবে মোর ঘর ॥

অন্নদা তথাস্তু বলিয়া আসিলেন।

গৃহে আসিয়া—

ভাবেন অন্নদা দেবী কি করি এখন।
স্বর্গে লব বসুন্ধরে করিয়া কেমন ॥
শাপ দিতে হইবেক কুবেরনন্দনে।
জনম লইবে সেই মরতভুবনে ॥
ভবানন্দ মজুন্দার হইবেক নাম।
তার ঘরে হইবেক করিতে বিশ্রাম ॥
ইহারে ছাড়িতে নারি না দিলে বিদায়।
কহ লো বিজয়া জয়া কি করি উপায় ॥

অবশেষে উপায় স্থির হইল। বৃদ্ধকালে হরিহোড়কে সোহাগীনাম্নী একটি রূপসীর সহিত গৌরী বিবাহ দিয়া দিলেন। হরিহোড়ের ঘরে সোহাগীর শুভাগমন পর্য্যন্ত নিত্য কোন্দল ঝগড়া আরম্ভ হইল। অন্নদা নিজে কোন্দলপটু হইলেও পরের কোন্দল সহিতে পারেন না। হরিহোড়ের গৃহ ছাড়িবার পন্থা বাহির করিলেন। হরিহোড়—

একদিন পূজায় বসিয়া ধ্যান ধরে।
তার কন্যা হয়ে দেবী গেলা তার ঘরে ॥
মনে আছে তার পূর্ব্ব দিবস হইতে।
জামাই এসেছে তার কন্যারে লইতে ॥
অন্নপূর্ণা বিদায় চাহিলা সেই ছলে।
ক্রোধভরে হরিহোড় যাহ যাহ বলে ॥
এই ছলে অন্নপূর্ণা ঝাঁপি লয়ে করে।
চলিলেন ভবানন্দ মজুন্দার ঘরে ॥

কিন্তু বঙ্গসাহিত্যে শুধু চণ্ডী আর অন্নদা নহেন—যে কয়টি দেবতা আছেন, এক একটি চণ্ডী। অষ্টপ্রহর কেবল আপন পূজা গণিয়া কাটান—কে মানিল না মানিল, কে ভক্তি করে, কে করে না, কে খুসী, কে নারাজ। চাল কলা নৈবেদ্য আর গোটা দুই প্রণাম পাইবার লোভে ইহাঁরা করিতে না পারেন, হেন কাজ নাই। শুধু তাই নয়। এইগুলি না পাইলে বিষম ক্ষাপা। অদৃষ্টও তেমনি। এক একজন বিদ্রোহী জুটিয়া যায়, তাহারা কিছুতেই বশ মানে না। মানব হইয়া দেবতাকে গালি পাড়ে, হেতাল হস্তে দেবতার মাথা লইবে বলিয়া বাড়ী বাড়ী ফিরে। দেবতা বেচারীকে হেতালের ভয়ে সাত হাত তফাতে থাকিতে হয়—যে পাড়ায় হেতাল আছে, তাহার ত্রিসীমায় ঘেঁসিবার যো নাই। তাই বলিয়া দেবতার সহিত লোকে অবশ্য চিরদিন আঁটিয়া উঠিতে পারে না—তাঁহাদের কত দুর্ভেদ্য ফন্দি আছে! নৌকা ডুবাইয়া, না হয় ছেলে কয়টাকে শিঙ্গা ফুঁকাইয়া দিবেন। তাহাতেও না হয়, সর্ব্বস্বান্ত করিবেন। দুর্ব্বল মানবশিশুকে জব্দ করা বৈ ত নয়—একটা না একটা উপায় খাটিয়া যাইবেই।

চাঁদ সদাগরকে লইয়া মনসা দেবী কি না করিয়াছেন? সেও বশ মানিবে না—তিনিও ছাড়িবেন না। মনসার সহিত তাহার নিরন্তর ঝগড়া বাধে। এবং

দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাঁহারে॥
মনস্তাপ পায় তবু না নোঙায় মাথা।
বলে চেঙ্গমুড়ী বেটী কিসের দেবতা॥
হেতাল লইয়া হস্তে দিবানিশি ফিরে।
মনসার অন্বেষণ করে ঘরে ঘরে॥
বলে একবার যদি দেখা পাই তার।
মারিব মাথায় বাড়ি না বাঁচিবে আর॥
আপদ্ ঘুচিবে মম পাব অব্যাহতি।
পরম কৌতুকে হবে রাজ্যেতে বসতি॥

কিন্তু আপদ্ সহজে ঘুচে না। সদাগর সাত ডিঙ্গা লইয়া বাণিজ্যে বাহির হইয়াছে, মনসা সন্ধান পাইয়াছেন।

নেতা লইয়া যুক্তি করে জয়বিষহরি।
মম সনে বাদ করে চাঁদ অধিকারী॥
নিরন্তর বলে মোরে কাণী চেঙ্গমুড়ী।
বিপাকে উহারে আজি ভরাডুবি করি॥
তবে যদি মোর পূজা করে সদাগর।—ইত্যাদি।

সদাগর সর্ব্বস্বান্ত হইল। তথাপি মনসার প্রতি তাহার বিদ্বেষ গেল না। মনসাও জুলুম করিতে ক্ষান্ত হয়েন না। ভিক্ষার উপরে সাধুর নির্ভর, গণেশের মূষিক ধার করিয়া আনিয়া তিনি তাহার ভিক্ষার অন্ন খাওয়াইয়া দেন। নিজের বাড়ীতে গিয়া চাঁদ বেণে মনসার অনুগ্রহে ঠেঙ্গা খাইয়া মরে। মনসা গণকের বেশ ধরিয়া সাধুর স্ত্রীকে মিছামিছি বলিয়া আসিয়াছেন যে, আজ তোমার বাড়ী চুরি হইবে, সন্ধ্যার পর কলাবনে আসিয়া চোর অপেক্ষা করিবে, সেই সময় তাহাকে ধরিয়া ঘা কতক বসাইয়া দিও। সে দিন সন্ধ্যার সময় সদাগর আসিয়া উপস্থিত—পরিধানে ছেড়া টেনা—সুতরাং লজ্জায় বেচারি আলো থাকিতে ঘরে ঢুকিতে পারে নাই। সনকা বেণেনী যথাসময়ে আসিয়া মনসার কথামত ব্যবস্থা করিল—সদাগরের পৃষ্ঠদেশ ফুলিয়া ঢাক হইয়া উঠিল। এই শেষ নহে। বেণেকে প্রতি পদে মনসা জ্বালাতন করিয়া মারিয়াছেন। অনেক দিনের পর সদাগরের একটি পুত্র জন্মিল—নখীন্দর। সদাগর বেহুলা বলিয়া একটি রূপসী পাত্রী স্থির করিয়া তাহারই সহিত নখীন্দরের বিবাহ দিলেন। মনসার কোপে বাসরেই নখীন্দরের মৃত্যু হইল। কিন্তু সদাগর বুলি ছাড়িল না। অবশেষে বহু দিন পরে বেহুলার সেবায় পরিতুষ্ট হইয়া মনসা চাঁদ সদাগরের পুত্র এবং ধন রত্ন সমুদয় ফিরাইয়া দিলেন। তখন চাঁদ বেণে মনসার পূজা করিল।

বেহুলার সেবার একটু বিস্তারিত বিবরণ আবশ্যক। তাহাতে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবলোকের আরও কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে দেবলোক যতটুকু দেখা গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, সেখানে পৃথিবীর কোন দৌরাত্ম্যেরই অভাব নাই—গালাগালি মারামারি হিংসাদ্বেষ অত্যাচার অবিচার বিভ্রম বিলাস, সকলই ষোল আনা আছে, অধিকন্তু সেখানকার ঋষিরাও নাচের মজলিসে সঙ্গীতাদি করিয়া থাকেন। মনসার ভাসানে দেবতাদের ঘরের খবর কিছু কিছু পাওয়া যায়। দেবতারা কি কাপড় পরেন, তাঁহাদের ধোপানী কে, সে কি দিয়া কাপড় কাচে ইত্যাদি ইত্যাদি। বেহুলা ত এই ধোপানীর সাহায্যেই কার্য্য উদ্ধার করে। নেতা ধোপানীকে সে মাসী বলিয়া ডাকে, দেবতাদের কাপড় দুএকখানা কাচিয়া দেয়, এমনি করিয়া ভাব-সাব করিয়া থাকে। ধোপানী বেহুলার কাচা খান দুই কাপড় লইয়া গিয়া একদিন দেবসভায় উপস্থিত। সে দিন কিছু পরিষ্কার কাচা হইয়াছে দেখিয়া দেবতারা জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁগা বাছা, তুমি এত দিন কাপড় কাচিয়া আসিতেছ, এমন সুন্দর ত কোনও দিন হয় নাই—আজ হইল কিরূপে ? নেতা বলিল, আমার বোনঝি আসিয়াছে, এ কয়খান কাপড় সেই কাচিয়াছে। তখন,—

মহেশ বলেন নাহি দেখি এত দিন।
তোমার বোনঝি মোর হইল নাতিন ॥

দেবতাসভায় আন দেখিব কেমন।
ধোপানী এ কথা শুনি করিল গমন॥

পরে বেহুলাকে সে সঙ্গে করিয়া দেবসভায় লইয়া গেল। সেখানে বেহুলার নৃত্য দেখিয়া দেবগণ পরিতুষ্ট হইলেন। এখন মনসাকে ঠাণ্ডা করিতে পারিলেই হয়। নেতা ধোপানী মনসার প্রিয়সখী—অনেক হাতে পায়ে ধরিয়া মনসাকে দেবসভায় লইয়া আসিল। দেবতারা পাঁচ জনে বেহুলার হইয়া ওকালতি করিলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর ফল ফলিল। কিন্তু মনসার তরফে ইনাইয়া বিনাইয়া ন্যাকামি করিবার কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই, বলা বাহুল্য। একে বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতা, তাহাতে আবার নারী!

বাঙ্গলা সাহিত্যে দেবতাদের কিছুমাত্র সম্ভ্রম নাই। বিলাসিতা সংস্কৃত স্বর্গেও কম নহে। দেবচরিত্রে এ কলঙ্ক বহুদিনের। অমরাবতীর বড় কর্ত্তাটির অপকীর্ত্তি ত সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্যের দেবতাগুলির মত 'খেলো' অপদার্থ চরিত্র কোথাও দেখা যায় না। সংস্কৃত সাহিত্যের বড় বড় সম্ভ্রান্ত দেবগণ—যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর—বাঙ্গলা দেশে আসিয়া পদমর্য্যাদা একেবারে হারাইয়াছেন। নেতা ধোপানীর সহিত 'ইয়ারকি' দিতে হইলে সম্ভ্রম বজায় রাখা বোধ করি কিছু কঠিন হইয়া পড়ে। চরিত্রের বল থাকে না। অন্নদামঙ্গলের শিব মদনের এক বাণে একেবারে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য। মদনকে ভস্ম করিয়াছেন নিতান্তই যেন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরোধে।

ভাগ্যে ভাগ্যে নারদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। নারদ গৌরীর সন্ধান দিলেন।

শুনি শিব কন ওরে বাছাধন
ঘটক হও তাহার।

নারদ আশ্বাস দিলেন। কিন্তু

কহেন শঙ্কর বিলম্ব না কর
আজি চল মোর বাবা।

"বাবা" সে দিন চলিলেন না—তাঁহার ত আর দায় নয়। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই বিবাহের সব স্থিরস্থার হইয়া গেল। এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে শিব বিবাহ করিতে আসিলেন। অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার—হুলাহুলির ধুম। এদিকে বাঘছাল খসিয়া পড়ে—শিবের হুঁস নাই। মেনকা নারদের উদ্দেশে গাল পাড়িতে সুরু করিলেন,

হাত লাড়ি গলা তাড়ি ডাক ছাড়ি কয়॥
ওরে বুড়া আঁটকুড়া নারদা অল্পেয়ে।
হেন বর কেমনে আনিলি চক্ষু খেয়ে॥

ভারতচন্দ্র ভরসা দিয়াছেন—

কোন্দলের অভাব কি নারদ ঘটক।

যাহা হৌক্, বিবাহ করিয়া শিব গৌরীকে লইয়া আসিলেন। সিদ্ধিঘোটনের ধুম পড়িয়া গেল। তাহার পর হরগৌরীর কথোপকথন। শঙ্কর দেবীকে বলিতেছেন—

অঙ্গে অঙ্গে তোমার আমার অঙ্গে অঙ্গে।
হরগৌরী একতনু হয়ে থাকি রঙ্গে॥

গৌরী পুরুষজাতির একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া বলিলেন—

নিজ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

দেবতাদের এই অবস্থা! পুরুষ মহলে ভাঙ্‌টুকু ধুতুরাটুকু খাওয়া আছে, মজলিসে নাচটা আশটা দেওয়া আছে, এবং আনুষঙ্গিক দোষেরও ত্রুটি নাই; স্ত্রীমহলে ঝগড়া কোন্দল—এখানকার প্রতিথনামা পাড়াকোন্দলীরাও তাহার নিকট হার মানেন। দেবলোকে সবই আছে—নাই শুধু সুগভীর প্রেম, সামান্যতম ত্যাগস্বীকার, কোনরূপ উচ্চ আদর্শ। না থাকিবারই কথা—মারণ উচ্চাটন বশীকরণে আমাদের সমস্ত হৃদয় তখন জোড়া—উচ্চ আদর্শ ঠাঁই পাইবে কোথায়? রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র শিথিল—কেবলি রাজা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ এবং সবল দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ। সামাজিক আদর্শও এই শাসননীতিরই প্রভাবে গঠিত।

এখন কাল ফিরিয়াছে। সে সহস্র খুচরা দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ নবাব নাই। এক বৃহৎ নিয়মতন্ত্রের অধীনে সমস্ত ভারতবর্ষ একছত্র—এক রাজা, এক নিয়ম, সহস্র রাজপুরুষ একই সম্রাটের সহস্র বাহু। এবং এই বিপুল রাজশক্তি সমস্ত প্রজার সুনিয়ত স্বাধীনতার উপরে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা এবং শান্তি। বিচিত্র বিভিন্ন শক্তি এক বৃহৎ শক্তিতে নিমগ্ন এবং এক মূল শক্তি সহস্র বিরোধী শক্তিকে নিয়ত নিয়মিত করিতেছে। এই রাজনৈতিক প্রভাবে সমাজতন্ত্রও নূতন করিয়া গঠিত হইতেছে। উপধর্ম্ম এবং উপদেবতার প্রভাব প্রতি দিন ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। এক মহান্ ঈশ্বরের মঙ্গল নিয়মাধীনে আমরা এক হইয়া দাঁড়াইতেছি। আমাদের নূতন আদর্শ, নূতন আশা, নূতন উদ্যম।

['সাধনা,' শ্রাবণ ১২৯৯]

সাময়িক সারসংগ্রহ

নূতন "ফেডারেশন"

উপনিবেশ স্থাপন এবং রাজ্যবিস্তারের সহিত ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞের মনে এক দুর্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে যে, এই সকল শতযোজনব্যবহিত ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ড চিরদিন কখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিবে না—আজই হোক্, কালই হোক্, আমেরিকার যুক্তরাজ্যের মত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি উপনিবেশগুলি ইংলণ্ডের শাসনকর্ত্তৃত্ব লঙ্ঘন করিয়া স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং এই বেলা দিন থাকিতে সেই ভাবী অনিবার্য্য বিচ্ছেদের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, কিম্বা এমন কোনও অমোঘ সদুপায় অবলম্বন করা, যাহাতে কখনও বিচ্ছেদ ঘটিবার কারণ না উপস্থিত হয়।

অধিকাংশ বড় বড় রাজনৈতিক পণ্ডিতদিগের মতে এ বিচ্ছেদ নিবারণ করা মানবচেষ্টার সাধ্যাতীত। কিন্তু জর্জ্জ পার্কিন প্রভৃতি একশ্রেণীর লেখকগণের বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্যরূপ। ইহাঁদের মত এই যে, বাষ্পযান এবং তাড়িত বার্ত্তাবহের কল্যাণে প্রাকৃতিক ব্যবধান এখনকার দিনে নগণ্যের মধ্যে; সুতরাং ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, আয়র্লণ্ডের সহিত কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশসমূহের বৃহৎ একটি যুক্তরাজ্যরূপে অবস্থিতি তাদৃশ অসম্ভব নয়। এবং এরূপ দৃঢ় যোগবন্ধন যখন সকলেরই পক্ষে সুবিধাজনক, তখন কোনও পক্ষ হইতে আপত্তি উঠিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব যেখানে বন কাটিয়া বা লোক মারিয়া জন্ বুলের বৎস হাত পা ছড়াইবার জমি করিয়া লইয়াছে, সেই স্থান লইয়া একটি "ইম্পিরিয়াল্ ফেডারেশন্" গঠিত হউক্।

কিন্তু এক মহাসমস্যা ভারতবর্ষ। তাহাকে লইয়া কি করা যায়? ছাড়িয়া দেওয়া অসম্ভব—অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে, ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া ইংলণ্ডের এক দণ্ড চলে না। ইংরাজ শ্রমজীবীর অন্নের সংস্থান ভারতবর্ষ। বড় সামান্য সংস্থান নহে—বৎসরে প্রায় এক শত কোটি টাকার বাণিজ্য। ভারতবর্ষকে ছাড়িয়া দিলে লাঙ্কাশায়ারের তন্তুবায়কে মাসে পনের দিন উপবাস করিতে হয়; ওল্ড্হ্যামের তিন চতুর্থাংশ কাজ বন্ধ হইয়া যায়। ডাণ্ডীর পাটের ব্যবসায়ীর একমাত্র নির্ভর বাঙ্গলার পাট—রপ্তানি একদিন বন্ধ থাকিলে পরদিন সেখানে একেবারে সর্ব্বনাশ।

লণ্ডন চেম্বার অফ কমার্সে বক্তৃতাকালে লর্ড ডফারিন স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে সামান্য গোলযোগ উপস্থিত হইলে বিলাতের প্রত্যেক সামান্যতম কুটীরবাসীকে পর্য্যন্ত তাহার দারুণ ফলভোগ করিতে হইবে। বিলাতী পণ্য-সামগ্রীর রপ্তানি ভারতবর্ষেই

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ১৮৮৮ সালে বিলাত হইতে পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৭২,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের তুলার বস্ত্রাদি রপ্তানি হয়। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষে কাট্‌তি ২১,২৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী, কিন্তু চীনে ৬,৫০০,০০০ পাউণ্ড, জর্ম্মানিতে ২,৫০০,০০০ পাউণ্ড এবং মার্কিন যুক্তরাজ্যে ২,০০০,০০০ পাউণ্ডের অধিক নয়। ঐ বৎসরেই বিলাত হইতে নানান দেশে ৩৬,০০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ধাতুনির্ম্মিত সামগ্রী এবং বিবিধ যন্ত্রাদি রপ্তানি হয়—তন্মধ্যে ভারতবর্ষে কাট্‌তি ৫,৭৫০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য, কিন্তু ফ্রান্সে ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড, রুষিয়াতে ১,৭৫০,০০০ পাউণ্ড এবং চীনে ৭৫০,০০০ পাউণ্ড বৈ নয়। লর্ড ডফারিন বলেন, ভারতের সহিত বিলাতের বাণিজ্য সমগ্র পৃথিবীতে ব্রিটিশ-বাণিজ্যের দশমাংশ।

শুধু আমদানি রপ্তানি নহে, ভারতবর্ষে রেলওয়ে প্রভৃতিতে ইংরাজের ৩৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড নিয়মিত খাটিতেছে। ইহা ভিন্ন ছোটখাট নানান ব্যবসায়ে বিস্তর বিলাতী মূলধন খাটে এবং ন্যায্য সুদ পোষাইয়াও ইংরাজ বণিকের যথেষ্ট লাভ থাকে।

ইহার উপর লক্ষাধিক ইংরাজ কর্ম্মচারীর বেতন ভারতবর্ষকে যোগাইতে হয়। এবং বাটাবিভ্রাটের কল্যাণে বিলাতে পেনশন যোগাইতেও সামান্য দণ্ড লাগে না।

আরও, পূর্ব্বাঞ্চলে ইংরাজের বাণিজ্যবিস্তারের সম্পূর্ণ নির্ভর ভারতবর্ষের উপর। ভারতবর্ষ হাতছাড়া হইলে প্রাচ্য ভূভাগে ইংরাজ-বাণিজ্যশ্রী একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িবে।

ইংলণ্ড এই কামধেনুকে ছাড়িবে কি দুঃখে?

ইংলণ্ডের ত কথাই নাই, ইংরাজের উপনিবেশসমূহও ভারতবর্ষকে দোহন করিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে।

এডেন ও অন্যান্য গুটিকতক বন্দরে ভারতবর্ষ ইংরাজসৈন্যের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া অষ্ট্রেলেসিয়ার বিস্তর সুবিধা করিয়া দেয়। এবং সম্প্রতি ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্যসূত্রে অষ্ট্রেলেসিয়ার অবস্থাও অনেক ভাল হইয়া উঠিতেছে। ভারতবর্ষ ইংরাজের অধিকারচ্যুত হইলে এ আশার পথ একেবারে বন্ধ।

দক্ষিণ আফ্রিকার উন্নতির প্রধান কারণই ভারতবর্ষ। এক সময়ে ভারতবর্ষে আসিবার পথে এইখানে জাহাজ থামিত। এবং এখনও ভারতবর্ষের সহিত সম্বন্ধেই ইহার বিশেষ গৌরব।

ইংরাজ উপনিবেশসমূহের মধ্যে একমাত্র কানাডারই ভারতবর্ষের সহিত দূর সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগরে হংকং অবধি কানাডীয় পোতের রীতিমত গতিবিধি আরম্ভ হইয়াছে। এবং ইংরাজের প্রাচ্য অধিকারসমূহে কানাডার অনেক ভবিষ্যৎ সুবিধার সূচনা দেখা যাইতেছে।

সুতরাং ইংরাজ উপনিবেশসমূহেরও ভারতবর্ষকে ছাড়িবার সাধ নাই।

তবে কি ভারতবর্ষকেও কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতির ন্যায় অধিকার দিয়া ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে? পার্কিন সাহেব ইহাতে নারাজ। ভারতবর্ষকে কোনও নূতন অধিকার দেওয়া যাইতে পারে না। তিনি বলেন, অধিকার কিছুই না দিয়া কেবল ভারতবর্ষের প্রভুর সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেই তাহার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে। অর্থাৎ এখন যেমন ভারতবর্ষ একমাত্র ইংলণ্ডেরই অধীন, তাহা না রাখিয়া তাহাকে ইংলণ্ড এবং নিউজিলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, আফ্রিকা প্রভৃতি যাবতীয় ইংরাজ উপনিবেশের অধীনে স্থাপিত করা হউক। এখন বৃটিশ পার্লামেণ্ট যে কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছে, ফেডারেশন তাহাই করিবে। ভারতবর্ষের প্রতিনিধি-শাসনতন্ত্রের কথা পার্লামেণ্টে না উঠিয়া ফেডারেশনে আলোচিত হইবে। ভারত গবর্মেণ্ট এখন যেরূপ ভাবে সংগঠিত, এইরূপ থাকিবে—কেবল তাহার কার্য্যাকার্য্য সমালোচনার ভার পার্লামেণ্টের পরিবর্ত্তে ফেডারেশনের উপর পড়িবে। এইরূপে ইংলণ্ড এবং উপনিবেশসমূহের সমবেত স্বার্থ দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সংহত বলে চিরদিন ভারতবর্ষকে মুঠার ভিতরে চাপিয়া রাখিবে—এবং এই বিপুল রাবণবংশের শাসন শোষণে ভারতবর্ষের পারলৌকিক মুক্তির পথ অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিবে। ['সাধনা,' অগ্রহায়ণ ১২৯৯]

মুসলমান সমাজ

ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের মধ্যে বর্ত্তমান শিক্ষার একটা শুভ ফল দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অল্পে অল্পে ধর্ম্মকে প্রাচীন আরবীয় কুসংস্কার ও কুপ্রথাসকল হইতে মুক্ত করিয়া মহম্মদের সদুপদেশ ও সাধু সংকল্পের অনুবর্ত্তী হইবার চেষ্টা করিতেছেন। কোরাণে নানা কথা আছে; কেবলি যে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ, তাহা নহে; তৎকালীন আরব সমাজের উপযোগী রীতিনীতি, আচারব্যবহার, ক্রিয়াকর্ম্ম, আইনকানুন সম্বন্ধে বিস্তর প্রসঙ্গ—আবশ্যক অনুসারে মহম্মদ যখন যাহা বলিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরের মহিমাগান এবং স্বদেশীয়দের মধ্যে ঈশ্বরের পূজা প্রতিষ্ঠাই মহম্মদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, এবং কোরাণের প্রত্যেক সুরার প্রথমেই তিনি দয়াময় ঈশ্বরের নাম লইয়া আরম্ভ করিয়াছেন। মহম্মদের সময়ে আরবেরা প্রস্তরখণ্ডকে দেবতার সিংহাসনে বসাইয়া তাহারই আশ্রয়ে সহস্র দুর্নীতির অনুষ্ঠান করিত, যে বিশ্বাতীত বিশ্বব্যাপী মহান্ আত্মা মানবের সকল সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়া তাহাকে নিয়ত কল্যাণপথে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার নাম তাহারা শুনে নাই; মহম্মদ আসিয়া বলিলেন, সেই এক দেবাধিদেব

ব্যতীত আর দ্বিতীয় উপাস্য নাই এবং তিনি মহান্ "আল্লা আকবর"। দুরাচার আরবেরা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। মহম্মদ বলিলেন, পৌত্তলিক অনুষ্ঠানসকল পরিত্যাগ কর, দুর্নীতি দুরাচার হইতে বিরত হও এবং পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর—তিনি কৃপা করিবেন, নহিলে নিষ্কৃতি নাই। ক্রমে আরবেরা একে একে তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। এবং মহম্মদ তাহাদিগকে গৃহধর্ম্ম এবং অন্যান্য কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যথাবশ্যক উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড বিক্ষিপ্ত উক্তি একত্র গ্রথিত হইয়া কোরাণ রচিত হইল। অধ্যায়ের পর অধ্যায়—কোনটির সহিত কোনটির তেমন ঘনিষ্ঠ যোগ নাই এবং অনেক স্থলে প্রসঙ্গের ধারাবাহিকতাও রক্ষিত হয় নাই; কোথাও গল্প, কোথাও উপদেশ, কোথাও স্বর্গবর্ণনা, কোথাও দায়ভাগ, কোথাও বিবাহের কথা, কোথাও বিচ্ছেদবিধি; কিন্তু এই সমস্তের মধ্য হইতে এক লক্ষ্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে—পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ।

সুতরাং ইহাকেই মহম্মদীয় ধর্ম্মের মূল উদ্দেশ্য বলা যাইতে পারে। পৌত্তলিকতার উপর মহম্মদের দারুণ বিদ্বেষ ছিল এবং ইহাকেই তিনি সকল দোষের আকর বলিয়া মনে করিতেন। মহম্মদ দেখিলেন, আরব সমাজে যে সকল কদাচার এবং দুর্নীতি বহু বর্ষ ধরিয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে, এই এক পাষাণ-দেবতাকে স্থানচ্যুত করা ভিন্ন তাহার প্রতীকারের আর অন্য উপায় নাই। পাষাণখণ্ডের সহিত সে সকল দুর্নীতি নিয়ত জড়িত হইয়া ধর্ম্মেরই এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—কদাচার দেবতার অনুমোদিত, সুতরাং সম্যক্ প্রতিপালনই বিধি। তাই প্রথমেই মহম্মদ আল্লা আকবরের নামে লোকসকলকে জড়-দেবতার রোষানলভয় হইতে মুক্ত করিলেন—এবং তাহার পর অল্পে অল্পে দেশ কাল পাত্র বিবেচনাপূর্ব্বক নিজের আদর্শ অনুসারে সমাজ গঠন করিতে লাগিলেন। অনেকাংশে সফলও হইলেন। কিন্তু আরব সমাজের সমস্ত কুপ্রথা উন্মুলিত হইল না; হইতে পারে যে, মহম্মদের আদর্শ তাদৃশ উন্নত ছিল না, অথবা আরব সমাজের অবস্থা নূতন উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠার অনুকূল ছিল না। নব্য শিক্ষিত মুসলমানেরা শেষোক্ত কথার উপরেই বিশেষ ঝোঁক দেন—এবং তৎকালীন আরব সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাহা অসঙ্গত বোধ হয় না। আর মহম্মদও যখন এই সমাজের মধ্য হইতেই অভ্যুদিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট বর্ত্তমান কালোচিত উন্নত আদর্শ আশা করাও সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে।

মহম্মদ সম্বন্ধে খ্রীষ্টান লেখকদিগের অনেকের গ্রন্থে এই এক প্রধান দোষ দেখা যায়। তাঁহারা মহম্মদকে তাঁহার দেশ কাল হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন এবং বর্ত্তমান সভ্যতার উন্নত আদর্শ অনুসারে বিচার করিয়া তাঁহাকে শয়তানের এক ধাপ উচ্চে আসন দিয়া থাকেন। মহম্মদ স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনতা দেন নাই, বহুবিবাহ এবং দাসপ্রথা

রহিত করিতে সক্ষম হয়েন নাই, তিনি স্বর্গেও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং ইহ জীবনে বহুদারপরিগ্রহ ও আবশ্যকমত যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা আপন পার্থিব স্বভাবেরই পরিচয় দিয়াছেন, অতএব তাঁহার গৌরব কিসের!

কিন্তু মহম্মদ মানুষই ছিলেন। এবং আপনাকে মানুষ বলিয়াই তিনি প্রচার করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে খ্রীষ্টের যে স্থান, মুসলমান ধর্ম্মে মহম্মদের সেরূপ স্থান নহে। তাঁহার পিতার নাম আবদুল্লা, মাতার নাম আমিনা। অতি শৈশবেই মহম্মদ পিতৃমাতৃহীন হয়েন এবং পিতৃব্যের স্নেহে লালিত পালিত হইয়াই তিনি মানুষ হইয়া উঠেন। পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে খদিজানাম্নী এক ধনী বিধবার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই সময় হইতেই মহম্মদের কপাল ফিরিল। ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁহার মনে যখন যে কথা উঠে, তিনি খদিজাকে শুনান, এবং খদিজাও তাঁহার কথার সম্যক্ মর্ম্ম গ্রহণ করেন। এইরূপে পত্নীর সহধর্ম্মিতায় তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠা ক্রমেই দৃঢ় হইতে লাগিল। বিষয়কর্ম্ম ছাড়িয়া জায়া সমভিব্যাহারে এক নিভৃত পর্ব্বতগুহায় অবস্থিতি করিয়া তিনি ধ্যানধারণায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দেবতা প্রসন্ন হইলেন; মহম্মদের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞানের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল; সৃষ্টির সকল পদার্থেই তিনি ঈশ্বরের মহিমা উপলব্ধি করিলেন; এবং নিভৃত পর্ব্বতগুহা ছাড়িয়া সজন লোকালয়ে প্রচার করিতে বাহির হইলেন—"আল্লা আকবর" ঈশ্বর মহান্ এবং "ইস্‌লাম" আমরা তাঁহারই আজ্ঞাবহ।

ইহাই মহম্মদের গৌরব। যাহারা ঈশ্বরের নাম শুনে নাই, তিনি তাহাদিগকে সেই অভয়-নাম শুনাইলেন, যাহারা অবিশ্বাসী ছিল, তাহাদিগকে বিশ্বাস দিলেন, যাহারা দীন দুঃখী আতুর, তাহাদিগকে বলিলেন—ঈশ্বর ন্যায়বান্ এবং দয়ালু, তোমরা নিরাশ হইও না। সেই নিখিলনির্ভরের নামে মন্দিরে মন্দিরে পাষাণ-দেবতাসকল বিচলিত হইল এবং পাষাণখণ্ডের চতুর্দ্দিকে যে অরাজক উচ্ছৃঙ্খলতা বিরাজ করিতেছিল, তাহার মধ্যে একটা প্রবল বিপ্লব সূচিত হইল।

তাই বলিয়া যাহারা ভগিনীর পাণিগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না এবং পিতৃপুরুষের বিধবাকে বলপূর্ব্বক ভোগ্যারূপে নিযুক্ত করিয়া পৌরুষ অনুভব করিত, তাহারা সহসা স্ত্রীজাতির প্রতি পশ্বাচরণ ছাড়িয়া দেবতার ন্যায় ব্যবহার সুরু করিল না, এবং অভ্যস্ত দাসপ্রথা ত্যাগ করিয়া দুরাচারেরা ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীন মানবের অধিকারও ফিরাইয়া দিল না। কিন্তু মহম্মদের যত্নে বিবাহবিধি অনেক সংস্কৃত হইল, অবগুণ্ঠনবতী কুলরমণীর প্রতি পথে ঘাটে সামান্যা দাসীর ন্যায় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইল, এবং ক্রীতদাসদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার ঈশ্বরের রাজ্যে কখনও নিষ্ফল নহে—এই সাধু উপদেশ প্রচারিত হইল। ইহার

অধিক কিছু করা মহম্মদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না, এবং বোধ করি, এতদধিক তিনি চেষ্টাও করেন নাই।

সে জন্য মহম্মদীয় ধর্ম্মের প্রতি কিছুতেই দোষারোপ করা যায় না। কিছু দিন পূর্ব্বে খ্রীষ্টান জগতের সর্ব্বত্র স্ত্রীজাতির অবস্থা যে বড় ভাল ছিল, এমন নহে, এবং যে দাসপ্রথার ধুয়া ধরিয়া ইংরাজ লেখকেরা মুসলমান ধর্ম্মের প্রতি আত্যন্তিক অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, খ্রীষ্টান জগতে খ্রীষ্টান পাদ্রিগণের বিশেষ সহায়তায় সেই নিষ্ঠুর দাসব্যবসায় ধর্ম্মানুগত বলিয়া গণ্য হইতেও ক্রটি হয় নাই। এ সকল বিষয়ে সভ্যতার উন্নতির সহিত মানবসমাজের আদর্শ ক্রমে উন্নত হইতেছে। সংস্কারকেরা যুগে যুগে তখনকার উপযোগী বিধানসকল প্রচার করেন মাত্র। তাহা কালাতীত নহে এবং অপরিবর্ত্তনীয়ও নহে। কিন্তু এই সকল কালোপযোগী সমাজসংস্কার তাঁহাদের প্রচারিত কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় মূল সত্যের সহিত জড়াইয়া ক্রমে যখন সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তখন ধর্ম্মেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখিয়া লোকে তাহার চতুষ্পার্শ্বের সভ্যতা হইতে তাহাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, এবং কাল যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ধর্ম্ম সহস্র প্রাচীন কুসংস্কার ও দুষ্ট প্রথার আবরণে অত্যন্ত হীন এবং হেয় বলিয়া উপেক্ষিত হয়।

ধর্ম্মের এরূপ অধঃপতন নিবারণের একমাত্র উপায় জ্ঞানের অনুশীলন। দুর্ভাগ্যক্রমে পৃথিবীর যে অংশে মহম্মদের আবির্ভাব, সেখানে বহু কাল ধরিয়া অজ্ঞানের অপ্রতিহত একাধিপত্য চলিয়া আসিয়াছে। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার সেরূপ বিস্তার হয় নাই; সামান্য-শিক্ষিত মৌলবীগণ ধর্ম্ম এবং স্বার্থ একত্র জুড়িয়া দম্ভসহকারে হিংস্র গোঁড়ামি প্রচার করে মাত্র; এবং ভাবটুকু ছাড়িয়া কোরাণের অক্ষর-মাহাত্ম্য লইয়া মানবে মানবে নিত্য দলাদলি ও মনোমালিন্য জন্মিতে থাকে।

বর্ত্তমান শিক্ষা ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগকে ইহাই দেখাইয়া দিতেছে। দেখাইতেছে যে, অধিকাংশ খ্যাতনামা কোরাণ-ব্যাখ্যাতা কোরাণকে যে হিসাবে দেখিয়াছেন, কোরাণ সে হিসাবে দ্রষ্টব্য নয়। কোরাণে প্রায় ছয় সহস্র শ্লোকের মধ্যে দুই শতের অধিক আইন-কথা নাই, এবং তাহাও বারো আনা ভাগ দুএকটি খণ্ড খণ্ড কথা, দুই তিন কি চারি কথার সমষ্টি বা গুটিকতক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ পদ—নানান জনে তাহার নানারূপ মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। মহম্মদের ত আইন-প্রণয়ন উদ্দেশ্য ছিল না, তবে বিশেষ দমনযোগ্য কতকগুলি সামাজিক কদাচার সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি নিষেধবিধি জারি করিয়াছেন মাত্র। আর কতকগুলি পালনবিধিও আছে—তাহা কতক সে-সমাজে যেরূপ বিধি প্রচলিত ছিল, কতক বা প্রচলিত বিধিরই অল্পবিস্তর সংস্কার। বর্ত্তমান শিক্ষা আরও দেখাইতেছে যে, কোরাণের মূল ভিত্তি কোথায় এবং বর্ত্তমান সভ্যতার অনুগত আচার

ব্যবহার কোরাণবিরুদ্ধ না হইতেও পারে। মুসলমান ধর্ম্ম যদি মহম্মদের বহু পরকালবর্ত্তী খলিফগণের সংগৃহীত স্তূপাকার সত্য মিথ্যা লোককথা এবং জনশ্রুতির সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিয়া কেবলমাত্র কোরাণ গঠিত হইত, তাহা হইলেই বর্ত্তমান কালের সহিত তাহার বিরোধ মিটিয়া আসিত। কথার দাসত্বই সকল সর্ব্বনাশের মূল।

মহম্মদের এক প্রধান গুণ ছিল, তিনি মানবকে তাহার স্বাধীন বুদ্ধি পরিচালনপূর্ব্বক কাজ করিতে পরামর্শ দিতেন, কেতাবের গুটিকতক অধ্যায়ের মধ্যে হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে জড় করিয়া রাখিতে চাহিতেন না। গল্প আছে, মাআজকে য়েমেন প্রদেশে নিজ প্রতিনিধি করিয়া পাঠাইবার সময় মহম্মদ প্রথমেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, লোকসকলকে তিনি কিরূপে বিচার করিবেন? মাআজ উত্তর করেন, "ঈশ্বরের গ্রন্থ অনুসারে আমি তাহাদিগের বিচার করিব।" মহম্মদ বলিলেন, "গ্রন্থে যদি সকল কথা না পাওয়া যায়?" উত্তর,—"আমি প্রেরিত পুরুষের নজীর ধরিয়া কাজ করিব।" "যদি নজীর না থাকে?" "তাহা হইলে নিজের বিবেচনা খাটাইবার চেষ্টা করিব।" মহম্মদ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

নিজেকে অভ্রান্ত প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা মহম্মদের আদৌ ছিল না—আরবের হিতার্থে এবং পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য জানিয়া তিনি যাহা কিছু ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছেন। ইমাম মস্‌লিম মহম্মদ সম্বন্ধে একটি গল্প বলেন যে, একদা মদিনার পথে কতকগুলি লোককে খর্জ্জুরবৃক্ষে পরাগসেক করিতে দেখিয়া মহম্মদ তাহাদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে বলেন। সে বৎসর ফল ভাল হইল না। লোকেরা মহম্মদকে গিয়া বলিল যে, তাঁহার কথা শুনিয়াই তাহাদের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। মহম্মদ বলিলেন, "আমি সামান্য মনুষ্য মাত্র—নির্ভুল নহি। ধর্ম্মবিষয়ে তোমাদিগকে যাহা বলিব, তোমরা তাহাই শুনিও; অন্যান্য বিষয়ে আমার কথার মূল্য তোমাদিগের অপেক্ষা অধিক নহে।"

কিন্তু মুসলমানেরা এক্ষণে মহম্মদকে সকল বিষয়ে অভ্রান্ত বলিয়াই মনে করেন। এবং খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যেরা যেমন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনা রচনা করিয়াছেন, মুসলমান মৌলবীরাও সেইরূপ মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার নামে অনেক অলৌকিক ক্রিয়া রটনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। অনেক সময় খলিফদিগের দুর্দ্দান্ত যথেচ্ছাচারিতা সমর্থন করিবার জন্যও মহম্মদের নাম দিয়া অনেক অসম্ভব অসঙ্গত মিথ্যা প্রচারিত হইয়াছে। অশিক্ষিত লোকেরা ত আর তাহা বুঝে না। এবং য়ুরোপীয় লেখকেরা সহৃদয়তাভাবে যত্নপূর্ব্বক এ বিষয়ে অনুসন্ধানও করেন না।

উদাহরণ যথেষ্ট আছে। খ্রীষ্টান গ্রন্থকারেরা সাধারণতঃ যে সকল দুষ্টাচার মহম্মদের বিশেস অনুমোদিত বলিয়া মনে করেন, কোরাণে দেখা যায়, মহম্মদ তাহার বিরুদ্ধে বিধি দিয়াছেন। যেমন বহুদারপরিগ্রহ। সুরা নেসা নামক অধ্যায়ে বিধি আছে, পুরুষ ইচ্ছা

করিলে দুই তিন অথবা চারি জন নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু যদি এমন আশঙ্কা থাকে যে, চারি জনের প্রতি ঠিক সমান ন্যায়ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে একাধিক পত্নীগ্রহণ না করাই শ্রেয়। কোরাণের ঐ সুরাতেই অন্যত্র কথিত হইয়াছে যে, ইচ্ছা থাকিলেও স্ত্রীগণের সম্বন্ধে সম্যক্ ন্যায়াচরণ মানবের সাধ্যাতীত। অতএব কোন্ বিধি অনুসারে বহুদারপরিগ্রহ কোরাণসম্মত বলিয়া গণ্য হয় ?

কিন্তু বিধি না থাকিলেও নজীর মহম্মদ স্বয়ং। ইংরাজীশিক্ষিত মুসলমানের অনেকে ইহার যে কৈফিয়ৎ দিয়া থাকেন, "মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ" শীর্ষক প্রবন্ধে মৌলবী চিরাঘ আলির* মত সমালোচনাকালে আমরা তাহার আভাসও দিয়াছি। এখানে আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা যাইতে পারে।

তিপ্পান্ন বৎসর বয়স অবধি মহম্মদ বরাবর একপত্নীক ছিলেন, এবং শেষ বয়সে অনেকগুলি বিবাহ করিলেও মৃত্যু পর্য্যন্ত খদিজাই তাঁহার হৃদয়েশ্বরী। তিনি যাহাদের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে তিন জন তাঁহার আবিসীনিয়াপ্রবাসী অনুচরদিগের বিধবা এবং দুই জন মদিনার যুদ্ধে হত দুইটি শিষ্যের স্ত্রী। বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করা ব্যতীত ইহাদিগকে অন্য কোনও উপায়ে আশ্রয়দান অসম্ভব ছিল।

আরবদিগের মধ্যে এখনও এই প্রথা কতকটা প্রচলিত আছে। বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা আরবেরা একটা পারিবারিক কর্ত্তব্যের হিসাবে দেখে। হয় ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুইটি শিশু সন্তান এবং একটি নিরাশ্রয়া বিধবাকে রাখিয়া অকালে লোকান্তর গমন করিলেন। বিধবাকে পরহস্তে সমর্পণ করিলে শিশুদিগকে মাতৃহীন করা হয়, কিম্বা বিধবার সঙ্গে শিশুদিগকে পিতৃকুল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হয়—এ স্থলে পরিবারভঙ্গ নিবারণার্থে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভ্রাতৃবধূকে বৈধ পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া সকল দিক্ রক্ষা করে। সমাজের অসভ্যাবস্থায় ইহাপেক্ষা সুচারু ব্যবস্থা দুর্লভ।

এখন, মহম্মদকে অনুচরদিগের বিধবাজনরক্ষার্থে বিবাহ করিতে হইয়াছিল কেন, স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। সে সময়ে আরবের যে অবস্থা, তাহাতে বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে কোনরূপ ঘনিষ্ঠতা নিন্দনীয় হইত, এবং শিথিল আরবপ্রকৃতি এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র শৈথিল্য দেখিলে আপন উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের একটা অবসর পাইত।

কিন্তু ভোগ্যা দাসী রক্ষণ প্রথা যদি অক্ষুন্ন থাকে, তাহা হইলে বহুবিবাহ নিষেধ করিলেও আরব সমাজের দুরাচার সংশোধিত হইল, এমন বলা যায় না। মহম্মদ সেই জন্য নানা উপায়ে সে পথেও কণ্টক আরোপ করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। কোরাণে

* Reforms under Moslem Rule by Maulavi Cheragh Ali.

ব্যবস্থা দিলেন যে, তোমাদের মধ্যে যাহারা স্বাধীনা বিশ্বাসিনী কন্যার পাণিগ্রহণে অক্ষম, তাহারা বিশ্বাসিনী দাসীকে বিবাহ করিবে। এবং অব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগকে যৌতুক প্রদান করিবে। কিন্তু বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াও যদি তাহারা ব্যভিচারপরায়ণা হয়, তবে তাহাদের প্রতি স্বাধীনা স্ত্রীর অর্দ্ধেক শাস্তি বিধি। তোমাদের মধ্যে যাহারা কুকার্য্যের ভয় করে, তাহাদেরই জন্য এই বিবাহ। ধৈর্য্য ধারণ করিলে তোমাদেরই মঙ্গল। ঈশ্বর জিতেন্দ্রিয়ের প্রধান সহায়। কিন্তু যাহারা দুষ্প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাহারা বিপথে চালিত হয়।— এইরূপে দাসীবিবাহের বিধি দিয়া এবং বিবাহ ব্যতীত স্ত্রীপুরুষের মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ গর্হিত বলিয়া মহম্মদ ভোগ্যারক্ষণ নিষেধ করিলেন। এবং দাসীর পাণিগ্রহণ অপেক্ষা ধৈর্য্য ধারণই শ্রেয়, এই কথায় তাঁহার মত আরও ভালরূপ ব্যক্ত হইল। শাসনও রহিল যে, কামনার অনুসরণ করিতে চাও কর, কিন্তু ও পথে কল্যাণ নাই।

কোরাণে যে, ভোগ্যারক্ষণের অনুকূলে কোনও কথা নাই, তাহা নহে। স্যুরা মারেজ্ব নামক অধ্যায়ে মহম্মদ স্ত্রী এবং ক্রীতদাসী ভিন্ন অপরার প্রতি আসক্তি নিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং দাসীরক্ষণ মহম্মদের অনুমোদিত নহে ত কি? কিন্তু শিক্ষিত মুসলমানেরা বলেন যে, মহম্মদ ক্রমে ক্রমে আরব সমাজ সংস্কার করিয়াছেন—প্রথমে তিনি এই ব্যবস্থাই দিয়াছিলেন; কারণ, আরব সমাজের দারুণ ব্যভিচারস্রোত রোধ করিবার তখন আর কোনও উপায় ছিল না; ক্রমে সময় বুঝিয়া দাসীরক্ষণ নিবারণের জন্য দাসীদিগকে বিবাহ করিবার ব্যবস্থা দিলেন—কিন্তু সেই সঙ্গে ধৈর্য্যাবলম্বনের মহত্ত্বটুকু উল্লেখ করিতে ভুলিলেন না; এবং পরে বহু নারীর প্রতি সমান ন্যায়াচরণ অসম্ভব বলিয়া বহুদারপরিগ্রহও প্রকারান্তরে নিষেধ করিলেন। দাসীরক্ষণ মহম্মদের আদৌ অনুমোদিত নহে। স্যুরা নূরে ক্রীতদাসদাসীদিগের বিবাহ দিবার জন্য তিনি স্পষ্টই আদেশ করিয়াছেন, এবং সেই সঙ্গে অবিবাহিতদিগকে চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিবার জন্যও উপদেশের ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু হইলে হইবে কি? সহস্র কূট তর্ক বাহির করিয়া মুসলমানেরা পালনচ্ছলে বার বার মহম্মদের বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন। এবং লঙ্ঘিত বিধি প্রচলিত আচারের প্রভাবে ক্রমে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। ইংরাজ লেখকেরা মুসলমানদিগের প্রতি যে সকল তীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণ প্রয়োগ করেন, মুসলমানপ্রচলিত ব্যবস্থাই তাহার কারণ। লোকাচার এবং ইদানীন্তন আইনে মিলিয়া মহম্মদকে একেবারে আড়াল করিয়াছে। বহুবিবাহ নিবারণ, দাসীরক্ষণ প্রথার উচ্ছেদ, ক্রীতদাসদিগের দুরবস্থা মোচন, যথেচ্ছ দারপরিত্যাগ নিষেধকরণ প্রভৃতি যে সকল শুভানুষ্ঠানের তিনি সূচনা করিয়া গিয়াছেন, মুসলমানজগতে তাহার একটিও সম্যক্ রক্ষিত হয় নাই। অজ্ঞানের আধিপত্যে তাহার সম্ভাবনাও বিরল।

কিন্তু একটা কথা সহজেই মনে হয়। সমস্ত মুসলমান-জগৎ জুড়িয়া চিরদিন যদি অজ্ঞানই নিষ্পরোয়া আধিপত্য করিয়া আসিতেছে, তবে সে অন্ধকার মরুরাজ্যে মানবের হৃদয়মথিত এক অপূর্ব্ব সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিল কোথা হইতে? তাহাতে যে মধুর প্রেমগীতি ধ্বনিত হইয়াছে, সে দেবগাথা পৃথিবীতে দৈবাৎ শুনা যায়, যে করুণ উদারতা এবং নির্ভীক সহৃদয়তা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা কঠিন পাষাণ ভেদ করিয়া উঠে নাই—তাহা মানবেরই করুণ হৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাস। এবং এখনও সেই সুফী কবিগণের রচিত গীত গাহিয়া মুসলমান ভক্তহৃদয় নির্জ্জনে ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার নিগূঢ় যোগসাধন করে। ইহা কি কখনও অজ্ঞানের ফল হইতে পারে?

বোগ্‌দাদের খলিফেরাও যে বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, আরব্যোপন্যাসের কল্যাণে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। এবং মুসলমান-জগতে খলিফদিগের জ্ঞানচর্চ্চার সুফলও কিছু কিছু ফলিয়াছিল। খলিফ আলমামুন পাঁচ শত মণ স্বর্ণ দিয়া গ্রীক সম্রাটের নিকট তাঁহার সভাপণ্ডিত লিওকে চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, তিনি আসিয়া মুসলমান ছাত্রদিগকে কিছু দিন যদি দর্শন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন, খলিফ আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ বিবেচনা করিবেন। দামাস্কাসে মুসলমান-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন একজন পণ্ডিত খ্রীষ্টান। ইহাতে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি যে অকপট সদ্ভাব প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা জ্ঞানালোচনারই ফল। জ্ঞানের মত গোঁড়ামির আর অমোঘ ঔষধ নাই।

কিন্তু এ জ্ঞানালোচনা অবিচ্ছেদে বরাবর চলে নাই। প্রথমতঃ, খলিফেরা সকলে সমান ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধবিগ্রহাদিজনিত রাজনৈতিক বিপ্লবে দীর্ঘকাল সমভাবে জ্ঞানচর্চ্চার বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। আরও এক কথা, এখন যেমন সাধারণের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তার হইতেছে, তখন কেবল পণ্ডিতগণের মধ্যেই জ্ঞান সীমাবদ্ধ ছিল। এবং পণ্ডিতেরা অনেক সময় কেতাবের মর্ম্ম সাধারণের নিকট সম্যক্ উদ্‌ঘাটিত করিতে সঙ্কুচিত হইতেন।

যাহাই হউক্, এ সকল ত্রুটি থাকিলেও, মুসলমানদিগের দ্বারা পৃথিবীর যে অনেক হিতসাধন হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। এবং বিদেশী লেখকেরা মুসলমান-জগতে নিত্য অত্যাচার অবিচারের ধারাবাহিক উল্লেখ করিলেও সুশাসন, শৃঙ্খলা এবং সহৃদয়তা মুসলমান-ধর্ম্মের বহির্ভূত নহে, এ কথাও মানিতে হয়। মুসলমান-শাসনও যে ভাল হইতে পারে, স্পেনের ইতিহাস তাহার প্রমাণ। মূরদিগের রাজত্বকালে স্পেনের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বহু দূরদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা কর্ডোভার বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে আসিত; বড় বড় অধ্যাপকেরা জ্যোতিষ, রসায়ন, প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন, এবং লোকের মুখে মুখে ভাল ভাল কবিতা শুনা যাইত। ইহা ভিন্ন, স্থাপত্য-

বিদ্যা এবং অন্যান্য অনেক সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যের যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল বলা বাহুল্য। মূরদিগের শাসনসময়ে স্পেন য়ুরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এইরূপ গুটিকতক প্রাচীন নজীর কোরাণের অনুশাসনের সহিত যুক্ত হইয়া নব্য মুসলমানদিগকে ভরসা দিতেছে যে, মুসলমানেরা পৃথিবীর অভিশপ্ত সন্তান নহে, তাহারাও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মত সৎকার্য্যের অধিকারী এবং সাধু অনুষ্ঠানে সক্ষম; একবার সংযতভাবে আপন কর্ত্তব্য বাছিয়া লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ফল সুনিশ্চিত। যে যাহা বলে বলুক, ধর্ম্মকে রক্ষা করিতেই হইবে, প্রাচীন কুসংস্কার এবং অজ্ঞানান্ধকারে যাহা চাপা পড়িয়াছে, তাহাকে উদ্ধার না করিলে নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষালোকে এখন পথও সুগম। সুতরাং এই এক মহা অবসর।—আরবের মরুপ্রান্তে মহম্মদ যে আল্লা আকবর ধ্বনি তুলিয়াছিলেন, এইবারে তাহা সফল হউক্। ['সাধনা,' মাঘ ১২৯৯]

ভবিষ্যৎ ধর্ম্ম*

আদিম কাল হইতে সভ্যতার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ধর্ম্ম যেমন নিরবচ্ছিন্ন মানবসমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে, এমন আর কিছুই নহে। সংসারের দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষা মানবহৃদয়ে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল—কিন্তু অসহায় মানবশিশু সংসারে আসিয়াই প্রবলা প্রকৃতির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহার চতুর্দ্দিকেই রোগ শোক, বিপদ্ আপদ্, যুদ্ধবিগ্রহ মৃত্যুভয়; শিকারে সে নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসে; দাবানলে তাহার যথাসর্ব্বস্ব পুড়িয়া যায়; সে এক করিতে যায়, আর এক হইয়া পড়ে—সুতরাং সহজেই সে আপনাকে কোনও দুর্দ্দান্ত অপদেবতার ক্রীড়াসামগ্রী ঠাহরাইয়া বসে এবং সেই অদৃশ্য নিষ্ঠুরের হিংসাবৃত্তি প্রশমিত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে থাকে। প্রকৃতিতে বিপ্লবও নানা—নদী কূল প্লাবিত করিয়া উথলিয়া উঠে, আকাশ দারুণ মেঘগর্জ্জনে ভাঙ্গিয়া পড়ে, ভূমিকম্পে একটা প্রলয়-ব্যাপার ঘটিবার উপক্রম হয়, কালো ছায়া আসিয়া চন্দ্রের শুভ্র কান্তি ঢাকিয়া ফেলে; ভয়বিহ্বলচিত্তে দুর্ব্বল মানবসন্তান চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে, কোনও কারণ খুঁজিয়া পায় না—কেবল এই বুঝে যে, এখানে সহস্র দানবশক্তি তাহার সঙ্গে নিতান্ত লাগিয়াছে, সকলগুলিকে সন্তুষ্ট করিতে না পারিলে নিস্তার নাই। নিজের প্রকৃতি দিয়া সে দেবচরিত্র নির্ণয় করিতে বসে, এবং উৎকোচ দানই তাহার নিকটে দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বোধ

* Religion : Its Future—By the Rev. Dr. Momerie.

হয়। এখন এই দানব-দেবতাকে কি দেওয়া যায়? শস্য, ফলমূল, মদ্য মাংস যাহা দাও, তিনি সর্ব্বভুক্। রক্ত দৃশ্যে দেবতার বিশেষ আনন্দ। অতএব দেবতাকে প্রসন্ন করিতে চাহ ত যত পার বলিদান কর। যাহারা বিশেষরূপে দেবচরিত্রের রহস্য উদ্ভেদ করিতে সমর্থ হইল, তাহারাই ক্রমে গুরু পুরোহিত হইয়া উঠিল। এবং প্রথমে যেমন ইহলোকের সুখকামনাই দেবতাকে সন্তুষ্ট করিবার একমাত্র কারণ ছিল, কালক্রমে তাহার সহিত পারলৌকিক সুখকামনা যুক্ত হইল। পারলৌকিক সুখের আশায় লোকে ইহলোকে অনেক কষ্টভোগও স্বীকার করিল। পরলোকে স্বর্গলাভের আশায় লোকে আপনাকে হোমানলে আহুতি দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রকে ভাসাইয়া দিয়াছে, না করিয়াছে হেন কাজ নাই। দুঃখ হইতে অব্যাহতি এবং সুখলাভের জন্য মানুষ এমনি অধীর।

এই সকল আচার অনুষ্ঠানের মধ্য হইতে মধ্যে মধ্যে এক এক জন মহৎলোকের আবির্ভাব হইয়াছে—যেমন, কন্‌ফ্যুশস্, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ; তাঁহারা প্রচলিত ধৰ্ম্মকৰ্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া যাজকদিগের শিক্ষার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন, যাগ যজ্ঞ, জীববলি, মন্ত্র তন্ত্র সম্পূর্ণ নিষ্ফল প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনই যে মানবজীবনের উন্নতির মুখ্য উপায়, এই সত্যটি বার বার প্রচার করিয়াছেন। সংস্কারকদিগকে লোকে প্রথমে গালি দিতে থাকে, পরে তাঁহাদিগকে নূতন ধৰ্ম্মের সংস্থাপক বলিয়া প্রচার করে; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অধিকাংশ স্থলে তাঁহারা যে ধৰ্ম্ম প্রচার করিয়া যান, তাহার অনেক বিরোধী মত ও অনুষ্ঠানই তাঁহাদের নামসংযুক্ত ধৰ্ম্মের অঙ্গরূপে বিরাজ করিতে থাকে।

ডাক্তার আল্‌ফ্রেড মোমারি তাঁহার ধৰ্ম্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে ইহারই উল্লেখ করিয়া ধৰ্ম্মের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কতকগুলি যুক্তিসঙ্গত কথার আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি প্রথমে দেখাইয়াছেন যে, বড় বড় সংস্কারকেরা সকলেই একবাক্যে লোকসকলকে সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করিয়াছেন। ইসায়া বলিয়াছেন,—দেবতা ছাগরক্তে পরিতুষ্ট হয়েন না, উপহারের আড়ম্বরে এবং ধূপ ধুনার গন্ধে তাঁহার চিত্তবিনোদন হয় না, এ সকলি মিথ্যা পণ্ডশ্রম; অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হও, সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান কর, দরিদ্রের অভাব মোচন কর, পিতৃহীনকে আশ্রয় দাও, বিধবাকে সাহায্য কর। জোরোস্তার ইন্দ্রজালের নিষ্ফলতা দেখাইয়া কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকেই মানবের একমাত্র আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ,—পৃথিবীতে ভাল মন্দ দুই আছে, তোমরা মন্দ পরিত্যাগ করিয়া ভালকে গ্রহণ কর; সদালাপ, সাধু চিন্তা এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানই স্বর্লোকে নেতা। কায়মনোবাক্যে পরের অনিষ্টাচরণে বিরত থাকাই কন্‌ফ্যুশসের প্রধান শিক্ষা। বুদ্ধ বলিয়াছেন,—মস্তকমুণ্ডন, বস্ত্রত্যাগ, ধূলিশয্যা বা বেদাধ্যয়ন মানবকে শুদ্ধ করিতে পারে না; কারণ, ক্রোধ, হিংসা, মত্তত্তা, পরশ্রীকাতরতা, এই সকলই মানবের অশুচি। যীশু খ্রীষ্টও এই

কথাই বলিয়াছেন,—প্রভু প্রভু করিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না; সেই তাঁহাকে পায়, যে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করে; যাহারা মুখে দীর্ঘ বক্তৃতা করে এবং কাজের বেলায় অনাথা বিধবার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাদের কল্যাণ নাই। আরবপ্রান্তে মহম্মদেরও সেই একই কথা,—ঈশ্বর রক্তমাংসের বলি গ্রহণ করেন না, তোমাদের অকপট ভক্তিই তাঁহার নিকট পঁহুছায়। যাহারা ভক্তির ভাণ করে এবং দরিদ্রকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না, তাহাদের সে ভক্তি ব্যর্থ। পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া নমাজ পড়িলেই পুণ্য হয় না, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা সংসাধনের চেষ্টাই যথার্থ পুণ্যকার্য্য।

ধর্ম্মসংস্থাপকেরা যুগে যুগে এই একই কথা বলিয়াছেন যে, সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানে আপনাকে বড় করিয়া তোলো, তোমাদের জন্য প্রশস্ত কল্যাণ রহিয়াছে। কিন্তু অনুচরবর্গ সহস্র অনাবশ্যক আড়ম্বর এবং অনর্থক অনুষ্ঠান দ্বারা মূল কথাকে ক্রমে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে—দাঁড়াইয়াছে এই যে, বুদ্ধ যাহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিয়াছিলেন, তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; খ্রীষ্ট যাহা বলেন নাই, তাহাই খ্রীষ্টধর্ম্মের মূল বিশ্বাস; মহম্মদ এবং মুসলমানধর্ম্ম পরস্পরবিরোধী। যদি কোনও গতিকে একবার এই সকল মহাপুরুষেরা মর্ত্ত্যে আসিয়া তাঁহাদের নামসংযুক্ত ধর্ম্মের অবস্থা দেখেন, নিশ্চয়ই তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েন।

উত্তর বৌদ্ধধর্ম্মে এখন পৌত্তলিকতার সমস্ত আড়ম্বরই নিঃশব্দে স্থান লাভ করিয়াছে—স্বর্গীয় দূত, পবিত্র বারি, জপমালা এবং বিচিত্র দুর্ব্বোধ্য অনুষ্ঠান বুদ্ধকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়া তাঁহার মৃৎপ্রতিমার পদতলে প্রতি দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। দক্ষিণ বৌদ্ধধর্ম্ম বাহ্যতঃ তাদৃশ বিকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না—কিন্তু বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের সহিত তাহার যথার্থ ঐক্য অল্পই। যাজকমণ্ডলী প্রাচীন পালি ভাষায় শ্লোক আওড়াইয়া যায়—নতজানু শ্রোতৃমণ্ডলী কেবলি হাঁ করিয়া শুনে এবং না বুঝিয়া শ্রুতিযোগে যথাসাধ্য পুণ্য অর্জ্জন করে।

খ্রীষ্টধর্ম্মেরও এই দশা। ডাক্তার মোমারি দেখাইয়াছেন যে, পূর্ব্বকালের পৌত্তলিকতা এবং খ্রীষ্টজন্মের পরবর্ত্তী সময়ের যত অদ্ভুত অধ্যাত্মবিদ্যা মিলিয়া বর্ত্তমান খ্রীষ্টধর্ম্ম গঠিত হইয়াছে। যীশু খ্রীষ্টকে, নামটুকু বাদে, খ্রীষ্টানেরা যথাসাধ্য সারিয়া ফেলিয়াছেন। তর্ক উঠে যে, পবিত্রাত্মা (ইংরাজী Holy Ghostএর এই অনুবাদই বোধ করি প্রচলিত) ঈশ্বর এবং তাঁহার পুত্র উভয় হইতে বাহির হইয়াছেন, অথবা কেবলমাত্র পিতা-ঈশ্বর হইতে। লুথর বলিয়াছেন, পাপীর প্রতি ঈশ্বরের এতই ক্রোধ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার নিজ পুত্রের শোণিত ভিন্ন অপর কিছু দ্বারা সে দুর্জ্জয় ক্রোধশান্তি অসম্ভব হইত। এমনও শুনা যায় যে, ঈশ্বর তাঁহার বাছাইকরা লোকগুলিকেই উদ্ধার করিবেন, আর সকলের অদৃষ্টে যাহা হয় ঘটিবে।

খ্রীষ্টান ঈশ্বরের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। সামান্য অপরাধে যিনি অনন্ত নরকদণ্ড বিধান করেন, এক দম্পতির অবাধ্যতার জন্য সমুদায় উত্তরবংশীয়দিগকে স্বর্গ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন, একজন নিরীহের প্রাণ না লইয়া পাপীর প্রতি যাঁহার করুণা উদ্রেক হয় না, সে খামখেয়ালী প্রবলপ্রতাপ বিধাতার কথা কেমন করিয়া বলিব? যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের নামে প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন; খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিয়াছে বিভীষিকা।

মুসলমান-ধর্ম্মও মহম্মদকে লঙ্ঘন করিয়াছে। অন্য প্রবন্ধে আমরা তাহা দেখাইয়াছি। ডাক্তার মোমারি তাঁহার প্রবন্ধে সায়েদ আমীর আলি সাহেবের "মহম্মদের জীবনচরিত" নামক গ্রন্থ হইতে ইহার অনুকূলে দুই চারি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

মোমারি সাহেব কেবল হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। কারণ বোধ হয়, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদের ন্যায় কোনও বিশেষ ধর্ম্মসংস্থাপকের নামের সহিত হিন্দুধর্ম্ম গ্রথিত হয় নাই, এবং ইহা ভিন্ন হিন্দুধর্ম্ম কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট মত ও বিশ্বাসে আবদ্ধ নহে। নানা শাস্ত্র, নানা মত, নানা কথা, নানা বিধান—সুতরাং ধরিবার ছুঁইবার মত কিছু পাওয়া কঠিন। কোথাও তেত্রিশ কোটী দেবতার মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, কোথাও সেই তেত্রিশ কোটী দেবতা মিথ্যা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছে; হিন্দুধর্ম্ম ত ঠিক এক ধর্ম্ম নহে—ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহাই পুথিরক্ষিত হইয়া সম্প্রতি হিন্দুধর্ম্ম নামের মধ্যে কোন প্রকারে স্থান লাভ করিয়াছে মাত্র। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র ধরিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, এ দেশেও ঋষিবাক্য প্রত্যহ লঙ্ঘিত হইয়াছে, এবং ঋষিবাক্য-লঙ্ঘনই প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। আরও ইদানীং আমাদের মধ্যে যে সকল ধর্ম্মসংস্থাপকের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহাদের প্রচারিত ধর্ম্মের অবস্থা দেখিলেই মোমারি সাহেবের অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। চৈতন্যের ধর্ম্ম এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্ম, নানকের ধর্ম্ম এবং বর্ত্তমান শিখদিগের ধর্ম্ম, এই সকল তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

এইরূপে দেখা যায় যে, পৃথিবীতে চিরদিন দুই প্রকারের ধর্ম্ম চলিয়া আসিতেছে। গুরু পুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্ম্ম এক, এবং ধর্ম্মসংস্থাপক ও অল্পসংখ্যক লোকের ধর্ম্ম এক। প্রথমোক্ত শ্রেণীর সুবিধাই আদর্শ, শেষোক্ত শ্রেণীর আদর্শ ন্যায়; এক পক্ষ নীতিকে পশ্চাতে রাখিয়া দেন, অন্য পক্ষ নীতিকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া থাকেন; এক পক্ষের ধর্ম্ম কতকটা অসভ্য অবস্থার এবং অভিব্যক্তির নিম্নশ্রেণীর, অপর পক্ষের ধর্ম্ম অভিব্যক্তির চরম ফল। ডাক্তার মোমারি সেই জন্য গুরু পুরোহিত ও জনসাধারণের ধর্ম্মকে অতীত কালের ধর্ম্মের মধ্যে ফেলিয়াছেন। এবং মহাজনদিগের ধর্ম্মকেই ভবিষ্যতের ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ভবিষ্যতের ধর্ম্মই এখন প্রতি দিন ধীরে ধীরে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে।

এখন প্রশ্ন এই যে, ভবিষ্যতের ধর্ম্মে দেবতা স্থান পাইবেন কি না? দেবদেবী ত প্রতি দিন লোপ পাইতেছে—ঈশ্বর কি থাকিবেন? কনফ্যুশস্, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ, এই চারি জন ধর্ম্মসংস্কারকের মধ্যে শেষোক্ত দুই জনই ব্রহ্মবাদী। এবং শুনা যায়, নাস্তিক্য-ধর্ম্ম কেবলমাত্র নীতি বৈ আর কিছুই নহে। মোমারি সাহেব বলেন, ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, ঈশ্বরবিহীন নীতি নীতিবিহীন ঈশ্বর অপেক্ষা শতগুণে ভাল। কিন্তু আচরণ-প্রধান ধর্ম্মকে শুদ্ধ মাত্র নৈতিক ধর্ম্ম হিসাবে দেখা সঙ্গত নয়। ধর্ম্মও যে সর্ব্বত্র সুব্যক্তরূপে ঈশ্বরবাদী, তাহা বলা যায় না। এবং ধর্ম্ম এবং নীতি দুই বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ বলিয়া মনে করাও ভ্রম। নীতি বাদ দিয়া ধর্ম্ম, কিম্বা একেবারে ধর্ম্মশূন্য নীতি অসম্ভব। নীতির মধ্যেও অন্ততঃ গূঢ়ভাবে ঈশ্বরনিষ্ঠাই প্রকাশ পায়। ঈশ্বর আমাদিগকে সদনুষ্ঠানরত দেখিতে চাহেন—এবং সাধু কার্য্যের অনুষ্ঠানই তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন। সুতরাং যে ব্যক্তি মনে করে যে, সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সেও ঈশ্বরবাদীরই মত তাঁহার প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে তাঁহার অবারিত প্রীতিলাভে সমর্থ। নীতি ধর্ম্মের পত্তনভূমি—ধর্ম্মের সূচনা; কেবল ধর্ম্ম এখনও আপনাকে আপনি বুঝিবার মত স্পষ্ট ভাব ধারণ করে নাই। যে নীতিপরায়ণ ব্যক্তি চিরদিন ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া আসিতেছেন, তত্ত্ববিদ্যায় একটা ভুল করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহাকে ধর্ম্মপরাঙ্মুখ বলা যায়।

কিন্তু নাস্তিকতা যে ভ্রম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ডাক্তার মোমারি প্রকৃতির একরূপতা, চিন্তাবময়তা এবং উন্নতিশীলতা আলোচনা করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রথমে প্রকৃতির একরূপতা। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে ইহাই প্রথম প্রমাণ। কিন্তু ইহাই অবশ্য যথেষ্ট নহে; তবে এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, প্রকৃতিতে অনিয়ম ঈশ্বরের অস্তিত্ব অপ্রমাণ করিবার কারণ হইত। প্রকৃতির একরূপতা আবিষ্কারের পূর্ব্বে একেশ্বরবাদ টিঁকিতে পারিত না। একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে বহু পরিবর্ত্তনশীল ইচ্ছার উপর হইতে বিশ্বাস হরণ করা চাই। যিনি সমস্ত প্রকৃতিতে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনাবলী যাঁহার ইচ্ছার বিচিত্র নিত্য বিকাশ, সেই অনন্তস্বরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে প্রকৃতিবহির্ভূত সসীম দেবতার প্রতি বিশ্বাস ভাঙ্গা চাই।

দ্বিতীয়, প্রকৃতির চিন্তাবময়তা। বেকন বলেন, বিজ্ঞান প্রকৃতির ব্যাখ্যান। কিন্তু যেখানে জ্ঞানের সম্পর্ক নাই, সেখানে ব্যাখ্যা অসম্ভব; উন্মাদের কার্য্যের মধ্যে কে কবে সঙ্গতি বাহির করিতে পারিয়াছে? জ্ঞানসম্পর্কশূন্য পরমাণুসমষ্টির মধ্যে নিয়মও থাকিত না, বৈজ্ঞানিক আলোচনারও সুবিধা হইত না। এবং তাহা জ্ঞান উদ্রেক করিতেও পারিত না। এখন আমরা যে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের কার্য্যপ্রণালী তন্ন তন্ন বলিয়া দিতে পারি,

সে এই জ্ঞানেরই সম্পর্কে। বিজ্ঞানের প্রতি নূতন আবিষ্কার প্রকৃতির অবিচলিত শৃঙ্খলা এবং সুনিয়ম—এক কথায়, জড়ের অন্তরে নিহিত জ্ঞানেরই পরিচয় দেয়। এবং এই জ্ঞান চিৎ ব্যতীত সম্পূর্ণ জড় হইতে অভিব্যক্ত হইতে পারে না।

তৃতীয়, প্রকৃতির উন্নতিশীলতা। অন্য কথায় অভিব্যক্তি। চতুর্দ্দিকের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া যখন ঈশ্বরের মঙ্গল অভিপ্রায়ে অবিশ্বাস জন্মে, তখন অভিব্যক্তিবাদ বুঝাইয়া দেয় যে, ইহারই মধ্য হইতে প্রতি দিন উন্নতির পর উন্নতি সুচিত হইতেছে। আরও বলে যে, ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান, কিন্তু খামখেয়ালী নহেন। অসঙ্গত যথেচ্ছাচরণ তাঁহার স্বভাব নহে। কিন্তু ধীরে ধীরে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলায় তিনি এই বিপুল সৃষ্টিকে প্রতি দিন অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতেছেন।

এইরূপে মোমারি সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ভবিষ্যতের ধর্ম্ম ঈশ্বরবাদী না হইয়া যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, মানবাত্মার অমরতা ভবিষ্যতের ধর্ম্মে টিঁকিবে কি না? মোমারি সাহেব বলিয়াছেন—টিঁকিবে। প্রথম কারণ, ইহার বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ নাই, বরঞ্চ অনুকূলে কিছু কিছু অনুমানসিদ্ধ প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতার সহিত ইহার সামঞ্জস্য আছে। প্রকৃতির সর্ব্বত্র আমরা যে শৃঙ্খলা এবং ক্রমোন্নতি দেখিতে পাই, তাহা এই ভাবেরই অনুকূল। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের অন্তরে চিরদিন সুখের জন্য তৃষ্ণা রহিয়াছে, অথচ সুখ আমাদের ভাগ্যে মিলে না; আমাদের অন্তরে পূর্ণতা লাভের আকাঙ্ক্ষা অহরহ পোষিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু আমরা অত্যন্ত অসম্পূর্ণ হীন; আমাদের অন্তরে ন্যায়ের যে উজ্জ্বল ভাব মুদ্রিত হইয়া আছে, প্রতিবেশীদের সম্পদ্ বিপদে তাহা প্রতি দিন লঙ্ঘিত হইতেছে;—অমরতাই এই সকল বিরোধের একমাত্র মীমাংসা। তৃতীয়তঃ, সাধুতাকে যে ব্যক্তি যথার্থ ভালবাসে, সে লাভের প্রত্যাশা রাখে না, সাধুতার জন্যই সে সাধুতার প্রতি অনুরক্ত। কিন্তু সৎ যদি নিতান্ত নশ্বর হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে তাহার আর আকর্ষণ থাকে না। অতএব অমরতা ভবিষ্যতের ধর্ম্মে উপেক্ষিত না হইবারই সম্ভাবনা।

মোমারি সাহেবের শেষ প্রশ্ন, খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং চার্চ থাকিবে কি না? উত্তর—এখন যাহা আছে, ইহা থাকিবে না। তিনি বলেন, যীশু খ্রীষ্টে ফিরিয়া গিয়া আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে। আমরা এখানে তাহার বিস্তারিত উল্লেখ করিতে বিরত হইলাম। আমাদের পাঠকসাধারণের এ বিষয়ে বোধ করি বিশেষ আগ্রহ নাই।

কিন্তু মোমারি সাহেবের কথাটা পাল্টাইয়া আমরা স্বদেশের প্রতি প্রয়োগ করিতে পারি। তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, আমাদের দেশেরও প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক এই

কথাগুলি খাটে। গুরুপুরোহিতদিগের বিধি-বিধান ত এখনই লজ্ঘিত হইতেছে। যে সকল আচার অনুষ্ঠান অসুবিধাজনক, তাহা কেহ মানে না। সমাজের সর্ব্বত্র কেবল একটা ভীষণ অবিশ্বাসের আধিপত্য। প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা ও কাপট্যাবলম্বন করিতে চারি দিক্ হইতে পরামর্শ বর্ষিত হয়। এই মিথ্যাচরণই বাহ্যতঃ এখন সমাজকে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইহাই তাহার ক্ষয়ের কারণ। প্রতি দিন অল্পে অল্পে তাহার বিরুদ্ধে মনুষ্যত্ব বল সঞ্চয় করিতেছে—একদিন সহসা এ মিথ্যাজাল ছিন্ন করিয়া সে আপন প্রবল বিক্রম প্রকাশ করিবে। সে দিন খুব বেশী দূর নহে। ['সাধনা,' ফাল্গুন ১২৯৯]

অনার্য্য ব্রাহ্মণ

আমরা বহু কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ভিন্ন ভারতবর্ষের অপর জাতিমাত্রই আর্য্যেতর—হয় সম্পূর্ণ অনার্য এবং শূদ্রপদবাচ্য, নয় আর্য্য-শোণিতের সহিত অনার্য-শোণিতের মিশ্রণফল। ক্ষত্রিয় বৈশ্য এখনকার দিনে কদাচিৎ দৃষ্টিগোচর হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণই একমাত্র অবশিষ্ট ভারতবর্ষীয় আর্য্যসন্তান।—কিন্তু যখন শুনা যায় যে, এখানেও সংশয় মিটে নাই, ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও এত বিজাতীয় শ্রেণীবিভাগ এবং পরস্পরের জাতিগৌরবের প্রতি এমনি অবিশ্বাস যে, এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিতেও লজ্জা বোধ করে, এবং আকারে প্রকারে, চাল চলনে, দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেক সামান্য অনুষ্ঠানটিতে পর্য্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে একেবারে আর্য্য অনার্য্য প্রভেদ, তখন আমাদের পূর্ব্ববিশ্বাসকে কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে হয়।

হণ্টার সাহেব তাঁহার উড়িষ্যার বিবরণের এক স্থলে প্রসঙ্গক্রমে হিমালয় হইতে আরম্ভ করিয়া সিংহলপ্রান্ত অবধি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে এই জাতিবিভাগের যাবতীয় দৃষ্টান্ত এবং তৎসংক্রান্ত কিম্বদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, হিমালয়ের পাদমূলে চম্বা নামক প্রদেশে গাড়ী নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। ইহারা মেষ চরাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। রাখালদিগের সহিত ইহাদের ধর্ম্মকর্ম্মে কিছুই প্রভেদ নাই। প্রতি দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া বাহির হয়, সন্ধ্যাকালে ধেনু চরাইয়া ঘরে ফিরে। হণ্টার সাহেব ইহাদিগকে—বিশেষতঃ গাড়ী স্ত্রীলোকদিগকে—বিশেষ সুন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

আরও একটু দক্ষিণে কাংরা উপত্যকায় ব্রাহ্মণেরা হল চালনা করে। সদ্বংশীয় ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণাচক্ষে দেখেন এবং আপনাদিগের স্বজাতি বলিয়া আমল দেন না। স্থানীয় ব্রাহ্মণবংশাবলীর মধ্যেও ইহাদের কোনও উল্লেখ নাই।

সিমলা পাহাড়ে ব্রাহ্মণেরা রাখাল, কৃষক, কুলি এবং মজুরের কাজ করিয়া থাকে। একটু দূরবর্ত্তী স্থানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিধবা ভ্রাতৃবধূকে বিবাহ করা গৌরবের কার্য্য বলিয়া গণ্য হয়, এবং পিতৃগণ কন্যাদিগকে অসৎ উদ্দেশ্যে বিক্রয় করিতে লজ্জাবোধ করে না। হণ্টার সাহেবের একজন ব্রাহ্মণ খানসামা ছিল—সে যে সকল কাজ করিত, সাহেবের একজন গোয়ালা চাকর সে সকল কাজ স্পর্শ করা তাহার জাতির অনুপযুক্ত মনে করিত।

পাতিয়ালায় অনেক ব্রাহ্মণ-মজুর আছে। ইহাদের কেহ কেহ পাল্কীবেহারার কাজ করিয়া খায়।

দক্ষিণে আসিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে একদল ব্রাহ্মণ-কৃষক দেখা যায়। ইহাদের নাম তগা। কিম্বদন্তী এই যে, ব্রাহ্মণের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কৃষি অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া ইহাদের এই নাম—তগা ত্যাগের অপভ্রংশ। কিন্তু স্যর হেন্‌রি ইলিয়ট সাহেব বলেন, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ একজন শূদ্রকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া জাতিচ্যুত হয়েন। সেই অবধি ইহারা এক স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ডুসা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত। এবং তাহাদের এক স্বতন্ত্র বর্ণভেদ-প্রণালী আছে।

উড়িষ্যার অন্তর্গত যাজপুরে হলচালক ব্রাহ্মণের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এবং শুনা যায় যে, একজন প্রবলপ্রতাপ ভূপতি দেবপূজাকালে যথেষ্ট ব্রাহ্মণ না পাওয়াতে গলায় পৈতা দিয়া বিস্তর ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করেন। ইহাদের অনেকে এক সময় অযোধ্যায় গিয়া বসতি করে। কিন্তু সেখানকার ব্রাহ্মণ সমাজ ইহাদিগকে গ্রহণ করে নাই।

অযোধ্যার সওয়ালাখী ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ও এইরূপ রাজ অনুগ্রহের ফল। রাজা রাম বাঘেল নামক নরপতি একবার অনেক ব্রাহ্মণ লইয়া ধুমধাম সহকারে এক যজ্ঞ সম্পাদন কারতে ইচ্ছা করেন। সওয়া লক্ষ ব্রাহ্মণ সহজে মিলিল না। রাজা হুকুম দিলেন, সওয়া লক্ষ সামান্য প্রজার গলায় পৈতা দিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ করিয়া লওয়া হউক। রাজাজ্ঞা অবিলম্বে প্রতিপালিত হইল এবং রাজসভা ব্রাহ্মণে ভরিয়া গেল।—গল্প আছে, কৃষ্ণও নাকি একবার এইরূপে অনেকগুলি ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে বিশ্বামিত্রকে তবু তপস্যা করিতে হইয়াছিল। ইদানীং রাজপ্রসাদই যথেষ্ট।

বারাণসীর সন্নিহিত প্রদেশে ভুঁইহার ব্রাহ্মণদিগের জাতি সম্বন্ধেও লোকের সন্দেহ আছে। তাহারা বহুদিন অবধি কৃষিকার্য্য করিয়া আসিতেছে। এবং দেশীয় রাজশাসনে তাহাদিগকে কর দিতে হইত না।

এমনও দুএকটি বিবরণ শুনা যায় যে, এক প্রদেশের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় একই পূর্ব্বপুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয় দেয়। সে কালে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল বলিয়া যদি

ইহা সম্ভব হয় বলা যায় না। কিন্তু তাহা হইলেও হয় ব্রাহ্মণেরা, নয় সেখানকার ক্ষত্রিয়েরা বর্ণসঙ্কর।

বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের কথা কাহারও অবিদিত নাই। রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণদিগের আগমনের পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদের হীনতার সকল কারণ আমরা জানি না। অনেকে অনুমান করেন যে, দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের সহিত বিবাহাদিতে তাঁহাদের বিশুদ্ধতা নষ্ট হওয়াই ইহার কারণ।

উড়িষ্যায়ও দুই জাতীয় ব্রাহ্মণ দেখা যায়। এক জাতীয়কে দেখিলেই ব্রাহ্মণ বলিয়া বোধ হয়, অপর জাতি চাষ করে, মজুরী করে, নারিকেল বিক্রয় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে এবং তাহাদের আকারপ্রকারে ব্রহ্মণ্যের কণামাত্র আভাসও পাওয়া যায় না।

দাক্ষিণাত্যে ব্রহ্মণ্যের আরও দুর্দ্দশা। প্রবাদ আছে, পরশুরাম একবার ধীবরদিগকে জালের দড়ির পৈতা পরাইয়া ব্রাহ্মণ করিয়া লইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে আগত সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণেরা ইহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক রাখেন না। মালাবারে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ উপাধিধারীদিগের মধ্যে পরিবারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভিন্ন কনিষ্ঠদিগের বিবাহ নিষেধ। কিন্তু কনিষ্ঠেরা নায়ার কন্যাদিগের সহিত সহবাসে সন্তুষ্ট থাকে—এবং এইরূপে বিধি রক্ষিত হয়।

নায়ার ব্রাহ্মণদিগের আচার ব্যবহার এবং বিধিব্যবস্থায় তাহাদিগের অনার্য্য মূল সম্বন্ধে সংশয় থাকে না। পুত্রের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে ভাগিনেয় বিষয়ের অধিকারী।

দাক্ষিণাত্যে চোল ব্রাহ্মণেরা যে কত জাতির সম্মিশ্রণ বলা যায় না। এবং মাদুরায় কর্ম্মকারেরা অবধি আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়।

এমন কি, সমুদ্রপারে সিংহলেও এই ব্রাহ্মণীকরণের তরঙ্গ পহুঁছিয়াছিল বোধ হয়। মাদুরার রাজা উত্তর হইতে একবার আটচল্লিশ সহস্র অনার্য্যকে স্বরাজ্যে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাহাদের বংশধরেরা কৃষিকার্য্য করিত। এবং সিংহলে যদিও ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ কোনও নির্দ্দিষ্ট জাতি নাই, কিন্তু সেখানেও চাষী ব্রাহ্মণ নামেই ইহারা পরিচিত।

ব্রহ্মণ্যের এই সকল শাখাপ্রশাখা আলোচনা করিয়া হণ্টার সাহেব দেখাইয়াছেন যে, ইংরাজ আসিয়া যেমন জাতিভেদটা আইনবদ্ধ হইয়াছে, পূর্ব্বে এতটা ছিল না। ইহার মধ্যে মধ্যে অনেক ছিদ্র ছিল। এবং সেই সকল ছিদ্রপথ দিয়া কালে কালে অনেক সম্পূর্ণ বিজাতীয় শোণিত ব্রাহ্মণবংশে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এবং অনেক স্থলে সম্পূর্ণ এক হইলেও ব্রাহ্মণ এবং আর্য্য সর্ব্বত্র একার্থবাচক নহে। ['সাধনা,' ফাল্গুন ১২৯৯]

ইংরাজি বনাম বাঙ্গলা

দ্বাপর যুগে অভিমন্যু যেমন সপ্ত রথীর ব্যূহ ভেদ করিবার সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু নির্গমনের পথ বাহির করিতে পারেন নাই, কলি যুগে ইংরাজি শিক্ষায় নব্য বঙ্গেরও কতকটা সেই দশা—আমরা জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে সক্ষম, কিন্তু সেই জ্ঞান সাধারণ্যে প্রচার করিবার পথ খুঁজিয়া পাই না। ইংরাজি শিক্ষাও আবার শুধু জ্ঞানটুকু মাত্র দিয়াই ক্ষান্ত হয় না, স্বদেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্চারিত করিয়া দিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দেয়। কিন্তু বাল্যকাল হইতে মাতৃভাষায় কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়া তাহাতে নূতনলব্ধ জ্ঞান ব্যক্ত করা কঠিন হইয়া উঠে। হইয়াছে যেন নাবালকের বিষয়প্রাপ্তির মত ; অল্পস্বল্প ভোগ করা চলে, কিন্তু দানবিক্রয়ের ক্ষমতা নাই।

অনেকে সেই জন্য মনে করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা ভাষাটাকে কেবলমাত্র ঘরকন্নার কাজে লাগাইয়া, সাহিত্য এবং জ্ঞানালোচনার ভাষা ইংরাজি করিলেই কোন গোল থাকে না। তাহা হইতে বাঙ্গলা ভাষায় ভাব ব্যক্ত করিবার আর আবশ্যকই থাকে না। এবং শিক্ষার বিস্তারের সহিত অল্পে অল্পে ইংরাজি ভাষায় দেশ ছাইয়া ফেলে। এইরূপে প্রাদেশিক ভাষার বিলোপে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ঐক্যসাধনের পথও অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসে।

বাস্তবিক যদি ইহা সম্ভবপর হয়, হউক্ ;—শিশু বঙ্গভাষাকে সম্মুখে খাড়া করিয়া দিয়া ভারতবর্ষের উন্নতিস্রোত রোধ করিবার আমাদের কি অধিকার আছে ? কিন্তু ভারতবর্ষের উন্নতিসাধন যদি দেশের সর্ব্বসাধারণের উন্নতিকে বাদ দিয়া না হয়, তাহা হইলে বোধ করি, সাধারণপ্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাসমূহকে উপেক্ষা করিয়া কেবলমাত্র শিক্ষিতজনবোধ্য বিদেশীয় ভাষা অবলম্বনে বিশেষ সুবিধা হয় না। কারণ, শিক্ষাবলে সমাজের এক অংশ যে ভাবে গঠিত হইতে থাকে বিদেশী ভাষার কঠিন আবরণ ভেদ করিয়া অপর অংশে সে ভাবের প্রবাহ সহজে পঁহুছে না ; এইরূপে ভাষাভেদে সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবপ্রবাহসঞ্চার বন্ধ হইয়া গিয়া প্রত্যেক অঙ্গ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং সমগ্র সমাজদেহের সম্যক্ পুষ্টিসাধনের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

প্রাচীন ভারতে বিস্তৃত শূদ্রসমাজ যে ব্রাহ্মণজনোচিত জ্ঞানোপার্জ্জন হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল, সে কেবল মনুর বিধানগুণে নহে, কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় যে ভাব অনুশীলিত হয়, শিক্ষিতদের হৃদয়শিখর হইতে নামিয়া স্বাভাবিক নিয়মে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে নিঃশব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, এবং সম্যক্ আয়ত্ত না হইলেও সাধারণের উপর তাহার একটা মোটামুটি প্রভাব থাকিয়া যায়। কিন্তু সংস্কৃত তখন কেবলমাত্র সাহিত্যের ভাষা, শিক্ষিতের ভাষা ;

রাজসভায় পণ্ডিতেরা বসিয়া তাহার আলোচনা করিতেন, চতুষ্পাঠীতে ছাত্রেরা মিলিয়া অধ্যাপকের নিকট তাহার ব্যাকরণ শিক্ষা করিত; এখন যেমন ইংরাজি না জানিলে সমাজে প্রতিপত্তি হয় না, তখন সেইরূপ সংস্কৃত না শিখিলে সম্ভ্রম রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিত। সাধারণ লোকের সংস্কৃত ভাষার সহিত সুতরাং বড় একটা সংস্পর্শ ছিল না। তাহারা জ্ঞানরাজ্যের বাহিরে প্রচলিত ভাষায় তুচ্ছ প্রসঙ্গের মধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

কিন্তু বুদ্ধদেব আসিয়া যখন দেশের সর্ব্বসাধারণকে বাহু প্রসারণপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন, সম্ভ্রান্ত সংস্কৃত ছাড়িয়া তাঁহাকে পালির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। ফল হইল যে, ব্রাহ্মণশাসনের সংস্কৃত বেড়া কাজে লাগিল না, এবং দেখিতে দেখিতে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম ও ভাব বায়ুতাড়িত বহ্নিশিখার ন্যায় হুহু শব্দে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল।

চৈতন্যও যখন বাঙ্গলা দেশের গৃহে গৃহে প্রেমের ধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইলেন, প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে সংস্কৃতশাস্ত্র রচনা না করিয়া বঙ্গসন্তানকে তিনি তাহার মাতৃভাষায় আহ্বান করিলেন—নির্জ্জীব বঙ্গসমাজও আলোড়িত হইয়া উঠিল। এবং নবদ্বীপের সমস্ত শুষ্ক পাণ্ডিত্য সে বৈষ্ণব প্রেমের প্রবাহ রোধ করিতে পারিল না।

কেবলমাত্র শিক্ষিতবোধ্য ভাষা যতই সম্পূর্ণ এবং সম্ভ্রান্ত হউক না কেন, প্রেমের সহজ ভাষার নিকট তাহা চিরদিনই নিষ্ফল। প্রেমের ভাষা আমাদের মাতৃভাষা—মাতৃস্তন্যের সহিত প্রতি দিন যাহা পান করিয়া পিতৃপিতামহক্রমে আমরা বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছি।

বাঙ্গলা লেখকেরাও তাই বুদ্ধ এবং চৈতন্যের পদানুসরণ করিয়া স্বদেশীয় ভাষার মধ্য দিয়া একটা নূতন জীবনপ্রবাহ আনিয়া বঙ্গসমাজের সর্ব্বাঙ্গে একটা স্পন্দন সঞ্চার করিয়াছেন। তাহার ফলে আমাদের সাহিত্যে এখন অল্পে অল্পে আমাদের নবোদ্ভিন্ন জাতীয়তা অঙ্কুরিত এবং পল্লবিত হইয়া উঠিতেছে। সাহিত্য জীবনকে এবং জীবন সাহিত্যকে প্রতিদিন নিঃশব্দে গড়িয়া তুলিতেছে। এবং পরস্পরের সহায়তায় উভয়েরই স্থায়িত্বের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।

ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারে যাঁহারা প্রাদেশিক ভাষার বিনাশসম্ভাবনা কল্পনা করেন, তাঁহাদের সেই বহুযত্নপোষিত আশার বিরুদ্ধে এক প্রধান উদাহরণ এই নব্য বঙ্গসাহিত্য। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যখন গ্রাম্য বলিয়া বাঙ্গলা ভাষাকে উপেক্ষা করিতেন, ইংরাজিশিক্ষিতেরাই তখন বিদেশ হইতে জ্ঞান আহরণ করিয়া আনিয়া এই বঙ্গসাহিত্যের প্রাণসঞ্চার করেন এবং সেই ইংরাজিশিক্ষিতেরাই এপর্য্যন্ত অবিশ্রাম যত্নে ইহাকে পোষণ করিয়া আসিয়াছেন।

শুধু বাঙ্গলা দেশ বলিয়া নহে, ভারতবর্ষের যে যে প্রদেশে ইংরাজিশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে, সেইখানেই ইংরাজিশিক্ষিতদের যত্নে সাহিত্যবদ্ধ হইয়া প্রাদেশিক ভাষার

স্থায়িত্বলাভ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে ইংরাজি শিক্ষার বাতাসে সাহিত্যের নব নব অঙ্কুর উদ্গত হইয়া উঠিতেছে। তবে বাঙ্গলা দেশেই ইংরাজি শিক্ষার প্রথম সূত্রপাত হয়, সেই জন্য বঙ্গসাহিত্যই অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের তুলনায় অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে।

কিন্তু সর্ব্বত্রই যদি ইংরাজির শুভাগমনে দেশীয় সাহিত্যের এইরূপ অভ্যুদয় দেখা যায়, তাহা হইলে ইংরাজি শিক্ষাকেই প্রাদেশিক ভাষার উন্নতির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত বোধ হয় না। বাস্তবিকও তাহাই। ইংরাজি শিক্ষায় মানবহৃদয়ে ভাবপ্রকাশ ও জ্ঞানবিস্তারের যে আকাঙ্ক্ষা জন্মে, ইহা তাহারই অনিবার্য্য ফল। নহিলে, বাঙ্গলা সাহিত্যের সেবা করিয়া সুদূর যশোবিস্তার, রাজসম্মান বা অর্থাগমের কিছুমাত্র সুবিধা হয় না; এবং দেশের লোকেও ইংরাজি লেখককে যেরূপ সম্মানে পথ ছাড়িয়া দেয়, বাঙ্গলা লেখককে দেখিলে তাদৃশ সসঙ্কোচ সম্ভ্রম অনুভব করে না।

মনে করা যাক, এক সময় ইংরাজি ভাষাই দেশের বালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে প্রচলিত হইবে, কিন্তু সে দিন যে বহু দূরে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে দেশের যে বৃহৎ অংশ ইংরাজি না জানে, তাহাদের কি গতি হইবে? তাহারা কি জ্ঞানলাভের জন্য সেই দূর ভবিষ্যৎ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিবে? যাঁহারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহারা কখনই আপন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতাভগিনীদিগের প্রতি এত কাল উদাসীন হইয়া থাকিবেন না; তাঁহারা নিজে যাহা বুঝিতেছেন, অন্য লোককে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন এবং সেই চেষ্টাতেই দেশীয় সাহিত্য জন্মগ্রহণ করিবে এবং পরিপুষ্ট হইবে। এইরূপে দেশীয় সাহিত্যের যতই পরিণতি হইতে থাকিবে, বিদেশীয় ভাষা ও সাহিত্য দেশের আপামর সাধারণের মধ্যে স্থায়ী প্রতিষ্ঠালাভের আশা ততই সুদূরপরাহত হইবে। সংক্ষেপে বলিলে ইহা একটি স্বতোবিরোধী বচনের মত শুনিতে হইবে;—আমরা যত ইংরাজি শিখিব, ততই দেশী সাহিত্য বিস্তৃত হইবে, এবং দেশী সাহিত্য যতই বিস্তৃত হইবে. ততই ভবিষ্যতে ইংরাজি ভাষা ব্যাপ্তির ব্যাঘাত করিবে।

আরও, ইংরাজিকেই যদি কাহারও আদেশানুসারে আমাদের সাহিত্যের ভাষা করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলেই কি সাহিত্য সেই মহামহিমের আদেশ পালন করিবে? সে আশা দুরাশা মাত্র। ইংরাজি সাহিত্যের কোথাও আমাদের জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিবে না। তোতা পাখীর মত আমরা সে সাহিত্যকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু যে সাহিত্য স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের অন্তরের উত্তাপে আপনি ব্যক্ত হইয়া উঠে, তাহার প্রত্যেক কথার সহিত আমাদের জীবনের যেমন এক চিরন্তন নিগূঢ় যোগ থাকিয়া যায়, পরিপূর্ণ ইংরাজি সাহিত্যের সহিত আমাদের জীবনের সেরূপ

অবিচ্ছেদ্য যোগ সাধিত হওয়া অসম্ভব। কারণ, ইংরাজি সাহিত্য আমাদের জাতীয়তা বিকাশের ফল নহে, এবং দেশে, কালে, সকল বিষয়েই তাহা আমাদের সুখদুঃখের বাহির, সুতরাং স্বদেশীয় সাহিত্যের মত আমাদের জীবনগঠনে ইহার প্রভাবও তেমন অমোঘ নহে।

ইহা কেবলমাত্র কল্পনা নহে। ফরাসী ভাষায় সাহিত্যরচনা যখন জর্ম্মন দেশের প্রথা ছিল, তখনকার জর্ম্মনির সাহিত্য শুনা যায়, কেবলমাত্র ফরাসী সাহিত্যের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র—তাহার মধ্যে জীবনপ্রবাহ নাই, জর্ম্মন বল নাই, কেবল কতকগুলি পরিপাটি অনুকরণ এবং নির্ভুল ব্যাকরণলীলা। কিন্তু জর্ম্মনেরা যখন দেশীয় ভাষায় সাহিত্যানুশীলন সুরু করিল, তখন জর্ম্মনির গৌরবে য়ুরোপ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এখন এই ভারতবর্ষের দূর প্রান্তেও জর্ম্মন কবির গাথা শিক্ষিত জনের চিত্ত হরণ করে।

ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না করিলেও এ কথা স্বীকার করিতে হয় যে, ইংরাজি এদেশের সর্ব্বসাধারণের ভাষা হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। এবং য়ুরোপীয় ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহার অনুকূল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ফ্রান্স এবং স্পেন যখন রোমক শাসনের অধীন ছিল, তখন উক্ত দেশের ভদ্রসমাজের রোমীয় আচার ব্যবহারের সহিত লাটিন ভাষাও প্রচলিত ছিল, এবং রোমকেরা কখনও তত্তৎদেশের ভাষার উন্নতিসাধনের বিন্দু মাত্র চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু ফ্রান্স এবং স্পেনের ভাষা লাটিন হইল না—জাতীয় জীবনবিকাশের সহিত ধীরে ধীরে জাতীয় সাহিত্য মুকুলিত হইয়া উঠিল। গ্রীস যখন রোমের অধীনতা স্বীকার করে, তখন তাহার পূর্ব্বগৌরব কিছুই নাই, লাটিন ভাষা এবং লাটিন সাহিত্যই সর্ব্বত্র প্রবল এবং তৎকালীন গ্রীক লেখকেরা লাটিন লেখকদিগের তুলনায় অতি হীন, তথাপি লাটিন গ্রীকের স্থান অধিকার করিতে পারিল না। তাহার পরেও বহু বৎসরের তুরস্কশাসন গ্রীসকে নির্বীর্য্য করিয়া রাখিয়াছিল। এই শতাব্দীকাল মাত্র গ্রীস আপন লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত দারুণ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও পরাধীন গ্রীস আপন মাতৃভাষাকে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য যদিও গ্রীক সাহিত্যের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ নহে, তথাপি সে দ্রুতবেগে বাড়িয়া উঠিবে; কারণ, দেশের মাটির মধ্যে তাহার শিকড় আছে। স্কুল কালেজে একমাত্র ইংরাজিতেই শিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয় বটে, তাহার ফলে বঙ্গসন্তানের জীবনে তাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে না। কিন্তু দেশের ভাষা বাঙ্গলাই থাকিয়া যায়। বাহিরের কার্য্যক্ষেত্রে অনেক সময় ভাষণপ্রসঙ্গে কিম্বা পত্রব্যবহারে বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করিলেও বাড়ীতে আসিয়া মা, বোন, স্ত্রী কন্যার সহিত ইংরাজিতে স্নেহপ্রীতির আদানপ্রদান চলে না। এবং বিবাহের পূর্ব্বে বাঙ্গলা বই কিনিয়া পয়সা নষ্ট করিতে রাজি না হইলেও গৃহিণীর শুভাগমন হইতে অনেক ইংরাজিনবীশের বাঙ্গলা গ্রন্থের সহিত পরিচয়ও

সাধিত হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যের ভরসাও সেইখানে। বঙ্গসাহিত্য আমাদের অন্তঃপুরেই প্রতি দিন জীবনে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়া নিঃশব্দে দেশের সর্ব্বত্র তাহার অমোঘ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। ['সাধনা,' চৈত্র ১২৯৯]

উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র

ভূগর্ভের নিম্ন স্তরে যেমন বহিরুপদ্রব হইতে নিরালায় বহু পূর্ব্বতন যুগের কঙ্কালাবশেষ পাষাণ হইয়া থাকে, ভারতবর্ষের প্রাচীন ধর্ম্মবিপ্লব সেইরূপ বহিঃশত্রুর নিরন্তর আক্রমণ হইতে দূরে উড়িষ্যার উপকূলে পাষাণখোদিত হইয়া কথঞ্চিৎ রহিয়া গিয়াছে। সিন্ধুপার হইতে মুসলমান আক্রমণের বন্যা এত দূর প্রান্ত অবধি আসিয়া প্রায় পঁহুছিত না, এবং কাঠজুড়ি ও মহানদীর তীর হইতে মুসলমান সেনাকে দুই চারি বার এমন বিফলমনোরথ হইয়াও ফিরিতে হইয়াছে। অবশেষে উড়িষ্যা যদিও মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, তথাপি এই নদী-পাহাড়-বনজঙ্গলসমাকীর্ণ ভূখণ্ডের সর্ব্বত্র তাগার স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। মন্দিরে মন্দিরে দেবতাগণ মধ্যে মধ্যে লাঞ্ছিত হইয়াছেন এবং প্রাচীন কীর্ত্তিও দুএকটা বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সমস্ত দেবমন্দিরের পাষাণে মস্‌জিদের প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই।

সেই জন্যই উড়িষ্যা এখনও মন্দিরের দেশ। রাজধর্ম্ম যখন যাহা প্রবল হইয়াছে, আপনার উন্নত মহিমা প্রচার করিতে অভ্রভেদী পাষাণ-শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে, এবং এইরূপে ভারতবর্ষের বিলুপ্তপ্রায় পঞ্চবিংশতি শতাব্দী ভিন্ন ভিন্ন দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া পুরাতন দিনের জীবন-গৌরব রক্ষা করিতেছে। পুরীতে জগন্নাথ, ভুবনেশ্বরে শিব, যাজপুরে পার্ব্বতী, বিনায়কে গণেশ, কণারকে দেবতাহীন সূর্য্যমন্দির, খণ্ডগিরিতে পরিত্যক্ত বৌদ্ধ গুম্ফাবলী; নদীতীরে, গিরিশিখরে, সাগরবেলায়, যেখানে প্রকৃতি দেবী আপন সৌন্দর্য্য ঈষৎ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, সেইখানেই নীল দিগন্তের গায়ে হয় দেবালয়, নয় অনুশাসন-স্তম্ভ, নয় প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে; সমস্ত উৎকলদেশ যেন দেবতার বিহারভূমি এবং মানবের তীর্থক্ষেত্র।

ভারতবর্ষের বহু দূর প্রান্ত হইতে বহু সহস্র যাত্রী—বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য, নানা বিভিন্ন সম্প্রদায়—এই সকল প্রাচীন মন্দিরের দ্বারে আসিয়া নিত্য পুণ্য অর্জ্জন করিয়া যায়। বৈতরণী পার হইয়াই তাহারা মনে মনে যেন কোন্ পুণ্যলোকে উপনীত হয়—এখানে ব্রাহ্মণ নাই, শূদ্র নাই, উচ্চ নাই, নীচ নাই, ক্ষুদ্র জাতি, ক্ষুদ্র মান, ক্ষুদ্র গর্ব্ব এ রাজ্যের নহে।

সম্মুখে আম্রমুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরুষোত্তমের দ্বার অবধি প্রসারিত। এই পথ বাহিয়া চিরন্তন মানবপ্রবাহ নিশ্চল দেবতার দ্বারে আপন বেদনা জানাইতে আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নগনদী পথের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদু প্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। দূরে মেঘের মত নীল শৈলশ্রেণী কখনও ছায়াসুপ্ত কখনও রবিকিরণে উদ্ভাসিত।

বালুহন্তা হইতে অদূরে দেখা যায়, বিজন ধাউলির পাহাড়, শিরোদেশে প্রাচীন দেবমন্দিরের শ্যাম মুকুট। দেবতাহীন ব্রাহ্মণহীন মন্দিরে যাত্রী আর কেহ যায় না। পুরাতত্ত্বান্বেষী শুধু এই গিরিপাদমূলে দাঁড়াইয়া রাজা অশোকের পালি অনুশাসন পাঠ করিয়া আসেন, এবং প্রাচীনা দয়া নদী নিভৃত কল্লোলে সেই পুরাতন দিনের কাহিনী কহিয়া যায়—যখন এই একাদশ অনুশাসন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সমস্ত জনসমাজে জীবে অহিংসা এবং সর্ব্বভূতে দয়া প্রচার করিত।

আরও কিছু দূর গিয়া প্রাচীন শিল্পের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি ভুবনেশ্বর—আম্রকাননের মধ্য হইতে সমুচ্চ চূড়া উঠিয়াছে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত শৈব মতের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, ভুবনেশ্বর তাহারই সাক্ষিস্বরূপে দাঁড়াইয়া। কেশরী বংশ তখন উড়িষ্যার অধিপতি। ব্রাহ্মণ তাঁহাদের গুরু এবং শিব তাঁহাদের দেবতা। রাজা ললাটেন্দু কেশরী বৌদ্ধধর্ম্মকে আড়াল করিয়া খণ্ডগিরির সম্মুখ প্রদেশে ভুবনেশ্বরের দেবধানী স্থাপন করিলেন। সহস্র নাগবালা প্রস্তরস্তম্ভের বেষ্টনে শতপাকে চির-আবদ্ধ হইল—আবক্ষ নারীদেহের শিরোভাগে যেন মন্ত্রবলে অযুত ফণা পাষাণ হইয়া রহিল। শত দেব, শত দেবী, নব গ্রহ, নব রস, অযুত নরনারী, বিচিত্র পত্রপুষ্প, যৌবনবিলাসকলা পাষাণে চির-মুদ্রিত হইয়া নিশ্চল শিল্পসৌন্দর্য্যে দেশদেশান্তরের বিস্মিত নয়ন আকর্ষণ করিল। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা খণ্ডগিরির শিখরদেশ হইতে প্রতি দিন চাহিয়া দেখিতেন, এক একখানি করিয়া পাষাণের পর পাষাণ উঠিয়া তাঁহাদের প্রতি দিবসকে নিষ্ফল করিতেছে। একটির পর একটি, এমনি করিয়া সাত সহস্র মন্দির শির উত্তোলন করিয়া উঠিল। নিরাশহৃদয়ে সন্ন্যাসীর দল খণ্ডগিরি পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

আরও যোজন পথ অতিক্রম করিলে, সত্যবাদীতে বসিয়া নিরীহ সাক্ষীগোপাল পুরুষোত্তমযাত্রীর সংখ্যা গণিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। জগন্নাথদেবের প্রাপ্য অংশ হইতে তিনিও যৎকিঞ্চিৎ সঞ্চয় করেন।

পুরীর পথপার্শ্বে দূরে নিকটে এমনি মন্দিরের পর মন্দির। সারা পথ জুড়িয়া পাণ্ডার দল শিখা এবং উপবীত আস্ফালন করিয়া ফিরিতেছে এবং দূরাগত যাত্রিগণমধ্যে দুই হস্তে সুলভ আশীর্ব্বাদ বিতরণ করিয়া দুর্লভ তাম্ররজত সঞ্চয় করিতেছে। যাত্রীরও অন্ত নাই।

শকটের পর শকটপ্রবাহ—আবরণের ছিদ্রপথ দিয়া শত পশ্চিম-কুলরমণীর কুবলয়নেত্র, বঙ্গগৃহিণীর উজ্জ্বল স্নেহদৃষ্টি পথক্লিষ্ট পথিক জনের অন্তরে গৃহকাতর বেদনা জন্মাইয়া দেয়।

পুরুষোত্তমে আসিয়া এই দীর্ঘ যাত্রার অবসান। যাত্রিহৃদয়ের বহু দিনের যত্নযত্ন-পোষিত আশার প্রথম সফলতা। মন্দিরের মহা অন্ধকারমধ্যে ক্ষীণ দীপালোকে নিস্বদেহ জগন্নাথ ভগিনী সুভদ্রা ও ভ্রাতা বলরামের সহিত সিংহাসনে বসিয়া। দিবালোক সেখানে পঁহুছে না, সংসার রুদ্ধদ্বার ; শুধু ভক্তি এবং স্তুতি, বেদনা এবং আবেদন, নিরাশ হৃদয়ের ব্যাকুল ক্রন্দন এবং দুঃখগাথা সেখানে দেবতার সিংহাসনতলে নিত্য স্তূপাকার হয়। ব্রাহ্মণ নৈবেদ্য নিবেদন করেন, দেবতা প্রসাদ করিয়া দেন ; সেই মহাপ্রসাদ বাহিরে আসিয়া ব্রাহ্মণে চণ্ডালে, রাজা প্রজায়, স্ত্রী পুরুষে মিথ্যা উচ্চনীচ ভেদ ঘুচাইয়া দেয় এবং হৃদয়ে হৃদয়ে পুণ্য প্রীতি সঞ্চারিত করে।

এই জগন্নাথের মাহাত্ম্য বৃহৎ ভারতভূমিতে অদ্বিতীয়। তিনি শুধু ব্রাহ্মণের দেবতা নহেন, আচণ্ডাল সকলেরই তাঁহাতে সমান অধিকার। তিনি বিষ্ণুর অবতার, পতিতের পাবন, পরম অহিংসক ; তাঁহার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সর্ব্বদেশ সর্ব্বলোক একাকার। জাতিভেদময় ভারতবর্ষে জাতিভেদের এমন গুরুতর প্রতিবাদ আর কোথাও দেখা যায় না। এবং এই জাতিবিহীন মহাতীর্থে আসিয়া নানকী, কবীরী, প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী, নানা মতের নানা মুনি সেই একই জগন্নাথদেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হয়েন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, ভিন্নমতাবলম্বী সম্প্রদায়ের দেবতা অবধি জগন্নাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে স্থান লাভ করিয়াছেন এবং সেই বিমলা দেবীর দেবভোগ সম্বন্ধেও ব্যবস্থার ত্রুটি হয় নাই।

জগন্নাথের মাহাত্ম্যের কারণ ইহাই বটে। ইহার মধ্যে যে সর্ব্বগ্রাসী সামঞ্জস্যশক্তি আছে, তাহাতেই সকল সম্প্রদায় এখানে আসিয়া মিলিত হয়। জগন্নাথ বৈষ্ণব বলিয়াই সর্ব্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁহার মন্দিরে অনেক তন্ত্রাচারের বৈষ্ণবীকরণ হইয়াছে শুনা যায়। এবং ঘষা-জল ও মাসকলাই ভোগের ব্যবস্থা নাকি তান্ত্রিক কারণসলিল ও আমিষাশেরই বৈষ্ণব বিধান।

জগন্নাথদেবকে যাঁহারা উত্তমরূপে জানেন, তাঁহারা একবাক্যে জগন্নাথদেবের পরকে আপন করিবার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া থাকেন। কেমন দ্বিধাশূন্য মনে তিনি সুভদ্রা ও বলরামকে লইয়া বৌদ্ধ সংঘ-ধর্ম্ম-বুদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন। অধিক দিনের কথা নয়, চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনও বুদ্ধের দন্ত রথারোহণে মন্দির হইতে বাটিকান্তরে গিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহন করিয়া আসিত ; জগন্নাথ অসঙ্কুচিত চিত্তে আপনাকে বুদ্ধের দন্তমর্য্যাদার স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তিনি

সাধারণের দেবতা—এবং উড়িষ্যার জনসাধারণের সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, জয় পরাজয়ে, পলায়নে প্রত্যাগমনে, সকলের সহিত তিনিও চিরদিন আপন গুরু দেব-অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। লোকরঞ্জনার্থে ভিন্ন মতের বিধি বিধান দুই চারিটা আত্মসাৎ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন কিসের ?

কিন্তু শুধু জগন্নাথ বলিয়া নহে—উৎকলভূখণ্ডের সর্ব্বত্র মতবিরোধের মধ্যে একটা নির্ব্বিবাদ ঐক্যস্থাপনচেষ্টা দেখা যায়। বৈষ্ণবের পক্ষে শিবের মন্দির নির্ম্মাণ উড়িষ্যায় একটা মহাপুণ্যকার্য্য বলিয়া গণ্য। অথচ ভারতবর্ষের অপরাপর প্রদেশে বৈষ্ণবে শৈবে অনেক সময় মুখ-দেখাদেখি নাই। কাশীর সম্মুখ দিয়া যাইতে হইলে অনেক ধনী বৈষ্ণব নৌকার সমস্ত জানালা বন্ধ করিয়া দেন—পাছে দৈবক্রমে বিশ্বেশ্বরের মহিমা নেত্রপথে পতিত হয়, এবং রাধাকৃষ্ণের নামমাত্র কর্ণগোচর হইলে অনেক ভক্ত শৈব আহত বিষধরের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠেন !

উড়িষ্যার জগন্নাথের মন্দিরে শৈব দেবতা, শিবের মন্দিরে বৈষ্ণব নৃসিংহ। ভুবনেশ্বরে দোলযাত্রা সম্পাদিত হয়—তাহার প্রধান অনুষ্ঠান হরিহর-মূর্ত্তির দোলন। জন্মাষ্টমীর রাত্রিতে শিবের পাণ্ডারা শ্রীকৃষ্ণের পূজাও করিয়া থাকে, এবং ভুবনেশ্বর শিব আপন মন্দিরে বিষ্ণু অবতারের পূজা অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়া কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েন না। কিম্বদন্তী শুনা যায় যে, বিষ্ণুর আদেশানুসারেই শিব ভুবনেশ্বরে বাস করেন ; এবং এই কিম্বদন্তী স্মরণ রাখিয়া ভুবনেশ্বর-যাত্রীরা বিন্দুসরোবরে স্নান করিয়া প্রথমেই পুরুষোত্তম বিষ্ণুদেবকে প্রণাম করিয়া আসে।

দেবতায় দেবতায় এইরূপ সদ্ভাব থাকায় বিভিন্ন মন্দিরের বিচিত্র অনুষ্ঠানসকলের মধ্যেও আদানপ্রদান চলে। প্রাবর্ণোৎসবে ভুবনেশ্বর গ্রীষ্মবস্ত্র ত্যাগ করিয়া শীতবস্ত্র পরিধান করেন, পুরুষোত্তমে ইহারই অনুরূপ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া জগন্নাথদেবের দেহে শীতবস্ত্র উঠে ; ভুবনেশ্বরের পুষ্যাযাত্রা, জগন্নাথদেবের অভিষেক ; ভুবনেশ্বরে শয়ন-চতুর্দ্দশী, জগন্নাথে শয়ন-একাদশী ; ভুবনেশ্বর এবং জগন্নাথ উভয়েরই সেই চন্দনযাত্রা, সেই মকরসংক্রান্তি, ভৈমী একাদশী এবং গুণ্ডিচাশ্রম গমন ও মন্দিরে প্রত্যাগমন বিধি।

কণারকের সূর্য্যমন্দিরেও এই রথযাত্রার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কপিলসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, অর্কক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রথযাত্রা দর্শন করিলে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ হয়। আরও, এখানে সকল দেবতার উপাসনাবিধি আছে এবং যে ব্যক্তি যে লোকে যাইতে চায়, তাহারও বাধা নাই—কেবল দিন ক্ষণ দেখিয়া দেবতাবিশেষকে ডাকিলেই হইল। অমুক দিন মহোদধিতে স্নান করিয়া যে রামেশ্বরকে পূজা করে, রামচন্দ্র তাহার অভীষ্টসাধনে সহায়তা করেন ; মহেশ্বরের চরণে ভক্তিপূর্ব্বক নৈবেদ্য নিবেদন করিলে

শিবলোক প্রাপ্তি হয়; বিখ্যাত অর্কবটমূলে বসিয়া যে ভক্ত বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে, বিষ্ণু তাহার প্রতি সদ্য প্রসন্ন হয়েন।

পৌরাণিক বর্ণানুসারে এই অর্কক্ষেত্রে বিষ্ণুর পদ্ম পড়িয়াছিল; সেই জন্য ইহার আর এক নাম পদ্মক্ষেত্র। পুরাণরচয়িতা উড়িষ্যার চারি ক্ষেত্রে বিষ্ণুর চারিটি স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিয়াছেন :—কণারকে পদ্ম, পুরীতে শঙ্খ, ভুবনেশ্বরে চক্র এবং যাজপুরে গদা। বিষ্ণুদেব গয়াসুরকে বধ করিয়া গয়ায় স্বীয় পদচিহ্ন এবং উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আপন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম রাখিয়া যান। তন্মধ্যে চক্রক্ষেত্র ও গদাক্ষেত্র হরপার্ব্বতীর এলাকা। কিন্তু তাহাতে এ পর্য্যন্ত কোনও গোল উঠে নাই।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সন্দেহ হয় যে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম্মের একটু বিশেষ প্রভাব হইয়াছিল এবং হয় ত তাহারই ফলে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, সৌরদিগের মধ্যে বিরোধ অন্তর্হিত হইয়া কালক্রমে অনেকটা ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছে। এক হইতে পারে, বৌদ্ধ মতের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় পরস্পরের সহিত বিরোধ ত্যাগ করিয়া এক হইয়াছিল; আর এক হইতে পারে, সকল সম্প্রদায়ই যেখানে যতটুকু আবশ্যক বোধ করিয়াছে, বৌদ্ধ মত ও অনুষ্ঠান হরণ করিয়া লইয়া আপন আপন দেহের পুষ্টিসাধন করিয়াছে, এবং এইরূপে স্বভাবতই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সংযত হইয়া আসিয়াছে।

যেমন করিয়াই হউক, হয় বৌদ্ধধর্ম্মের ব্রাহ্মণীকরণে, নয় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বৌদ্ধীকরণে, কিম্বা উভয়েরই সংযোগে, উড়িষ্যায় যে হিন্দুধর্ম্ম একটা নূতন আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এবং পদ্মার প্লাবনে যেমন সমস্ত আল ভাঙ্গিয়া গিয়া ভিন্ন ভিন্ন জমির সীমানা মিশাইয়া যায়, এই ধর্ম্মবিপ্লবে সেইরূপ উড়িষ্যার ভিন্ন ভিন্ন দেবতার এলাকার ব্যবধান ভাঙ্গিয়া গিয়া একসা হইয়া গিয়াছে—কতটুকু কাহার অধিকার, নির্ণয় করা সুকঠিন।

মন্দিরে মন্দিরে পাষাণে খোদিত সহস্র আধা-মঙ্গোলীয় ছাঁচের বৌদ্ধ মূর্ত্তি। কোন কোন স্থলে হিন্দু দেবদেবীও যেন বৌদ্ধ ছাঁচে ঢালাই হইয়া বাহির হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হয়। জগন্নাথের মূর্ত্তি, চক্র, রথযাত্রা, জাতিভেদবিহীনতা যখন বৌদ্ধ প্রভাবেরই অবশেষ, তখন মন্দিরের স্থাপত্যে কিম্বা ভাস্কর্য্যে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হইবে, ইহাতে বিচিত্র কি? যোগাসীন শিব যখন বৌদ্ধ রথযাত্রা উৎসবে বিচলিত হইয়া গুণ্ডিচাশ্রমে অবস্থিতির লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, তখন ভুবনেশ্বরের স্থাপত্য বৌদ্ধ দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে, ইহাতেই বা বিস্মিত হইবার কি আছে?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শুষ্ক নীতিধর্ম্মের মধ্য হইতে এমন বিলাসকলা স্ফূর্ত্তি পাইল কিরূপে? উড়িষ্যার মন্দিরে যে সমস্ত চিত্র খোদিত হইয়াছে, তাহা বিলাসভাবময় ত বটেই, এবং অনেক স্থলে বিলাস শ্লীলতাকে লঙ্ঘন করিয়া আপন নগ্ন শৃঙ্গার-সৌন্দর্য্য ব্যক্ত করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে নাই।

বৌদ্ধ স্থাপত্যে এই বিলাসপরায়ণতার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া প্রথমেই যাহা চোখে পড়ে, তাহা এই যে, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার আদিম বিশুদ্ধতা নষ্ট হইয়া গিয়া চতুর্দ্দিকের পৌরাণিক আখ্যায়িকা ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সে রূপান্তরিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং গ্রীকদিগের সহিত ঘনিষ্ঠতায় কল্পনাকে পাষাণে বাঁধিবার আকাঙ্ক্ষাও সম্ভবতঃ তখন সমধিক উদ্দীপিত হইয়াছিল। বাস্তবিক, ভুবনেশ্বরের দেয়ালে কতকগুলি উন্নতগ্রীবা দীর্ঘাবয়বা নারীমূর্ত্তি দেখিলে এমনি য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালা বোধ হয় এবং কোন কোনটির ভঙ্গী এমনি য়ুরোপীয় যে, গ্রীক প্রভাব অস্বীকার করিতে বিস্তর চেষ্টার আবশ্যক করে। বিশেষতঃ যখন পার্ব্বতীমূর্ত্তির সন্নিহিত নিভৃত কোণে কলানিপুণা রমণীগণমধ্যে সহসা গ্রীসীয় লায়র-যন্ত্রহস্তা নারীমূর্ত্তি দেখা যায়, তখন চমকিয়া উঠিতে হয়—এ কি গ্রীস, না ভারতবর্ষ!

ভারতবর্ষে যে তখন গ্রাকদিগের গতিবিধি ছিল, তাহার সপক্ষে বিস্তর প্রমাণ আছে। রাজা অশোকের পালি প্রস্তরলিপিতে গ্রীক অন্তিয়োকসের নাম পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় গ্রীকেরা অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নূতন ধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচার করিতেও বাহির হইয়াছিলেন, ইতিহাসে এরূপ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং এক দিকে ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিকী কল্পনা এবং অন্য দিকে গ্রীক সৌন্দর্য্যচর্চ্চা মিলিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে যে তাহার শুষ্ক নীতি-সিংহাসন হইতে টানিয়া আনিয়া স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে সাধারণের মনোরম করিয়া তুলিয়াছে, ইহাতে সংশয়ের বিশেষ কিছুই নাই। এবং এইরূপে সাধারণের মনে মুদ্রিত হইয়াই যে তাহা কালক্রমে রূপান্তরিত আকারে সর্ব্বশরণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে, ইহাও নিতান্ত অমূলক বোধ হয় না।

এমনি করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম হইতে পরিপুষ্ট হইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে আবার পরিপুষ্ট করিয়াছে। আপনাকে সর্ব্বসাধারণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পৌরাণিকতার সহায়তা গ্রহণ তাহার আবশ্যক হইয়াছিল, আবার আপনি যখন দেশান্তরিত হইল, প্রাচীন পৌরাণিকতাকে আরও পৌরাণিক করিয়া দিয়া গেল। এখন খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন—কোন্ অবধি ব্রাহ্মণ্য এবং কোন্ অবধি বৌদ্ধ সীমা।

হিন্দুধর্ম্ম এমনি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং এখনও ইহার গঠনকার্য্য শেষ হয় নাই। উড়িষ্যার দেবক্ষেত্রে যেন ইহার আদিম অনুষ্ঠান হইতে চরম অভিব্যক্তি পর্য্যন্ত গায়ে গায়ে

মিশিয়া পুঁটুলি পাকাইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া শুনিয়া যেন কতকটা বুঝা যায়, নির্গুণ ব্রহ্ম, সগুণ ব্রহ্ম, কর্ম্মফল, জ্ঞান মোক্ষ, ভক্তি মুক্তি, দর্শন এবং কাব্য চতুর্দ্দিক্ হইতে আসিয়া কেমন করিয়া মিশিয়াছে, এবং বুদ্ধি যাহার মধ্য দিয়া বাঁধা পথ বাহির করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে, আমাদের নিরক্ষর সাধারণের হৃদয়ে সেই সকল বিরোধী মতের মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য স্থাপিত হয়। ['সাধনা,' বৈশাখ ১৩০০]

সাময়িক সারসংগ্রহ

আকবরের স্বপ্ন

কাশ্মীরের কোনও মন্দিরের জন্য রচিত আবুল ফজলের একটি প্রস্তরলিপি পাওয়া গিয়াছে :—

হে ঈশ্বর, প্রত্যেক মন্দিরেই আমি সেই সাধুগণের দর্শন লাভ করি, যাঁহারা তোমাকে দর্শন করেন, এবং যত ভাষা আমার শ্রুতিগোচর হয়, সকল ভাষাতেই ভক্তগণ তোমারই যশোগান করিয়া থাকেন।

বহুদেববাদ এবং ইস্‌লাম তোমাকেই অনুভব করিতে ব্যাকুল।

সকল ধর্ম্মই বলে, তুমি এক এবং অদ্বিতীয়।

মস্‌জিদে ভক্তগণ তোমারই পুণ্য নমাজ উচ্চারণ করেন, এবং খ্রীষ্টান ভজনালয়ে তোমার প্রতি প্রেম হইতেই মধুর ঘণ্টাধ্বনি নিনাদিত হয়।

আমি কখনও বা খ্রীষ্টানদিগের গির্জ্জায় যাই, কখনও বা মস্‌জিদে বিচরণ করি।

কিন্তু মন্দির হইতে মন্দিরে আমি কেবল তোমার সন্ধান করিয়াই ফিরি।

তোমার অন্তরঙ্গেরা নব্য ধর্ম্ম বা পিতৃধর্ম্ম লইয়া কালক্ষয় করেন না; কারণ, তোমার সত্যের পশ্চাতে উভয়ের কোনটিই স্থান পায় না।

নব্যপন্থীর জন্য নব্য মত আছে এবং প্রাচীনপন্থীর জন্য পিতৃধর্ম্ম আছে; কিন্তু গোলাপ-পুষ্পের রেণু—সে কেবল গন্ধব্যবসায়ীর হৃদয়ের ধন।

এই প্রস্তরলিপি অবলম্বন করিয়া ইংলণ্ডের রাজকবি টেনিসন "আকবরের স্বপ্ন" নামে একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর সম্প্রতি উক্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

আবুল ফজল আকবরের প্রিয় সুহৃৎ ও প্রধান সভাসদ্। অবসর পাইলেই দুই জনে বিজনে বসিয়া ধর্ম্মালাপ করিতেন। দুই জনের হৃদয় এক ছিল, ধর্ম্ম এক ছিল, লক্ষ্য এক

ছিল এবং ভারতবর্ষের ঐক্যসাধনেই উভয়ে দেহপাত করিয়াছেন। সম্রাটের প্রিয় বলিয়া গোঁড়া মৌলবীরা আবুল ফজলের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, এই হতভাগ্য সভাসদ্ মৌলবীদিগের সনাতন পদপর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া সম্রাট্‌কে নিরন্তর বিপথে লইয়া যাইতেছে। ফতেপুর-শিকরীর ইবাদতখানায় প্রতি বৃহস্পতি বার রাত্রিকালে নানা সম্প্রদায়ের পণ্ডিতেরা একত্র হইয়া বাদ্‌শাহের সম্মুখে ধর্ম্মবিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেন; পণ্ডিতে পণ্ডিতে তুমুল তর্কবিতর্ক হইত; পরাস্ত হইলে মৌলবীরা আবুল ফজলকে অভিশাপ দিতেন এবং সুবিধামত সেলিমের হৃদয়ে পিতৃদ্রোহ উদ্রেক করিয়া দিতে ত্রুটি করিতেন না।

এই সঙ্কীর্ণ স্বদেশীয় পাণ্ডিত্যের জ্বালায় আবুল ফজল অস্থির হইয়া উঠিয়াছিলেন। অজ্ঞ গোঁড়ামির দম্ভ তাঁহার যেমন অসহ্য বোধ হইত, এখানে তেমনি তাহারই মহাধিপত্য। তিনি নিজমুখেই বলিয়াছেন যে, মঙ্গোলিয়ার জ্ঞানিগণ কিম্বা লেবাননের সাধুদিগের দর্শনলাভের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত, তিব্বতের লামা কিম্বা পর্ত্তুগালের পাদ্রীর সাক্ষাৎ পাইলে তিনি আপনাকে ধন্য মনে করিতেন, এবং জেন্দাবেস্তা পণ্ডিতগণের সহিত একত্র বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ বোধ হইত; কিন্তু এই স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের প্রসঙ্গ শুনিলে তাঁহার গায়ে জ্বর আসিত।

আবুল ফজলকে বুঝিয়াছিলেন কেবল আকবর, এবং আকবরকে যদি কেহ সম্পূর্ণ বুঝিয়া থাকেন ত পণ্ডিত আবুল ফজল। কবি টেনিসন দুই মহৎ হৃদয়ের এই নিভৃত সমবেদনাটুকু দিয়াই তাঁহার "আকবরের স্বপ্ন" রচনা করিয়াছেন।

দৃশ্য ফতেপুর-শিকরী। রাত্রিকাল। প্রাসাদসম্মুখে বিষণ্ণমুখ সম্রাট্ আকবর, পার্শ্বে বিশ্বস্ত মন্ত্রী আবুল ফজল। ফজল জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে পৃথিবীপতি, আজ আপনাকে এত বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন?" আকবর একবার দূর নক্ষত্রালোকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আবুল ফজলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"ঠিক বুঝিয়াছ ফজল, যে দারুণ দুঃস্বপ্ন আমার হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, মুখে তাহারই কালো ছায়া। জানি, স্বপ্ন শুধু বিম্বের মত ক্ষণিক বিড়ম্বনা; কিন্তু তবু প্রার্থনা করি, হে ঈশ্বর, এ স্বপ্ন যেন সত্য না হয়। প্রার্থনা এবং সাধনা—জীবনে প্রার্থনার অবিচলিত অনুসরণ—ইহাই উপাসনা। যে প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম না থাকে, মৃতবৎসা প্রসূতির ন্যায় ঈশ্বরের চক্ষে তাহা নিষ্ফল। তাই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্বপ্ন যাহাই বলুক, আমি ন্যায়াচরণ করিতে বিরত থাকিব না—যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এই বাহু শাণিত অসি ধরিয়া বিপুল সাম্রাজ্য জয় করিয়াছে, বিজয়লব্ধ বসুন্ধরায় অক্ষয় শান্তি স্থাপন করিয়া সে সেই উদ্দেশ্য সফল করিবে। ঈশ্বর সহায় হউন।

"আর তুমি যত ক্ষণ আমার সহিত একহৃদয়, আমি এখানেও একক নহি ; এবং এমন ভরসা রাখি যে, কেবল রাজমুকুট রচনা না করিয়া তোমার সাহায্যে এমন একটি সুন্দর মুকুট রচনা করিতে পারিব, যাহা বিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, জৈন, পারসী, সকলেরই শিরোভূষণ হইবে।

"কিন্তু হায়, ঈশ্বরের প্রেমের অক্ষর কেহ বুঝে না। অজ্ঞ নর না তাঁহাকে বুঝে, না আপনাকে জানে। সকলেই সম্প্রদায় বাঁধিয়া চীৎকার করে, 'আমিই একমাত্র সত্যের পথ পাইয়াছি, আর সকলেই জাহান্নমে চলিয়াছে।'

"গোলাপ তবে পদ্মকে ডাকিয়া বলুক, 'তুমি ফুল নহ—ফুল একমাত্র আমি।' মাধবী তরুলতাকে বলুক, 'আমিই সুন্দর—তুমি বিড়ম্বনা।' আম্র অন্য ফলকে বলুক, 'পরমেশ্বর আমাকেই মানবের ভোগের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন—তোমরা কে হে বাপু ?' প্রত্যেক তারা বলিতে থাকুক, 'স্বর্গে আমিই একা।'

"পিঞ্জর যতই সঙ্কীর্ণ হয়, গোঁড়ামির গর্জ্জন ততই গুরুতর। আমাদের পণ্ডিতেরা তাই পালঙ্কে শয্যা রচনা করিয়া অহর্নিশি অন্যের নরকযন্ত্রণাই দেখিতে পান। যত বলি, ঈশ্বরের রাজ্যে অশুচি কেহ নাই, ভ্রূকুটিকুটিলমুখ ততই আমার প্রতি তীব্র অভিসম্পাত বর্ষণ করে। সিংহাসনতলে বসিয়া পাণ্ডিত্য আস্ফালন করিয়া মরে, আমি দেখি—যেখানে জল অল্প, সেইখানেই তোড় প্রবল। মহাসমুদ্রের গম্ভীর উচ্ছ্বাস এখানে শুনা যায় না।

"যখন মনে করি, এই দিল্লীর সিংহাসন পরধর্ম্মের উচ্ছেদমানসে বলপ্রয়োগ করিয়া আপনাকে কলঙ্কিত করিতে লজ্জা বোধ করে নাই, তখন লজ্জায় আমার শির নত হইয়া পড়ে। কাফের শব্দই আমার কর্ণে বজ্রধ্বনি। যে যেরূপ বুঝে, আপন আপন ধর্ম্ম পালন করুক। আমি বিধর্ম্মকে রাজস্ববৃদ্ধির কারণ করিতে চাহি না। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ—সেই প্রেমস্বরূপের মঙ্গল ইচ্ছা সম্পাদনই আমার জীবনের কার্য্য। ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠান লইয়া বিবাদ করা বালকেরই শোভা পায়। বাহ্যানুষ্ঠান ত বেশভূষার মত। কেহ বা ঢিলা কাপড় পরে, কেহ বা আঁটসাঁট ভালবাসে। প্রেমেই আমি মানবে মানবে একতা সম্পাদন করিতে চাহি।

"স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, পাথরের উপর পাথর চাপাইয়া আমি যেন সেই প্রেমের মিলনমন্দির গঠন করিয়া তুলিয়াছি। সেখানে সত্য এবং প্রেম এবং ন্যায় এবং শান্তি বিরাজ করিতেছে।

"কিন্তু এ কি ! আমারই প্রাণের পুত্র সেলিম একটির পর একটি করিয়া পিতৃমন্দিরের সমস্ত পাষাণ খসাইয়া ফেলিতেছে। যেন শুনিতে পাইতেছি, সেই ধ্বংসাবশেষ হইতে সহস্র কাতর ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে বিলাপ করিতেছে।

"হায় মন্ত্রি, এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি আমার চিত্ত বড় অধীর।—কিন্তু এই দুঃস্বপ্নের শেষে একটু যেন আশার আভাস ছিল। দেখিলাম, দূর হইতে কোন্ এক অপরিচিত জাতি আসিয়া আমার সেই জীর্ণ মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিল এবং যে কার্য্য আমি সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই, ধীরে ধীরে তাহা সুসম্পন্ন করিল।

"পরমেশ্বর ধন্য—তিনি কাহার দ্বারা কি উদ্দেশ্য সাধন করেন, কে জানে।"

দেখিতে দেখিতে প্রভাত হইয়া আসিল। আকবর ও আবুল ফজল পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব প্রাসাদে গমন করিলেন। টেনিসনের কাব্য সমাপ্ত হইল।
['সাধনা,' বৈশাখ ১৩০০]

খণ্ডগিরি

ভুবনেশ্বরের শিবালয় হইতে ক্রোশেক পথ অগ্রসর হইলেই একাম্রক্ষেত্রের বিক্ষিপ্ত আম্রকুঞ্জের মধ্য হইতে সহসা দুইটি গিরিখণ্ড শির উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে দেখা যায়। দুইটি একই পাহাড় এবং সাধারণতঃ খণ্ডগিরি নামেই অভিহিত—মধ্যে কেবল একটি মাত্র নিম্ন পার্ব্বত্য পথ ব্যবধান হইয়া এই গিরিখণ্ডকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে, নাম হইয়াছে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি। উড়িষ্যার যেখানে যে মন্দির স্থাপিত হইয়াছে, খণ্ডগিরি তাহার প্রাচীর রচনায় আপন প্রস্তর দান করিয়াছে এবং আপন বক্ষকোটরে এক কালে সংসারত্যাগী বৌদ্ধ তাপসদিগকে আশ্রয় দিয়াছে; এখনও প্রস্তরে খোদিত সেই শূন্য গুম্ফাবলী শৈলপটে প্রাচীন ইতিহাসের অক্ষর লিখিয়া রাখিয়াছে।

বহু পুরাতন দিনে স্বাধীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এইখানে গুহাবাসে থাকিয়া নিভৃতে ধর্ম্মালাপে কাল যাপন করিতেন। তখনও ভুবনেশ্বর মস্তক তুলিয়া উঠে নাই এবং একাম্র-ক্ষেত্রে শিব আসিয়া বাস করেন নাই; একদিকে ধবলগিরি অনতিদূর জনস্থানের শিরোদেশে অশোকের অনুশাসন হৃদয়ে ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অন্য দিকে নিবিড় অরণ্যানীর পশ্চাতে নীলাদ্রিশ্রেণীর উন্নত প্রাচীরে দৃষ্টি প্রতিহত হইত; সম্মুখে ভুবনেশ্বরের স্থানে কুটীর-প্রাসাদ-সমাচ্ছন্ন বৌদ্ধ লোকালয়—প্রতি প্রভাতে সেইখানে গিয়া নিঃসম্বল সন্ন্যাসীরা দিবসের অন্ন ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেন।

খণ্ডগিরি গুহায় গুহায় পরিপূর্ণ। মানবের বুদ্ধি পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া ক্ষুদ্র গিরিখণ্ডকে আপন বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে—তলার উপর তলা, ঘরের পর ঘর, বারান্দায় বিচিত্র আকারের গিরিকর্ত্তিত স্তম্ভ এবং স্তম্ভের শিরোদেশে ব্র্যাকেটাকারে

উন্নতবক্ষ নারীদেহ পাষাণ-ছাদভার বহন করিতেছে। দেয়ালেও মধ্যে মধ্যে নানা মূর্ত্তি খোদিত—নর নারী, সৈনিক প্রহরী, যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রমোদ বিলাস, হয় ত কোনও প্রাচীন বৌদ্ধ উপাখ্যানের অবশেষ, কোথাও বা বিশেষ একটা চিহ্ন মাত্র।

বৌদ্ধ রাজা ও রাণীরা সন্ন্যাসীদিগের জন্য বহু ব্যয়ে এই সকল চারু শিল্পরচিত গুহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখনও রাণীগুম্ফা একজন বৌদ্ধ রাণী-সন্ন্যাসিনীর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। বৌদ্ধ যাজকেরা খণ্ডগিরির শিখরদেশে দাঁড়াইয়া প্রতি দিন সন্ধ্যাকাশে গম্ভীর স্বরে সংঘ, ধর্ম্ম ও বুদ্ধের শরণমন্ত্র ধ্বনিত করিতেন; গিরিপ্রাঙ্গণ হইতে মধুর নিনাদে সান্ধ্য ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইত; গুহায় গুহায় দীপালোকে ধূপগন্ধে একটা মহা আনন্দ জাগিয়া উঠিত। ধবলগিরিশৃঙ্গ হইতে অপর সন্ন্যাসীর দল এই উৎসব-আনন্দে যোগদান করিতেন; সেখান হইতেও সংঘ ধর্ম্ম বুদ্ধ নাম উত্থিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তরের শৈলশিখরে প্রতিধ্বনিত হইত।

সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তখন উড়িষ্যায় ধর্ম্মগুরু। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সহিত সর্ব্বত্রই তাঁহাদের প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ধর্ম্মবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে লোকে তাঁহাদের নিকট আসিয়া মীমাংসা প্রার্থনা করে; কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সন্ন্যাসাশ্রমে দুষ্কৃত খণ্ডনের উপায় অনুসন্ধান করিতে আসে। কর্ম্মফলবাদ যত বলে—দুষ্কৃতের ফল দুঃখ অনিবার্য্য, দুর্ব্বল মানবহৃদয় সান্ত্বনা মানে না—দুর্ব্বলতাকে দমন করিতে না পারিলেও দুঃখ হইতে সে অব্যাহতি চায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা দেখিলেন, জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে সান্ত্বনা দিতে অক্ষম, মানবের প্রতি পদস্খলনে অবিচলিত দণ্ডহস্তে সে কেবল কর্ম্ম এবং ফলের মধ্যে অমোঘ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করে; লোকে নিরাশ হইয়া পড়ে। তাঁহারা সহজ বিধি দিলেন, যাজকমণ্ডলীসমীপে দুষ্কৃত স্বীকার করিলেই পাপ হইতে মুক্তি। ইহাতে কর্ম্মফলও টলিল না, মুক্তিও সুলভ হইয়া আসিল। কর্ম্মফল যেন সহসা এই নূতন প্রায়শ্চিত্তবিধি আবিষ্কার করিল। মুক্তিলাভের সহজ উপায় দেখিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে এই পথ অবলম্বন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীরা মালাজপের ব্যবস্থা দিলেন, আশীর্ব্বচনের অমোঘতা প্রতিপন্ন করিলেন এবং স্থলবিশেষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রও দিতে লাগিলেন; ক্রমে দাঁড়াইল এই যে, এক দিকে বুদ্ধগণ, অন্য দিকে অজ্ঞান মানব, এবং মধ্যে যাজকমণ্ডলী সেতুস্বরূপ। এইরূপে স্পষ্টতঃ না হইলেও নিঃশব্দে বৌদ্ধধর্ম্ম জ্ঞানমার্গচ্যুত হইয়া ব্রাহ্মণ্যের তন্ত্রজালে জড়িত হইয়া পড়িল। যেখানে কর্ম্মফলের একমাত্র অধিকার ছিল, সেখানে দেবপ্রসাদবৎ একটা অনুগ্রহলিপ্সার ভাব অল্পে অল্পে ব্যক্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে অনুষ্ঠান যত বাড়িতে লাগিল, ব্রাহ্মণ্যের সহিত ঘনিষ্ঠতাবৃদ্ধি সহকারে প্রাচীন বৌদ্ধ সরলতা বিলুপ্ত হইয়া আসিল। এবং ব্রাহ্মণ্য যখন যথাবশ্যক বৌদ্ধাচারকে

স্বীয় অঙ্গভুক্ত করিয়া লইতে আপত্তি করিল না, তখন এদেশে বৌদ্ধ মতের বিশেষ সার্থকতা রহিল না—বৌদ্ধধর্ম্ম দেশান্তরিত হইয়া গেল।

যেখানে যেখানে বৌদ্ধ মঠ ছিল, ব্রাহ্মণ মঠধারী গিয়া সেখানে শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করিলেন। স্থানে স্থানে বৌদ্ধ মঠে হিন্দু দেবদেবীরও প্রতিষ্ঠা হইল। খণ্ডগিরি বাদ গেল না। গণেশ আসিয়া একটি গুম্ফা অধিকার করিয়া বসিলেন। এবং গিরিপাদমূলে বাসা বাঁধিয়া বৈষ্ণব বাবাজী এক ধার হইতে বৌদ্ধ মূর্ত্তির হিন্দু নামকরণ সুরু করিয়া দিলেন। খণ্ডগিরিও সময়ে অসময়ে দুই চারি জন যাত্রীর তীর্থদর্শনস্পৃহা চরিতার্থ করিল।

পথের পাথরকে সিন্দূর দিয়া যাহারা দুই বেলা পূজা করিয়া থাকে, তাহাদের সেই ভক্তি-উন্মুখ হৃদয় খণ্ডগিরির আশ্চর্য্য গুম্ফাবলী দেখিয়া দেবপ্রভাব অনুভব করিবে না ত কি? ব্রাহ্মণেরা আবার বুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার করিয়া লইয়াছেন, সুতরাং বৌদ্ধ মূর্ত্তি লইয়া যদি বা কোন কালে গোলযোগ উঠিবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাও মিটান হইয়াছে। আর আমাদের দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বহু কাল হইতেই নানা বিভিন্ন মত পরিপুষ্ট হইয়া মনটিকে এমনি করিয়া তুলিয়াছে যে, সকল বিরোধের মধ্যেই সেখানে নির্ব্বিবাদে কেমন একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া আসে। কর্ম্মফলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়াও আমাদের দেবভক্তি কিছুমাত্র বিচলিত হয় না; বিশ্বসংসারকে মায়া এবং মোহ বলিয়া উড়াইয়া দিই, আবার সমস্ত বিশ্বে দেবতার আবির্ভাব দেখিয়া, তরু লতা গুল্ম হইতে সর্ব্বলোকে মায়াতীত বিশ্বেশ্বরের মহতী মঙ্গল-ইচ্ছার বিকাশ অনুভব করিয়া প্রেমে অভিভূত হইয়া পড়ি; দেবতা এক এবং অদ্বিতীয় জানিয়া ইতর বস্তুর পূজা নিষ্ফল বলিয়া বুঝি, আবার প্রতি ক্ষুদ্র পাষাণখণ্ডের চরণে নৈবেদ্য নিবেদন না করিয়া থাকিতে পারি না; দ্বৈতবাদ অদ্বৈতবাদকে সমানভাবে অন্তরে স্থান দিয়া থাকি; ব্রহ্মকে নির্গুণও বলি, সগুণ জানিয়াও পূজা করি; যেখানে বিভিন্ন মতের মধ্যে স্পষ্ট বিরোধ দেখা যায়, সেখানেও আমরা উভয়কেই অকাতরে আত্মসাৎ করিয়া লই। নানা মতের সংঘর্ষে আমাদের মনের বোধ করি নানা বিভিন্ন দিক্ হইতে দেখিবার শক্তি একটু বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখি বলিয়াই আমাদের মনে বিরোধ সহজেই ভঞ্জন হইয়া আসে।

যে সমস্ত বড় বড় ধর্ম্মতত্ত্ব ইংরাজ সংস্কারকেরা হালে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাইতে চাহিতেছেন—যেমন, জাতি-উচ্ছেদ, মানবে মানবে সাম্য, ঈশ্বরের একমাত্রতা এবং প্রতিমার অকিঞ্চিৎকরতা—সে সকলই আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও নূতন কথা নহে। সামান্য কুটীরবাসী কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলে সেও বলিবে, ধর্ম্মের নিকটে জাতি নাই, সকলেই সেই একমাত্র অদ্বিতীয় প্রত্যক্ষের অগোচর পরমেশ্বরের সৃষ্টি এবং সেই মহান্ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বঘটে নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছেন। যদি

তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তবে শিলাখণ্ডকে পূজা করিয়া ফল কি, পিতৃপিতামহাগত লোকাচারের উল্লেখ করিয়া সেও বলিবে, ইহার মধ্যেও ত পরমেশ্বর আছেন, এবং সেই সঙ্গে নিরাকারকে ধারণা করিবার সামর্থ্য অস্বীকার করিয়া বিনীতভাবে সর্ব্বসমক্ষে আপন অজ্ঞতা নিবেদন করিবে। কিন্তু নিজে শিলাখণ্ড পূজা করে বলিয়া অপ্রতিম ব্রহ্মোপাসনার মহত্ত্ব অস্বীকার করিবে না।

ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে দেখিবার অভ্যাসে মনের এইরূপ প্রসর বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই এবং সৃষ্টির সর্ব্বত্র নানা বিরোধের মধ্যে এক চিরন্তন নিগূঢ় অবিরোধ আবিষ্কার করিয়া সমগ্র বাহিরকে চিত্ত অন্তরে আয়ত্ত করিতে শিখে। কিন্তু আমাদের অন্তরের একাংশে এই সামঞ্জস্যসাধনী শক্তির পরিপুষ্টি হইলেও সময় সময় বৈপরীত্যের অযথা সম্মিলনে অনেক অসঙ্গত অদ্ভুত ফলও প্রসূত হয়। এবং দেবে দানবে, অবতারে নিরীশ্বরে ঘোলাইয়া গিয়া মন অনেক সময় বিহ্বল হইয়া পড়ে।

সে যাহাই হউক, এই বিরোধগ্রাসিতাই কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের জীবন। এবং ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে এইটুকু ছিল বলিয়াই বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে স্থায়ী হইতে পারিল না। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘর্ষেই ব্রাহ্মণ্যের এই শক্তি অধিকতর স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়াছে এবং তজ্জন্য বৌদ্ধধর্ম্মের নিকট ব্রাহ্মণ্য কতকাংশে ঋণী।

বৌদ্ধধর্ম্মও যে ব্রাহ্মণ্যের দ্বারা সহজেই প্রভাবীকৃত হইয়াছিল, তাহারও এক কারণ এই। ব্রাহ্মণেরা যেমন-তেমনি বৌদ্ধ কর্ম্মফলটিকে আত্মসাৎ করিয়া লইলেন এবং তাহার উপর চিরন্তন দৈবের প্রতিষ্ঠা করিয়া কর্ম্মফলের দুঃখ লাঘব করিলেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মকেও দৈবের স্থানে কৃত্রিম কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণ্যের সহিত সমান সম্মান বজায় রাখিতে হইল। সৃষ্টি হইল বৌদ্ধ তন্ত্র—যাহা যথার্থ বৌদ্ধভাবের সম্পূর্ণ বিরোধী এবং এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের কালস্বরূপ। এই তন্ত্র যেন ব্রাহ্মণ্যেরই ছদ্ম শিশু, বৌদ্ধবেশে ব্রাহ্মণ্যকেই উচ্চ করিয়া তুলিল এবং বৌদ্ধধর্ম্মকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিল।

কিন্তু এ সমস্তই যাহা কিছু ঘটিয়াছে, বিপ্লবের আকারে নহে—ধীরে ধীরে নিঃশব্দে যেন একই ধর্ম্ম নানা অবস্থার মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হইয়াছে। বাস্তবিকও বৌদ্ধধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বরাবর পাশাপাশি ছিল এবং বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণদিগকে ও ব্রাহ্মণীয়েরা শ্রমণদিগকে শ্রদ্ধা করিতে ত্রুটি করিতেন না। ব্রাহ্মণ্য দর্শনাদি বৌদ্ধ আশ্রমে পঠিত হইত এবং ব্রাহ্মণ গুরুর নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়নও অগৌরবের বিবেচিত হইত না। বৌদ্ধ শ্রমণেরাও যে কিরূপ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছিলেন, এখনকার হিন্দু সন্ন্যাসীদিগকে দেখিলেই

তাহা অনেকটা বুঝা যায়। কারণ, এই সন্ন্যাসবাহুল্য অনেক পরিমাণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসেরই ফল।

খণ্ডগিরির গুহাবলীতে এই প্রাচীন ধর্ম্মযুগের সমাধি। এখন কিছুই নাই, শুধু শূন্য গুম্ফাবলী, কোনটি ব্যাঘ্রের মুখব্যাদানের অনুরূপ, কোনটি বা হস্তীর স্থূল দেহের আকারসদৃশ, কোথাও দেবসভা—পাহাড়ের পাষাণ-দেয়ালে খোদিত কতকগুলি বৌদ্ধ মূর্ত্তি, এবং তাহারই সন্নিহিত সর্ব্বোচ্চ শিখরে নব্য জৈন মন্দির। জৈন দেবতা সেই বিজন গিরিশিখরে বসিয়া আপন মহিমায় বিলীন হইয়া আছেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে একবার উৎসব হয়। ভুবনেশ্বর হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া ঘণ্টা নাড়িয়া যায়। দূর নিকট হইতে কতকগুলি জৈন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হয়। গিরিপাদমূলে যে বাবাজী বাসা বাঁধিয়া থাকে, যাত্রীদিগকে সাদর অভ্যর্থনাসহকারে নানাপ্রকারে খণ্ডগিরির অতীত গৌরব স্মরণ করাইয়া দেয়। এবং সেই পুরাতন গল্পটি বার বার করিয়া বলে যে, হনুমান্ পৃষ্ঠে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় ঋষিসেবিত হিমালয়ের এক খণ্ড কেমন করিয়া এখানে ফেলিয়া যায় এবং বহুদিন ঋষিদিগের বাসস্থান থাকিয়া কলির প্রারম্ভে পাপের প্রাদুর্ভাবের সহিত সেই নিক্ষিপ্ত হিমাচলখণ্ড কালক্রমে কিরূপে ঋষিগণের বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে।
['সাধনা,' জ্যৈষ্ঠ ১৩০০]

সাময়িক সারসংগ্রহ

সশস্ত্র য়ুরোপ

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের পর প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল য়ুরোপে তেমন যুদ্ধবিগ্রহের কথা আর বড় শুনা যায় না। ত্রিশ সালে সমস্ত য়ুরোপের উপর দিয়া যে মহা-বিপ্লবের ঝটিকা বহিয়া যায়, তাহাতে অনেক বড় বড় সিংহাসন এবং বহুদিনের প্রাচীন প্রবল প্রতাপ কম্পান্বিত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু রীতিমত গুরুতর কোনও যুদ্ধাদি ঘটে নাই। বেলজিয়াম হলাণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, কিন্তু এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপার সমাধা করিতে এক বিন্দু রক্তপাত আবশ্যক হইল না; কাগজে কলমেই নির্ব্বিবাদে আপোষে মীমাংসা হইয়া গেল। লোকে মনে করিল, এত দিনে রাজপুরুষদিগের চৈতন্য উদয় হইয়াছে—এবার অবধি তবে বুঝি শস্ত্রের ব্যবহার বন্ধ হইয়া যায়।

একান্ন সালের হাইড্ পার্কের প্রদর্শনীতে শান্তির এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। শান্তি ভিন্ন লোকের মুখে আর কথা নাই।

কিন্তু এ শান্তির প্রতিষ্ঠা কেবলি বালির বাঁধ। প্রদর্শনী শেষ হইয়া গেল, তাহার পর এই কয় বৎসরে য়ুরোপের রঙ্গভূমিতে আটটি মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে। লেং সাহেব তাহার ফর্দ্দ দিয়াছেন।

(১) ক্রিমীয় সমর; এক দিকে রুষিয়া, অন্য দিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, তুরস্ক।
(২) ইতালীয় সমর; এক দিকে ইতালী, অন্য দিকে অষ্ট্রীয়া।
(৩) হঙ্গেরীয় সমর; অষ্ট্রীয়া, রুষিয়া, হঙ্গেরী।
(৪) তৃতীয় ইতালীয় সমর; ফ্রান্স, অষ্ট্রীয়া, ইতালী।
(৫) অষ্ট্রীয়-প্রুস সমর; প্রুসিয়া, অষ্ট্রীয়া, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জর্ম্মন রাজ্যসমূহ।
(৬) রুষ-তুরস্ক সমর; রুষিয়া এবং তুরস্ক।
(৭) ফ্রাঙ্কো-জর্ম্মন সমর; জর্ম্মনি এবং ফ্রান্স।
(৮) মার্কিন সমর; মার্কিন যুক্তরাজ্যের উত্তর এবং দক্ষিণ প্রদেশ।*

ইহা ভিন্ন মেক্সিকো, রোম এবং টন্‌কিনে ফ্রান্সের, ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়ার, পোলাণ্ড এবং ককেশীয় প্রদেশে রুষিয়ার, ইতালীতে গারিবল্ডির, মেক্সিকো প্রদেশে মার্কিন যুক্তরাজ্যের, এবং আফগানিস্থান, চীন, মিসর, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিলণ্ডে ইংলণ্ডের যে কয়েকটি যুদ্ধঘটনা হইয়াছিল, সেগুলিও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে।

কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়া ধরিলেও য়ুরোপে যে কয়টি কুরুক্ষেত্র ব্যাপার অভিনীত হইয়াছে, তাহা হইতেই দেখা যায় যে, ক্রিমীয় সমরে প্রথম শান্তিভঙ্গ হইয়া অবধি য়ুরোপের সৈন্যবল ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে এবং যুদ্ধকার্য্য উত্তরোত্তর গুরুতর, জটিল ও সর্ব্বধ্বংসী হইয়া দাঁড়াইতেছে। পূর্ব্বে ম্যাজেণ্টা ও সল্‌ফেরিনোতে উভয় পক্ষে এক লক্ষের অধিক সৈন্যসমাগম হয় নাই; কিন্তু প্রুস-অষ্ট্রীয় সমরে উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা পাঁচ লক্ষেরও অধিক হইয়াছিল, এবং ফ্রাঙ্কো-প্রুসীয় যুদ্ধে কেবলমাত্র এক পক্ষের সৈন্যসংখ্যাই প্রুস-অষ্ট্রীয় সমরের উভয় পক্ষীয় সৈন্যসংখ্যা ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু এই সকল যুদ্ধের ফলে য়ুরোপে যে অক্ষয় শান্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। ভিন্ন ভিন্ন প্রবলপ্রতাপগণের মধ্যে একটা সশস্ত্র সশঙ্ক সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে মাত্র এবং শস্ত্রগৌরব ও সৈন্যবৃদ্ধি লইয়া রাজায় রাজায় নিয়ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছে। একটা বড়রকম যুদ্ধ বাধিলে এখনই

রুষিয়া	৫০,০০,০০০
জর্ম্মনি	৩৫,০০,০০০

* য়ুরোপীয় রাজনীতির সহিত যোগসূত্রে এখানে ইহার উল্লেখ নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হয় না।

ফ্রান্স	...	...	...	৩০,০০,০০০
অষ্ট্রীয়া	...	...	...	২০,০০,০০০
ইতালী	...	...	...	১৫,০০,০০০

সৈন্য সমরক্ষেত্রে উপস্থিত করিতে পারে।

তথাপি নিবৃত্তি নাই। আরও সৈন্য চাহি। ট্যাক্সের উপর ট্যাক্স যোগাইয়া দেশ নির্ধন হইয়া যাইতেছে, করভারে লোকের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতেছে, কিন্তু কামান গোলাগুলি এবং লাল-কুর্ত্তিতে কিছুতেই কূল পাইতেছে না। জলে স্থলে, এমন কি, আকাশে পর্য্যন্ত এই অবিশ্রান্ত রণসজ্জা চলিয়াছে।

এমন সম্ভাবনাও নাহি যে, কেহ সহসা আপন সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিবে। ফ্রান্স না পথপ্রদর্শন করিলে প্রুসিয়া অথবা ইতালীর পক্ষে এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। কারণ, ফ্রান্সের প্রতাপ অধিক হইলে এই উভয় দেশেরই স্বল্পদিনলব্ধ রাজনৈতিক একতা অক্ষুন্ন থাকা অসম্ভব। ফ্রান্সও আলসেস্ লোরেন প্রদেশের সহিত তাহার লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের আশা একেবারে না পরিত্যাগ করিলে সৈন্যসংখ্যা হ্রাস করিতে পারে না। এদিকে অষ্ট্রীয়া রুষিয়ার সৈন্যবল উপেক্ষা করিয়া আপন বিপদ্ ডাকিয়া আনিবে না। এবং রুষিয়াও তাহার গ্রীক চার্চ্চের উপর প্রভুত্ব এবং তুরস্ক সাম্রাজ্যের পতনের সহিত কনষ্টান্টিনোপলে আধিপত্য বিস্তারের আশা ছাড়িয়া পঞ্চাশ লক্ষকে পাঁচ লক্ষে পরিণত করিবে না।

কনষ্টান্টিনোপল রুষিয়ার খিড়কিদ্বার। এবং সমস্ত য়ুরোপীয় গোলযোগের শেষ মীমাংসা ঐখানে। সেখানে যদি কোনও প্রবলপরাক্রম বিদেশী ঘাটি বাঁধিয়া বসে, কৃষ্ণসাগরের রুষীয় রণতরীর নির্গমনপথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং রুষিয়ার পোতবল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কনষ্টান্টিনোপল শত্রুহস্তগত হইলে রুষীয় বাণিজ্যেরও বিশেষ ক্ষতি—কারণ, তাহাকে পরের অনুগ্রহের উপর একান্ত নির্ভর করিতে হইবে। সুতরাং কনষ্টান্টিনোপলে আপন অধিকার দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিতে রুষিয়া শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিবে।

এবং ইহার জন্যই ফ্রান্সের সহিতও তাহার কতকটা সদ্ভাব থাকার প্রয়োজন। (১) প্রতিবেশী অষ্ট্রীয়া কিছুতেই রুষিয়াকে অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িতে দিতে পারে না। অষ্ট্রীয় সম্রাটের অধীনে অনেকগুলি জাতির বাস—কতক ট্যুটনিক, কতক স্লাভ এবং অন্যান্য। বিশেষতঃ ইহাদের মধ্যে গ্রীক-চার্চ্চভুক্ত লোকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। অষ্ট্রীয়ার প্রতাপ ক্ষুন্ন হইলে এই সকল গ্রীক-চার্চ্চীয়েরা অবিলম্বে রুষিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে। সুতরাং কনষ্টান্টিনোপলে রুষিয়াকে প্রাধান্য লাভ করিতে অষ্ট্রীয়া কিছুতেই দিতে পারে না। কারণ, সেখানে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে ভিয়েনা পর্য্যন্ত রুষিয়ার প্রায়

অপ্রতিহত প্রভাব। (২) জর্ম্মনিও অষ্ট্রীয়ার পক্ষ অবলম্বন করিবে। এক ত অষ্ট্রীয়দিগের সহিত জর্ম্মানদিগের কতকটা জাতিগত ঐক্য আছে ; দ্বিতীয়তঃ, কনষ্টান্টিনোপলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে রুষীয় রণতরীর প্রতাপে য়ুরোপ অস্থির হইয়া উঠিবে। কনষ্টান্টিনোপল দখলে রাখিতে পারিলে রুষিয়ার পক্ষে জর্ম্মনি আক্রমণেরও অনেকটা সুবিধা হয়। বিশেষতঃ ফ্রান্স যখন জর্ম্মনির অধঃপতন সাধন করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া আছে। (৩) ইংলণ্ড এবং ইতালী কিছুতেই ডার্ডেনালিসে রুষীয় বৈজয়ন্তীর প্রতিষ্ঠা হইতে দিবে না। কারণ, তাহা হইলে ভূমধ্যসাগরে রুষিয়ার একাধিপত্যে বাধা দেওয়া অসম্ভব। কৃষ্ণসাগরের দুর্ভেদ্য আশ্রয় হইতে বাহির হইয়া রুষীয় রণতরী অন্যের বাণিজ্যতরী আক্রমণ করিবে এবং অন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে ডার্ডেনালিসের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সম্পূর্ণ নিরাপদ্ হইবে। কনষ্টান্টিনোপল রুষিয়াকে ছাড়িয়া দিলে য়ুরোপের প্রধান জলদুর্গ তাহার আয়ত্ত হইল। সে এখন ডাঙ্গার বাঘ আছে, ক্রমে জলেরও কুম্ভীর হইয়া উঠিবে।—সুতরাং প্রায় সমগ্র য়ুরোপই রুষিয়াকে ডার্ডেনালিসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে দিবে না। এতগুলা জাতির বিপক্ষে রুষিয়ার কিছু করিয়া উঠাও কঠিন। তাই ফ্রান্সের সহিত রুষিয়ার সদ্ভাব রাখিতে হয়। ফ্রান্স আবশ্যক হইলে স্থলে জর্ম্মনিকে কিম্বা জলে ইংলণ্ডকে কতকটা ব্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে।

য়ুরোপে ইংলণ্ডের বাস্তবিক প্রবল শত্রু ফ্রান্স। ফ্রান্সের প্রায় তিন দিকে সমুদ্র, এই জন্য জলে তাহার প্রভাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। বিশেষতঃ আজকাল যখন সকল জাতিরই ভাল ভাল রণতরীর অভাব নাই, তখন কেবলমাত্র পূর্ব্বগৌরবটুকুর উপর নির্ভর করিয়া এমন বলা যায় না যে, একটা রীতিমত যুদ্ধ বাধিলে ইংলণ্ড সহসা ফ্রান্সকে হটাইতে পারে। আর, কোনপ্রকারে ইংলণ্ডকে জলযুদ্ধে একবার পরাস্ত করিতে পারিলেই ফ্রান্স লণ্ডনের দ্বারে গিয়া আঘাত করিবে। এবং অন্যান্য য়ুরোপীয় জাতি হয় ত নানা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়া তখন ইংলণ্ডকে সাহায্য করিতেও পারিবে না।

জলে এই ফ্রান্সের ভয়। এদিকে রুষিয়া ভারতবর্ষে গোলযোগ বাধাইয়া য়ুরোপীয় রাজনীতিক্ষেত্র হইতে ইংলণ্ডের চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে চাহে। য়ুরোপে রুষিয়ার পথে ইংরাজ একটি প্রধান কণ্টক। এই কণ্টককে সরাইতে পারিলে তাহার কার্য্য উদ্ধার অনেক সহজ হইয়া আসে। এবং চাই কি, অচিরেই ভূমধ্যসাগরের রুষীয় রণতরী নিরাপদে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারে।

ইংলণ্ড সেই জন্যই ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্ত লইয়া যেমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, য়ুরোপে পোতবল বৃদ্ধি করিবার জন্যও সেইরূপ নানা আয়োজন করিতেছেন।—কেহই নিশ্চিন্ত নাই। সকল জাতিই অহরহ রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। বর্ত্তমানে যে শান্তিটুকু

রহিয়াছে, সে কেবল একটা সশস্ত্র সন্ধিমাত্র ; একটু সুবিধা হইলেই চতুর্দ্দিক্ হইতে অস্ত্রে অস্ত্রে ঝন্‌ঝনা উঠিবে।—['সাধনা,' জ্যৈষ্ঠ ১৩০০]

বিক্রমাদিত্য

বিক্রমাদিত্যের কালনিরূপণ লইয়া য়ুরোপীয় গবেষণা কিছু দিন হইতে প্রাণপণ যত্নে লাগিয়াছে। বিক্রমাদিত্য নিরাপদে ৫৭ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে রাজত্ব করিতেছিলেন, মধ্য হইতে পাশ্চাত্য অধ্যাপকদল—ফার্গুসন, ম্যাক্‌স্‌মূলর, বেবর প্রভৃতি মিলিয়া তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে কালান্তরিত করিয়া দিলেন।

বিক্রমাদিত্যের অপরাধ—কালিদাসকে তিনি সভায় স্থান দিয়াছিলেন। এখন সেই কালিদাসের প্রেতাত্মাই তাঁহার ৫৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী। কালিদাসের সময়ে সংস্কৃতভাষায় অনেক কৃত্রিমতা প্রবেশ লাভ করিয়াছে দেখা যায়—সুতরাং কালিদাস বহুকালের প্রাচীন কবি নহেন। কালও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী খ্রীষ্টপূর্ব্ব শতাব্দীর তুলনায় অনেক আধুনিক। অতএব কালিদাস খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক। এবং বিক্রমাদিত্য কালিদাসের প্রভু হইয়া ৫৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে থাকিতে পারেন না। অতএব সমবেত অধ্যাপকমণ্ডলীর বিচারানুসারে তাঁহাকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যাবজ্জগৎ নির্ব্বাসন দণ্ড দেওয়া গেল।

কিন্তু অধিক দিন না যাইতে যাইতে বিক্রমাদিত্যের পক্ষে দুই জন বড় কৌঁসুলি খাড়া হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতেছেন যে, সংস্কৃত রচনায় কৃত্রিমতা খ্রীষ্টজন্মের বহু পূর্ব্ব হইতেই ঢুকিয়াছে। এবং সর্ব্বত্র য়ুরোপীয় অধ্যাপকগণের বিচারের উপর নির্ভর করা সঙ্গত নহে। বিক্রমাদিত্য সম্ভবতঃ ৫৭ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দেই ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ব্বাসন তাঁহার প্রতি নিতান্তই অবিচার। কৌঁসুলি দুই জনেরই পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি আছে, নাম—ডাক্তার বুলার ও ডাক্তার পিটার্সন। অধ্যাপক কিয়েলহর্ণও ডাক্তার বুলারের অনুকূলে সাক্ষ্য দিয়াছেন।

লুধিয়ানার পণ্ডিত জোয়ালা সহায় এই কৌঁসুলিদিগের যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া সম্প্রতি 'এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিয়ু' পত্রে আরও গুটিকতক দলিল দাখিল করিয়াছেন। সাধনার পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছি।

প্রথম দলিল 'জ্যোতির্ব্বিদাভরণ' গ্রন্থ। ইহার রচয়িতা কালিদাস। এবং উক্ত কালিদাস যে রঘুবংশপ্রণেতা কালিদাস হইতে ভিন্ন নহেন, পণ্ডিত জোয়ালা সহায় কতকগুলি

সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এই জ্যোতির্ব্বিদাভরণের একটি শ্লোকে গ্রন্থরচনার কাল লেখা আছে—৩০৬৮ কলিগতাব্দ। বর্ত্তমান ১৩০০ সাল কলিগতাব্দ ৪৯৯৩। সুতরাং এই গ্রন্থ ১৯২৫ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হয়। সংস্কৃত অন্যান্য অনেক জ্যোতিষগ্রন্থে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ৩০৪৪ কলিগতাব্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষে জ্যোতির্ব্বিদাভরণ রচিত হইয়াছে। তাহা হইলে বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনাধিরোহণ হইতে সম্বৎ গণনা প্রচলন হওয়া কিছু মাত্র অসম্ভব নহে। সুতরাং খ্রীষ্টের পূর্ব্বেই তাঁহার কাল নির্দ্দেশ করিতে হয়।

জৈন সাহিত্য হইতেও পণ্ডিত জোয়ালা সহায় গুটিকতক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "গুর্জ্জরদেশভূপাবলী" দৃষ্টে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যই যে সম্বৎ প্রচলন করেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিক্রমাদিত্য শকদিগের বিশেষ শত্রু ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এবং ইহাঁর ১৩৫ বৎসর পরবর্ত্তী প্রবলপ্রতাপ শালিবাহনও শকদমন ছিলেন। পণ্ডিত জোয়ালা সহায় দেখাইয়াছেন যে, সম্বৎ এবং শকাব্দ দুইটিই শকদিগের পরাজয় বৃত্তান্তের স্মরণার্থে প্রবর্ত্তিত হয়। এবং জৈন ইতিহাসে সম্বৎপ্রচলনকর্ত্তা শকারি বিক্রমাদিত্য ভিন্ন দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের উল্লেখও নাই।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে এদেশে একজন বিখ্যাত নরপতি ছিলেন বটে, তাঁহার নাম ভোজ রাজা। ইংরাজ লেখকেরা ইহাঁরই স্কন্ধে হয় ত বিক্রমাদিত্যকে চাপাইয়াছেন। এরূপ ভ্রম হওয়া বিশেষ আশ্চর্য্য নহে। ['সাধনা,' আষাঢ় ১৩৪০]

লোকসংখ্যাবৃদ্ধি ও আহার্য্যসংস্থান

য়ুরোপে লোকসংখ্যার যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে, পণ্ডিতেরা ভাবিত হইয়া পড়িয়াছেন যে, এত লোকের আহার্য্যসংস্থান হইবে কোথা হইতে?

আপাততঃ অবস্থা ভাল বৈ মন্দ নহে। গ্রেট ব্রিটনের লোকসংখ্যা অর্দ্ধ শতাব্দীরও কম সময়ে দেড় কোটি হইতে তিন কোটিতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু ষ্ট্যাটিষ্টিক্স্ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, পূর্ব্বে লোকসংখ্যা অর্দ্ধেক থাকিতে প্রত্যেক ব্যক্তির আহারের পরিমাণ যাহা ছিল, এখন লোকসংখ্যা দ্বিগুণ হইলেও আহারের পরিমাণ তদপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদেশী আমদানি খাদ্যসামগ্রীর ফর্দ্দ দেখিলে বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যেখানে প্রতি জনে ৪২ পৌণ্ড গম লাগিত, এখন সেখানে মাথাপিছু ২২০ পৌণ্ড করিয়া লাগে; শূকরমাংস পূর্ব্বে আমদানি ছিল না বলিলেই হয়, এখন জন হিসাবে গড়ে ১৪০ পৌণ্ড করিয়া আসে; পনির ১ পৌণ্ড হইতে ৬ পৌণ্ডে উঠিয়াছে; ডিম ৪০০০০০০ হইতে ২২০০০০০০-এ

দাঁড়াইয়াছে; ইহা ভিন্ন, চা চিনি মাখন চাউল প্রভৃতির আমদানিও কম নহে এবং য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্স্, কানাডা, আরজেন্টাইন রিপবলিক, নিউজিলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া হইতে বরফে জমাইয়া মাংস চালান আসে।

এদিকে খাদ্যসামগ্রীর মূল্য যেমন হ্রাস হইয়াছে, লোকের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমজীবী শ্রেণীর বেতন এখন পূর্ব্বের দ্বিগুণ; সেবিংস্ ব্যাঙ্কে জমা পূর্ব্বের পাঁচ গুণেরও অধিক।

আমেরিকায়ও লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত লোকের আহার্য্যসংস্থান প্রচুর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক শতাব্দীতে সেখানে ষাট লক্ষ অধিবাসীর স্থলে ছয় কোটি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং আহারবিষয়ে পৃথিবীর কোন জাতিই ইহাদের সমকক্ষ নহে। উদ্বৃত্ত যাহা থাকে, তাহাতেই প্রায় দুই কোটী বিদেশীর নিয়মিত ভরণপোষণ নির্ব্বাহ হয়।

কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত এরূপ স্বচ্ছলতা কোথা হইতে আসে? কারণ স্পষ্টই পড়িয়া আছে। দৈনন্দিন আবশ্যকীয়ে বিজ্ঞানের প্রয়োগ করিতে শিখিয়া অবধি মানুষ প্রকৃতির নিকট হইতে আদায় অধিক করিতেছে, এবং বাষ্পীয় পোতের কল্যাণে এক দেশের অভাব দেশান্তরের উদ্বৃত্ত হইতে সহজেই মিটান যায়। চিকাগো প্রদেশ হইতে ইংলণ্ডের বাজারে যে সকল গো মেষাদি প্রেরিত হয়, স্কটলণ্ড হইতে আনীত গো মেষাদি অপেক্ষা তাহার মূল্য অধিক নহে। আর ভারতবর্ষ, নিউজিলণ্ড, কালিফর্ণিয়া, আরজেন্টাইন্ রিপবলিক সকলে মিলিয়া ধন ধান্য দিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা নিবৃত্ত করিতেছে। সুতরাং বিজ্ঞানের উদ্ভাবনী শক্তির কল্যাণে খোরাকের বিষয় অনেকটা নিশ্চিন্ত।

কিন্তু যতই ষ্টীম-লাঙ্গল উদ্ভাবিত হউক অথবা ষ্টীমারের গতি বৃদ্ধি হউক্ না কেন, জমির অভাব হইলে শুদ্ধ মাত্র কলের মধ্য হইতে ফসল বাহির হইবে না। পৃথিবীতে যদি এখনও অনেকখানি আবাদোপযোগী পতিত জমি থাকে, তবেই ভরসা। কিন্তু তাহা আছে কি?

য়ুনাইটেড্ ষ্টেট্সের ৯৬০০০০০০০ একর জমির মধ্যে কিছু দিন পূর্ব্বে ২৬০০০০০০০ একর মাত্র পতিত ছিল। এখনই ইহার কতক অংশে চাষ আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। আর কিছু দিন পরে জমি পাওয়া কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। লোকসংখ্যা যেরূপ দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে অধিবাসীর সংখ্যা ১২০০০০০০০ হইবার কথা। তখন আমেরিকার জমি হইতে বিদেশের ভরণ কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইবে। আমেরিকার আহার যোগাইতে পারিলেই যথেষ্ট।

এদিকে এসিয়াখণ্ডে জমি দুষ্প্রাপ্য। লোকের ভীড় ক্রমেই বাড়িতেছে, জমি সেইই আছে, এসিয়াবাসীদের নিজেদেরই চলে না। আফ্রিকারও আবাদোপযোগী অনেক জমিই

য়ুরোপীয়দিগের দখলে আসিয়াছে। মধ্য আফ্রিকার যে উচ্চ জমিটুকু আছে, সেখানে দেশীয় অধিবাসী নিতান্ত কম নহে।—মধ্য এসিয়ার এবং আফ্রিকার অনেক স্থানে যে সকল মরুভূমি আছে, তাহাতে চাষাবাদেরও সুবিধা নাই। সুতরাং সে জমি নিষ্ফল।

য়ুরোপে দানিয়ুব প্রদেশে যে পতিত জমিটুকু আছে, তাহাও প্রায় আবাদ হইতে চলিল। সেই জমিটুকুর উপর স্থানীয় বর্দ্ধনশীল অধিবাসীদের অনেকটা নির্ভর।

আমেরিকার ব্রেজিল, দক্ষিণ কালিফর্ণিয়া, ফ্লরিডা প্রভৃতি প্রদেশে কাফি, আঙ্গুর, পীচ, কমলালেবু, এই সকল উৎপন্ন হয়। গম না হইলে এ সকল ফল মূল লইয়া ত আর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চলে না। অষ্ট্রেলিয়ারও যে সকল প্রদেশে গম উৎপন্ন হয়, সেই প্রদেশগুলিই এখনও কিছু কাল য়ুরোপের খোরাক যোগাইতে পারে; সকল প্রদেশে ত আর গম জন্মে না।

কানাডায় এখনও অনেকটা পতিত জমি আছে। তাহার দ্বারাও কিছু কাল য়ুরোপের দুর্ভিক্ষ নিবারণ হইতে পারে। কিন্তু য়ুরোপ হইতে আমেরিকায় যেরূপ লোকপ্রবাহ প্রবেশ করিতেছে, তাহাতে খুব বেশী দিন সে সকল জমি যে য়ুরোপের কাজে লাগিবে, এমন সম্ভাবনা অল্প। লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত আহার্য্যোৎপাদন কি অনুপাতে বর্দ্ধিত হইতেছে, লেং সাহেব-প্রদত্ত নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে তাহা বুঝা যাইবে।

লোকসংখ্যা	২,	৪,	৮,	১৬,	৩২,	৬৪,	১২৮।
আহার্য্য	২,	১২,	২২,	৩২,	৪২,	৫২,	৬২।

প্রথম পাঁচটি অবস্থা গড়ে মন্দ নহে; কিন্তু লোকসংখ্যাবৃদ্ধিতে বাধা দিতে না পারিলে ষষ্ঠাবস্থায় নিত্য দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য।

প্রতীকারেরও কোনও সহজ পথ নাই। এক, যদি প্রকৃতি দেবী মড়কে দেশের লোকসংখ্যা হ্রাস করিয়া দেন, কিম্বা অন্য কোন উপায়ে অনেকগুলা লোককে একেবারে লোকান্তরে উপনীত করা যায়! কিন্তু সে সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। এই পর্য্যন্ত বুঝা যায় যে, অন্নচিন্তা ভবিষ্যতের এক মহাসমস্যা। ['সাধনা,' শ্রাবণ ১৩০০]

•

বর্ম্মার ডাকাত

ব্রহ্মবীর জেনেরাল স্যর হেন্‌রী প্রেণ্ডার্গষ্টের নাম বঙ্গীয় পাঠকসমাজে নিতান্ত অপরিচিত নহে। জেনেরাল সাহেব সম্প্রতি "এসিয়াটিক কোয়ার্টার্লি রিবিয়ু" পত্রে বর্ম্মার ডাকাইতি সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সাধনার পাঠকবর্গের জন্য নিম্নে তাহার সার মর্ম্ম প্রকাশিত হইল।

এংলো-ইণ্ডিয়ান সম্বাদপত্রে বর্ম্মায় প্রায় নিত্য নিয়মিত ডাকাইতির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আজ দুই শত ডাকাইতের সহিত ইংরাজ সেনার ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, কাল তিন শত ডাকাইত ধরা পড়িয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি ;—যেন ডাকাত ভিন্ন বর্ম্মায় আর কিছুই নাই।

প্রেণ্ডার্গষ্ট সাহেব কিন্তু এই সকল ডাকাতদিগের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইহাদিগকে ডাকাত না বলিয়া দেশানুরাগী সদাশয় বলিয়া গণ্য করেন। বলেন, দোষ যতই থাক না কেন, মগদিগের গুণও অনেক আছে। উত্তেজিত হইলে ইহারা অনেক সময় নিষ্ঠুর আচরণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু এদিকে সামান্যতম জীবের প্রতিও ইহাদের করুণার অভাব নাই। ইহারা সাধারণতঃ অলস এবং সকল বিষয়ে নিরুদ্যম, কিন্তু আবশ্যককালে ইহারা পরিশ্রম করিতেও কাতর নহে। কথা বাড়াইয়া বলে বটে, তাই বলিয়া অনর্গল মিথ্যা কথা বলে না। ইংরাজেরা ভারতবাসীদিগের অপেক্ষা ইহাদিগের প্রতি সদয়। মগদিগকে মনে মনে ইংরাজ একটুকু অনুগ্রহ করেন।

বর্ম্মানেরা সদা প্রফুল্ল, লঘু-হৃদয়, কোনও হাঙ্গামায় থাকিতে চাহে না। তাহাদের ডাকাইতিও কিছু অদ্ভুত রকমের। রাম শ্যাম স্থির করিল, যদুর ঘরে ডাকাইতি করিতে হইবে, আর দুই চারি জন সঙ্গী জুটাইয়া যদুর ঘরে গিয়া হাজির হইল। যদু ঘটি বাটী ফেলিয়া পলায়ন করিল। রাম শ্যাম তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গেল। প্রতিবেশীরা যদুকে কেহ একটা বলদ দিল, কেহ বা একটি ঘটি দিল ; এমনি করিয়া যদুরও ক্ষতিপূরণ হইল। তখন যদু আবার মধুর সাহায্যে রামের ঘরে ডাকাতি করিল। রাম পলায়ন করিল। যদু যাহা পাইল লইয়া গেল। রক্তপাত বড় একটা হয় না। কেবল ইংরাজের ঘরে ডাকাইতি হইলেই রক্তপাত ঘটে। ইংরাজ ছাড়ে না—ডাকাতকে চাপিয়া ধরে ; তখন অগত্যা তাহার দা বাহির হয়।

কুচ কাওয়াজ, এ সকল কার্য্য বর্ম্মানের অত্যন্ত বিরক্তিজনক। ইংরাজের সহিত যুদ্ধে বর্ম্মানদিগের সম্মুখযুদ্ধও বড় একটা হয় না। বর্ম্মানেরা হুটপাট করিয়া আসিয়া পড়ে, লুটপাট করিয়া চলিয়া যায়। য়ুরোপীয় রণশিক্ষা ত আর তাহারা পায় নাই। এবং দা ও গোটাকতক জীর্ণ বন্দুকের সাহায্যে ইংরাজের কামান বন্দুক অস্ত্রশস্ত্রের সহিত পাল্লা দেওয়াও চলে না।

প্রেণ্ডার্গষ্ট সাহেব বলেন, অস্ত্রশস্ত্রের অভাবেই বর্ম্মানেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে বাধ্য হয়। নহিলে, য়ুরোপীয় প্রণালী অনুসারে সুশিক্ষিত ও সসজ্জ করিলে এই বর্ম্মান সৈন্য বর্ম্মাপ্রান্তে কোনও যুদ্ধ বাধিলে ইংরাজের অনেক কাজে লাগিতে পারে। ['সাধনা,' শ্রাবণ ১৩০০]

কণারক

(উড়িষ্যার সূর্য্যমন্দির)

কণারকে এখন কিছুই নাই, ধূ ধূ প্রান্তরমধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধিমন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী। সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িতহস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন; নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্ব্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্কমন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহু দিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে, দ্বারের সম্মুখে, সিদ্ধগন্ধর্ব্বসেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয়, একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনককিরণে সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন!

এখন এ অর্কক্ষেত্রে যাত্রীর পদধূলি আর পড়ে না। পুরী হইতে দশ ক্রোশ পথ বালু ভাঙ্গিয়া একটা ভগ্ন মন্দির দেখিতে কে যাইবে? মন্দিরের সমস্তই পড়িয়া গিয়াছে—শুধু জগমোহনটুকু বিচিত্র শৃঙ্গার-ভাস্কর্য্যে ও অক্ষুণ্ণশিল্প নীলাভ প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারদেশে দৈবাগত পথিক জনের মুগ্ধ নয়ন আকর্ষণ করে। এবং পুরাতত্ত্ববিৎ এই মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখেন, পাষাণে প্রাচীন ভারতবর্ষ আপনাকে কি সুন্দররূপেই মুদ্রিত করিয়াছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জীবজন্তুদিগের মূর্ত্তিগুলিই কি সুন্দর! এমন সুগ্রীব তেজে ভরা অশ্ব, এমন সুন্দর সুঠাম করিবর! কেবল সিংহ দুইটি প্রকৃতির অনুরূপ নহে—কিন্তু তাহাও উড়িষ্যার অন্যান্য মন্দিরের সিংহের সহিত তুলনায় কতকটা সিংহের মত বটে। আর সেই অতুল্য শিল্প—নবগ্রহ; উজ্জ্বল কৃষ্ণ পাষাণখণ্ডে মুদ্রিত কয়টি বুদ্ধসদৃশ প্রশান্ত হাস্যবদন, হস্তে কাহারও জপমালা, কাহারও বা অর্দ্ধচন্দ্র, কাহারও বা পূর্ণঘট। এখন এই নবগ্রহমূর্ত্তি মন্দির হইতে প্রায় চারি শত হস্ত দূরে ইংরাজের লৌহরথোপরি শায়িত—কলিকাতায় আনিতে আনিতে আনা হয় নাই; পথিকেরা তাহার গায়ে সিন্দূর লেপন-

পূর্ব্বক ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া যায়; কিন্তু এই নূতনলব্ধ ভক্তি এবং প্রীতি লাভ করিয়াও আর কিছু কাল পড়িয়া থাকিলে এই অক্ষুণ্ণ প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে।

উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজস্ব সমুদ্রের বালুতটে এই একমাত্র পাষাণমন্দিরে নিঃশেষিত হইয়াছে। মন্দিরটি ত সামান্য নহে। গত শতাব্দীতেও মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহারই পাথর খসাইয়া খসাইয়া জগন্নাথের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। এবং জগন্নাথের সিংহদ্বারের সম্মুখে যে সমুচ্চ অরুণস্তম্ভ দেখা যায়, তাহাও এই কণারকেরই গৌরবের ভগ্নাবশেষ।

বিলাসকলার তখন ত্রুটি ছিল না। মন্দিরের সমস্ত ভিত্তি পূর্ণ করিয়া নগ্ন নারীমূর্ত্তি—বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী ও সুডোল গঠন অনেক স্থলে শিল্পীর অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং অধিকাংশ স্থলেই অত্যন্ত কুৎসিত কল্পনায় শিল্পগৌরব সঙ্কুচিত।—হয় ত বাহিরেও যেমন, ভিতরেও সেইরূপ ছিল। নর্ত্তকীর লাস্যলীলা দেবতার মনোরঞ্জন করিত এবং ভোগবিলাসেই দেবচরিত্রের সমস্ত গৌরব স্থাপিত ছিল। উড়িষ্যার দেবমন্দিরে নর্ত্তকীর প্রাধান্য এখনও বড় কম নহে। জগন্নাথের পবিত্র নিকেতনে এখনও নিত্য রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয় এবং পাণ্ডাবর্গের পুণ্যসঞ্চয়ের তাহাতে কোনও ব্যাঘাত ঘটে না।

এই বিলাসখচিত মন্দিরের দ্বারে কত লোকে কত দিন অন্তরের দারুণ নির্ব্বেদ লইয়া আসিয়াছে! সংসার পাছে কামনার উদ্রেক করে, পাছে কোন দিন স্ত্রীর মুখ দেখিয়া মোহ উপস্থিত হয়, সন্তানের মায়া কাটান না যায়, বৃদ্ধ পিতামাতার অশ্রুজল বন্ধনচ্ছেদনে বাধা দেয়, গৃহ স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা সমস্ত পরিজন পরিত্যাগ করিয়া লোকে দেবদ্বারে আসিয়া হত্যা দিয়া পড়িয়াছে—হে দেবতা, রক্ষা কর, মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া দাও, আমি তোমার দ্বারে চিরদিন সন্ন্যাসী হইয়া রহিব। হায়, জড় দেবতা, সে যদি বুঝিত—তুমি কি অন্ধকার মোহরাশিতে গঠিত! ক্ষীণ দীপালোকে তুমি ভক্তহৃদয়ের বৈরাগ্য অনুমোদন কর; এবং শত দীপালোকে তোমারই সম্মুখ-প্রাঙ্গণে নিত্য মদনবিলাসের এক এক অঙ্ক অভিনীত হয়!

তবে এ কি মায়া? এ কি এই সংসারখেলার একটা রূপক? বুঝান যে, চারি দিকে মদন মন যৌবন লইয়া নিত্য যে আন্দোলন উঠিতেছে, তাহারই মধ্যে অন্তর কিরূপে অবিচলিত শান্তভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবিহৃদয় তোমার মন্দির দেখিয়া মনে করে, বিশ্বসংসারেরও বহিঃপ্রাচীরে আমরা এইরূপ ভাস্কর্য্যের মত—আপন আপন বিচিত্র জীবন যৌবন লইয়া নিত্য এই বিশ্বপাষাণে মুদ্রিত হইতেছি; কিন্তু বিশ্বের অন্তরের মধ্যে যে মহান্ দেবতা জাগিয়া বসিয়া আছেন, এ মায়াবুদ্বুদ তাঁহার চরণে পঁহুছে না।—বৈরাগ্য ও বিলাস যেন দেবতামন্দিরে দুই দিক্ হইতে আসিয়া মিশিয়াছে—শুধু এপিঠ ওপিঠ, শুধু ভিতর বাহির, শুধু দেহ মন।

কণারকে এখন দেবতা নাই—এত কথা বলা খাটে না। কিন্তু সমস্ত প্রান্তর জুড়িয়া সেখানে এক নিশ্চল বৈরাগ্য বাসা বাঁধিয়াছে। তাহার মুখে কেবল হায় হায়। বৈদান্তিক মায়াবাদীর মত সে শুধু বলিতেছে,—জীবন অনিত্য, যৌবন অনিত্য, ধন জন অনিত্য, সুখ অনিত্য, সংসার অনিত্য, সকলি যেখানে অনিত্য ও মায়া, সেখানে দেবালয়ে এ বিড়ম্বনা কেন? দ্বাদশ বৎসরের দুর্ভিক্ষ দিয়া এ পাষাণস্তূপ রচনা করিয়া কি ফল? দেশ কাল ত সাগরবক্ষে একটা ক্ষণিক বুদ্বুদ মাত্র; হায়, মায়াহত, তুমি জানিয়া শুনিয়াও ইহা বুঝিলে না।

মায়াই বটে—বিধাতার মায়ারাজ্যে এ শুধু মানবের মায়াস্বপ্ন।

ভুল করিয়া শাম্ব সে দিন সরসীতীরে আসিয়াছিলেন—জননী জাম্ববতী জানিলে নিষেধ করিতেন, জনক শ্রীকৃষ্ণ সঙ্গে থাকিলে আসিতে দিতেন না—শাম্বের বিমাতৃগণ তখন পরিপূর্ণ যৌবনে জলক্রীড়ায় মত্ত। মৃণাল-ভুজ আলোড়নে জল যেমন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সুন্দরীদের যৌবনও তখন সেইরূপ আবেগভরে আন্দোলিত। এই পথে শাম্ব। পিতৃমুখ হইতে অভিশাপ বাহির হইল—কুষ্ঠরোগে তোমার প্রায়শ্চিত্ত হউক।—অভিশপ্ত শাম্ব দ্বাদশ বৎসর কাল শান্ত দান্ত নিরাহার বায়ুভক্ষ্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া চন্দ্রভাগা নদীতীরে সূর্য্যকে তবে সন্তুষ্ট করিলেন। এবং সর্ব্বপাপঘ্ন দিবাকরের বরে রোগমুক্ত হইয়া মুক্তিদাতা দেবতার নামে এই মন্দির উৎসর্গ করিলেন।

সেই অবধি এই অর্কক্ষেত্রে আসিয়া সমুদ্রে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে সদ্য মুক্তিলাভ হয়। ঐ যে অর্কবট দেখা যায়, সূর্য্য স্বয়ং এখানে আসিয়া ঐ রূপ ধারণ করিয়াছেন; তিন পক্ষ কাল এই বটতরুতলে বসিয়া সূর্য্যমন্ত্র জপ করিলে মানব তৎক্ষণাৎ চরম সদ্গতি লাভ করে। এখানে রথযাত্রা দর্শনমাত্রে সূর্য্যের শরীরী রূপ দর্শনলাভ ঘটে। যে পুণ্য জন এইখানে আসিয়া অনন্যমনে নবগ্রহের স্তোত্র পাঠ করিতে পারেন, তিনি ধন্য।—অর্কক্ষেত্রের মহিমা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। কপিলসংহিতা-রচয়িতা শত শ্লোকে তাহা শেষ করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এই ঘোর কলির অভ্যুদয়ে সে প্রাচীন শ্লোকসমূহও ব্যর্থ। সংহিতা কে শুনে? বিধি কে মানে? মন্দিরের দ্বার হইতে সমুদ্র যেমন মাইল পথ সরিয়া গিয়াছে, যাত্রীর প্রবাহও সেইরূপ অর্কক্ষেত্র ছাড়িয়া পুরুষোত্তমে গিয়া ঠেকিয়াছে।—রৌদ্রদীপ্ত নারিকেল-তরুশ্রেণীর গায়ে শৈবালশ্যাম কণারক শুধু চিত্রার্পিতবৎ দেখা যায়।

পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপের নির্জ্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিম-শিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রামসুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লিমুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিক জন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখে এবং

বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন্ প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।' মনে হয়,

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।"

['সাধনা,' ভাদ্র ১৩০০]

প্রাচীন উড়িষ্যা

উড়িষ্যার গৌরবের দিন গিয়াছে। সে কেশরী রাজবংশও নাই, সে নিপুণ শিল্পীও নাই, সে ব্রাহ্মণ্যও নাই, সে শ্রমণ সম্প্রদায়ও নাই। আর অভ্রভেদী মস্তক তুলিয়া নিত্য নূতন মন্দির উঠে না, ধূপগন্ধে ঘণ্টাধ্বনিতে দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া শত গিরি নদী প্রান্তরভূমি হইতে প্রতি সন্ধ্যায় ধর্ম্মের নাম তেমন উত্থিত হয় না; পথপ্রান্তে, বালুতটে, পরিত্যক্ত গিরিশৃঙ্গে সহস্র জীর্ণ মন্দির মঠ পড়িয়া আছে, তাহারা কেবল সেই পুরাতন অতীতের সাক্ষী—দূর হইতে পথিকহৃদয়ে প্রাচীন গৌরব সঞ্চার করিয়া দেয় মাত্র।

দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত উড়িষ্যার ইহাই এখন একমাত্র সম্বল। এই সকল প্রাচীন ভগ্নাবশেষ যুগযুগান্তরের বহু বিপ্লবের মধ্য দিয়া বহু প্রাচীন কালের একটি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। শুধু ধর্ম্ম নহে, শুধু ব্রাহ্মণ্যের গর্ব্ব অথবা বৌদ্ধ সন্ন্যাসমাহাত্ম্য নহে, শুধু একটা বিপ্লবের ইতিহাস নহে; কিন্তু এই দেবমন্দিরের ভাস্কর্য্যে এদেশের প্রশান্ত প্রাচীন সভ্যতার একটি অখণ্ড চিত্র, একটি সম্পূর্ণ মহিমা চিরদিনের মত মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। পাষাণে খোদিত শত নারীমূর্ত্তির কত বিভিন্ন প্রকারের কেশবিন্যাস, কত বিচিত্র বেশভূষা, হস্তে কত বিস্মৃত প্রাচীন যন্ত্র, গঠনে কি মায়ামন্ত্র, ভঙ্গীতে কি অবলীলা মাধুরী! শত নিশ্চল দেবতা বিবিধ সজ্জায়, বহুবিধ শিরস্ত্রাণে, আজানু উপানহে সভা উজ্জ্বল করিয়াছেন। এখানে সেখানে নানাবিধ কলস, পানপাত্র, দীপাধান, শয্যা, আসন, গদা, অসি, খাঁড়া, ঢাল, ধ্বজা, দণ্ড—প্রাচীন সভ্যতার বিবিধ বিলাস-উপকরণ।—চক্ষের সমক্ষে মন্দিরে খোদিত একখানি সুবৃহৎ প্রাচীন গ্রন্থ—হে দূরাগত পান্থ, এইখানে আসিয়া একবার তোমার পূর্ব্বপুরুষের সমাজচিত্র দেখিয়া যাও।

বর্ত্তমান উৎকলের সহিত ইহার কিছুই মিলে না। কোথায় সে-নিত্য নব কবরীর শোভা, কোথায় সে বিচিত্র কেশবিন্যাসের সহিত সুশোভন বিবিধ অলঙ্কার, কোথায় সে মৃণালভুজে চারু বলয়কঙ্কণ! উড়িষ্যাসুন্দরী হরিদ্রারঞ্জিতদেহে একখানি আজানুলম্বিত শাড়ী জড়াইয়া গুরুভার কাংস্যালঙ্কারে মৃণালবাহুর মণিবন্ধাবধি অর্দ্ধাংশ নরলোকের দৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখেন এবং মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া ও সীমন্তে সিন্দুর লেপন করিয়া কেশবিন্যাসনৈপুণ্যের প্রতি অনেক পরিমাণে উপেক্ষা প্রদর্শন করেন।—তাই বলিয়া সুকেশিনীগণের মধ্যে তখনকার সকল ফেসান একেবারে লোপ পায় নাই। ভুবনেশ্বরের ভাস্কর্য্যে কেশবিন্যাসের যে সকল ফেসান দেখা যায়, তাহার কোন কোনটি অদ্যাবধি উড়িষ্যার নর্ত্তকীদিগের মস্তকের শোভা সম্পাদন করে এবং কোন কোনটি মান্দ্রাজ অঞ্চলে এখনও বিশেষ প্রচলিত। সচরাচর আমরা যাহাকে মান্দ্রাজী খোঁপা বলি—মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে গুচ্ছীকৃত বেণীবন্ধনহীন কেশকলাপ—তাহা অনেকটা এই পাষাণখোদিত খোঁপারই অনুরূপ। কেবল, সে কালে এই খোঁপার সহিত যে সকল গহনা ব্যবহার ছিল, এখন তাহা আর দেখা যায় না।

ভুবনেশ্বরে এই মান্দ্রাজী ধরণের খোঁপারও আবার নানা বিভিন্ন ফেসান দৃষ্ট হয়। খোঁপা কখনও মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত, কখনও বা বাম পার্শ্বে ঈষৎ হেলান, কখনও কেশগুচ্ছকে বিভক্ত করিয়া দুই পার্শ্বে দুইটি স্বতন্ত্র খোঁপার মত করিয়া দেওয়া, এবং কোন কোনটিতে এই খোঁপার উপর গুটিকতক কুঞ্চিত কুন্তল ও ললাটদেশ বাহিয়া দুইটি সুন্দর ঝাপ্টা। মস্তকের উপরিভাগেও অনেক সময় খোঁপা স্থাপিত হইত—কখনও বাম পার্শ্বে কর্ণদেশের উপরিভাগে ঈষৎ বঙ্কিম ঝুঁটির মত, কখনও একটু চেপ্‌টা বেল্লনাকার এবং তাহারই মধ্যস্থলে একটি চারু গোলক, কখনও বা কর্ণ হইতে কর্ণান্তর অবধি শ্রেণীবদ্ধ ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনীবৎ ; কেশবিন্যাসের অন্ত নাই এবং বৈচিত্র্যেও অশেষ।

এখন যাহা পাষাণে খোদিত মাত্র, এক সময়ে এ সকলি জীবন্ত ছিল। কুলনারীরা প্রাসাদের নিভৃত বাতায়নসম্মুখে বিচিত্র কারুকার্য্যখচিত সুখাসনোপরি উপবেশন করিয়া কেশ এলাইয়া দিতেন ; দীর্ঘ কেশগুচ্ছ কেদারার মকরমুখশোভিত পৃষ্ঠদেশ ছাইয়া পড়িত এবং সুন্দরী পরিচারিকা কঙ্কতিকা হস্তে পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কেশের পরিচর্য্যা করিত। পার্শ্বে সুনির্ম্মিত টিপায়ের উপরে পানের বাটা, সম্মুখের পাদপীঠে দুইখানি অলক্তকরঞ্জিত কোমল পদপল্লব।

কেশবন্ধনাদি সমাপনান্তে বেশভূষার পালা। কঞ্চুলিকাবদ্ধ অঙ্গোপরি লঘু অঙ্গিকা, এবং কোঁচা দিয়া পরা মনোহর শাড়ী। খোঁপায় মুক্তার মালা ; ললাটের উপরিদেশে

সিঁথি; কর্ণে দুটি দুল; কণ্ঠে হীরককণ্ঠী বা মুক্তাহার; বাহুতে তাবিজ, বাজু বা তাড়; প্রকোষ্ঠে বলয়, কঙ্কণ বা শাঁখা; কটিদেশে চন্দ্রহার; চরণে নূপুর, কিঙ্কিণী, গুজরী।

অলঙ্কার ব্যবহার পুরুষদিগের মধ্যেও নিতান্ত বিরল ছিল না। সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের কটিদেশে প্রায়ই এক একটি চন্দ্রহার শোভা পাইত। এবং কারুকার্য্যখচিত রেশমী ধুতির উপরে তাহারই উজ্জ্বল আভা পড়িয়া যুবতীজনের চিত্ত হরণ করিত। ইহা ভিন্ন, হস্তে বলয়, কর্ণে বীরবৌলি, গলায় হার, এ সকলও কঠিন পুরুষদেহের শোভা সম্পাদনে অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইত না। এবং উচ্চ জনের ধনগৌরব ও পদমর্য্যাদার সহিত ইহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল বলিয়া বোধ হয়।

শুধু অলঙ্কার নহে, বেশবিন্যাসেরও বিশেষ একটু পারিপাট্য ছিল। এবং ধুতি ভিন্ন পায়জামা, জামা, চাপকান, উষ্ণীষ প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। রাজসভায় এক বেশ, এবং দেবমন্দিরে এক বেশ; রণক্ষেত্রে যে বেশ, প্রিয়জনকক্ষে সে বেশ নহে।—খণ্ডগিরি ও ভুবনেশ্বরের পাষাণশিল্পে এই বেশবৈচিত্র্যের একটি সুন্দর চিত্রাভাস পাওয়া যায়। এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সেই বহু প্রাচীন কালেও ভারতবর্ষীয় সভ্যতা আদিম অবস্থা হইতে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিল।

জীবনস্রোত ভারতবর্ষে তখনও মন্দীভূত হইয়া আসে নাই। জীবনে সুখও ছিল, সখও ছিল।—সুরম্য হর্ম্ম্যমধ্যে সুসজ্জিত কক্ষে প্রমদাগণ দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বসিয়া প্রিয়জনের সহিত সুখে প্রেমালাপ করিতেন; অনতি উচ্চ মঞ্চোপরি সরক ও পানপাত্র থাকিত, এবং সুন্দরীর পাণ্ডু কপোলদেশ বারুণীরাগসঞ্চারে অরুণিম শোভা ধারণ করিত; কলাবিদ্যার তখন বিশষ প্রাদুর্ভাব। বীণার তারে তারে নাচিয়া নাচিয়া তন্বঙ্গীর চম্পক-অঙ্গুলি সৌদামিনীর মত খেলিয়া বেড়াইত এবং প্রিয়জন সেই চঞ্চল অঙ্গুলিচালনার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পাইতেন না। কেবল, সেই মধুর বীণাধ্বনি, সুন্দরীর অঙ্গরাগসৌরভ ও চঞ্চল রূপের তরঙ্গ মিলিয়া মলয়সেবিত চন্দ্রালোকস্নিগ্ধ নিশাকে স্বপ্নের মত মনোহর করিয়া তুলিত।

দীর্ঘ প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানে দিগন্তবিস্তৃত নীল চন্দ্রাতপতলে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়া সুন্দরীগণ কত নিশি প্রিয়জনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। দূর হইতে গন্ধবহ কেতকী-সৌরভ বহন করিয়া আনিত, এবং চূতশাখায় বসিয়া পাপিয়া জ্যোৎস্নাপুলকিতকণ্ঠে মনের খেদ মিটাইত। প্রিয়জন এখানে আসিয়াই প্রেয়সীর কেশপাশে বহুযত্নগ্রথিত বকুলমালা জড়াইয়া দিয়া অনঙ্গের মনোবেদনা দূর করিতেন।

উৎকলের সে সকল দিন গত। মাল্য এখনও গ্রথিত হয়, কিন্তু তাহার সে পূর্ব্বাদর নাই; বীণা নীরব হইয়াছে; সুসঙ্গীতও বড় শুনা যায় না। উৎসবের সময়ে উড়িষ্যার

গৃহে গৃহে শুধু এক অত্যন্ত বেসুরা সানাই প্রাণপণে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সঙ্গীতের কলঙ্ক রটনা করে মাত্র; এবং পথক্লিষ্ট পথিক তাললয়সুরহীন দারুণ চীৎকারে মধ্যে মধ্যে কর্ণজ্বর উপস্থিত করে।

সহজেই সন্দেহ হয় যে, এই উৎকলীয়েরা কি সেই কলাকুশলদিগের বংশধর? ইহাদের পিতৃপুরুষেরাই কি স্থাপত্যে ও ভাস্কর্য্যে বিলাসকলার এমন অক্ষয় স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন? অথবা গঙ্গা ও যমুনার দেশ হইতে এক উন্নত প্রবলপ্রতাপ আর্য্যজাতি আসিয়া এইখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন? এবং উৎকলীয়েরা তাঁহাদের অধীনে জন খাটিত মাত্র?

কারণ, বিলাস অবশ্য সমস্ত দেশ জুড়িয়া ছিল না। দেশে দরিদ্রও বিস্তর ছিল। এবং বিলাস সমুচ্চ প্রাসাদ ছাড়িয়া দরিদ্রের গৃহে পদার্পণ করিতে কুণ্ঠিত হইত। সেখানে চিরদিন যেমন হইয়া থাকে, স্ত্রী গৃহকার্য্য করে, স্বামী মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া আনে। মাটির ঘরে গুটিকতক হাঁড়ি কলসী এবং একটি চারপাই মাত্র হয় ত দম্পতির ইহজীবনের সম্বল। ইহার উপর, অতিরিক্ত খাটিয়া কোনরূপে স্ত্রীর হাতের দুইগাছি রূপার খাড়ু গড়াইয়া দিতে পারিলেই পতির জীবন সার্থক।

এবং তাহাও নিতান্ত দুর্লভ ছিল না। কাজ যথেষ্ট ছিল। তন্তুবায় তাঁত বুনিত, স্বর্ণকার গহনা গড়িত, কর্ম্মকারের ঘরে অস্ত্রের ফরমাস বারো মাসই ছিল। রাজবাড়ী হইতে মধ্যে মধ্যে যে দিন পাগ্ড়ী-আঁটা প্রহরী আসিয়া তাগাদা করিত, কর্ম্মকারপত্নী বাপু বাছা কহিয়া প্রহরীকে খুসী করিয়া দিত, স্বর্ণকার প্রহরিগৃহিণীর জন্য রূপার দুইটি গুঁজি গড়িয়া দিয়া বলিত,—মহারাজ, এখন কিছু কাল অব্যাহতি দাও, এবং তন্তুবায় গোপনে প্রহরীকে ঘরে লইয়া গিয়া দেখাইত, প্রহরিণী মাসীর কাপড় হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

এমনি দেখিতে দেখিতে ধান কাটার দিন আসিত। সোনার ধানে ক্ষেত ভরিয়া উঠিয়াছে। কৃষকেরা দলে দলে ধান কাটিতে বাহির হইয়াছে; কৃষকাঙ্গনারা গান গাহিতে গাহিতে ধানের আঁটি বাঁধিতেছে। গৃহে গৃহে উৎসব। দেবতামন্দিরে পূজার ভারি ধুম। সিংহাসন হইতে রাজা নামিয়া আসিয়াছেন, প্রাসাদ হইতে অমাত্যের দল উপস্থিত, পশ্চাতে সমস্ত প্রজাপুঞ্জ; মন্দিরের প্রাঙ্গণ হইতে বাহিরের দিগন্ত অবধি লোকারণ্য। উজ্জ্বল নীলাকাশতলে বিচিত্র উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষা—ময়ুরকণ্ঠী ধূপছায়া লাল নীল সোনালী গোলাপী বেগুনী নানা বর্ণের তরঙ্গ; মণিমুক্তা জরী জহরৎ ঝক্‌মক্ করিতেছে। পট্টবস্ত্রপরিহিত ব্রাহ্মণেরা মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, হোমাগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি ও লাজাঞ্জলি প্রদত্ত হইতেছে, স্তূপাকার পুষ্পরাশিতে দেবতা দুর্নিরীক্ষ্য; বাহিরে নহবৎ বসিয়াছে, ভিতরে

কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খধ্বনির বিরাম নাই; আবালবৃদ্ধবনিতা রাজা হইতে ভিক্ষুক অবধি নতশিরে দেবতার আশীষ গ্রহণ করিতেছেন।

এখনকার কালের মত রাজা প্রজায় তখন একটা দূর সম্পর্ক ছিল না। রাজা পিতার মত ছিলেন—পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে পালন করিতেন। প্রজারাও সুখে দুঃখে রাজদ্বারে গিয়া দাঁড়াইত—তাহাতে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত না। শাসনতন্ত্র তখন এত জটিল হয় নাই, সুচারুও হয় নাই বটে; কিন্তু দুর্ব্বল প্রজাপুঞ্জের স্কন্ধদেশে তাহা একটা দুর্ব্বহ গুরুভারের মত চাপিয়া ছিল না। রাজার অধীনে সমস্ত দেশ যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবার; তাহার ত্রুটি সহস্র, কিন্তু সেখানে সহৃদয়তারও অসদ্ভাব নাই। স্বদেশীয় রাজা সহজেই দেশের সুখদুঃখ বুঝিতেন, এবং তাঁহার সমস্ত হৃদয় দেশের সহিতই বাঁধা ছিল।

প্রতি দিন প্রাতঃকালে রাজকার্য্য সম্পন্ন হইত। বৃহৎ সভামণ্ডপ বিবিধ বর্ণের উষ্ণীষে শোভিত। স্বর্ণসিংহাসনোপরি হেমমুকুটশিরে রাজা; দণ্ডধর দণ্ড ধরিয়া দাঁড়াইয়া, ছত্রধর মুক্তাঝালরশোভিত ছত্র ধারণ করিয়া আছে, দুই দিক্ হইতে দুই জন পরিচারক চামর ব্যজন করিতেছে। সিংহাসনতলে পদমর্য্যাদানুসারে সভাসদ্‌গণের আসন নির্দ্দিষ্ট। শুক্লকেশ প্রবীণেরা শুভ্র বেশ পরিধান করিয়াছেন—আজানুলম্বিত চাপকান, মস্তকে শুভ্র উষ্ণীষ। নবীনদিগের বেশভূষায় বর্ণবৈচিত্র্যের অন্ত নাই—বিবিধ বর্ণের বহুমূল্য চীনাংশুক বসন এবং তদুপরি নানাবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্য। এখনকার মত আপাদমস্তক কুয়াশার দেশের কৃষ্ণ আবরণে আচ্ছাদিত করা তখনকার ফেসান ছিল না। ভারতবর্ষের উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে স্বভাবতই বিবিধ উজ্জ্বল বর্ণের বেশভূষার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল।

মধ্যাহ্নশঙ্খধ্বনি শুনা পর্য্যন্ত এই উজ্জ্বল রাজসভা পরিপূর্ণ থাকিত। প্রজা বেদনা জানাইতে আসিয়াছে, রাজা বিচার করিতেছেন। বৈদেশিক দূত উপঢৌকন লইয়া আসিয়াছেন, যথাযোগ্য সৎকার সহকারে উপঢৌকন গ্রহণপূর্ব্বক রাজা তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন। মন্ত্রিগণ রাজকার্য্যের উপদেশ লইতেছেন; ব্রাহ্মণেরা দেবকার্য্যের উপদেশ দিতেছেন; রাজ্যের তুচ্ছতম কর্ত্তব্য অবধি এখানে উপেক্ষিত হয় না।

রাজা যদি কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন, প্রজাগণ দেবদ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। রাজার উপরে এক দেবতা, আর ব্রাহ্মণ। দেবতার চরণতলে উৎসৃষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ্য দেবতুল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার এক অভিশাপে সহস্র সিংহাসন নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া যায়, বাসুকির সহস্র শির বিচলিত হইয়া উঠে, সৃষ্টি সেই আদিম অন্ধকারের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া আসে। দেবতা আর ব্রাহ্মণ একই। যে ব্রাহ্মণকে প্রসন্ন করিতে পারে, সে দেবতার প্রসাদ লাভ করে; যে দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া চলে, সে ব্রাহ্মণেরও প্রিয়।

সেই ব্রাহ্মণ মনুর বিধি লঙ্ঘন করা রাজারও অসাধ্য। যদি করেন, সমস্ত ব্রাহ্মণ্য ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, দেবতা বিমুখ হইয়া দাঁড়ান, রাজ্য উৎসন্ন যায়। সুতরাং রাজার অত্যাচারের প্রতীকার এই দেবমন্দিরেই সম্ভব—যেখানে দেবতা এবং দেবতার অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ নিয়ত বিরাজ করিতেছেন।

কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের তাড়নে ব্রাহ্মণ্য তখন কতকটা দুর্ব্বল হইয়াও পড়িয়াছিল। যদিও বৌদ্ধ রাজসভায় ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা শ্রমণ অপেক্ষা হীন ছিল না এবং বৌদ্ধ রাজগণ দানাদি কার্য্যে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগের প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন, তথাপি চিরন্তন অদ্বিতীয়ত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণেরা বুঝিয়াছিলেন যে, এই জাতিনাশী ধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্যের প্রধান শত্রু এবং ইহার যতই প্রচার হয়, ব্রাহ্মণ্যের ততই সঙ্কট দশা। সেই জন্য তাঁহাদের স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাজশক্তির বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণেরা সহজে উত্তেজিতও হইতেন না।—রাজন্যশক্তিও ব্রাহ্মণ্যকে মানিয়া চলিত। তখনও চাণক্যের নাম কেহ ভুলে নাই। রাজা বুঝিতেন যে, ঐ প্রশস্ত ললাট তীক্ষ্ণ নাসাগ্র দিয়া যাহাকে বিঁধে, তাহার আর নিস্তার নাই।

এই সন্ধিস্থাপনে ব্রাহ্মণ্যও প্রবল হইয়া উঠিল এবং রাজন্যও প্রাধান্য লাভ করিল। ব্রাহ্মণদিগের সহস্র অনুষ্ঠান-আড়ম্বরে রাজা প্রাণপণে সহায়তা করেন এবং রাজা যখন আবশ্যকমত শূদ্রকণ্ঠে যজ্ঞোপবীত দিয়া এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ গড়িয়া লয়েন, ব্রাহ্মণেরাও তখন তাদৃশ আপত্তি করেন না। এবং এই ব্রাহ্মণ্যের অনুগ্রহ-বিধিতে সাধারণ্যেও সকলি নির্ব্বিবাদে চলিয়া যায়।

প্রাচীন উড়িষ্যা এইরূপ ছিল। ব্রাহ্মণ্যের পক্ষপুটচ্ছায়ায় রাজন্যের পরিপোষণে ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার অনুষ্ঠান বেশভূষা শিল্পকলা পুঞ্জীভূত হইয়া কেমন একটি শান্ত সমগ্রতা লাভ করিয়াছিল। ইহাই সভ্যতা। এবং প্রাচীন উড়িষ্যার ইহাই গৌরব। এখন শুধু ভগ্নাবশেষ ভাস্কর্য্যে এই গৌরবকাহিনী কথঞ্চিৎ মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে মাত্র। নহিলে, সে সভ্যতার কিছুই নাই; সে বেশভূষাও নাই, চাপকানও নাই, উষ্ণীষও নাই, বিবিধ আগুল্‌ফ আজানু উপানৎও নাই। প্রাচীন কালে সোফা কৌচ কেদারার ন্যায় বিবিধনাম যে সকল আসনাদি ও গৃহসজ্জার বহুবিধ আসবাব ছিল, তাহাও এখন দুর্লভ। উড়িষ্যার ভাস্কর্য্যেও তাহার শ্রেষ্ঠ নমুনা অল্পই পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্বপণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের গ্রন্থে অমরাবতী-ভাস্কর্য্যের যে গুটিকতক চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহার আসনাদি বর্ত্তমান সভ্যতানুমোদিত গৃহসজ্জার আসবাবের এত অনুরূপ যে, দেখিলে বিস্ময় জন্মে। ইহা ভিন্ন, প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির বর্ণনা পাঠে ও পুরাতত্ত্ববিষয়ক চিত্রাদি দর্শনে সময় সময় আশ্চর্য্য হইয়া থাকিতে হয়—সে কালে কি এ কাল ছিল। এবং এই সকল হইতেই প্রাচীন ভারতবর্ষে একটি সুন্দর পরিপাটি সংস্কৃত সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়

থাকে না; এবং সেই বহু প্রাচীন কালের মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া ক্ষণিকের জন্য আমরা বর্ত্তমান দুঃখ দৈন্য হইতে দূরে থাকি। ['সাধনা,' আশ্বিন-কার্ত্তিক ১৩০০]

বারাণসী

বৃহৎ ভারতবর্ষের নানা জাতি ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যদি কোথাও আন্তরিক মিলনক্ষেত্র থাকে ত সে এই প্রাচীনা দেবধানী বারাণসী। তাহার প্রাচীন কীর্ত্তি সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে এবং তাহার প্রধান দেবতা বিধর্ম্মীর উপদ্রবে মন্দির ছাড়িয়া বাপীমধ্যে আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু তথাপি বারাণসীই ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান এবং তিব্বতপ্রান্ত হইতে সেতুবন্ধাবধি বহু কোটি মানবের একমাত্র অন্তিম কামনা। ভারতবর্ষে তীর্থ আরও অনেক আছে এবং যাত্রীর ভীড় সকলগুলিতেই যথেষ্ট; কিন্তু বারাণসীতে কেবলমাত্র যাত্রীর ভীড় নহে, ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের বহু মুমুক্ষু ও বহু ভক্ত গৃহ ছাড়িয়া চিরদিনের মত এই পুণ্যতীর্থে দিনযাপন করিতে আসেন। এবং এই বহু দূরদেশের বহু লোকসমাগমে বারাণসী সুবৃহৎ ভারতবর্ষের একটি সংহত সংক্ষিপ্তসার বলিয়া প্রতিভাত হয়।

আমাদের রাজনৈতিক মিলনক্ষেত্র কলিকাতায় নানা প্রদেশের বহু লোকসমাগম হয় বটে, কিন্তু ভারতবর্ষ সেখানে নিজ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া দেখা দেয় নাই; প্রস্তর দিয়া আপন স্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করে নাই, ইট কাঠ দিয়া বিদেশী ছাঁচে অচিরস্থায়ী আপিস গড়িয়া রাখিয়াছে। বারাণসীতে তাহা নহে, হিন্দুস্থানের সকল সম্প্রদায়ই এখানে আপনাপন স্থায়ী চিহ্ন অক্ষয় কীর্ত্তি বহু যত্নে স্থাপন করিয়াছে এবং এই সকলগুলিই সমান ভাবে হিন্দুসন্তানের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করে। ইহাতে ফল হইয়াছে এই যে, দেবমন্দিরে আসিয়া ক্ষুদ্র জাতিবিদ্বেষ আর প্রধূমিত হইয়া উঠে না এবং সকলেই আপন আপন প্রাদেশিক গর্ব্ব বিস্মৃত হইয়া এক মহা হিন্দুজাতিগৌরবে আপনাকে সম্মানিত জ্ঞান করিতে থাকে।

এই যে বিভিন্ন প্রদেশীয়দিগের মধ্যে একটি অকপট ভ্রাতৃভাব সংস্থাপন—ইহাতেই বারাণসীর এত মাহাত্ম্য। এবং আদিম কাল হইতে অদ্যাবধি চিরদিনই বারাণসী ভারতবর্ষের ধর্ম্মধানীরূপে এই মহাকর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছে। কেবলি যে, শৈব ধর্ম্মের গৌরবে বারাণসীর আজি এত প্রভাব, তাহা নহে, এই গঙ্গা বরুণার সঙ্গমক্ষেত্রে অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা শাস্ত্র, নানা তন্ত্র, নানা মত, নানা অনুষ্ঠান আসিয়া সঙ্গত হইয়াছে; এবং ভারতবর্ষের বিশাল বক্ষের উপর দিয়া মধ্যে মধ্যে যে প্রবল ধর্ম্মান্দোলন বহিয়া গিয়াছে, তাহারও সূচনা অনেক সময় এই বারাণসীর ধর্ম্মসঙ্গমে।

যে বৌদ্ধ মত এক সময়ে ব্রাহ্মণ্যের সমস্ত দেবতাগর্ব্ব চূর্ণ করিতে বসিয়াছিল এবং আজিও যাহা ব্রাহ্মণ্যের শাসনে দেশান্তরিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রথম প্রতিষ্ঠা এই শিবধামে। এইখানেই বুদ্ধ প্রথম উপদেশদান সুরু করেন এবং এইখান হইতেই দেশবিদেশে তাঁহার বৈরাগ্য প্রচার হইতে আরম্ভ হয়। সারনাথে রাজা অশোকের যে ভগ্নাবশেষ স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা এই আদিম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারেরই স্মৃতিস্তম্ভ। এই সেই পুরাতন মৃগদাব কানন—যেখানে প্রথম কেবলমাত্র কতিপয় শিষ্যমধ্যে অহিংসার মহামন্ত্র প্রচারিত হয় এবং সমাগত শিষ্যমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বোধিসত্ত্ব সকলকে দিকে দিকে এই মহাধর্ম্ম প্রচারে বাহির হইতে আদেশ করেন।

তখন বুদ্ধের ষষ্টি জন মাত্র শিষ্য সম্বল। এবং বারাণসী ভারতবর্ষের সমস্ত পাণ্ডিত্যের মহাদুর্গ। প্রতি সন্ধ্যায় মন্দিরে মন্দিরে দেবতার নামে যখন সহস্র কণ্ঠ হইতে বেদধ্বনি উত্থিত হইত, পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে সমস্ত নূতন মত, নূতন ধর্ম্ম, নব উদ্যম, ভূমিকম্পে বাসুকির শিরঃসমূহের ন্যায় সঘনে বিচলিত হইয়া উঠিত। এই শৈব পুরীমধ্যে বিধর্ম্মীর বিহার নির্ম্মাণ হইবে, এমন কেহ কখনও স্বপ্নেও মনে করিত না।—কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মও কালক্রমে নগরমধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। এবং বারাণসীর তীর্থক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ যাত্রীর ন্যায় বৌদ্ধ যাত্রীরও সমাগম হইতে লাগিল। এমন কি, সে দিনও হিয়োন্থ সাং যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন, বারাণসীতে অনেকগুলি বৌদ্ধ বিহার এবং প্রায় তিন চারি সহস্র বুদ্ধমতাবলম্বীর বাস ছিল।

এইরূপে দুই মহাধর্ম্মপ্রবাহের আদিস্থান হইয়া বারাণসী ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। শুধু ভারতবর্ষ কেন, বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মোত্রী হইয়া বারাণসী সমগ্র পূর্ব্ব-এসিয়ার আদি তীর্থ। এবং যখন মনে করা যায় যে, পৃথিবীর কত কোটি লোক এই প্রাচীনা ধর্ম্মধানীর দিকে চাহিয়া চিরজীবন কি অমোঘ সান্ত্বনা লাভ করে, তখন বারাণসীর মাহাত্ম্য অনুভব না করিয়া থাকা যায় না। জাপান হইতে গুর্জ্জর অবধি একদিন আবশ্যক হইলে যদি কেহ একত্র করিতে পারে ত সেই সনাতন গাঙ্গ্য পুণ্যভূমি

কিন্তু হায়, সে দিন শুধু স্বপ্নের কথা। বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্মের আর কি আছে? যেখানে বিহার ছিল, সেখানে মস্‌জিদ উঠিয়াছে; যেখানে অহিংসাই একমাত্র ধর্ম্ম ছিল, ধর্ম্মান্ধ মুসলমান দম্ভ সে স্থানকে রক্তস্রোতে কলঙ্কিত করিয়াছে; যে মৃগদাব কাননে একটি মৃগহত্যা হইতে পাইত না, সেখানে শত শত অসহায় মানবশিশু পঙ্গপালের মত জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ হইয়াছে। সারনাথের সেই দগ্ধাবশেষ এখন শুধু পুরাতত্ত্বান্বেষীর হৃদয়ে বিস্ময় ও ক্ষোভ সঞ্চার করিয়া দেয় মাত্র এবং মানুষের প্রতি মানুষ যে কত দূর নৃশংস হইতে পারে, তাহারই পরিচয় দিয়া থাকে।

সন্ন্যাসীদিগের অপরাধ, তাঁহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না; এবং এই অপরাধে গুরুদণ্ড, অগ্নিতে নির্ব্বাণ। তখন আহারসময়। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা যে অন্নটুকুর সংস্থান করিয়াছিলেন, এই মৃগদাবের পুণ্যক্ষেত্রে সকলে একত্র হইয়া তাহাই সেবন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। এমন সময় শাণিত অসিহস্তে সহসা অশ্বারোহীদল আসিয়া উপস্থিত। এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে কোরাণ। হয় জীবন হইতে মুক্তি, নয় পুরাতন সমস্ত বন্ধন ছেদন। নির্ব্বাণপরায়ণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা জীবনকেই তুচ্ছ করিলেন, তাঁহাদের মুখের গ্রাস মুখে রহিয়া গেল; নিমেষের মধ্যে সেই বৃহৎ বিহারক্ষেত্র ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিল এবং সেই মৃত্যুদৃশ্যের মধ্য হইতে বিজয়ী সেনার আনন্দকলরব উত্থিত হইয়া দশ দিকে এক ভীষণ বিদ্রূপের ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল।

সারনাথ ধ্বংস করিয়াই যদি মুসলমানদিগের মনের ক্ষোভ মিটিত, তাহা হইলেও রক্ষা ছিল। কিন্তু তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট হইবার পাত্র নহে। সহরে যত বৌদ্ধ বিহার ছিল, তাহা কতক ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিল, কতকগুলির উপর গম্বুজ ও মিনার উঠাইয়া দিল। বারাণসীতে প্রাচীন কীর্ত্তি এখন যাহা দেখা যায়, তাহা এই গম্বুজ ও মিনারের অন্তরালে সাধারণের দৃষ্টি হইতে প্রচ্ছন্ন।

হিন্দুদিগের যে সকল দেবালয় আছে, তাহার একটিও অধিক দিনের নহে। প্রাচীন যাহা ছিল, তাহা মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে। এবং বিশ্বেশ্বরের অভ্রভেদী স্থাপত্যগৌরব খর্ব্ব হইয়া অবধি বারাণসীতে মন্দিরের চূড়া আর আকাশ ভেদ করিয়া উঠে নাই। তথাপি গঙ্গাবক্ষ হইতে কাশীধামের দৃশ্যটি অতি মনোহর। মন্দিরের পর মন্দির, অট্টালিকার পর অট্টালিকা, নদীগর্ভ পর্য্যন্ত লোকপরিপূর্ণ পাষাণসোপানাবলী। সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরতোরণে প্রতি দিন নহবৎ বসে; প্রতি দিন অগণ্য যাত্রী দশাশ্বমেধে স্নান করিয়া পূত হয়; এবং মণিকর্ণিকায় চিরপ্রজ্বলিত চিতাগ্নি মহাকালের অলঙ্ঘ্য মহিমা প্রচার করে।

কত দিন হইতে যে এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কে জানে! সকলই যে অতি প্রাচীন, তাহা নহে, এবং সকলই যে আধুনিক, তাহাও নহে। কালে কালে নানা কারণে কাশীধামের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এবং নানাজাতীয় বিচিত্র লোকসমাগমে বিভিন্ন দেবতার সহিত নানাবিধ অনুষ্ঠানও দুই দশটা করিয়া কাশীক্ষেত্রে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। হয় ত যেখানে পূর্ব্বে পতিত ভূমি ছিল, সেখানে একটি নূতন মন্দির বা ঘাট উঠিয়া অবধি কতকগুলি অর্দ্ধপৌরাণিক গল্প আসিয়া জুটিয়াছে এবং তদবধি সে স্থানে স্নান বা দান বা কোনও একটি বিশেষ কর্ম্মের অনুষ্ঠান অত্যন্ত পুণ্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হয়। হয় ত কোথাও কোন একটি স্মরণীয় উপদ্রব ঘটিয়াছিল এবং সেই উপদ্রব শান্তি হওনাবধি একটি দেবাসুরসংগ্রামকাহিনী যুক্ত হইয়া সেই স্থানের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিয়াছে। এমনি

করিয়া আদিম কাল হইতে এ পর্য্যন্ত কাশীর প্রায় প্রত্যেক পাষাণখণ্ড অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীসংযোগে এক একটি ক্ষুদ্র তীর্থ হইয়া উঠিয়াছে। কোন্‌টি যে কত কালের প্রাচীন, সকল সময় তাহা ঠাহরাইয়া উঠা কঠিন।

কিন্তু বিশ্বেশ্বর বারাণসীর আদিদেবতা, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীন পরিব্রাজকেরা ভারতে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের পূর্ণ গৌরব দেখিয়াছেন। এবং বুদ্ধ যে এত দেশ থাকিতে বারাণসীকেই তাঁহার প্রথম প্রচারক্ষেত্ররূপে বরণ করেন, সে কেবল এই বিশ্বেশ্বরের গৌরবে সাধারণ্যে তখন বারাণসীর সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দেখিয়া। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইলে এই ধর্ম্মধানী হইতে আরম্ভ করাই শ্রেয়।

কারণ, বারাণসীতে নানা সম্প্রদায়ের বহু পণ্ডিত ও সাধু সন্ন্যাসিগণ সর্ব্বদা অবস্থিতি করিতেন। তাঁহাদের সহিতই ধর্ম্ম আলোচনার সুবিধা। এবং ইঁহাদের মতিগতি ফিরাইতে পারিলে ভারতবর্ষের মতিগতি ফিরানও অনেক সহজ হইয়া আসে।—কিন্তু সমগ্র বারাণসীকে বুদ্ধ স্বমতে আনিতে পারেন নাই। যদিও বারাণসীর দেবধর্ম্মে বৌদ্ধ প্রভাব একেবারে নিষ্ফল হইয়াছিল, এমনও বোধ হয় না। অদ্যাবধি সেখানে যে সকল নানা সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী দেখা যায়, তাহাতে সময় সময় বৌদ্ধ প্রভাব অনুমিত হয়।

কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম বিশেষরূপে বৌদ্ধ আশ্রম নহে। এবং হিয়োন্থ সাং আসিয়া বিশ্বেশ্বরের দ্বারে যে অগণ্য নগ্ন ও ভস্মাবৃততনু সন্ন্যাসী দেখিয়াছিলেন, তাহা শ্মশানবাসী শিবেরই আদর্শানুরূপ। বৌদ্ধধর্ম্ম এই সন্ন্যাসাশ্রমে একটা নূতন জীবন সঞ্চার করিয়াছে মাত্র। এবং সেই হইতে দেশে প্রব্রজ্যার গৌরব অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বহু দিনের বিচ্ছেদবশতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের যতটা দূর হইয়া পড়িয়াছে, বাস্তবিক তাহার সহিত আমাদের সেরূপ দূর সম্পর্ক নহে। বৈরাগ্যপ্রবণ ভারতবর্ষে বুদ্ধ একেবারে নূতন কিছুই প্রচার করেন নাই; অনেকগুলি মত ও বিশ্বাস, যাহা দর্শনশাস্ত্রের নিভৃত নিকেতনে নিয়ত আলোচিত হইত, সেইগুলিকে একটি নির্দ্দিষ্ট গঠন দিয়া তিনি সাধারণ্যে প্রচার করিয়াছেন মাত্র। এবং ইহারই আনুষঙ্গিকরূপে কতকগুলি বিশেষ আচার অনুষ্ঠান স্বাভাবিক নিয়মে ধর্ম্মের চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে সংসক্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু ভারতবর্ষীয়দিগের নিকট ইহা কখনও বিজাতীয় ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয় নাই। ভারতবর্ষে বহু দিন ধরিয়া শৈব ও বৌদ্ধ, দুই ধর্ম্ম বরাবর পাশাপাশি ছিল। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইলেও পরস্পরের প্রতি হিন্দু-মুসলমানের বিদ্বেষভাব কখনই ছিল না। বরঞ্চ, উভয় সম্প্রদায়ই উভয়ের ধর্ম্মগুরুদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতি এই গুণে পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ। পরের মত তাহাদিগের একেবারে অগ্রাহ্য নহে। সেই জন্য লিঙ্গপূজা বৌদ্ধ নির্ব্বাণতত্ত্বের পরিপুষ্টির ব্যাঘাত করে নাই। অথচ এই দুয়ের মধ্যে মূলেই বিরোধের সূচনা রহিয়াছে। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ চরমে 'কিছুই না'তে গিয়া শেষ হয়; এবং শিবলিঙ্গ সংহারান্তে যে শক্তি পুনর্ব্বার সমুদয় চরাচর সৃষ্টি করিবে, তাহারই পরিচায়ক চিহ্ন। সুতরাং যত দিন এই শক্তি রহিয়াছে, তত দিন চরাচরের চরম নির্ব্বাণের কোন সম্ভাবনা নাই। এবং এ শক্তি যখন অক্ষয়, তখন প্রলয়ের পর সৃষ্টি এবং সৃষ্টির পর প্রলয় চিরদিনই চলিবে আশা হয়। বৌদ্ধ নির্ব্বাণবাদ এই চিরন্তন সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়প্রবাহের এক জায়গায় ছেদ দিতে চাহে—যেখানে পঁহুছিয়া ভূলোক দ্যুলোক, দেব মানব, এমন কি, এই সমুদয়ের যদি কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা থাকেন, তিনিও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবেন। আমাদের মহাপ্রলয়ও এরূপ সমুদয় সত্তার আত্যন্তিক বিলোপসাধন নহে, কিন্তু এক পূর্ণ সত্তায় সমস্ত ক্ষুদ্র সত্তার চরম পরিণতি মাত্র।

এই নির্ব্বাণ এবং প্রলয়ের এ পর্য্যন্ত কোনও মীমাংসা হয় নাই। কিন্তু এখন একটা আপোষে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে—এবং হিন্দুহৃদয় কোনটা শুনিলেই অতিমাত্র বিচলিত হয় না। যেমন করিয়া হউক, মায়ার পরপারে উত্তীর্ণ হইলেই হইল। জন্মপরিগ্রহের কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করাই একমাত্র কামনা। হিন্দুর লয়তত্ত্ব ও বৌদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব, উভয়েরই মুখ্য কথা এই। কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও নির্ব্বাণ লইয়া যে খটকা থাকিয়া যায়, দার্শনিক পণ্ডিতেরা তাহা লইয়া বিচারবিতর্ক করিতে থাকুন। সাধারণ লোকের পক্ষে নির্ব্বাণ ও প্রলয় সমান সুসংবাদ। তবে যত দিন জীব দেহে আবদ্ধ থাকে, তত দিন পিতৃপিতামহের পন্থানুসরণই সুবিধাজনক।

যাহা হউক, এই নির্ব্বাণ ও প্রলয়ের সংঘর্ষে বহু মতের বহু সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে—এবং বারাণসীই সকলগুলির প্রধান সঙ্গমক্ষেত্র। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের কত দূর প্রভাব আছে না আছে, এ পর্য্যন্ত সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই, কিন্তু এই বৌদ্ধ আন্দোলনের পর হইতে বৈষ্ণব দেবতাও কেহ কেহ বারাণসীর গঙ্গাতীর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন। নিরীহ জগন্নাথও তাঁহার বৌদ্ধ উৎপত্তি গোপন করিয়া কাশীধামের এক প্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ নৈবেদ্যের উপর নির্ভর করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। এবং কণারকের সূর্য্যমন্দিরের কাহিনীও বারাণসীতে যথাযথ দেশান্তরিত হইয়া আসিয়াছে।

এই সকল দেবতাসঙ্গমের মধ্যে আদিম কাল হইতে ধর্ম্মের ধারাবাহিক অভিব্যক্তির একটি ঐতিহাসিক সূত্র পাওয়া যায়। এবং এই সূত্রে অন্যান্য অনেক প্রাচীন দেশের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হয়। যেমন, লিঙ্গপূজাবলম্বনে প্রাচীন মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠতা; সূর্য্যোপাসনাবলম্বনে প্রাচীন পারস্যের সহিত ঘনিষ্ঠতা; এবং এইরূপ ক্ষুদ্র

বৃহৎ নানা অনুষ্ঠান অবলম্বনে বহুতর অন্যান্য সভ্য জাতির সহিত সম্বন্ধ। এক দিকে এই; এবং অন্য দিকে মানবহৃদয়ের ক্রমবিকাশের একটি সমগ্র সোপানপরম্পরা ইহারই মধ্যে নিহিত আছে। সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখ, বারাণসীতে আসিয়া বিপুল মানবসমাজের সহিত সম্বন্ধ সুদৃঢ় হয়। এবং এই সনাতন সম্বন্ধ নিবন্ধনেই বারাণসীর গৌরব ভূভারতে অদ্বিতীয়। ['সাধনা,' পৌষ ১৩০০]

বোম্বায়ের রাজপথ

নাট্যশালা, রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট, বাদ্যভাণ্ড, সমস্তই আধুনিক হইতে পারে, কিন্তু তথাপি যখন শকুন্তলার অভিনয় দেখা যায়, তখন কোথা হইতে সেই পুরাতন তপোবন, সেই চন্দ্রবংশীয় রাজার পুরাতন রাজপুরী, সেই অতীত প্রাচীন ভারতবর্ষ সমস্ত আধুনিকতাকে অভিভূত করিয়া হৃদয়ের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠে। বোম্বাই সহরটি দেখিলে সেইরূপ মনে হয় যে, এই নূতন নাট্যশালা ইংরাজের রচিত: ইংরাজ ইহাকে সুচিত্রিত করিয়াছে, ইংরাজ ইহার প্রদীপ জ্বালাইয়া দিতেছে এবং সমস্ত অভিনয়ের মধ্যে মধ্যে ইংরাজী যন্ত্রে ইংরাজের সঙ্গীত বাজিয়া উঠিতেছে; তথাপি সমস্ত অতিক্রম করিয়া ইহার মধ্যে একটি সুকোমলা প্রাচ্যশ্রী দর্শকের চক্ষে মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দিতেছে।

সমুদ্রের উপকূলে বৃহৎ বোম্বাইপুরী যেন পাশ্চাত্য শিল্পীর অঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটের উপরে প্রাচ্য উপন্যাসের একখানি মায়াচিত্র। মালাবার শৈলশিখর হইতে তরুণ শ্যামিমা নামিয়া আসিয়া নিম্নভূমির নারিকেলতরুকুঞ্জে নিঃশব্দে মিশিয়া গিয়াছে এবং এই মোহময়ী প্রকৃতির নিবিড় কুঞ্জবনমধ্য হইতে সহস্র অভ্রংলিহ প্রাসাদশিখররাজি উঠিয়া বোম্বায়ের রবিকরদীপ্ত সমুদ্রবেলায় একটি চিত্রার্পিত রমণীয়তা অর্পণ করিয়াছে। রাজপথে বিচিত্র জনতা—এই মায়াপুরীরই রাজপথ—এবং সে জনতাও এমনি মোহকর। বিচিত্র উষ্ণীষ, বিবিধ বর্ণ, বহুবিধ বেশভূষা, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী, সমস্ত মিলিয়া দর্শকের মনে একটি সুদূর স্বপ্নাবেশ সঞ্চারিত করিয়া দেয়—এবং এই বিচিত্রবর্ণ গতিবিধি মৃদু সন্ধ্যারুণরাগে শুধু একটি বর্ণময়ী ছায়াসমাগমের মত প্রতিভাত হয়।

কলিকাতার নগ্নশির দীনবেশ কৃষ্ণকান্তি জনপ্রবাহ হইতে আসিয়া বোম্বায়ের এই বিচিত্র বর্ণতরঙ্গের মধ্যে উদ্ভ্রান্ত চিত্ত প্রশ্ন করিয়া উঠে, এ সমস্ত সত্য, কি স্বপ্ন—কায়া কি ছায়া—বাস্তব, কি চিত্রার্পিত মাত্র। সমস্তই যেন অত্যন্ত প্রাচ্য এবং প্রাচীন, উপন্যাসবর্ণিতবৎ।—অর্দ্ধাচ্ছাদিত কর্ণীরথে বসিয়া বণিক্‌কন্যাগণ সমস্বরে স্বদেশীয় গাথা

গান করিতে করিতে চলিয়াছে—পরিধানে বিচিত্রচিত্রিত শাটিকা এবং চারু নীল পীত হরিৎ বর্ণের উজ্জ্বল বক্ষাবরণ। রথের দ্রুত গতিবশে গোকণ্ঠবিলম্বিত ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাসকল রিণিরিণি ধ্বনিত হইতে থাকে এবং অন্যমনস্ক পথিক জনকে রথচক্রপথ হইতে দূরে সরিয়া যাইবার জন্য সতর্ক করিয়া দেয়। মস্তকে দুগ্ধভাণ্ড লইয়া সুগঠনা তন্বঙ্গী আহীরবালিকারা সরল অঙ্গযষ্টির অবলীলাগতিভঙ্গে সৌন্দর্য্যের একটি হিল্লোল তুলিয়া যায় এবং পিত্তলকঙ্কণ মুহুর্মুহু কাংস্যভাণ্ডে আহত হইয়া পশ্চাতে একটি লঘু ধ্বনি সমুত্থিত করিয়া তুলে। নিবরগুণ্ঠনা মহারাষ্ট্রকুলকামিনীগণ নিঃসঙ্কোচ অস্খলিতপদে রাজপথে ইতস্ততঃ গতায়াত করেন—পুষ্পমাল্যবিভূষিত কঠিনদৃঢ়বদ্ধ ব্রাহ্মণীয় বেণী মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে কুণ্ডলিত হইয়া থাকে; যেন কোন্ পুরাতন ভাস্কর্য্য এই দক্ষিণ দেশে আসিয়া সহসা সজীব হইয়া উঠিয়াছে মনে হয়। শাড়ীর বিচিত্র ভাঁজ, বিলম্বিত দৃঢ় কচ্ছ, বাম স্কন্ধদেশ হইতে দক্ষিণ বাহূপরি বিলুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্ত, ঈষৎ ব্যক্ত বক্ষসন্নদ্ধ চোলিকা—সকলই বিচিত্র; শুধু বর্ণ এবং আভা, ছায়া এবং আলোক, বসন ভূষণ এবং ধ্বনিবৈচিত্র্যের তরঙ্গ। এবং এই তরঙ্গায়িত বৈচিত্র্যমধ্যে শুভ্রবস্ত্রনিবদ্ধকেশপাশ বিচিত্র্যাভ চীনাংশুকপরিহিতা পারসীক সুন্দরীগণের মৃদু স্মিত স্নিগ্ধ শোভা একটি নূতন রমণীয়তা সঞ্চার করিয়াছে। ভারতবর্ষের সহস্র জাতি বর্ণ দ্বিকোণ চতুষ্কোণ গোলাকার বক্রচূড় শুভ্র নীল পীত রক্ত বিবিধ উষ্ণীষরাজিতে শোভিত হইয়া এই চিত্রার্পিত জনতার শোভা সম্পাদন করিতেছে এবং কুবলয়স্নিগ্ধদৃষ্টি কুলকামিনীগণসমাগমে এই রমণীয় জনতা অধিকতর উজ্জ্বল ও মনোহর হইয়া উঠিয়াছে। প্রাচ্য ভারতে এমন উজ্জ্বল সজীব অথচ চিত্রার্পিতবৎ সুন্দর দৃশ্য আর কোথাও দেখা যায় না।

বোম্বায়ের পার্শ্বে কলিকাতার চিত্রপট অত্যন্ত ম্লান—না আছে এ উষ্ণীষখচিত প্রাচ্য বৈচিত্র্য, না আছে এ কুলাঙ্গনাদৃষ্টিউজ্জ্বল চিত্তহারী বর্ণবিন্যাস। সৌন্দর্য্য সেখানে ইষ্টক-স্তূপের মধ্যে অসূর্য্যম্পশ্যা এবং রাজপথ এই শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকারাজির মধ্য দিয়া বৈচিত্র্যহীন জনতাপ্রবাহ মাত্র।

কলিকাতারও দৃশ্যপট অল্পে অল্পে পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে। যেখানে সমস্ত অন্ধকার ছিল, সেখানে এখন ক্বচিৎ কদাচিৎ দুইটি স্নেহনিস্যন্দিনী উজ্জ্বল দৃষ্টি দুর্ভাগ্য পথিক জনের অন্তরে মৃদু আশার সঞ্চার করে। রাজপথে রথবাতায়ন পূর্ব্বের ন্যায় আর নীরন্ধ্র অর্গলিত হয় না। এবং "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" দাম্পত্যের মধুকলহের বাহিরে কদাচ শুনা যায়। কিন্তু মহারাষ্ট্রভূমির সহিত তুলনায় এটুকু কিছুই নহে। সুদীর্ঘ মুসলমানশাসননিপীড়িত বাঙ্গলায় সমাজের যে অর্দ্ধাঙ্গ সকলপ্রকার সামাজিকতা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া পরিবারের মধ্যেও অত্যন্ত সঙ্গোপন অন্তঃপুরে অন্তরিত হইয়াছে, স্বাধীন

মহারাষ্ট্রভূমিতে সে অর্দ্ধাঙ্গ চিরদিন অপরার্দ্ধের সহচরীরূপে অভ্যাগতকে সমাদর করিয়াছে, যজ্ঞস্থলে স্বহস্তে অন্ন পরিবেশন করিয়াছে, রণস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে আসন অটল রাখিয়াছে; সুতরাং তাহার সে সহজ শোভন সম্ভ্রম, সে সুদৃঢ়পদচারিণী অবলীলাগতি, সে নীরবগুণ্ঠন নিঃসঙ্কোচ লজ্জাশীলতা অন্তঃপুর-অন্তরিত বঙ্গগৃহের বদ্ধাকাশে আশা করা যায় না। কলিকাতার দৃশ্যপটে কচিৎ কদাচিৎ সন্ত্রস্তসকরুণদৃষ্টি বঙ্গকুললক্ষ্মী যেন ছায়ার মত ক্ষণকালের জন্য দেখা দিয়া তৎক্ষণাৎ মিলাইয়া যাইতে চাহেন। নেপথ্যের চিরাভ্যস্ত অসূর্য্যম্পশ্য কক্ষ হইতে দিবালোকিত রঙ্গমঞ্চে সহস্র দৃষ্টির মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইতে সহজেই তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হয়। বাহিরের সহস্র তীব্র দৃষ্টি যেন নিতান্ত নিদারুণ পরিহাসের মত সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিতে থাকে। তিনি যেন ব্যাধানুসারিতা হরিণীর ন্যায় ভয়ে পথভ্রান্তা এবং লজ্জায় সঙ্কোচে একান্ত অভিভূতা।

বোম্বাইপুরী পূর্ব্ব-পশ্চিমের মিলনতীর্থ। ভারতলক্ষ্মী এখানে পশ্চিম-সমুদ্রের তটপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সমুদ্র পার হইয়া এইখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রাচী এবং প্রতীচী, উভয়েই এখানে উজ্জ্বল অম্লান লাবণ্যে উদ্ভাসিত। নগরী শোভা স্বাস্থ্যে সমুজ্জ্বল, রাজপথ প্রশস্ত ও পরিষ্কার, কর্ম্মস্রোত নিত্য প্রবাহিত, রাজপথে লৌহবর্ত্মে রথচক্র নিরন্তর ঘর্ঘরিত; এবং এই বেগবান্ পাশ্চাত্য ঐশ্বর্য্যপ্রবাহের মাঝখান দিয়া দক্ষিণ-ভারতবর্ষের উজ্জ্বলবর্ণধারিণী শুচিশোভা তরণীখানি সুন্দরভাবে ভাসিয়া চলিয়াছে।

সভ্যতাসঙ্গমের তীর্থতটবর্ত্তী বোম্বায়ের এই কুহক অন্যত্র দুর্লভ। ইহার মধ্যে যে একটি মোহকরী প্রাচীনতা আছে—ইহার জনতায়, উষ্ণীষে, উৎসব আনন্দে যে প্রাচীন সভ্যতার সজীবতা অনুভূত হয়, আর্য্যাবর্ত্তের বড় বড় সহরে কোথাও এই প্রাচীন মোহটুকু নাই। ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, যে উদীয়মান শক্তি-প্রভাবে মহারাষ্ট্রীয়গণ অনতিকালপূর্ব্বে সমস্ত ভারতবর্ষে ক্রমশঃ আপন প্রতাপ বিকীর্ণ করিতেছিল, সেই উদ্যৎ শক্তির দীপ্তি আজ ভস্মাচ্ছন্ন হইলেও সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত হয় নাই। সেই শক্তি এবং সেই জ্যোতি মহারাষ্ট্রদেশে হিন্দুসমাজকে সজীব ও উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। মহারাষ্ট্রের তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিশুদ্ধ পৌরাণিক আদর্শ একটি সজীব আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে। বিদেশীয় উপপ্লবে সমতল উত্তর-ভারত বারম্বার প্লাবিত হইয়া নব নব স্তরপাতে মিশ্রতা লাভ করিয়াছে; মহারাষ্ট্রদেশ অপেক্ষাকৃত অক্ষুব্ধ ছিল; দিল্লী মহানগরীর প্রবল আবর্ত্তবেগ দাক্ষিণাত্যে ক্ষীণতর হইয়া প্রবেশ করিত। আর একটি কারণ এই যে, কালিদাস ও ভবভূতির অমর কাব্য দক্ষিণ-ভারতবর্ষকে চিরকালের জন্য পুরাতন করিয়া রাখিয়াছে। তীর্থ বহু আছে, দেবধানীর অন্ত নাই, বর্ষে বর্ষে বহু ব্যয়ে নানা স্থানে বহু উৎসব সুসম্পন্ন

হয়; কিন্তু যদি কোথাও রাজপথের বিচিত্র জনতার মুখশ্রীতে একটি প্রাচীন সভ্যতা মুদ্রিত হইয়া গিয়া থাকে ত সে বোম্বায়ে। বোম্বাই সংস্কৃত ভারতবর্ষের একখানি চারু চিত্র।

আমি বোম্বায়ের একটি মাত্র উৎসব দেখিয়াছি। তখন ভাদ্রপদ মাস, সমুদ্র বোম্বায়ের কূলে কূলে উছলিত, আকাশে ক্ষণে মেঘ, ক্ষণে রৌদ্র, এবং নবাগত শরৎ রৌদ্র ও বৃষ্টি দিয়া মেঘে মেঘে নব নব আভা এবং বর্ণের লূতাতন্তু রচনা করে। এই মায়াচন্দ্রাতপ-তলে গণপতির মহোৎসব। সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ গণপতি শিবিকারোহণে, বাহকস্কন্ধে সমুদ্র-বেলায় সমাগত। দেহের বর্ণে একটি অতি মৃদু গোলাপী আভা, পরিধানে শুভ্র বস্ত্র, কুণ্ডলীকৃতাগ্রভাগ দীর্ঘ শুণ্ড উদরপিণ্ডোপরি প্রায় লুটাইয়া পড়িয়াছে, এবং এই গজগাম্ভীর্য্যের মধ্য হইতে জ্ঞানের সরল প্রশান্ত মহিমা অনতিউজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। সহস্র মশালের আলোক, ভক্তবৃন্দের উন্মত্ত অঙ্গভঙ্গীসহকারে নিরন্তর জয় দেব ধ্বনি, ঘন ঘন ঢক্কানিনাদ এবং বৃহৎ লোকারণ্যসমুত্থিত মহাকলরব একত্র মিশিয়া এই সন্ধ্যাছায়ালীন সমুদ্রোপকূলে গণপতির উৎসব নিবিড়তর করিয়া তুলিয়াছে।—অজ্ঞান বাহু তুলিয়া নৃত্য করিতেছে, উচ্চৈঃস্বরে বন্দনাগান গাহিয়া আবেগভরে করতালি দিতেছে, মশাল জ্বালিয়া ঢক্কানিনাদ করিয়া উৎসব ঘোষণা করিতেছে; জ্ঞান অটল গাম্ভীর্য্যে নিশ্চল স্তিমিত—চক্ষে পলক পড়ে না, অঙ্গ উচ্ছ্বাসে আন্দোলিত হয় না, বেদনা ভাষাহীন হইয়া অন্তর্নিরুদ্ধ এবং মুখশ্রী ভাবে সর্ব্বদাই বিকসিত।

এই গণেশউৎসব বোম্বাই নাট্যশালার একটি প্রধান দৃশ্য। অভিনয় অধিক নহে, কিন্তু এরূপ সুবৃহৎ জনতা কদাচ দেখা যায়। সে দিন সমুদ্রোপকূলে রাজপথে সমস্ত বোম্বাই সহর ভাঙ্গিয়া পড়ে। এবং উন্মুক্ত প্রাসাদবাতায়নসকল হইতে কুলললনাগণের কুবলয়দৃষ্টি নিপতিত হইয়া এই উষ্ণীষখচিত বিবিধবেশ বর্ণবৈচিত্র্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলে। এবং একে একে যখন আলোক নিভিয়া আসে, প্রতিমাসকল সমুদ্রগর্ভে বিসর্জ্জিত হয়, জনতা সহস্র পথ দিয়া গৃহাভিমুখী হইতে থাকে, বোম্বায়ের বর্ষব্যাপী এক অঙ্কের অভিনয় যেন সমাপ্ত হইয়া আসে—একবার যেন ক্ষণকালের জন্য পটক্ষেপ হয়। এবং দর্শকের মনে কেবল এই বসন ভূষণ বর্ণ ধ্বনি, এই আকাশ সমুদ্র এবং আকাশপটে মুদ্রিত শ্যাম শৈলশ্রেণী ও সমুদ্রগর্ভে প্রতিবিম্বিত চারু বোম্বাই সহর, এই কোলাহল কলরব উৎসব মোহবৎ ঘনীভূত হইয়া আসে এবং সমস্ত শিরা ও স্নায়ুর মধ্যে একটি তড়িত্তরঙ্গের অনুকম্পন বহু ক্ষণ ধরিয়া স্পন্দিত হইতে থাকে। ['সাধনা,' অগ্রহায়ণ ১৩০১]

গুজরাটে গরবা

প্রবাসী পথিকের সোৎকণ্ঠ কুতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে নূতন অঙ্কের নূতন দৃশ্যপট উত্থিত হইতেছে। বোম্বাইপুরী তাহার বেলাতললীন চিরচঞ্চল ক্ষুব্ধ সমুদ্র, নারিকেলতরুশির-নীলায়িত শৈল-কটিবন্ধ এবং সেই বিপুল লোকারণ্য, বিচিত্র কলকণ্ঠধ্বনি, সেই সতত বৈচিত্র্যময় সুবিস্তীর্ণ রাজপথ, লৌহবর্ত্মে নিরন্তরধ্বনিত রথচক্রঘর্ঘর, সমস্ত লইয়া দূরে অপসারিত হইয়াছে, এবং সম্মুখে শীর্ণ স্বচ্ছ শাবরমতীর সৈকত-তটভূমি শরতের রৌদ্রালোকে স্বর্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু নব দৃশ্যপট এখনও সম্যক্ উদ্ঘাটিত হয় নাই—অর্দ্ধউত্তোলিত যবনিকার অন্তরালে কেবল গুজরাটের তপ্তোজ্জ্বল শ্যামল ক্ষেত্র শরৎকালের নির্ম্মল নীলাকাশতলে নবরবিকিরণকীর্ণ কনক রঙ্গভূমির আভাসের মত প্রতিভাত হইতেছে মাত্র।

যখন ধীরে ধীরে যবনিকা সম্পূর্ণ উত্থিত হইল, তখন এই পক্বশালীশ্যামল রঙ্গভূমিতে এই শারদরৌদ্রলেখাঙ্কিত স্বর্ণদৃশ্যপটে একটি পুরাতন আনন্দউৎসবের অভিনয় প্রকাশিত হইল। বৃহৎ প্রাঙ্গণতলে ম্লান দীপশিখা পরিবেষ্টন করিয়া সহস্র নারীমূর্ত্তি চঞ্চল ছায়া-প্রতিমার মত চিত্তহারী বিচিত্র গতিভঙ্গীতে প্রমত্ত আনন্দাবেগে ঘূর্ণ্যমান—সহস্র শাটিকার তরঙ্গায়িত প্রান্তদেশ হইতে চতুর্দ্দিকে বিচিত্র বর্ণচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতেছে এবং সহস্র তন্বঙ্গের সুনিয়ত তরঙ্গভঙ্গে, সুবলিত বাহুবিক্ষেপে, শুভ্র হাস্যোচ্ছ্বাসে, ক্বণিত করতালিধ্বনিতে তপ্ত উৎসের মত শতধারে বিচিত্র সৌন্দর্য্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। মনে হয়, যেন রাজা উদয়নের সেই চিরন্তন অবন্তীপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি—যেখানে নরনারীগণ নিত্যোৎসবে প্রমত্ত, যেখানে সকলই সুন্দর, যেখানে নৃত্যগীতকলানুষ্ঠানের বিরাম বিশ্রাম নাই।

ক্ষুদ্র গুজরাট এই গরবা-উৎসবে যেন সেই বহু পুরাতন মহিমায় মহীয়ান্ হইয়া উঠে। নগরবাসীদিগের আনন্দ আর ধরে না। কুলকন্যাগণ সন্ধ্যার পূর্ব্বেই গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া সুসজ্জিতদেহে উৎসবপ্রাঙ্গণে আসিয়া সম্মিলিত হয়েন। এবং সন্ধ্যা যতই গাঢ় হইয়া আসে, মৃদু মৃদু গুঞ্জনে গরবা-গান আরম্ভ হয়; ধীরে ধীরে সহস্র কণ্ঠে সঙ্গীত সংক্রমিত হইতে থাকে, গতিতে আবেগ, ভাবে আবেশ, দেহভঙ্গীতে ললিত হিল্লোল এবং অপাঙ্গে ও অধরপ্রান্তে একটি চারু স্মিত-সৌন্দর্য্য সঞ্চারিত হইয়া উঠে। পার্ব্বতী উমার নামে প্রথম সঙ্গীত গীত হয়। এবং এই সূচনামাত্র হইয়া নারীজাতির চিরপ্রিয় রাধার প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণের কথাই আলোচিত হইতে থাকে—সেই শ্যাম রূপ, নন্দভবনে বাল্যলীলা, কৈশোরে

সখাগণ সহ নিত্য নব নব আনন্দ উপভোগ, গোকুলহৃদয়হরণ, সেই অক্ষয় যৌবন এবং যমুনাতীরসুপ্ত সেই পুরাতন আহীরপল্লীর সহস্র সুখদুঃখ। এবং গুর্জ্জরসুন্দরীগণ এই ব্রজগাথা গান করিতে. করিতে মধুমত্ত ভ্রমরের মত মাতিয়া উঠেন—গান আর থামে না, করতালি ক্রমেই দ্রুত হইয়া আসে এবং দীপশিখার চতুষ্পার্শ্বে চক্রগতিতে প্রবলবেগে শুধু একটি বর্ণধ্বনিসৌন্দর্য্যময়ী গতি মাত্র বিঘূর্ণিত হইতে থাকে।

গুর্জ্জরসুন্দরীগণের এই প্রমত্ত উৎসাহাবেগ, এই চারু সৌন্দর্য্যচক্র রচনা করিয়া কালানুসারিণী গতিভঙ্গীতে অশ্রান্ত দীপশিখাপ্রদক্ষিণ, এই কঙ্কণশিঞ্জিত করতালিস্তনিত সমস্বর গীতিঝঙ্কার, গরবার এই নাট্যাভিনয়বৎ উজ্জ্বল রমণীয়তা—এই সমস্তের মধ্যে সেই যমুনাতীরবাসিনী শ্যামসখীগণের একটি পুরাতন স্মৃতি-মহিমা যেন নিরন্তর আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে। কারুকার্য্যখচিত বিচিত্র কঞ্চুলিকাবদ্ধ যৌবনতলে যেন সেই আহীরবালিকার আবেগময় হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করা যায় এবং প্রতি অপাঙ্গদৃষ্টিতে, ঈষৎ স্মিত-ভাষিতে, চঞ্চল গতিভঙ্গে, অঞ্চললুণ্ঠনে পুরাতন বৃন্দাবন তাহার জ্যোৎস্নালোকিত অতীত রজনী লইয়া চক্ষের সমক্ষে অস্ফুটালোকে ফুটিয়া উঠে। যেন সেই প্রাচীন আহীরপল্লীখানি সহসা অতীত কাল হইতে সজীব হইয়া উঠিয়া চিরকালের পথে সশরীরে অভিসারযাত্রা করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

প্রাঙ্গণের রঙ্গভূমিতে যখন এই গরবাভিনয় চলিয়াছে এবং প্রমোদপ্রবাহ চঞ্চলা শিপ্রার দুই তটভূমির ন্যায় কৃশাঙ্গী শাবরমতীর দুই কূল প্লাবিত করিয়া প্রবহমান, তখন প্রাঙ্গণের অনতিদূরে পূজাগৃহের নেপথ্যে মৃদুস্বরে আর এক অভিনয় চলিয়াছে—পুরাতন মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে ব্রাহ্মণেরা যথারীতি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রে দেবীকে আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু সে ধ্বনি প্রাঙ্গণের শ্রোতৃমণ্ডলীর কর্ণে প্রবেশ করে না—সে ধ্বনি কৈলাসে দেবীসদনে উত্তীর্ণ হয় কি না, সে বিষয়েও সন্দেহ। এখানে কৃষ্ণেরই একাধিপত্য—চণ্ডীর আবাহন কেবল তাঁহার প্রচণ্ড কোপ হইতে উদ্ধারের আশায়। বঙ্গগৃহে পার্ব্বতী যেরূপ কন্যার ন্যায় সকল পিতামাতার স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছেন এবং দশমীর দিনে সেই কন্যারূপিণী স্নেহের প্রতিমাকে বিসর্জ্জন দিয়া সমস্ত বঙ্গহৃদয় যেরূপ কন্যাবিচ্ছেদবেদনা অনুভব করে, গুজরাটে তাহার কিছুই নাই। সে করুণ আগমনীসঙ্গীতও নাই, সে স্নেহসুকোমল বিচ্ছেদবেদনাভয়ও নাই, সে সুনিবিড় আত্মীয়তাও নাই এবং তদানুষঙ্গিক অনিবার্য্য দুঃখফলও নাই।

গুজরাটের স্নেহরস কৃষ্ণের প্রতিই প্রবাহিত। দুগ্ধঘৃতনবনীপরিপুষ্ট যশোদার এই নীলমণিটিকে কে না ভালবাসে? গুর্জ্জরসুন্দরীগণ বিশেষরূপে তাঁহার অনুরক্ত। যশোদা যেমন করিয়া কৃষ্ণকে আহার করাইতেন, যেমন করিয়া কর্ণে দুল, মস্তকে শিখিপুচ্ছ,

কটিদেশে চন্দ্রহার, চরণে নূপুর দিয়া সাজাইয়া দিতেন, সেই সকল কথা গান করিতে করিতে চঞ্চলাক্ষী গুর্জ্জরাঙ্গনাগণ উৎসাহে প্রমত্ত ও আনন্দে বিবশ হইয়া পড়েন। এবং অনন্যহৃদয়া রাধিকাসুন্দরী এই বহুপ্রেয়সী প্রিয়জনের আশাপথ চাহিয়া সচকিতনেত্রে উৎকণ্ঠিত অন্তরে কত নিশি যাপন করিয়াছেন, সে গান গাহিতে গাহিতে গরবার সেই চিরন্তন একটানা সুরও যেন রুদ্ধ অশ্রুচ্ছ্বাসে আর্দ্র হইয়া আসে।

এই কৃষ্ণপ্রেম বহু দিন হইতে গুজরাটে অনুশীলিত হইয়া আসিতেছে। এবং আহারে বিহারে প্রমোদ বিলাসে গোপালই গুর্জ্জরের বহু দিনের পুরাতন আদর্শ। গোপাল গোপগৃহে ক্ষীর সর ঘৃত নবনী সেবনে মানুষ হইয়াছিলেন; গুর্জ্জরেও আহার্য্যের মধ্যে দুগ্ধ ঘৃত শর্করার বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য এবং যজ্ঞস্থলে নরনারীগণ যখন দুই পংক্তিতে আহারে উপবেশন করেন, গব্যগন্ধে যজ্ঞভূমি আমোদিত হইতে থাকে। গোপালের স্রক্‌চন্দনপ্রিয় বলিয়া খ্যাতি আছে; ভক্ত গুর্জ্জর এ বিষয়েও আদর্শ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। এমন কি, দাক্ষিণাত্যের জনশ্রুতি বিশ্বাস করিতে গেলে, গুর্জ্জরের নরনারীর হৃদয়বন্ধনেও পুরাতন বৃন্দাবনের প্রগাঢ় প্রেমপ্রভাব স্বীকার করিতে হয়।

একে শ্রীকৃষ্ণের বংশীমোহ, তাহাতে শরৎকালের এই মোহময়ী প্রকৃতি। বর্ষাপগমে আকাশ মেঘমুক্ত, ধরিত্রী স্বর্ণশস্যে সমুজ্জ্বল এবং সুবর্ণ সৈকতভূমিতলে কৃশাঙ্গী নদী-প্রবাহ মুক্তাহারের ন্যায় শোভমান। নবীনা প্রকৃতিও যেন উৎসবসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছেন। এবং প্রকৃতির এই নব উল্লাসচাঞ্চল্য নারীহৃদয়ে যেন হিল্লোলিত হইয়া উঠিয়াছে।

নিরানন্দ বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের আর সর্ব্বত্রই প্রকৃতির সহিত নারীহৃদয়ের ঐকটা প্রকাশ্য সমবেদনা দেখা যায়। কোথাও বা বর্ষায়, কোথাও বা শরতে, কোথাও বা নব বসন্তে—হয়, পর্য্যাপ্ত পুষ্পপল্লবের বিকাশে, নয় স্নিগ্ধ-সজল-সঘন নবমেঘের সমাগমে, নয় শিশিরমণিখচিত কনকশস্যরাশির প্রচুর পরিণতিতে রমণীগণ মঙ্গলগান এবং আনন্দনৃত্য সহকারে প্রকৃতির উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। মূঢ় প্রকৃতি যখন কেবল সমীরোচ্ছ্বাসে, ঘনঘটায়, ফুলে ফলে পল্লবে নব নব প্রাণসঞ্চারের আনন্দ মূকভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন দয়মানা প্রমদাগণ তাহাকে সুকণ্ঠের সঙ্গীতময় বাক্যময় ভাষা অর্পণ করিয়া বিশ্বব্যাপী আনন্দপ্রকাশকে সম্পূর্ণতা দান করেন। তাহা দেখিয়া মনে হয়, নারীগণ যেন আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অন্তরঙ্গভাবে আত্মীয়ভাবে বিশ্বপ্রকৃতির সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া আছেন;—যে নিগূঢ় প্রাণপূর্ণ পুলক-চাঞ্চল্য মাটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অপূর্ব্ব ইন্দ্রজালে শাখায় শাখায় পুষ্পস্তবক এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শস্যমঞ্জরী বিরচিত করিয়া দেয়, তাহা অলক্ষিতভাবে রমণীগণের সুকুমার দেহলতিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃত্যে এবং গীতে স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠে। উন্মুক্ত আকাশতলে পৃথিবীর

সৌন্দর্য্যসভায় বিশ্বলক্ষ্মীর সহিত আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের এই কোলাকুলি, এই প্রকাশ্য প্রীতিসম্ভাষণ, এমন শোভন সুন্দর দৃশ্য আর কি কিছু আছে? কিন্তু হায়, সমস্ত বঙ্গদেশে বসন্ত হইতে হেমন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঋতুর পর্য্যায়ে স্ত্রীকণ্ঠের সঙ্গীত একেবারেই নীরব;—প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য যখন নূতন প্রাণে নূতন বেশে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তখন প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম সৌন্দর্য্য সেই নিখিল-সঞ্চারিত নবযৌবনের আনন্দে যোগ না দিয়া বিচ্ছিন্ন বিমুখভাবে অন্ধকারে আত্মযাপন করে!

প্রকৃতির সহিত নারীহৃদয়ের এই যোগসূত্রে শরৎকাল এমন উৎসবময়। এবং ভারতবর্ষের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে গুর্জ্জররমণীগণ বিচিত্র বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া গ্রাম্য গাথায় যখন এই উৎসবের আবাহন করেন, তখন এই গরবা-উৎসব সহজেই রমণীয়তর হইয়া উঠে। এই গরবার গীতিধ্বনিতে যেন সমস্ত ভারতবর্ষের কুলস্ত্রীগণের কণ্ঠধ্বনি কলিত হইয়া উঠে এবং নির্ম্মল শারদীয় শুক্লপক্ষ সমধিক শোভাসম্পন্ন হয়। এবং এই নির্ম্মল নিশীথ আকাশতলে এই ঘূর্ণ্যমান উন্মাদনা, ছায়া আলোক, হৃৎস্পন্দন, কলগীতি, রূপ যৌবন, দেহতরঙ্গ, সমস্ত মিলিয়া একটি মহীয়সী মায়ার মত প্রতিভাত হইতে থাকে। ['সাধনা,' জ্যৈষ্ঠ ১৩০২]

কলবেদনা

তোমাদের মনের কথার যেমন অন্ত নাই, আমার কল্লোলকাহিনীরও সেইরূপ কোথাও ছেদ নাই। সেই জন্য কলসীকক্ষে ঘাটের ভাঙ্গা ধাপগুলি দিয়া পদে পদে তোমাদিগকে যখন নামিয়া আসিতে দেখি, উৎসাহে ও আনন্দে আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে—মনে হয়, এই কয়টি ধাপ নামা হইয়া গেলে একেবারে সর্ব্বাঙ্গ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া এক নিশ্বাসে ছলছল কলকলে সমস্ত কথাগুলি যদি বলিয়া ফেলিতে পারি! কিন্তু মনের কথা বলা আর হয় না। কাঁখ হইতে কলসীটি নামাইয়া তোমরা যেই আমার জলে পদার্পণ কর, তোমাদের কোমল পদপল্লবতলে আমার সমস্ত মনের কথা যেন আবর্ত্তিত হইয়া উঠে। তখন ছলছল কলকল করিয়া একটি কথাও আর খুঁজিয়া পাই না—উৎসাহভরে গণ্ড বাহিয়া কর্ণমূল পর্য্যন্ত ছলাৎ ছলন্ করিয়া উঠি, কিন্তু কি বলিতে আসিয়াছিলাম, ভুলিয়া গিয়া লজ্জায় তোমাদের চঞ্চল বাহুমূলে, সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে, তপ্ত বক্ষতলে কোথায় যে মিশিয়া যাইব, ভাবিয়া পাই না।

প্রতি দিন এমনি করিয়া বেলা অবসানসময়ে মন বাঁধিয়া আসি, আর তোমাদের মসৃণ চিক্কণ চারু দেহলতার উপর দিয়া মন যেন স্রস্ত হইয়া পড়ে—ঐ কুসুমপেলব যৌবনের

পুলকাবেগে তোমাদের নীবিবন্ধের সহিত আমার হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন নিমেষে শিথিল ও বিবশ হইয়া আসে। তখন সুখে সুখবোধ থাকে না, দুঃখে দুঃখবোধ থাকে না, হৃদয়ে ধৈর্য্য ধরে না, যৌবনে আবেগ রোধ মানে না—সর্ব্বাঙ্গে ছলিত ও কলিত হইয়া উঠিয়া আমি যেন কোথায় ভাসিয়া চলি। তোমরা কি মনে কর জানি না, এবং বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া হেলিয়া দুলিয়া নানা ভঙ্গীতে যখন কম্বুবিনিন্দিত গ্রীবাদেশ মার্জ্জন করিতে করিতে কলকণ্ঠে হাস্যালাপ ও সুখদুঃখের কথা কহিতে থাক, তখন আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপের অবসর পাও কি না, তাহাও বুঝিতে পারি না;—কিন্তু উহারই মধ্যে এক এক বার আগ্রীব আমার নীল তরঙ্গভঙ্গমধ্যে যখন নিমজ্জিত করিয়া দিয়া আমার বক্ষ চুম্বন করতঃ দুইখানি সরল অধরপুটপ্রান্ত হইতে তরল জলসেকে আমাকে অভিষিক্ত করিয়া দাও—বদ্ধ অঞ্জলির কোমল করতল ও চারু আননের নিরুপম সুখস্পর্শমধ্যে আমাকে সঞ্জীবিত করিয়া তোল, তখন—আমি কি আর বলিব—শুধু কুলুকুলুকলধ্বনি।

সেই জন্যই মনের কথা এ পর্য্যন্ত বলিয়া উঠা হইল না। তোমাদের কথাও যে স্থির হইয়া দুই দণ্ড কান পাতিয়া শুনিব, তাহাও ঘটিয়া উঠে না। আমার এই চির-আবহমান কলস্রোতে সকলই যেন ভাসিয়া যায়। একবার যদি তোমাদের মত, হে বন্ধুরগাত্রি সুন্দরীগণ, দুই দণ্ড স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি! একবার যদি অমনি করিয়া একখানি চারু লঘু সূক্ষ্ম বসনবেষ্টনের মধ্যে এই চঞ্চল কলপ্রবাহকে মুহূর্ত্তের জন্য সম্বৃত করিয়া তুলিতে পারি! হে মানববধূ, তোমার ঐ দেহভঙ্গী ত আমার তরঙ্গভঙ্গেরই মত চঞ্চল, ঐ সর্ব্বাঙ্গসমাচ্ছন্ন রূপযৌবন ত আমারই জলের মত তরল,—তরল লাবণ্যরাশি সিক্ত স্বচ্ছাম্বরের মধ্য দিয়া যেন শতধারে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে—কিন্তু কোন্ মন্ত্রবলে হে সুনিপুণে, ঐ সূক্ষ্ম এলায়িত বসনলূতাতন্তুজালে ইহাকে এমন ঘেরিয়া রাখিয়াছ? আমাকে একবার সেই মহামায়াবিদ্যায় দীক্ষিত কর—তাহা হইলে বোধ করি, আমি একদিন তোমাদের কলভাষণে সম্যক্ যোগ দিয়া তোমাদের সুখে দুঃখে, তোমাদের বিচিত্র বিরহ-বেদনা আশা উৎসাহে আপনাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে পারি। আমার কলকল আছে, মনের কথা আছে, কেবল আপনাকে সম্বৃত করিয়া লইয়া আমি বলিতে পারিতেছি না বলিয়াই চিরদিন ভাসিয়া চলিয়াছি। এ নিত্য অভিসারযাত্রা আমার আর ভাল লাগে না।

হে বিধি, জন্মান্তরের কত পুণ্যফলেই না জানি, এই চিরকাঙ্ক্ষিত মানবীজন্ম লাভ হয়? অমনি করিয়া কলসীকক্ষে সোনার গ্রাম্য পথ দিয়া নিত্য জল সহিতে আসা—পায়ে নূপুর রুণুঝুণু এবং কক্ষের কলসীতে আহত কঙ্কণের মৃদু কিঙ্কিণীধ্বনি; অমনি লুণ্ঠিত অঞ্চলপ্রান্তে পথের দুই ধারের পুষ্পিত সরিষাক্ষেত্রের সুরভি চয়ন করিতে করিতে মৃদু, অভিসরণ—পশ্চাতে শুধু গন্ধ এবং আমোদ এবং কনকরেণুকণা; অমনি নিরন্তর কলভাষণে

ধাপে ধাপে—যেন ছন্দে ছন্দে—কোমল পদক্ষেপে চারু অবতরণ; এবং অমনি অঞ্চল ভাসাইয়া দিয়া আবক্ষ জলে চঞ্চল গাহনলীলা—তনু অঙ্গসঞ্চালনে, মার্জ্জনে, প্রক্ষালনে, শতধারে উচ্ছ্বসিত বিচিত্র বিভঙ্গিমা; আহা, এ সুখ যদি নিমেষের মতও ভোগ করিতে পারিতাম!

আমার এই অনন্ত প্রবাহ তোমরা যদি বারণ করিতে পার—আমার ইচ্ছা করে, তোমাদের পদতলে চিরদিন পড়িয়া থাকি। আমার জীবনের যে শুভ মুহূর্ত্তগুলি চিরদিন শুধু খেলাচ্ছলে ভাসিয়া যায় সেইগুলিকে তাহা হইলে বুকের মধ্যে একবার প্রাণপণে আকর্ষণ করিয়া ধরি। তোমাদের মত স্বল্পপরিসর মধ্যে একবার এই অনাদি নিরুদ্দেশ চাঞ্চল্যকে অগাধ হৃদয়তলে সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিয়া লই।—বিধাতা বোধ করি, সুখ দিবে বলিয়াই তোমাদিগকে এমন স্বল্পের মধ্যে সুসঙ্গত করিয়া গড়িয়াছে।—কিন্তু হে মহাদেবতা, আমাকে সুখ নাহি দিতে, বেদনাও ত আমি বুকে করিয়া রাখিতে পারিতাম। এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, আজন্ম ব্যাপিয়া যে বহু সুখ দুঃখ বেদনা আশা জীবনে যৌবনে এই নীল বক্ষোপরে তরঙ্গে তরঙ্গে ফেনিল হইয়া উঠিয়াছে, তিল তিল করিয়া আজন্মের সেই সমস্ত সঞ্চয় ব্যর্থ হইয়া যায়, কিন্তু প্রাণপণ করিয়াও তাহার ক্ষীণতম স্মৃতিটুকুমাত্রকেও অন্তরের মধ্যে পোষণ করিতে পারি না!

তাই ত আমার অগাধ জলের মধ্যে তোমাদের পরিপূর্ণ বক্ষতলের প্রগাঢ় পরিরম্ভ যখন অনুভব করি, এক এক বার মনে হয়, দুইটি কনককপাট উদ্ঘাটন করিয়া একবার ঐ বুকের মধ্যে উঁকি মারিয়া দেখি। সাধ যায়, একবার ঐ কূলে কূলে উচ্ছলিত স্ফটিকস্বচ্ছ যৌবনসরসীর মধ্যে তোমাদের মত এমনি মনের সাধে গাহন করিয়া আসি—যেমন করিয়া আমার বুকের মাঝে তোমাদের তরুণ তনুখানি আগ্রীব আপনাকে দিয়া ঢাকিয়া রাখি, তেমনি করিয়া একবার তোমাদের তরল যৌবনে সর্ব্বাঙ্গসমাচ্ছন্ন হইয়া ঐখানে সম্যক্ সমাহিত হইয়া থাকি; আর যদি, যেমন করিয়া আমার মর্ম্মের কাছে দুইখানি কোমল পদতল কনকনূপুরশিঞ্জিতে একটি রিণিরিণি বেদনা সঞ্জাত করিয়া তোলে, তেমনি করিয়া, আহা, একবার মাত্র—হায় মত্ত আশা, এ দুঃস্বপ্নের কি কোথাও অন্ত নাই!

কুলুকুলু ছলছল। আমি আর বলিতে পারি না—যে কথা বলিতে যাই, বলা শেষ না হইতে তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়—বলা আর হয় না। আমি তোমাদের আর্দ্র বসনপ্রান্তে সন্নদ্ধ হইয়া থাকি—বসনের সহিত আমাকেও এই শুষ্ক সৈকতশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া চল। নয় ত, নীবিবন্ধের সহিত আমাকে বাঁধিয়া লও—হে ক্ষীণমধ্যা, আমি তোমাদের ত্রিবলিলাঞ্ছিত কটিতটে সম্বদ্ধ হইয়া এই শূন্য মনোভাবের পরপারে উপনীত হই,—যেখানে তোমাদের সহস্র চিরন্তন সুখদুঃখে, অবিরত গল্পগুঞ্জনে, স্নেহে প্রেমে আনন্দে

জীবনের শেষাঙ্ক সমাপন করিতে পারি।—ঐ কলসীর কঠিন কনকনে আমাকে কাণায় কাণায় আর বিড়ম্বিত করিয়ো না। ছল ছল ছল ছলাৎ ছলন্। ['ভারতী,' বৈশাখ ১৩০৩]

দিল্লীর চিত্রশালিকা

নব্যতন্ত্রের হিসাবে হয় ত সে সূক্ষ্ম ছায়া আলোকও নাই এবং তুলিকার সে দূরানুস্যূচী লঘুস্পর্শও এখানে দুর্লভ, কিন্তু তথাপি আমাদের পুরাতন কলাভবনের এই লুপ্তপ্রায় চিত্রশিল্পের মধ্যে যে একটি মনোহর মোহ আছে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। শুধু যে পুরাতন বলিয়া, সে কালের বলিয়াই ইহার আদর তাহা নহে; ইহার বিচিত্র সূক্ষ্ম রেখাপাত ও স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রাচ্য বর্ণবিন্যাসে যে সুন্দর কারুকার্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, এমন রমণীয় কলানৈপুণ্য অন্যত্র কদাচ লক্ষিত হয়। এবং এই কলানুস্যূত নিপুণ কারুকার্য্যই ভারতবর্ষের শিল্পিজনচিত্তে এই সুরঞ্জিত চিত্রফলক এত দিন ধরিয়া এমন অম্লান আদর্শে সঞ্জীবিত রহিয়াছে।

পাশ্চাত্য চিত্রকলার সহিত ইহার সম্বন্ধ অল্পই—না ভাবে বিশেষ ঐক্য, না বর্ণবিন্যাস ও রচনাপ্রণালী একবিধ; এমন কি, উভয়বিধ রচনার অন্তর্নিহিত প্রতিভার মধ্যেও যেন বহু দেশ ও বহুতর সমুদ্রের ব্যবধান। প্রাচ্য জীবনপ্রবাহেরই মত এই চিত্রার্পিত জীবন-স্রোত রূপে বর্ণে আলোকে, বিচিত্র মিলন বিরহ সম্ভোগে, কখনও হাসিতে, কখনও অশ্রুচ্ছ্বাসে, কখনও সুখে, কখনও বেদনায়, কোথাও নিবিড় নির্জন দাম্পত্যের রমণীয় স্নিগ্ধচ্ছায়ে, অন্যত্র আলোকচ্ছটাবিচ্ছুরিত সহস্রসখীপরিরম্ভাকুলিত নৃত্যগীতরস-রভসে হিল্লোলিত ও বিহ্বলিত হইয়া মদালসময়ী মন্দগতিতে নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছে। এবং ভারতবর্ষীয় সকল শিল্পকলারই মত ইহার অবলীলাগতিভঙ্গে শিল্পীর সেই প্রায়নির্লিপ্তবৎ অনতিসচেতন রচনাকলা সকল চেষ্টার ভাব অপসারিত করিয়া দিয়া কেমন একটি প্রশান্ত স্থৈর্য্য সঞ্চারিত করিয়া তুলিয়াছে।

আমাদের নিকট ইহা স্বভাবতই রমণীয়—বিষয়গুণেও বটে, এবং আরও বিশেষতঃ ইহার রবিকরোদ্ভাসিত বর্ণাভাসে। সে ঔজ্জ্বল্য আমরা আর কোথাও দেখিতে পাই না। প্রতীচ্য চিত্রে স্বভাবতই তদ্দেশেরই সূর্য্যালোক দীপ্তি পাইয়া থাকে, এবং প্রতীচ্যবিদ্যা-শিক্ষিত নব্য আর্টস্কুলের ছাত্রের রচনায়ও আলোকসন্নিবেশ প্রায়ই বিলাতী ছবির অনুরূপ হওয়ায় তদ্দেশীয় মৃদু আলোকেই এদেশীয় চিত্র উদ্ভাসিত হয়। আমাদের পুরাতন সূর্য্যালোক অবহেলালাঞ্ছিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই। তাহা যেন কেবল এই প্রাচীন চিত্রফলক এবং যে বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার মধ্যে এই

চিত্রকলা চিরদিন বৰ্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহারই বিচিত্রাভ বর্ণসঙ্গমে একান্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে।

সেই জন্যই বোধ করি, এই সমস্ত দেশীয় বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার আবহাওয়ার মধ্যেই এই চিত্রগুলি সমধিক উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইবার অবসর পায়। বিলাতী ফ্রেম ইহার সহিত কিছুতেই বেশ শোভন সঙ্গত হয় না। এবং পণ্যশালাবৎ অগণ্য বস্তু-বিস্তারবহুল টুকিটাকিকণ্টকিত আধুনিক অভ্যর্থনাগৃহের বিলাতী শিক্ষিত অবহেলাসজ্জিত অসঙ্গতির মধ্যে সহস্রধা প্রতিহত হইয়া ইহার মৰ্ম্মনিহিত সমস্ত সৌন্দৰ্য্য যেন একান্ত ক্লিষ্ট হইতে থাকে। এই শিল্পসৌন্দর্য্যের যথার্থ মৰ্ম্ম গ্রহণ করিতে হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে ঘনায়মান য়ুরোপীয় সভ্যতার বহু নিরর্থক বাহুল্যভার দূরে অপসারিত করিয়া দিতে হয়, যাহাতে ক্ষণে ক্ষণে তাহা চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে না পারে।

যে গৃহভিত্তিমূলে এই ছবিগুলি বসিবে, তাহার মৰ্ম্মরহৰ্ম্ম্যতলে, চিত্রিত প্রাসাদকক্ষে যেরূপ ঘননিবিড় কোমল বিচিত্রাভপুষ্পিত পারস্য গালিচার উপরে উষ্ণীষশোভিতশির সুদীর্ঘ-চাপকাননিবদ্ধবপু রাজসভাসদ্‌গণের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ঐরূপ পুরু খাপী কুসুমসুকুমার-স্পর্শ নানা পুষ্পলতাবিচিত্র গালিচার উপরে কনককারুখচিত আমেদাবাদী কিংখাবের গোটামণ্ডিত গুটিকতক সুগঠিত গভীর আরাম-উপাধান বৈ আর বড় কিছু থাকিবে না। এবং লাক্ষাবিলেপচিত্রিত সহস্র বর্ণের আভানিস্যন্দী ছাদহৰ্ম্ম্যতলে দন্তিদন্তখচিত আগুন্তখোদিত চন্দনপাদপীঠোপরি জয়পুরী কারুকার্য্যময় সুবর্ণদীপাধানে সুগন্ধী স্নেহাভিষিক্ত বৰ্ত্তিকাশিখামুখ হইতে ধূপধূম্রগন্ধবৎ একপ্রকার লঘু স্নিগ্ধ সৌরভ উত্থিত হইয়া দিকে দিকে মৃদু অনুকূল মোহ সঞ্চারিত করিতে থাকিবে।

চিত্রও যেরূপ, চতুষ্পার্শ্বিক সমস্তই তদনুরূপ হওয়াই সঙ্গত। গৃহের স্থাপত্যে আগ্রার সেই সুরম্য প্রস্তরসন্নিবেশ এবং অলিন্দের আলিসায় সেইরূপ জালিকাজের রচনা, কপাটে মহীসুরী খোদাই অথবা লক্ষ্ণৌয়ের কনকঝালরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য, খিলানের খাঁজে খাঁজে বিলম্বিত রবিকিরণকীর্ণ কনকঝালরের ইন্দ্রজালমায়া, এবং উদ্যানপ্রান্তের দূর তোরণমণ্ডপ হইতে নহবতের শেষপ্রায় স্বর্ণরেশটুকু। এবং আমরা দর্শকের দল এই রূপরসশব্দস্পর্শগন্ধমোহময়ী চিত্রশালিকায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে সভ্য প্রাচ্য রীতি অনুসারে দ্বারদেশে পাদুকা উন্মোচনপূর্ব্বক ভব্য উষ্ণীষ চাপকান চুড়ীদার এবং তদুপরি বাম স্কন্ধ হইতে দক্ষিণ বাহুতল দিয়া বিলম্বিত সোনালী পাড়ের বায়ব উত্তরীয়পরিশোভিত হইয়া গেলেই সমস্তটির সহিত সম্যক্ একীভূত হইয়া যাই।

কিন্তু বাঙ্গলার পাঠকসাধারণের নিকট এ প্রাচীন চিত্রকলা বোধ করি, সেরূপ সুপরিচিত নহে এবং এতদানুষঙ্গিক এই বর্ণ-গন্ধ-গীতি-সৌন্দর্য্যময়ী শোভা-সম্পদ্-সুখ-বিলাস-

উৎসববিচিত্রা জীবনযাত্রাও নব্য শিক্ষাগুণে বিস্মৃতপ্রায়। সেই জন্য এ সকল অনেকের নিকট দুরূহ প্রহেলিকা প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কা জন্মে। আমাদের মধ্যে যাঁহারা কিছু দিন পশ্চিম দেশে যাপন করিয়াছেন এবং দিল্লীর শ্রেষ্ঠিচত্বরে অথবা জয়পুরের কলাভবনে বিচিত্র দেশীয় শিল্পকলার মধ্যে এই মনোহারিণী চিত্রবিদ্যার পরিচয় গ্রহণের অবসর পাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ভরসা করি, এই সকল কথা প্রহেলিকা বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। কিন্তু যাঁহাদের অভিজ্ঞতা বাঙ্গলার নব্য রাজধানীর নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর বাহিরে বড় যায় না, তাঁহারা যদি কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসীতে কলিকাতার রাজপথে পরেশনাথের যে উৎসবযাত্রা বাহির হয়, তৎপ্রতি একটু লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন এবং কল্পনার সাহায্যে সেই হয়গজরথধ্বজাসমন্বিত বিচিত্রবেশ রম্য দৃশ্যটুকুকে যথাযথ চিত্রপটে আরোপিত করিয়া তুলিতে পারেন, তবে তাঁহাদের মনে এই চিত্রকলা সম্বন্ধে ধারণা কথঞ্চিৎ পরিস্ফুট হয়। তেমনি লাল নীল সোনালী বেগুনী শ্বেত পীত জরী জহরৎ ঝকমক ঝিকিমিকি, অথচ এত ঔজ্জ্বল্যেও কেমন একটি প্রশান্ত কমনীয়তা—কোথাও কোনরূপ বর্ব্বর আতিশয্য চক্ষুকে পীড়া দেয় না বা মনকে ক্লিষ্ট করে না।

আমাদের সমালোচ্য চিত্রাবলীমধ্যে গুটিকতক চিত্র আছে, যাহা বিশেষরূপে এই পরেশনাথ যাত্রাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। বোধ করি, কোন্ দেশের রাজকুমারীর সহিত কোথাকার রাজপুত্রের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে, নগরের প্রশস্ত রাজপথ দিয়া তাই ভারে ভারে থালে থালে বিবিধ ফল মূল মিষ্টান্ন ও নানাবিধ রাজভোগ্য সামগ্রী লইয়া বৃহতী রাজবাহিনী গীতবাদ্য সহকারে বরপক্ষীয় প্রাসাদ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছে। সঙ্গে পাটল শ্বেত কৃষ্ণ ও ধূসরবর্ণের চতুরশ্বযোজিত সুবর্ণরথোপরি বেগুনী চন্দ্রাতপতলে নহবতখানা। এবং পুরোভাগে, এই প্রাচ্য বিলাসকলা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিতেই যেন, সারঙ্গী ও সেতারে, নূপুরে বলয়ে, বাহুবিক্ষেপে ও অবলীলা দেহভঙ্গীতে নিয়ত হিল্লোলিত ও মুখরিত কলাকুশলা নর্ত্তকীর মনোহারিণী লাস্যলীলা। দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ রক্ষিবর্গ—আসমানী গোলাপী শ্বেত পীত হরিদ্বর্ণের আজানুতলবিলম্বিত বসনোপরি সোনালী জরীর কটিবন্ধে নিবদ্ধ গাঢ় বেগুনী মখমলের ছোরার খাপ, স্কন্ধে সুবর্ণমণ্ডিত চারু দণ্ড, এবং তাম্বুলরাগরক্ত অধরে সচেতন পদমর্য্যাদার ঈষৎ স্মিত ভাব। এবং এই সুরঞ্জিত দৃশ্যপটে পার্শ্ববর্ত্তিনী নর্ত্তকীদিগের পদক্ষেপ ও অঙ্গভঙ্গের ছন্দে ছন্দে বিঘূর্ণিত ও বিচ্ছুরিত জরীর পাড়ের ঢাকাই মসলিনের গিলাকরা পেশোয়াজের মধ্য হইতে ঈষদ্ব্যক্ত বিবিধ বর্ণের চুড়ীদার পায়জামা ও পিনদ্ধ কঞ্চুলিকানিবদ্ধ সঘনস্পন্দিত কনকযৌবনমোহ সঞ্চারিত হইয়া যেন বসন্তমদোন্মত্ত বুলবুলের গীতমুখরিত সিরাজপুরীর একখানি সুন্দর মরীচিকা রচনা করিয়াছে।

কিন্তু নিপুণ চিত্রকর এত ক্ষণ ধরিয়া শুধু একটি মূক দৃশ্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই—তাঁহার প্রত্যেক নরনারীই সচল সজীব সহৃদয় মানুষ। এবং হস্ত্যশ্বরথোপকণ্ঠবিলম্বিত ঘন্টিকারণিত ও চারুচরণতাড়িত নূপুরশিঞ্জিত দীর্ঘ পথ তাহারা মূক ও বধিরের মত চুপ করিয়া আসে নাই, কিন্তু বহু লঘু প্রণয়পরিহাসে, অপাঙ্গের বিলোল কৌতুককটাক্ষে, চিত্তহারী মধুর সম্ভাষণে ও সরস ভাষণপ্রসঙ্গে পরস্পরের চিত্তবিনোদন করতঃ পথশ্রম এককালে বিস্মৃত হইয়াছে। এবং চিত্রেও সেটুকু অতি সুন্দররূপে উদ্ভাসিত হইয়াছে।—কোথায় এক শ্যামাঙ্গী পুষ্পপেলবা বিলাসিনী পথশ্রমে ক্লিষ্ট হইয়া ললাটের স্বেদবিন্দু মোচনার্থে কখন্ একবার পশ্চাদ্দিকে মুখ ফিরাইয়াছিল, এবং সেই শুভ অবসরের প্রলোভনটুকু সম্বরণ করিতে না পারিয়া এক চঞ্চলচিত্ত তরুণ মাহুত দূর হস্তিপৃষ্ঠ হইতেই বাহবাসূচক একটি সস্মিত সেলাম নিবেদনে নিজ মনোবেদনা জ্ঞাপন করিল, চিত্রকরের দৃষ্টি সেটুকুও অতিক্রম করে নাই। নহবতখানায় সানায়ে ফুৎকারমাত্র নিবদ্ধ করিয়া অন্যমনা বাদক একদৃষ্টে সম্মুখের নৃত্যকলাকৌশল উপভোগ করিতেছিল, সেই নিবিষ্ট দৃষ্টিটুকু চিত্রকর নিঃশব্দে আপন চিত্রপটে হরণ করিয়া আনিলেন। যে খঞ্জননয়নার উৎসুক দৃষ্টি, বোধ করি কোন পরিচিত প্রিয়মুখ সন্দর্শনের আশায়, ইতস্ততঃ কিছু ঘন ঘন সঞ্চালিত হইতেছিল, তাহার সুর্মাঙ্কিত কৃষ্ণ ভ্রূযুগের মনোজয়ী কুঞ্চনবিলাস এখানে তুলিকার মোহস্পর্শে ধরা দিয়াছে। এবং এই সকলগুলিতেই প্রাচ্য মুখভাবের নানাবিধ ভঙ্গী ব্যক্ত হইয়া চিত্রকলার মনোহারিতা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে।

আর একটি চিত্রে এই রাজকীয় বিবাহের বরযাত্রা বাহির হইয়াছে—রাজকীয় বরযাত্রা যেমন হইয়া থাকে, মশালে দীপালোকে আতসবাজীতে রাত্রি উজ্জ্বল এবং সহস্র উন্মুক্ত কিরীচ ও তরবারির বিচিত্র আস্ফালনে বিচ্ছুরিত হইয়া সে ঔজ্জ্বল্য দিকে দিকে ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সুগ্রীব শ্বেত অশ্বোপরি বরবেশ পরিয়া তরুণ রাজকুমার। দুই পার্শ্বে দুই জন উষ্ণীষধারী পদাতিক ময়ূরপুচ্ছের চামর ব্যজন করিতেছে এবং পশ্চাতে শুভ্রবেশ পরিচর বৃহৎ সুবর্ণ তালবৃন্ত সঞ্চালন করতঃ রাজমর্য্যাদারক্ষণে নিযুক্ত আছে। সম্মুখে পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ অশ্বারোহী ও পদাতিক সিপাহীর দল এবং তৎসহ অশ্বপৃষ্ঠে ও পদব্রজে লাল নীল গোলাপী ক্ষীরী ও ফলসাই রঙ্গের বেশপরিহিত তিন চারি দল বাদক। পুরোভাগে কনকমঙ্গলঘটশ্রেণীর দক্ষিণে ও বামে চারু চতুর্দ্দোলোপরি ললিত কলিত নৃত্যকলায় শুভযাত্রানুসূচী নটীগণ ও অগ্রপশ্চাৎ রাজকীয় ধ্বজাদণ্ডচামরপ্রবাহের কনকহিল্লোল। এবং পথের উভয় পার্শ্বে স্থাপিত আতসউৎস হইতে আগ্নেয় কনকচম্পকরাশি উচ্ছ্বসিত ও বর্ষিত হইয়া নীল নৈশাকাশতলে ধূমে আলোকে এক অভিনব তাম্রকপিশ গোধূলি-আভা সঞ্চারিত কবিয়া তুলিয়াছে। এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল রম্যালোকে এই বিচিত্রবর্ণ বরযাত্রাভিযান

যেন একখানি নাট্যশালার দৃশ্যপট—ইহার সকলই বর্ণে আভায় সৌন্দর্য্যে মোহে রমণীয় এবং সকলই নাট্যদৃশ্যবৎ অভিনব লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

নাট্যকলার সহিত ইহার কলাগত ঐক্যও যথেষ্ট। রঙ্গমঞ্চে যেমন বাস্তবকে পরিস্ফুট করিবার জন্যই অভিনেত্রীবর্গের স্বাভাবিক মুখশ্রী তুলিকাস্পর্শে সমধিক অভিব্যক্ত করিয়া তোলা আবশ্যক হয়—নহিলে আমাদের মনে সেরূপ অনুকূল মোহ উৎপাদন করে না, চিত্রপটেও সেইরূপ বাহিরের বস্তুকে রেখায় ও বর্ণে হুবহু কাপি না করিয়া তাহার মর্ম্মনিহিত ভাব অনুসরণে অনেক সময় শিল্পীর মনঃকল্পিত শোভন সৌন্দর্য্যের যথোচিত প্রয়োগ আবশ্যক হইয়া থাকে। যে বৃহৎ আকাশপটে প্রকৃতির দৃশ্যাবলী চিত্রার্পিত হইয়াছে, তাহা ত আর আমাদের সম্যক্ আয়ত্ত নহে এবং ক্ষুদ্র চিত্রপটের সীমামধ্যে তাহাকে অক্ষুণ্ণ সন্নদ্ধ করিয়া তোলাও অসম্ভব। সুতরাং আমাদের স্বরচিত জমির উপরে প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন অনুকরণ চেষ্টা যে অনেক সময় অসঙ্গত ও ব্যর্থ হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে আর বিচিত্র কি। সমস্ত চতুষ্পার্শ্বের সহিত ত একটা ঐক্য চাহি। প্রকৃতিতে কোন বস্তু আমাদের মনে কেবল নিজ বর্ণ ও রেখামাত্রে স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশ পায় না, কিন্তু যে বিস্তীর্ণ পটের উপরে তাহা সুলিখিত, সেই পটভূমির বর্ণদৃশ্য সৌন্দর্য্য ও আনুষঙ্গিক নানা ভাবের সহিত সঙ্গত হইয়া একটি অখণ্ড সমগ্রতায় প্রতিভাত হয়। ভাবের এই অখণ্ড সমগ্রতাটুকু অক্ষুণ্ণ রাখিতেই শিল্পীকে ক্ষেত্র বুঝিয়া নিজ প্রতিভা পরিচালনা করিতে হয়। সেই জন্যই নিপুণ চিত্রকরেরা ছোটখাট সকল খুঁটিনাটিতে প্রকৃতির বাহ্য রেখা ও বর্ণবিন্যাসটুকু মাত্র নকল না করিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মর্ম্মানুসারে নিজ নিজ রচনায় বর্ণবিন্যাস করিয়া থাকেন। এবং তাহাতেই আমাদের মনে সেই মোহ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয়েন—যাহাতে সমগ্র চিত্রখানি তাহার স্বাভাবিক সঙ্গতিতে আমাদের মানসপটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই জন্যই আমাদের চিত্রপটে অশ্বের আসমানী ও হরিদ্বর্ণ, প্রকৃতির অনুকরণ না হইয়াও বেশ সঙ্গত ও স্বাভাবিক হইয়াছে। এবং জনতার মুখমণ্ডল বিচিত্র বর্ণাভাসে আনুপূর্ব্বিক স্বভাবানুযায়ী না হইয়াই সমধিক শোভা পাইয়াছে। প্রাচ্য চিত্রকর সমস্ত পটটির উপরে যে স্নিগ্ধোজ্জ্বল রমণীয় আলোক নিক্ষেপ করিয়াছেন, তাহাতেই চিত্রখানি মনোহারী হইয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, এই আলোকসন্নিবেশের উপরে বর্ণসঙ্গমের স্ফূর্ত্তি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। এবং অনেক সময় এই আলোকবিক্ষেপের হেরফেরে কোথাও কৃত্রিমতাও সুশোভন হইয়া উঠে, কোথাও স্বাভাবিকতাও নেত্রপীড়া উৎপাদন করে।

এই প্রয়োগবিজ্ঞানে অমোঘ পটুত্বই আমাদের ভারতবর্ষীয় শিল্পীর প্রধান গৌরব। এমন কি, এই অশিক্ষিতপটুত্বে শিক্ষিত পাশ্চাত্য রুচি যেখানে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, সেখানেই

তাহার বর্ব্বর স্পর্শে শিল্পকলা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। অশিল্পী বর্ব্বরেরা কৃত্রিম ও স্বাভাবিক দুইটা শব্দ ও তাহার আভিধানিক অর্থ শিখিয়া রাখিয়াছে মাত্র, প্রয়োগবিষয়ে তাহাদের ধারণা বালকেরও অধম। তাহারা গালিচার কৃত্রিম পুষ্পকে সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে চাহে এবং আমাদের চিরন্তন শালের পাড়ে নেত্রঝলসী বর্ণে বিলাতী আদর্শানুযায়ী স্বাভাবিক প্যাটার্ণ সূচিত করিবার প্রয়াস পায়। ফলে, প্যাটার্ণ যতই স্বভাবানুরূপ হইয়া আসে, শিল্পের মনোহারিতা ততই দূর হইতে থাকে।

চিত্রশিল্প সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। যে কারণে গালিচার জমিতে ও শালের সূচি-কার্য্যে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি নিষ্ফল হয়, ঠিক সেই কারণেই আমাদের চিত্রশিল্পে নব্যতন্ত্রের স্বাভাবিকতা স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠে না। গৃহভিত্তিমূলে যে চিত্র অঙ্কিত হয়, ক্ষুদ্র গৃহাকাশের প্রস্তরনিবদ্ধ চতুষ্পার্শ্বে এবং স্থাপত্যের কৃত্রিম গঠনপ্রণালী ও সহস্র কারুকার্য্যের সহিত তাহার সঙ্গতি সংরক্ষণ নিতান্ত আবশ্যক। এবং এই সঙ্গতিরক্ষার্থেই খুঁটিনাটির প্রতি দেশীয় চিত্রকরের দৃষ্টি এরূপ তীক্ষ্ণ। গৃহের প্রাচীরবেষ্টনমধ্যে কি রেখাবর্ণ-সমাবেশ সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন হয়, আমাদের শিল্পীরা তাহার মর্ম্মটুকু আশ্চর্য্য আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। এমন কি, আমাদের চিত্রকলা স্থাপত্যের একটি প্রধান অনুরঞ্জনী অঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে।

নব্য পাশ্চাত্য চিত্রলেখার প্রণালীই কিছু স্বতন্ত্র। শিল্পী সেখানে যে উচ্চভূমিপরে দাঁড়াইয়া সম্মুখের দৃশ্যপটে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে রেখাবর্ণের প্রত্যেক সূক্ষ্ম বিভাগ দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু বৃহৎ প্রকৃতি সেখান হইতে সমগ্রভাবে ভালরূপ চোখে পড়ে। এই জন্য, ঐ সকল ছবি দেখিতে গেলেও একটু তফাতে দাঁড়াইতে হয়, যাহাতে খুঁটিনাটি দৃষ্টিপথে না পড়িয়া সমস্ত চিত্রখানি এক দৃশ্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। আমরা সচরাচর যে ভাবে দেয়ালে ছবি টাঙ্গাইয়া গৃহকে সজ্জিত করি, তাহাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য যে সম্যক্ বিকশিত হইবার অবসর পায়, এমন বোধ হয় না। তাহার দূরানুসূচিতা অনেক সময় গৃহভিত্তির চতুঃসীমামধ্যে প্রতিহত হইতে থাকে এবং বাহিরের মুক্তাকাশের ছায়ালোকও বোধ করি, বদ্ধ গৃহে কথঞ্চিৎ অসঙ্গত হইয়া উঠে।

আমাদের চিত্রশিল্প দূর হইতে কেবল মনোহর বর্ণসঙ্গম মাত্র এবং নিকটে কারুকার্য্যে চিত্তহারী। গৃহের মধ্যে লোকে অনেক সময়ে কাছে আসিয়া দেখিবে, ইহা আশা করাই যায়। সুতরাং সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের এখানে বিশেষ সার্থকতা আছে। কিন্তু এ কারুকার্য্য কেবলই জ্যামিতিক রেখাবিন্যাস মাত্র নহে, এবং বারাণসী শাড়ী বা কাশ্মীরী শালের সূচি-কার্য্যের সহিত কলাগত ঐক্য বা সাদৃশ্য থাকিলেও নরনারীর বিচিত্র মুখভঙ্গী ও হাবভাবে ইঁহাতে যে একটি সরস সজীবতা সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহা কিছুতেই উপেক্ষণীয় নহে।

এবং ভারতবর্ষীয় চিত্রকরের রচনা এ বিষয়ে বিশেষ প্রশংসার্হ। সভামধ্যেই কি, অন্তঃপুরেই কি, উৎসবেই কি, সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বাবস্থাতেই তাঁহার রচিত চরিত্রগুলির মুখে চক্ষে ভাবে ভঙ্গীতে একটু বিশেষ রকম আছে।—আমাদের আলোচ্য চিত্রাবলীমধ্যে বিবাহযাত্রার পরেই একখানি অন্তঃপুরের চিত্র আছে—রাজার অন্তঃপুর যেরূপ হইতে হয়, আগ্রার বাদশাহী বেগমমহলের অনুরূপ বিচিত্র কারুচিত্রিত শুভ্র মর্ম্মরহর্ম্ম্য এবং সুদীর্ঘ প্রাচীর নীরন্ধ্র হিমমর্ম্মর শুভ্রতায় চিত্রপটের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অবধি প্রসারিত এই অন্তঃপুরকক্ষদ্বারে কিংখাবের সুবর্ণপুষ্পিত পর্দ্দার বাহিরে ঈষৎ ধূমায়িত ফলসাহী জমির উপরে স্বর্ণরেণুসিঞ্চিত বিচিত্রবেশী সপ্ত রমণী ও সুগঠনা শ্যামাঙ্গী বীণাবাদিনীর চিত্র। সকলেরই একটু ছলছল ভাব, এবং বীণাবাদিনী সম্মুখে অগ্রসর হইতে হইতে পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়াছেন। তাঁহার ঘনপল্লবিত আবেশময় টানা চোখে একটি প্রশান্ত বিষাদানম্র স্থৈর্য্য এবং তম্বু অধর রেখাপাতে একটুকু সসম্ভ্রম দৃঢ়তা। বেশভূষার বিশেষ আতিশয্য বড় নাই, অথচ বেশ একটু পারিপাট্য আছে। সোনালী রঙের ঘাগরার উপর গোলাপী উত্তরীয়খানি স্তনপরিসরটুকু মাত্র আচ্ছাদন করিয়া দুই স্কন্ধদেশ হইতে পশ্চাদ্দেশে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, কর্ণে দুইটি মরকতমণির দুল, কণ্ঠে সাতনলীর মত মতির মালা, বাহুতে তাবিজ, প্রকোষ্ঠে কনককঙ্কণ, এবং কটিদেশে প্রাচ্য কবিদিগের চিরপ্রিয় মেখলা নাভিনিম্ন হইতে দুইখানি চন্দ্রকলার মত নামিয়া আসিয়া মধ্যভাগকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। একটি অল্পবয়স্কা বালা করজোড়ে বীণাবাদিনীর নিকট কি মিনতি করিতেছে। সব শুদ্ধ, দৃশ্যটিতে বিষাদে বিলাসে, কঠিন মর্ম্মর দেয়ালে ও মানবমুখে করুণ মিনতিতে এমন একটি সুন্দর মোহ সঞ্চারিত হইয়া উঠিয়াছে! এই একটি নারীসমাগমের রহস্যে আমাদের সমস্ত মন একান্ত পরিপ্লুত হইয়া যায়, কিন্তু বুদ্ধি ইহার অন্তস্তল অবধি পঁহুছে না। শুধু মনের মধ্যে কেমন একটি অনুরণন থাকিয়া যায়।

অন্তঃপুরের আর একখানি চিত্রে চিত্রকর আর একটি দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া তুলিয়াছেন। তরুণী তন্বঙ্গী সুবর্ণপালঙ্কে উপাধানবিন্যস্ত বামকরতলে মস্তক রাখিয়া অর্দ্ধালসাবেশে সর্ব্বাঙ্গ বিস্তার করিয়া দিয়াছেন; স্নিগ্ধ অঙ্গে জরীর ফুলকাটা রক্তবর্ণ চীনাংশুকের পায়জামা, এবং উত্তরাঙ্গে একখানি লঘু সূক্ষ্মাম্বর ঈষন্নালিমুখ আতুঙ্গ লাবণ্যরাশি সমুদ্ভাষিত করিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। শিয়রদেশে সুন্দরী পরী পক্ষ উন্মুক্ত করিয়া বসিয়া আছেন এবং পদপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তিনটি পরী পরিচারিকা—বেশভূষা কতকটা পুরুষেরই মত; আসমানী, অলক্তক ও সবুজ রঙের চাপকান এবং তদুপরি সোনালী পাড়ের শুভ্র, ম্লানস্বর্ণ ও রক্তবর্ণের তিনটি কটিবন্ধ। ঘরদুয়ারগুলি পরিপাটি পরিচ্ছন্ন—কোথাও আগ্রার সুন্দর জালিকাজ, কোথাও মর্ম্মরপ্রস্তরের সুগঠিত

স্তম্ভ, কপাটে মৈনপুরী তারকষির সোনালী কারুকার্য্য, হর্ম্ম্যতলে অতি সূক্ষ্ম নীল ও অলক্তকরাগের পুষ্পখচিত শুভ্র গালিচা। অনতিদূরে পশ্চাতে একটি নিবিড় উদ্যানের ঘনপল্লবিত তরুশিরশ্রেণী দেখা যায়, এবং সম্মুখে রজতমুকুলিত চারুপুষ্পবাটিকা। সকলই এখানে, কিন্তু যেন কেমন লঘু ও মায়াময়। এই কঠিন পাষাণবন্ধও মনে হয়, যেন আরব্যোপন্যাসের এক রাত্রির বিলাসকাহিনী মাত্র।

কিন্তু এ কি! আবার সেই বীণাবাদিনী—মৃদু চন্দ্রালোকে এক নিবিড় বনান্তে ব্যাঘ্রচর্ম্মোপরি সমাসীন হইয়া অনন্যমনে বীণা বাজাইতেছেন, সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিয়া এক সুসজ্জিত পুরুষ, দুই অলৌকিক পক্ষে তাহার অমানুষ বংশ নির্দ্দেশ করিতেছে এবং সুবর্ণমুকুটে পদমর্য্যাদাও যে সূচিত না করিতেছে, এমন বলা যায় না। দূরে বৃক্ষান্তরালান্ধকারে চারিটি লাঙ্গুলী বিকটমূর্ত্তি একটি সুবর্ণ আসন নামাইয়া দাঁড়াইয়া আছে।—এই দলপতি এবং দলবলকে আমরা বহু পূর্ব্বে, আমাদের চিত্রাবলীর সর্ব্বপ্রথম পৃষ্ঠায়, এক পার্ব্বত্য উপত্যকাভূমিতে ছাড়িয়া আসিয়াছি। এই সুসজ্জিত পুরুষবর সে দিন ক্ষুদ্র একটি স্বর্ণসিংহাসনে বসিয়া দৈত্যদিগকে কি আদেশ সংবিধানার্থে দক্ষিণ তর্জ্জনী নির্দ্দেশপূর্ব্বক শাসন করিতেছিলেন, এবং পর্ব্বতের উপরিদেশে একটি বৃহল্লাঙ্গুল দৈত্য বৃহৎ চুপড়ির মধ্য হইতে একটি তরুণ মানবকে বাহির করিয়া বহিয়া আনিতেছিল।—তাহার পর কত চিত্র গিয়াছে—নূতন নূতন চিত্রে নব নব দিনের ঘটনা। কোথাও শাহেনশাহ বাদ্‌শাহ মন্ত্রিবর্গপরিবৃত হইয়া দরবারগৃহে সমাসীন—খাতাপত্র লইয়া মুন্সীর দল বসিয়া গিয়াছে এবং চামরধারী পশ্চাতে দাঁড়াইয়া সুবর্ণচামর ব্যজন করিতেছে; অন্যত্র আমদরবারের মুক্তাঝালরখচিত চন্দ্রাতপতলে বৈদেশিক রাজদূত কুর্নিশান্তে বাদ্‌শাহ সমীপে এক ছড়া মহামূল্য রত্নহার নজর নিবেদন করিতেছে; কোথাও তরুণ রাজকুমার কোন্ রাজকন্যার উদ্দেশে সদলবলে যাত্রা করিয়াছেন—সে যাত্রাদৃশ্য কাদম্বরীর রাজপুত্রের পাঠসমাপনান্তে গৃহাগমনবর্ণনা স্মরণ করাইয়া দেয়; অন্যত্র সেই অশ্রুছলছল সপ্ত নারী ও চূড়ানিবদ্ধকেশপাশ বীণাবাদিনী; চিত্রান্তরে অশ্রুসজল তরুণ রাজা এবং লেখনী হস্তে চিন্তান্বিত বৃদ্ধ মন্ত্রী; ক্রমে সেই পরীসমাগত অন্তঃপুরকক্ষ, সেই শুভ্র সুন্দর মায়াপুরী; তাহার পর নূতন দৃশ্যে আবার সেই বীণাবাদিনী, সেই সুপক্ষ পুরুষবর, সেই লাঙ্গুলী দৈত্যদল। মনে হয়, যেন সকলগুলির মধ্যে কোথায় একটি অন্তঃপ্রবাহিত যোগসূত্র আছে, যেন সেই সমস্ত লোক জন দৃশ্য সমস্তটি মিলিয়া একখানি মহানাটকের উপসংহার ঘনাইয়া আনিতেছে। কিন্তু কে জানে, কিছুই ধরা দেয় না, শুধু সংশয় এবং অনুমান, চিন্তা এবং কল্পনা, রহস্য হইতে রহস্যান্তরে নিয়ত অবগাহন।

কিন্তু এ উৎসব কিসের ? কিংখাবের বরশয্যোপরি রাজকুমার উপবিষ্ট, বাম পার্শ্বে সেই মুকুটধারী দৈত্যপতি, গালিচার উপরে শ্রেণীবদ্ধ সভাসদ্‌গণ আসীন, এবং সম্মুখে বিচিত্র ভঙ্গী সহকারে নর্ত্তকী নৃত্য করিতেছে। চিত্রকর এই দৃশ্যপটে নর্ত্তকীর সারেঙ্গী ও তব্‌লাওয়ালার যে মুখভঙ্গীটুকু চিত্রিত করিয়াছেন, কেবল ঐটুকুতেই তাঁহার নিপুণ রসগ্রাহিতা আশ্চর্য্য পরিস্ফুট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন, উপস্থিত সভ্যমণ্ডলীর প্রত্যেকের মুখে তিনি এমন এক একটি স্বাভাবিক সহজ অথচ স্বতন্ত্র ভাব বিকশিত করিয়া তুলিয়াছেন যে, এই দশাঙ্গুলিপরিমিত স্থানমধ্যে দর্শকের চিত্ত বহু ক্ষণ যাপন করিয়াও কিছু মাত্র ক্লিষ্ট হয় না।

চন্দ্রাতপের উপরে একটি পারসী বয়েৎ লেখা। চিত্রখানি এই লিপিরই অনুরঞ্জনী। ইংরাজী লিপিরঞ্জনী চিত্রকলার সহিত যাঁহারা পরিচিত, ইহার রচনাপ্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে বলিবার বিশেষ কিছু নাই ; কেবল, ভারতবর্ষীয় চিত্রকরের বর্ণসমাবেশনৈপুণ্যে ও পারসী অক্ষরের সহজ শোভায় ইহা সমধিক চিত্তহারী হইয়া উঠিয়াছে। এত বিচিত্র সূক্ষ্ম বর্ণবিন্যাস, এত অসংখ্য রঙের সমাবেশ ও তাহার এরূপ মনোহর সামঞ্জস্যসাধন অন্যত্র এরূপ সুলভ নহে। বিলাতী লিপিরঞ্জনে অনেক স্থলে কেবল লাল এবং নীলেরই প্রাচুর্য্য এবং তাহার উপর স্বর্ণরেণুসিঞ্চত কারুকার্য্য, কিন্তু রেখায় রেখায় এরূপ নব নব বর্ণ এবং আভার অপূর্ব্ব মেলন সেখানে অতি বিরলদৃশ্য। এখানে গালিচার পাড়ে, বরাসনের কারুকার্য্যে, সম্মুখের দীপাধানের ডালে ডালে, এমন কি, প্রজ্বলিত বর্ত্তিকাশিখামুখে পর্য্যন্ত রঙের কারুকার্য্য অতি বিচিত্র। এবং লাল নীল সোনালী বেগুনী আস্‌মানী ফলসাহী গোলাপী ক্ষীরী আল্‌তাই ধূপছায়া ধূসর কপিশ, সকল বর্ণেরই এখানে প্রাদুর্ভাব, দুর্লভ কেবল রাণীগঞ্জের কৃষ্ণতমিস্র অঞ্জনগঞ্জনা। এই এতগুলি চিত্রের পর গুটিকতক পারসী অক্ষর ব্যতীত কালো রঙের বড় কিছু ত মনে পড়িতেছে না ; এবং তাহাও শ্বেত ও সোনালী চতুঃসীমার মধ্যে উজ্জ্বল হইয়াই উঠিয়াছে বৈ অন্ধকার গাঢ় করে নাই।

কিন্তু স্থান সঙ্কীর্ণ এবং পাঠকগণের ধৈর্য্যেরও সীমা নিরবধি নহে ; ইহার উপরে চিত্রের যে সৌন্দর্য্য, তাহা আমার এই জড় ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব ; সুতরাং সুদীর্ঘ বর্ণনায় ছেদ দিবার যথেষ্ট সময় হইয়াছে।—এখনও দৃশ্য অনেকগুলি। অন্তঃপুরের উদ্যানবাটিকায় ষোড়শী তরুণী বহু সখীসমাগমের মধ্যে বীণাবাদিনীর আবার আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গে বীণা নাই, শুধু একটি সস্মিত সেলামে সমাগত যুবতিবৃন্দকে তিনি সাদর অভিবাদন জানাইতেছেন এবং তরুণীরা থালে থালে ভারে ভারে বহু উপঢৌকন লইয়া তাঁহার চরণে নিবেদন করিতেছেন।—আবার রাজসভা, নজর নিবেদন ; বৃক্ষবাটিকায় পরিচারিকা ও সখী সহ বিষাদানতমুখ রাজ-অন্তঃপুরিকার নিভৃত অবস্থান ; পরদৃশ্যে বাষ্পগদগদ রাজা রাণী এবং বীণাবাদিনী ও দৈত্যপতি ; সহস্র ধারাযন্ত্রনিঃসৃত জলকণাস্নিগ্ধ বেগমমহলের লাস্যময়ী

বিলাসকলা ; রক্তবস্ত্রের আচ্ছাদনতলে তরুণবয়স বরকন্যার প্রথম শুভদৃষ্টিবিনিময় ; বধূ সহ রাজপুত্রের মাতৃসমক্ষে আগমন ; আবার সেই বীণাবাদিনী ও দৈত্যপতিসমাগম—শুভ্র মর্ম্মরহর্ম্ম্যতলে বীণাখানি এক পার্শ্বে পড়িয়া আছে এবং সুবর্ণথালের উপরে স্ফাটিক পানপাত্র ও সরকভাণ্ড সুসজ্জিত, পানভূমির সিন্দুররক্ত অনতিউচ্চ জালিকাটা প্রাচীরবাহিরে দৈত্য দানবের দল মনের উল্লাসে নৃত্য করিতেছে। (তাহার পর মহোৎসবের মত্ততায় ও প্রিয়সমাগমের পরমোৎসাহে দিল্লীর এই প্রাচীন চিত্রাবলীর উপসংহার। এবং যবনিকা পতনের পর সমগ্র নাট্যখানি মনের মধ্যে যেরূপ দৃশ্যে আলোকে রূপে গীতে সৌন্দর্য্যে শৃঙ্গারে বর্ণে অভিনয়ে ঘনাইয়া আসিয়া উজ্জ্বল হইয়া উঠে, এই চিত্রকলাও সেইরূপ আমাদের মন-অন্তঃপুরে তাহার ভাবে ভঙ্গীতে বর্ণে লাবণ্যে মুখশ্রী ও গঠনপারিপাট্যের সমাবেশে একটি সুন্দর মায়ালোকমোহে রমণীয় হইয়া আসে। মনে হয়, যেন পুরাতন ভারতবর্ষের কোন্ কলাভবনপ্রদর্শনী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম, যেখানে কালিদাসের কাব্য, কাদম্বরীর বর্ণনা, তাজমহলের স্থাপত্য, দিল্লীর অন্তঃপুরের প্রসাধন-বিলাস, কাশ্মীরী শাল, পারস্য গালিচা, ঢাকাই মসলিন, কটকী রূপার কাজ, দক্ষিণের চন্দনখোদাই শিল্প, এই সমস্ত একত্র সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সকলগুলির মধ্য হইতে ভারতবর্ষের কারুকুশলা প্রতিভা বিকশিত হইয়া কোথায় একটি মনোহর ঐক্য সূচিত করিতেছে। এই ঐক্যসূত্রেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা চির-সজীব এবং ইহাতেই আমাদের পুরাতন কলাভবন এত চিত্তহারী।) ['ভারতী,' বৈশাখ ১৩০৫]

বেণো জল

কথাটা শুনিতে পরিহাসের মত বোধ হয়, কিন্তু আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট ভারতবর্ষ অপেক্ষা স্বল্পপরিচিত দেশ বাস্তবিকই বিরল। জন্মাবধি ইংলণ্ডের নগর পল্লী, পথ ঘাট, সমাজ শিল্প, কলকারখানা, জল বায়ু, মায় খানা ডোবা, গোষ্ঠ ও গোচারণ-ভূমি, যেখানে যাহা আছে, তাহার সহিত সুপরিচিত হইতে এবং তদুপরি সর্ব্বাপেক্ষা অনাবশ্যক কতকগুলি ধারাবাহিক প্রজাপীড়কের কঠিন নামাবলী ও তৎসংযুক্ত রক্তাক্ত কীর্ত্তিকলাপ আয়ত্ত করিতেই আমাদের এত কাল কাটিয়া যায় যে, স্বদেশ সম্বন্ধে রেলওয়ে গাইডের সুলভ মানচিত্রের ইংরাজী অক্ষরসন্নদ্ধ গুটিকতক বিন্দুর অতিরিক্ত আর বড় কিছু ধারণা করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে না। ভারতবর্ষ আমাদের মানসপটে যেন একটি বিস্তীর্ণ মরুভূমির মত প্রতিভাত হয়—তাহার মধ্যে মধ্যে কেবল লৌহবর্ত্মসন্নিবদ্ধ রেলওয়ে-ষ্টেশন

ও লালপাগড়িচ্ছটাদীপ্ত পুলিশের থানা, ইংরাজের দূরে দূরে অবিচ্ছিন্ন শৈলশৃঙ্গের নিভৃত বিলাসভবন ও প্রমোদোপবনগুলির সান্নিকট্য ও শান্তিসংরক্ষণে নিযুক্ত। এতদ্ভিন্ন, দেশ সম্বন্ধে আমাদের আর বিশেষ কোন ধারণা নাই বলিলেই হয়—কৃষি শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, আর্থিক সমস্যা ও প্রাকৃতিক অবস্থা প্রভৃতি তত্ত্ব ত দূরের কথা, ঘরের কাছে দ্বারের সম্মুখে কোথায় কি আছে না আছে, তাহারই আমরা সন্ধান জানি না.

কিন্তু শিক্ষাপ্রণালীর সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপরেও এ সকল বিষয়ে ধারণা অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। দেশের শিল্প বাণিজ্য ও এতৎসংশ্লিষ্ট সর্ব্বপ্রকার সন্ধানসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের কাহারও জ্ঞানতঃ কোনরূপ সংশয় নাই, কিন্তু বাহিরের সহিত যে সম্পর্ক ও সংঘর্ষের ফলে এ সকল বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানে মনের বিশেষ আগ্রহ ও ঔৎসুক্য স্বতঃ উদ্দীপিত হয়, আমাদের জীবনযাত্রায় শ্রেষ্ঠিজনসুলভ সে উত্তেজনা বড় লক্ষিত হয় না। আমরা হয় জমিদার, অথবা রাজকর্ম্মচারী, নয় ত ব্যবহারজীবী—সুতরাং আমাদের মনে ভারতবর্ষ প্রথমেই যে তাহার রেলপথ-সন্নিবদ্ধ কোতোয়ালীপরম্পরা লইয়া উপস্থিত হয়, ইহাতে আর বিচিত্র কি! এই কোতোয়ালী ও আদালতের নিত্য-সংঘর্ষেই আইনে ও শাসনতন্ত্রঘটিত বিষয়ে ব্যুৎপত্তির সহিত আমাদের একটু আন্তরিক স্পৃহাও জন্মিয়াছে। এবং দেশের কল্যাণের জন্য সুনিয়ত শাসনতন্ত্র ও শুভসংকল্প রাজবিধির বিশেষ আবশ্যকতা ও কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া ইহার সুব্যবস্থা সম্পাদনে আমাদের অনেকের আন্তরিক চেষ্টা হইয়াছে।

বিষয়বিশেষে এই আন্তরিক অনুরাগ ও উদ্যোগী অভিনিবেশ কতকটা যেমন অন্তরের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, বাহিরের নানা অবস্থা ও ঘটনাবলীর উপরেও তেমনি কতক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। এক অনুকূল অবস্থায় দেশের আইন এবং শাসনতন্ত্র আমাদের মনে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আর এক অনুকূল অবস্থায় দেশের সহিত—দেশের যথার্থ অবস্থা ও অভাবের সহিত আমাদের সমুচিত পরিচয় সংসাধনের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আফিস এবং আদালত যে দুইটি আশ্রয়, এ বিষয়ে আমাদের প্রধান বাধা ছিল, স্থানসঙ্কীর্ণতাবশতঃ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাপরাস্ সত্ত্বেও অনেকের পক্ষে ক্রমেই দুর্গম হইয়া উঠিতেছে। সুতরাং রাজসরকারের উন্মুক্ত ধ্রুব অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইয়া অনেক শিক্ষিত মনকে অগত্যা নূতন নূতন পথে নিজের ভাগ্য ও দেশের শুভ সূচিত করিতে হইতেছে।

এবং এই মনের গতি সহজেই যে দেশীয় শিল্প ও পণ্যজাতের পথ অবলম্বন করিতেছে, স্বল্পকাল মধ্যে দেশের নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসভা ও দেশীয় দ্রব্যজাতপ্রদর্শনী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পণ্যভবনগুলিই তাহা সপ্রমাণ করে। দাক্ষিণাত্য ও পঞ্জাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে

স্বদেশবস্তুব্যবহার প্রচলনার্থে যে সকল সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে চাহি না—ঐ সকল দেশের নিরভিমান নির্ব্বাক্ কর্ম্মনিষ্ঠ দেশানুরাগ সর্ব্বজনবিদিত—কিন্তু সাহেবিয়ানার আদি তীর্থ এই বঙ্গদেশে কয় বৎসরের মধ্যে এতদনুকূলে যে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বহুযত্নসিঞ্চিত "ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এসোসিয়েশন," চুঁচুড়ার নিঃশব্দকর্ম্মরত "স্বদেশী এজেন্সি," এবং স্বল্পদিনমাত্র কতিপয় বন্ধুজনের যত্নে স্থাপিত "স্বদেশী সভা," এবং তাহারই সহায়তা জন্য প্রতিষ্ঠিত "স্বদেশী ভাণ্ডার" এই সকলগুলিতেই এই পরিবর্ত্তন সূচিত হয়। এতদ্ভিন্ন, রাজধানী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে বহু দূরে নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে এতদনুরূপ অনামিকা চেষ্টাও যে হইতেছে, এতৎসংবাদ শ্রবণে এই মনোভাবের ব্যাপকতা সম্বন্ধে সংশয় অনেক পরিমাণে অপনীত হয়।

তিন বৎসর পূর্ব্বেও আমাদের এরূপ অবস্থা ছিল—এবং এখনও যে তদবস্থা আমরা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারিয়াছি, সাহসপূর্ব্বক এমন বলা যায় না—যে, অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থের উপরেও একটা বিলাতী ছাপ পড়িলে আমাদের চিত্তোদ্বেগ শান্ত রাখা কঠিন হইয়া উঠিত এবং তদভাবে কোন ভাল জিনিস দেখিলেও কুঞ্চিত নাসিকায় তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সঙ্কোচ হইত না। যে বোম্বাই কলের সুতা হইতে প্রস্তুত কাপড় পরিয়া ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত জনেরা গৌরব অনুভব করিতে উৎসুক হইয়াছেন, তিন বৎসর পূর্ব্বে কোন একটি দেশীয় কোম্পানি বিলাতীর পরিবর্ত্তে বোম্বাই হইতে ঐ কাপড় আনাইয়া কেবলমাত্র দেশী ছাপের গুণে, উপযুক্ত মূল্যে বাজারে বিক্রয় করিতে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেবল দেশী জিনিস বিক্রয়ের জন্য প্রয়াগে কাশীধামে ও কলিকাতায় কিছু দিন পূর্ব্বে কয়খানি দোকান খোলা হয়—অনাদরের উপেক্ষায় বহু ক্ষতি স্বীকারের পর বিলাতী লংক্লথ ও ছিটের জামা বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া কোন কোনটিকে গণপতির বিমুখতা হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে। আজ স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া অনেকে দেশী জিনিস চাহিতেছেন এবং সকল সময় আবশ্যকমত যথেষ্ট পাইয়া উঠিতেছেন না। শুভ অবসর এমনি করিয়াই নিঃশব্দপদসঞ্চারে সমাগত হয়।

নিজের দেশের সহিত সুপরিচিত হওয়া সম্বন্ধে আমাদের বাস্তবিকই কেমন একটু ঔদাসীন্য ছিল। স্বদেশ সম্বন্ধে যে পরিশ্রম করিয়া জানিবার কিছু থাকিতে পারে, এ কথাটা অনেক সময় সহজে মনে আসে না। বিলাতীর পরিবর্ত্তে যথাসম্ভব দেশী জিনিস ব্যবহার সংকল্প সুসিদ্ধ করিতে কত অজ্ঞাত অশ্রুতপূর্ব্ব প্রান্ত হইতে দ্রব্যজাত সন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়, সুতরাং দেশের শিল্পজাতের কল্যাণ সাধনচেষ্টায় তাহার যথার্থ অবস্থার সহিতও পরিচয় স্বতই সংঘটিত হইয়া পড়ে। ভারতবর্ষ ক্রমে আমাদের মনে তাহার ধন ধান্যে,

কৃষি শিল্প বাণিজ্যে, তাহার বক্ষতলবিহিত গুপ্ত যক্ষভাণ্ডারে ও বিধিদত্ত সহজ শোভাসম্পদে স্ফুটতর হইয়া উঠে। এবং এই অতুল সম্পদের দারুণ দুর্দ্দশা বিস্মৃত হইয়া কুক্কুরের মত পরপদলাঞ্ছিত হীন বিলাসে জীবন যাপন করিতে লজ্জা ও ঘৃণা বোধ হয়।

কিন্তু নানা কার্য্যে ব্যতিব্যস্ত সর্ব্বসাধারণের পক্ষে ইচ্ছাসত্ত্বেও যথেষ্ট পরিমাণে মনঃসংযোগপূর্ব্বক পরিহার্য্য ও ব্যবহার্য্য দ্রব্যজাত পদে পদে নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া কিছু কঠিন হইয়া পড়ে। আমরা সেই জন্য আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মধ্যে যেগুলি এদেশে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার একটি তালিকা প্রকাশ করিতে মনস্থ করিয়াছি। এবং তৎসহ যে সকল দ্রব্য এদেশে না পাওয়া গেলেও পরিহার করিবার পক্ষে বিশেষ বাধা দেখা যায় না, তাহারও একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিবার ইচ্ছা আছে। এই নীরস বিষয়ের অবতারণা সাহিত্যামোদী অধিকাংশ পাঠকগণের পক্ষে কিছু অপ্রীতিকর হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরোধে মধ্যে মধ্যে এরূপ সাহিত্যরসহীন প্রসঙ্গের অবতারণা অনিবার্য্য জানিয়া তাঁহারা ভরসা করি, আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন। এবং সুবিধা ও অবসরমত একটু কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক নিজ নিজ জেলায় যত প্রকার দেশী জিনিস প্রস্তুত হয়, তাহার ঠিকানা, কারিকরের নাম ধাম, মূল্য, পরিমাণ, কলিকাতায় পাঠাইবার উপায় ও খরচা প্রভৃতি সম্বন্ধে তালিকা এবং যদি সম্ভব হয় ত নমুনাদি পাঠাইয়া আনুকূল্য করিতেও কুণ্ঠিত হইবেন না।

এক্ষণে দেশীয় দ্রব্যজাতের তালিকা সুরু করিবার পূর্ব্বে আমাদের জন্য বিলাত হইতে নিত্য যে সকল দ্রব্য আমদানি হইয়া থাকে, তৎপ্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যাক। এ প্রসঙ্গে সর্ব্বপ্রথমেই কাপড়ের উপরে দৃষ্টি পড়ে—বিশেষতঃ আমাদের মত কাপড়প্রিয় জাতির দৃষ্টি। আমাদের বসনবৈচিত্র্যের ত অন্ত নাই—ধুতি চাদর পিরান শার্ট চোগা চাপকান কোট টাই চায়নাকোট পার্সীকোট ওয়েষ্টকোট পাজামা পেন্টালুন সকলেরই আমাদের ত্বকের উপরে সমান অধিকার এবং আমরাও সকলেরই অধিকার সমান ভাবে বজায় রাখিয়া সুবিধামত সাটে বেসাটে যথেচ্ছা মেলন করিয়া থাকি। সুতরাং কাপড়ের কারবারের পরিসর এদেশে কিরূপ বিস্তৃত, তাহার বাহুল্য ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এবং ম্যাঞ্চেষ্টরের কল্যাণে নিতান্ত অন্ধের দৃষ্টিতেও তাহা প্রতিভাত না হইয়া যায় না।

সূক্ষ্ম তথ্যতালিকার প্রয়োজন দেখি না, প্রতি দিন আমাদের চক্ষে যত লোক পতিত হয়, সকলের পরিধেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই এ বিষয়ের একরকম মোটামুটি ধারণা জন্মিয়া যায়। ধুতি, শাড়ী, উড়ানী; পিরান ও কামিজের লংক্লথ, নয়ানসুক, টুইল, নানাবিধ চেক ও ডোরা, সাদা ও রঙ্গীন ছিট্‌, মলমল, তাঞ্জেব; কোট পেন্টালুন ও চোগা চাপকানের ড্রিল, সাটিন জিন, খাকি, টুইড্; মোজা, গেঞ্জি, রুমাল, সকলই বিদেশ হইতে

আমদানি। এতদ্ভিন্ন নিত্যব্যবহার্য্য আরও অনেক বিলাতী জিনিস আছে; যথা, নানাবিধ তোয়ালে, গামছা, ঝাড়ন, ন্যাপকিন, মশারির থান, নেট, মার্কিন, তোষক, বালিশ প্রভৃতির খোলের জন্য বিচিত্র রঙ্গীন ও সাদা কাপড়, সালু ও ছাতার কাপড়, সুতী রেপার ইত্যাদি। টেবিলচাদর, কার্টেন ও পর্দ্দার কাপড়, গৃহসজ্জাবরণ ও পাখার ঝালরের জন্য হলাণ্ডক্লথ, নানাবিধ রঙ্গীন টেবিল ও টিপয়-কভার প্রভৃতি নব্যতন্ত্রীর আবশ্যকীয় অনেক প্রকারের বিলাত-আমদানি কাপড়, যাহা উপরিলিখিত তালিকার মধ্যে ধরা হয় নাই, তাহাও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এতদুপরি আধুনিক কুলস্ত্রীগণের নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বেশভূষোপযোগী নানাবিধ লেস্, চিকন, রিবন, গজ, জালি কাপড় ও নানান টুকিটাকির সংখ্যাও নিতান্ত কম হইবে না।

আমাদের নূতনলব্ধ সভ্যতার আদর্শ ইহাতেও সম্যক্ পরিতৃপ্ত হয় না। আমরা দেখি, বিলাতী জাহাজে বোঝাই দিয়া সুসভ্য পশ্চিম কেবলই যে সুতার কাপড় পাঠায় তাহা নহে, আমাদের প্রতি মায়াবশতঃ বর্ষে বর্ষে রাশি রাশি রেশম পশম পাটের মিশ্র ও অবিমিশ্র নানাবিধ বিচিত্রনাম কাপড় পাঠাইতেও ত্রুটি করে না। অতএব শরীরে সহ্য হউক বা না হউক, সভ্যতার দায়ে আমাদিগকে ঐ সকল জিনিস খরিদ করিয়া, প্রাণ হারাইলেও, মান বজায় রাখিতেই হয়। আলপাকা, প্যারামেটা, ফ্রেঞ্চ কাশ্মীর এবং নানান রঙের ডোরা ও চেক্ জুট ত এখন আমাদের মধ্যাহ্নিক আপিসের বেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং বিচিত্র ফ্রেঞ্চ সিল্ক, সার্টিন, মখমল, রেশমের লেস্ ও রিবন এবং এতদ্ভিন্ন অজ্ঞাতনাম বহুবিধ বস্ত্রখণ্ড নানা কার্য্যে আমাদের গৃহিণীগণের এক্ষণে নিত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ইহা ভিন্ন, ঋতুরও পরিবর্ত্তন আছে, এবং তদনুসারে মেরিনো, ফ্ল্যানেল, বনাত, সার্জ কাশ্মীর, পশমী টুইড্, কম্বল, ফেল্ট, জার্সি, এ সকলেরও প্রয়োজন হয়। এবং কাশ্মীর, সার্জ ও বনাতের চাদর আমদানি সুরু হইয়া অবধি এ সকল বিলাতী দ্রব্যজাতের চাহিদাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তদ্ভিন্ন বিলাতী নকল শাল রুমাল আলোয়ান এবং রেপার রগ্ প্রভৃতিরও আমদানী সামান্য নহে। ইহার উপর গলবন্ধ, কোমরবন্ধ, মোজা, কার্ডিগান, ব্ল্যাক্লাভা ও নাইটক্যাপ এবং ইংরাজের অর্দ্ধ-উপেক্ষিত বাবুশিরশোভী গোল টুপি, এমন অনেক জিনিস আছে—তাহার আনুপূর্ব্বিক তালিকা সংযোগ করিয়া পাঠকবর্গের ধৈর্য্যের প্রতি আক্রমণ করিতে সাহস করি না।

এরূপ দুঃসাহসের বোধ করি আবশ্যকও নাই। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত এখানকার ইংরাজ দোকানগুলির—বিশেষতঃ কাপড়ের দোকানের ক্যাটালগ দেখিয়া থাকিবেন। ঐ সকল ক্যাটালগে বেশভূষা হইতে সুরু করিয়া এন্টিমেকেসর, টি-কোজি, কুশন, কার্পেট পর্য্যন্ত বহুবিধ সুতী রেশম পশম প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যজাতের তালিকা

দেখা যায়, উহার অধিকাংশই আমাদের নবসভ্যতাভিশপ্ত ভবনে প্রবেশ লাভ করে। সুতরাং দীর্ঘ তালিকা উদ্ধৃত না করিয়া ঐ ক্যাটালগগুলির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব। ব্যবহারবশতঃ তাহা আমাদের অনেকেরই একরূপ মনস্থই আছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

তালিকাটি ত বড় সামান্য নহে। সুতা, রেশম, পশম, পাট, তাহার কয়েকটি বিভাগ মাত্র ; আনারস, ঘাস, রিয়া, তিসি, এমন কি, কাঠ হইতেও আঁশ বাহির করিয়া বিলাত আমাদের বসনবিলাস বর্দ্ধনে নিযুক্ত আছে। সে কালের বল্কল কিরূপ ছিল জানি না,—পায়নাপ্‌ল্‌, ক্রেপ বা কাঠরেশম বোধ করি, সে বৈরাগ্যের পক্ষে কিছু অতিরিক্ত গুরু হইত,—কিন্তু ইংরাজের আমদানি এই সৌখীন বল্কল আমাদিগকে ত প্রায় বৈরাগ্যধর্ম্মী করিয়া তুলিয়াছে, বিশেষতঃ স্বদেশীয় দ্রব্যজাত সম্বন্ধে!

শুনিলে বিশ্বাস করিতে লজ্জা বোধ হয়, আমাদের বসনান্তরালের নিভৃত ঘুন্‌শিটি পর্য্যন্ত এক্ষণে জর্ম্মনি হইতে আমদানি হইতে সুরু করিয়াছে। এবং কেবলমাত্র এই রঙ্গীন সুতাগাছি দিয়া জর্ম্মনি বর্ষে বর্ষে নিঃশব্দে কয় লক্ষ মুদ্রা গৃহে লইয়া যাইতেছে। আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, বানরের মত কটিদেশে ঐ রজ্জুখণ্ড বাঁধিয়া লাঙ্গুল আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছি ; গলায় বাঁধিয়া ঝুলিবার সুবুদ্ধিটুকু একবারও মনে উদয় হইল না! বোধ করি, এখনও অপেক্ষা করিয়া আছি, ম্যাঞ্চেষ্টর কবে বিভিন্ন গোত্রের জনকতক ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ ধরিয়া লইয়া গিয়া একেবারে বিলাতী কল হইতে সদ্যঃপ্রসূত মন্ত্রপূত উপবীত রপ্তানি সুরু করে, এবং এখানে চৌরঙ্গীর পণ্যশালায়, পগেয়াপটি ও সুতাপটির দোকানে, চাঁদনির পদপথপ্রান্তে আমাদের গলবন্ধন জন্য এই সূত্রখণ্ড গোত্রীয় নম্বরানুসারে সুলভে বিক্রয় সুরু হয়!

কিন্তু এক্ষণে উপায় কি? বিলাতী সুলভ নাগপাশে যখন একবার স্বেচ্ছায় ধরা দিয়াছি, তখন বণিক্‌কুল কি সে মায়াবন্ধ হইতে সহজে আমাদিগকে মুক্তি লাভ করিতে দিবে? শুধু ত তন্তুজাত দ্রব্য নহে, আমাদের আবশ্যকীয় কুটাটুকুর জন্য পর্য্যন্ত বিদেশের মুখ চাহিয়া থাকিতে হয়। শৈশবে বিলাতী পুতুল লইয়া আমরা খেলা আরম্ভ করি এবং বয়োবৃদ্ধিসহকারে ক্রমে বিলাতী পাদুকাযুগলকেও অর্চ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হই। বাস্তবিকই, লণ্ডনের চর্ম্মকারবর্গ অকস্মাৎ বিমুখ হইলে জুতা অভাবে আমাদের পদতল তিন সুতা পরিমাণ ক্ষয় হইয়া আসে। তাহার পর, ব্যাগ্‌ বাক্স ষ্ট্র্যাপ ঘোড়ার সাজ চসমার খাপ প্রভৃতি বিহনে যে অন্ধকার দেখিতে হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি!

বিলাতী চীনা বাসন ও কাচের দ্রব্যজাত কয় বৎসরের মধ্যে দেশের সর্ব্বত্র যেরূপ প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, তদভাবেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য।

ঝাড় লণ্ঠন আস্‌বাবাদি ধরি না, কাচের চুড়ী না পাইলে গৃহিণীর চন্দ্রবদন যে কি আকার ধারণ করিবে, অভিজ্ঞ পাঠককে ধ্যাননেত্রে সেই মূর্ত্তিটুকু অবলোকন করিতে অনুরোধ করি মাত্র। বৈকালিক প্রসাধনক্রিয়ার জন্য দর্পণ, তৈলের শিশি ও বাটি ও সন্ধ্যা হইয়া আসিলে দর্পণের একপার্শ্বসম্মুখে স্থাপিত করিবার উপযুক্ত চিমনি সহ ল্যাম্প, এ সকল অপরিহার্য্য দ্রব্যগুলি আহরণ করিবার পক্ষে জায়াচিত্তরঞ্জনেচ্ছু সুধীগণকে বহুল পরামর্শ দিবার প্রয়োজন নাই। ফুলদানি, খেলনা এবং নানাবিধ মণিমুক্তার কৃত্রিম অনুকরণের প্রতি যুবতিজনচিত্তের স্বাভাবিক স্পৃহাও সর্ব্বজনবিদিত। সুতরাং ভারতবর্ষে বিলাতী কাচদ্রব্য বহুল প্রচলনের কারণ দূরে খুঁজিতে হয় না।

তাহার পর ধাতুদ্রব্যও কম নহে। অস্ত্রশস্ত্র ছুরী কাঁচি প্রভৃতি বাদ দিয়া ধরিলেও নিত্যব্যবহার্য্য তালা চাবি, বাক্‌স পেটরা, সিন্ধুক আলমারি, কড়া কাতলী, শিকল পেরেক, কল কব্জা স্ক্রু সূচি পিন কাঁটা সংখ্যায় নিতান্ত সহজগণ্য হইবে না। চিরুনি ব্রুশ কৌটা প্রভৃতিও এখন নানা ধাতুর প্রস্তুত হইতেছে। এবং কলাইকরা বাসনের আমদানি সুদূর পল্লীগ্রাম অবধি পঁহুছিয়াছে। এতদ্ভিন্ন যন্ত্রাদি, সৌখীন দ্রব্য, ষ্টেশনারি, মায় তুরস্ক ফেসানের নারগিলা পর্য্যন্ত বিলাতী জাহাজে নিত্য এদেশে আনীত হইতেছে। এবং আমাদের মধ্যে অনেকে, নারগিলা না ধরিলেও, বিলাতী নলসংযোগে আলবোলা হইতে ধূম্রাকর্ষণ সুরু করিয়া দিয়াছেন।

এ সকলের উপরে কাঠের জিনিস, কাচকড়া, ঝিনুক, হাড় ও হাতীর দাঁতের প্রস্তুত নানাবিধ সামগ্রী, রবরের জিনিস, তেল সাবান বাতি এসেন্স ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য, নানা রুচির সুলভ চিত্রাদি, বোতলে ও টিনে বদ্ধ দুগ্ধ মাখন পনির জ্যাম জেলি মিষ্টান্ন বিস্কুট উদ্ভিজ্জ ফলমূল মৎস্য মাংস মদ্য এবং এতদ্ভিন্ন সহস্রাধিক নব নব দ্রব্যজাত চালান দিয়া বিলাত আমাদিগকে মজ্জাবধি বিবশ করিয়া তুলিয়াছে। এবং এখনও বা যতটুকু বাকী আছে, প্রতি দিন নানা উপায়ে বিলাসকে সুলভতর করিয়া তুলিয়া সেটুকু অসম্পূর্ণ না রাখিবার পক্ষে সাধ্যমতে যত্নের ত্রুটি করিতেছে না।

ইংরাজ বণিক্, সহধর্ম্মী স্বজাতীয় মিশনরীরই অনুসরণে, আমাদের দ্বারের কাছে দোকান খুলিয়া, অযাচিত ক্যাটালগ পাঠাইয়া, বাড়ীতে জিনিস বহিয়া দিয়া আসিয়া, দেশী এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া, যত প্রকার উপায়ে সম্ভব, আমাদিগকে অষ্ট প্রহর আগলিয়া আছে—সর্ব্বদাই সতর্ক, পাছে আমাদের কোনও অভাব মোচনের ত্রুটি হয় অথবা কোনরূপে নব নব অভাবগুলি আমাদের অনুভূতি এড়াইয়া যায়। এমন কি, আবশ্যকমত, চিরপরিচিত গৃহসারমেয়ের মত আমাদের পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া কেমন হেলাভরে আমাদের নিদারুণ অনাদরবেদনা ঘুচাইয়া দেয়, এবং পুনশ্চ কেমন অবলীলাভঙ্গীতে, আমাদেরই শিক্ষাবিধানার্থে

চিরন্তন অতি মৃদু অনতিস্ফুট "What can I do for you Sir" পদটিকে, ঈষৎ রূঢ় হইলেও, অনায়াস-শ্রুতিগম্য "What do you want, Babu" পদে রূপান্তরিত করিয়া লইয়া প্রখর সভ্যতাবেগকে লঘু ও আমাদের পক্ষে সমধিক উপযোগী করিয়া তুলে। এবং সেই জন্যই ইংরাজী পণ্যভবনদ্বারে, বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায়, আমাদের নির্ব্বাণকামনা সমধিক প্রগাঢ় হইয়া উঠে।

কিন্তু বিলাতী জিনিসের দেশী দোকানে এত শত সাংঘাতিক আকর্ষণ নাই। কিন্তু একেবারে যে কোন আকর্ষণই নাই, এ কথা বলা চলে না। বিলাতী জিনিসের মজ্জায় মজ্জায় আমাদের প্রতি যে বিষবিদ্রূপ নিহিত রহিয়াছে, তাহা হইতে পরিত্রাণ কোথায়? বিলাতী কাপড়ের মধ্য হইতে ম্যাঞ্চেষ্টর নিঃশব্দে পরিহাস করে,—হে আর্য্য, আমরা ত বহুদিনের ম্লেচ্ছ, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মাতা স্ত্রী দুহিতার লজ্জা নিবারণ করে কে? যে বস্ত্রখণ্ডসংবৃত হইয়া, হে স্বদেশহিতৈষি, এই ম্যাঞ্চেষ্টারকে গালি দিয়া এত সহজে তুমি দেশের করতালি সংগ্রহ কর, সে বস্ত্রখণ্ডের জন্য তুমি কাহার নিকট ঋণী? বিলাতী কাতলীর মধ্য হইতে চা-পায়ী নব্য-ভারতকে বার্মিংহাম একটুকু কৃতজ্ঞতা স্বীকারের অবসরলাভের জন্য অনুরোধ করে। বিলাতী বেন্টউড্ চেয়ার কংগ্রেসের প্রত্যেক রেজোল্যুশনকে পরিহাস করিয়া বলে, দেশের টাকা বিলাতে যায় বলিয়া বিদেশী গবর্মেণ্টকে তোমরা যে তিন দিবস ধরিয়া দোষ দাও, একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, যে আসনে বসিয়া সেই গালি পাড়, সেই আসনের ইতিহাসটা কি।—সুতরাং এই পরিহাসলাঞ্ছনার আকর্ষণ ইংরাজের দোকান ভিন্ন দেশীয় লোকের বিলাতী দোকানেও যথেষ্ট।

কিন্তু পতঙ্গও বহ্নিমুখ পরিত্যাগের সংকল্প করিতেছে—আমাদের মধ্যেও অনেকেই এই বিলাতী পণ্যশালার আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিবার ইচ্ছা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে নানাবিধ নূতন নূতন কলকারখানার সূত্রপাতও হইতেছে। একদিনে অবশ্য আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না। সর্ব্বাংশে বিদেশের উপর নির্ভর পরিত্যাগ করা আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভবপর নহে; তথাপি যে সকল সামগ্রী এ দেশে পাওয়া যায়, তৎসম্বন্ধে বিদেশের অনুগ্রহলাঞ্ছনাটুকু উপেক্ষা করা বোধ করি, নিতান্ত কঠিন হইবে না। এবং বিদেশীয় দ্রব্যজাতের সাহায্যে নিজেকে অলঙ্কৃত করিবার চেষ্টার মধ্যে হীনতা যতই উপলব্ধি করিতে পারিব, স্বদেশীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ততই আমাদের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবার দিকে অগ্রসর হইতে থাকিবে। আপাততঃ কোন কোন স্থলে একটু আধটু সৌখীনতা ত্যাগ করিতে হইতে পারে; কিন্তু ভদ্রজনদিগের তাহাতে কুণ্ঠার কোনরূপ কারণ নাই। কারণ, বসন ভূষণের চাকচিক্য কোথাও ভদ্রতার পরিচায়ক নহে, আচরণই তাহার একমাত্র

পরিচয়স্থল। এবং ভদ্রজনের পক্ষে যে বেশভূষায় একটি পরিপাটি সংযম প্রকাশ পায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুশোভন।

কিন্তু তৎসম্বন্ধে সুদীর্ঘ মুখবন্ধনের প্রয়োজন নাই। বিলাতী আমদানীর মোটামুটি তালিকা উপরে লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহার মধ্যে কোন্ জিনিসগুলি দেশেই পাওয়া যাইতে পারে এবং যেগুলি বা না পাওয়া যায়, সেগুলি কত দূর পরিহার করা চলে, ইহাই প্রধান আলোচ্য। তালিকাটি স্থির করিতে পারিলে পাঁচ জন ভদ্রসন্তান একত্র বসিয়া আলোচনাপূর্ব্বক আমাদের এই পণ্যসমস্যার মীমাংসায় উপনীত হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কারণ, মনের ভাব সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে বিরোধ অল্পই; কেবল সকল সুবিধা অসুবিধা সকলের জানা না থাকায় বাহিরে অনেক সময় ব্যবহারের বহু বৈপরীত্য লক্ষিত হয়।

প্রবন্ধান্তরে আমাদের স্বদেশীয় ব্যবহারিক শিল্পের তালিকা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এ বিষয়ে পাঠক সাধারণেরও সানুগ্রহ সহায়তা লাভের আশা রাখি। ['ভারতী,' জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫]

প্রাচ্য প্রসাধনকলা

কবি যদিও কহিয়াছেন—"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্," রূপসীরা কিন্তু এই বচনের উপর নির্ভর করিয়া বল্কলমাত্রাবলম্বনে কবির মনোহরণ অভিসারে বাহির হইতে সম্যক্ সাহসী হয়েন না। কবিকে তাঁহারা নিতান্তই কল্পনাজীবী জানিয়া মনে মনে বলেন, হে কল্পলোকের অতিথি, তুমি আমাদের এই নিরাভরণ তন্বঙ্গের যতই মনোহারিতা প্রকাশ কর না কেন, আমরা মনে স্থির জানি, কতখানি তুমি এই উৎপলনেত্রে মুগ্ধ, আর কতখানিই বা ইহার মধ্যে কজ্জলকালিমার মোহ, কতটুকু এই অপাণ্ডুরস্নিগ্ধ অধরপুটের আকর্ষণ, আর কতখানি বা তপ্ত লাক্ষারাগের উদ্দীপনা। উৎসাহাবেশে তুমি যাহাই বল, আমাদের প্রতি অঙ্গ তাহার কেয়ূরকঙ্কণমেখলানূপুরে তোমার অন্তরে মুখরিত হইয়া উঠে, আমাদের যৌবন-লাবণ্য বিবিধ রাগরঞ্জিত হইয়া তোমার চিত্তে অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলে; তোমার মুগ্ধ দৃষ্টি যেখানে দেখে বাহুকটিচরণভঙ্গিমা, আমরা সেইখানেই অনুভব করি কেয়ূরকাঞ্চী-নূপুরলাঞ্ছনা, যে গণ্ডস্থলের তরুণ অরুণিমা তোমাকে একান্ত মুগ্ধ করিয়া রাখে, আমরা বুঝি তাহার কতটুকু এই স্মিতগণ্ডের, কতটুকু বা মোহিনী তুলিকার রাগ-রচনাগত। যুগের গুণে রুচির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রূপ যেখানে আছে, প্রসাধনের সাধনা সেখানে না থাকিয়া যায় না।

সংস্কৃতি কবি, বোধ করি বহুদিনের অভিজ্ঞতায়, আর কিছু না হউক, এই জ্ঞানটুকু লাভ করিয়াছিলেন। সেই জন্য কোন সময়ে মধুরাকৃতিদিগের মনোজ্ঞতাবর্দ্ধনবিষয়ে মণ্ডন-বাহুল্য নিষ্প্রয়োজন বলিলেও, অন্তঃপুরের প্রসাধনকক্ষদ্বারে সুবিধামত অপাঙ্গবিক্ষেপ করিয়া আসিতে তিনি কখনও ছাড়েন নাই। এবং প্রসাধন কলাটিকে স্বল্পদিন মধ্যেই বহুতর সৌন্দর্য্যসিঞ্চনে তাঁহার কাব্যলোকের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। কেয়ূর কঙ্কণ মেখলা হার নূপুর কুণ্ডল ক্রমে যেন সেই কাব্যলোকেরই অনিবার্য্য অলঙ্কার হইয়া উঠিয়াছে এবং কজ্জল কুঙ্কুম অলক্তক লোধ্ররজ অগুরু ধূপ প্রভৃতি সেই কল্পলোকবাসিনীদিগের প্রসাধনী কলার প্রধান উপকরণরূপে পরিণত হইয়াছে। নব নব ঋতুপর্য্যায়ে সেখানকার সুমধ্যমা কৃষাঙ্গীগণের স্থূল সূক্ষ্মাম্বর কখনও কুসুম্ভপরাগরাগে, কখনও বা ঈষৎ বাসন্তী রঙ্গে, কখনও নিবিড়জলদাভ, কখনও কনকচম্পকপ্রভ, ঋতূচিত নানা বর্ণে সুরঞ্জিত হইয়া থাকে, এবং তৎপ্রতি কবির বিশেষ আগ্রহও প্রকাশ পায়। সংস্কৃত কবি এইরূপে, একদিকে "কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্" ইত্যাদি মনোহর বচনে এবং অন্য দিকে রূপসীগণের নানাবিধ সুশোভন প্রসাধনসংসাধনে, নারীহৃদয়ে সহজেই সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এবং বোধ করি, সাহস করিয়া বলা যায়, কামিনাগণের এরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সেবা আর কোন দেশের কবি এমন সুনিপুণ অবলীলাসহকারে করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

নব্যতন্ত্রীরা যদি রাগ না করেন, তাহা হইলে সাহসপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করি যে, যতই নারীপূজক হউন না কেন, আধুনিক পাশ্চাত্য কবি কি কখনও তাঁহাদের সহস্রমুকুরবিম্বিত প্রসাধনভবনদ্বারে নিয়ত উপস্থিত থাকিয়া এরূপ সেবাশীল ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন ? আধুনিক বিজ্ঞান নিত্য নূতন আবিষ্কার দ্বারা প্রসাধনবিলাস অনেক বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে এবং আসন মুকুর গৃহসজ্জা দীপালোক প্রভৃতির নানাবিধ উন্নতি সাধন করিয়া ইহাকে অপেক্ষাকৃত সহজ ও অনায়াসসাধ্য করিয়া আনিয়াছে, কিন্তু যে রমণীয় কুহকসঞ্চারে নারীজাতির এই নিত্যকর্ম্ম সে কালে কবিতার কল্পলোকলাবণ্যে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কুহক, সে মোহময়ী রমণীয়তা এ প্রসাধনশালায় কোথায় ? এবং বোধ করি, এই পাশ্চাত্য আদর্শানুসরণেই আমাদের নব্য প্রসাধনশালাও কবির সর্ব্বাঙ্গীন স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। যেখানে বা আধুনিক প্রাচ্য কবির এতৎপ্রতি একটুকু সানুভব দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে দেখা যায়, সেখানে তিনি সেই সে কালের অন্তঃপুরদ্বারে, পুরাতন উজ্জয়িনীর প্রাসাদবাতায়নসম্মুখে অথবা তমালতরুচ্ছায়ানীল বৃন্দাবনের আভীরকন্যাপরিসেবিত প্রাঙ্গণে গিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন ; নব্যাঙ্গনাগণের বিচিত্রোপকরণ প্রসাধনকলা তাঁহার হৃদয় তাদৃশ মন্থন করিয়া তুলে নাই।

সে কালের প্রসাধনকলায় তবে না জানি কি মোহ ছিল, যাহাতে কবিহৃদয় আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারিত না। অথবা কে জানে, সেই বিগতা রূপসীদের রূপযৌবনভঙ্গারই বা কি অমোঘ কুহক ছিল যে, তাঁহাদের পেলব দেহলতার প্রতি স্পন্দনে, বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গে, মৃণালভুজসঞ্চালনে, চারুচরণবিক্ষেপে এই মনোহর প্রসাধনকলা কাব্যের ছন্দে ঝঙ্কৃত ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত! উপকরণ ত এখনও বহু আছে—লোধ্ররজ নাই বটে, কিন্তু শ্বেতহস্তচূর্ণিত শুভ্র রজ এখনও সমুদ্রপার হইতে নিত্য আমদানি হইয়া থাকে, অলক্তক পূর্ব্ববৎ ব্যবহৃত না হইলেও তাহার পরিবর্ত্তে নব নব গাঢ় রক্তদ্রাব প্রচলিত হইয়াছে, অগুরু ধূপ না থাক, কিন্তু হেয়ার-ওয়াশের গন্ধও হীন নহে; তবে অভাব কিসের? অলঙ্কার এখনও সেই সুন্দর মণিবন্ধে একান্ত সন্নদ্ধ হইয়া রহে, এখনও হারযষ্টি তনু গ্রীবাদেশ বেষ্টন করিয়া ধরে, এবং যৌবনশ্রী চিরদিন যাহা ছিল, সেইরূপই অনিন্দ্যসুন্দর কমনীয়তায় তনু মন প্রাণ হরণ করিয়া লয়; তবে কবিতার কল্পকাননে এই প্রসাধনবিচিত্র যৌবনকলা তাহার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হয় কেন?

কবিকুলকেও সহসা অপরাধী সাব্যস্ত করিতে প্রবৃত্তি হয় না; মনে হয়, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে তাঁহাদের কাব্যনাড়ী পীড়িত করে। হয় ত বর্ত্তমান কালের প্রসাধনকলামধ্যে, আধুনিক সকল বিষয়েরই মত কোথাও একটি অতিসচেতন ভঙ্গী প্রকাশ পায়, কোথাও আবরণমধ্য হইতে সর্ব্বদা সতর্ক চেষ্টার ক্লিষ্ট মূর্ত্তিখানি ব্যক্ত হইয়া মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিমুখ করিয়া দেয়। কারণ, ইহাতে আর সন্দেহ নাই যে, সে কালে প্রসাধনকলা এখনকার মত এত গোপন ব্যাপারও ছিল না এবং তাহার মধ্যে কোনপ্রকার রহস্যভেদাশঙ্কা না থাকায় সর্ব্বদা আবরণরক্ষার দুশ্চিন্তাও ছিল না। নব্য পাশ্চাত্য প্রসাধনকলা সে হিসাবে সর্ব্বদাই সতর্ক ও সন্দিগ্ধ, এবং নানা ছদ্ম আচ্ছাদনে আত্মগোপন করা তাহার পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। কারণ, তাহার মধ্যে অনেক নিদারুণ দ্বন্দ্ব এবং চেষ্টা, কঠিন পীড়ন এবং নিষ্ঠুরতা প্রচ্ছন্ন আছে, তাহা ব্যক্ত হইলে তাহার সমস্ত সৌকুমার্য্য একেবারেই ব্যর্থ হইয়া যায়। পাশ্চাত্য বেশবন্ধ যাঁহাদের পরিচিত, তাঁহারাই অবগত আছেন যে, তাহার বিপুল বাহুল্য কোথাও অসঙ্গতরূপে স্ফীত হইয়া উঠিয়া যেমন স্বভাবকে লঙ্ঘন করে, সেইরূপ তাহার কঠিন বন্ধন কোথাও নির্দয়ভাবে পিনদ্ধ হইয়া তনুমধ্যকে তনুতর করিবার প্রয়াসে প্রাণবায়ু চলাচলের পথ পর্য্যন্ত প্রায় রুদ্ধ করিয়া দেয়। এই কৃচ্ছ্রসাধন, এই শরীরপীড়ন ও মনের উদ্বেগ, এই অস্বাভাবিক অসঙ্গতি, ইহাই বোধ করি, কবিহৃদয়ের স্নেহধারা হইতে এই প্রসাধনকলাকে বঞ্চিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে তপঃসাধনের কঠোরতা সমস্তই আছে, কিন্তু তাহার শান্তিময় উচ্চ লক্ষ্যটুকু কোথাও নাই, যাহাতে হৃদয় তৃপ্তি মানে। কেবলি বন্ধন এবং বেধন, পিন এবং রিবন, কুঞ্চন এবং

সম্প্রসারণ, পীড়ন এবং প্রয়াস ; কলাবিদেরা যে আনন্দ এবং পূর্ণতাকে কলার প্রধান লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহার সম্পূর্ণ অভাব।

আমাদের অন্তঃপুরে প্রসাধন একটি নিত্যকর্ম্মের মধ্যে, এবং আমাদের সকল নিত্যকর্ম্মই যেরূপভাবে সম্পাদিত হয়, এই সজ্জাকলাও সেইরূপ বিনা আড়ম্বরে অবাধে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে গোপনীয় বড় অধিক নাই এবং তাহা অত্যন্ত গোপনভাবে সমাধাও হয় না। আমাদের রমণীগণ পঙ্খ-কারু-পিচ্ছল হর্ম্ম্যতলে মাতুরটি বিছাইয়া সম্মুখে দর্পণখানি স্থাপিত করিয়া কাজললতা ও সিন্দুরের কৌটা এবং কেশপাশবেধনবন্ধনের উপকরণ লইয়া যেখানে বসিয়া কেশ বিন্যাস সম্পাদনে নিযুক্ত হয়েন, সে স্থান প্রায়ই গতিবিধির পথপ্রান্ত হইতে প্রচ্ছন্ন নহে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের কিছুমাত্র বাধা হয় না। নানাসখীসমাগত হাস্যপরিহাস গল্পগুঞ্জন ও রসালাপপ্রসঙ্গের মধ্যে প্রসাধনব্যাপার যেন লীলাচ্ছলে সংসাধিত হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে নিত্যকর্ম্মের অভ্যাসটুকু ব্যতীত কোনরূপ দারুণ দুঃসাধ্য সাধন নাই। বেশভূষা যেমন শরীরের কোন অঙ্গকে অতিমাত্র পীড়িত বিকৃত করে না, তেমনি অতিসচেতন চেষ্টা মনকে কোথাও ক্লিষ্ট করিতে থাকে না।

আমাদের প্রসাধনকলা প্রকৃতির সহিতও নানা ভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বদ্ধ। এমন কি, পাশ্চাত্য কলার সহিত তুলনায়, ইহাকে প্রকৃতির স্বহস্তরচিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। লোধ্ররজই কি, তাম্বুলরাগই কি, কুঙ্কুমলেখাই কি, চন্দনরচনাই কি, সকলই আমাদের প্রকৃতির দান। তাঁহার তরু লতা ফুল ফল পত্র বৃক্ষনির্য্যাস হইতে, তাঁহার স্বকীয় প্রসাধনপেটিকা হইতে সঞ্চিত। এমন কি, রূপসীগণের বস্ত্ররঞ্জন করিতে হইলেও আমাদিগকে প্রকৃতির সজ্জাভবনদ্বারে উপস্থিত হইতে হয়, এবং ঋতু অনুসারে কখনও কুসুম্ভ, কখনও শেফালীবৃন্ত, কখনও লট্‌কান, কখনও বা হরিদ্রা, কখনও নীল, কখনও বা বল্কলরস দানে প্রকৃতি আমাদের প্রমদাগণের শাটিকা ও চোলি রঞ্জিতকরণে সহায়তা করেন।

পাশ্চাত্য প্রসাধনকলাকেও এ সকল বিষয়ের জন্য যে প্রকৃতির দ্বারস্থ হইতে হয় না, তাহা নহে, কিন্তু প্রকৃতির সেখানে প্রকৃতিস্থ থাকিবার যো নাই। রাসায়নিক প্রক্রিয়া, পেটেন্টের পাট্টা, মকদ্দমার আরজি, ট্রেডমার্কের ছাপ, বিজ্ঞাপনের ঘোষণাপত্রে বল্কলধারিণী বনচারিণীকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের প্রসাধনে প্রকৃতির উপর কোথাও এরূপ জবরদস্তি প্রকাশ পায় নাই ; পণ্যশালার মধ্যেও সে আপনার সরল শুচি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। আমাদের রমণীগণ স্বহস্তেই মুখমণ্ডলে লেপনজন্য দুগ্ধ হইতে সরটুকু তুলিয়া রাখেন, রৌদ্রে গোলাপপাতা শুকাইয়া আমলকী কুটিয়া লইয়া কেশধূপ রচনা

করেন, সযত্নসজ্জিত তাম্বুলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া তৃপ্ত হয়েন, দীপটি জ্বালিয়া তদুপরি কাজললতাখানি ধরিয়া আঁখির অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া লয়েন, চন্দনকাষ্ঠ ঘষিয়া লইয়া পত্ররচনা করেন, ইহার মধ্যে কোথাও পেটেন্ট আপিসের কোনও উপদ্রব নাই।

প্রাচ্য প্রসাধনকলার এই যে একটি নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্য ভাব, ইহাতেই ইহা রমণীয় এবং এই ভাবের গুণেই কবিহৃদয়ে ইহা এমন সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। আমাদের মনে আমাদের প্রমদাগণের চিত্র যেন তাঁহাদের বিচিত্র প্রসাধনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সন্নিবদ্ধ। সিন্দূরের টিপ্‌টি, কবরীর বেষ্টনটি, অঞ্চলের প্রান্তটি, অবগুণ্ঠনের পাড়টি, দুইখানি প্রকোষ্ঠসন্নদ্ধ বলয়কঙ্কণ এবং কণ্ঠবিলম্বিত চারু হারলতাটি, এমন কি, নূপুরের নিক্বণটুকু পর্য্যন্ত আমাদের অন্তরে কুলকন্যাগণের কমনীয় মূর্ত্তির সহিত একান্ত বিজড়িত। এইগুলি বাদ দিয়া অন্য কোনও নূতন বেশে বোধ করি আমরা তাঁহাদিগকে ঠিক এরূপ ভাবে দেখি না। উচ্চগোড়ালি সূক্ষ্মাগ্র বিলাতী পাদুকা-নিষ্পীড়িত পদপল্লব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে তেমন স্থির করিয়া গিয়া পড়ে না। জামায় লজ্জা নিবারণ করে, অতএব তাহার দোষ দিতে পারি না, কিন্তু জ্যাকেটের সজ্জাবাহুল্যে ভূষণ-ঘোষণা করে অথচ শ্রী এবং হ্রী রক্ষা করে না। ইহা নিশ্চয় যে, গৃহপ্রাঙ্গণে, উৎসবক্ষেত্রে, কোন শুভ অনুষ্ঠানে এই সকল ফ্যাশান-স্ফীতিমার অসঙ্গতি যেন সমধিক পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

কারণ, আমাদের সকল শুভ কার্য্যেই বাহিরে যেমন নহবত না বসিলে নয়, অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণতলে সেইরূপ নূপুর কঙ্কণ অঙ্গদ কুন্তল রুণুঝুণু রিণিঝিনি না বাজিলে সকলই শূন্য ও শ্রীহীন। হ্রীসংযতা নারীগণের কলকণ্ঠের পরিবর্ত্তে এই সকল অলঙ্কারশিঞ্জিতেই বাহিরের পুরুষগণ অন্তঃপুরের পরিপূর্ণ আনন্দোৎসবের সংস্পর্শ অনুভব ও উপভোগ করেন। এবং তাঁহাদের অন্তর একটি মনোহর সৌন্দর্য্যলোকের কল্পনায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে, যেখানে আনন্দের অবসান নাই এবং কোথাও কোনরূপ অভাবের সূচনামাত্র নাই। এই ধ্বনিবৈচিত্র্যের অন্তরালে যে একটি পিনদ্ধনিচোলা নীলাম্বরীপরিহিতা ঈষদবগুণ্ঠনবতী কল্যাণী মূর্ত্তি প্রচ্ছন্ন আছে, সেই লক্ষ্মীরূপিণীই আমাদের মনোরাজ্যে অধিষ্ঠাত্রী দেবী; এবং এই চিরস্নেহময়ীর অধিষ্ঠানেই আমাদের গৃহ নিত্যোজ্জ্বল।

যে গৃহে পাশ্চাত্য গৃহসজ্জার সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ আসবাব নাই—না আছে কৌচ, না আছে সোফা, না আছে পিয়ানো, না আছে হোয়াট্‌নট্‌, না আছে দেয়ালে পেরেক ও হুকে বিলম্বিত অগণ্য ব্র্যাকেট, ফুলদানি, আয়না, পাখা, চিত্রিত জাপানী চিকের টুকরা, কোণে শেল্‌ফ, কোথাও চিজেল, কোথাও জার্ডিনিয়র, অন্যত্র নানাভঙ্গীবিশিষ্ট উচ্চ নীচ বক্র ত্রিকোণ ক্যাবিনেটরাজি এবং তদুপরি সজ্জিত অসংখ্য শঙ্খ শম্বুক প্রবাল পুত্তল ফটোফ্রেম ও রীতিমত একখানি মণিহারীর দোকান। চিত্রিত গৃহভিত্তি কলাকুশলা তন্বঙ্গীগণের বহুযত্নলিখিত

বিচিত্র আলেপনরচননৈপুণ্য ব্যক্ত করে মাত্র এবং পঙ্খের মেঝের উপরে দন্তখচিত পর্য্যঙ্কতলে রঞ্জিত-সূত্র-চিত্রিত আস্তরণশয্যায় আমাদের গৃহসজ্জাভাব পূর্ণ করিয়া দেয়, অথবা উপাধানসঙ্কুল নির্ম্মল শুভ্র বিস্তীর্ণ বিছানায় অভ্যাগতদিগকে সর্ব্বদা উন্মুক্ত স্বাগত নিবেদন করে। তাহার কোথাও কোনও আতিশয্য নাই, যাহাতে দর্শকের মনে সর্ব্বদা একটি পণ্যভবনের প্রসঙ্গ উপস্থিত করে বা কোনরূপ নিরর্থকতা সূচিত করিয়া দেয়। আছে কেবল অবাধপ্রচুর সূর্য্যালোক, ধূলিবিহীন নিরবচ্ছিন্ন পারিপাট্য এবং সর্ব্বদা একটি প্রশান্ত পরিচ্ছন্ন সংযত আরাম। এই উড্ডীনরেণু তপ্ত প্রাচ্যদেশে আসবাববিরলতার যে কি শ্রী এবং শোভা, এবং আরাম এবং শান্তি, তাহা পাশ্চাত্য সভ্যতা জানে না, এবং সভ্যতাদগ্ধপক্ষ বহ্নিমুখী পতঙ্গ আমরাও অনেক সময় প্রাণপণে না জানিবার চেষ্টা করি।

কিন্তু আমাদের চিরাগত প্রসাধনকলার মনোহারিতা সম্যক্ অনুভব করিতে হইলে একবার এই গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া দণ্ডায়মান হওয়া আবশ্যক। এই যে বিরলবস্তু পরিষ্কার পরিপাটি বিচিত্রচিত্রিত চারুচিক্কণ গৃহখানি, এই পটভূমির উপরেই আমাদের সহজ শোভন বিচিত্র প্রসাধিত চারু নারীমূর্ত্তি সম্যক্ ফুটিয়া উঠে; এবং আমাদের কবিগণ হর্ম্ম্যরাজির বাতায়ন ও গবাক্ষপথ দিয়া সেই মর্ম্মস্থলে উপনীত হইতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদের কাব্যে নারীসৌন্দর্য্য প্রসাধনকলায় এরূপ সমুদ্ভাসিত। কখনও হর্ম্ম্যতলে নিদাঘকাতর আলুলায়িত দেহযষ্টি, প্রখর রবিকরজ্বালায় স্থূল বস্ত্র পরিহার করিয়া সূক্ষ্মাম্বরপরিহিতা, কণ্ঠে লঘু মুক্তাহার, মণিবন্ধে মণিময় বলয়, শ্লথ দেহলতা মেখলাভারবহনেও অক্ষম; কখনও যে দিন ভবনশিখরে ঘনঘটা করিয়া নীল মেঘ নামিয়া আসে, শিখী পুচ্ছ বিস্তারপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, জলদ মেঘমল্লারে গম্ভীর গর্জ্জন করে, ঘননীল চোলীখণ্ডোপরি কুসুম্ভরাগরক্ত শাটীখানি জড়াইয়া, কর্ণাটছন্দে কবরী বাঁধিয়া, চিবুককুহরে কস্তুরীবিন্দুটুকু নিবদ্ধ করিয়া, বন্ধুজীব অম্বুজ এবং নীপকুসুমের মালা পরিয়া, কর্পূরচন্দনচর্চ্চিতদেহে সীঁথি-কুণ্ডল-হার-অঙ্গদ-কঙ্কণ-কাঞ্চী-মঞ্জীরমণ্ডিতা—বর্ষার মর্ম্মমন্দিরে যেন তাহার অধিষ্ঠাত্রী তড়িল্লতা; কখনও সুদীর্ঘ শারদ নিশান্তে কাশশুভ্রাংশুকা, অগ্রহায়ণে আপক্বশালিশ্যামলাম্বরা, বসন্তজ্যোৎস্নায় বকুলমাল্যভূষণা। ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির তরুলতাপুষ্পপল্লবে যেমন বিচিত্ররাগসঞ্চারে নব নব চাঞ্চল্য অনুভূত হয়, আমাদের স্ত্রীনিকুঞ্জেও সেইরূপ যেন কখনও নীলাম্বরীতে, কখনও কুসুম্ভরক্তবস্ত্রে, কখনও বাসন্তীবসনাঞ্চলে প্রকৃতির সেই অন্তরের পুলকরশ্মি বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এমন কি, উৎসবজনতার বেশবৈচিত্র্যে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হয়, যেন শ্রীপঞ্চমী, দোলযাত্রা, জন্মাষ্টমী, কোজাগর-পূর্ণিমা, এইগুলি ঋতূচিত প্রসাধনেরই এক একটি আনন্দ-উৎসব।

কিন্তু পাশ্চাত্য ভূমিতে সুন্দরীগণের প্রসাধনবৈচিত্র্য কম নহে, বরং আমাদের তুলনায় বহুগুণে অধিক ; সেখানে কেবলি যে ঋতুতে ঋতুতে সুন্দরীগণের বেশ পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা নহে, দিবসে নিশীথে, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে, চা-পানসময়ে ও ডিনার-আসনে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বেশভূষা। এবং সেখানকার সাপ্তাহিক মাসিক সাময়িক অসাময়িক সচিত্র বিচিত্র নানা পত্রে নিয়ত আন্দোলিত আলোচিত বিজ্ঞাপিত হইয়া এতৎপ্রতি সর্ব্বদাই সাধারণের মনোযোগ অত্যন্ত সজাগ করিয়া রাখা হয়। কিন্তু ইহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব লইয়া এত আন্দোলন আলোচনা সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত ইহা কাব্যের বিষয়ীভূত হইয়া একটি স্থায়ী আনন্দসত্তা লাভ করে নাই। আমাদের প্রসাধনের মত পাশ্চাত্য ভূমিতে প্রকৃতির সহিত তাহার সেই অনিবার্য্য প্রাসঙ্গিকতাটুকু নাই। ['ভারতী,' ভাদ্র ১৩০৫]

শুভ উৎসব

পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘর্ষে আর যাহাই হউক, আমাদের পুরাতন বিচিত্র উৎসবকলা যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নাই। দোল দুর্গোৎসবেই কি, বার ব্রত অনুষ্ঠানাদিই কি, আর জাতকর্ম্ম অন্নপ্রাশন বিবাহাদি সংস্কারগুলিই বা কি, অল্পদিন মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়াকর্ম্মেই যেন কি একটি পরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে—প্রাচীন কালে ইহার মধ্যে যে শুভ আনন্দটুকু ছিল, তাহা বুঝি আর থাকে না, ইহার ব্যাপক সার্ব্বজনীন ভাব সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া ক্রমশঃ ইহা ব্যক্তিবিশেষের সমারোহময়ী তামসিকতা-মাত্রে আসিয়া না পরিণত হয়। কারণ, আমাদের দেশে, সমাজবন্ধনগুণেই হউক বা লোকের প্রকৃতিগুণেই হউক, উৎসবমাত্রেই চতুষ্পার্শ্বের সর্ব্বসাধারণের যেন একটি চিরন্তন অধিকার ছিল ; আমার গৃহের পূজাপার্ব্বণে, আমার পারিবারিক সকল শুভ কর্ম্মে কেবলমাত্র আমি এবং আমার গৃহিণীর নিকটসম্পর্কীয়গণ নহে, কিন্তু নিকটস্থ সমস্ত গ্রামের, চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত পল্লীর অন্তরে উৎসব ঘনীভূত হইয়া আসিত, এবং সকলেরই মনে হইত, যেন তাহার নিজের বাড়ীর কাজ। এক্ষণে নবাগত সভ্যতা ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য রক্ষাচ্ছলে আত্মপরের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই দুরতিক্রমণীয় করিয়া তুলিতেছে—আমরা সকল অধিকার আইনের পাকা মাপকাঠির সাহায্যে নূতন করিয়া বুঝিতেছি ; সুতরাং হৃদয়ের কাঁচা সরস সম্বন্ধ অক্ষুন্ন রক্ষা করা অনেক স্থলেই অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিতেছে। ফলে, যে সকল উৎসবকলা হৃদয়ের তাপে এত দিন সজীব ও নবীন ছিল, হৃৎপিণ্ডের রক্তপ্রবাহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সেগুলি ক্রমশঃ মৃত্যুর মত হিমপাণ্ডু হইয়া আসিতেছে। এবং এই মৃত্যুহিম বিবর্ণতাটুকু ঢাকিবার জন্যই বাহিরের সাজসজ্জা ও সমারোহবাহুল্য অনিবার্য্য হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু মুখরাগলেপনে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের তপ্ত লাবণ্যসঞ্চারচেষ্টার মত উৎসব-শ্রীসম্পাদনে এই সমারোহাড়ম্বর সম্পূর্ণ নিষ্ফল। উৎসবের সহস্র চঞ্চল আলোকরশ্মি জনতার চিন্তাক্লিষ্ট ললাটে ও উৎসাহহীন ম্লান মুখে প্রতিফলিত হইয়া অবসাদের শীর্ণ মূর্ত্তিখানিই ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ করিয়া দেয়। পূর্ব্বে হৃদয়ের সম্বন্ধাধিকারে যখন আইনের এত চুলচেরা সূক্ষ্ম বিভাগ ছিল না, একের উৎসব তখন সহৃদয়তাগুণে দশের হইয়া উঠিত। উদ্যোগপর্ব্বের ভারও তখন পাঁচ জনের মধ্যে স্বেচ্ছায় বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত এবং উত্তরকাণ্ডেও সকলের সমবেত যত্ন চেষ্টা উৎসাহ আনন্দে উৎসবকলা সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইয়া উঠিত। নব্যতন্ত্রের নাগরিক অধিকার অনধিকার বিধি তখনও হয় নাই—সুতরাং আমার কাজে খাটিয়া দিতে পাঁচ জনের অনধিকার সঙ্কোচও বোধ হইত না এবং নিজের কাজের ভার পাঁচ জনের উপর চালাইয়া দিতে এ পক্ষেরও কোনরূপ দ্বিধা মনে আসিত না। কেহ আটচালা নির্ম্মাণকার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত হইত, কেহ দীপ জ্বালাইবার ব্যবস্থা করিত, কেহ কদলীপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিত, কেহ কটিবন্ধ দৃঢ়রূপে আঁটিয়া পরিবেশনে লাগিয়া যাইত, কেহ বা ক্রমাগত ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত, কেহ বসিয়া বসিয়া কেবল পরামর্শ সরবরাহ করিত, নিতান্ত কোন কাজ না পাইলে ডাকহাঁক ও মোড়লী করিয়া লোকে নিজের একটা কর্ম্ম গড়িয়াও লইত। এইরূপে নিশ্চেষ্ট ঔদাস্যভরে দেখিবার অবসর না পাওয়ায় এবং উৎসবসৌষ্ঠব সম্পাদনবিষয়ে কথঞ্চিৎ নিজ হস্ত উপলব্ধি করিয়া সকলেই আপনাকে ইহার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে অনুভব করিতে পারিত। এবং ইহা হইতেই একের উৎসব সাধারণের হইয়া সমধিক সরস ও সজীব হইয়া উঠিত, এবং বৃহৎ সমাজের সর্ব্বাঙ্গ একটি অখণ্ড সৌষ্ঠবলাভে সমধিক মনোজ্ঞ সৌন্দর্য্যে প্রতিভাত হইত।

এক্ষণকার উৎসবগুলি কিন্তু ক্রমশই যেন আপিসী ছাঁচে গঠিত হইয়া উঠিতেছে—তাহার মধ্যে দেনাপাওনা হিসাবপত্রের হাঙ্গাম যত অধিক, আনন্দ আর সে পরিমাণে নাই। পূর্ব্বে যে দেনাপাওনার সম্বন্ধ আদৌ ছিল না তাহা নহে, এবং হয় ত সূক্ষ্মরূপে বিচার করিয়া দেখিলে আর্থিক সম্বন্ধ তখনও এখনকার মত প্রবল ছিল, কিন্তু অন্যপ্রকার সম্বন্ধের আবরণে এই হিসাবী সম্বন্ধটা তখন কোথাও বড় প্রবল হইয়া আত্মপ্রকাশ করিবার অবসর পাইয়া উঠে নাই। ব্রাহ্মণ ফলাহারের পর দক্ষিণা না লইয়া বাড়ী ফিরিতেন না, কিন্তু দাতা-গৃহীতার মধ্যে এমন একটি মধুর সম্বন্ধবন্ধন ছিল যে, দক্ষিণার আর্থিকতা তাহার মধ্যে স্থান পাইত না। নাপিত ক্ষৌরকার্য্য সারিয়া যে রিক্তহস্তে গৃহে ফিরিত তাহা নহে, সে কালে বরঞ্চ পাওনাগণ্ডা এখনকার অপেক্ষা অনেক বেশীই ছিল, কিন্তু নাপিতের সহিত সম্বন্ধ এমনি, যেন সে বিনা অর্থেও ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদন করিয়া যাইত এবং উক্ত কার্য্য না করিলেও কর্ত্তা তাহাকে অর্থসাহায্য করিতেন। কুম্ভকার শুভ কার্য্যের দিনে গুটিকতক চিত্রিত নূতন

ভাণ্ড আনিয়া না দিলে যেন কর্ম্মই বন্ধ হইয়া থাকে, পয়সা দিয়া বাজার হইতে কিনিয়া আনিলে উৎসবের অঙ্গহানি হয়। সকলেরই সঙ্গে আমাদের এইরূপ একপ্রকার আত্মীয়তা-বন্ধন—এবং উৎসবাদিতে এই আত্মীয়তাটুকু যেন সম্যক্ স্ফূর্ত্তিলাভের অবসর পায়। সেই জন্যই মন্ত্রপাঠের ব্রাহ্মণ হইতে সুরু করিয়া কামার কুমার ধোপা নাপিত হাড়ি ডোম পর্য্যন্ত যে যেখানে আছে, সকলেরই নিজ নিজ মর্য্যাদানুসারে উৎসবাঙ্গে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে—কাহাকেও বাদ দিলে চলে না।

কিন্তু এখন ইংরাজী পণ্যশালার অনুগ্রহে যান্ত্রিক ভাবেই অনেক কার্য্য নিঃশব্দে সমাধা হইয়া উঠে। এই কলমের আঁচড়ে হ্যারিসন হ্যাথাবে, হোয়াইট্যাওয়ে লেড্‌ল, অস্‌লর, ল্যাজারাসের ভবন হইতে যাহা কিছু আবশ্যক—আনাইয়া লওয়া যায়, এমন কি, নাপিত পাচক পরিবেশকাদিও সংগ্রহ করিতে বিলম্ব হয় না। কিন্তু আমাদের পণ্যক্রিয়ার মধ্যে সজীব সহৃদয় মনুষ্যত্বের মধুর সংস্পর্শে যে একটি নিগূঢ় আনন্দ ছিল, ইহাতে সেটুকু দিতে পারে না স্বীকার করিতে হয়।—তখনকার দিনে বড়লোকের বাটীতে কোনও ক্রিয়া-কর্ম্মোপলক্ষ্যে মাসেক কাল পূর্ব্ব হইতে নানাবিধ পণ্যভার লইয়া দোকানী পসারীরা গতিবিধি সুরু করিত। শালওয়ালা ভাল ভাল কাশ্মীরী শাল ও রুমাল লইয়া আসিত, মুর্শিদাবাদ ও ঘাটাল অঞ্চলের বণিকেরা নানাবিধ গরদ তসর ও রেশমী বস্ত্র আমদানি করিত, ঢাকা শান্তিপুর ফরাসডাঙ্গা সিমলার বেপারীরা কত প্রকারের সূক্ষ্ম ও বিচিত্রপাড় কার্পাসবস্ত্র এবং পশ্চিমী ক্ষেত্রীরা বেণারসী ও চেলির জোড় লইয়া উপস্থিত হইত। এতদ্ভিন্ন, স্বর্ণকার কর্ম্মকার মালাকার ময়রা গোয়ালা পাথরওয়ালা কাংস্যপিত্তলবিক্রেতা নানান জনে নানাবিধ ফরমাসে নিত্য গতায়াত করিত। এমন কি, বেদানার বস্তা লইয়া বিদেশী কাবুলীওয়ালা পর্য্যন্ত বাদ যাইত না। কিন্তু এ গতিবিধি নিতান্তই বাহিরের লোকের মত ছিল না। এবং এই খরিদবিক্রয়টুকুর মধ্যেই তাহাদের সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হইয়া যাইত না। সকলেই উৎসাহসহকারে উৎসবের নানাবিধ অনুষ্ঠানবিষয়ে পাঁচটা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিত, মন্তব্য দিত, প্রশ্ন করিত, কোথায় কি হইবে না হইবে দেখিয়া শুনিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, কাজের দিনে বাড়ীর ছোট ছোট ছেলেপুলেগুলিকে লইয়া উৎসব দেখিতে আসিত, এবং পুরাতন কাবুলীওয়ালা তাহার সখের জরীর কোর্ত্তা গায়ে দিয়া প্রসন্নমুখে দ্বারদেশে আসিয়া প্রহরী হইয়া দাঁড়াইত। নিতান্ত জড় বিনিময় মাত্র না হইয়া আমরা তাহাদের পণ্যসামগ্রীর সহিত অন্তরের শুভ প্রীতিও অনেকখানি করিয়া লাভ করিতাম, এবং মুদ্রাখণ্ডের সহিত উৎসবের ভাগও কতক পরিমাণে দিতাম। এই যে অন্তরে অন্তরে "ফাউ" আদানপ্রদানটুকু, ইহাতেই আমাদের বিশেষ আনন্দ। এবং এইটুকুর জন্যই আমাদের মধ্যে আর্থিক সম্বন্ধে হীনতা সহজে দেখা যায় না।

কেবলি যে বাহিরে বাহিরে এইরূপ গতিবিধি ও আদানপ্রদান ছিল, তাহাও নহে। অন্তঃপুরে কুম্ভকারপত্নী নূতন বরণডালা সাজাইয়া আনিয়া দিত, মালিনী নিত্য নব নব ফুলভার যোগাইত এবং ফুলসজ্জার জন্য নূতন নূতন ফুলের গহনা প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিত, নাপিতানী দিদিঠাকুরাণী ও বধূঠাকুরাণীদিগের কোমল পদপল্লবে ঝামা ঘষিয়া আলতা পরাইয়া দিয়া যাইত, তাঁতিনী নূতন নূতন পাড়ের মনোহারিণী নীলাম্বরী ও বিচিত্রবর্ণের শাটিকা লইয়া আসিত, গোয়ালিনী মধ্যাহ্নভোজনান্তে, আর কিছু না হউক, গোয়ালপাড়ার দুইটা মন্তব্য শুনাইয়া যাইত, এবং পাড়ার বৃদ্ধা ব্রাহ্মণঠাকুরাণী স্বহস্তকর্ত্তিত কয়গাছি পৈতার সুতা আনিয়া দিয়া পা ছড়াইয়া গল্প করিতে বসিতেন। এই এতগুলি বর্ষীয়সী ও যুবতীসমাগম যে নিতান্ত যান্ত্রিকভাবে সাধিত হইত না, সে কথা বলাই বাহুল্য। হাস্যপরিহাস গল্পগুঞ্জন সমালোচনা বিধিব্যবস্থা নির্দ্ধারণ ও নানা অনাবশ্যক উপদেশ পরামর্শ ও বিচার প্রসঙ্গে বয়স ও অবস্থার তারতম্য ঘুচিয়া গিয়া সকলের মধ্যে সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ও সরস হইয়া উঠিত—দেনাপাওনার সম্বন্ধটুকু আদৌ প্রকাশ পাইত না। সকলেই যেন আত্মীয় পরিজন-বর্গের মধ্যে—যেন একটি বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারের নানা অঙ্গ।

এইরূপে আমাদের প্রত্যেকের কোন শুভানুষ্ঠানের মধ্যে অলক্ষিতে এই এতগুলি লোকের শুভকামনা কার্য্য করে। এবং ইহাতেই আমাদের সামান্য ক্রিয়াকর্ম্মও বৃহৎ উৎসবে পরিণত হয়। নব্যতন্ত্র রজতচক্রকে যেরূপ সকল সম্বন্ধের মধ্যবিন্দু করিয়া তুলিতে চাহে, তখন তাহা ছিল না। ধনের পদমর্য্যাদা যথেষ্ট থাকিলেও কুলের গৌরবকে প্রীতির সম্বন্ধকে সে লঙ্ঘন করিতে পারিত না। এমন কি, বেতনভুক্ সামান্য দাসদাসীদিগকেও সংসারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে দেখা হইত, এবং সুগৃহিণী ইহাদের কেহ ক্ষুধিত থাকিতে নিজের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন। এই যে হৃদ্যতাটুকু—এই যে ব্যথার ব্যথী ভাব—ইহা আর কিছুতেই থাকে না। পরিজনবর্গের সহিত পূর্ব্বের মত একসংসারভুক্ত অবশ্যপোষ্য সম্বন্ধ ঘুচিয়া গিয়া বিদেশী ইংরাজের দৃষ্টান্তে কেবলমাত্র কাজ আদায় ও বেতনদানের সম্বন্ধই দিনে দিনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতেছে। এমন কি, পাকা নব্যতন্ত্রিগণের নিকট সে কালের মাঠাকুরাণী দিদিঠাকুরাণী প্রভৃতি সম্বন্ধসূচক সম্বোধনগুলি পর্য্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে।

এই সকল সামান্য পরিবর্ত্তন হয় ত আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনা, এবং উৎসবপ্রসঙ্গে এ সকল তুচ্ছ বিষয়ের উত্থাপন না করিলেও চলিত, কিন্তু ইহাতে এইটুকু অন্ততঃ বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে যেখানে প্রীতিসূচক আত্মীয়তাই স্বাভাবিক ছিল, এক্ষণে সেখানে নিকট সম্বন্ধ স্থাপনই অনেক সময় অত্যন্ত অশোভন ও অসঙ্গত বলিয়া ঠেকে। আশ্রিত জন এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় হৃদয়ের আশ্রয় আর বড় পায় না, এবং আশ্রয়দাতাও তাঁহাদের

হৃদয়ের অধীশ্বরত্ব হইতে বঞ্চিত হয়েন। অন্তরে অন্তরে কাহারও সহিত কাহারও কোনরূপ অনিবার্য্য যোগ নাই।

আমাদের উৎসবে এই অন্তরেরই প্রথম প্রতিষ্ঠা। সমারোহসহকারে আমোদপ্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছুমাত্র চরিতার্থ হয় না, কিন্তু তাহার মধ্যে সর্ব্বজনের আন্তরিক প্রসন্নতা ও শুভ ইচ্ছাটুকু না থাকিলে নয়। উৎসবপ্রাঙ্গণ হইতে সামান্য ভিক্ষুকও যদি ম্লানমুখে ফিরিয়া যায়, শুভ উৎসব যেন একান্ত ক্ষুণ্ণ হয়। যাত্রা হউক, কথা হউক, রামায়ণগান হউক বা চণ্ডীপাঠ হউক, যখন যাহা হয়, উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে আসিয়া সর্ব্বসাধারণে তাহাতে অকাতরে যোগদান করে, এবং সকলের সহিত একত্র হইয়া গৃহকর্ত্তা তাহা উপভোগ করেন।

কেবলি যে বড় বড় পূজাপার্ব্বণে এই বিধি তাহা নহে, ছোটখাট বারব্রত যে-কোন অনুষ্ঠানেই এই শুভ ভাবটি রক্ষণীয়। এবং অনুষ্ঠানের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। আজ পূজা, কাল ব্রত, পরশ্ব গঙ্গাস্নানের যোগ, অন্য দিন কোনও শুভ তিথি বা বারমাহাত্ম্য, কখনও নবান্ন, কখনও পৌষপার্ব্বণ, কোন দিন বা অরন্ধন, জ্যৈষ্ঠে জামাতৃপূজন, কার্ত্তিকে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, মধ্যে রাখীবন্ধন, কোন মাসে পুত্রের বিবাহ, কোন দিন পৌত্রের জাতকর্ম্ম, তাহার পর জন্মতিথি, হাতে খড়ি, সাধ, সীমন্তোন্নয়ন, পঞ্চামৃত—যেন একটির পর একটি শুভ অনুষ্ঠান ও আনন্দ-প্রবাহের অন্ত নাই। প্রচলিত প্রবচনে বারো মাসে তের পার্ব্বণ মাত্র স্থান পাইয়াছে, কিন্তু গণনায় বোধ করি প্রতি মাসে ত্রয়োদশ সংখ্যা ছাড়াইয়া যায়। এবং কর্ম্মকার্য্যের সহিত জড়িত হইয়া সকলগুলিই আমাদের শুভকর্ম্ম। দান ধ্যান সদনুষ্ঠান ও দশ জনের সহিত আত্মীয়তা প্রকাশ ও সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করাই উদ্দেশ্য। একটা উপলক্ষ্য পাইলেই হয়।

এবং যাহাতে আমার নিজের কিছুমাত্র আনন্দ আছে, সেই আনন্দটুকু যখন দশ জনের মধ্যে বিতরণ করিতে চাহি, তখন উপলক্ষ্যের অভাব ঘটিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই, তাহা পাঁচ জনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। অনেক ছোটখাট বিষয়েও আমি হয় ত একটুকু আনন্দ পাই, নিজের বাড়ীখানি হইলে সুখী হই, পুষ্করিণীটি থাকিলে লাগে ভাল, গোরুগুলির কল্যাণ কামনা করি—গৃহপ্রবেশ, জলাশয়প্রতিষ্ঠা, গোষ্ঠাষ্টমী, এইরূপ এক একটি উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণপণ্ডিত আত্মীয় স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী পোষ্য পরিজন দীন দুঃখীকে আহ্বান করিয়া যথাসাধ্য সৎকারে আমার সুখের ভাগী করিতে চাহি। আমি যে আজ একজন গৃহহীনকে আশ্রয় দিতে পারি, তৃষ্ণার্ত্তের পিপাসা নিবারণ করিতে পারি, অবোলা জীবের কিছুমাত্র

সুখবিধান করিতে সক্ষম হই, আমার এ সৌভাগ্য অন্তর যেন সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিতে চাহে। সাবিত্রীব্রত, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাতৃষষ্ঠী উপলক্ষ্যে আপন প্রিয়জন ও স্নেহাস্পদগণকে যথাযোগ্য সৎকার করিয়া নিজেকে ধন্য মনে হয়, বিধাতা আমাকে যে এত সৌভাগ্যসুখ দিয়াছেন, ইহা সকলের সহিত বণ্টন করিয়া না লইলে ইহার সফলতা কোথায়? উৎসব ইহারই উপলক্ষ্য।

সেই জন্য আমাদের উৎসবে ভাবেরই প্রাধান্য—বাহিরের সমারোহ তাহার প্রধান অঙ্গ নহে। পতিব্রতা স্ত্রীর সামান্য হাতের লোহা ও মাথার সিন্দুর যেমন আমাদের মনে একটি অনির্ব্বচনীয় লক্ষ্মীশ্রী সূচিত করিয়া দেয়, নেত্রঝলসী অলঙ্কাররাজি তাহা পারে না, প্রীতিবিকশিত উৎসবের সামান্য মঙ্গলঘট ও চূতপল্লবগুচ্ছ সেইরূপ আমাদের অন্তরে একটি শিবসুন্দর ভাব সঞ্চারিত করিয়া তুলে, সহস্র তাড়িতালোক ও বিলাস-উৎসে সে শুভ কমনীয়তা সঞ্চার করিতে পারে না। বিলাসের মণিমুক্তা আমাদের বাহিরের ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক মাত্র, কিন্তু উৎসবের ধান্যদূর্ব্বামুষ্টি অন্তরের অকৃত্রিম শুভকামনার বাহ্য চিহ্ন। ইহার সহিত ধনীর রত্নভাণ্ডারেরও তুলনা সম্ভব নহে। ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীতের মত ইহার মধ্যে যেন কেমন একটি অক্ষুণ্ণ শুচিতা আছে—বাহ্যাড়ম্বরবাহুল্যের সহিত তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই। ['ভারতী,' অগ্রহায়ণ ১৩০৫]

গৃহকোণ

আমাদের পুরাতন প্রবচনে গৃহের বর্ণনা বড়ই সুন্দর এবং সরল। সংস্কৃত কবি দুইটি মাত্র চরণে আমাদের গৃহখানি একান্ত চিত্তহারী করিয়া তুলিয়াছেন—

"ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।"

সুতরাং গৃহপ্রবেশের পূর্ব্বেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার স্তবগানে মঙ্গলাচরণপূর্ব্বক কার্য্যারম্ভ করা শ্রেয়, যাহাতে শুভ কার্য্যে কোনরূপ বিঘ্ন না জন্মে বা অশুভ না উৎপন্ন হয়। সে কালের নারীচিত্তাবগাহী রসিক কবিজনেরা সেই জন্য এই গৃহলক্ষ্মীকে কখনও ভামিনী, কখনও চণ্ডী, কখনও মানিনী, কখনও বা অন্য কোনরূপ মনস্তুষ্টিকর প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্বোধনে প্রসন্ন না করিয়া লেখনী ধারণ করিতেন না। এবং আমরাও এই সকল প্রাচীন মহাজনগণের পন্থানুসরণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে সেই ভামিনী গৃহিণীর চরণবন্দনাপূর্ব্বক তাঁহার শুভ্র মন্দিরে প্রবেশ করি—হে ভামিনি, প্রসন্না হও, তোমার চরণাঙ্গুলিনখকিরণে যেন আমরা পথের সন্ধান করিয়া লইতে পারি, এবং সেই আলোকেই যেন তোমার মন্দিরের

চারু কারুসজ্জা আমাদের চক্ষে উজ্জ্বল বর্ণে প্রতিভাত হয়। আমরা তোমারই মন্দিরের যাত্রী। এবং হে সুনিপুণে, তুমিই আমাদের সাধনার পরম ধন।

এই গৃহবর্ণন বিষয়ে সংস্কৃত কবির সহিত আধুনিক আমাদের কিছুমাত্র মতভেদ নাই। আমাদের গৃহখানি একমাত্র গৃহিণীর অধিষ্ঠানেই পরিপূর্ণ—তিনিই আমাদের সমস্ত গৃহ জুড়িয়া আছেন। আর যাহা সেখানে আছে, তাহা অতি সামান্য—সংসারের নিত্যব্যবহার্য্য ঘটি বাটি থালা, শয্যা আসন, বসন ভূষণ, দেয়ালে আলিপনা, মেঝ্যাতে মাদুর, পিল্‌সুজে প্রদীপ, কুলুঙ্গিতে কড়ির সিন্দূরচুপড়ি, এক পার্শ্বে মকরশোভিত পালঙ্ক এবং অপর পার্শ্বে কাঁঠাল-কাঠের একটি পুরাতন সিন্ধুক। এবং এই সকলই কেবল এক গৃহিণীর অধিষ্ঠানেই শোভমান, যেমন দেবমন্দিরের সকল আয়োজন একমাত্র দেবতার অধিষ্ঠানেই সার্থক। গৃহিণী বিনা এই সকল সজ্জোপকরণ সম্পূর্ণ নিষ্ফল। এবং তাঁহার অধিষ্ঠানে এই জড় উপকরণগুলিও যেন সজীব ও ভাবময় হইয়া উঠে। এবং এই ভাবের উপরেই আমাদের গৃহপ্রতিষ্ঠা।

নহিলে আমাদের আসবাব আড়ম্বরবাহুল্য কোন কালেই বড় নাই। তখন দেশে এত আলোক ছিল না—তাড়িতালোক, গ্যাসালোক, এ সকল ত ছিলই না, এমন কি, কেরোসিনশিখারও প্রাদুর্ভাব হয় নাই—পুরাতন পিলসুজের সরু ডাঁটার উপরে মাটির প্রদীপমুখে ঈষৎ স্নেহসিক্ত শলিতাগ্রভাগে মিটি মিটি যে আলোটুকু জ্বলিত, তাহাতেই আমাদের গৃহকোণের অন্ধকার কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইত; এবং সেই বাতবিকম্পিত ক্ষীণালোকে দিদিমার মুখের আষাঢ়ে গল্পে, মায়ের ঘুমপাড়ানী গানে, ভাইবোনের নানাবিধ প্রশ্নোত্তরে, একান্তোপবিষ্ট ননদ ভাজের মৃদু হাস্যালাপে ক্ষুদ্র গৃহকোণটুকু এমনি জমিয়া উঠিত—সে জমাট বাহিরের কিছুতেই হয় না। নূতন সভ্যতা নব নব বৈজ্ঞানিক আলোকে আমাদের গৃহপ্রান্তরে এই অন্ধকারটুকু একান্ত বিদূরিত করিতে যেখানেই প্রয়াস পাইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের গৃহভিত্তি হইতে অনেকগুলি চিরন্তন স্মৃতি ও বিচিত্র বিস্মৃতি একেবারে মুছিয়া গিয়া একটা সাদা দেয়ালের কঙ্কাল বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। ক্ষীণ প্রদীপশিখাটুকুর বিকম্পনে আমরা যে মাতৃদৃষ্টির স্নেহালোক, তরুণী বধূর করুণ মুখের পৌর্ণমাসী সুধা, স্নেহপ্রীতিভক্তির সহস্রধারনিস্যন্দিত মৃদু রশ্মি-বিকিরণ অনুভব করি, সেটুকু ত বাহিরের এডিসন দিতে পারে না।—এবং এই বধূ ও মাতৃরূপিণী গৃহিণীর চারু চরণ-চ্ছটাতেই আমাদের গৃহ উজ্জ্বল। এমন কি, সেই আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া দরিদ্রের সামান্য ঘটি বাটি পিলসুজ কাজললতা সিন্দূরের কৌটাটি পর্য্যন্ত একটি নূতন শ্রী ধারণ করে, এবং আমাদের মর্ম্মস্থল অবধি তাহার প্রভা আসিয়া পড়ে।

বাস্তবিকই, বাহিরের দর্শকের চক্ষে ইহা যতই সামান্য হউক, ঘরকন্নার এই নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীগুলির আমাদের নিকট একটু বিশেষ আদর আছে। এই সকল অতি-

তুচ্ছ ছোটখাট মৃৎ-কাংস্য-পিত্তল-বংশ-তৃণ-কাষ্ঠবিনির্ম্মিত সামগ্রীগুলি আমাদের গৃহিণীগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সহিত সহস্র অদৃশ্য সূত্রে যেন চিরগ্রথিত। ইহাদের প্রত্যেক ব্যবহারে কখনও তাঁহাদের বাহুবিক্ষেপ, কখনও চরণভঙ্গ, কখনও কঙ্কণের কিঙ্কিণী, কখনও বা সর্ব্বাঙ্গে লঘু বেপথু যেন নানা ছন্দে হিল্লোলিত ও মুখরিত হইয়া উঠে। এবং সেই সঙ্গে কোথাও পুকুরপাড়, কোথাও বাঁধা ঘাট, কোথাও সরিষাক্ষেতের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথরেখা, কোথাও তকৃতকে নিকান প্রাঙ্গণ, কোথাও দীপালোকিত বাতায়নপথ, চিত্রের পর চিত্র- সঞ্চারে মনে যেন ক্ষুদ্র বঙ্গভূমি তাহার সমস্ত শোভা ও সৌন্দর্য্য লইয়া একান্ত ঘনাইয়া আসে।

এই পুকুরপাড়ে ঘাটের ধাপে আম্রকুঞ্জ ও বাঁশঝাড়ের ছায়ায় আমাদের চিরহাস্য গ্রাম্য বধূর নিত্য রঙ্গভূমি। প্রতি দিন প্রভাতে ঐখানে ঘাটের চাতালটিতে বসিয়া তিনি রাশীকৃত তৈজসপত্র মার্জ্জন ঘর্ষণ ও পরিষ্করণে নিযুক্ত থাকেন। কত রকমের থালী, কত রকমের বাটি, কত বিচিত্র গঠনের ঘটি,—কাঞ্চননগরী, গয়েশ্বরী, জগন্নাথী, বলেশ্বরী, খাগড়াই, পশ্চিমী, দক্ষিণী, কত গঠন এবং কারুকার্য্য, কত আকার এবং প্রকার, কত কলানৈপুণ্য ও সূক্ষ্ম কৌশল। অতি পুরাতন কাল হইতে দিদিমা কি ঠাকুরমা যখন যে তীর্থে গিয়াছেন, সেখান হইতে নানাবিধ জিনিসপত্র সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন—কোশাকুশি, ঘণ্টা পঞ্চপ্রদীপ, ধূপাধার, ধুনাচি, বহুবিধ মনোহর ভাণ্ড, পানের বাটা, গামলা, হাঁড়ি, হাতা, বেড়ী, গণনায় সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না। এবং গৃহের বধূকে প্রতি দিন এইগুলি মাজিয়া ঘষিয়া তকৃতকে করিয়া রাখিতে হয়—নহিলে, লক্ষ্মী চঞ্চলা হয়েন। তাহার পর কলসীকক্ষে নিত্য দুই বেলা জল সহিতে যাওয়া এবং হাস্যপরিহাসগল্পগুঞ্জনসুখমুগ্ধচিত্তে সরিষা ও অরহরক্ষেতের মধ্য দিয়া আঁকাবাঁকা পথে আর্দ্রবস্ত্রে মন্থরগমনে গৃহে ফিরিয়া আসা। ঐ কলসীর জলোচ্ছ্বাসছলছলে সেই পুকুরঘাটের যত কাহিনী যেন স্বপ্নবিম্ববৎ ফুটিয়া উঠে। এবং ঐ সুমার্জ্জিত তৈজসপ্রভায় বধূর মুখে যেন কত দিনের শ্বশুর শ্বশ্রূ ননন্দা ঠাকুরমার স্নেহাশীর্ব্বাদপ্রভা প্রতিভাসিত হয়।

কিন্তু কেবল এক তৈজসমাত্রই আমাদের সম্বল নহে, এবং পুকুরপাড়েই আমার বৈঠক নহে। ধনীই হউক, দরিদ্রই হউক, আমাদের সকলেরই এক একটি থাকিবার স্থান আছে। এবং ক্ষুদ্র হইলেও সে গৃহে অতিথিকে আশ্রয় দিবার সঙ্কুলান হয়। সে জন্য কোনপ্রকার অতিরিক্ত আসবাববাহুল্যের প্রয়োজন হয় না। ঘরের দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া দিলেই অতিথিকে আসন পরিগ্রহ করিতে বলা যায়। গৃহীর অবস্থাভেদে সে মাদুর মোটা কাঠির, কখনও বা রেসমবস্ত্রবৎ কোমল মেদিনীপুরী মছলন্দ, কখনও বা দন্তিদন্তারুণাভ মণিপুরী শীতলপাটি। এই মাদুর আমাদের অভ্যর্থনাগৃহের প্রধান আসবাব। গ্রীষ্মপ্রধান

দেশে এমন আরামের আসন অল্পই আছে। এবং মাদুরের পাড়ে বিচিত্র রঙ্গীন কারুকার্য্যে অনেক সময় গৃহের ঔজ্জ্বল্যও বিশেষ বর্দ্ধিত হয়। শীতাকাশতলে পুরু খাপি পারস্য গালিচার যে শোভা, বৈশাখী দিনে এই ঈষৎ শ্যামাভ সূক্ষ্ম মছলন্দ-শয্যার শোভা তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। এবং এই চারু আস্তরণোপরি মধ্যে মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত গুটিকয়েক উপাধান এবং এক একখানি শুভ্র তালবৃন্ত হইলেই মোটামুটি আমাদের গৃহশয্যা একরূপ সম্পূর্ণ হয়। তাহার পর সঙ্গতি অনুসারে এই শুভ্র স্নিগ্ধ ভাবটি রক্ষা করিয়া আরও অনেক করা যায়। এমন কি, এত দূরও যাওয়া যায় যে, তাহাতে কার্পণ্য অপবাদের কোনরূপ সম্ভাবনাই থাকে না। কেবল সকল খুঁটিনাটির প্রতি একটুকু নিজের চিত্ত এবং চিন্তা প্রয়োগ করিতে হয়।

কারণ, ল্যাজরেস কোম্পানীর প্রতি অনেকগুলি রজতচক্র সহ একটি সংক্ষিপ্ত হুকুম জারী করিয়া এ ক্ষেত্রে কার্য্য উদ্ধারের সুবিধা নাই। দেশের সূর্য্যালোকের সহিত, চতুষ্পার্শ্বের ঘনায়মান প্রকৃতির সহিত আমাদের অন্তরের যুগযুগান্তরাগত শুভ ভাবের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া আমাদের চিরন্তন সজ্জাকলাটিকেই আধুনিক কালোপযোগী করিয়া অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতে হইবে। বিসদৃশ বিলাতী ফেসানের কতকগুলা আবর্জ্জনা যথেচ্ছা সংগ্রহ করিয়া একটা অশোভন পণ্যশালা সাজাইয়া বসিয়া, তাহাকেই একখণ্ড দেশী গালিচার জোরে আমাদের অভ্যর্থনাগৃহ আখ্যা দেওয়া চলিবে না। আসল কথা, আমরা ভুলিয়া না যাই যে, ইংরাজ দোকানের বিলাতী আসবাবগুলি নিতান্তই আমাদের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত করা হয় নাই। যে দেশে দক্ষিণা বাতাসের জন্য সারা ক্ষণ দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে হয় না এবং রুদ্ধ সাসীর মধ্যে ধূলিপ্রবেশের সুবিধা নাই, সে দেশে যে সকল আসবাব গৃহের শ্রী এবং শোভা সম্পাদনে নিয়োজিত হয়, আমাদের মুক্তবাতায়ন ধূলিবহুল প্রাচ্য গৃহে সে সকল গৃহসজ্জা সম্যক্ সুশোভন না হইতেও পারে। বিশেষতঃ ইংরাজের মত টেবিল চেয়ার কৌচ কার্পেটের পশ্চাতে অহরহ লাগিয়া থাকা আমাদের পোষায় না। এবং সেরূপভাবে একান্ত লাগিয়া থাকিতে না পারিলেও এ সকল জিনিস অত্যল্প ধূলিসঞ্চয়েই দেখিতে দেখিতে খেলো হইয়া আসে। আমাদের আধুনিক ইংরাজের অনুকরণ ড্রয়িংরুমগুলিই ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

সকল দেশেই সাহিত্যই কি, শিল্পই কি, বসনভূষণই কি, গৃহসজ্জাই কি, সংক্ষেপে সভ্যতা তাহার নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লইয়া দেশের মর্ম্মস্থল হইতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। তাহার শিকড় থাকে দেশের মাটিতে এবং সমস্ত জাতির হৃদয় হইতে রসাকর্ষণ করিয়া শাখাপল্লবে ক্রমশঃ তাহা গগন ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়। প্রাচীন ভারতে সভ্যতার কোনও আস্‌বাবেরই অভাব ছিল না—এখনও সহস্র মন্দিরভিত্তিতে, ভগ্ন স্তূপে, প্রাচীন কীর্ত্তির

ধ্বংসাবশেষসমূহে সুখাসন পাদপীঠ প্রভৃতি নানাবিধ আধুনিক কালোচিত গৃহসজ্জোপকরণ দেখা যায়; কিন্তু সেই সকলগুলির মূল ছিল দেশের মধ্যে। ধনী এবং দরিদ্রের গৃহসজ্জার পার্থক্য যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তাহার মধ্যে একটা সুগভীর ঐক্যও ছিল। এক্ষণকার ড্রয়িংরুমগুলির মত একেবারে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র বিজাতীয় কোন কিছু আমাদের মধ্যে কখনও উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসে নাই। এবং সেই জন্য সময় সময় মনের এক কোণে একটু আশারও সঞ্চার হয় যে, হয় ত বা এই বিজাতীয় সজ্জাসরঞ্জাম-সংঘর্ষে আমাদের নির্ব্বাপিতপ্রায় সজ্জাকলা সহসা একদিন পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিতেও পারে। সে দিন সমস্ত দেশের সহিত একটি অখণ্ড যোগসূত্রে আমাদের আতিথ্যও সম্ভ্রম ও গৌরবের হইবে। নহিলে, সান্ধ্য সমিতির নিমন্ত্রণই করি আর ইংরাজের মত ধুমধামই করি, তাহার ভিতরকার প্রচ্ছন্ন প্রহসন হইতে নিষ্কৃতি নাই।

আমাদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ, আমাদের গৃহসজ্জা ও আদর অভ্যর্থনা ত বিলাতী সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হইলেই সার্থক হয় না। তাহার মধ্যে বরঞ্চ যতটুকুতে আমাদের অন্তঃপুরের একটুকু ছাপ পড়ে, সেইটুকুই শোভন ও মনোহর হইয়া উঠে। যে গৃহসজ্জার পারিপাট্যে গৃহিণীর শুচিতা প্রকাশ পায়, যে ব্যঞ্জনরন্ধনে তাঁহার কোনরূপ প্রযত্ন বা উপদেশ থাকে, যে তাম্বূলরচনায় তাঁহার শুভ অঙ্গুলিস্পর্শ মধু সঞ্চার করে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা চিত্তহারী এবং তাহাতেই আমাদের সার্থকতা। আমাদের মনে এই সকল বাহিরের জিনিসের মধ্য দিয়া সেই যুবতিপরিবৃত তাম্বূলরচনাশালা, সেই নিরন্তরগল্পগুঞ্জনহাস্য-পরিহাসধ্বনিত পাকগৃহ, সম্মার্জ্জনীসংক্ষুব্ধ গৃহপরিষ্করণশব্দ, উৎসাহ-আনন্দ-গতিবিধি-উদ্যমসজীব উদ্যোগপর্ব্ব কেমন যেন সহজ অবলীলাভরে নানা চিত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই সকল চিত্রপরম্পরা আমাদের ক্ষুদ্র গৃহকোণটিকে চিরউজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিকতার মধ্যে নেপথ্য হইতেও গৃহিণীর শুচি স্মিত প্রসন্ন সংযত কল্যাণী মূর্ত্তিটুকু প্রকাশ পায়। এবং গৃহের সাজসজ্জা আস্‌বাব উপকরণের সহিত তাঁহার মহিমা নিরন্তর জড়িত। তিনি স্বহস্তে প্রদীপের শলিতা উস্‌কাইয়া না দিলে যেন দীপশিখা তেমন জ্বলে না, এবং তাঁহার ঈষৎ স্ফুরদধরপল্লবনিঃসৃত মৃদু ফুৎকার ব্যতীত তাহার নিভিয়াও শান্তি হয় না। বাতায়নপার্শ্বে শুভ্র শয্যা-আস্তরণখানি বিছাইয়া সযত্নরচিত কবরীবন্ধে বেলফুলের মালাগাছি পরিয়া কঙ্কণকিণাঙ্কিতপ্রকোষ্ঠ বামকরতলে চিবুকটি রাখিয়া তিনি যখন নিথর রজনীতে দূরপ্রবাসাগত প্রিয়জনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়া বসিয়া থাকেন, এই ক্ষীণ দীপশিখাই তাঁহার একমাত্র নিভৃত সঙ্গী। আর গৃহের চৌকাঠের বাহিরে বহুযত্নমার্জ্জিত জলপরিপূর্ণ ভৃঙ্গারোপরি সযত্নরক্ষিত একখানি নির্ম্মল নির্ম্মঞ্ছনী সেই প্রবাসাগতকে স্বাগতসম্ভাষণ জানাইতে স্থাপিত হয়। এবং সেই কম্পিত দীপশিখা তরুণীর

মুখ হইতে পালঙ্কের শয্যাবিস্তারে এবং তথা হইতে চৌকাঠপারের ভৃঙ্গারগাত্রে ছায়ায় আলোকে ক্ষণে ক্ষণে প্রতিভাসিত হইতে থাকে।

এই সকল ভাবপ্রসঙ্গ আমাদের গৃহকোণের সর্ব্বত্র এবং গৃহের সকল জিনিসপত্র যেন আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। কেবলই যে শয়নকক্ষের দীপটি, পালঙ্কটি, মাহুরটি, কুলুঙ্গিস্থ পাত্রটি এই প্রতীক্ষা ও মিলনাশায় সঞ্জীবিত হইয়া মনোহর, তাহা নহে, শয়ন উপবেশন প্রসাধন দেবপূজা—নানা সূত্রে আমাদের বহুতর সামগ্রী যেন জড়জগৎ হইতে ভাবরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছে। প্রসাধনের আসনখানি, চুলের দড়িগাছি, কাজললতাখানি, সিন্দূরের কৌটা, দর্পণ, তৈলপাত্র, সরু চিরুনী, টিপের মোড়ক, এমন কি, প্রসঙ্গক্রমে আলুলায়িত অঞ্চলপ্রান্তনিবদ্ধ চাবির গুচ্ছটি পর্য্যন্ত যেন আমাদের অঙ্গনাগণের নানাবিধ গ্রীবাভঙ্গী ও কুতূহলী দৃষ্টিসঞ্চারে সঞ্জীবিত, এবং তাহার মধ্যে নারীহৃদয়ের যেন একটি আভাসপ্রসঙ্গও সূচিত হইতে থাকে। পূজার ঘরের পুষ্প চন্দন নৈবেদ্যপাত্র ও কুশাসনের সহিত শুচিস্নাতা সুসংযতবেশা গৃহিণীর ভক্তিভরে অবনত চারু মূর্ত্তিখানি দেবপ্রসাদপ্রসঙ্গে গৃহখানিকে অন্তরে যেন সম্যক্ প্রতিষ্ঠা দেয়। এই সকলেরই মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি অনিবার্য্য প্রাসঙ্গিকতা একান্ত গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। কোথাও কোনরূপ নিরর্থকতা নাই বা পুতুলের খেলাঘরের ভাব মনে উদয় হয় না।

সেই জন্য এই বাহুল্যবিবর্জ্জিত সরল সুন্দর গৃহপ্রাঙ্গণ হইতে আসিয়া প্রথম যখন অগণ্য কৌচক্যাবিনেট্‌কণ্টকিত আধুনিক কোনও নব্যতন্ত্রীর ভবনে প্রবেশ করা যায়, অনেক ক্ষণ ধরিয়া কিছুই যেন ভালরূপ ঠাহর হয় না—এমন কি, বলিতে সাহস হয় না, অনেক সময় সেই অভ্যর্থনাকক্ষের অধিষ্ঠাত্রী গৃহিণীকে দেখিয়া স্থির করিয়া উঠা যায় না যে, তিনি আমাদেরই একজন ভ্রমপ্রমাদসুখদুঃখমোহময়ী মানবী—না, বিলাতী সাহেবের অদৃশ্য তারবিলম্বিত কোনরূপ আশ্চর্য্য কলের পুতুল। কারণ, অনভ্যস্ত চক্ষে তাঁহাদের গতিবিধি, তাঁহাদের গুরু গাম্ভীর্য্য ও লঘু হাস্যবিকিরণ, তাঁহাদের আতিথ্য ও অভ্যর্থনা, সকলই কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় যান্ত্রিক বলিয়া ঠেকে। এবং খানিক ক্ষণ সেই চুরোটিকাধূমকুণ্ডলিত আবহাওয়ার মধ্যে থাকিতে থাকিতে নিজেকেও যেন রঙ্গালয়ের অভিনেতা বলিয়া ভ্রম জন্মে। এবং সে অভিনয়ও বড় সহজ নহে, সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয় যে, কখন্ কোন্ ভঙ্গীটি বেদস্তুর হইয়া পড়ে। কারণ, এ ভঙ্গীকলার মধ্যে কোনরূপ যুগযুগান্তরাগত ভাবপ্রবাহ নাই, যাহাতে আমাদিগকে অবলীলাভরে পরিচালিত করে—আছে কেবল কতক পরিমাণে নেপথ্যের তারওয়ালা সাহেবের অদৃশ্য হস্ত এবং আর কতক পরিমাণে শিথিল-প্রকৃতি কয়েকটি দেশী পুত্তলিকার হস্ত পদ ও রসনা সঞ্চালন।

কিন্তু তরুণী ভামিনীগণ আক্ষেপোক্তিতে দোষ গ্রহণ করিবেন না, তাঁহাদের প্রতি কোনরূপ প্রচ্ছন্ন কটাক্ষ আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা যে স্রোতের মধ্যে পড়িয়াছি, তাহাতে দেশকালের সর্ব্ববন্ধনচ্যুত হইয়া একটা উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়হীনতার অকূলে গিয়া উপনীত হইবার সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। এই একটানার মধ্যে তাঁহারাই যথাস্থানে নোঙ্গর ফেলিয়া আমাদিগকে কূলের নিকটে টানিয়া রাখিতে পারেন। এবং বন্যার প্রথম প্রকোপ শান্ত হইয়া আসিলে আবার আমরা শুভ ক্ষণে নিজগৃহে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারি—দেয়ালে দেয়ালে কম্পিত দীপশিখায় যেখানে মরা বর ও সুয়ো রাণী দুয়ো রাণী নিত্য সুখে কালযাপন করেন, যেখানে ঠাকুরমার মুখের রামসীতার দুঃখকাহিনী ও কুরুপাণ্ডবের বৃহৎ কথা প্রতি দিন গৃহের নববধূ ও তাঁহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবর ও ননন্দাগণের অন্তরোচ্ছ্বসিত অশ্রু অভিষেকে পরিবারের অন্তরে অক্ষয় অম্লান গৌরবে মুদ্রিত হইয়া রহে, এবং নিত্য নব শুভ আনন্দোৎসবে কঙ্কণে বলয়ে হেমহারে মেখলায় নূপুরে গুর্জ্জরীতে কনককিঙ্কিণীশিঞ্জিতে শুভ্র হর্ম্ম্যতল স্পন্দিত ও মুখরিত হইয়া উঠে। আমরা সেই গৃহকোণমুখী প্রবাসী—শুধু এই সুসজ্জিত খেলাঘরমধ্যে পুত্তলবৎ নৃত্যসুখ হইতে মুক্তি কামনা করি। হে গৃহিণি, তুমিই তাহার প্রধান সহায় হও। এবং তোমারই চারুচরণনখমণিপ্রভায় আমাদের পুরাতন গৃহকোণ নূতন সৌন্দর্য্যে ও শোভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। ['ভারতী,' মাঘ ১৩০৫]

নিমন্ত্রণ-সভা

ধনীই হই বা দরিদ্রই হই, আমাদের নিমন্ত্রণশালার সজ্জায়োজন বড় অধিক নহে। কদলীপত্র ও মৃৎপাত্র হইলেই আমাদের বৃহৎ যজ্ঞ অনায়াসে সমাধা হয়, এবং ইহার উপরে যদি এক একখানি কুশাসন জুটে, তাহা হইলে যজ্ঞশালাসজ্জার কোন অঙ্গই অসম্পূর্ণ থাকে না। তাহার পর অভ্যাগত নিমন্ত্রিতগণকে সমাদরপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া আনিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে আসন পরিগ্রহ করিতে বলা যায়, এবং গৃহকর্ত্তা প্রসন্ন স্মিতমুখে পাতে পাতে অন্নব্যঞ্জন পরিবেশন সুরু করিয়া দেন। ধনীর ভবনে দুই ভাগ ব্যঞ্জন অধিক হয়, এবং হয় ত দুই দশ জন লোকও বেশী হইতে পারে ; তদ্ভিন্ন আসনে বাসনে পরিবেশনে বা ভোজনশালার অন্যান্য আয়োজনে ধনী দরিদ্রের কোনরূপ পার্থক্য চক্ষে পড়ে না। আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপার যেরূপ বিপুল, তাহাতে সজ্জাড়ম্বরের কিছুমাত্র বাহুল্য থাকিলে ধনিগণেরই নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া আসিত, দরিদ্র জনের দুর্দ্দশার ত কথাই ছিল না।

কারণ, ইংরাজের মত দশ কুড়িটি অতিঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও পরম বন্ধু লইয়া আমাদের কারবার নহে ; আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মে সামাজিক অনুষ্ঠানে নিকটস্থ দুই দশ পল্লী, পাঁচ সাত

গ্রাম, দূরতম আত্মীয়ের দূরসম্পর্কীয় বৈবাহিককুল এবং বন্ধুর বন্ধুজনকেও নিমন্ত্রণ করা হইয়া থাকে, এবং সকলের প্রতি নির্ব্বিশেষে যথোচিত আতিথ্য প্রয়োগপূর্ব্বক গৃহস্থকে আত্মরক্ষা করিতে হয়। যেখানে বিশ পঁচিশ জন মাত্র বন্ধুসমাগম, সেখানে মঞ্চসজ্জা ও নানান খুঁটিনাটি অলঙ্করণের প্রতি দৃষ্টি রাখা সহজ, কিন্তু কথায় কথায় যাহাদের শতাধিক লোক জমিয়া যায় এবং দফায় দফায় যাহাদের প্রাঙ্গণ নিকাইয়া আসন বিছাইতে হয়, তাহাদের পক্ষে এরূপ খুঁটিনাটি পরিপাটি রক্ষার ব্যবস্থা কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং বাহিরের এ সকল আড়ম্বর খর্ব্ব করিয়া অন্য উপায়ে তাহাদিগকে লোকের পরিতোষ সাধনে চেষ্টা পাইতে হয়। হৃদ্যতা ও আত্মীয়তাই তাহার একমাত্র প্রশস্ত পথ।

সেই জন্য আমাদের নিমন্ত্রণে গৃহকর্ত্তার স্থান ঠিক পাশ্চাত্য গৃহকর্ত্তার অনুরূপ নহে। সে দেশে নিমন্ত্রণমজলিসে গৃহকর্ত্তা একরূপ সভাপতিস্থানীয় বলিলেই হয়—ভোজনমঞ্চের শীর্ষস্থানে বসিয়া তিনি সকলকে যথোপযুক্তরূপে মর্য্যাদা বণ্টন করিয়া দেন এবং অতিথিরা তাঁহার প্রসাদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়েন। কিন্তু আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে ইহার ঠিক বিপরীত ব্যবস্থা। গৃহকর্ত্তা ধনে মানে কুলে শীলে যত বড় লোকই হউন না কেন, দীনতম অতিথির নিকটেও তিনি সশঙ্কিত। এবং সকলকে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করাইয়া সকলের সর্ব্বপ্রকার ফরমাস যোগাইয়া, তবে তিনি দুই এক গ্রাস অন্ন মুখে গুঁজিবার অবসর পান। অতিথির এখানে সর্ব্বপ্রকার জুলুম করিবার অধিকার আছে এবং প্রতাপও বড় অল্প নহে। আহারে যোগদান করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া অতিথি গৃহস্থকে পলকের মধ্যে অপদস্থ করিতে পারেন, তখন হাতে পায়ে ধরিয়া গৃহস্থকে তাঁহার ক্রোধশান্তি করিতে হয়। কোন কারণে কেহ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে না আসিলে গৃহস্বামী অত্যন্ত ব্যথিত হয়েন এবং মর্ম্মে মরিয়া থাকেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যেখানে নিমন্ত্রণ পাইয়া লোকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পথ পায় না, আমাদের দেশে সেখানে নিমন্ত্রণ করিয়া গৃহস্বামীই যেন ধন্য হয়েন।

এইরূপে আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে গৃহস্থের বড় একটি মনোহর বিনয় প্রকাশ পায়। এবং তাহাতেই তিনি সর্ব্বজনের সহায়তা ও সহানুভূতি লাভ করেন। আমাদের অভ্যাগতগণের ক্ষমতা ও অধিকার এক দিকে যেরূপ অপরিসীম, সেইরূপ অন্য দিকেও বলা যায় যে, নিতান্তই পরের মত খাড়া না থাকিয়া তাঁহারা গৃহস্থকে সর্ব্বপ্রকার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তাও করিয়া থাকেন। গৃহস্থও যেন তাঁহাদেরই মধ্যে একজন, মধ্যে কোনরূপ দুরধিগম্য ব্যবধান নাই। তাঁহার কর্ম্মটি যাহাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় এবং কোন বিষয়ে কোনরূপ ত্রুটি থাকিয়া না যায়, তাহা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। এবং সেই জন্য নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে যিনি যেরূপ ঘনিষ্ঠ ও যাঁহার যেরূপ শোভা পায়, তদনুসারে কেহ কটি

বাঁধিয়া পরিবেশনে লাগেন, কেহ সারি সারি আসন বিছাইয়া যান, কেহ আহারান্তে তাম্বুল বিতরণ করেন, কেহ কাহাকেও তামাক সাজিয়া রাখিতে বলেন, এবং যাঁহারা পংক্তিতে বসিয়াছেন, তাঁহারও মধ্যে মধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী জনের পাতে লুচি অথবা সন্দেশের অভাব দেখিলে তাহা পূরণ করিবার জন্য যথোচিত ডাকহাঁক ও হুকুমহাকাম পরিচালনা দ্বারা আসর সরগরম করিয়া তুলেন; সকলেই যেন পরস্পরের আতিথ্যবিষয়ে সর্ব্বদাই উন্মুখ এবং সকলেরই যেন নিজের ঘরবাড়ী।

এই হৃদ্যতা ও পরস্পরাত্মীয় ভাবেই আমাদের এত বড় বড় নিমন্ত্রণসভাগুলি জমাট হয়। ইহার মধ্যে বড় একটি পরিতোষ ও সদ্ভাব নিহিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য ভোজনশালার সর্ব্বাঙ্গীন পারিপাট্য আমাদের নাই বটে, এবং কোলাহল কলরবটাও আমাদের কিঞ্চিদধিক—এমন কি, বিদেশীর নিকট তাহা কতকটা বর্ব্বরতারও পরিচায়ক ঠেকিতে পারে—কিন্তু সর্ব্বজনের আন্তরিক প্রীতিগুণে ইহার একটি বড় শুভ প্রভাব অনুভব হয়। পাশ্চাত্য নিমন্ত্রণে যে পরিমাণ আমোদমাত্রোপভোগ, ইহাতে আমোদ ততখানি আছে কি না সন্দেহ; কারণ, আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপার নিতান্ত আমোদ নহে, তাহা কাজ, এবং কাজ সুসম্পন্ন হওয়ার উপরেই তাহার আনন্দ। এই কারণে তাহার আনন্দও ঢের বেশী ব্যাপক এবং উচ্চ স্তর হইতে নিম্ন ভূমি অবধি তাহা প্রবাহিত। পাশ্চাত্য নিমন্ত্রণগুলি ইহার তুলনায় অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। একজন ধনী ব্যক্তি সেখানে অসম্ভব ব্যয়ে দেশদেশান্তরের দুইটি দুর্লভ ফল বা উপাদেয় মদিরা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দুই দশ জন ধনী বন্ধুর রসনাতৃপ্তি করিয়া সন্তোষ অথবা গর্ব্ব অনুভব করেন মাত্র। আমাদের নিমন্ত্রণের মত সর্ব্বজনের পরিতোষ সাধন তাহার লক্ষ্যই নহে।

অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, ঘরের কাছেই দুএকটি ছোটখাট উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে। সকলেই জানেন, আমাদের নিমন্ত্রণাদিতে প্রভুর আহারের পর ভৃত্যদেরও আহারাদির যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আমি যেখানে নিমন্ত্রণে যাই, সেখানে আমার পাল্কীবেহারা বা গাড়োয়ানের খোরাকীর জন্য কখনই ভাবিতে হয় না। কারণ, তাহারা ক্ষুধিত থাকিলে গৃহস্থের আতিথ্য ক্ষুণ্ণ হয়। বরঞ্চ অভ্যাগত জনের দাসবর্গ নিমন্ত্রণভবনে যেরূপ আদর যত্ন ও আতিথ্য লাভ করে, তাহা আমাদের আজকালকার বিবেচনায় কিছু অতিরিক্ত। তাহাদেরও যেন গৃহস্থের উপরে দাবী আছে, সেখানে তাহারা উপদ্রব করিতে পারে। এই গেল আমাদের দেশী ব্যবস্থা। ইহার অনতিদূরেই চৌরঙ্গীর ময়দানের সম্মুখে ইংরাজের নিমন্ত্রণভবনের দৃশ্য দেখা যায়। রুদ্ধ সাসীর মধ্যে তাড়িতালোকে যতক্ষণ নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রভুর রসনাতৃপ্তি করিতেছে এবং আমোদপ্রবাহ ডিশের উপর ডিশ ছাপাইয়া পড়িতেছে, বেচারা গাড়োয়ান ততক্ষণ দুই সহিস সহ নিরাশহৃদয়ে

শীতরজনীর হিম ভোগ করে মাত্র, এবং পার্টিশেষে প্রভুকে লইয়া যথাসময়ে জুড়ী হাঁকাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। প্রভুর সুখদুঃখ বেদনা আনন্দ উৎসব সমারোহের সহিত, কেবল মাত্র সজ্জার হিসাবে ভিন্ন, ভৃত্যের সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই। চাপ্‌কান আঁটিয়া ও তক্‌মা পরিয়াই তাহাদের যাহা কিছু সুখ—হৃদ্যতার গণ্ডির মধ্যে তাহারা স্থান পায় না।

এই কারণে ইংরাজের নিমন্ত্রণকলা আমাদের নিকট নিতান্ত নীরস দস্তররক্ষা বলিয়া বোধ হয়। তাহা বন্ধ্য আমোদ মাত্র, সহৃদয় শুভ কর্ম্ম নহে। আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে গৃহস্থের কত প্রযত্ন ও উদ্যম, কত উদ্বেগ ও পরিশ্রম, কত সংযম ও হৃদ্যতা। বাহিরের জাঁকজমকে ইহার সফলতা নহে। প্রত্যেক ছোটখাট অনুষ্ঠানে প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে গৃহস্থের অন্তরের যেন একটি ছাপ পড়া চাহি—নহিলে তাহার মর্ম্মস্থলের বেদনাটুকু ব্যক্ত হয় না, এবং সমুদয় ব্যর্থ হইয়া যায়। তকৃতকে নিকান প্রাঙ্গণে শ্রেণীবদ্ধ শুভ্র কুশাসন এবং সম্মুখে এক একখানি শ্যামল কদলীপত্র ও নূতন মৃৎপাত্রের সারি; গৃহকর্ত্তা পাড়া-প্রতিবেশী পাঁচ জন মুরুব্বি ও বন্ধুজনের সহিত মিলিয়া পরিবেশন করিতেছেন, এবং সমবেত অভ্যাগতেরা পরিতোষব্যঞ্জক বিবিধ ধ্বনি সহকারে গ্রাসের পর গ্রাসে ভোজ্যাবলীর যথোচিত মর্য্যাদারক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অন্তঃপুরে রন্ধনশালা; প্রাঙ্গণের রোয়াকের উপরে রন্ধনশালার কপাটের ফাঁকের মধ্য হইতে অন্তঃপুরিকাজনের কুতূহলী কুবলয়দৃষ্টি সযত্নপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন ও নানাবিধ অভিনব মিষ্টান্নাদিতে একটি মনোহারিণী প্রীতি সঞ্চারিত করিয়া দেয়, এবং পরিতৃপ্তচিত্ত অতিথি জনের প্রশংসাকুশল পরিতোষবাক্যে তাঁহাদের সর্ব্বান্তঃকরণ ভরিয়া উঠে ও শ্রম সার্থক হয়। এই সুমধুর হৃদ্যতা ও নিরতিশয় পরিতোষ, এক দিকে আন্তরিক প্রীতিপ্রযত্ন ও অন্য দিকে সর্ব্বাঙ্গীন শুভকামনা, গৃহস্থের সংযত নিষ্ঠা ও নিমন্ত্রিত জনের অক্ষুণ্ণ সদ্ভাব, ইহাতেই নিমন্ত্রণ-সভার মনোহারিতা। এখানে পাত পাতিয়া বসিয়া খাইতেও সুখ এবং দৃঢ়রূপে কটি বাঁধিয়া পরিবেশন করিতেও আনন্দ।

কারণ, এই নিমন্ত্রণব্যাপারে কোনরূপ বিজাতীয় ভাড়াটিয়া ভাব নাই। ইহার কুট্‌না কোটা হইতে সুরু করিয়া হাঁড়ি নামান এবং আসন বিছান হইতে পরিবেশন পর্য্যন্ত, এমন কি, আহারান্তে তাম্বূলসেবনবিধি অবধি সকল কর্ম্মে সকল অনুষ্ঠানে অন্তঃপুরের একটি শ্রীহস্ত ও শুভ দৃষ্টি নিবদ্ধ রহিয়াছে। এবং নিজগৃহে যেমন মাতা স্ত্রী কন্যা ও আত্মীয়া জনের যত্নে আহারের ব্যবস্থাটি পরিপাটি হয়, নিমন্ত্রণভবনেও সেইরূপ আহারের ব্যবস্থায় বন্ধু জনের শুচিস্নাত অন্তঃপুরের একটি ঐকান্তিক প্রযত্ন প্রকাশ পায়, যাহাতে ব্যঞ্জনের স্বাদ শতগুণ বর্দ্ধিত করে এবং অন্তরে বেশ একটি নিরাবিল আনন্দ সঞ্চারিত করিয়া দেয়। সেই জন্য সামান্য দধি চিপিটকেও গৃহস্থের আতিথ্যগুণে যে পরিতোষ জন্মে, তাহার তুলনায় ভারত-খ্যিদিত পেলিটি এবং উইল্‌সনের বিপুলায়োজনও ব্যর্থ হইয়া যায়।

কিন্তু ইংরাজের উইল্‌সন পেলেটি—এবং সস্তা স্থলে মঙ্গলু খানসামা—ক্রমশঃ আমাদের ভবনেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে দেখা যায়। নব্যতন্ত্রীরা বলেন, টাকা ফেলিয়া দিলেই যেখানে হাঙ্গাম চুকে, সেখানে অনর্থক গৃহিণীকে পাকশালায় পাঠান কেন? নিমন্ত্রণের মধ্যে যে একটি পবিত্র নিষ্ঠার ভাব আবহমান কাল আমাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে, এবং যাহার উপরে আমাদের নিমন্ত্রণসভার প্রতিষ্ঠা, সে সকল প্রীতিভাব বিস্মৃত হইয়া আমরা ইহাকেও আপিসী কাজের সামিল করিয়া লইয়াছি, এবং ঠিকা লোক দিয়াই হউক বা যে উপায়ে হউক, কাজ সারিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেই পরম চরিতার্থতা লাভ করি। সেই জন্য এই সকল নিমন্ত্রণে কোনরূপ আনন্দ বা পরিতোষ নাই—উদরতৃপ্তিও হয় বটে, রসনা-তৃপ্তিও যথেষ্ট হয়, কিন্তু সমস্ত আড়ম্বর লইয়াও ইহা মনের কোণে কিছু মাত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না। এমন কি, বলিতে সঙ্কোচ হয়, আমাদের গৃহিণীরা আসিয়া এই ভোজনশালা উজ্জ্বল করিয়া বসিলেও ইহার মধ্য হইতে সেই মনোজ্ঞ শুভ পরিতৃপ্তিটুকু পাওয়া যায় না।

বরঞ্চ, গৃহিণীও এখানে নিষ্প্রভ প্রতিভাত হয়েন। অন্ততঃ আমাদের গৃহে নিত্য তাঁহার যে লক্ষ্মীশ্রী, কল্যাণী মূর্ত্তি, সকল কাজে কর্ম্মে গতিবিধিতে স্নেহে যত্নে ভাবে ভঙ্গীতে উছলিয়া পড়ে, সেটুকু এখানে প্রকাশ পায় না। তাঁহারা যদি রাগ না করেন, তাহা হইলে সাহস করিয়া বলি, তাঁহাদের সমস্ত গতিভঙ্গী বেশবিন্যাশ রকম-সকম এখানে কেমন যেন ছাঁচে ঢালা হইয়া আসে—তাহার মধ্যেই যেন কি একটি সন্ত্রস্ত সচেতনতা আমাদিগকে সারা ক্ষণ বিদ্ধ করিতে থাকে। সে অন্নদা অন্নপূর্ণাকে এখানে কিছু মাত্র অনুভব করা যায় না। শুধু যেন আমাদিগকে ইংরাজের টেবিলের আদবকায়দা অভ্যাস করাইবার জন্য কয়টি কলের পুত্তলী বলিয়া ভ্রম জন্মে।

কারণ, এখানে খানসামাহস্তপরিবেশিত অন্নে তাঁহার শুভ হস্ত স্পর্শ মাত্র করে নাই, এবং কোন দ্রব্যে তাঁহার অন্তরের শুভাকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয় নাই। আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে অন্ততঃ মিষ্টান্নেও তাঁহাদের রচনাকলার পরিচয় পাওয়া যাইত। তাম্বূলরচনা ত অন্তঃপুরিকাগণের বাঁধা কাজ বলিলেই হয়। এবং শসার চাটনি, আদার কুচির সহিত কালো জীরা ও নেবুর রস দিয়া চাটনিবৎ একটা কিছু, দধির লুড়কি, ক্ষীরকমলা কিম্বা অভিনব দু একটা কিছুতে না কিছুতে তাঁহাদের সিদ্ধ হস্ত প্রকাশ পাইতই। সে কালে, এমন কি, এক একটি জিনিসে এক এক বাড়ীর বিশেষ একটু প্রতিপত্তিও থাকিয়া যাইত। কোনও বাড়ীর পান সাজা, কোনও বাড়ীর মিষ্টান্ন, কোনও ঘরের কাসন্দী, কোনও গৃহের নবান্ন, কাহারও বাড়ীর আমানি, কাহারও বাড়ীর রন্ধন। এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্মে নিপুণাগণের বিশেষ সমাদরও ছিল। বহু দূর হইতে পাল্কীভাড়া দিয়া সাধনা

করিয়া লোকে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইত। এবং লোকের বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্মে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া তাঁহাদের পরিতোষও যথেষ্ট হইত।

নব্যতন্ত্রিণীরা ইহা পছন্দ করিবেন কি না জানি না, কিন্তু ইহার মধ্যে বড় একটি শ্রী ছিল, এবং নারীজন্মের যেন বিশেষ একটু সফলতা ছিল। এবং সত্য কথা বলিতে কি, অধুনাতন পার্টিতে রমণীর যে স্থান, তদপেক্ষা ইহাতে তাঁহাদের মর্য্যাদাও ছিল। কারণ, তাঁহারা আমাদের সর্ব্ব শুভ কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী কল্যাণীরূপে বিরাজ করিতেন। এক্ষণকার মত সখের পার্টিতে তাঁহারা নিতান্তই পুরুষের ক্রীড়াপুত্তলী মাত্র ছিলেন না। এবং তাঁহাদের সম্মানও অন্যরূপ ছিল। তরুণেরা সেখানে শ্রদ্ধাভরে নত হইয়া রহিত, এবং বৃদ্ধেরা আশীর্ব্বচনে তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনা করিতেন। রুমালকুড়ান ডিগ্রী-পাওয়া সুলভ গ্যালাণ্ট্রী তখনও এদেশে আমদানি হয় নাই, এবং স্ত্রীসম্মানবিষয়ে এত বড় বড় বিলাতী ফাঁপা কথাও আসিয়া জুটে নাই।

অন্ততঃ সহরের বড় বড় বিলাতফেরতী পার্টিগুলি দেখিয়া আমাদের অজ্ঞানান্ধ চিত্তে এইরূপই ধারণা জন্মে। কয়েকটি বাঁধি গতে সাধনা করিয়া কোনও মহিলাকে পিয়ানোতে বসাইয়া দেওয়া হয় এবং অপর কাহাকেও বার বার অনুরোধ করিয়া সঙ্গীতে লাগাইয়া দেওয়া হয়। এবং সঙ্গীতও সুরু হয়, গল্পও জমিতে থাকে, অল্পক্ষণ মধ্যেই সেই নিমন্ত্রণশালা সহস্র কণ্ঠের যুগপৎ গুঞ্জনে ভ্রমরের চাকের মত মুখরিত হইয়া উঠে। যেমন পিয়ানো থামে, এক পসলা করতালিবর্ষণ হইয়া যায়, এবং অপেক্ষাকৃত সাহসী ড্রয়িংরুমবীরেরা চিরাভ্যস্ত সনাতন কম্‌প্লিমেণ্টমুখে পিয়ানোর একটু নিকটে ঘেঁষিয়া আসেন। এবং যথাসময়ে একটু তফাতে সরিয়া দাঁড়াইয়া ইয়ার বন্ধুজন সহ, সমাগত মহিলাবৃন্দ সম্বন্ধে, আমাদের দেশের কল্পনাতীত অশোভন ইঙ্গবঙ্গ ভাষায় নির্লজ্জভাবে সমালোচনা সুরু করিয়া দেন।

এই করতালি ও কম্‌প্লিমেণ্টে সৌভাগ্য অনুভব করেন, এরূপ লঘুচিত্ত তরুণী যদি কেহ থাকেন জানি না, কিন্তু আমাদের কুলকন্যাগণের এত দূর অবনতি ত কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। মাতৃ-অনুক্রমে তাঁহারা সমস্ত দেশের হৃদয় হইতে যে ভাষাহীন সম্ভ্রম লাভ করিয়া আসিতেছেন, তাহার সহিত কি এই ড্রয়িংরুমরঙ্গমঞ্চের দীর্ঘচ্ছন্দ বক্তৃতাগত সম্মানের তুলনা হয়? আমাদের দেশে রমণী গৃহলক্ষ্মীরূপে সকলের হৃদয় হরণ করেন। সে সম্ভ্রম, সে প্রতিষ্ঠা আন্তরিক, তাহা চায়ের পেয়ালার উপর কথার ফুৎকারে বুদ্বুদের মত ভাসিয়া উঠে না। যেখানে গৃহ আছে, সেইখানেই গৃহিণীর আদর; যেখানে যে ক্রিয়াকর্ম্ম হয়, গৃহিণীরা না মিলিলে তাহা সুসম্পন্ন হয় না, সুতরাং তাঁহার মর্য্যাদা আমাদের নিকট স্বাভাবিক। তাঁহার একটি বিশেষ কাজ আছে—এবং কর্ম্মানুযায়ী পদও আছে—তাহা

নিতান্ত অনুগ্রহের দান নহে। সেই জন্য কাজ করিয়া তাঁহাদের পরিতোষ, এবং তাঁহাদের প্রসাদে আমাদেরও আনন্দ।

গৃহস্থালীর যে সৌন্দর্য্য, তাহা গৃহী ব্যক্তিই বিশেষরূপে উপলব্ধি করেন। এবং আমাদের নিমন্ত্রণসভা এই গৃহস্থালীরই উৎসব বলিয়া আমাদের এত হৃদয়গ্রাহী। যে গৃহিণী নিত্য নানা প্রকারে স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন পোষ্য পরিজনবর্গের সর্ব্বপ্রকার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিয়া সংসারের কল্যাণসাধন করিতে থাকেন, এই নিমন্ত্রণব্যাপারে তাঁহার মহিমা যেন সমস্ত সমাজে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। এবং সমস্ত লোকের পরিতোষজনিত শুভ কামনা তাঁহার অভিমুখে উত্থিত হইয়া শুভ কর্ম্মে তাঁহাকে অধিকতর উৎসাহিত করে। এবং সারা বৎসর ধরিয়া কখনও কাসন্দী প্রস্তুতে, কখনও চাল কোটায়, কখনও বড়ি দেওয়ায়, এইরূপ নানাবিধ খুঁটিনাটি ছোটখাট আয়োজনে যেন এই বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা চলিতে থাকে।

এই সকল আয়োজনের মধ্যেও বিশেষ একটু শ্রীছাঁদ আছে। স্নানাহ্নিক হইতে সুরু করিয়া নানাবিধ অনুষ্ঠানপূর্ব্বক এই সকল আয়োজন করিতে হয়। ইহার আদ্যোপান্ত একটি শুচি শুভ ভাব বিদ্যমান। বৈশাখ মাসে কাসন্দীর দিন। দুই দিন পূর্ব্ব হইতে বধূরা আসিয়া ঢেঁকিশালের মেঝ্যা ও সম্মুখের দাওয়াটি বেশ করিয়া নিকাইয়া দিয়া যায়, এবং সায়াহ্নে গোয়ালঘরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিতে আসিয়া গৃহিণী ঢেঁকিশালায়ও ধূপধুনার গন্ধ ছড়াইয়া যান। শুভ দিনে গ্রামের তরুণীরা মিলিয়া পুকুরঘাট হইতে ধামা ধামা সরিষা ও হলুদ ধুইয়া আনেন এবং রৌদ্রে শুকাইয়া শুচিবাসে তৎসহ ঢেঁকিশালে প্রবেশ করেন। সেখানে তেল থাকে, সিন্দূর থাকে, একটি কাঁচা আম ও একটি কচি লেবু থাকে ; ঢেঁকিকে বরণ করিয়া হুলুধ্বনিপূর্ব্বক প্রথম পাড় দেওয়া হয়। এবং তরুণী এয়োগণের অলক্তকরঞ্জিত চারু চরণতাড়নে ছন্দে ছন্দে তালে তালে ঢেঁকি সরিষা কুটিতে থাকে। পানাপুকুরপাড়ে চিতার বেড়াঘেরা আম্রকুঞ্জবনমধ্য হইতে বউ-কথা-কও থাকিয়া থাকিয়া ডাকিয়া উঠে, এবং পল্লীগ্রামের ঝাঁঝাঁ মধ্যাহ্ন যেন নিঃশব্দে সেই কাসন্দীর ঝালের মধ্যে তাপ সঞ্চার করে। এমনি, কাসন্দীর পর কুলচূর, কুলচূরের পর বড়ি, কুমড়া কোটা, ডাল কোটা, সরুচুকলি ও পিঠার সময় চাল কোটা, ধান ভানা, এক ঢেঁকিশালেই কত অনুষ্ঠান। এবং ঢেঁকিশালের বাহিরেও অনুষ্ঠান কম নহে। সে জন্য কুরুণী আছে, বঁটি আছে, ছাঁকনি আছে, অজ্ঞাতনাম আরও অনেক প্রকারের সরঞ্জাম আছে ; এবং সেই সঙ্গে বিচিত্র আসন করচালন গ্রীবাভঙ্গী ও গৃহলক্ষ্মীগণের একান্ত অভিনিবেশ সংযুক্ত হইয়া সমস্তটিকে চিত্তহারী করিয়া তুলিয়াছে।

এবং আমাদের গৃহিণীগণের এই সকল আচার অনুষ্ঠানও যেমন বিচিত্র, নিমন্ত্রণের মধ্যেও সেইরূপ বৈচিত্র্য আছে। ইংরাজের যেমন চা আছে, ডিনার আছে, প্রাতরাশ আছে, এবং বিবাহ ও পর্ব্বাদির বিশেষ বিশেষ ভোজ আছে, আমাদেরও সেইরূপ ভাতের

নিমন্ত্রণ, জলপানের নিমন্ত্রণ, ফলাহারের নিমন্ত্রণ, পূজার নিমন্ত্রণ, শুভ কর্ম্মের নিমন্ত্রণ, অরন্ধন, নবান্ন, শ্রীপঞ্চমী, পিঠাপার্ব্বণ ইত্যাদি বিচিত্র প্রকারের নিমন্ত্রণ আছে এবং তাহাতে আহারাদির ব্যবস্থারও যথেষ্ট বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। এখানে তাহার তালিকা দিবার প্রয়োজন নাই—মোটামুটি সকলেরই এ সকল জানা কথা। এতদ্ভিন্ন, আমের সময় ব্রাহ্মণ কাঙ্গাল দীন দুঃখীকে আম সন্দেশ না খাওয়াইয়া সুগৃহিণী আম্র মুখে তুলেন না। বৈশাখ মাসে অতিথিদের জন্য ডাব বাতাসার ব্যবস্থা। এবং ইহার উপর বার ব্রত উপলক্ষ্যেরও অভাব নাই। সবশুদ্ধ অতিথিপরায়ণতা প্রাচ্য জাতির একটি বিশেষ ভাব। এবং নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে সামাজিকতায় এই আতিথ্যধর্ম্মের একটি বিশেষ স্ফূর্ত্তি অনুভব হয়। আমাদের সকল ব্যাপারেরই অন্তরে অন্তরে যে একটি সাত্ত্বিক শুভ ভাব প্রবাহিত, তাহাতেই আমাদের অন্তরের সমুদয় আকর্ষণ।

এবং এই শুভ সংকল্পটুকু ক্রমশঃ আমাদের অন্তঃপুর হইতেও যে তিরোহিত হইতেছে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখের বিষয়। আমোদ আহ্লাদের মধ্যে আমাদের একটি শুভ ভাব থাকা চাহি—নহিলে, তাহা যথেষ্ট হৃদয়গ্রাহী হয় না। দান করিয়া, খাওয়াইয়া, সেবা করিয়া পাঁচ জনকে সুখী করিয়া সুখ। অন্তঃপুরেও যদি অতিথিবিমুখতা আসে, সেখানেও যদি তামসিকতা মাত্র মনোহর হইয়া উঠে, ক্রিয়াকর্ম্মে কেবল বাহিরের আড়ম্বর ও বাজে জাঁকজমকের প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে এ দরিদ্র দেশের দুর্গতির আর শেষ কোথায়? জাঁকজমকে আড়ম্বরে ত পরিতোষ কোথাও নাই, এবং অগাধ অর্থব্যয়ে এক ব্যক্তি যাহা করে, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অন্য জনের পক্ষে তাহা আদর্শ হইতে পারে না। সেই জন্যই আমাদের চিরদিন কলাপাতা ও মাটির খুরি ব্যবস্থা। এদিকে বাজে ধুমধামে অনর্থক বিপুল অর্থ ব্যয় না করিয়া, সেই অর্থে আমরা দশ জনকে আহ্বান করিয়া পরিতোষপূর্ব্বক খাওয়াইয়া তৃপ্তি লাভ করি। আমাদের সরঞ্জাম অল্প, লোক অনেক। যত লোকের সহিত মিলিয়া আমরা আনন্দ উপভোগ করি, ততই আমাদের আনন্দ অধিক হয়। হে গৃহিণি, তোমার তকতকে গৃহপ্রাঙ্গণে পুরাতন দিনের মত আমাদিগকে আবার আহ্বান কর এবং তুমি স্বহস্তে পাতে পাতে অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন কর। তোমার ভাণ্ডার অক্ষয় হউক, তোমার কীর্ত্তি অবিনশ্বর হউক। ['ভারতী,' ফাল্গুন ১৩০৫]

রবি বর্ম্মা

(অসমাপ্ত)

পাঁচ বৎসর পুর্ব্বে সাধনার পৃষ্ঠায় রবি বর্ম্মার সহিত আমাদের যখন প্রথম পরিচয় সাধিত হয়, তখন কলিকাতার বাজারে তাঁহার চিত্রাবলীর আমদানি হয় নাই; এবং বোম্বাই-প্রবাসী ভিন্ন সাধারণ বঙ্গবাসীর নিকট তাঁহার নাম পর্য্যন্তও অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং সে সময়ে নামতঃ তাঁহার সহিত পরিচয় সাধন হইলেও কার্য্যতঃ তাঁহার গুণ গ্রহণ করিবার অবসর আমাদের সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে জুটে নাই, এবং সাধনার সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদের কল্পনা বোধ করি, তদানীন্তন আর্ট ষ্টুডিয়োকে লঙ্ঘন করিয়া অধিক দূর অগ্রসর হইবারও অবসর পায় নাই। এক্ষণে এই কয় বৎসরের মধ্যে রবি বর্ম্মার চিত্রাবলীতে দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এমন কি, সুদূর পল্লীগ্রামের মেটে ঘরের দেয়ালেও দাক্ষিণাত্যের রূপসীগণ এলো চুলে কুঞ্চিত কুন্তলে স্মিতহাস্যে মালানিবদ্ধ কবরীবেষ্টনে গোলাপী ও বাসন্তী রঙের শাটিকা ও বিচিত্ররঞ্জিত চোলিকায় মনোহারিণী মূর্ত্তিতে শোভা পাইয়া থাকেন।

কিন্তু তাই বলিয়া এখনও সুক্ষ্ম বিচারের সময় আসে নাই। টেক্‌নিকের ওস্তাদি প্রথম হইতেই আশা করা যায় না—এবং শিল্পকলার এ সকল খুঁটিনাটি দোষগুণ আমাদের মত অনিপুণ দর্শকের চক্ষে সহসা ধরাও দেয় না। রবি বর্ম্মার কোন কোন চিত্রে অবশ্য এমন ত্রুটিও আছে, যাহা স্বল্পজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টিপথেও নিপতিত হয়—কিন্তু ভাবের প্রাবল্যে এ সকল দোষ কতকটা যেন ঢাকা পড়িয়া যায়, অন্ততঃ আমাদের এতৎপ্রতি কোনরূপ অতিমাত্র ঝোঁক দিতে ইচ্ছা হয় না এবং সম্প্রতি তাহার তাদৃশ আবশ্যকতাও দেখা যায় না। আমাদের সুন্দরীদের যে একটি মনোহর শ্রী তাঁহার তুলিকাস্পর্শে বিকশিত হইয়া উঠে, তাহার মধ্যে যে মুখের ভাব, যে অপাঙ্গের দৃষ্টি, যে দাঁড়াইবার ভঙ্গী, যে বাহুবিক্ষেপ, যে অলঙ্কারমণ্ডন, সকলই সম্পূর্ণ দেশী এবং আমরা প্রতি দিন যাহা দেখি, তাহারই মধ্যকার সৌন্দর্য্যটুকু দিয়া উদ্ভাসিত।

রবি বর্ম্মার রূপসীরা আমাদের ঘরের লোক। কেশবিন্যাসে, অঙ্গরাগলেপনে, প্রসাধনে, পথে ঘাটে গৃহে নানাবিধ নিত্যকর্ম্মে ইঁহাদের সহিত আমাদের নিয়ত দেখাশুনা। কখনও পরিহাসপরায়ণা, কখনও অশ্রুপরিপ্লুতা, কখনও শুশ্রূষারতা, কখনও উৎসবপ্রমত্তা, কোথাও বিরহবিধুরা, নীলাম্বরীসম্বৃতা অভিসারিকা, কোথাও কান্তসমাগতা লীলাময়ী মনোহারিণী; কোনখানে একান্ত তরুণী নববধূ, কোনখানে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মী। এত রূপে এত ভাবে যেখানে পরিচয়, সেখানে যে একটি আরাম এবং সান্ত্বনা, প্রীতি এবং

আত্মীয়তা অনুভব করা যায়, তাহা ত আর বাহিরে আশা করা যায় না। বাহিরে যেখানে রূপ নেত্র মাত্র ঝলসিয়া দেয় কিম্বা বড় জোরে মনের মধ্যে একটা ঝাপটা দিয়া যায়, এখানে সে স্থলে একটি কল্যাণী শ্রী সমস্ত হৃদয় মন যেন আচ্ছন্ন করিয়া তুলে। এবং হৃদয়ে হৃদয়ে যে বেদনার তড়িৎসঞ্চার স্ফুরিত হইতে থাকে, তাহাতে সকল অসম্পূর্ণতা ঘুচিয়া যায়।

রবি বর্ম্মার চিত্রকলার মূল উৎস আমাদের হৃদয়ে। হয় পৌরাণিক বিষয়—রাধাকৃষ্ণ, নলদময়ন্তী, শকুন্তলা, সুভদ্রার্জ্জুন, তপোভঙ্গ; নয় আধুনিক দাক্ষিণাত্যের গোপবালা, তম্বঙ্গী, ব্রাহ্মণ-বিধবা, শুচিস্নাতা পূজায়োজনরতা; সে কালে এ কালে আমাদের অন্তরের সহিত সকলগুলিরই একটি নিরবচ্ছিন্নতা আছে। কিন্তু রবি বর্ম্মার সে কালের চিত্রগুলি যে সকল স্থলেই যথার্থ পৌরাণিক, তাহা বলা যায় না—বরঞ্চ আধুনিকেরই সেখানে কিছু প্রভাব দৃষ্ট হয়। বিরহিণী যেখানে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া একান্তমনে ধ্যান করিতেছেন, সেখানে তাঁহার পার্শ্বের আলিসাটি হয় ত নিতান্তই আধুনিক স্থাপত্যানুযায়ী ইতালীয় কলসসজ্জিত। সে কাল তাহাতে সহসা মনে আসে না। তবে দাক্ষিণাত্যের রূপসীদের বেশভূষা, তাঁহাদের শাটী ও চেলী, মালা ও কবরী, মুসলমান-প্রভাববর্জ্জিত ভাব ও ভঙ্গীতে সে কাল নাকি অনেক পরিমাণে রহিয়া গিয়াছে। সেই জন্য চতুষ্পার্শ্বের আধুনিকতা কতক ঢাকিয়া যায়, এবং তাহাতেই সাধারণ দর্শকের চক্ষে রবি বর্ম্মার এ সকল ত্রুটি বড় সহজে ধরা দেয় না।

আসল কথা, রূপসীগণই এখানে যেন ত্রুটিগুলি সারিয়া লয়েন। তাঁহাদের আঁখিকোণপ্রান্ত হইতে যেন পুরাতন উজ্জয়িনীর সমস্ত কুবলয়নেত্র অতীতের গবাক্ষপথমধ্য দিয়া বর্ত্তমানের প্রতি কুতূহলী দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে। যেমন আজিকার এই বাসন্তী চন্দ্রালোকে সেই পুরাতন মধু মাসের তাবৎ চন্দ্রিকা নিশার সুখদুঃখ জাগিয়া উঠে, আজিকার রাখাল বালকের বংশীধ্বনিতে রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেই পুরাতন বৃন্দাবনের রাখালবালকগণের স্ফুরদধরনিঃসৃত ফুৎকারটুকু সঞ্জীবিত হইয়া রহে, রবি বর্ম্মার রূপসীগণের মুখে সেইরূপ নির্ব্বাপিত অতীন্দ্রিয় রূপলাবণ্যের একটি করুণ মোহাবেশ যেন একান্ত সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছে। সেখানে সে কাল এ কালের মধ্যে কোনরূপ ব্যবধান চক্ষে পড়ে না। অথবা কর্ম্মক্লিষ্ট এ কালের মাঝে সে কালের শান্তিটুকুই সমধিক উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়।
['প্রদীপ,' আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৬]

লাহোরের বর্ণনা

(অসমাপ্ত)

পঞ্জাবের আতপ্ত আকাশপটে লাহোর সহরটি যেন আরব্যোপন্যাসের প্রাচীন খলিফাদিগের একটি অতি পুরাতন পরিত্যক্ত রাজধানী। হারুন্-অল্-রসিদ্-শাসিত বোগ্দাদের সে নিত্যোৎসবময় পুরাতন সমারোহ এখানে এখন দুর্লভ—রাজপথে ছদ্মবেশে খলিফারাও ভ্রমণ করেন না এবং নিত্য নিশীথে নূতন নূতন উপন্যাসসুলভ ঘটনাও সংঘটিত হয় না—কিন্তু তথাপি ইহার গম্বুজে মিনারে, তোরণে প্রাচীরে, গৃহদ্বারে অলিন্দে, বাটীর সম্মুখের বিচিত্র খোদিত গোল বারান্দায়, বাতায়নে গবাক্ষে, ইহার আঁকা বাঁকা অপ্রশস্ত রাজপথ ও অসংখ্য গলিপথে এবং এই সকল পথের বিচিত্রবেশী জনতায় ও হয় গজ উষ্ট্র গো গর্দ্দভ মেষ মহিষ এক্কারথরণিত গতিবিধিতে সেই খালিফী বোগ্দাদের কাহিনী মনে পড়ে, এবং নিরন্তর উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালে ও অবাধ প্রচুর সূর্য্যকিরণে মনে যেন আরব্যমরীচিকার ছায়া ঘনাইয়া আসে।

পঞ্জাবে বসন্তসমাগম মহাসমারোহের ব্যাপার। বসন্ত সেখানে বরবেশে মহোল্লাসে পুষ্পকরথে চড়িয়া আগমন করে। বেগবান্ পবন তাহার বাহন, সূর্য্য তাহার রথচক্র, এবং রৌদ্রোজ্জ্বল বসনপ্রান্তে শুভ্রবিকশিত নাস্পাতির ফুল এবং তাহার রেণুপাটল দোধূয়মান উত্তরচ্ছদে নেবুমঞ্জরীর সৌরভ।

স্বচ্ছ আকাশ, দীপ্ত সূর্য্যালোক, মৃদু উত্তাপ, আলস ভাব, ধূলারঙের মেষ ও বৃহৎকায় ছাগপাল, মহিষ ও গোরুর পাল, আরোহী সহ উটের দল, স্ত্রীলোক বোঝাই গোরুর গাড়ী, স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদ ইজার ঘাগরা অঙ্গরাখা ওড়না, ঘুড়ি উড়াইবার উৎসাহ, আঁকাবাঁকা গলি, উটের গাড়ী, এক্কা, গুড়গুড়ি হাতে রাখাল, রাস্তার ধারে চরকা কাটার ধুম, গলির ভিতরে কোমরে কাপড় জড়াইয়া মধ্যাহ্নে মেয়েদের সুতাকাটা, পথের ধারে পাঠশালা, মেঠায়ের দোকান, কড়া প্রসাদ, রাত্রে ফকিরের গান, ভারবাহী গাধা, পথে নাপিত কামাইতেছে, গেরুয়াবসন সাধু, পথের ধারে ছাতের নীচে ইঁদারা, ঘোড়ার পিঠে স্ত্রী পুরুষ আরোহী, মেয়েদের ঘটিহাতে স্নানান্তে ফুল ফেলা ও মন্দিরে গতিবিধি, পথে বিবাহের বরযাত্রা, অশ্বারোহী বর ও বাদ্যভাণ্ড। পঞ্জাবী ভোজ, দস্তরের উপর, থালার উপরে বাটি বসানো, রুটি পোলাও দধি। ['প্রদীপ,' আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৬]

শিবসুন্দর

আমাদের মনে সৌন্দর্য্যের সহিত সর্ব্বত্রই একটি বিশেষ শুভ ভাব বিজড়িত। সুন্দরীর রূপবর্ণনায় এই জন্য আমরা কথায় কথায় লক্ষ্মীর সহিত তাঁহার উপমা দিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহার কল্যাণী মূর্ত্তিখানিই আমাদের অন্তরে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, রূপের দাহিকা শক্তি নিতান্ত প্রবল না হয়। লক্ষ্মী আমাদের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী—তাঁহার চরণের অরুণরাগস্পর্শে আমাদের গৃহের অন্ধকার বিদূরিত হয়, তাঁহার সকরুণ শুভদৃষ্টিতে আমাদের মনের সমস্ত তমঃ পলকে কাটিয়া যায়—যেমন রূপ তেমনি গুণ ; এবং রূপ এখানে গুণের সহিত নিত্য সম্বদ্ধ। সুতরাং এই লক্ষ্মীরূপিণী সুন্দরীর শুভ প্রভাব আমাদের জীবনে নিতান্ত সামান্য নহে। তাঁহার সকলই শুভ এবং এই শুভ ভাবেই তিনি আমাদের হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

আমাদের এই শুভ ভাবনাটুকু বাহিরের দৃষ্টিতে সহসা ধরা না পড়িতে পারে ; কারণ, বাহিরে হয় ত সৌন্দর্য্যের একটা হিল্লোল স্পন্দন মাত্র অনুভব হয়, কিন্তু যাহাদের সহিত অন্তরের সম্বন্ধ, তাহারা সেই শুভটুকুই যেন অধিক করিয়া দেখে, ইহাই বিশেষরূপে উপলব্ধি করে। সুন্দরীর চারু চরণতল ধরা স্পর্শ করে কি না করে—তাহার প্রত্যেক পদবিক্ষেপে যেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর শুভ পাদপাতস্পন্দন অনুভব হয় ; তন্বঙ্গীর মনোহর অবলীলাগতি পশ্চাতে যেন কমলালয়ার কমলকুঞ্জের সৌরভ বিকীর্ণ করিয়া যায়—কোনরূপ ত্রুটি ঘটিলে তাহা যে কেবলই অশোভন তাহা নহে, তাহা অশুভ, তাহাতে অলক্ষ্মী প্রশ্রয় পায় ; আমাদের গৃহলক্ষ্মীর কথায় বার্ত্তায় ভাবে ভঙ্গীতে সংসারের সর্ব্ববিধ কাজে কর্ম্মে ক্ষুদ্র বৃহৎ অনুষ্ঠানে নিয়ত একটি লক্ষ্মীশ্রী প্রকাশ পায়, আমাদের নিকট যাহা বিশেষরূপে শুভ এবং শুভ বলিয়াই একান্ত কমনীয়।

এই শুভ ভাবের প্রভাব এইখানেই শেষ নহে। কোথায় সীমন্তের সিন্দূররেখা, কোথায় চরণের অলক্তরাগ, কোথায় চিরন্তন কেশধূপরচনা, কোথায় তন্বঙ্গে চন্দন-পঙ্ক-লেপন, প্রকোষ্ঠে বলয়কঙ্কণ, গ্রীবাদেশে হারযষ্টি, এমন কি, শাড়ীর রক্তবর্ণ পাড়টি অবধি আমাদের অন্তরে প্রধানতঃ যেন একটি শুভ সূচিত করে। প্রসাধনকলার এই শুভসূচিতা আমাদের নব্যশিক্ষিত অন্তরে প্রথম দৃষ্টিতে হয় ত কেবল কুসংস্কার মাত্র বলিয়াই প্রতিভাত হয়, কিন্তু হৃদয়ের যোগে সৌন্দর্য্য যে শুভ হইয়া উঠে, যেখানে কেবল মাত্র বহিরিন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি ছিল, সেখানে অন্তরের একটি মনোহর পরিতোষ ভাব সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে অনেক বড় করিয়া দেয়, এ কথা আমরা বিস্মৃত না হই। কেবল প্রসাধন বলিয়া নহে, আমাদের যে-কোন কাজে—কি গৃহসজ্জা, কি উৎসবকলা, কি শঙ্খধ্বনি, কি মঙ্গলঘট স্থাপন, কি অন্য

কোন কিছু—হৃদয় যেখানে আপন ব্যাপকতা সঞ্চার করিয়াছে, সেইখানেই সুন্দর শুভ হইয়া উঠিয়াছে, সেইখানেই শিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অন্য দেশের সহিত আমাদের এই ভাবে বিশেষ একটু প্রভেদ আছে। রমণী যে দেশে আছেন, সেখানেই যে অলঙ্কারমণ্ডল ও বেশবিন্যাস-পারিপাট্যের ব্যবস্থা না থাকিয়া যায় না, সে কথা বলাই বাহুল্য। এবং এই বেশভূষা প্রসাধনের মধ্যে কোথাও সচেতনভাবে, কোথাও বা অজ্ঞাতসারে মনোহরণের একটি বিশেষরূপ চেষ্টা প্রকাশ পায়। কিন্তু এই মনোহরণ বোধ করি, আর কোনও দেশে আমাদের দেশের মত স্বামীর শুভ কামনা ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠার মধ্যে পুষ্ট হইয়া তাহার বণিক্‌ভাব হইতে মুক্ত হয় নাই। আমাদের গৃহিণীগণের অলঙ্কারমণ্ডন একটি অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে—তাহাতে প্রিয়জনের কল্যাণ হয় এবং পরিবারের লক্ষ্মীশ্রী অক্ষুণ্ণ থাকে। এই শুভ কামনায় ইহার ভিতরকার অনেক নিদারুণ দৈন্য ও মলিন হীনতা চাপা পড়িয়া গিয়াছে—বরঞ্চ ইহাতে সৌভাগ্যবতীদের একটু গৌরবের বিষয় হইয়াছে। এবং এই কারণেই প্রিয়বিয়োগে আমাদের গৃহিণীরা একেবারে নিরাভরণা হয়েন—স্বামীর কল্যাণের সহিত যে প্রসাধনের একান্ত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তদভাবে তাহাতে আর প্রয়োজন কি? বাহিরের সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট অন্তরের শুভ ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত না হইলে এতই নিষ্ফল।

শুভ কর্ম্মের দিন আমাদের গৃহদ্বারে মঙ্গলঘট কেবলমাত্র বহিঃশোভাসম্পাদক নহে, কিন্তু তাহা চূতপল্লবরমণীয় হইয়া উৎসব ব্যাপারে আমাদের একটি মঙ্গল ইচ্ছা ব্যক্ত করে। সেই কারণে তাহা আমাদের মানসচক্ষে য়ুরোপের বহুমূল্য গৃহসজ্জা অপেক্ষা সুন্দর। তাহা ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু তাহা গৃহকর্ত্তার আন্তরিক কল্যাণ ভাবের বাহ্য প্রতিমা-স্বরূপ (Symbol)। এই কারণে তাহা আমাদের চক্ষু আকর্ষণ করিবার পূর্ব্বেই এক মুহূর্ত্তে অন্তঃকরণের সুগভীর সুস্নিগ্ধ প্রসন্নতা আকর্ষণ করিয়া আনে। বিদেশীর কাছে ইহা নিরর্থক, কিন্তু শিশুকাল হইতে যাহারা প্রত্যেক মঙ্গল অনুষ্ঠানে এই মঙ্গলঘটের প্রত্যক্ষ ভাষা বুঝিয়া আসিয়াছে, তাহাদের নিকট ইহা একান্ত অন্তরতররূপে রমণীয়।

আমাদের ভাষায় যেমন শুভ এবং শোভা শব্দের একই ধাতু, তেমনি ভারতবর্ষীয়ের মনের মধ্যেও মঙ্গল এবং সুন্দর একত্র মিশিয়া আছে। এরূপ মিশ্রণ আর কোথাও নাই। এই মিশ্রণপ্রভাবে আমরা সৌন্দর্য্যকে চোখ দিয়া না দেখিয়া হৃদয় দিয়া দেখি, ধর্ম্মচক্ষু দিয়া উপলব্ধি করি। সেই জন্য পাত পাড়িয়া মাটির খুরী সাজাইয়া মাটিতে বসিয়া ধনী দরিদ্র আহূত রবাহূত অনাহূত সকলে মিলিয়া আহার করার মধ্যে কিছুই অসুন্দর দেখি না। আমাদের চক্ষে বিচ্ছিন্ন কদলীপত্র ও সুলভ মৃৎপাত্র অশোভন নহে, কিন্তু যদি দীনতম অতিথি গৃহস্বামীর অনাদর কল্পনা করিয়া বিমুখ হইয়া যায়, তবে তাহাই অশোভন; কারণ, তাহা

অশুভ; কারণ, তাহা যজ্ঞ-সমবেত জনসংঘের বিপুল হৃদয়গত অখণ্ড সদ্ভাববন্ধনের বিচ্ছেদজনক, সুতরাং কুশ্রী।

বরণ আমাদের একটি সনাতন অনুষ্ঠান। যাহাকে আমরা ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি, যাহার শুভ কামনা করি, তাহাকে বরণ করিবার প্রথা বহুকাল হইতে প্রচলিত। ঋগ্বেদের সময় সদস্য বরণ সকল উৎসবের একটি প্রধান অনুষ্ঠান ছিল। সেই বরণক্রিয়া অদ্য আমাদের দেশে নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তীর্ণ হইয়া আমাদের গৃহের মধ্যে স্নিগ্ধচ্ছায়া বিস্তার করিতেছে। বিবাহ হউক, অন্নপ্রাশন হউক, বারব্রত হউক—কখনো বধূ, কখনো জামাতা, কখনো স্বামী, কখনো পুত্র, কখনো অতিথি বা ব্রাহ্মণকে বরণ করিয়া লইতে হয়; এমন কি, নিতান্ত পক্ষে গোষ্ঠের গোরু অথবা ঢেঁকিশালের ঢেঁকিকে বরণ না করিয়া শুভ কর্ম্ম সমাধা হয় না। জীব ও জড়, আত্ম ও পর, সকলের মধ্যে এই অক্ষুণ্ণ সদ্ভাবের উত্তাপহীন সৌম্য জ্যোতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলে তবেই আমাদের যজ্ঞানুষ্ঠানের সৌন্দর্য্যবিকাশ প্রাপ্ত হয়। কেবল ঝাড় লণ্ঠন বা বৈদ্যুতিক আলোকচ্ছটায় হয় না।

ভারতবর্ষীয় প্রকৃতির এই শুভ সুন্দর ভাব যে বৌদ্ধ পালিমন্ত্রে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাই এই প্রবন্ধের উপসংহারে মঙ্গলশঙ্খধ্বনি উদ্‌ঘোষিত করুক :—

"সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্ঝা হোন্তু, অনীঘা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু। সব্বে সত্তা দুখ্‌খ পমুঞ্চন্তু। সব্বে সত্তা মা যথালব্ধ সম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু।"

সর্ব্বজীব সুখী হোক, অবৈর হোক, অবধ্য হোক, অহিংসিত হোক—সুখী আত্মা হইয়া কালহরণ করুক। সর্ব্বজীব দুঃখ হইতে প্রমুক্ত হোক। সর্ব্বজীব যথালব্ধ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত না হোক। ['প্রদীপ,' আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৬]

প্রার্থনা

স্নেহময়ী জননীর শ্যামল ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সংসারের রৌদ্রতপ্ত পথে পথে নয়নলোর সম্বল করিয়া আমরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। নরকযন্ত্রণার অন্ধকার বিভীষিকায় জীবনের মধুর প্রভাত অতিবাহিত করিয়া আমাদের হৃদয়ের শোভন সৌকুমার্য্য দিনে দিনে মুছিয়া যাইতেছে। তোমার সন্তানের মুখশ্রীতে যে পবিত্র মহত্ত্ব ছিল—যে গভীর সৌন্দর্য্যে মানবের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল, অযতনে সে হৃদয়ের অনুপম ভাব ম্লান হইয়া পড়িতেছে। আর সে মহান্ সৌন্দর্য্য—গম্ভীর শোভা—সুমধুর পবিত্রতা নাই। বিষয়চিন্তায় ইহকাল ফুরাইয়া যায়; পরকাল চক্ষের সম্মুখে ধোঁয়ার মত—সেখানেই বা আশা কোথায়? জননীর

ক্রোড়ে আমাদের আর স্বত্ব নাই, মাতার স্নেহে আমাদের আর অধিকার নাই, সংসারের আদেশে স্নেহের উৎস, প্রেমের সাগর ছাড়িয়া চিরদিন পরের মুখ চাহিয়া জীবন কাটাইতে হইবে—আমাদের যেন জননী নাই, বিপুলা ধরণীতে আমাদের যেন থাকিবার স্থান হয় নাই, মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া পাপের আশ্রয়ে জীবনের শান্তি রচনা করিতে হইবে। স্নেহময়ি! এই দুর্দ্দিনে তোমার নিরন্ন ক্ষুধাকাতর সন্তানকে ক্রোড়ে আশ্রয় দাও। আমাদের চারি দিকে অবসাদ ঘনাইয়া আসিতেছে। আপন ভারে আমরা অবসন্ন—আর ভার বহিতে পারি না। বাসনা আমাদিগকে শত পাকে জড়াইয়াছে—কুহকিনীর মন্ত্রপাশ ছিন্ন করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। পাপপঙ্কিল হৃদয়ে একবার তোমার চরণকমল অর্পণ কর—তোমার পুণ্যচরণ-স্পর্শে মায়াবিনীর নাগপাশ ছিন্ন হইয়া যাইবে। আমাদের হৃদয়ে সকলই অন্ধকার। অন্ধকার আসিয়া আলোককে ছাইয়া ফেলিয়াছে, রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিয়াছে, হিংসা আসিয়া প্রেমকে আক্রমণ করিতেছে, সত্যের অবমাননা করিয়া মিথ্যা দিন দিন স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের আর মঙ্গল নাই—এখন তুমিই একমাত্র অগতির গতি।

জানিয়া, না জানিয়া বাসনার পূজার জন্য কত বার কত সুকুমার হৃদয়ে আঘাত দিয়াছি—কত হৃদয়ের সমস্ত সুখশান্তি দলিত করিয়া ক্ষুদ্রত্বের গর্ব্বে এমনি স্ফীত হইয়া উঠিয়াছি যে, তোমার নাম লইয়া রসনা তৃপ্তিরও অবসর পাই না। কথায় কথায় তর্ক করিতে ছুটি, আস্ফালন করিতে থাকি, তোমার নাম লইয়া পরস্পরের প্রতি অন্যায়াচরণ করি—কাপট্য অবলম্বনপূর্ব্বক তোমার পবিত্র নামে অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করি। প্রভুত্বের জন্য, যশের জন্য, হৃদয়ের সহস্র তুচ্ছ বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য পরস্পরের বিপক্ষে শাণিত রসনার তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার স্থাপন করিয়া আমরা আনন্দিত হইতেছি। মনে করিয়াছি, পরলোক নাই, ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই, ফাঁকি দ্বারা সকল কার্য্য সমাধা করিয়া সহজেই আপনাকে ধর্ম্মের অবতার প্রতিপন্ন করিব। এইরূপে ফাঁকির উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া দিন দিন আমরা ফাঁকিতে পড়িতেছি। রসনা যাহা বলে, হৃদয় তাহা বিশ্বাস করিতে পারে না, বাক্য যে উপদেশ দিয়া যায়, কার্য্য তাহা দূরে ফেলিয়া দেয়, কায়মনোবাক্য এক ভাবের সেবা করিতে চাহে না। তোমার করুণা বিনা আমাদের আর গতি নাই। তোমার ন্যায়দণ্ডে আমাদিগকে শিক্ষা দাও, যাহাতে পাপের কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিয়া তোমার পূর্ণ মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিতে পারি।

আমাদের পাপের অন্ত নাই—সাধ করিয়া আমরা পরের হৃদয় লইয়া টানাটানি করি, পরের মনে কষ্ট দিয়া সুখী হই—আমাদের পাপের শেষ নাই। নির্ম্মম শকুনি-ভাবে আমাদের হৃদয় পাষাণ হইয়া গিয়াছে। দুই মুঠা তর্কের সাহায্যে আপনার মূর্ত্তি গড়িয়া

অহোরাত্র আপনাকেই পূজা করিতেছি। বিপদে পড়িলে চৈতন্য উপস্থিত হয়—তখন একবার তোমার জন্য কাঁদিয়া উঠি। তোমার করুণায় বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া আবার আপনার অহঙ্কারে মত্ত হই। সাংসারিক প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনায় হৃদয় টলমল—কিন্তু দাম্ভিকতা ছাড়িতে পারিলাম না। কথার উপর কথা জড় করিয়া আপনার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতেছি—কথা কাটাকাটিতে পরাজয় সহিতে হইবে না। হৃদয় যে অনুর্ব্বর হইয়া উঠিতেছে, সে দিকে দৃষ্টি নাই। বহিঃশত্রু হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে গিয়া অন্তরে রিপুকুলের প্রতিষ্ঠা করিতেছি—তাহা বুঝিতেছি না। এ জড়-হৃদয়ে তোমার চরণ-সৌন্দর্য্য একবার স্পর্শ কর—হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠুক। তোমার ন্যায়দণ্ড এ পাষাণের পাষাণত্ব ঘুচাইয়া দিক—পাষাণ গলিয়া গিয়া প্রেমের উৎস বহিতে থাকিবে। আমরা অধঃপাতে যাইতেছি। তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

এই চির-অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া—মৃত্যুন্মুখ মুহূর্ত্তের অঙ্কে মস্তক রাখিয়া—মা আমার! তোমার সন্নিধানে প্রার্থনা, তোমার কার্য্যসাধনে কখনও অবহেলা না করি—মৃত্যুযন্ত্রণায় তোমার কার্য্য করিতে করিতেই জীবন অবসান হয়। ['পুণ্য,' অগ্রহায়ণ ১৩০৭]

গান

এই বিশাল জগতের অন্তরতম প্রদেশ হইতে যে সুমধুর ধ্বনি উত্থিত হইয়া সমস্ত জগতের প্রাণের মধ্যে শান্তি ছড়াইতেছে—যে মহান্ ছন্দে গ্রথিত হইয়া চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রেরা নীরবে নিঃশব্দে নিজের কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, সেই শান্তিময়ী ছন্দোময়ী ধ্বনির নামই গান। জগতের প্রাণের রুদ্ধ উৎস টুটিয়া যে আনন্দহিল্লোল তাঁহার মরমে আসিয়া আঘাত করে এবং মরমের সমস্ত তন্ত্রীগুলি সুরলয়তানে বাজিয়া উঠে, সেই আনন্দহিল্লোলের ঘাতপ্রতিঘাতধ্বনিই আমাদের সুরলয়তানযুক্ত ছন্দ—আমাদের প্রাণের প্রাণ সঙ্গীত। এই মহান্ ঘাতপ্রতিঘাতের প্রতিধ্বনি মানবের কণ্ঠে গিয়া আঘাত করে; এই জন্যই শুধু মনুষ্য সঙ্গীতের মর্ম্ম কতকটা বুঝিতে পারে—জগতের মহান্ সঙ্গীতের সামান্য অনুকরণ করিয়াও সুখী হয়।

মরমের লুকান প্রদেশ হইতে গানের উৎপত্তি, শ্মশানের গম্ভীর ছায়ায় তাহার কায়া এবং চিরশান্তির অনন্ত আশ্রয়ে তাহার বৃদ্ধি। দূর স্বপনের মত প্রাণের পরে সে একবার যে পদচিহ্নগুলি ফেলিয়া যায়, ইহজন্মে তাহা আর মুছে না—সে সুধামাখা রেখাগুলি চিরদিনের জন্য স্মৃতির জীবন্ত ছায়ার মধ্যে অন্ততঃ অস্ফুট আকারেও বিরাজ করিতে থাকে।

চারি দিক্ হইতে শত সহস্র ছোট বড় বিস্মৃতি তাহাদের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকে; কিন্তু স্তম্ভিতহৃদয়ের মত এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না।

আমরা সামান্য মনুষ্য—ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে আমরা সকল জিনিসকেই কতকটা বাঁধিয়া রাখিতে যাই। মহত্ত্বের বন্ধন নাই—আঁটা-আঁটি বাঁধাবাঁধি সীমার ভাবে মহত্ত্বের কায়া কলঙ্কিত নহে। অসীম ভাবের অসীম ক্ষেত্র। কিন্তু আমরা এমনি নির্ব্বোধ যে, এই অসীম ক্ষেত্রকে পর্য্যন্ত বদ্ধ করিতে পারিলে—একটা সীমানা দিয়া ঘর বাড়ী তুলিয়া প্রাচীর গাঁথিয়া এই অসীম ক্ষেত্রের মুক্ত বায়ুকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে সমর্থ হইলে, আপনাদিগকে পরম পণ্ডিত বলিয়া মনে করি। গান পৃথিবীর সীমা ছাড়াইয়া—তারকাখচিত নীল নভোমণ্ডলের দিগন্তব্যাপী ক্ষেত্রকে বহু পশ্চাতে রাখিয়া অনেক দূর উঠিয়াছে। আমাদের পৃথিবীর দুই চারিটা 'সা-রে-গা-মা'র মধ্যে সে কখনই বদ্ধ নহে। কতকগুলা কটমট কথার মধ্যে তাহার ভাবকে কিছুতেই আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। গান স্বাভাবিক সরল জ্যোৎস্নাময়ী। তাহার অনন্ত উচ্ছ্বাস, অনন্ত প্রাণ। তর্কের দুয়ারে আজীবন হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিলেও তাহাকে আয়ত্ত করা যায় না। ভাবের দুয়ার, প্রাণের দুয়ার প্রশস্ত করা চাই, খুলিয়া রাখা চাই, তবে গান আমাদের প্রাণে পঁহুছাইবে। প্রাণেই গানের প্রতিধ্বনি শুনা যায়। হৃদয় সেই প্রতিধ্বনিকে ধরিয়া রাখিতে চায়।

গান এ জগতের সামগ্রী নহে—পার্থিব ধূলিকণায় তাহার দেহ মলিন নহে। সে কোন জ্যোৎস্নার দেশ হইতে আসিয়াছে। নয় ত তাহার প্রাণ জ্যোৎস্নাময়ী স্বপ্নময়ী হইল কেন? অনন্তত্বের ছায়াই গানের প্রাণ। সে শুষ্ক ধরণীতে শুধু শান্তি ছড়াইতেই আসিয়াছে—ধরণীর কঠিন বক্ষকে শ্যামল ভাবে গঠিত করিতে আসিয়াছে—জীর্ণ প্রাণের জীর্ণ কক্ষে এক ফোঁটা মৃতসঞ্জীবনী আনিয়া দিয়া মরণের প্রজাকে জমিদারের অত্যাচার হইতে মুক্তি দিতে আসিয়াছে।

কবিত্ব এই মহান্ গানের ছায়া। কবিত্বের জ্যোৎস্নালোকে এই মহান্ সঙ্গীত ফুটিয়া উঠে। স্তব্ধ জগতের নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া এই গানের হিল্লোল যখন প্রাণে আসিয়া আঘাত করে, তখন প্রাণের বেলাভূমি সেই তরঙ্গাঘাতে টুটিয়া গিয়া তাহার কোলে চিরজনমের তরে মিলাইয়া যায়—আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থ লোভ মোহ তাহার গম্ভীর অতলস্পর্শ জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া চিরদিনের মত আমাদিগকে পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া যায়।

এ মহান্ গান শুনিতে হইলে সংসারের পরপারে যে এক বিস্তৃত "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" ভূমি পড়িয়া আছে, সেই বিস্তৃত ভূমিখণ্ডের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইতে হয়। সেখানে দাঁড়াইলে জগতের মহান্ গীতিধ্বনি আমাদের মরমের অভ্যন্তরে প্রতিধ্বনিত হয়—

আমাদের হৃদয়ের চিরশান্তিময় নিভৃত আবাসে গিয়া পঁহুছায় এবং ক্ষুদ্র প্রাণে মহত্ত্বের সঞ্চার করিয়া দেয়। পার্থিব কোলাহলের মধ্যে অন্যমনস্ক থাকিলে এ ধ্বনি শুনিব কিরূপে? পৃথিবীর ধূলায় প্রাণের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে সে প্রাণে পঁহুছিবে কিরূপে?

হৃদয়ের নীরব অশ্রুজলের মধ্যে জগতের মহান্ অশ্রুজলের যে শুভ্র হাসির ছায়া পড়ে, সেই ছায়ায় বিশ্বের এই অমর গান সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণে এই অশ্রুজলের মধ্য দিয়াই তাহার অনন্ত ভাব আসিয়া আঘাত করে। আমরা সে অনন্ত ভাব অনেক সময় ধরিতে না ধরিতেই তাহা মিলাইয়া যায়; কিন্তু তাহার শুভ্র পদচিহ্নগুলি ইহজনমের মত আমাদের হৃদয়ের প্রশস্ত দুয়ারে বসিয়া যায়—আমাদের হৃদয়ের বদ্ধ বায়ুতে মলয়ানিল আনিয়া দিয়া আমাদিগকে মহত্ত্বের দিকে কতকটা আকৃষ্ট করে।

এই মহান্ গানের মহদ্ভাব অশ্রুজল ভিন্ন আর কেহ প্রকাশ করিতে পারে না। আর কিছুই তাহার গভীর তলে ডুবিতে পারে না। এক ফোঁটা অশ্রুজল এত দূর গভীর যে, তাহার মধ্যে জগতের এই মহান্ গানও প্রস্ফুটিত হয়। আমরা অশ্রুজলকে নিতান্ত 'কিছুই না' মনে করি—তাহার গভীরতা না বুঝিয়া তাহাকে এক ফোঁটা বলিয়া উপেক্ষা করি। কিন্তু ইহা আমাদের অতিশয় ভ্রম। এক ফোঁটা অশ্রুজলের মধ্যে শত শত বৃহৎ সাম্রাজ্যের চিরদিনের মত সমাধি হইতে পারে—এক বিন্দু অশ্রুবারির তোড়ে শত সহস্র যৌবনের দম্ভ অহঙ্কার অভিমান চূর্ণ চূর্ণ হইয়া যায়। বাঁধ বাঁধিয়া মনুষ্য কিছুতেই অশ্রুজলকে বাধা দিতে পারে না—সীমানা দিয়া আটকাইয়া রাখিতে পারে না। সে অসীম বলিয়াই তাহাতে অসীম গানের ছবি ফুটিয়া উঠে। গান সসীমের মধ্যে প্রস্ফুটিত হইতে পারে না।

আমরা যখন ক্রমাগত সুখের সময়, দুঃখের সময়, সম্পদে বিপদে এই সুধাময় সঙ্গীত শুনিতে থাকিব, তখনই জানিব—আত্মার অনন্ত উচ্ছ্বাস কোথায়। তখন আমাদের চারি দিকে শান্তি, চারি দিকে শুধু অনন্ত আনন্দ। তখন,

"চারি দিকে সৌরভ, চারি দিকে গীতরব
চারি দিকে সুখ আর হাসি,
চারি দিকে শিশুগুলি মুখে আধ আধ বুলি
চারি দিকে স্নেহ প্রেমরাশি।"

['পুণ্য,' পৌষ ১৩০৭]

টা ও খান

১। চেতন পদার্থের নামের সঙ্গে 'টা' বসে, 'খান' বসে না। যেমন—একটা লোক, লোকটা, একটা ঘোড়া, ঘোড়াটা, একটা পাখী, পাখীটা, একটা মাছ, মাছটা।

২। সেলাই করা কাপড়ের—যাহাতে দর্জ্জির হস্ত আবশ্যক—নামের সঙ্গে টা বসে, খান বসে না। যেমন—কোটটা, একটা কোট, একটা চাপকান, একটা পিরান, পিরানটা ইত্যাদি।

৩। তাঁতে বোনা কাপড়ের নামের সঙ্গে টা এবং খান দুইই ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যেমন—একখানি ধুতি, একটা ধুতি, ধুতিখান ছিঁড়ে গেল, ধুতিটা পচা। কাপড়টা, চাদরটা, কাপড়খানি, চাদরখান ইত্যাদি।

৪। বাসনের নামের সঙ্গে সাধারণতঃ টা বসে। যেমন—একটা ঘটী, দুইটা কলসী, একটা থালা, একটা পেয়ালা। ইত্যাদি।

৫। স্থলবিশেষে চতুর্থ নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যেমন—থালাখান।

৬। কাটিবার শাণিত অস্ত্রের নামের সাথে টা এবং খান দুই বসে। যেমন—খাঁড়াটা, খাঁড়াখান, একটা ছুরি, ছুরিটা, ছুরিখান। ইত্যাদি।

৭। আগ্নেয় অস্ত্রের এবং যে সকল অস্ত্র দূর হইতে মারে তাহাদের নামের সহিত 'টা' ব্যবহৃত হয়, 'খান' নহে। বন্দুকটা, একটা বন্দুক, কামানটা, একটা কামান। তীরটা, ধনুকটা।

৮। চিঠি পত্র বহিটইয়ের সঙ্গে টা ও খান দুইই বসে। চিঠিটা, চিঠিখান। বইখান, বইটা। পুস্তকের সহিত 'টা'রই অধিক মিল।

৯। বাড়ী ঘর দ্বার সঙ্গে 'টা' ও 'খান' দুইই চলে।

১০। ঘৃণা, আজ্ঞা এবং সময় সময় অনুগ্রহ প্রকাশ করতে হলে 'টা' ব্যবহৃত হয়। লোকটা দুষ্ট, লোকটা ভদ্র বটে।

১১। উদ্ভিদ নামের সহিত টা ব্যবহৃত হয়। গাছটা, একটা গাছ।

১২। বিদ্যা গানটান—একটা গান, গানটা।

১৩। গুণবাচক নামের সহিত 'টা' বসে। একটা গুণ, গুণটা, বুদ্ধিটা ধারাল। বুদ্ধিখান নয়।

১৪। হাতখান, দেহখান।

১৫। বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত বিশেষণের সহিত 'টা' বসে 'খান' নহে।

১৬। গহনার নামের সহিত 'টা' বসে কোন কোন নামের সহিত 'খান'।

১৭। মাছের অংশখান—কখান হল।

১৮। অংশ বুঝাইলে 'টা' ও 'খান'। ['পুণ্য,' চৈত্র ১৩০৭]

সুরা দেবী

কিঙ্খাপের কুসুম-কোমল শয্যার উপর সুরা দেবী আলুলায়িত কেশে উপবিষ্টা। অধরোষ্ঠে সাদর সম্ভাষনী হাসি, নয়নের কোণে ঢুলুঢুলু জড় ভাব, রক্তিম গণ্ডস্থলে চুম্বনের রেখার মত সৌন্দর্য্য ফুটিয়া পড়িয়াছে। মান অপমান, জাতি কুল ভুলিয়া ভক্ত সেবকেরা চারি পার্শ্বে ঘিরিয়া বসিয়াছে। ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ দেবীর পাদমূলে স্তূপাকৃত স্বর্ণমুদ্রা। সেই স্বর্ণঔজ্জ্বল্যের মধ্য হইতে সুরা দেবীর রঞ্জিত পদতলের অস্ফুট রক্তিমা সন্ধ্যার স্বর্ণ-লাবণ্য-উজ্জ্বল রক্তিম মেঘখণ্ডের মত শোভা পাইতেছে। এই বাহ্য-সৌন্দর্য্যে বিষহৃদয়া সুরা দেবী ভক্তদিগকে মুগ্ধ করিয়াছেন। তিনি তাহাদের প্রাণে অতি ধীরে ধীরে বিষ সেচন করিতেছেন। মুগ্ধ ভক্তেরা মনে করিতেছে, ইহা বিষ নয়—অমৃত।

রজনী সুরা দেবীর শৈশব সহচরী—শয্যাপ্রান্তে বসিয়া বিবশা সুরা দেবীকে চামর ব্যজন করিতেছে। ঐশ্বর্য্যগর্ব্বিতা সুরা লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে এক একবার রজনীর পানে চাহিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন। ভক্তেরা ভাবিতেছে—দেবী প্রসন্না। প্রথম যৌবনের মত সে অধোহাসি ভাব দেখিয়া পাষাণও গলিয়া যায়—মুগ্ধ ভক্ত যে সে ছলনায় ভুলিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি।

সুরা দেবী বাল্যকালে সুরপুরীতে দেবকন্যাগণের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইতেন—নন্দন কাননে ফুল পাড়িয়া, ফল ছিঁড়িয়া যথেচ্ছা বিচরণ করিতেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার কুটিল স্বভাব অল্পে অল্পে প্রকাশ হইতে লাগিল। শচী দেখিলেন, সুরা দেবভূমিতে মৃত্যুর প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নশীল। ইন্দ্রের নিকট এ সংবাদ প্রকাশ করিয়া তিনি সুরাকে সুরলোক হইতে দূর করিয়া দিলেন। সেই দিন সখী রজনীকে সঙ্গে লইয়া সুরা মানবের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

স্বর্গের পরিত্যক্তাকে মানবেরা সহজেই আশ্রয় দান করিল। দলে দলে সুরার ভক্ত সেবক জুটিতে লাগিল। মোহাচ্ছন্ন ভক্তের রক্তে ফোঁটা পরিয়া সুরা দেবী ধরণীতে অকাল-মৃত্যুর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সেই অবধি তাঁহার ভক্তেরা অকাল-মৃত্যুর পূজা করিয়া আসিতেছে। সুরা দেবী মৃত্যুর প্রণয়িনী। ['পুণ্য,' বৈশাখ ১৩০৮]

নীরবে

যখনই তাহার কাছে যাই, সে ত কথা কহে না, কেবলই নিমেষহীন দৃষ্টিতে হৃদয় বিদ্ধ করিয়া নীরবনেত্রে মুখপানে তাকাইয়া থাকে। বসন্তের পর বসন্ত তাহার অধর-খসিত [?] কনক-কাহিনীর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি—কাননে কাননে ফুল ফুটিয়া উঠে, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখী গাহিতে থাকে—সে কথা কহে না। তাহার হৃদয়ের সমস্ত আকুলতা যেন তুটি সুকোমল নলিন-নয়নে ঘনীভূত হইয়া সেখান হইতে নীরবে আপনাকে ব্যক্ত করিতেছে। আর ভাষা নাই, কথা নাই, কেবলই নীরবে চোখে চোখে। কিন্তু এ গভীর নীরবতায় কি হৃদয় তৃপ্তি মানে? এত দিন ধরিয়া সাথে সাথে ফিরিলাম, এত কথা বলিলাম, এত হাসিলাম, এত অশ্রু ফেলিলাম, তবু এক ক্ষুদ্র বালিকার একরত্তি হৃদয়ের তুটি কথা শ্রবণে পশিল না? কিন্তু সে যে কি চোখে চায়, কি দৃষ্টিতে দেখে, নিকটে আসিলে সে কাতর নয়ন-নীরবতাতেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ি! তবু যদি একটি কথা কয়—অশ্রু ফেলিয়া কাজ নাই, বেদনা বলিয়া কাজ নাই—শুধু একটি মাত্র কথা, একবার—আর নয়। এত প্রেম, এত ভালবাসা, একটি কথা আর কহিবে না? তবে ত সকলই ব্যর্থ!

ওগো না, কিছুই ব্যর্থ নহে। নীরব-দৃষ্টিতে সে তুই হৃদয়ের বেদনা গাঁথিয়া শুভ্র প্রেম-কাব্য রচনা করিতেছে। এ প্রেম টুটিবার নয়। ভাষা আসিয়া মর্ম্মমথিত এ নীরব সম্মিলন-সুধা-মধ্যে প্রিয় ছলনা রচিতে পারে নাই। তবে তুটি কথা শুনিবার জন্য এ অধীরতা কেন? সেই তুটি কথার স্মৃতিতে সমাহিত হইয়া হৃদয় বুঝি কি সুগভীর আনন্দ লাভ করিবে। কিন্তু নয়ন যে ভাষা ব্যক্ত করিতেছে, রসনা কি তাহা পারে? শব্দ আকাশে মিলাইয়া যায়, এ সুকুমার রজতদৃষ্টি মর্ম্মের স্তরে স্তরে বিঁধিয়া থাকে। সে হয় ত কথা বলিতে চাহে, কিন্তু গভীর হৃদয়ে যে তরঙ্গ উথলিয়া উঠে, অধরের রাঙ্গা তটে আসিয়াই তাহা মিলাইয়া যায় বুঝি। তাই তাহার বলা আর হইল না। সে ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর মধ্যে না জানি কত কথাই গুমরিয়া মরে। নহিলে এত প্রেম কি কেবলই চোখে চোখে? বুকের বাঁধ ভাঙ্গিয়া হৃদয় বাহির হইতে চাহে না? ভাষা বাহির হইবার জন্য প্রাণ কেমন করে না? তাহার মুখ কিন্তু ফুটিল না। জানি, সে হৃদয় ভাষায় ব্যক্ত হইবার নহে—নীরবতাই তাহার একমাত্র ভাষা; কিন্তু মনে হয়, এ জীবনে যদি এক দিনও তাহার অস্ফুট স্বর শুনিলাম।

তাহার মুখ হইতে কখনও প্রেম আহ্বান শুনি নাই, তবে কি করিয়া বলি, এ হৃদয়ের সহিত সে হৃদয় একই সুরে বাঁধা? মুখপানে চাহিয়া স্থিরনেত্রে বসিয়া রহে বলিয়া? অর্দ্ধগ্রথিত মালাগাঁথা শেষ হয় না বলিয়া? কে জানে কেমন করিয়া জানি, সে কি ভাবে,

সে কি চাহে। তাহার হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গভঙ্গ, মৃদুতর মৃদুতম শিহরণ কিন্তু অনুভব করি। তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রেম ধরা দেয়। চন্দ্রমার নীরব দৃষ্টিতে হৃদয় উথলিয়া উঠে কেন? কুসুমের মৃদু সৌরভে প্রাণ আকুল করে কেন? সে মর্ম্মনিঃসৃত ভাষাহীন ভাষা যে বুঝে, সে বুঝে। প্রেমের ভাষা ভাষাহীন। প্রেম কি কথা কহে না? কহিবে কেন? কিন্তু প্রেম যত গভীর হয়, কথা নীরব হইয়া আসে। যে প্রেম সহিতে চাহে—সুখ চাহে না, যে প্রেম জ্বালায় কাতর নহে—তৃপ্তি খুঁজে না, কণ্ঠভাষায় সে ব্যক্ত হইবে কিরূপে? সে অধর-পল্লবে আপনার কাহিনী লিখিয়া রাখিয়া যায়, নয়নপ্রান্তে চকিত আকুলতা রচনা করে। কিন্তু প্রেম তাহা নিজেই হয় ত জানে না। না জানিয়াই তাহার ভাষার প্রকাশ। যে তাহা অনুভব করে, সেই দেখিতে পায়।

সন্ধ্যাছায়াময় নদীতীরে বসিয়া তাহাকে যখন জীবনের কাহিনী শুনাই, আমার এই সঙ্গিহীন সহায়হীন কঠোরতা-বেষ্টিত মরুজীবনের সুখদুঃখের কথা বলি, তখন সে কি প্রশান্ত আগ্রহের সহিত শুনিতে থাকে। চারি দিক হইতে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে আকাশ ছাইয়া ফেলে, অনন্যমনে সে শুনিয়া যায়। প্রেম না থাকিলে সে ভাবে কেহ শুনিতে পারে না। যখন আমার দুর্দ্দিনের কথা বলি, বিপদ্‌সঙ্কুল জীবনের বিপদের কথা বলি, তাহার আঁখিপাতা সিক্ত হইয়া আসে, সর্ব্বাঙ্গ দিয়া একটা শিহরণ বহিয়া যায়। সে কথা কহে না; কিন্তু আর কি তাহার কথা শুনিবার আবশ্যকতা আছে? কেবল আমার শ্রবণপরিতৃপ্তি—এ সুখটুকু না হয় নাই ঘটিল। হৃদয়বন্ধন ত আর ঘুচিবে না। প্রেমের এমন মধুর চির-মিলনময়ী ভাষা ছাড়িয়া কণ্ঠধ্বনির আহ্বান শুনিতে চাহে কে? তবু যদি রহিত! তাহা হইলে না জানি তাহাকে আরও কত সর্ব্বাঙ্গীন অনুভব করিতাম! এত করিয়া মনকে বুঝাই; তবু মনে হয়, তাহার একটি কথা জীবনে শুনিতে পাইলাম না!—একটি—একটিমাত্র কথা!

নীরবে—নীরবে। এমনি নীরবেই শরতের শুকতারা কাহার পানে চাহিয়া থাকে। এমনি নীরবেই চন্দ্রালোক সাগরহৃদয়ে তরঙ্গ তুলে। নীরবে সন্ধ্যারাগে আকাশে ধরণীতে সম্মিলন হয়। নীরবে ফুল পবন-হৃদয়ে সৌরভ ঢালিয়া দেয়। নীরবে—নীরবে। সেও নীরবে—নীরবে চাহিয়া থাকে, নীরবে হৃদয় ঢালে, নীরবে এ শূন্য হৃদয় পূর্ণ করে।

কিন্তু সে যদি জানে যে, অধরসিক্ত দুটি মধু-বাণী শুনিলে হৃদয় পুরিয়া উঠে, তাহা হইলে কি কথা কহে না? তাহাকে ত কখনও এমন কথা বলি নাই। সে ত জানে না, তাহার কথা শুনিতে এ হৃদয়ে কত আকাঙ্ক্ষা। সে হয় ত মনে করে, কি বলিতে কি বলিয়া হৃদয়ে ব্যথা দিবে। সে হয় ত আমার কথাতেই তন্ময় হইয়া থাকে, বলিবার অবসর পায় না।

কিন্তু এত প্রে
এই নীরব মিলনের মত
সেইখানেই বুঝি চির-
করিবে না। মনে হয়,
কুসুমচয়নে স্মৃতি মাত্র ছ
কিন্তু সে ভাষাহীন ভ
ইহা কিন্তু শুধু মনে হয়
তবু যেন সমস্ত হৃদয়ের
পড়ে, চক্ষু অন্ধকার
জন্য হৃদয় উদ্‌গ্রীব হইয়
বিরহ আসিয়া প্রাণ আ

তবে কি তাহা
তাহাকে বুঝি সর্ব্বাঙ্গীন
সৌরভময়, তরঙ্গভঙ্গীমা
চাহনীটুকু দেখিয়া জীব
তাহার বিমল হৃদয়ে হৃদ
অদৃষ্টে কি আছে?

['সাহিত্য,' আষাঢ় ১৩২

দুইটি নন্দনশোভা মরণশয্যায়,
সন্ধ্যার আঁধারছায়ে লইছে বিদায়।

['বিশ্বভারতী পত্রিকা,' আষাঢ় ১৩৫৩]

দুইটি গান

(১)

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়!
জগত শিশুর মত চরণে ঘুমায়ে রয়!
অভিমান অহঙ্কার মুছে গেছে নাহি আর,
ঘুচে গেছে শোক তাপ, নাহি দুঃখ নাহি ভয়!
কোটি রবি শশী তারা, তোমাতে হয়েছে হারা,
অযুত কিরণ-ধারা তোমাতে পাইছে লয়!

(২)

নিশীথ নিদ্রার মাঝে জাগে কার আঁখি-তারা,
সুপ্ত লোক লোকান্তরে সে আঁখি নিমেষহারা!
শ্বাসহীন মহাপ্রাণ মহাকাশে স্তম্ভমান,
অচেতন বিশ্বে বহে অনন্ত চেতনা-ধারা।
ছাড় যোগী নিদ্রাবেশ, হের আঁখি অনিমেষ,
মিল' সে জাগ্রত প্রাণে, ভাঙ্গ এ কুহক-কারা।

[ব্রহ্মসঙ্গীত]